জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি

"আত্মনে মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ"

শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)

Published by:
Shri Paramhans Swami Adgadanandji Ashram Trust
New Apolo Estate, Gala No. - 5,
Mogra Lane Near Railway Subway
Andheri (E), Mumbai - 400069
Tel. No.: 022-2825 5300
Email : contact@yatharthgeeta.com
Website : www.yatharthgeeta.com

Trust office :
Shri Parmhans Ashram
Village : Akhnir (Near Delight Garden)
Sector- 21C, Surajkund Road, Faridabad, Hariyana,Pincode -231304

© Author - **Shri Paramhans Swami Adgadanandji Maharaj**

Edition - 1st Edition February 2020 - 2000 Copies

The " Yatharth Geeta" copyright (c) 2020 by
Shree Paramhans Swami Adgadanandji Maharaj.

All Rights Reserved. No part of this book may be used or reproduce, stored in or into any retrieval system or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) in any manner whatsoever without written permission of the copyright owner.

Printed by:
Mahindra Enterprises
Shop No. 9, Khatau Terrace,
Dr. S. S. Rao Road,
Lalbaug, Mumbai - 400 012.
Email : mahindraenterprises@gmail.com

Price: Rs. 250.00

ISBN : 81- 89308 -14 - 9

অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রাক্কথন	ক—ট
প্রথম উচ্ছ্বাস	
জীবন-পরিচয়	৩
বাল্য জীবনের বিলক্ষণ ঘটনা	৩
পাঠশালার শিক্ষা	৪
ব্যায়ামের প্রেরণা	৪
পরিণয়-সূত্র	৪
আকাশবাণী এবং সাধু-মিলন	৪
সাধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত আশীর্বাদ	৬
বৃদ্ধা দ্বারা তরুণীর সংবাদ	৬
সদ্‌গুরু-দর্শন	৯
ভজনারম্ভ	১০
লঙ্গড়ু বাবা	১০
সদ্‌গুরুর পরকায়া প্রবেশ দ্বারা মনের স্থিরতা	১১
সাধনা-ক্রম	১২
প্রভাত ফেরী	১৩
ইষ্ট সর্বত্র ব্যাপ্ত এ বিষয়ে বিশ্বাস	১৪
সাধনা পরীক্ষার মাপকাঠিতে	১৭
সহধর্মিনীকে উপদেশ	১৮
নলকূপে গুরুদেবের স্নান ও সতর্কবাণী	১৮
গৃহে ভয়ঙ্কর উৎপাত	২০
ক্ষণিক আসক্তির ফলে ইষ্টের আদেশ	২১
প্রয়াগের ঘটনা	২১
প্রয়াগে কুম্ভমেলায়	২৬
পরিভ্রমণকালে জৌনপুর	২৭
জৌনপুরের কবর-স্থান	২৭
বিচরণকালে নিস্পৃহ আকাশবৃত্তি	২৮
কর্মনাশা নদীর তীরে দেবী-মন্দির	২৯
শিশিরকালে দিগম্বরাবস্থা	৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা

রামনগরে ভক্তদের মাঝে	৩২
ফকীরের সঙ্গে ভোজন	৩৩
যমুনার তীরে স্ত্রীলোকদের ভজন	৩৪
বিচরণকালে আগ্রা নগরে	৩৪
কামিনী কাঞ্চন থেকে নিবৃত্তি	৩৫
কুপাত্রকে দান	৩৬
উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায়	৪০
হিমালয়ের উপত্যকায়	৪১
ইষ্ট-এর আদেশের গুরুত্ব	৪৩
মধ্বাপুর গ্রামান্তে চাতুর্মাস্যা	৪৪
পুনর্জন্ম	৪৮
বিল্ব ফলরক্ষা	৪৯
মরণাসন্নকে জীবনদান	৪৯
ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহারাজজী	৫০
সাধুকৃপাতে পরমার্থ-পথ	৫৩
কণ্ঠমালা	৫৩
জন কোলাহলের মাঝে ধ্যানস্থ	৫৪
নারকেল খাওয়ার ইচ্ছা	৫৫
দুধ ভিক্ষাতে মৎস্যপ্রাপ্তি	৫৬
জঙ্গলের ভিতর সাহায্য লাভ	৫৭
জন্মভূমির পথে	৫৭
জম্মু থেকে চিত্রকূটে প্রস্থান	৬১
জ্যোতিষীর উপর কৃপা	৬১
যাত্রাপথে কাশী এবং প্রয়াগ (হঠযোগ)	৬৩
দেহাধ্যাস	৬৫
কার্বী স্টেশনে বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন	৬৮
চিত্রকূটে মহারাজজী	৬৯
অনুসুইয়ার পথে	৭০
দ্রৌপদীবাঈ	৭১
সিদ্ধবাবার চমৎকারী তক্তাপোশ	৭২
ভোজন গ্রহণের জন্য আদেশ	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা

অনুসুইয়াতে শুরুর দিনগুলিতে	৭৪
হিংস্র পশু এবং বর্বর দস্যুদের মাঝে	৭৫
কোল-ভীল জাতির লোকেদের হৃদয় পরিবর্তন	৭৭
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ	৮১
অনুপানে দুধের বিধান	৮১
মহর্ষি অত্রির বিদ্যমানতা	৮৩
রামলখনদাসজীর আগমন	৮৪
দ্রৌপদীবাঈ-এর ষড়যন্ত্র	৮৬
শাস্ত্রার্থে বিজয়	৮৯
হাতে ফোড়া	৮৯
অনুসুইয়ার সিদ্ধ বাবা	৯১
পাপগ্রহের অবসান	৯১
সিদ্ধবাবার তক্তাপোশ ও মহাত্মা	৯৩
সাম্প্রদায়িকতার শমন	৯৪
আকাশবৃত্তি দ্বারা আশ্রমের ব্যবস্থা	৯৬
জাতিগত মোহ	১০০
অনুসুইয়া আশ্রমের পূর্ব ব্রহ্মচারী মশাই	১০২
ব্রহ্মচারী মশাই শিষ্যরূপে	১০৫
ভবিষ্যত দ্রষ্টা সাধু	১০৫
পশুপক্ষীর প্রতি সমত্বভাব	১০৭
সত্যযুগের মহাত্মা	১০৯
অনুসুইয়ার জঙ্গল	১১৪
পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আশ্রমে	১১৫
আসামের পণ্ডিত তীর্থভ্রমণের পথে	১১৬
জ্বর থেকে নিবৃত্তি	১১৭
তর্কশাস্ত্রের ছাত্রী সত্যানুসন্ধানে	১১৮
নির্মলদাসজীর দুরাগ্রহ	১২৩
চরখারীর পুরোহিত	১২৬
আশ্রমে ডাক্তার রামকুমার বর্মা	১২৭
শিষ্যদের নিযুক্তি	১৩৩
শিষ্য (অখণ্ডানন্দজী) এর প্রবেশ	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা

শ্রী ভগবানানন্দজীর প্রবেশ	১৩৮
স্বয়মানন্দজীর আগমন	১৪৩
স্বামী শিবানন্দজী	১৪৪
বগ্গড় বাবা	১৪৫
সিকটিয়া পুরবার ভক্ত	১৪৭
আমার প্রবেশ	১৪৭
আশ্রমের নিত্যক্রিয়া	১৫০
গুরুমহারাজের ছড়ি এবং স্পর্শ	১৫২
কামরূপ কামাখ্যার পাণ্ডা	১৫৪
শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ	১৫৮
ভবিতব্য পরিবর্তন	১৫৯
আশীর্বাদের ফলে রোগ মুক্তি	১৬০
গোপীপুরের প্রধান মশাই	১৬১
গুরু পূর্ণিমার ঘটনা	১৬৩
মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে জীবনদান	১৬৩
শীতল পণ্ডিত	১৬৫
বাঘ শাবক	১৬৮
শ্রী স্বরূপদাসজী	১৭০
সিদ্ধবাবার উদ্ধার	১৭১
নিবৃত্তির স্বরূপ	১৭১
সেবাতে প্রবৃত্ত লক্ষ্মীর দর্শন	১৭৩
নেহরুর রাজতিলক	১৭৫
শ্রীব্রহ্মচারী মশাই এবং করপাত্রী মশাইয়ের মধ্যে বার্তালাপ	১৭৫
সেবা দ্বারা ভজনের জাগৃতি	১৭৬
কালেক্টর চতুর্বেদী মশাই সেবাকার্যে	১৭৮
আশ্রমে প্রথম নির্মাণ কার্য	১৭৮
আমার নামকরণ	১৮১
চিত্রকূটে পূর্ণস্থিতিপ্রাপ্ত মহাত্মা	১৮৩
রামানন্দজীর সমর্পণ	১৮৪
দুধ ভিক্ষা	১৮৪
সাধকদের রক্ষণাবেক্ষণা	১৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা

অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা ১৮৭
ব্রহ্মচারী বাঁদর ১৮৭
গীতা যোগাড় ১৮৯
সাধকদের বৈরাগ্য ১৯০
সাধকদের যোগক্ষেম ১৯৪
ধারকুণ্ডী যাওয়ার নির্দেশ ১৯৫
পশু-পাখিদের মানবদেহ লাভ ১৯৬
তহশীলদার স্বামী ২০২
রামনগরের রামলীলা ২০৪
জঙ্গলে রেডিয়ো ২০৫
দানে প্রাপ্ত বস্তুর পুনরায় দান ২০৬
গাছী-বাছী-দাসী ২০৭
ঈশ্বরপথে নকল করা উচিত নয় ২১০
মহারাজজী দ্বারা ভাণ্ডারার আয়োজন ২১১
মহাপ্রয়াণের সময় ২১৬
বারোমাস্যা (পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের বাণী এবং উপদেশ) ২২১

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

সদুপদেশের ক্ষণিক দর্শন

ভগবৎ পথ এ সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কেন? ২৫৪
পরহিত কাকে বলে? ২৫৪
শাশ্বত আত্মার আবার কি হিত? ২৫৫
কল্যাণের সরল উপায় কি? ২৫৬
গৃহে থেকে কি ভজনা সম্ভব নয়? ২৫৬
যদি গৃহে নিবৃত্তি সম্ভব নয় তবে গৃহে থেকে লাভ কি? ২৫৬
ভজনার পরাকাষ্ঠা কাকে বলে? ২৫৭
ভগবান কি দেখা দেন? ২৫৮
ব্রহ্ম কি শূন্য? ২৫৮
নিশাচরের স্বরূপ কি? ২৫৯
গঞ্জিকা সেবন কি ধ্যানে সহায়তা করে? ২৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা

যথার্থতঃ সনাতন-ধর্ম কি? ২৬১
অবধের স্বরূপ (অবধ তজে তনু নহিঁ সংসারা) ২৬৫
মুক্তিদাত্রী সরযু কোথায় প্রবাহিত? নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এর স্থিতি কি? ২৭০
নরদেহের স্বরূপ ২৭৫
কামধেনু এবং কল্পবৃক্ষের স্থিতি ২৭৫
আধ্যাত্মিক পথে যুদ্ধ কি অনিবার্য ২৭৮
অমৃতবর্ষার প্রভাব নিশাচরদের উপর পড়েনি কেন? ২৮২
'উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন'-কোন্ স্থিতিতে ভগবান ২৮৪
প্রেরণা দেন এবং কোন্ বিড়ম্বনাতে মায়া? ২৮৪
মানসের বাস্তবিক স্বরূপ কি? ২৮৫
সেই সেতু কোন্‌টা যা দর্শন করলে মানব ভব-সাগর অতিক্রম করে ২৮৮
সমুদ্রের জলচর সমুদ্রের থেকেও বড় এবং অসংখ্য ছিল, তবে সেগুলো ছিল
কোথায়? ২৯১
স্থূল জগৎ-এর তীর্থগুলির কি কোন মহত্ত্ব আছেও? ২৯২
কোন্ মন্ত্রের প্রভাবে ক্ষুধা, পিপাসা লোপ পায়? ২৯৩
অবতারের বাস্তবিক স্বরূপ? ২৯৫
সগুণ এবং নির্গুণ উপাসনাতে প্রভেদ কি? ২৯৭
প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালীন বন্দনার মহত্ত্ব ৩০০
অবতরণ-বিধি অবতারের স্বরূপ কি? ৩০২
রামের বাস্তবিক স্বরূপ—রামের বাস্তবিক স্বরূপ কি?
রাম মূর্তি পূজা নিরর্থক ৩০৯
মানস-এ নারীর স্বরূপ- গোস্বামী তুলসীদাস মানস-এ নারীদের
কি হেয় করে প্রস্তুত করেছেন? ৩২৫
নারীদের সমান অধিকার- নারীদের কি সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে? ৩৩৬
নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ- ৩৪৩
যুগ-ধর্ম? ৩৪৬
স্বার্থ- স্বার্থ থাকতে পরমার্থ হবে কি করে? ৩৫৬
শিক্ষা ও বিদ্যা- বিদ্যা কি অনাবশ্যক? ৩৬৫
বিদ্যালাভের পর কি বিবেকের প্রয়োজন থাকে? ৩৭৫
হৃদয়াভ্যন্তরের সঙ্কেতই কি বিদ্যা? ৩৭৬
সায়েন্সের ভাষানুবাদ 'বিজ্ঞান'- ৩৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রাচীনকালের অপেক্ষা আজ বিজ্ঞান কি বেশী প্রগতির পথে?	৩৮০
গো-প্রকরণ— গো-রক্ষার জন্য কি অবতার অবতরিত হয়নি?	৩৯১
আর্য— কাকে বলে আর্য?	৩৯৯
অবতার	৪১২
সাধকের আচরণ- সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত?	৪১৭
মহাভারতের প্রাণ গীতা এবং এর ক্ষেত্র	৪২৩
দেবতা- দেবতা কে?	৪২৭
শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন?	৪৩০
যজ্ঞ- যজ্ঞ কাকে বলে?	৪৩৮
কর্ম- কর্ম কাকে বলে?	৪৫৩
গীতোক্ত বর্ণ—ব্যবস্থা—গীতাশাস্ত্রে বর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ কি?	৪৬৭
বর্ণ—ব্যবস্থা কি জন্মগত?	৪৭৬
বর্ণসঙ্কর -বর্ণ সঙ্কর কাকে বলে?	৪৮১
জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ- জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ-এ পার্থক্য কি?	৪৮৭
গীতোক্ত যুদ্ধস্থল- গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র কোথায় স্থিত?	৪৯৫
কুরুক্ষেত্র কি বিজাতীয় পক্ষকে বলে?	৫০৪
গীতোক্ত যুদ্ধ- গীতাশাস্ত্রে যুদ্ধের স্বরূপ কি প্রকার?	৫০৫
সনাতন-ধর্ম— সনাতন ধর্ম (হিন্দু ধর্ম) কাকে বলে?	৫১৫
জাতি-প্রথা-জাতি প্রথা-এর উপযোগিতা কি?	৫২৬
বিপ্র-বিপ্রের বাস্তবিক স্বরূপ কি?	৫৩৪
ভিক্ষা-ভিক্ষান্ন কিরূপ?	৫৪১
ভগবান কর্তা অথবা অকর্তা?	৫৪৩
যোগ-বিধিই যজ্ঞ, জগৎ আহুতির সামগ্রী	৫৪৭
এক ভক্তের প্রশ্ন	৫৫০
ধর্মের নামে	৫৫৩
মহাপুরুষগণের উদ্ভব এবং তাঁদের পরম্পরা	৫৫৭
পরমহংসজীর লোকপ্রবাদ	৫৬১
মহারাজজীর বিদ্যা	৬১২
ভাব-সুমন	৬২০
মানবতার চরমোৎকর্ষ	৬২৩

।। ওঁ।।

ছবির তালিকা

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.	পূজ্য স্বামী শ্রী পরমহংসজী মহারাজের ছবি	
২	পূজ্য স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজের রঙিন ছবি	
৩.	পূজ্য স্বামী শ্রী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের রঙিন ছবি	
৪.	পূজ্য স্বামী শ্রী ভগবানানন্দজী মহারাজের রঙিন ছবি	
৫.	সতী অনুসুইয়ার পাবর্ত্য অঞ্চলে স্থিত শ্রী পরমহংস আশ্রম	
৬.	শ্রী পরমহংসজীর দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা	১
৭.	সাধুর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ	৭
৮.	পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ এবং সৎসঙ্গী মহারাজজী	১৫
৯.	প্রয়াগের ঘটনা	২৩
১০.	কামিনী-কাঞ্চন থেকে নিবৃত্তি	৩৭
১১.	মরণাপন্নকে জীবনদান	৫১
১২.	কোল-ভীল জাতির লোকেদের হৃদয় পরিবর্তন	৭৯
১৩.	পূজ্য স্বামী শ্রী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ এবং পরম পবিত্র ধারকুণ্ডী আশ্রম	১০৩
১৪.	শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া (প্রাচীন মহর্ষিগণের তপঃস্থলী) পশু-পক্ষীদের প্রতি সমভাব	১১১
১৫.	শ্রী পরমহংস আশ্রম স্থানাসীন স্বামী শ্রী ভগবানানন্দজী মহারাজ	১৩৯
১৬.	পরমপূজ্য স্বামী শ্রী পরমানন্দ পরমহংসজী মহারাজের ছড়ি	১৫৫
১৭.	পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ ভক্তদের মাঝে	১৭৯
১৮.	পরমশ্রদ্ধেয় পূজ্য সদ্‌গুরুদেব শ্রী পরমহংসজী মহারাজ	১৯৭
১৯.	বিশেষ উৎসবে সাধক এবং ভক্তদের মাঝে শ্রী পরমহংসজী মহারাজ	২১৩
২০.	ধ্যানমগ্ন সদ্‌গুরুদেব পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ	২২৩
২১.	পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ শিষ্যদের সঙ্গে	৫৩৫

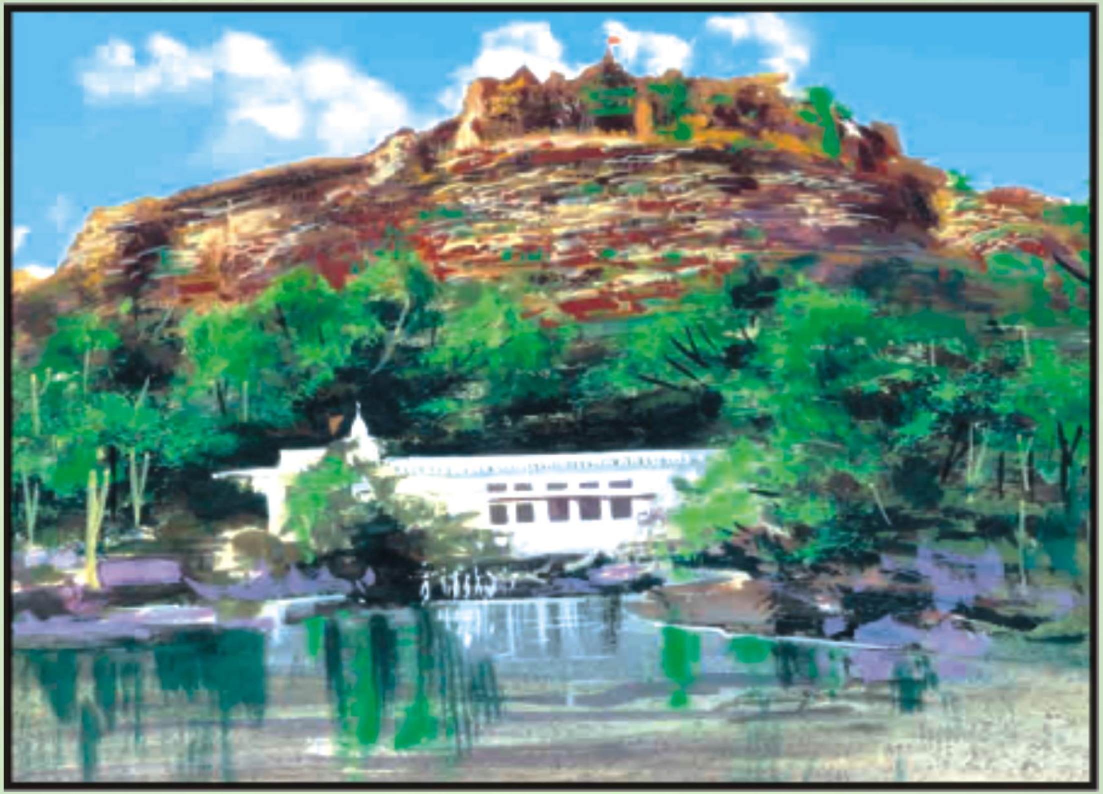

সতী অনুসুইয়ার পাবর্ত্য অঞ্চলে স্থিত শ্রী পরমহংস আশ্রম

প্রাক্‌কথন

এটা সার্বভৌমিক সত্য যে, যখনই মানুষের মনের মধ্যে আসুরী প্রবৃত্তিগুলির বাহুল্য ঘটে এবং সৎ প্রবৃত্তিগুলি হ্রাসোন্মুখ হয়ে প্রশ্রয় পেতে চায়, তখনই সমাজের বিষম পরিস্থিতির দিনগুলিতে নবজাগরণের সংবাদ নিয়ে মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। এইরূপ কিছু ধার্মিক সাম্প্রদায়িকতা এবং আড়ম্বরের শমনের জন্য সত্যিকার অধ্যাত্ম পথ প্রদর্শক রূপে পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজীর ধরাতে আবির্ভাব হয়েছিল। এমন এক প্রকাশপুঞ্জরূপে জনসাধারণের মাঝে শ্রী পরমহংস স্বামীজীর আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁর জ্যোতির্ময় রশ্মি ধার্মিক আড়ম্বর ও তিমিরাচ্ছাদিত অন্তর্মল নষ্ট করে অখিল সংসৃতিকে আলোকিত করেছে।

যে ব্যক্তি শিষ্যকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে না, তাকে গুরু বলা যেতে পারে না এবং যে গুরুর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাঁর আদেশ অনুসারে প্রবৃত্ত হয়ে গুরুর স্থিতি লাভ করে না, তাকে শিষ্য বলা চলে না। এইরূপ পরমপবিত্র বিভূতি শ্রী পরমহংসজী মহারাজের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য বহু আগে থেকে আমার মনে ভাব তরঙ্গিত হচ্ছিল কিন্তু অন্তর্জগত থেকে আদেশ না পাওয়ার জন্য সেগুলির অভিব্যক্তি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সৌভাগ্যবশতঃ এই বছর গ্রীষ্মকালে শ্রী পরমহংস আশ্রম ধারকুণ্ডীতে কিছু দিন থাকার সুযোগ ঘটেছিল। পরমার্থ-পথ প্রশস্ত করতে সমর্থ ব্রহ্মজ্ঞ শ্রী স্বামীজী, পরমহংস আশ্রম ধারকুণ্ডী মহারাজজী আমাকে অন্তর্দেশ থেকে সম্বল প্রদান করে এই কৃতীর সঙ্কলনে অক্ষুণ্ণ প্রেরণা যুগিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর অতুলনীয় সহযোগ ও কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বাণী অসমর্থ তবুও এই কৃপার জন্য আমি কোটি-কোটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর চির ঋণী হয়ে রইলাম। এই আশা ও বিশ্বাসের সঙ্গে লিখে যাচ্ছি যে, শ্রী স্বামীজী আদ্যোপান্ত ভাবগুলিকে স্বরূপ দেবার সময় প্রেরণাত্মক আশীর্বাদ দিতে থাকবেন। সেই সঙ্গে অনুসুইয়া আশ্রমের বর্তমান স্বামীজী ভগবানানন্দজীর প্রতিও আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার উপর বহু পূর্ব থেকেই তাঁর অসীম কৃপা। সব অনুযায়ী শিষ্যগণ কোন না কোনরূপে নিজের-নিজের গুরুদেবের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ, এটা একটা পরম্পরাগত প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশস্তি গায়ন দ্বারা গুরু ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শিষ্যকে ক্রমশঃ যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রয়োগাত্মক পথে চলে গুরুর গুরুত্ব লাভ করতে হয়। সদ্‌গুরু, পরমাত্মার যে পরাকাষ্ঠাতে স্থিত, সাধক ক্রমশঃ চলে সেই পরাকাষ্ঠাতে লীন হলে তবেই সেটা শুদ্ধ স্তুতি বলা যেতে পারে। বাস্তবে সেই সাধকের দ্বারাই গুরুর গুণধর্ম প্রকট হয়। অতএব তারই অন্তিম উপলব্ধির ফলস্বরূপ গুরুর নাম সার্থক হয়। সমর্থ সদ্‌গুরুর উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করা সামর্থ্যের বাইরে। এখানে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, তা তাঁরই অসীম কৃপার প্রতিফল।

সময়ের প্রবাহে জীবনমুক্ত মহাপুরুষ পরমহংসজীও পার্থিব শরীর ত্যাগ করে আমাদের মাঝ থেকে ঠিক সেইপ্রকার চলে গেছেন, যেভাবে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি গেছেন। যে-যে বিশেষত্ব উপযুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে ছিল, সেগুলি পূর্ণতঃ পরমহংসজীর জীবনবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উপর্যুক্ত মহাপুরুষদের জীবনে সমস্যাগুলির সমাধান কিছু এমন অলৌকিক এবং চমৎকারে পূর্ণ ছিল যা দেখে জনসমাজ তাঁদের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। কিছু-কিছু এইরূপ বিলক্ষণ ঘটনার সমাধান শ্রী পরমহংসজীর সান্নিধ্য থেকেও জনজীবন লাভ করেছিল। যা অসংখ্য মানুষের সন্তুষ্টির অমরস্রোত হয়ে গিয়েছে।

চিত্রকূটের জনগণ স্বভাবতঃ শ্রীরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই বিশেষ গুণের জন্য তাদের ধনী বলা যেতে পারে। যদিও এখানে প্রায়ই ডাকাতদের ক্রূর বর্বরতার উদাহরণ পাওয়া যায়। সামাজিক ক্রূরতার পরিবেশে শ্রী পরমহংসজীর আগমন জনজীবনকে সদ্‌মার্গের নতুন দিশা প্রদান করার পথে অভূতপূর্ব কার্য করেছিল। শত-শত পাগল তাঁকে দর্শন করামাত্র ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারা আজও জীবিত ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিছু ঘটনা এমন, যা দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কিছু এমন রুগ্ন ব্যক্তি যাদের হাল চিকিৎসকেরা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে কৃপা যাচনা করেছিল, অদ্যাবধি তারা জীবিত।

শ্রী পরমহংস মহারাজজীর সান্নিধ্যে শিষ্যত্বের জন্য বহু ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল, কিন্তু শরণ কয়েকজন ব্যক্তিই পেয়েছিলেন। জনসাধারণের স্থিতি তিনি পরীক্ষা করে দেখে নিতেন ও শরণে রাখতে অস্বীকার করে দিতেন। কিছু-কিছু ব্যক্তি এই অপ্রিয় শব্দগুলি শুনে অনশন শুরু করে দিত, কিন্তু পাত্র সুপাত্রের বিচার করার পর উপযুক্ত অধিকারীকেই স্থান দেওয়া হত। শ্রী মহারাজজীর

দেদীপ্যমান শিষ্যদের মধ্যে পবিত্র বিভূতি শ্রী স্বামী সচ্চিদানন্দজী, পরমহংস আশ্রম ধারকুণ্ডী আজ স্থানীয় সমাজের জন্য সুলভ যাঁর অন্তর্দেশ থেকে নিঃসৃত জ্ঞানের পীযূষ-ধারা অনবরত ধারকুণ্ডীর অপার্থিব গুহা থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রস্তুত কৃতির প্রথম অংশে জীবনাদর্শকে প্রকাশিত করছে যে কতিপয় আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলি, সেগুলির পরিচয়াত্মক পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আত্মানুভূতির চরমোৎকর্ষে স্থিতি প্রদানকারী তাঁর অমরবাণী বারমাস্যার ব্যাখ্যা এবং সদুপদেশগুলির চয়ন করা হয়েছে যা হৃদয়ঙ্গম করে যিনি জীবন পথে চলবেন, তিনি সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবেন। কৃতির দ্বিতীয় অংশে পূজ্য মহারাজজীর উপদেশগুলির ক্ষণিক দর্শন এবং তাঁর বিদ্যার সঙ্কলন রয়েছে, যেগুলির দ্বারা তিনি ভক্তদের পথ-প্রদর্শন এবং অনেকানেক সাধনোপযোগী ভূমিকার নিদর্শন করতেন। সরল, সরস লোকপ্রবাদ দ্বারা গম্ভীর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির বিবেচনা করা পরমহংসজীর বিশেষত্ব ছিল, এর অবগুণ্ঠনে ব্রহ্মবিদ্যার শুষ্কতা দূর হয়ে যেত। কিন্তু মহারাজজীর নিজস্ব শৈলী বিলক্ষণ ছিল, যা অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যেত।

এই কৃতিকে আমি নিজের সামর্থ্য দ্বারা নয়, অন্তর্জগতের প্রেরণাকে সেবাভাব উদ্দেশ্যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র। এর সঙ্কলনে ত্রুটির এবং বিচারের ক্রমবদ্ধতার উপর বিশেষ অভিনিবেশ করা হয়েছে, তবুও বিচারধারার অভিব্যক্তিতে বিশৃঙ্খলতা বোধ হলে প্রিয় পাঠকগণ এবং সাধক স্বীয় উপলব্ধি জেনে গ্রহণ করবেন।

শ্রীগুরু পূর্ণিমা, সন ১৯৭৪

- সদ্‌গুরু কৃপাশ্রয়ী জগৎ বন্ধু
স্বামী অড়গড়ানন্দ

ওঁ

প্রথম উচ্ছ্বাস

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংস পরমানন্দজী মহারাজ

(সতী অনুসুইয়া, চিত্রকূট)

এর জীবন বৃত্তান্ত

জীবনাদর্শ-এর উপর আলোকপাত করেছে এমন

কিছু-কিছু আদর্শ ঘটনা

এবং

বারমাস্যা

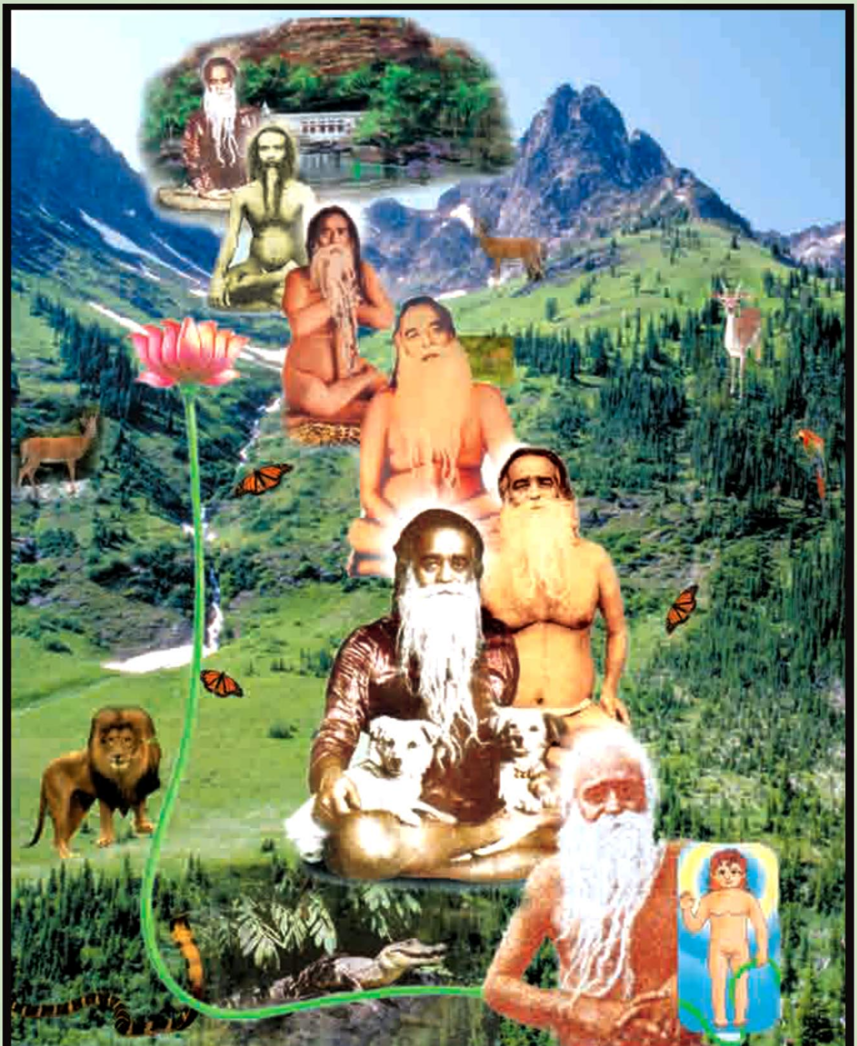

শ্রী পরমহংসজীর দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা

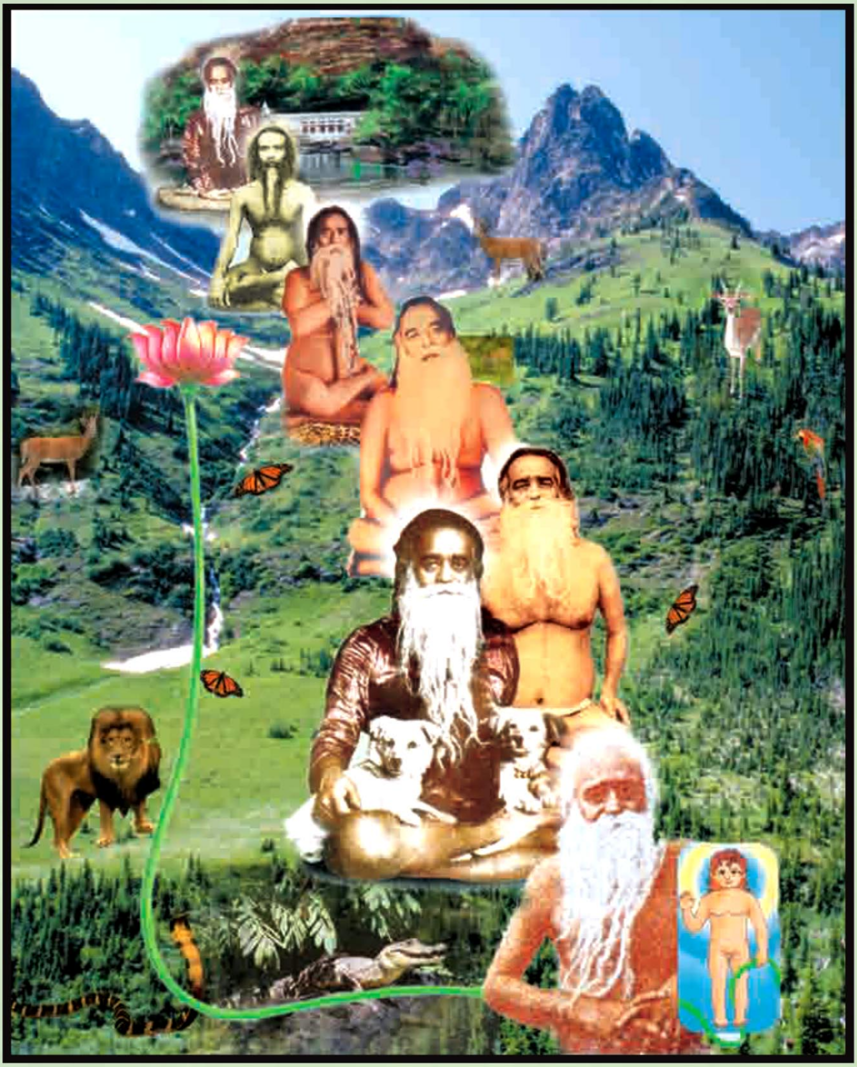

শ্রী পরমহংসজীর দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা

আদর্শ জীবন

জীবন পরিচয়

(সাল ১৯১১ খৃ. থেকে ১৯৬৯ খৃ. পর্যন্ত)

পরিবর্তন সমগ্র সৃষ্টির শাশ্বত বিধান। অপরাজেয় কালচক্রের আবর্তনে বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কাহিনী অঙ্কিত থাকে। অজেয় শক্তিগুলিও ক্ষণিকের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে যায়। ভৌতিক বৈভবের বিশাল অট্টালিকাগুলিও সময়ের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু দেশকাল, পরিস্থিতির সীমার উর্ধ্বে, জীবনমুক্ত ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্ব যুগ-যুগান্তর ধরে বিশ্ব-বাটিকাকে সুরভিত জীবন পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করতে থাকবে। এইরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত মহাপুরুষদের মধ্যে পরমপূজ্য শ্রী পরমহংস মহারাজজীর জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য।

তাঁর জন্ম গোরখপুরে হয়েছিল, যা বর্তমানে দুভাগে বিভক্ত। বর্তমান দেবরিয়া জেলান্তর্গত রামকোলা গ্রামে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল। মাতা ফুলমানি দেবী ও পিতা জগতরূপ শর্মা ছিলেন। মহাপুরুষদের জীবনে শিশুকাল থেকেই অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রিগণ শিশুরূপে শ্রী পরমহংস মহারাজজীকেও দেখে, তাঁর দিব্য ভবিষ্যত জীবনের সঙ্কেত করে তাঁর মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এইরূপ অসাধারণ বালকের মা হওয়া ভাগ্যের কথা। এই ছেলে তোমার যোগ্য নয়। প্রথমে তো মাতৃহৃদয় ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কাতে কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু এই বালক রাজা হবে অথবা যোগী, জ্যোতিষীদের এইরূপ বলার পর মাতৃহৃদয় আশ্বস্ত হয়ে পুনরায় শিশু-স্নেহে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অশুভদৃষ্টি যাতে না পড়ে সেইজন্য মাতৃদেবী তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাল্য-জীবনের বিলক্ষণ ঘটনা

মহারাজজী যখন ছ'মাসের ছিলেন, লোকদৃষ্টিতে সেই বাল্যাবস্থাতেই কালবৎ, হৃদয় বিদারক এক ঘটনা ঘটেছিল। একদিন হঠাৎ তাঁর পালঙ্কের উপর ভয়ঙ্কর একটা সাপ উঠেছিল এবং তাঁর শরীরের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে গিয়েছিল। সেই বিষধরটিকে তাঁর শরীর থেকে সরাবার চেষ্টা বহু লোক করেছিল, শেষে দড়িতে ব্যাঙ বেঁধে সাপটাকে সেদিকে আকর্ষিত করা হয়েছিল, ব্যাঙ দেখে ভক্ষণের

লালসাতে সাপটা যেমনি সরেছিল মাতৃহৃদয় বাৎসল্যে ভরে উঠেছিল তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

পাঠশালার শিক্ষা

পাঁচ বছর বয়সে তিনি প্রথম পাঠশালায় গিয়েছিলেন। লেখা পড়া করতে তাঁর ভাল লাগত না। পাঠশালাতে তৃতীয়দিন মাষ্টারমশাই কোন অপরাধে স্কেল দিয়ে তাঁর হাতে প্রহার করেছিলেন, হাতে তিনটি রেখার দাগ পড়েছিল। তিনি পাঠশালাতে না যাবার জন্য বায়না ধরেছিলেন, কান্না কিছুতেই থামছিল না। পুত্র স্নেহবশতঃ মাতৃহৃদয় করুণায় ভরে উঠেছিল, ফলস্বরূপ তিনি আর পাঠশালায় যাননি। এরপর অধ্যয়নের শৃঙ্খলা চিরকালের জন্য ভঙ্গ হয়েছিল। এখনও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার চিত্রকূটে হস্তাক্ষরের প্রয়োজন হওয়াতে, তাঁকে চারদিন ধরে অভ্যাস করতে হয়েছিল, আধ্যাত্মিক অধ্যাপকের পার্থিব অধ্যয়নের সীমা এটুকুই ছিল।

ব্যায়ামের প্রেরণা

যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই স্থানটি পালোয়ানদের মল্ল প্রদর্শনের কেন্দ্র ছিল। সেইজন্য পাঁচ বছর বয়স থেকেই পালোয়ানদের প্যাঁচ দেখে তাঁরও ব্যায়াম ও পালোয়ানি করার আগ্রহ জেগেছিল। তাঁর পালোয়ান হওয়ার রুচি দেখে তাঁর বড় ভাই সর্বদা তাঁর জন্য দুধের ব্যবস্থা করে রাখতেন। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করা শুরু করেছিলেন। শরীর যাতে হৃষ্ট-পুষ্ট থাকে, সেদিকে তিনি বিশেষভাবে নজর রাখতেন। যার ফলে পরবর্তীকালে তিনি সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ানরূপে গ্রামীণ অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পরিণয়-সূত্র

পুত্রবধূর জন্য লালায়িত মাতৃদেবী তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন। বিবাহ হয়েছিল কিন্তু পালোয়ানদের জন্য তাদের দেহটাই সব। স্ত্রীর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিছুদিন এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু মাতৃদেবীর অভিলাষের ফলস্বরূপ ক্রমশঃ চারটি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, অদ্যাবধি যাঁরা জীবিত আছেন।

আকাশবাণী এবং সাধু-মিলন

একবার এই পালোয়ানির নেশাতে মত্ত হয়ে তিনি নিকটস্থ বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে পতাকা হাতে একজন মহাত্মাকে দেখেছিলেন, তিনি ‘সীতারাম’

'সীতারাম' ধ্বনি উচ্চারণ করতে-করতে চলে যাচ্ছিলেন। সেই সাধু চলে যাবার পর আকাশবাণী হয়েছিল যে, এই সাধুর জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর। এই প্রভাবপূর্ণ বাণী শুনে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পথের ধারে সেতুর উপর ভর দিয়ে নিজেকে সংযত করে আশেপাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিছু শুনতে পেলেন কি? তাঁর কথা শুনে সকলেই বলেছিলেন, এখানে শোনার মত কি আছে? এ বিষয়ে মহারাজজী বলতেন যে, সেই অজ্ঞাত ধ্বনি এত তীব্র ছিল যে, মনে হয়েছিল যেন বহুদূর পর্যন্ত এর শব্দ গেছে। তিনি বলতেন যে, অদ্ভুত ঠেকেছিল, মাথার ভিতর থেকে কে কথা বলছে? মনে হয়েছিল যেন এটা দৈব ঘটনা, যা হোক, সেই মহাত্মাকে খাওয়ানো উচিৎ এই ভেবে তিনি সেই সাধুটিকে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সারাদিন খোঁজাখুজির পর তাঁকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে অকস্মাৎ পথে সেই মহামূর্ত্তির দর্শন পেয়েছিলেন। অধীর হয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মহারাজজী! 'সীতারাম-সীতারাম' বলতে থাকবেন কি কিছু খাবেনও। তখন সেই মহাত্মা বলেছিলেন, কি খাওয়াবে?'

দৈবক্রমে, তাঁর কাছে মাত্র তিন পয়সা ছিল, সেটা তৎকালীন ভোজন-সামগ্রীর জন্য পর্যাপ্ত ছিল। শিশু সুলভ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভেবেছিলেন যে, ঘরের জন্য কিছু নিয়ে এই মহাত্মাকেও ভোজন করিয়ে দেওয়া যাক। এই ভেবে বিনম্রভাবে ছাতু গ্রহণ করার আগ্রহ করেছিলেন। তিনি রেগে বলেছিলেন-"ছাতু কি খাবার জিনিষ।" তিনি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই, মহারাজজী ছুটে পুনরায় চরণযুগলে প্রণত হয়ে বলেছিলেন-"বালক স্বভাববশতঃ এরূপ বলে ফেলেছি, আপনার যা ভাল লাগে, গ্রহণ করুন।" বারবার অনুরোধ করার পর সেই মহাত্মা ভোজন-প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। খেয়ে তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-কেন খাওয়ালে, কি চাও? মনে কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা না থাকার দরুন অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করার পর মহারাজজী বলেছিলেন-"আমি যাতে কুস্তীতে কারও কাছে পরাজিত না হই।" সেই মহাত্মা এই কথা শুনে হেসে 'এবমস্তু' বলে চলে গিয়েছিলেন।

মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জয় লাভ করার মত কোন বস্তুই নেই। প্রকৃতির সামান্য বন্ধনকে জয় করার অভিমান থেকেই এরূপ সংস্কার সাধকের মানসের উপর পড়ে। সেইজন্য মহাবলশালী কাল-এর কাছে অপরাজেয় হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর মনে হত আশীর্বাদটি যেন সঙ্গেই আছে, যদিও দৃষ্টি তখনও সাংসারিক ছিল। সেই মহাত্মা সাতদিন ধরে অভুক্ত ছিলেন,

তিনি চলে যাবার পর মহারাজজী তা জানতে পেরেছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যে, ভগবান খাবারের ব্যবস্থা করলে, তবেই খাবেন। প্রায়ই লোকে চিন্তা করে যে, তাঁরাই অন্যের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন কিন্তু এটা ভ্রম। পূণ্যাত্মাদের প্রেরিত করে ভগবানই নিজের ভক্তদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। যিনি খাওয়ান তিনিও পরবর্তীকালে সাধুপুরুষে পরিণত হন।

সাধুর কাছ থেকে প্রাপ্ত আশীর্বাদ

সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদের ফলস্বরূপ মহারাজজীর মনে এই বিশ্বাস জেগেছিল যে, কেউ তাঁকে কুস্তীতে পরাজিত করতে পারবে না। তিনি ভেবে রেখেছিলেন যে, দু'একজনের সঙ্গে এক-এক হাত কুস্তির প্যাঁচ লড়ে সোজা গামার সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। একবার নাম তো হোক, এই অঞ্চলে তো তিনি প্রায় আসেন আর এখন তো তাঁর আসার সময় হয়ে এসেছে। কুস্তীতে পরাজিত তো হবেন না। উক্ত ঘটনার ঠিক তিনদিন পরেই কুস্তীর আয়োজন হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর থেকে কম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও দৈবযোগে মল্লযুদ্ধে শীঘ্রই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। মাথা নীচু করে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন ও তিনদিন পর্যন্ত লজ্জাবশতঃ ঘরের বাইরে বেরোননি। তিনি নিরন্তর এই চিন্তাই করছিলেন যে কোথায় গেল সেই আশীর্বাদ, সেই বাণী। পরে যখন সেই আশীর্বাদের ফলস্বরূপ অনুসুইয়া আশ্রমে অনুভব করেছিলেন যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কেটে গিয়েছে, তখন আন্তরিক প্রসন্নতায় বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন এবং বিচার করেছিলেন যে, ভগবান অথবা মহাপুরুষের বাণী মিথ্যা হবার নয়। যদি মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও যেতেন তবুও পরিণাম পরাজয়ই ছিল কারণ দেহটাও তো একদিন জীর্ণ হয়ে যাবে। যথার্থতঃ কালজয়ী হওয়াই সন্তপ্রবরের আশীর্বাদের অপরাজেয়তা ছিল।

বৃদ্ধা দ্বারা তরুণীর সংবাদ

এটা অত্যধিক রোমাঞ্চকর ঘটনা, যার ফলস্বরূপ ভাবী সাধন জীবনের শুভারম্ভ হয়েছিল। ঘটনাটি এই যে, নিকটবর্তী গ্রামের এক যুবক বিবাহের পর বধূসহ স্বগৃহে ফিরে এসেছিল। তরুণীটির রূপে আকর্ষিত হয়ে কিছু নবযুবক বাসনায় মত্ত হয়ে তাদের ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল, কিন্তু তরুণীটি কাউকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে এক বৃদ্ধার হাতে পত্র প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মহারাজজী পালোয়ান

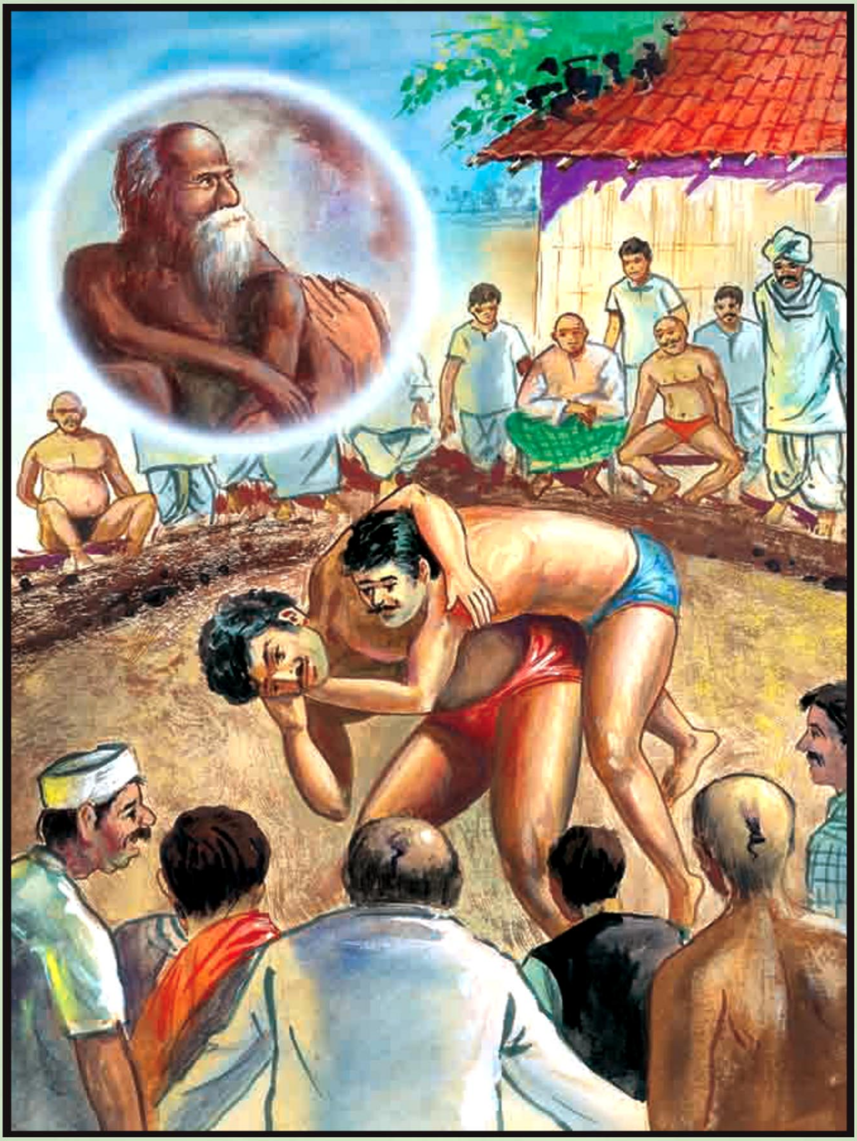

সাধুর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ

ছিলেন সেইজন্য তাঁর জীবন সংযত ছিল কিন্তু সেইসময় সংস্কারবশতঃ যুবাবস্থার নেশায় মত্ত তাঁর মনে হয়েছিল **'জনম রঙ্ক জনু পারস পাওয়া' (মানস, ১।৩৪৯।৭)** কোন রকমে দু'চার ঘণ্টা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অন্ধকারে ধীরে-ধীরে তার বাটীর দিকে যাচ্ছিলেন, থেকে-থেকে তাঁর মনে এই চিন্তাই আসছিল যে, তিনি কোন পাপ-কর্মে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছেন না তো। এই বিচার করতে-করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলেন-"মহাপাপ করতে যাচ্ছ নরকে যাবে।" কথাকটি শুনে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন, যার জন্য দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে কেঁপে উঠেছিল। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন তিনি অধীর হয়ে ফিরছিলেন, তখন মৃদু স্বর শুনতে পেয়েছিলেন-'সম্মুখের দেবালয়ে তোমার সদ্‌গুরু রয়েছেন।'

সদ্‌গুরু-দর্শন

উপরোক্ত বাণী শুনে তিনি দেবালয়ের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেবালয়ের অন্তঃকক্ষ অন্ধকারপূর্ণ ছিল সেইজন্য কাউকে দেখতে পাননি। তিনি বিচার করতে শুরু করেছিলেন যে, বিচিত্র এই লীলা, জানি না কে জোরে কথা বলে, কে ধীরে। ঠিক সেই সময় মন্দিরের ভিতর থেকে কাশির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন এগিয়ে গিয়ে দেখেছিলেন এক মহাপুরুষ মন্দিরের এক কোণাতে বসে রয়েছেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গুরুদেবের জন্য আলো ও খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর গোটা রাত মহারাজ গুরুর পদসেবা করেছিলেন এবং সৎসঙ্গ শ্রবণ করেছিলেন। সদ্‌গুরুদেব মহারাজজীকে তিনি মনে প্রশ্ন উদয় হওয়া মাত্র প্রশ্ন করে গিয়েছিলেন এবং গুরুদেবও শঙ্কাগুলির সমাধান করে যথোচিত উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনদিনের অল্প অবধিতেই সাধন-ভজনের বিধি সম্বন্ধে বলে গুরু মহারাজজী অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। এরপরই মহারাজজী ঘর থেকে উদাসীন হয়ে তৎপরতাপূর্বক সাধনায় রত হয়েছিলেন। এর মধ্যেই শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে আসাতে ধ্যান ভালভাবে জমতে শুরু করে।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন যে, তিনি কখনও কল্পনাও করেননি যে, সাধু হবেন। জম-জমাট সংসার ছিল, ছেলেপুলে, পরিবারের প্রতি টানও ছিল, কিন্তু ভগবান সতর্ক করে জোর করে সাধু বানিয়ে দিয়েছিলেন। যতক্ষণ ভগবান আজ্ঞা না দেন ততক্ষণ গৃহত্যাগ করা পাপ, কিন্তু যখন বলেন ত্যাগ করতে, তখন ঘরে থাকাও পাপ। যেমন ধরুন, প্রধানমন্ত্রী যখনই চাইবেন তখনই যে কোন নাগরিককে

নিজের কাছে ডেকে পাঠাতে পারেন, তাতে সে ব্যক্তি যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, সেই প্রকার ভগবান বিষয়ী লোককে যখন চাইবেন, তখনই নিজের কাছে ডেকে পাঠাতে পারেন। **লীলা করন চহত প্রভু জবহীঁ। কারণ খড়া করত হ্যাঁয় তবহীঁ।।** তিনি এমন ব্যবস্থা করে দেন যে, করতেই হয়।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম-"মহারাজজী! আপনার প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল কিন্তু সকলের প্রতি তো এরূপ হয় না।" তিনি বলেছিলেন-"হো, এই শঙ্কা আমারও হয়েছিল। একদিন ভগবান অনুভবে বলেছিলেন যে, আমি গত সাতজন্ম ধরে সাধু। চার জন্ম তিলক কেটে কমণ্ডলু নিয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করেছি। সত্যিকার সাধু হওয়ার জন্য প্রযত্নশীল ছিলাম কিন্তু যোগ-ক্রিয়া জাগ্রত ছিল না। গত তিন জন্ম ধরে উত্তম সাধু ছিলাম। যেমন হওয়া উচিত। যোগ-ক্রিয়া জাগ্রত ছিল। গত জন্মে নিবৃত্তি হয়ে এসেছিল, কিন্তু মনের মধ্যে দুটি ইচ্ছা ছিল-প্রথম ইচ্ছা-বিবাহের, দ্বিতীয় ইচ্ছা-গাঁজা সেবনের, ভগবান অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু দেখিয়ে শরণ দিয়েছেন।"

ভজনারম্ভ

মহারাজজীর গৃহ থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে একটা ফলের বাগান ছিল। নির্জন দেখে সেই বাগানের মধ্যেই ঝোপের আড়ালে বসে তিনি চিন্তনে রত হয়েছিলেন। শুরুতে চার-ছ'দিন কেউ বুঝতে পারেনি যে, মহারাজজী কোথায় গিয়েছেন। ক্রমশঃ সকলেই জানতে পেরেছিলেন। জেনে সকলেই অনুমান করতে শুরু করেছিল যে, এঁর কি হয়েছে। কোন অসুখ করেনি তো? কেউ বলেছিল, যখন থেকে লঙ্গড়ু বাবার সঙ্গে মেলামেশা করছে, তখন থেকেই এমন হচ্ছে, মনে হচ্ছে তিনি কিছু তুক করেছেন।

লঙ্গড়ু বাবা

শিব মন্দিরে যিনি সাধনা-প্রণালী সম্বন্ধে বলেছিলেন সম্পূর্ণ অঞ্চল সেই মহামানবকে লঙ্গড়ুবাবা অথবা সৎসঙ্গী মহারাজ বলে ডাকত। মহারাজজী আগেও অনেকবার তাঁকে দেখেছিলেন, লঙ্গড়ুবাবা খোঁড়া ছিলেন সেইজন্য কেউ-কেউ তাঁকে লঙ্গড়ুবাবা বলে ডাকত। সকলেই তাঁকে পাগল বলে ভাবত। মহারাজজীও তাঁকে পাগল বলেই ভাবতেন। কিন্তু আকাশবাণী হয়েছিল যে, ইনি তোমার গুরু মহারাজ, তখনই তিনি জানতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ লঙ্গড়ুবাবা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন।

যোগের রহস্যময় ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সদ্‌গুরু হওয়ার সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে ছিল, কিন্তু লোকে তাঁকে পাগল বলেই ভাবত।

গ্রামের লোকেরা সৎসঙ্গী মহারাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ঘরের লোকজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই খুঁজছিল যে, পেলে তাঁকে মারধর করা হবে। জানি না আমাদের ছেলেকে কি শিখিয়েছেন। কিন্তু সৎসঙ্গী মহারাজকে কোথাও খুঁজে পায়নি। চারমাস পর তাঁর দেখা পেয়ে গ্রামের সকলেই উত্তেজিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল। মাতৃদেবী একটা কথাই বলেছিলেন-"বাবা কি তুক করেছেন, আমার ছেলে যে উচ্ছন্নে গেছে।" তিনি রেগে বলেছিলেন-"হুঁ, আমার জন্য উচ্ছন্নে গেছে, নিজের কর্ম তো দেখছ না। কেউ যদি পাগল হয়, কারও যদি মৃত্যু হয়, কেউ যদি বেঁচে ওঠে তাতে আমি কি করতে পারি? নিজের ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?" কিন্তু বাবার মন্ত্র খুবই প্রভাবশালী ছিল। তাঁর প্রতি যখন থেকে বিশ্বাস জেগেছিল তারপর আর কার ক্ষমতা যে, তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

সদ্‌গুরুর পরকায়া প্রবেশ দ্বারা মনের স্থিরতা

পর্যটন করে চার মাস পরে যেদিন সদ্‌গুরু মহারাজ ফিরেছিলেন, সেদিন তাঁর মন ভজনাতে বেশী নিবিষ্ট হয়েছিল। তিনি গুরু মহারাজকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোন্ কারণে আমার মন ভজনাতে আজকের মত কখনও স্থির হয়নি? গুরুদেব তাঁকে আশ্বাসবাক্য দ্বারা শান্ত করে বলেছিলেন-"আমি তোমার মনকে ধারণ করে ধ্যানস্থ হয়ে যাই। তখন পরমহংস মহারাজজী বিচার করেছিলেন যে, গুরু মহারাজজীর ছ'জন শিষ্যের বিকাশ বোধ হয় এই জন্য হয়নি যে, মহারাজজী মন ধরে আবার ছেড়ে দেন। ফলস্বরূপ মনের অস্থিরতার জন্য কিছু সময় পরে তাঁরা অশান্তি অনুভব করেন তিনি এই প্রক্রিয়াটি বুঝে গুরু মহারাজজীকে অনুরোধ করেছিলেন যে, আমার মনকে ধারণ না করে কৃপা করে আমাকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন, যার দ্বারা আমি মনের চাঞ্চল্য পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে মনকে স্থির করতে সমর্থ হই। যদি মনকে ধরে আপনি আবার ছেড়ে দেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে চঞ্চলতা এসে যাবে। অতএব কৃপা করে আন্তরিক সম্বল প্রদান করুন। তখন গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, তবে তাই হোক।"

পরকায়া প্রবেশ দ্বারা কারও মনকে উচ্চ অবস্থাতে নিয়ে যাওয়া, চিন্তা ধারার পরিবর্তন, ধ্যানস্থ করে দেওয়া ইত্যাদি গুরু মহারাজজীর জন্য সাধারণ ব্যাপার

ছিল। এই বিলক্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা মুমুক্ষু সাধকদের পরমকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভজনাতে খুব তৎপরতা ছিল, সেইজন্য তিনি নিজে করতে চেয়েছিলেন।

সেইদিন থেকে মহারাজজী স্বয়ং প্রযত্ন করে ধ্যান করার চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন ও চার মাসের মধ্যেই হৃদয়ে স্বরূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তখন থেকে ধ্যান প্রগাঢ় হতে শুরু করে।

সাধনা-ক্রম

মহারাজজী রাত দুটো থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত আত্ম চিন্তনে অনুরক্ত থাকতেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে পুনরায় ধ্যানে বসতেন। আত্ম চিন্তনের জন্য উপযুক্ত নির্জন পরিবেশ তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু সৎসঙ্গ ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রায়ই অনিচ্ছাপূর্বক সৎসঙ্গ করতে হত তাঁকে। রাত্রির প্রথম প্রহর ন'টা পর্যন্ত সব কাজ শেষ করে নিতেন। পুনরায় ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে ইষ্টোপাসনায় রত হতেন। নিরন্তর সাধনায় রত থাকার পরিণাম স্বরূপ পরমহংস মহারাজজী দিন-প্রতিদিন কৃশকায় হতে থাকেন ও তাঁর পাচন যন্ত্র খারাপ হয়ে পড়ে। মহারাজ খাবার খেতে চাইতেন না। নিদ্রা ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। কেউ পাশে এসে বসলে, মহারাজ এই অপেক্ষায় থাকতেন যে কতক্ষণে সেই ব্যক্তিটি উঠে যাবে, কারও সঙ্গে বসে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগত না।

শ্রী পরমহংসজীর বাণী (নিদ্রার বিধান)

যোগীর পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাওয়া অত্যন্ত ঘাতক। তীব্র অনুরাগ এবং বিরহ-বৈরাগ্যযুক্ত সাধকদের ঘুম আসে না। এক-একটা দিন তাঁদের শতাব্দীর মত মনে হয়। যাঁদের মধ্যে এই লক্ষণগুলি নেই, তাঁরা মায়ারূপ শত্রু নিদ্রার হাতে পরাজিত হয়ে বর্তমানে ঘুমাচ্ছে এবং জন্মান্তরেও ঘুমাবে। যোগীর জন্য শ্বান নিদ্রার বিধান রয়েছে। রাত্রে গাছের পাতা নড়লেই কুকুর যেমন ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে, তেমনিই যোগীও এই ভয়ে চিন্তিত হয়ে নিদ্রা যান যে, বিজাতীয় পরমাণু যেন আক্রমণ না করে দেয়। বিরহীর ঘুম আসে না। অতএব মনকে ধিক্কার দিয়ে সতত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

সেইজন্য তাঁর কাছে কম-লোক যাতায়াত করত। কিন্তু পুত্রের শারীরিক দশা দেখে মাতৃদেবীর হৃদয় করুণায় ভরে উঠেছিল। তিনি সাধনা-স্থলে গিয়ে তাঁকে স্বল্পাহারের জন্য বাধ্য করতেন। ক্রমশঃ শারীরিক ক্ষীণতা দেখে জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগে, তারা চর্চা করতে শুরু করে যে, তিনি যোগী নন সম্ভবত পাণ্ডু রোগী। যখন গ্রামে এইরূপ গুজব ছড়ায়, তখন মহারাজের মনও ক্ষুন্ন হয়ে ওঠে। তিনি এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে অন্তর্দেশ থেকে আশ্বাস পেতেন যে, সাধনাতে প্রবৃত্ত থাক, ভাবী উপলব্ধি তোমার মঙ্গলময়।

যখন মহারাজজী গৃহত্যাগ করে সাধনারত হয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর সাথী পালোয়ানেরা নিশ্চয় করেছিল যে, তাঁর কিছু সেবা করবেন। তাঁর কাছ থেকে সাধন প্রণালী শিখে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনবেন। এই নিশ্চয় করে তাঁরা মহারাজজীর সেবাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কুটীরের আশেপাশে ফলফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন।

প্রভাতফেরী

কিছুদিন পর সাথী পালোয়ানেরা তাঁর কাছে নিবেদন করেছিল-‘‘বাবা! প্রভাত ফেরী হলে কেমন হয়। সকাল-সকাল হলে গ্রামবাসীদের মধ্যেও ভক্তি তরঙ্গিত হবে।’’ মহারাজজীর পছন্দ হয়েছিল এই কথা। ভোর চারটের সময় মহারাজজী তাদের ডেকে তুলতেন এবং মহারাজজীর সঙ্গে তারা ঢোল করতাল বাজিয়ে সীতারাম-সীতারাম উচ্চারণ করে গ্রামের পরিক্রমা করতেন আর অন্ধকার থাকতেই সকলে কুটীরে ফিরে আসতেন। তারপর যে যার ঘরে ফিরে যেতেন। চারমাস পর্যন্ত এইরূপ কীর্তন চলেছিল। শুরুতে পনেরো-কুড়িজন প্রভাত ফেরীর সময় থাকত। ধীরে-ধীরে ভক্তিধারা প্রবাহিত হয়েছিল এবং বহু লোক প্রভাত ফেরীতে সম্মিলিত হতে শুরু করেছিল। লোকের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছিল। সকলেই প্রভাতফেরীর অপেক্ষাতে আগে থেকেই জেগে তৈরী হয়ে থাকত।

একদিন মহারাজজী রোজের মত রাত দুটো থেকে চিন্তনে বসেছিলেন, চারটের কিছু পূর্বে হঠাৎ তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙ্গেছিল সকালে। তিনি অনুতাপ করছিলেন যে, আজ নিয়মভঙ্গ হয়ে গেল, প্রভাত ফেরী হল না। সেদিন তিনি কাউকে জাগাতে পারেননি। সকলেই দুঃখিত হয়ে তাঁকে বলেছিল-‘মহারাজজী আজ আপনি আমাদের ডেকে তুললেন না। তিনি চুপ করেছিলেন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রাম থেকে লোক আসতে শুরু করেছিল। তারা এসেই বলেছিল-মহারাজ! আজ আপনি কোন পথ দিয়ে প্রভাত ফেরী করে ফিরে এলেন শুনতে খুব ভাল লাগছিল, আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে, যখন আপনি ঘরের সামনে দিয়ে যাবেন, তখন আমরাও সেই দলে সম্মিলিত হব। আপনি কোন্ পথ দিয়ে ফিরে এলেন?

মহারাজজী ভাবছিলেন যে, আজ তো আমরা যাইনি, তবে কি এরা রসিকতা করছে, ততক্ষণে অন্যান্য পাড়া থেকেও লোক এসে পৌঁছেছিল। সকলেই পরস্পর বলাবলি করছিল যে, আজ তো খুব মধুর ধ্বনিতে প্রভাত ফেরী হয়েছিল আমরা স্পষ্ট শুনেছি। আপনি কোন পথ দিয়ে এলেন। এ কথা শুনে মহারাজজীর খুব গ্লানি হয়েছিল যে, আজ আমার জন্য ভগবানের কত কষ্ট হল। তাঁকে প্রভাত ফেরী করতে হল, সেইজন্য আজ থেকে কীর্তন বন্ধ। কীর্তন তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই ঘটনার ফলস্বরূপ বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয়েছিল এবং মহারাজজী প্রাণপনে চিন্তনে রত হয়েছিলেন।

ইষ্ট সর্বত্র ব্যাপ্ত এ বিষয়ে বিশ্বাস

ভজন কুটীরের অনতিদূরে এক সৎব্যক্তির ফলের বাগান ছিল। সেখান থেকে নিত্য আম চুরি হত। বাগানের মালিক তাঁকে সন্দেহ করত ও দু'কথা শুনিয়ে যেত। একদিন তিনি অন্তর্দেশের মাধ্যমে গুরু মহারাজজীকে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি তো ফল চুরি করি না, সেই ফল পেতেও চায় না। তা সত্ত্বেও বাগানের মালিক আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। যাঁরা নিয়মিত সৎসঙ্গ করতেন, সেই সাধু ব্যক্তিদেরও বাগানের মালিকের এই ব্যবহার ভাল লাগেনি। কিছু ব্যক্তি প্রতিশোধের ভাব নিয়ে মহারাজজীকে বলেছিল-রাত্রিতে আপনি আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন, আমরা ফলগুলি তুলে নেব, দেখি কি করে বাগানের মালিক নিজের ফলগুলি রক্ষা করে। এইরূপ মনোভাব নিয়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্রমশঃ নিস্তব্ধ রজনীতে মহারাজজী এই বিচার করছিলেন যে, এদের ডেকে তুলে ফল তোলার জন্য প্রোৎসাহিত করা অনুচিত হবে না তো। পুনরায় তাঁর সেই একই অনুভব হয়েছিল। একটি লোককে তিনি কুটীরের দিকে আসতে দেখেছিলেন তাঁর কাছে পৌঁছে লোকটি এই সূক্তিটি উচ্চারণ করেছিল-'**জননী সম জানহিঁ পর নারী, ধু পরাও বিষ তেঁ বিষ ভারী।' (মানস, ২।১২৯।৬)** যেমনি বিচার করতে শুরু করেছিলেন ভয়ঙ্কর কুলক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন অন্তর্জগত

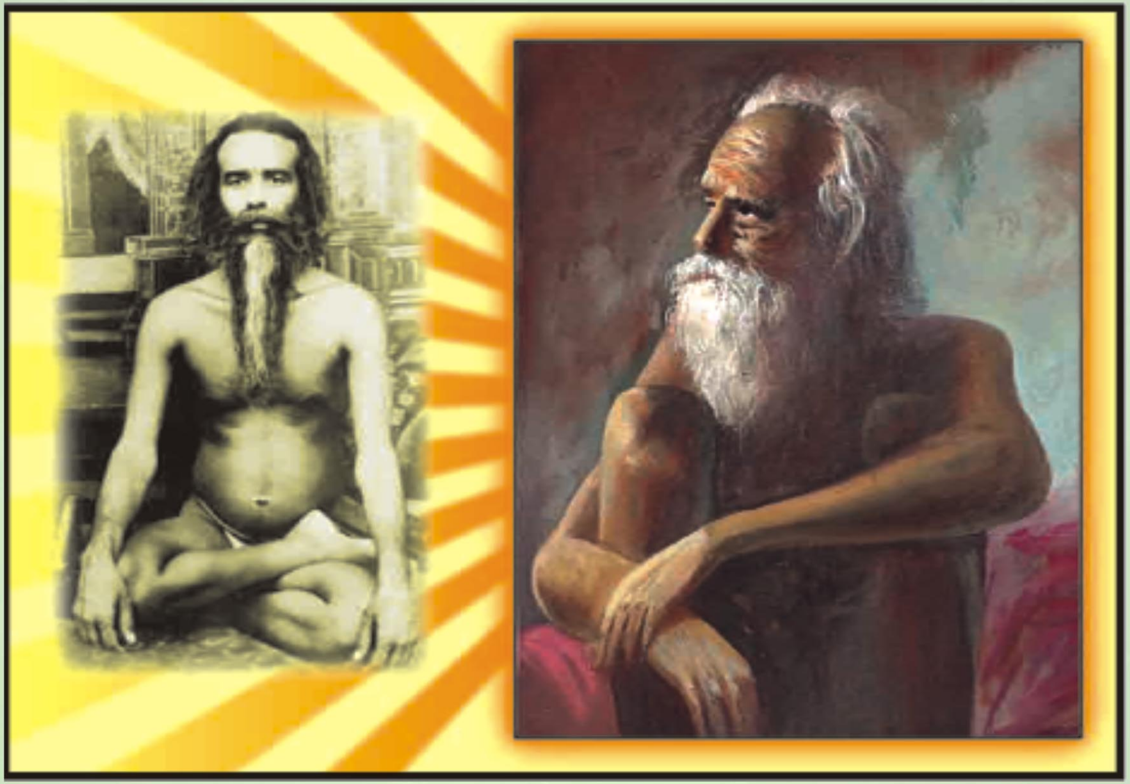

পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ এবং সৎসঙ্গী মহারাজজী

থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন যে, তুমি যে কাজে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছ সেটা মহাপাপ। যারা রাত্রিতে আম তোলার পরিকল্পনা করেছিল তারা সকালে মহারাজজীকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মহারাজজী রাত্রিতে আমাদের কেন তুলে দেননি? তিনি সরলভাবে বলেছিলেন-ইষ্টদেব বারণ করেছিলেন। সর্বব্যাপক ইষ্টদেবের ব্যাপকতা এটাই। এটা ঠিক-'**হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা।**' **(মানস, ১। ১৮৪।৪)**

সেই মহাপ্রভু ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যম দ্বারা আমাদের মধ্যে সতত সজাগ থাকার চেতনা সঞ্চার করতে থাকেন। ঐ ব্যক্তিটি চার বছর ধরে সেই পথ দিয়েই নিজের খেত-এ যাতায়াত করেছিল, কিন্তু উপর্যুক্ত সূক্তিটি আওড়ায়নি। শ্রী পরমহংস মহারাজজী সাধনারম্ভেই ঈশ্বরের সার্বভৌমিকতার আভাস পেয়েছিলেন।

সাধনা পরীক্ষার মাপকাঠিতে

মহারাজের সাধনারত জীবনের পরীক্ষা নিতে, প্রতিস্পর্ধার আবেশে এক সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তার ইচ্ছা ছিল রাজ্যশাসন প্রণালী দ্বারা সাধনাতে ব্যবধান উৎপন্ন করে তাঁকে পথভ্রষ্ট করা। এই পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করার জন্য সেই সম্পন্ন ব্যক্তিটি মহারাজজীকে উপেক্ষা করে বলেছিল-ইনি ভণ্ড, শঠ। আমি দেখছি, আমার দ্বারা আয়োজিত মোকদ্দমা রামনামের জোরে কি করে জিতছেন? তিনি শুনে সহজভাবে বলেছিলেন-পারিবারিক জীবন এবং আত্মীয়দের সঙ্গেই সম্বন্ধ যখন বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, তখন মোকদ্দমাতে আমার কি প্রয়োজন? গ্রামবাসীরাও ব্যঙ্গোক্তি করেছিল যে, যদি রামের নাম সত্য, তবে ইনি মোকদ্দমাতে অবশ্যই জিতবেন। যেদিন মোকদ্দমার নির্ণয় ছিল, তার একদিন আগে গুরুদেব এসেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে,যাও, ধ্যানে বিচারপতির স্বরূপ নিজের অন্তরে ধারণ করে নিজের পক্ষে ভাবান্তর করবে, তুমি বিজয়ী হবে। কারণ সেই ধনী ব্যক্তি রাম নামকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। বিচারপতির নির্ণয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বির পক্ষে হবার কথা ছিল কিন্তু নির্ণয় মহারাজের পক্ষেই ঘোষিত হয়েছিল। তিনি সস্নেহে জমিদারকে বলেছিলেন, "দেখ, রামনাম সত্য কি মিথ্যা। আমার খেত খামারের কোন প্রয়োজন নেই।" সেই থেকে জমিদারের মনে তাঁর চরণের প্রতি সুগভীর অনুরাগ উৎপন্ন হয়েছিল। মহারাজজী যখন এই ঘটনার বিবরণ দিতেন, তখন বলতেন, "হো! ভগবানের ইচ্ছাতে পাথরের উপরেও দুর্বা গজাতে পারে।"

সহধর্মিনীকে উপদেশ

সাধু হওয়ার পূর্বে মহারাজের ভরা পুরা সুখী সংসার ছিল। তাঁর সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি ও অন্যান্য আরও ব্যক্তি ছিল। ভজনে তীব্র অনুরাগ দেখে একবার তাঁর স্ত্রী পূর্বের ন্যায় প্রসাধন করে শান্ত রজনীতে তাঁর সঙ্গে সংসর্গ করার ইচ্ছা নিয়ে কুটীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহারাজজী তাঁর মনের ভাব পরখ করে স্বভাবতঃ বলে উঠেছিলেন, এখনও মন ভোলান স্বভাব যায়নি? তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-‘‘আমি কি বিধবা?’’ তিনি বলেছিলেন-বিধবা নয়ত কি? সাধু হওয়া কি মৃত্যু হওয়া একই ব্যাপার। যেই না বলা অমনি করুণ ক্রন্দন সেখানকার গোটা পরিবেশটাই পালটে দিয়েছিল। এয়োস্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার তিনি খুলে ফেলেছিলেন। স্ত্রীর আর্তনাদ শুনে গ্রামের লোকজন দেখতে এসেছিল যে, কি ব্যাপার? পরে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। তাঁর স্ত্রী নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। যাঁরা নিয়মিত মহারাজের কাছে যেতেন তাঁদের তিনি এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, **‘ত্রিয়া চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্, দৈবো না জানাতি কুতো মনুষ্যঃ।’**

ভগবৎ পথের পথিকদের নারীর আকর্ষণ পথভ্রষ্ট করে দেয়। অতএব ছলাকলা থেকে সাবধান হলে তবেই আমরা সাধনাতে প্রবৃত্ত হতে পারব। তিনি বলতেন-‘‘যখন মায়া পরীক্ষা নেয় তখন ভীরু বীরপুরুষ হয়ে যায় এবং বৃদ্ধ যুবক হয়ে যায়।’’ এর তাৎপর্য এই যে, ইষ্টদেব-এর কৃপা হলে তবেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে।

নলকূপে গুরুদেবের স্নান ও সতর্কবাণী

সৎসঙ্গী মহারাজ দশ-কুড়ি দিনের মধ্য গুরু মহারাজের কাছে আসতেন। তিনি এলে মহারাজজী তাঁর সেবাতে রত হতেন। সেবাকার্য সাধনার আধারশিলা। মহারাজজী সেবাতে রত থাকাকালীন সৎসঙ্গী মহারাজ সাধনার সূক্ষ্ম ওঠা নামাগুলি অবগত করাতেন।

মহারাজজীর আচরণের প্রতি সৎসঙ্গী মহারাজজীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। মহাপুরুষের হৃদয় কোমল হয় কিন্তু সাধক ভুল করতে পারে জানলে, তাঁরা খুব কঠোর হয়ে যান।

একবার মহারাজজী নিজের গুরুদেব সৎসঙ্গী মহারাজজীকে নলকূপে স্নান

করাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই এক সুন্দর কন্যা ঘড়া নিয়ে জল নিতে এসেছিল। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিরক্ত হতে শুরু করেছিল। মহারাজজী তার বিরক্তি দেখে তাকে এক একবার দেখে নিচ্ছিলেন যে, একটু দাঁড়াও, গুরুদেবের স্নান হয়ে যাক। গুরুদেব তাঁকে যদিও সেই কন্যার দিকে তাকাতে দেখেননি, তবুও জানতে পেরেছিলেন। রেগে বলেছিলেন 'থামো' তারপর একদিকে সরে গিয়েছিলেন। তিনি কন্যাটিকে জল নিয়ে নিতে বলেছিলেন। সে ঘড়াতে জল পূর্ণ করে চলে গিয়েছিল।

তার যাবার পর স্নান করতে-করতে সৎসঙ্গী মহারাজ বলেছিলেন-''জানো মাছকে আকৃষ্ট করার জন্য কিভাবে প্রলোভন দেখানো হয়? বড়শীতে টোপ গেঁথে মাছ ধরার জন্য সেটাকে জলে ফেলা হয়। প্রথমে তো মাছ সেটা দূর থেকে দেখে, তারপর অল্প চেখে, এদিক-ওদিক দেখে পালিয়ে যায়। তারপর আবার চারার কাছে আসে, লোভ সামলাতে পারে না। যেই টোপ কেড়ে পালাতে যায় অমনি কাঁটাটি গলায় আটকে যায়। সূতাটি নড়লেই মাছ শিকারী ছিপটা জল থেকে তুলে মাটিতে আছড়ে দেয়। বুঝলে। মাছ কিভাবে ধরা হয়? মহারাজজী বলেছিলেন-''হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'' সৎসঙ্গী মহারাজ আবার জোরে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন-''এখন বলছ যে দেখেছি।'' মহারাজজীর মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে বলেছিলেন-''এইভাবে মাছকে মাটিতে আছড়ে মারে।''

তখন মহারাজজী চুপ করে থাকাতেই মঙ্গল দেখতে পেয়েছিলেন, কারণ কিছু বলার জন্য মুখ খুললেই গুরু মহারাজ চতুর্গুণ জোরে ধমক দিয়ে উঠছিলেন তিনি বুঝতে পারেননি কেন বকা ঝকা করছেন।

সন্ধ্যাবেলা দর্শনার্থী সৎসঙ্গীরা কুটীরে আসতে শুরু করেছিলেন। সৎসঙ্গী মহারাজকে প্রণাম করে তাঁরা মহারাজজীকে প্রণাম করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই সৎসঙ্গী মহারাজ তাঁদের বলেছিলেন-''তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসো বস।'' তারা বলেছিলেন-''সাধুবাবাকেও প্রণাম করে নিতাম।'' সৎসঙ্গী মহারাজজী বলেছিলেন-''সাধু, কি রকম সাধু? এ তো মেয়েছেলের দিকে তাকাচ্ছিল।'' তখন তারা মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল-''সাধুজী! গুরু মহারাজ একি বলছেন?'' মহারাজজী বলেছিলেন-''ভাই আমি তো জানি না।'' সৎসঙ্গী মহারাজ আবার ধমক দিয়ে বলেছিলেন-''আবার বলছ যে আমি জানি না। ঐ যে মেয়েটি

জল নিতে এসেছিল, তাকে তুমি দেখনি?” মহারাজজী নিবেদন করেছিলেন যে-“মহারাজজী! তার প্রতি আমার মনে কোন দুর্ভাব ছিল না।” সৎসঙ্গী মহারাজজী বলেছিলেন-“হ্যাঁ খোকা! দিদিমার কাছে মামাবাড়ির বর্ণনা। এখন আমাকেই বোঝাচ্ছে। ওরে! মাছ প্রথমে এই ভাবেই দেখে, যেভাবে তুই দেখছিলি। এই ভাবেই ক্রমশঃ কাছে আসতে-আসতে মায়া জীবকে মাছের মত চুরাশি লক্ষ যোনিতে ঘোরাতে থাকে।” বহু লোকের মাঝে সৎসঙ্গী মহারাজজীর তাড়নার ক্রম প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত চলেছিল। তাড়না পেয়ে মহারাজজী তৃপ্ত হয়েছিলেন। এই নির্দেশ তিনি কঠোরভাবে পালন করেছিলেন, যা পরে নিরাধার বিচরণকালে তাঁকে গুরুর মত সাহায্য করেছিল।

গৃহে ভয়ঙ্কর উৎপাত

পরমহংসজী সাধনাতে অনুরক্ত হওয়ার কিছুকাল পরে গৃহে ভয়ঙ্কর উৎপাত শুরু হয়েছিল। কারণ যাই হোক, অনায়াসে খড়ের চালে চরচর শব্দ শুরু হয়েছিল, যার পরিণাম স্বরূপ গোটা পরিবার শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এর কিছুদিন পর পরিবারে সদস্যদের এক-এক করে মৃত্যু হতে থাকে। একজন সদস্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হতে না হতেই আর একজন কাল কবলিত হচ্ছিল, ঘরের সদস্যরা মহারাজের কাছে শব রেখে কাঁদতে-কাঁদতে অভিসম্পাত করত যে, যখন থেকে তুমি ভজনা শুরু করেছ, তখন থেকে ঘরের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে পরিবারের এগারোজন সদস্য কাল কবলিত হয়েছিল। এই প্রকার রোমাঞ্চকর ঘটনার ভাবী সঙ্কেত দিয়ে গুরু মহারাজজী পূর্বেই বলে দিতেন যে, এবার তোমার পালা, সাবধান থেকো-কখনও অনুভবে, কখনও প্রত্যক্ষ। কান্নকাটি লেগেই থাকত; কিন্তু এই প্রকার চিত্তস্তম্ভনকারী ঘটনাগুলির মাঝেও তিনি অনবরত সাধনাতে রত ছিলেন। এটা গুরু মহারাজের কৃপাই ছিল।

একদিন তিনি চিন্তনে বসেছিলেন হঠাৎ নির্দেশ পেয়েছিলেন যে আগুন পোহানোর যে ধুনি ব্যবহার কর সেই ধুনির বিভূতি নিয়ে যাও আর ঘরে ছিটিয়ে দাও তাহলে আজ থেকে ঘরের চাল চর চর শব্দও করবে না। এবং কারও মৃত্যুও হবে না। পরিবারে যারা জীবিত, তারা দীর্ঘজীবী হবে। ধুনি ছিটিয়ে দিয়েই ফিরে আসবে সেখানে বসবে না।

ভগবানের আদেশ ছিল সেইজন্য মহারাজজী উঠেছিলেন, বিভূতি নিয়ে

ঘরের ভিতরে গিয়ে চতুর্দিকে উপর-নীচে বিভূতি ছিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। মাতৃদেবীকে বলেছিলেন-''আজ থেকে চাল চর চর করবে না আর কারও মৃত্যুও হবে না। এবার তোমার ঘর ঠিক হয়ে গিয়েছে।'' এইরূপ বলে তিনি নিজের কুটীরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মাতৃদেবী তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু মহারাজজী নির্বিকার চিত্তে নিজের কুটীরে গিয়ে বসেছিলেন।

ক্ষণিক আসক্তির ফলে ইষ্টের আদেশ

যে স্থানে মহারাজজী সাধনারত ছিলেন, তার সমীপেই আলপথ ছিল। সেই আলপথ ধরে যারা যাতায়াত করত, তারা তাঁর কৃশ শরীর দেখে আক্ষেপ করত যে, এঁর কোন কঠিন অসুখ করেছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাঁদের এইরূপ কথোপকথন কখনও-কখনও তিনি শুনতে পেতেন। সেইজন্য নিত্যই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন যে, আপনি অনুমতি দিলে অন্য কোথাও সাধন-ভজন করতাম। গ্রামের লোকেরা কিছু না কিছু বলবেই। কিন্তু ভগবান অনুমতি দিচ্ছিলেন না।

গৃহত্যাগ করা প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছিল। গাছে মুকুল দেখা দিয়েছিল। তা দেখে মহারাজজীর মনে এসেছিল যে, ভালই আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভজনাই তো করব। গাছে মুকুল এসেছে যখন তখন ফলও হবে। এখানেই ফলমূল খেয়ে ভজনা করব।

বাগানের প্রতি ক্ষণিক আসক্তি জাগার সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্জগত থেকে ইষ্টদেব আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রয়াগ যাও। মহারাজজী এই আদেশ পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল যেন, খাঁচা থেকে পাখি মুক্তি পেল। তিনি প্রয়াগের পথ ধরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও ছ'জন গিয়েছিলেন।

প্রয়াগের ঘটনা

তীর্থরাজ প্রয়াগ এলাহাবাদের কাছে গঙ্গা ও যমুনা এই দুটি নদীর পবিত্র সঙ্গম স্থল। গ্রামের কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মহারাজজী নৌকা বিহার করছিলেন। মাঝ সঙ্গমে নৌকাতে সৎসঙ্গ চলাকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে বাদ-বিবাদ বেধেছিল। তর্ক-বিতর্কে সকলেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। যাঁরা সৎসঙ্গ করছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সাধুর ফুটো ঘটি নিয়ে মহারাজজী অজান্তেই

তা গঙ্গাজলে পূরিত করেছিলেন। এই চমৎকারজনক কার্য দেখে তথাকথিত মহাত্মাগণ আশ্চর্যচকিত হয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিচার-বিমর্ষ শুরু করেছিলেন যে, এই ফুটো ঘটি কিভাবে জলধারণে সক্ষম হল? শেষে তাঁরা নিশ্চয় করে বললেন যে যদি আপনার স্পর্শ মাত্রে ছিদ্রযুক্ত পাত্রও জলধারণে সক্ষম হয় তবে আপনার বাণী নিঃসন্দেহে প্রত্যেক দেশ-কাল ও পরিস্থিতিতে সত্য আর আমাদের জন্য অনুকরণীয়, একথা শুনে মহারাজজী বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি ইষ্টদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন যে, আমি বুঝতে পারি না ঠাকুর, আপনি কি-কি চমৎকার দেখান।

রাত্রিবেলা ভোজনান্তে ভক্তরা বালির উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছিলেন। ন'টার সময় মহারাজজী ইষ্টদেবকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভগবন্! প্রয়াগে এলাম। এখন কি করি! ভগবান বলেছিলেন "এদের সঙ্গ ত্যাগ কর।" মহারাজজী তাদের সুপ্ত অবস্থাতে ছেড়ে সন্দর্পণে উঠে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। তিনি গঙ্গার তীর ধরে সারারাত হেঁটেছিলেন সকাল হতে-হতে ভক্তদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত দূরে চলে গিয়েছিলেন। নিত্যকর্ম সেরে হাত মুখ ধুয়ে চিন্তনে বসবার আগে মহারাজজী পুনরায় ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভগবন্! ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ তো করলাম, এখন কি করি।" ভগবান বলেছিলেন, "শরীরে যে কাপড়খানা রয়েছে, সেটা খুলে দিগম্বর হয়ে যাও।" আদেশ পালন করে দিগম্বর হয়েছিলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু! এখন কি আদেশ?" ভগবান বলেছিলেন, কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে এইদিকে এগিয়ে যাও। মহারাজজী গঙ্গার তীর ধরে হঁড়িয়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পরে তিনি বিশেষ-বিশেষ পর্বে কয়েকবার প্রয়াগ গিয়েছিলেন। মাঘমাসের মেলা ছিল সেইজন্য চতুর্দিকে, গঙ্গার পবিত্র তীরে সাধুদের জন্য ধুনি ও শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজজীর সম্বল বলতে কাছে কিছুই ছিল না। এই অবস্থাতে পরিভ্রমণ করতে-করতে তিনি ত্যাগীদের মাঝে গিয়ে পৌঁছেছিলেন—মহারাজজীকে দেখে তাঁরা সকলেই বলে উঠেছিলেন "চল খড়িয়া কঁহী কা। বস বনকর আ গয়ে সাধু, না তিলক কা পাতা না মালা কা লগে সাধু কি নকল করনে। চলো! দূর হাটো।" সরলভাবে হেসে কিছুদূর গিয়ে গঙ্গার তীরে বালির উপর বসে তিনি ধ্যানস্থ হয়েছিলেন।

সেই সময় একজন সাধু অনুরাগী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সাধু-সমাজকে

প্রয়াগের ঘটনা

ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এই অজ্ঞাত লোকে বিচরণকারী অবধূতকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ মনোভাব দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেই সাধুগণ মহারাজজীকে উপেক্ষা করে সেই ব্যবসায়ীকে ডেকে বলেছিলেন-একে খাওয়াতে চাও অথবা সাধুদের খাওয়াতে চাও? ব্যবসায়ীটি বিনীতভাবে বলেছিলেন-"ইনি যেমনই হোন, ইনি নিমন্ত্রিত সাধু, আমি এঁর অনাদর হতে দেব না।"

ভোজনের পূর্বে যখন পাত করা হচ্ছিল, তখন পাশে উপবিষ্ট সাধুরা হেয় করে বলতে শুরু করেছিলেন-এমন মনে হচ্ছে যেন এই ব্যক্তি বহুদিন স্নান করেনি। কিন্তু সেই শ্রদ্ধালু ব্যবসায়ী মহারাজজীর ভোজনের ব্যবস্থা খুব ভালভাবে করেছিলেন। তিনি কয়েকদিন ধরে অনাহারে ছিলেন। যেই দু'-তিন গ্রাস অন্ন গ্রহণ করেছিলেন অমনি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। তাঁর মুখ দিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে দু'-চারটি শব্দ প্রস্ফুটিত হয়েছিল যে, 'এখনই বৃষ্টি দেবার ছিল।' সন্ত-মহিমার ফলস্বরূপ তারপরই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নির্মল হয়ে গিয়েছিল। গোটা সমাজ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে আশ্চর্যচকিত হয়ে গিয়েছিল।

আহারান্তে হাত ধুতে যাবার সময় উপস্থিত সাধু ও গৃহস্থ সকলেই তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। 'গঙ্গায় হাত ধোব' বলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। গোটা সমাজ তাঁকে অনুসরণ করেছিল। মহারাজজী তাড়াতাড়ি গঙ্গায় নেমে ওপারে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে বাঁশের এক প্রকোষ্ঠে স্থির হয়ে বসেছিলেন। যে ভীড় তাঁকে অনসুরণ করছিল, তারা যত্র-তত্র তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করেছিল। কিছু ব্যক্তি নৌকাতে করে ওপারে গিয়েছিল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারা মহারাজজীকে খুঁজে পায়নি। হতাশ হয়ে একে অপরকে দোষ দিচ্ছিল যে, আমরা দুর্ভাগা কারণ একজন অদ্ভুত মহাপুরুষ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমরা ভালভাবে দর্শনও করতে পারলাম না, আপসোস করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

প্রবচনের সময় মহারাজজী মাঝে-মাঝে এই ঘটনাটির দিকে সঙ্কেত করে বলতেন ভগবানই সাধুর বাণী সত্য করে দেন। সিদ্ধাই-এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস ও স্থিরতা থাকা উচিৎ।

প্রয়াগে কুম্ভমেলায়

বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি কুম্ভমেলাতে পুনরায় প্রয়াগ গিয়েছিলেন। পাগলের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন। কেউ বসতে দিচ্ছিল না। এরই মধ্যে এক ধর্ম পরায়না রানী দ্বারা সাধুদের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। সাধুদের সঙ্গে মহারাজজীও গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে একজন সেপাই ধাক্কা দিয়ে তিরস্কার করে বলেছিল-''এখান থেকে যাও, মহাত্মাদের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তোমার মত পাগলের জন্য নয়।'' এই বলে খুব জোরে তাঁর হাত মুচড়ে দিয়ে তাঁকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। মনে ক্ষণিক করুণা সঞ্চার হওয়ার ফলস্বরূপ তিনি বিচার করতে শুরু করেছিলেন যে, সর্বব্যাপী, সর্ব নিয়ন্তা মহাপ্রভুই সকলের হৃদয়ে স্থিত ও তিনিই সেখান থেকে কথা বলেন তবে এই বিড়ম্বনা কেন? সাধু হওয়ার জন্য যত যোগ্যতার প্রয়োজন বোধ হয় তত যোগ্যতা অর্জন করিনি। এই বিচার করতে-করতে কিছুদূর গিয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বসেছিলেন যে, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমি আর কারও কাছে যাব না। যিনি এই পথে প্রবৃত্ত করেছেন, তিনি ভোজন প্রদান করলে গ্রহণ করব, না হলে নয়। কিছু সময় পরেই একজন সাধুসেবী ব্যবসায়ী তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ভোজন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ করেছিল। মহারাজজী নিস্পৃহভাবে বলেছিলেন, যদি ভগবান এখানেই ভোজনের ব্যবস্থা করেন, তবেই করব, না হলে উপবাসী থাকব। একথা শুনে সেই ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রকারের অন্ন ব্যঞ্জনপূর্ণ থালা সেই স্থানেই নিয়ে এসেছিল। ভোজন করার পর ঘুরতে-ঘুরতে মহারাজজী আবার সেই স্থানে পৌঁছেছিলেন, যেখানে সেপাইটি তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিল। তার বারবার মনে হচ্ছিল, আজ আমি একজন সাধুকে অপমান করেছি। হতে পারে তারই ফল পাচ্ছি। আশে-পাশে মহারাজজীর খোঁজ হচ্ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি বিচরণ করতে-করতে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, যেখানে সেই প্রহরী উদরশূলে পীড়িত হয়ে পড়েছিল। মহারাজজীকে দেখেই সকলে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল ও বিনম্র স্বরে প্রার্থনা করছিল। মহারাজজী ক্ষমা করুন, এই প্রহরী আপনাকে চিনতে ভুল করেছে। সাধু স্বভাবানুসারে মহারাজজী দয়ার্দ্র হয়ে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন। ঈশ্বরের অনুকম্পাতে তৎক্ষণাৎ তার পেট ব্যথা সেরে গিয়েছিল। এরূপ চমৎকারপূর্ণ দৃশ্য দেখে রানীও ভাববিভোর হয়ে উঠেছিলেন। দেখতে-দেখতে সে স্থান লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রাতের ঘন অন্ধকারে কোনওরকমে তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

পরিভ্রমণকালে জৌনপুর

বিচরণকালে একবার মহারাজজী জৌনপুর গিয়েছিলেন। সেখানে কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল না। রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে কোন বাগানের পেয়ারা খেয়ে তিনি ধ্যান ও জপক্রিয়ায় রত থাকতেন। একদিন উদ্যানরক্ষক তাঁকে পেয়ারা পেড়ে খেতে দেখে বলেছিল-''ভগবন্! এটা আপনারই উদ্যান। স্বচ্ছন্দে আপনি ফলাস্বাদন করুন কিন্তু আপনি নিজের সুকোমল হাতে কষ্ট করে কেন ফল পাড়বেন, আমিই আপনার সেবায় ফলার্পণ করব।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গ্রামের লোকেরা মহারাজজীর কাছে যেতে শুরু করেছিল। ভক্তরা নিয়মিত বিভিন্ন ভোজ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন। তিনি সমস্ত খাদ্য সামগ্রী একসঙ্গে সেদ্ধ করে খেয়ে নিতেন। ভোজ্য পাত্র বলতে তাঁর কাছে মাটির একটা হাঁড়ি ছিল, যেটা পেয়ারা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতেন। শূন্য পাত্রে ভক্তরা ভোজ্য সামগ্রী পূর্ণ করে দিয়ে যেতেন। মহারাজজী নিস্পৃহভাবে ভজনাতে বিভোর হয়ে থাকতেন।

জৌনপুরের কবর-স্থান

নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন সেইজন্য জৌনপুর শহর পরিভ্রমণ করতে-করতে কোলাহল থেকে দূরে তিনি শহরের বাইরে স্থিত কবর স্থানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে সর্বত্র নীরবতা পরিব্যাপ্ত ছিল। কাছেই একটা কুয়ো ছিল। তিনি কুয়োর পাশে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি অনেকগুলি আত্মার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। যেমনি মহারাজজীর ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল, তিনি আশে-পাশে চেয়ে দেখেছিলেন। বিভিন্ন আকৃতির ভীমকায় আত্মাদের দেখেছিলেন। যারা দূরে প্রকট হচ্ছিল এবং একটা সীমা পর্যন্ত তাদের আকৃতি বড় হচ্ছিল তারপর ছোট হতে -হতে শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। বার কয়েক এরূপ হয়েছিল। দৃষ্টি সরিয়ে পুনরায় তিনি ধ্যানে ডুব দিতেই সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, এরা পূর্বজন্মের কৃত অপরাধের ফল ভোগ করছে। পূর্বজন্মের সংস্কার ও পাপ এত জঘন্য ছিল যে, শরীর ধারণ করতে পারছে না আবার মুক্তও হতে পারছে না। সেইজন্য যেখানে-সেখানে নিজেদের কল্যাণের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্তর্জগৎ থেকে সঙ্কেত পেয়ে মহারাজজী পুনরায় সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন

এবং দেখেছিলেন সেই বিবিধ আকৃতির দূষিত আত্মাগুলি তাঁর পায়ে পড়ে অনুনয়-বিনয় করছে। কাতরভাবে প্রার্থনা করে তারা বলেছিল-আমরা পূর্বজন্মে ব্যভিচার, খুন, চুরি ইত্যাদি পাপকর্মে নিযুক্ত ছিলাম, সেইজন্য দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কৃপা করে আপনি আমাদের এই নিকৃষ্ট যোনি থেকে মুক্তি প্রদান করে আমাদের কল্যাণ করুন। সাধু স্বভাববশতঃ দয়ার্দ্র হয়ে মহারাজজী তাদের কল্যাণের আশীর্বাদ দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে সাধু-মহাত্মাদের সান্নিধ্যে অনায়াসেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং মন নির্মল হয়ে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত হয়।

বিচরণকালে নিস্পৃহ আকাশবৃত্তি

জৌনপুর ত্যাগ করার পর মহারাজজী ইষ্টদেবকে হৃদয়ে ধারণ করে নিরালম্ব বিচরণ করছিলেন, কাশী, আগ্রা, মথুরা, উজ্জয়িনী, মুম্বাই, গোন্ডা ইত্যাদি স্থানগুলি পরিভ্রমণকালে কারও কাছে তিনি ভিক্ষা করেননি। অযাচিতভাবে যা কিছু পেতেন, তাই নিবেদন করে ভজনাতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কখনও কারও বাড়িতে কিছু চাননি। কারণ গোড়া থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে-**মোর দাস কহাই নর আসা**। তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হলে সংসারী লোকেদের কাছ থেকে সহযোগিতার অপেক্ষা রাখা নিরর্থক। বিচরণকালে নিরন্তর আট-দশ দিন উপবাসে থাকা তাঁর জন্য সামান্য ব্যাপার ছিল। তাঁর অদ্ভুত রূপ দেখে বহু ব্যক্তি তাঁকে পাগলের সংজ্ঞা দিত। কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাদের অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে মহারাজের বাণীর জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করত এবং তারা সাধুসঙ্গে থাকার অভিলাষা নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করত। উপেক্ষা করলেও সঙ্গে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করত। যাতে হৃদয়ে প্রবাহিত ভজনের অবিচ্ছিন্ন ধারা অটুটু থাকে, সেইজন্য মহারাজজী রাত্রিতে কোন আশ্রমে অথবা গ্রামে আশ্রয় নিতেন না।

শিশিরকালে অসহনীয় শীতাধিক্যেও মহারাজজী বাঁশের প্রকোষ্ঠে বসে ধ্যান-ভজনের স্থিতিতে লীন হয়ে থাকতেন। প্রাতঃকালে উঠে এক-দু' ঘণ্টা রোদে বিশ্রাম নিতেন। লোকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করত, মহারাজজী আপনি সাপ, কাঁকড়া বিছার আস্তানাতে কি করে থাকেন? মহারাজজী হেসে বলতেন-দেখ, লৌকিক দৃষ্টিতেই এরা সাপ-কাঁকড়া-বিছে। সাধকের দৃষ্টিতে চতুর্দিকে ইষ্টই ব্যাপ্ত। ইষ্টদেব

তাদের যেভাবে রাখেন, তারা সেই অনুসারে যন্ত্রবৎ চলতে থাকে।

গঙ্গার তীর ধরে তিনি বিচরণ করতেন। প্রায়ই দু'-তিন দিন উপবাস থাকতেন। একদিন তিনি জাহ্নবীর তীরে বসেছিলেন, সেইসময় একজন কৃষক সেদিক দিয়েই যাচ্ছিল, সে মহারাজজীকে বলেছিল, "এখানে কেন বসে আছেন? গ্রামে গিয়ে কিছু ভিক্ষা করে নিন।" মহারাজজী বলেছিলেন-"আমি ভিক্ষা করব না।" সে বলেছিল, "তাহলে চলবে কি করে?" মহারাজজী হেসে বলেছিলেন-"ভগবান যাকে প্রেরণ করবেন, সেই খাওয়াবে! তুমি কেন চিন্তা করছ? সেই কৃষকটি আচ্ছা মহারাজজী! বলে চলে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই কৃষকটিই ভোজন নিয়ে এসে নিবেদন করেছিল-ভগবন্! প্রসাদ গ্রহণ করুন। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কেন এলে?" সে হেসে বলেছিল, "ধরুন, ভগবান আমাকেই প্রেরিত করেছেন, সেইজন্য চলে এলাম।"

কর্মনাশা নদীর তীরে দেবী-মন্দির

গঙ্গার ডান তীর ধরে বিচরণ করতে-করতে মহারাজজী বিহারের সীমান্ত প্রদেশ কর্মনাশা নদীর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে মেলা বসেছিল। এক বৈষ্ণব সাধু কুটীর তৈরি করে সেখানেই থাকতেন। তিনি মহারাজজীকে দেখে বসতে বলেছিলেন। তাঁকে ভোজন করানোর পর বলেছিলেন, "মহারাজজী! এখানে কোথাও আসন পেতে দিই?" মহারাজজী বলেছিলেন-"এখানে বড্ড ভীড়, আমাকে নির্জন স্থানের সন্ধান দিন।" তিনি বলেছিলেন, "এই দিক দিয়ে চলে যান।" মহারাজজী কর্মনাশা নদীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার চলার পর একটা মন্দির দেখতে পেয়েছিলেন।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। মন্দিরের কাছেই দু'-তিনটে ঘন গাছ ছিল। সেই স্থানে একটু বেশি অন্ধকার ছিল। ঠান্ডা জায়গা চিন্তা করে মহারাজজী সেই ঘন গাছের তলায় রাত্রি যাপন করার নিশ্চয় করেছিলেন। মন্দিরের ভিতরটা দেখেছিলেন। দেবীর মন্দির ছিল। মেঝেতে লাল-লাল কিছু চক্‌চক্ করছিল। পা রাখতেই আঠালো মত কিছু মনে হয়েছিল। মন্দিরের শীর্ষদেশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, ঘণ্টার পাশে একটা সাপকে ঝুলে থাকতে দেখেছিলেন। এরই মাঝে দু'-তিনটে কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে এসেছিল। মহারাজজী তাদের বকা দিয়েছিলেন বকুনি খেয়ে তারা দূরে সরে গিয়েছিল। মহারাজজী মন্দিরের ভিতরটা নোংরা দেখে পুনরায়

বৃক্ষের মূলে গিয়ে বসেছিলেন। দুটো কুকুরও অল্প দূরে গিয়ে বসেছিল।

তিনি সমস্ত রাত্রি ভজনে লীন ছিলেন। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে দেবী মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে কয়েকজন ব্যক্তি এসেছিলেন। তিনি সেখানে মহারাজজীকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-মহারাজজী! আপনি এখানে কখন এলেন? মহারাজজী সেই বৈষ্ণব সাধুর বিষয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর কুটীরে প্রসাদ গ্রহণ করে সন্ধ্যাবেলা চলে এসেছিলেন। মহারাজজীর খবর পেয়ে সেই বৈষ্ণব সাধুও সেখানে চলে এসেছিলেন। আশে-পাশের গ্রামের যারাই খবর পেয়েছিল, এক-এক করে সকলেই সেখানে একত্রিত হয়েছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি ব্যাপার? পূজারী বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! আপনি সিদ্ধ পুরুষ। এখানে রাত কাটাতে এসে আজ পর্যন্ত কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়নি। এখানে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আপনি গোটা রাত এখানে বসেছিলেন আর এখনও জীবিত, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।’’ তারা মহারাজজীকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না সকলেই তাঁকে ভক্তিভরে স্বাগত জানিয়েছিল। তিনদিন পর্যন্ত তাঁকে যেতে দেয়নি। চতুর্থদিন মহারাজজী রাত্রি বেলা উঠে ধীরে-ধীরে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

মহারাজজী বলেছিলেন-‘‘হো! সকালে উঠে দেবীর মন্দিরের মেঝেতে রক্ত দেখেছিলাম। উপরে তাকিয়ে দেখেছিলাম। অনেকগুলো পাঁঠার পা ঝুলানো ছিল গাছের ডালে-ডালে। সেইজন্য রাত্রিতে কুকুরও থাকত। যেখানে খাবারের ব্যবস্থা থাকবে, কুকুর, সাপ ও ব্যাঙ তো সেখানেই থাকবে। অকারণেই লোকেরা ‘ভূত-ভূত’ করে প্রাণ হারিয়েছে। ‘‘**ইয়হ ভ্রম ভূত সকল জগ খায়া। জিন-জিন পূজা তিন-তিন গায়া।।**’’ কোথাও কিছু ছিল না।

মহারাজজী পুনরায় গঙ্গার তীরে ফিরে এসেছিলেন। বিচরণকালে যেখানেই সন্ধ্যা হত, তিনি সেখানেই আশ্রয় খুঁজে নিতেন। গ্রামের বাইরে নির্জন স্থান দেখে তিনি সেখানেই বসে যেতেন। কোন মহাত্মার কুটীর দেখলেও কুটীরের ভিতর যেতেন না। মহারাজজী বিচার করতেন-যদি কেউ কুটীরে থাকে তাহলে মিছে আপ্যায়নে আর বাদ-বিবাদে ভজনা বাধিত হবে। সেইজন্য রাত্রিবেলা বাইরে নির্জনেই থাকতে পছন্দ করতেন। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে মহারাজজীর ধ্যানভঙ্গ হত, তখন বাঁশ-বৃক্ষ-এর মূল থেকে উঠে রোদে শুয়ে পড়তেন। দশটা-এগারোটা পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন।

শিশিরকালে দিগম্বরাবস্থা

পরিভ্রমণকালের এই শৃঙ্খলাতে তিনি কাশী পৌঁছেছিলেন। সেখানে রাত্রির নীরব পরিবেশে শীতের প্রাবল্য উপেক্ষা করে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভজনে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যখন শ্বাস অন্তর্দেশে স্থির হয়ে যেত, তখন শীতের প্রভাব তুচ্ছ হয়ে যেত। কাশীতে কিছুদিন বাস করে তিনি সমতল ভূমির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিকটবর্তী গ্রামের দুটি যুবতী মহারাজজীকে দেখে ছুটে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তিনি দিগম্বর অবস্থাতে ছিলেন। এই অবস্থাতে তাঁকে দেখে সেই দুটি যুবতী হাসাহাসি করছিল ও পরস্পর বলাবলি করছিল-"ও লো! এঁর তোকে পছন্দ হয়েছে। অন্য যুবতীটি বলেছিল, না না তোকে পছন্দ হয়েছে।" তাদের এসব কথাবার্তার কোন প্রভাব তাঁর মনে পড়েনি। উপরন্তু তিনি চিন্তনে বিভোর হয়েছিলেন। গ্রামের একটা লোক সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। তাকে দেখে যুবতী দুটি লজ্জা পেয়ে চিৎকার করে পালাতে গিয়েছিল। সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করেছিল-কেন পালাচ্ছ? তারা বলেছিল-এঁকে নগ্ন দেখে ভয় হচ্ছে। তাদের কথা শুনে গ্রামের লোকটি মহারাজজীর দিকে চেয়ে দেখেছিল ও সাধু জ্ঞান করে প্রণাম করেছিল। তাঁকে গ্রামে যাওয়ার অনুরাধ করেছিল। কিন্তু তিনি গ্রামে না গিয়ে তার অনুরোধে গ্রামের বাইরেই দশদিন পর্যন্ত ছিলেন, তারপর সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে ভগবানই বৈরাগ্যের রক্ষা করেন, তা না হলে বড়-বড় সাধকও কামের তাড়নায় পথ-ভ্রষ্ট হয়ে যান।

পরিভ্রমণকালে মহারাজজী শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল দিগম্বর অবস্থাতেই অতিবাহিত করতেন। বাঁশের প্রকোষ্ঠ তাঁর খুব প্রিয় ছিল, কারণ শীতকালে সেই প্রকোষ্ঠ অন্য খোলা জায়গা অপেক্ষা বেশী গরম থাকত। সন্ধ্যা হতেই তিনি বাঁশের প্রকোষ্ঠে বসে ধ্যান ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতেন। ধ্যানস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত শীত অনুভব করতেন, কিন্তু ধ্যানস্থ হতেই সামান্যই ঠান্ডা বোধ হত, যদিও রোমকূপ খাড়া হয়ে থাকত কিন্তু দেহটা গরম হয়ে যেত এবং শীতকালটা সহনযোগ্য হয়ে যেত। মন একাগ্র হওয়ার পর তিনি ধ্যানস্থ অবস্থাতেই দু' একবার আসন পরিবর্তন করতেন। এর মধ্যেই সকাল হয়ে যেত। এইভাবে দিন-মাস-বছর ঘুরে যাচ্ছিল।

রাত্রিতে কখনও-কখনও ধ্যানভঙ্গ হত। ধ্যানভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এত বেশী ঠান্ডা বোধ হত যে, দেহটা কাঁপতে শুরু করত। হাড় কাঁপানো শীতে হাওয়া তীরের মত শরীরে বিঁধে যেত। মহারাজজী শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রায়

আধ-কিলোমিটার পর্যন্ত খুব জোরে ছুটে যেতেন, তারপর ততটা বেগেই আবার ফিরে আসতেন। এইভাবে শরীর কিছুটা গরম হত। তখন তিনি পুনরায় ধ্যানে বসতেন, প্রায়ই ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন। দেহটা শীতে ঠান্ডা হতে-হতে, দেহের ভিতরটা গরম হয়ে যেত। একাগ্র চিত্তে রাত পার করে দিতেন।

বিচরণকালে দু'চারটা রাত এমনও কেটেছিল, যখন শত চেষ্টা করেও তিনি ধ্যানস্থ হতে পারেননি। সেইসময় প্রতিটা ক্ষণ খুব কষ্ট করে পার করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-মহারাজজী, সেই রাতগুলো কিভাবে কাটিয়ে ছিলেন? তিনি বলেছিলেন-হো! তা আমিই জানি কি করে কাটিয়েছিলাম। কোন রকমে কেটে গিয়েছিল। গঙ্গার তীরে বিচরণ করতে-করতে পা ফেটে গিয়েছিল। ঠান্ডা বালি যখন ফাটা পায়ের ফাঁকে ঢুকত তখন গোটা শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। ‘‘ফুটে করম তো ফটে বিওয়াই।’’ কিন্তু কিছু করার ছিল না। ভগবানের আদেশ ছিল যে, এইভাবেই থাকো। আদেশ পূর্ণরূপে পালন করা উচিত।

রাম নগরে ভক্তদের মাঝে

বিচরণ করতে-করতে মহারাজজী কাশীর অলিগলির ভিতর দিয়ে রামনগরের দুর্গের পিছনদিকে জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে নোনিয়া জাতির লোকেরা বসবাস করত। তারা অবস্থাপন্ন ছিল। মন্দিরে থাকার জন্য মহারাজজীকে তারা অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সম্মত নন দেখে দুর্গের প্রাচীর ঘেঁষে একটা কুটীর তাঁর জন্য তৈরী করে দিয়েছিল। তিনি সেই কুটীরের ভিতরে গিয়ে বসেছিলেন। সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর সেবা করত। তাদের ছেলে মেয়েরাও সেখানে যাতায়াত করত। একটি মেয়ে রোজ রাত দুটো থেকে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকত এবং ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে, অপলকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত, ভোর হতেই পালিয়ে যেত। দু'দিন পর তার ছায়া দেখে চেয়ে দেখেছিলেন যে, সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি সেই মেয়েটির বাড়ির সন্ধান করেছিলেন এবং সন্ধান পেয়ে বাড়ির লোকজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটির বিবাহ দিতে বলেছিলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন-হো! ভগবৎ পথের পথিকদের জন্য নির্জনে বেশী বাধা। যে নির্জনেও বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ, সেই মহান। সাধুকে জেদি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিৎ। দিগম্বরবেশের কৌতূহলই তাকে আকর্ষণ করত।

ফকীরের সঙ্গে ভোজন

মহারাজজী নিরাধার বিচরণ পছন্দ করতেন। পরিকল্পনা করে করতেন না। ধীর পায়ে পায়চারি করতে-করতে তিনি যে কোন একটা দিকে চলতে শুরু করতেন। কোথায় যাবেন, পথ চলতে-চলতে কোন্ স্থানে গিয়ে পড়বেন ইত্যাদি সুবিধা-অসুবিধার কোন খেয়াল থাকত না। পথ চলতে-চলতেও নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এর দিকে লক্ষ্য রাখতেন। নাম জপ এবং মনের উপর অনবরত দৃষ্টি রেখে চলতেন। উপবাসী থাকা তাঁর জন্য সামান্য ব্যাপার ছিল। কোন ব্যক্তি ভোজন করাতে চাইলে তা গ্রহণ করে নিতেন।

একবার মহারাজজী এক মুসলমান ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফকির প্রণাম করে প্রার্থনা করেছিল-"মহারাজজী! আমি মুসলমান ফকির। আমার হাতের তৈরী করা রুটি আপনি কি খাবেন? তার কথা শুনে মহারাজজী বলেছিলেন দেখো ভাই! সাধুর জাত-পাত, সমবায়, সম্প্রদায়, কুলগোত্র, ধর্ম এসবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থেকে যায় না। এই পথে লক্ষ্য একটাই-পরমতত্ত্ব পরমাত্মার চিন্তন। আমি হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য বুঝতে পারি না। তুমি ফকির, তোমার মনে কোন ভেদবুদ্ধি তো নেই? ফকির বলেছিলেন-"না মহারাজ! আমার মনে ভেদাভেদ ভাব নেই।"

মহারাজজী বলেছিলেন-"যেভাবে আল্লার নাম কর, সেই ভাবে দু'বার রাম-রাম বল, তাহলে খেয়ে নেব।" সে রাম নাম মুখে আনছিল না। মহারাজজী বলেছিলেন-তোমার মনে যখন এত ভেদবুদ্ধি, তাহলে আমি কি করে এ খাবার গ্রহণ করব? সে দেখল, রাম নাম উচ্চারণ না করলে মহারাজজী ভোজন গ্রহণ করবেন না। তখন সে চার বার রাম নাম নিয়েছিল। তারপর মহারাজজী তার হাতের তৈরী রুটি গ্রহণ করেছিলেন।

ভোজন গ্রহণের পর মহারাজজী তার সঙ্গে কিছুক্ষণ সৎসঙ্গ করেছিলেন। ফকিরটি বলেছিল-"কোন পার্থক্যই নেই কিন্তু মনে এমন ভ্রম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শীঘ্র তা দূর হতে চায় না, সেইজন্য রাম নাম করতে আমারও সঙ্কোচ হচ্ছিল। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন-"পরমাত্মার চিন্তন কর, সেই সঙ্গে গুরু মহারাজের ধ্যান কর স্বয়ং ভগবানই এই ভ্রম দূর করবেন।" সেই ফকিরকে যোগ-সাধনা ও চিন্তনের উপদেশ দিয়ে মহারাজজী প্রস্থান করেছিলেন।

যমুনার তীরে স্ত্রীলোকদের ভজন

একরাত্রিতে মহারাজজী যমুনার তীরে ধ্যানে বসেছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে কিছু মহিলা নিম্নপ্রদত্ত ভজনটি গাইতে-গাইতে স্নান করার জন্য যাচ্ছিল।

তইনে হীরা সো জনম গঁওয়াইয়ো ভজন বিনু বাওরে।
কদে না আয়ো সাধু সরন মে, কদে না হরিগুন গায়ো।
পচি-পচি মরইয়ো বইল কী নাঈ, সোই রহ ইয়ো উঠি খায়ো।।
ভজন বিনু বাওরে।।

সকাল সকাল এত ভাল ভজন শুনে মনে হয়েছিল যদি সবটা জানা যেত, তাহলে ভাল হত, কিন্তু পরের লাইনগুলি সেই মহিলারা উঁচু-নীচু স্বরে এমনভাবে গাইছিল এবং ভাষাটাও না জানার জন্য তিনি বুঝতে পারছিলেন না। উপর্যুক্ত লাইনগুলিই বুঝতে পেরেছিলেন। এই কটি লাইন প্রায়ই তিনি গুন গুন করে গাইতেন।

মহারাজজী বলতেন-কারও মধ্যে হাজারটা দুর্গুণ থাকলেও, একটা দুটো গুণ অবশ্যই থাকে। সাধক সেই একটা গুণকেই গ্রহণ করে।

সমিটি সমিটি জল ভরহিঁ তলাওয়া।
জিমি সদ্‌গুন সজ্জন পহিঁ আওয়া।। *(মানস, ৪/১৩/৭)*

সদ্‌গুরুর একটা গুণ সাধকেরা কুকুরদের মধ্যেও দেখেছিলেন। কুকুরের অনেক দুর্গুণ; তা সত্ত্বেও একটা গুণ তো দেখা যায়ই কেউ লাঠি ওঠালে পালিয়ে যায়, আবার ডাকলে কাছে চলে আসে। যাঁরা অবধূত তাঁদেরও এইরূপ মান-অপমান রহিত সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। শ্রী পরমহংস মহারাজজীও সাধনাতে সহায়ক গুণগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতেন। বিরহ, বৈরাগ্য ও সাবধান বাণীতে পূর্ণ উপর্যুক্ত ভজনটিকে মহারাজজী নিজের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করেছিলেন।

বিচরণকালে আগ্রা নগরে

মহারাজজী বিচরণ করতে-করতে আগ্রা গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সমস্তদিন যমুনা-নদীর তীর ধরে ভ্রমণ করার পর সন্ধ্যাবেলা শস্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। শ্রেষ্ঠী, মহাজনেরা নিজের-নিজের দোকান বন্ধ করছিল। মহারাজজী কোথাও-কোথাও দু-চারটে শষ্যের দানা পড়ে থাকতে দেখেছিলেন,

তিনি সেগুলো তুলে চিবোচ্ছিলেন। তাঁকে এরূপ করতে দেখে মহাজন এবং বড় ব্যবসায়ীদের মনে উৎকণ্ঠা জেগেছিল। তারা পরস্পর কথাবার্তা বলছিল কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস কেউ জোগাতে পারেনি। তারপরের দিনও তাঁকে এরূপ করতে দেখে মহাজনেরা তাঁর আশে-পাশে এক-এক মুঠো ছোলা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। মহারাজজী কিন্তু সেই ছোলাগুলোর দিকে চেয়েও দেখেননি। মহারাজজী যমুনা নদীর তীরে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন তাঁকে এরূপ করতে দেখে ধীরে-ধীরে সকলেই তাঁর দিকে আকর্ষিত হচ্ছিল। সেখানে থাকার অনুরোধ করে তারা দু'বছর পর্যন্ত অনবরত মহারাজজীর সেবা করেছিল। তিনি সেখানে থাকা কালে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের খুব ভীড় হত। কেউ তাঁকে বস্ত্র আভূষণ দান করত, কেউ সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চাইত কিন্তু মহারাজজী সকলকে সন্তুষ্ট করার পর ভক্তদের দেওয়া জিনিসগুলি দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদের মধ্যেই বিতরিত করে দিতেন। ভক্তদের দানের সামগ্রী, ভক্তিভাব এসব থেকে পৃথক থেকে তিনি নিস্পৃহভাবে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন।

কামিনী কাঞ্চন থেকে নিবৃত্তি

মহারাজজী যে মন্দিরে থাকতেন, সেখানে একটি বিধবা স্ত্রীলোক দানের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে প্রায়ই হাজির হত। আশেপাশের লোকেরা এই মহিলাটিকে পিসিমা বলে ডাকত। ঘন-ঘন যাতায়াত করার ফলে ধীরে-ধীরে তার মনে কুৎসিত ভাব জাগে। একদিন সে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁকে অনেক বেশী ধনরাশির প্রলোভন দিয়ে, কামাতুরা হয়ে তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ করার জন্য উদ্যত হয়ে বলেছিল-'এই ধনরাশি দিয়ে আমরা একসঙ্গে জীবন নির্বাহ করব এবং ভজনা করব।' কিন্তু সাধকদের স্বভাব এত নমনীয় হয় না, যে তা দিশাবিহীন হয়ে যে কোন দিকে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও সাধনাবস্থায় কিছু সংস্কার তো পড়েই। রাত্রিতে মহারাজজী স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর গুরুদেব দু'জন ব্রাহ্মণকে হলুদ বস্ত্র ধারণ করিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন-একে ধরে শুদ্ধ কর, স্ত্রীলোকের সাথে পালিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে তাঁকে স্নান করিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পবিত্র করে আদেশ দিয়েছিলেন-শীঘ্রই এই স্থান ত্যাগ কর, এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। মহারাজজীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এইরূপ বিভিন্ন স্থানে মায়ার প্রবল আক্রমণ থেকে ইষ্টদেব তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

একথা মহারাজজী প্রায়ই সৎসঙ্গের সময় বলতেন-“মায়া কখন অনুকূল এবং কখন প্রতিকূল সাধক তা বুঝতে পারে না। ভগবান অথবা গুরুদেবই প্রেরকের স্থান গ্রহণ করেন, তবেই সাধক রক্ষা পায়। ভগবান এবং মায়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ক্রিয়ারূপে হৃদয়ে স্থান লাভ হলে সদ্‌গুরুই সর্বত্র রক্ষা করেন। এই অবস্থাতে আপনি যেখানেই থাকুন, মনে দ্বন্দ্ব উঠলে তিনিই রক্ষা করবেন।”

কুপাত্রকে দান

একদিন মহারাজজী যমুনা নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। পথে পাঁচ টাকা পড়েছিল। যখনই টাকার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল, আদেশ পেয়েছিলেন-নিয়ে নাও। তিনি ভাবছিলেন, এই টাকা নিয়ে কি করব? কিন্তু আদেশ ছিল সেইজন্য টাকা তুলে মন্দিরে ফিরে এসেছিলেন। তাঁকে ইষ্টদেব আদেশ দিয়েছিলেন যে, এই টাকা দালাল রাধেলালকে দিয়ে দাও। সে তোমার অনেক সেবা করেছে, এখন তার বিপন্ন অবস্থা।

রাধেলাল দালালি করে অনেক ধন উপার্জন করেছিল। সে খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। সরল স্বভাবের ছিল কিন্তু জুয়া খেলার বদঅভ্যাস ছিল। অঙ্গীকার পত্রে “গুব্বা” আরও কত কি অঙ্গীকৃত থাকত। তখনকার দিনে আশি হাজার টাকা দেনা ছিল। তিনি রাধেলালকে বলেছিলেন-“রাধে লাল! দেখ তাকের উপর পাঁচ টাকা আছে, তুমি নিয়ে যাও।” একথা শুনে সে উদাস হয়ে বলেছিল-“গুরুদেব আপনার কৃপাই যথেষ্ট। আপনি কেন আমার জন্য টাকা ছুঁতে গেলেন?” অনেক বলার পরও সে টাকাটা নেয়নি। যেহেতু পূর্বে ধনী ছিল তাই যতই সে ভেঙ্গে পডুক, কিন্তু সাধুর কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার মনোবৃত্তিই হয়নি তার।

মহারাজজী ভাবছিলেন-“ভগবান একে দিতে বলছেন কিন্তু এতো নিচ্ছে না, কি করা যায়? রাধেলাল যাবার পর তার ছেলে এসেছিল, কম বয়স ছিল তার। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন-“তাকের উপর থেকে ফুলগুলো নিয়ে যা, ফেলে দিবি।” সে ফুলগুলো নিয়ে যাবার সময় বলেছিল, “মহারাজজী! এই তাকে পাঁচটা টাকাও আছে। মহারাজজী বলেছিলেন-“আচ্ছা, তাহলে তুই পাঁচটা টাকা পেলি। ঠিক আছে, নিয়ে যা আর কিছু কিনে খেয়ে নিস।” ছেলেমানুষ তাই সে টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

মহারাজজী আগ্রা ছেড়ে চলে যাবার সময় রাধেলালকে বলেছিলেন, “দেখ!

কামিনী-কাঞ্চন থেকে নিবৃত্তি

তুমি দেনা-দেনা করে এত চীৎকার কর, এখন আমি তো চললাম কিন্তু তুমি ধন পেলে কিছু দান-পুণ্য অবশ্য করবে এবং আমাকে স্মরণ করবে।" কালান্তরে মহারাজজী যখন অনুসুইয়াতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিলেন, সন্ধান করতে-করতে রাধেলাল দালাল সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। মহারাজজীকে বলেছিল-"মহারাজজী! আপনি চলে আসার দু'দিন পরেই আমি তিন লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলাম। সেই টাকাতে দেনা শোধ, দান-পুণ্য সব করেছি। আগ্রাতে যত গরীব এবং মেথর ছিল, সকলকে ভোজন, মদ্যপান করিয়ে, তাদের মধ্যে টাকাও বিতরণ করেছি।"

মহারাজজী ধমক দিয়ে উঠেছিলেন-"কেন রে! দান তো সুপাত্রে করতে হয়। দানে মদ খাওয়ানো হয় কি? তুই টাকা দিলে, তাদের কাছে সেটা টিকবে কি? টিকেছে কি? সে বলেছিল-না মহারাজজী! পরের দিনই মদ খেয়ে সে টাকা শেষ করেছে। কিন্তু আমি আবার সঙ্কটে পড়ে গিয়েছি এবং তখন থেকেই আপনার সন্ধান করছিলাম। মহারাজজী বলেছিলেন-"হুঁ বাছা! কুপাত্রে দান করলে, দাতা নষ্ট হয়ে যায়। এখন থেকে জুয়া খেলা বন্ধ করে ভজনা কর, তবেই তোর বিপদ দূর হবে। এই প্রকার আশ্বাস দিয়ে মহারাজজী তাকে বিদায় করেছিলেন।"

পুজ্য মহারাজজী প্রায়ই বলতেন-হো! যেদিন থেকে আপনি অল্প দানও করেন, সেইদিন থেকেই সংসারকে কোন না কোন মাত্রাতে ত্যাগ করেন। দান মুক্তির পথে নিয়ে যায়। দানের প্রকার কয়েকটাই যেমন-স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান, অনুদান ইত্যাদি। সকলের জন্যই অন্ন জীবন কিন্তু আয়ু শেষ হলে অন্ন থাকলেও তা কাজে লাগে না। শেষে বিদ্যাও কাজ দেয় না। শ্রেষ্ঠ দান হল অভয়দান। পরমাত্মাই অভয়সত্তা। সদ্‌গুরুর কৃপাতেই তাঁতে বিলীন হওয়া সম্ভব হয়। এটা সদ্‌গুরুর দান ও শ্রেষ্ঠ দান এটাই। হো! সংসারে তো সকলেই দানী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। '**হাথী স্বান লেওয়া দঈ**।' *(বিনয়০, পদ ৭৫)*-দশ টাকা দান করে পরিবর্তে হাতী কামনা করে। আসল দানী আমি, মোক্ষ প্রদান করি, তার পরিবর্তে কিছু চায় না। '**সোই মহি মণ্ডিত পণ্ডিত দাতা**।' *(মানস, ৭/১২৬/১)*-বাস্তবে সাধুই দানী এবং ভগবান মহাদানী!

'**মাঁগহু বর জোই ভাব মন মহাদানি অনুমানি**।।' *(মানস, ১/১৪৮)*
'**হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী**।।'
(মানস, ৭/৪৬/৫)

এই সংসারে অহৈতুকী কৃপা করেন ভগবান এবং তাঁর অনন্য সেবক। তিনিই মৌলিক দাতা। এই সর্বোৎকৃষ্ট দান পেতে হলে সাধককেও দান করতে হয়-তা হল মন দান, বিচারগুলি দান, ইষ্টের প্রতি কায়মনোবাক্যে সমর্পণ।

শীশ কাটি চরনন ধরে, তব পৈঠে ঘর মাঁহি।

উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায়

উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলার সময় লক্ষ-লক্ষ মহাত্মা একত্রিত হয়েছিলেন। পর্যটন করতে-করতে মহারাজজীও সেখানে পৌঁছেছিলেন। সেখানে বহু মঠাধীশ হাজার-হাজার সাধুদের আমন্ত্রিত করে ভোজন করাচ্ছিলেন। এক নাগা সাধুর সঙ্গে মহারাজজীকেও একটা ভাণ্ডারাতে যেতে হয়েছিল। প্রথমে তো তিনি যেতে চাইছিলেন না কিন্তু সঙ্গে যে নাগা বাবা ছিলেন, তাঁর জন্য যেতে হয়েছিল। সেখানে ভীড়ে বহু লোককে দেখে তিনি বিচার করেছিলেন যে, কে সেই সাধু ব্যক্তি, যে হাজার-হাজার সাধু মহাত্মাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে, আর এক আমি, ভোজন গ্রহণের কামনাতে নিজে থেকেই চলে এলাম। এইরূপ বিচার করতে-করতে তিনি এই নির্ণয়ে পৌঁছেছিলেন যে, ভাণ্ডারা উপেক্ষা করে চলে যাই। একথা মনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ধীরে-ধীরে চলতে চলতে ভাণ্ডারার স্থান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শিপ্রা নদীর তীরে একটা বৃক্ষের ছায়াতে গিয়ে বসেছিলেন। মনে-মনে নির্ণয় করেছিলেন, যদি ভগবান এখানেই ভোজনের ব্যবস্থা করেন, তবেই গ্রহণ করব, অন্যথা নয়। সেখানে তিন দিন অনাহারে ছিলেন। চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে এক মহাত্মা তাঁর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বলেছিলেন-বসে থাকুন, লক্ষ্মী আসছেন। ঠিক তার এক প্রহর পরেই একটি মহিলা হাতে ঘটি নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে কোন অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা প্রেরিত হয়ে মহারাজজী যেখানে বসেছিলেন তার চারপাশের জায়গা পরিষ্কার করে তাঁর ভোজনাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিলাটি সেবা করার উদ্দেশ্যে তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন। তার সেবা করার মনোভাব দেখে মহারাজজী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''ভবানী! এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো? কি চাও? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে আর কেনই বা ফিরে এলে? কি হয়েছে? সে অতি বিনম্রভাবে উত্তর দিয়েছিল, আমি স্নান করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম এঁর সেবা কর, ইনি সাধু। আশ্চর্যে পড়েছিলাম কি সেবা করব? তখন থেকে আমি ভাবছি, কিভাবে আপনার সেবা করব? আমি তো আপনার চরণযুগল দর্শন করেই তৃপ্ত হয়ে গিয়েছি।

এখন আপনার কৃপা কামনা করি। এই ঘটনার পর সেখানে যাঁরা যেতেন তাঁদের সেই ভদ্রমহিলা নিয়মিতভাবে ভোজন করাতেন এবং প্রসাদ বিতরণ করতেন। এই ব্যবস্থা শ্রী মহারাজজীর তরফ থেকে সেই ভদ্রমহিলার মাধ্যমে সম্পাদিত হত।

উপর্যুক্ত ভদ্রমহিলা একজন খ্যাতিপ্রাপ্ত আইনজীবীর ধর্মপত্নী ছিলেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ধন ছিল, যা তিনি মহারাজজীর সেবাতে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। বারবার আগ্রহ করা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত না হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

উজ্জয়িনীতেই কুম্ভের পবিত্র পর্বে পরম্পরা অনুসারে চারটি মঠের শঙ্করাচার্যগণ সাধুবেশধারীদের সন্ন্যাসধর্মে সম্মানিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাদের আহ্বানবাণী শুনে মহারাজজীর মনের মধ্যেও সঙ্কল্প উঠেছিল যে, বহুদিন থেকে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সন্ন্যাস ধর্মে সম্মিলিত হলে ভাল হয়। এই সঙ্কল্প ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ ইষ্টদেব সঙ্কেত দিয়েছিলেন যে, তোমার মত শিষ্য এবং তোমর মত গুরু কোথাও নেই। তুমি কোন্ সঙ্ঘে সম্মিলিত হতে যাচ্ছ? একথা শুনে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। তিনি ইষ্টের কাছে ক্ষমা যাচনা করেছিলেন।

মহারাজজী উপদেশের মাঝে-মাঝে এই ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন যে, সাধককে ইষ্টের অধীন হয়ে রত থাকা উচিৎ। মাঝে-মাঝে অন্তর্জগত থেকে আদেশ দিয়ে ইষ্টদেব স্বতঃ তাকে বিচলিত হতে দেন না।

হিমালয়ের উপত্যকায়

গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মহারাজজী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বলতেন সেই স্থানগুলিতে প্রায়ই কুয়াশা ছেয়ে থাকে। কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর হিমমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ রূপোর মত ঝলমল করে ওঠে। সূর্যোদয়ের সময় পর্বতশৃঙ্গ স্বর্ণ মণ্ডিত বলে মনে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে। পাহাড় কেটে সিঁড়ি তৈরি করে তাতে কৃষিকার্য করা হয়। এক-এক মিটারের ছোট ছোট খেত। শিখর থেকে ঢালু হয়ে নামতে-নামতে তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাকৃতিক ঝরনার সাহায্যে সেচন করা হয়। দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। সেই শীতেও দিগম্বর বেশে থাকতেন, কোথাও ধুনি পেতেন, কোথাও তাও পেতেন না।

ভ্রমণ করতে-করতে মহারাজজী দেবপ্রয়াগে পৌঁছেছিলেন। চারজন সাধু এক জায়গায় বসে গাঁজা তৈরী করেছিলেন। মহারাজজীও তাদের কাছে গিয়েছিলেন। সেই সাধুদের মধ্যে একজন বলেছিলেন-“আসুন বাবাজী! বসুন। গাঁজা খাবেন? মহারাজজী ভেবেছিলেন অনেক ঠান্ডা, দু'টান দিলে হয়ত শরীর কিছুটা গরম হবে, এই ভেবে তিনিও সেই সাধুদের পাশে বসে পড়েছিলেন। গাঁজাতে কোন মাদকদ্রব্য মেশানো ছিল। গাঁজা তৈরি করে একজন সাধু বলেছিলেন-“বাবাজী, নিন। অন্য একজন সাধু গাঁজা খাওয়ার জন্য বেশী ব্যগ্র ছিলেন। তিনি ঝট করে উঠে ছিলিম নিয়ে টান দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথম বার টান দিতেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাধুটি লুটিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।”

তাঁকে লুটিয়ে পড়তে দেখে বাকি তিনজন সাধু পালিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজজীও কোন ভাবনা-চিন্তা না করে তাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করেছিলেন। কিছুক্ষণ ছুটে তিনি বিচার করেছিলেন যে, আমি ছুটছি কেন এবং এরাই বা পালাচ্ছে কেন? তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে সাধুবাবা গাঁজায় টান দিচ্ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। ভয় পাওয়ার কারণ জানতে পেরে তিনি সাধুদের ধমক দিয়ে বলেছিলেন-“থামো! পালাচ্ছ কেন? কি অপরাধ করেছ, সকলেই তো সঙ্গী একে অপরের, নেশা বেশী হওয়ার জন্য সে মারা গেছে। তুমি টান দিলে তোমারও মৃত্যু হত এবং আমি দিলে হয়ত আমারও মৃত্যু হত। কেউ জেনেশুনে তো তাকে মেরে ফেলনি। তাহলে নির্দোষ সাধুদের ভয় কিসের? তাঁর কথা শুনে সাধুরা ফিরে এসেছিলেন। সকলেই বিচার করে থানায় খবর দিয়েছিলেন। থানা থেকে লোক এসেছিল এবং তদন্ত করে দাহ-সংস্কার করা হয়েছিল। সাধুটিকে পাঁচ অঞ্জলি জল মহারাজজীও অর্পিত করেছিলেন। মহারাজজী সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি মৃত্যু উপস্থিত হয়নি, তাহলে বাঘের কাছে থাকলেও সে খেতে পারবে না আর যদি আয়ু ফুরিয়ে গেছে তবে সব জায়গাতে কাল-এর দর্শন হয়। উত্তম ভোজন, উত্তম শয্যা, এমনকি সুরক্ষা ব্যবস্থাও কাল-এর রূপ ধারণ করে। অতএব ঠাকুরকে স্মরণ কর, তবেই তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গী সাধু শান্তি লাভ করবে। অতঃপর মহারাজজী দেরাদুনের পথ ধরেছিলেন।”

উমা জে রাম চরণ রত, বিগত কাম মদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত, কেহি সন করহিঁ বিরোধ।। ***(মানস, ৭/১১২ খ)***

ইষ্ট-এর আদেশের গুরুত্ব

উপর্যুক্ত সাধুদের ছেড়ে পাহাড়ের দুর্গম পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে মহারাজজী একটা জনহীন পথ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, যদি এটাই পথ, তবে কিছুদূর যাওয়ার পর নিশ্চয় কোন লোকালয় চোখে পড়বে, কিন্তু সেটা বনবিভাগের পথ ছিল। গগনচুম্বী বিশাল বৃক্ষের ঘন জঙ্গলে যেখানে-সেখানে হাতীদের বিষ্ঠা পড়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য বহু আগেই লুকিয়ে পড়েছিল। একটা জায়গা একটু খোলামেলা মাঠের মত ছিল সেই মাঠে একটা বিশাল বৃক্ষ দেখে মহারাজজী তার গোড়ায় গিয়ে বসেছিলেন। রাত্রিতে তিনি বৃক্ষমূলে বসে আত্ম-চিন্তন-এ রত হয়েছিলেন। সেই সময় ইষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন-“এখানেই বসে থাকো, তোমার যোগক্ষেম এখানেই পূর্ণ হবে এবং মানুষের কল্যাণের পথ তোমার দ্বারা প্রশস্ত হবে।” অনুভবের সেই শৃঙ্খলাতে তিনি গোটা পরিবেশ প্রকাশে প্রকাশিত দেখেছিলেন।

ইষ্টের কাছ থেকে এই আদেশ পেয়ে তিনি খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, যদি ঈশ্বরের এই ইচ্ছা, তবে ঠিক আছে। বসে-বসেই তিনদিন পার হয়ে গিয়েছিল। নিরন্তর শুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন যে, ‘সব কিছু সেইভাবেই হবে, শুধু বসে থাকো।’ খাওয়ার এবং থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। চতুর্থ দিন ইষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, “আজ এক সৈনিক দুধ নিয়ে আসবে, তুমি কিন্তু তা গ্রহণ করবে না।” তিনি মনে-মনে ভেবেছিলেন যে, যখন ইষ্টের এই আদেশ, তখন দুধ স্পর্শও করব না।

সকাল প্রায় সাতটা-আটটা নাগাদ তিনি এক ব্যক্তিকে তাঁর দিকে আসতে দেখেছিলেন। কাছে এসে সে বলেছিল-“মহারাজজী! এই দুধটুকু পান করুন।” মহারাজজী বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন যে, বড় একটা বাটিতে প্রায় তিন পোয়া মত দুধ নিয়ে সিপাহীটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, “আজ আমি দুধ গ্রহণ করব না, অন্য আর একদিন সেবা কোরো।” সে সমানে অনুনয় বিনয় করছিল, “মহারাজজী! আমি কি এতই অভাগা যে, আপনি আমার নিয়ে আসা দুধ গ্রহণ করবেন না। আমি আপনাকে তরশু, পরশু, কাল এবং আজও দেখছি। আপনি যেদিন থেকে এসেছেন সেদিন থেকে অনাহারে বসে রয়েছেন। এ দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে দুধ নিয়ে এসেছি। আমি এখানে বনরক্ষকের পদে পদস্থাপিত।” তার যা কিছু মনে আসছিল, তাই বলে যাচ্ছিল।

বনরক্ষককে সেখান থেকে সরানোর যত চেষ্টা করছিলেন, তার আগ্রহ ততই বেশী বেড়ে যাচ্ছিল। মহারাজজী নিরন্তর অশুভ সঙ্কেচ পাচ্ছিলেন। মহারাজজী এটাও বললেন যে, ভগবানের আদেশ নেই, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইছিল না। বনরক্ষককে নিরস্ত করার জন্য তিনি দ্রুত বাটিটা তুলে ঈশ্বরের আদেশ অবহেলা করে দুধ পান করেছিলেন।

সিপাহীটি তো চলে গিয়েছিল কিন্তু দুধ পান করার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবান আদেশ দিয়েছিলেন-"ওঠো এখান থেকে, আর এখানে কিছু হবে না। তুমি এখানে থাকতেই পারবে না।" মহারাজজী ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন। পায়ে পড়ে কেঁদেছিলেন, কাতর ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু আংশিকরূপে ইষ্টের অবহেলা করেছিলেন সেইজন্য তার ফলভোগ করতে হয়েছিল। চারদিন ধরে ক্ষুধায় কাতর মহারাজজী অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। তিনি উপদেশের সময় এই ঘটনাটির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন-"সাধনাবস্থায় সাধক অন্তর্জগত থেকে ইষ্টের যা আদেশ পায়, তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা উচিৎ। এরূপ না করলে লক্ষ্য প্রাপ্তিতে ব্যবধান উৎপন্ন হয়। এমনকি যাঁরা ইষ্টের আদেশ অবহেলা করেন, তাদের জয়ন্ত-এর মত কোথাও আশ্রয় জোটে না। সর্বসমর্থ ইষ্টের কৃপাতেই সাধক সাধনা ক্ষেত্রে ক্রমাগত সফলতা লাভ করে।"

মধ্বাপুর গ্রামান্তে চাতুর্মাস্যা

ভ্রমণকালে মহারাজজী কাশী, অযোধ্যা, মুম্বাই, নাসিক, উজ্জয়িনী, হরিদ্বার, গয়া, কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কর্মনাশা ইত্যাদি বিশিষ্ট নদীগুলির তীর তাঁর ভ্রমণের স্থান ছিল। নদীর তীর তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। অযোধ্যাতে থাকাকালে রাত্রিতে বিশ্রাম করতে-করতে বিচার করেছিলেন-যে, বর্ষা ঋতু আগত প্রায়, এই সময় বিচরণ করতে অসুবিধা হয়, অতএব কোথাও চাতুর্মাস্য ব্রত করা উচিৎ। মনে এই সঙ্কল্প করার পর যখন তিনি চিন্তনে বসেছিলেন, অনুভবে দেখেছিলেন-একটা কানন, তার মাঝে একটা পথ এবং এই বাণী শুনেছিলেন, "এদিকে মায়ের ঘর, ওদিকে বাবার ঘর, তার কাছেই একটা বেলগাছ আছে, তার মূলে গিয়ে বসো।"

সমাধি ভঙ্গ হওয়ার পর মহারাজজী বিচার করেছিলেন ভগবানও কত কৌতুকী। আমি মা বাবাকে কত আগেই ত্যাগ করে এসেছি এদিকে ভগবান বলছেন-এদিকে মায়ের ঘর, ওদিকে বাবার ঘর। যাই হোক যেদিকে যাওয়ার সঙ্কেত

পেয়েছিলেন, সেদিকে চলতে শুরু করেছিলেন, হাঁটতে-হাঁটতে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। রাত গভীর হচ্ছিল। মহারাজজী পথচলা বন্ধ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেছিলেন। তিনি পথের একদিকে দেবীর মন্দির এবং তার উল্টোদিকে শিবমন্দির দেখতে পেয়েছিলেন। বিচার করেছিলেন যে, এঁরাই কি তবে মা-বাপ। শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, এটাই সেই স্থান। তাঁর মনে পড়েছিল বেলগাছের কথা তবে তো বেলগাছও থাকা উচিৎ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা গাছও দেখতে পেয়েছিলেন, কাছে গিয়ে দেখেছিলেন, বেলগাছই ছিল। গাছের নীচে বসার সঙ্গে-সঙ্গে শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, চাতুর্মাস্যার স্থান এটাই।

দেবী মন্দিরে একটা পাগল এসেছে, এ খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইজন্য মহিলারা মন্দিরে এলে তাদের সঙ্গে দু'চারজন যুবক লাঠি হাতে আসত, তারা লুচি ও মোহনভোগ তৈরী করে নিয়ে আসত এবং দেবীকে নিবেদন করে ফিরে যেত। মহারাজজীর কারও সঙ্গে কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এক-একটা করে দিন পার হয়ে যাচ্ছিল, ঐদিক দিয়ে ছোট-ছোট ছেলেরা পাঠশালাতে পড়তে যেত, তারাও জানতে পেরেছিল যে, মন্দিরে একটা পাগল এসেছে। সকালবেলা পাঠশালা যাওয়ার সময় অবোধ ছেলেরা তাঁর দিকে ঢিল ছুঁড়ে এগিয়ে যেত। তারা পরস্পর বলাবলি করত—"ঐ দেখ! পাগলটা বসে রয়েছে।"

ষষ্ঠদিন দেবী দর্শন করে এক ভদ্রমহিলা মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল-"ছাতু খাবেন? আপনার কাছে যেতে ভয় হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি আপনি কে? যদি আপনি সাধু, তবে এই ছাতু গ্রহণ করুন।" মহারাজজী তার কথা শুনে ছাতু গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে ষষ্ঠদিন অল্প ছাতু খেয়ে, জলপান করেছিলেন এবং পুনরায় চিন্তনে রত হয়েছিলেন। যে ছেলেরা পাঠশালাতে পড়তে যেত, তারা দিন-দিন উদ্ধত হয়ে উঠছিল। ঢিল ছুঁড়ে মারতে তাদের মজা লাগত। মহারাজজী চুপ করে বসে থাকতেন, সেইজন্য তাদের অনিষ্টের আশঙ্কাও ছিল না। কাছে এসে তারা পাথর ছুঁড়ত। সপ্তম দিন একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছে এসে পাথর ছুঁড়েছিল। পাথরটা মহারাজজীর পিঠে লেগেছিল।

মহারাজজী চিন্তা করেছিলেন, এবার তো এরা নির্ভীক হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের এবং বাঁদরদের স্বভাব এক রকমের হয়। সেইজন্য তিনি উঠে বলেছিলেন-"ধর, ধর পালাতে যেন না পারে।"

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মধ্যে এরকম পরিবর্তন দেখে ছেলেদের দল তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারা চিৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে ঘরে পৌঁছেছিল।

তিনিই চতুর যিনি একমাত্র পরামাত্মার অনুসন্ধানে রত।

চতুরাই চুলেহ পড়ী, ঘূরে পড়া অচার।
তুলসী রাম ভজন বিনু, চারোঁ বরন চমার।।

অর্থাৎ সেই চতুরতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিৎ আচার-বিচার, শিষ্টাচার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিৎ যদি একমাত্র রাম, পরমপ্রভুর ভজনা করা হয় না। ভজনা না করলে চারটি বর্ণই অস্থি-চর্ম মাত্র। শুধুমাত্র দেহের পোষক যে, 'এটা আমার ওটা তোমার।' একমাত্র পরমাত্মার ভক্তিই যথার্থ চতুরতা।

কোন রকমে বলেছিল-"পাগলটা মেরে ফেলল।" পনেরো-কুড়িজন যুবক লাঠি বল্লম নিয়ে ছুটে গিয়েছিল। সব ছেলে পাঠশালা থেকে ফিরেছে কি না, খোঁজ হচ্ছিল। মহারাজজী যেখানে বসেছিলেন সেই জায়গাটি চারদিক থেকে ঘিরে একে অপরকে সাবধান করতে-করতে তারা মহারাজজীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল "দেখ, পালাতে যেন না পারে।"

গ্রামের লোকেরা অনুমান করেছিল যে, পাগল হলে গোলমাল শুনে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যথাস্থানে ধ্যানে রত ছিলেন। গ্রামের লোকেদের মধ্যে কেউ লাঠি সঞ্চালন করছিল, কেউ গালাগাল দিচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, এর তো খুব শান্তভাব দেখছি-উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাদের মধ্যে যেমন দেখা যায়। পাগলদের মধ্যে এরূপ শান্তভাব দেখা যায় না। আগে জেনে নেওয়া যাক। পদারথ কাকাকে ডাক।

ঠাকুর রাম পদারথ সিংহ মধবাপুরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সৎসঙ্গী এবং সাধুসেবী ছিলেন। কবীরের বাণী তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সব মহাপুরুষদেরই সেবা করতেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই একটি দোহা গেয়ে উঠেছিলেন।

একবার হরি ঘোড়া ভয়ে, ব্রহ্মা ভয়ে লগাম।
চাঁদ সূরজ রবিকা ভয়ে, চড়্হি গয়ে চতুর সুজান।।

দোহাটি গেয়ে তিনি প্রণাম করেছিলেন। আশীর্বাদের মুদ্রাতে মহারাজজী হাত তুলেছিলেন। তিনি মহারাজজীর কাছে দোহার অর্থ জানতে চেয়েছিলেন। মহারাজজী হেসে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, হরিই সর্বস্ব হরণ করেন। তিনি যখন মনের মধ্যে প্রবাহিত হন তখন হরি দ্বারা প্রেরিত এবং পূরিত মনকেই অশ্ব বলা হয়। হরির বিরহে, হরির সঙ্গে সংযুক্ত মনই অশ্ব হয়ে চরাচর জগতে ছুটে বেড়ায়, অসংখ্য যোনিতে এই মনই ভ্রমণ করে, এই মনই অশ্ব। মন হরির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উচ্চভূমিতে বিচরণ করার যোগ্যতা লাভ করে। **ব্রহ্মা ভয়ে লগাম**-এই বুদ্ধিই ব্রহ্মা। **'অহংকার সিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।' (মানস, ৬।১৫ ক)**-এই বুদ্ধি সাধারণ নয়, ইষ্টময়ী বুদ্ধিই লাগামের কাজ করে। এইরূপ বুদ্ধি দ্বারাই এই অশ্বরূপ মনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। **চাঁদ সূরজ রবিকা ভয়ে**-চন্দ্র অর্থাৎ ইঙ্গলা (ঈড়া), সূর্য অর্থাৎ পিঙ্গলা। নাড়ী অর্থাৎ নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস, বাম এবং ডান দুটি স্বর-এই দুটি শ্বাসই অশ্বের দুদিকে ঝোলানো দুটি পাদানি। নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এর যজন দ্বারা এই পাদানি দুটিতে পা দিয়ে চতুর ব্যক্তিগণ মনের নিরোধ করেছেন অর্থাৎ অশ্বারোহণ করেছেন।

এতটা শোনার পর তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়েছিল। তিনি মহারাজজীর চরণে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের উপর খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন, ইনি উচ্চকোটির সাধু। তোমাদের লজ্জা করে না। সাতদিন ধরে এই সিদ্ধ মহাপুরুষ অভুক্ত অবস্থায় আছেন। গোটা গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এখনই এঁর সেবার ব্যবস্থা কর। আগে আমাকে অন্ততঃ একটা খবর দিতে। সকলেই নিজের-নিজের ঘরে ছুটে গিয়েছিল। কেউ দুধ, কেউ দই, কেউ অন্য কোন সামগ্রী নিয়ে আসছিল। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, দেখতে-দেখতে ভক্তিধারা সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। মহারাজজী যেখানে ছিলেন সে স্থান পরিষ্কার করা হয়েছিল। গোটা গ্রাম তাঁর সেবাতে নিযুক্ত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। মহারাজজী বেলগাছের তলায় বসেছিলেন, গ্রামের লোকেরা তাঁকে মন্দিরে যেতে অনুরোধ করেছিল; কিন্তু তিনি বারণ করে বলেছিলেন, না, এখানেই ঠিক আছে। সকলে

মিলে ঠিক করেছিল যে, মহারাজজীর জন্য কুটীর তৈরী করা কাল সকালের প্রথম কাজ হবে কাল অন্য কোন কাজ করব না। সকালে মহারাজজী দেখেছিলেন যে, সকলেই লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। যদিও আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নিজেরাই ঠিক করেছিল যে, সকালে কুটীর নির্মাণ করা হবে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। সকলেই লাঙ্গল নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল তারপর লাঙ্গল রেখে মহারাজজীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। মহারাজজী বলেছিলেন-যাও চাষ কর! কেন এলে? কিছু করার প্রয়োজন নেই, দূর হও এখান থেকে। তিনি ভর্ৎসনা করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা কুটীর নির্মাণের কাজে লেগে পড়েছিল। তিনদিন ধরে কম বেশী বেগে অনবরত বৃষ্টি পড়েছিল কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই কুটীর তৈরী করে ফেলেছিল এবং কুটীরটি সুসজ্জিত করে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। মহারাজজী কুটীরে ধুনি জ্বালিয়ে চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ করেছিলেন।

পুনর্জন্ম

মধ্বাপুরে মহারাজজী নির্জনে পায়চারি করতেন। মনকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দেখার কাজে নিযুক্ত করে হাঁটতে শুরু করতেন। একটা ঘরের পাশ দিয়ে তিনি যখনই যেতেন, সেই ঘরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন, কিছুদিন এইভাবেই কেটেছিল। মহারাজজী মনে ভেবে দেখেছিলেন যে, এই ঘরটি আমি পূর্বেও কখনও দেখেছি কি? এই ঘরের প্রতি এত আকর্ষণ কেন? ইষ্টদেব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্বজন্মে এই ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলে। জন্মের পর মাত্র আড়াই মাস জীবিত ছিলে। সেই সংস্কার থেকে এখনও মুক্ত হও নি। ‘‘তিনি যখন সেই ঘরের সদস্যদের কাছে এই সমস্ত কথা জানতে চেয়েছিলেন, তখন সেখানে পরিবারের সকলেই একত্রিত হয়েছিল। তারা বলেছিল-‘‘মহারাজজী! খুবই প্রাণবন্ত ছেলে ছিল। তারপর আর কোন সন্তান হয়নি।’’ পঁচাশী বছরের বৃদ্ধা (মাতা ঠাকুরানী) মাও সেখানে পৌঁছে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। মহারাজজী উপদেশ চলাকালে বলতেন-হো! না জানি এই জীব কত জননীকে কাঁদিয়েছে। আত্মীয়তা প্রসারিত করেছে। কত যোনি ভ্রমণ করার পর মনুষ্য দেহ লাভ হয়েছে। এই মনুষ্যজীবন সার্থক করা উচিৎ।

বিমূঢ়াঃ নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। *(গীতা ১৫/১০)*

এই আত্মাকে কেবল জ্ঞানীগণ জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা জানতে পারেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ জানতে পারে না। হো ! কয়েক জন্মের বিবরণ ভগবান আমাকে দিয়েছেন; কিন্তু বিশ্বাস হয় কি ? বিশ্বাস তখনই হয়, যখন আমরা নিজেরা দেখতে সমর্থ হই।

বিল্ব ফলরক্ষা

মধ্বাপুরে মহারাজজীর নিবাসস্থানের সমীপে যে বেলগাছটি ছিল, সেই (বর্তমানেও আছে) গাছটির ফল খুবই সুমিষ্ট হওয়ার জন্য পোকা লেগে যেত এবং ফলগুলি মাটিতে পড়ে যেত। গ্রামবাসীরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ পারায়ণের আয়োজন করেছিল। বিশাল জনসমূহ নিজের কল্যাণের জন্য এই ধার্মিক আয়োজনে উপস্থিত হয়েছিল। কার্যক্রম নিরীক্ষণ করে মহারাজজী প্রশান্ত মুদ্রাতে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা আড়াই-তিন কিলোগ্রামের বিল্বফল তাঁর মাথার উপর পড়েছিল। ফলে মহারাজজী তাঁর মাথাটি ধরে অনেকক্ষণ বসেই ছিলেন। তারপর উপস্থিত বিশাল জনসমূহের মাঝে ঘোষণা করেছিলেন যে, আজ থেকে এই গাছের একটা ফলেও পোকা লাগবে না। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের দীর্ঘ অবধি পার হয়ে গেছে কিন্তু একটা ফলও পোকা লেগে মাটিতে পড়েনি। বর্তমানে মধ্বাপুর গ্রামে সেই গাছটির ফলগুলি প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয়।

মরণাসন্নকে জীবনদান

অনুকূল পরিবেশ এবং গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধে মহারাজজী কিছুদিন পর্যন্ত মধ্বাপুরে বাস করেছিলেন। সেখানে নিরীহ স্বভাবের একজন বনরক্ষক সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল। সৎপুরুষদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মহারাজজীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি চাতুর্মাস্যার জন্য পর্যাপ্ত কাঠের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং মাঝে-মাঝে নিজেও গিয়ে যথাসাধ্য সেবা করতেন। দৈব বিড়ম্বনার ফলস্বরূপ সেই বনরক্ষক একবার বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। মহারাজজীর কাছেও এ খবর পৌঁছেছিল। কিছু লোক তাঁকে গিয়ে বলেছিল-"মহারাজজী ! বনরক্ষক মিশ্রজী যিনি মাঝে-মাঝে এসে আপনার সেবা করতেন, তিনি মৃত প্রায় অবস্থাতে পড়ে রয়েছেন। বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তাঁকে গরু দান করাও হয়ে গেছে। বলা যায় না কখনও শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।" মহারাজজী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলেছিলেন-"মরবার-বাঁচবার জন্য গোটা সংসার পড়ে রয়েছে, তাহলে সাধু সেবা করে কি লাভ ? যদি তার মৃত্যু হবেই, তবে ভগবান

তাকে দিয়ে আমার সেবা করালেন কেন? সত্যিই কি সে মারা গিয়েছে; মহারাজজী বিভূতি নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে বললেন। তখন কারও সেই মহিমার্ণবের কথাতে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু সকালবেলা যখন মিশ্রজী গরুর গাড়ীতে এসেছিলেন, তখন সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছিল। মিশ্রজী এসেই বলেছিলেন-আপনার দেওয়া বিভূতি খাওয়ার পর থেকেই আমি সুস্থ বোধ করতে থাকি। আমি মাটি থেকে উঠে খাটে শুয়ে পড়েছিলাম তারপরই দেখি আপনি খাটে বসে রয়েছেন এবং আমার বুকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলছেন-ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এসে গেছি, তুমি মরবে না।" আপনি সারারাত সেখানেই ছিলেন, ভোরবেলা কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহারাজজী! আপনি কখন এলেন?

মিশ্রজীর আশাতীত স্বাস্থ্যোদ্ধার দেখে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের মহারাজজীর প্রতি বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। মিশ্রজী পূর্ববৎ সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভগবৎকৃপার অতুলনীয় দান ছিল এটা। যাঁরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা আজও জীবিত। পূজ্য পরমহংসজীকে শ্রদ্ধা করেন।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহারাজজী

মধ্বাপুরে জন্ম-মৃত্যুর বহু ঘটনা ঘটেছিল। রাত্রি দশটার সময় কীর্তন চলাকালীন একবার মহারাজজী বলেছিলেন-"কীর্তন বন্ধ কর।" ভক্তরা জিজ্ঞাসা করেছিল-"কেন মহারাজজী?" তিনি বলেছিলেন-"মনে হচ্ছে ব্যাকুল হয়ে কেউ এখানেই আসছে, তার কাজ হবে না।"

সকলে বলে উঠেছিল-"মহারাজজী! এত রাত্রে কে আর আসবে?" ততক্ষণে জঙ্গলের ভিতর একটা লালটেনের আলো দেখা গিয়েছিল। মনকাপুর স্টেট থেকে ছ'জন লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল যে, তার ছেলে লক্ষ্ণৌতে পড়াশোনা করে। এখন সে হাসপাতালে ভর্তি। বিকেলবেলা টেলিগ্রাম পেয়ে ভাবলাম আপনার দর্শন করে নিই।

মহারাজজী বলেছিলেন-"দেখ! আমি একটু আগেই এদের বলছিলাম যে, কাজ হবে না। তোমরা শীঘ্রই সেখানে যাও, তাহলে অসুবিধা হবে না।"

তারা লক্ষ্ণৌতে পৌঁছাবার আগেই ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু পার্থিব দেহ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। মহারাজজী আগে থেকেই সব কথা জানতে পারতেন।

মরণাপন্নকে জীবনদান

কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন মনে করতেন, ততটুকুই বলতেন। প্রত্যেক মহাপুরুষের স্বভাব এইরূপ। '**জানতহুঁ পূছিঅ কস স্বামী।**' ***(মানস, ৩/৮/৭)***-ভগবান রাম জেনেও না জানার ভান করতেন।

সাধুকৃপাতে পরমার্থ-পথ

ভজনের সুবিধা এবং শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণের জন্য মহারাজজী পরিভ্রমণকালে মধ্বাপুরে দু'বার গিয়েছিলেন। রাত্রি প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ভক্তরা তাঁর কাছে বসে থাকত। মহারাজজীকে গাঁজা তৈরী করে দিত। ভক্তদের মধ্যে একজন গরীব ব্যাধও ছিল, যে ক্ষত্রিয়দের ভয়ে দূরে বসে থাকত। একবার ভক্তদের যাবার পর সেই ব্যাধ মহারাজজীর কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করে যে, "আমি খুব ভাল মদ তৈরী করেছি, দয়া করে সেবন করুন।" মহারাজজী তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে, এই পানীয় তোমাদের জন্য, সাধু-মহাত্মাদের এরূপ বলা শোভনীয় নয়।" সেই ব্যাধ সমানে আগ্রহ প্রকাশ করছিল, মহারাজজী তার দুরাগ্রহ দেখে এই বলে মদ সেবন করেছিলেন যে, "পাপ-দোষের ভাগী তুমি হবে।" পরদিন সকালে তিনি সূচনা পেয়েছিলেন যে, সেই ব্যাধের পেটে খুব ব্যথা শুরু হয়েছে। যখন ভক্তরা কয়েকবারই পেট ব্যথার চর্চা করেছিল তখন তিনি বলে উঠেছিলেন রাত্রে সে মদ খাওয়ানোর জন্য অনুরোধ করছিল, সেই পাপের জন্য ব্যথা অসাধ্য না হয়ে যায়। ব্যাধটি মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থাতেই তাকে মহারাজজীর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাকে স্পর্শ করে মহারাজজী বিভূতি খাওয়াবার আদেশ দিয়েছিলেন। বিভূতি খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পর সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল তারপর চিরদিনের জন্য মদ ত্যাগ করে সাধু হয়ে গিয়েছিল। তার জীবনে এই বিলক্ষণ পরিবর্তন দেখে গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল, তাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, '**সঠ সুধরহি সতসঙ্গতি পাঈ। পারস পরসি কুধাত সুহাঈ।।**' ***(মানস, ১/২/৯)*** এর আদর্শ দৃষ্টান্ত সত্য। এইরূপ সহজ দয়ালু মহাত্মা কেউ দুরাগ্রহ করলেও তার কল্যাণ করেন। '**জিমি কুঠার চন্দন আচরনী।**' ***(মানস, ৭/৩৬/৭)*** এর মতই তার পথ প্রশস্ত হয়। সেই ব্যাধের জীবনেও এইরূপ বিস্ময়জনক পরিবর্তন হয়েছিল।

কণ্ঠমালা

মধ্বাপুর থেকে চলে যাওয়ার পর মহারাজজীর গলগণ্ড হয়েছিল। পুঁজে ভর্তি ছোট ছোট ফোড়া গলার চারদিকে হয়েছিল। অল্প-অল্প দুর্গন্ধও পাচ্ছিলেন।

ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-কোন পাপ করিনি, তবে এই ব্যাধি কেন হয়েছে। ভগবান বলেছিলেন-“আর কখনও মদ সেবন করবে?” পরে তিনি আমাদের বলেছিলেন-“হো! সেই শ্রদ্ধালু সেবককেও দণ্ড দিয়েছিলেন আর আমাকেও দিয়েছিলেন। সাধকের পক্ষে সুরাপান উচিৎ নয়, সুরাপানে চেতনা লুপ্ত হয় এবং ভজনার ক্রম রুদ্ধ হয়।” কিন্তু যখন অনুসুইয়াতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তারপর আর তাঁর জন্য বিধি-নিষেধ বলে কিছু ছিল না। কারণ নিবৃত্তির পর মহাপুরুষগণ কর্ম করলেও কিছু লাভ হয় না আবার কর্ম ত্যাগ করলেও কোন লোকসান হয় না।” গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন, “অর্জুন! যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন, যিনি আত্মসন্তুষ্ট, ওতপ্রোত এবং স্থিত, সেই যোগী কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলে কোন লোকসানও হয় না।”

প্রায়ই মহারাজজী সাধকদের বলতেন, “আমার জন্য বিধি-নিষেধ বলে আর কিছু নেই। তোমরা সাধক। সাধনাবস্থায় প্রত্যেকটি শীলের পালন আবশ্যক। গৃহস্থদের বলতেন, সংসারের দায়িত্ব পালন করে ভজনা কর। যদি তাতে ভুল হয়েও থাকে ভগবান ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু গৃহত্যাগী সাধুদের ভগবান কখনও ক্ষমা করেন না, তাদের নারদের মত কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।”

জন কোলাহলের মাঝে ধ্যানস্থ

মধ্বাপুরে থাকাকালীন একবার তাঁর জন্মভূমি যাবার অভিলাষা হয়েছিল। কিন্তু যাবার জন্য মনস্থ করতেই অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন যে, জন্মভূমি গেলে ক্ষতি হবে। মহারাজজী জন্মভূমি যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে পশ্চিম দিশাতে ভ্রমণ করতে করতে মুম্বাইতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মুম্বাই-এর মত ব্যস্ত এবং কোলাহলপূর্ণ শহরে মহারাজজীর স্থিতি প্রায় পাগলের মতই ছিল। তিনি তিনদিন ধরে নিরাহারে ছিলেন। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি একটি ময়রার দোকানের কাছে গিয়েছিলেন। জিলিপি দেখে মনে খাবার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। টাকা পয়সা স্পর্শ করতেন না, সেইজন্য সঙ্গে টাকা ছিল না। ভিক্ষা করা বারণ ছিল, এদিকে জিলিপির জন্য মন প্রবল হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল জিলিপির থালা তুলে নিয়ে যাই। বিচার করেছিলেন যে, এ কাজ মহাপুরুষদের নয়। অতএব তিনি মনকে বুঝিয়ে বলেছিলেন-মন, তুমি তো ভজনা করার জন্য এসেছিলে, মাঝে জিলিপির চিন্তা কোথা হতে এল? জিলিপির

মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে যে, জিলিপির জন্য ব্যস্ত হচ্ছ। আজ খিদেয় আছ তো কি হয়েছে? ভোজনের ব্যবস্থা তো ভগবান করেন। যখন তিনি বুঝবেন খাওয়াবেন, তুমি শুধু-শুধু কেন চিন্তা করছ।

এইরূপ নিজের মনকে বুঝিয়ে তিনি পথের ধারে কোলাহলের মাঝে বসেই ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। নির্জন পরিবেশে মন যেমন স্থির হত, সেখানেও সেইরকম স্থির হয়ে গিয়েছিল। সাধক যখন বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে একাগ্র করতে সক্ষম হন এবং আরাধনা প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকার ক্ষমতা লাভ করেন, এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি যে কোন স্থানে ধ্যানস্থ হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেন। জগৎ ভুলে তিনি সারাদিন ধ্যানে লীন ছিলেন। ক্রমে তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

এক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মহারাজজীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে ডেকে বলেছিল-‘‘সন্তজী!’’ মহারাজজী-‘‘গুন্ন’’ মত একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন যেহেতু তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। পরের বার সে জোরে ডেকেছিল। তখন তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে কেউ সন্তজী বলে ডাকছে। মহারাজজী ভেবেছিলেন ভগবান ডাকছেন বোধহয়। সেই ব্যক্তিটি আবার যখন ডেকেছিল তখন তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন একজন ভক্ত ব্যঞ্জনে পূর্ণ থালা হাতে দাঁড়িয়ে নিবেদন করছে-‘‘মহারাজজী ভোজন গ্রহণ করুন।’’ সেই ব্যক্তিটি মহারাজজীকে ভোজন করানোর পর হাত ধুইয়ে, জলপান করিয়ে সাদর প্রণাম করে চলে গিয়েছিল। ততক্ষণে ভীড় তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, কোন রকমে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে নির্জন স্থানের খোঁজে স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

নারকেল খাওয়ার ইচ্ছা

সমুদ্রের তটে একজন নারকেল বিক্রি করছিল। সে নারকেলের টুকরোগুলি একটার পর একটা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিল। মহারাজজীর মনে এক টুকরো নারকেল খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। মহারাজজী মনকে বুঝিয়ে বলেছিলেন-যা দেখবে, তাই খাবার জন্য ভজনা ছেড়ে ছুটে যাবে কি? এই ভাবে মনকে বুঝিয়ে তিনি কিছুদূর গিয়ে একটা গাছের তলায় বসেছিলেন। হঠাৎ একটুকরো নারকেল উপর থেকে তাঁর সম্মুখে পতিত হয়েছিল উপরে তাকিয়ে দেখেছিলেন একটা কাক গাছটিতে বসে রয়েছে। সেই নিয়ে এসেছিল, কিন্তু খাবার চেষ্টাতে চঞ্চু পুট ফাঁক করতেই সেটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। মহারাজজী সেটা তুলতেই শুভ সঙ্কেত

পেয়েছিলেন। তিনি নারকেল খেয়ে, নারকেল খাবার ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। যোগের পরাকাষ্ঠাতে মনে কোন ইচ্ছা জাগার সঙ্গে-সঙ্গে তা পূরণ হয়।

জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ।। হরিপ্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।

(মানস, ৭/১১৩/৪)

দুধ ভিক্ষাতে মৎস্যপ্রাপ্তি

একদিন খুব সকালে মহারাজজী মুম্বাই-এর গলি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনও লোকের আসা-যাওয়া, কলরব শুরু হয়নি। মুম্বাইবাসীদের ঘুম তখনও ভাঙ্গেনি। এক মহিলা দোতলা বাড়ি থেকে কয়েকটা পরোটা ছুঁড়তে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। মহারাজজীকে দেখতে পেয়ে সে তার মত পরিবর্তন করেছিল, তাঁকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল-"ও বাবাজী! পরোটা নেবেন? তিনি ভেবেছিলেন না চাইতেই দিচ্ছে, এটা তো দুধ ভিক্ষা, তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহিলাটি তাড়াতাড়ি নীচে এসে তাঁর হাতে পরোটাগুলি দিয়েছিল। চারটে মসৃণ পরোটার সঙ্গে কচুর তরকারি।"

হাঁটতে-হাঁটতে মহারাজজী এক গ্রাস মুখে তুলতেই মাছের স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি বিচার করেছিলেন যে, সাধুদের মাছ, মাংস, মদ খাওয়া উচিৎ নয়। না চাইতেই দিয়েছে। না চাইতেই যদি দেয়, তবে সেটা ফেলে দেওয়া উচিৎ নয়। আমি তো চাইনি। ভগবান কেন পাইয়ে দিলেন? খাবো কি ফেলে দিই। কখনও মনে হচ্ছিল ফেলে দিই, আবার মনে হচ্ছিল না চাইতেই দিয়েছে, দুধ ভিক্ষা এটা। তাঁর মনে হচ্ছিল ভগবান যেন রাগ করেছেন। কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন না। মহারাজজী শুভ, অশুভ কোন সঙ্কেতই পাচ্ছিলেন না। এই মানসিক দ্বন্দ্বে তিনি কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। গ্রাস মুখেই ছিল। শেষে থাকতে না পেরে সবটা ফেলে দিয়েছিলেন। একটা কলের কাছে গিয়ে মুখ কুলকুচো করেছিলেন। কাছেই একটা পান দোকান ছিল। দোকানদার তাঁকে দেখে পান নিয়ে ছুটে এসে বলেছিল-"সন্তজী নিন! মুখশুদ্ধি, পান খেয়ে যান। মহারাজজী পান খেয়ে আশীর্বাদ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন।"

মহারাজজীর মনে পড়েছিল যে, যখন তিনি ট্রেনে মুম্বাই আসছিলেন, তখন তাঁর পাশে বসে একজন যাত্রী মাছ ভাজা খাচ্ছিল। তিনি ব্যক্তিটির মাছ খাওয়ার উল্টো ধরন দেখছিলেন। মাছ এইভাবে খাওয়া উচিত। ওভাবে নয়, এইসব চিন্তা করছিলেন।

ভগবান দেখলেন ভজনা ছেড়ে মাছের চিন্তা করছে তখন মাছের পুর দেওয়া পরোটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তারপর মাছের প্রতি তাঁর মনে বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করেছিলেন ও গ্রাস ফেলে দেওয়া মাত্র মুখ শুদ্ধির ব্যবস্থা করে তাঁর সমর্থন করেছিলেন। পুনরায় ভগবান সঙ্কেত, আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন।

জঙ্গলের ভিতর সাহায্য লাভ

মহারাজজী হাঁটতে হাঁটতেই মুম্বাই-এর বাইরে চলে এসেছিলেন। রেল লাইনের ধারে-ধারে হাঁটছিলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। গ্রাম, লোকজন কিছুই চোখে পড়ছিল না। তিনি মনকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দেখার কাজে নিযুক্ত করে আপন মনে ধীরে-ধীরে হাঁটছিলেন। হাঁটতে-হাঁটতে তিনি খট-খট শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল যেন কোন মালগাড়ী আসছে। তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যেমনি গার্ডের কামরা তাঁর কাছে এসেছিল, গাড়ীটি থামিয়ে গার্ড তাঁকে ডেকেছিল। মহারাজজী তার কামরাতে চেপেছিলেন গার্ডের সঙ্কেতে গাড়ী আবার চলতে শুরু করেছিল। গার্ডটি টিফিন বাক্স থেকে খাবার বার করে তাঁকে খুব যত্ন করে খাইয়েছিল। কাটনী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে যেখানে তিনি নামতে চেয়েছিলেন, সে সেই জঙ্গলেই গাড়ী থামিয়েছিল। তিনি গাড়ী থেকে নেমে প্রস্থান করেছিলেন। এইপ্রকার ভগবানই প্রেরিত করে নিজের ভক্তদের সুবিধা করে দেন, অন্যথা জঙ্গলে কেউ কেন গাড়ী থামাবে, কারণ জঙ্গলেই বেশী গাড়ী লুট হয়।

জন্মভূমির পথে

মধ্বাপুরে থাকাকালীন মহারাজজীর কৃপার ফলস্বরূপ বহু ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে জীবন ফিরে পেয়েছিল। বেল বৃক্ষটিতে যখন থেকে ফল ধরতে শুরু করেছিল ফলগুলি বেশী পেকে যাওয়ার জন্য পোকা লেগে যেত। এখন আর লাগে না। সিদ্ধাই-এর নানারূপ দেখার পর মহারাজজী বিচার করেছিলেন-আগে গ্রামের লোকজন বলাবলি করত যে, ইনি রোগী, সাধু নন। এঁর টিবি হয়েছে শুধু সময় ফুরানোর অপেক্ষা। একবার গ্রামে গিয়ে মুখ দেখিয়ে আসি যে, আমি সাধু, রোগী নই। শুধু মুখ দেখিয়ে আসব, থাকব না। এই সমস্ত যেই না ভাবা, অমনি অশুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন। ভগবান বলেছিলেন-ভুলেও যেও না, কিন্তু প্রত্যেকদিন মন ঘরে যাওয়ার কথা চিন্তা করত। যখনই যাওয়ার ইচ্ছা হত, ভগবান বারণ করে দিতেন। একমাস পর্যন্ত ভগবান নিষেধ করেছিলেন। এদিকে মন যাওয়ার জন্য

তৈরী হয়েছিল। পুরোনো ঘরের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছিল। একদিন এক ভক্ত চামর দান করেছিল। মহারাজজী ভেবেছিলেন এটা গুরু মহারাজজীকে দিয়ে দেব। গুরু মহারাজের দর্শনও করা হবে এবং গ্রামবাসীরাও দেখতে পাবে যে, ইনি সাধু, রোগী নন। এই সব ভেবে মহারাজজী উঠে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

ভিতর থেকে নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও মহারাজজী রওনা দিয়েছিলেন। ট্রেনে ওঠা, বসা এবং ট্রেন চলতে শুরু করা পর্যন্ত সমানে বারণ করেছিলেন। গাড়ী রামকোলা স্টেশনে পৌঁছেছিল। যেমনি ট্রেন থেমেছিল শুনতে পেয়েছিলেন-এসে গিয়েছ কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নামবে না। নামলে সব রকমের দুর্দশা তোমার হবে। মহারাজজী বলেছিলেন-ঠিক আছে ভগবন! নীচে পা রাখব না। জানালার সিক ধরে ঝুলে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে দেখেছিলেন যে, কেউ তো দেখুক যে, ঐ দেখ বাবাজী। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা। গ্রামের স্টেশন। কিন্তু তাঁর গ্রামের একটা লোক সেখানে ছিল না। অনেক লোক ছিল কিন্তু গ্রামের কাউকে সেখানে দেখতে পাননি যে তাঁকে চিনতে পারবে। মহারাজও কোন পরিচিতকে দেখতে পাননি, যে ডেকে বলবেন-কি ভাই, কেমন আছ? প্রায় কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ট্রেনটি সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সিগন্যাল ডাউন হওয়ার পর ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন খটর খুঁ-খটর খুঁ শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে মহারাজজী ভেবেছিলেন এই গাড়ীতে অন্য কোথাও তো আমার যাওয়ার নেই। এখানেই নেমে যাই। তারপর গ্রামের বাইরে-বাইরে হেঁটে গ্রাম থেকে দূরে চলে যাব। গ্রামে ঢুকব না। চলে যাওয়ার পথে কারও সঙ্গে দেখা হলে সে গ্রামের লোকেদের বলে দেবে যে, মহারাজজী সাধু, রোগী নন, পাগল নন, ব্যস।

মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করে তিনি চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলেন। মহারাজজী এই প্রসঙ্গে বলতেন যে, হো! আঘাতও লেগেছিল। ট্রেন চলে গিয়েছিল এবং আমি নেমে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানেই আমার দেহ-এর ভিতর থেকে আমার একটি প্রতিমূর্তি বেরিয়েছিল। সেই প্রতিমূর্তি হাত দিয়ে ইশারা করেছিল যে, 'বাড়ি যাও। তোমার দ্বারা ভজনা হবে না।' তারপর প্রতি মূর্তিটি শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। এই দেখে মহারাজজী খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পুনরায় একটি প্রতিমূর্তি বেরিয়েছিল এবং বলেছিল-ঐ দেখ বাড়ি। গাছগুলির আড়ালে, দেখছ কি, চলে যাও, ঘরে যাও। তোমার দ্বারা সাধু হওয়া সম্ভব নয়। তোমার মধ্যে সাধু হওয়ার

লক্ষণ নেই। এ কথা শুনে মহারাজজী কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তৃতীয়বার আর একটি আকৃতি বেরিয়ে বলেছিল- কান্নাকাটি করলেও কিছু লাভ হবে না। যাও এখান থেকে। তুমি আর কখনও সাধু হতে পারবে না। চলে যাও। ঐ দেখ বাড়ি। মহারাজজী বিচার করে দেখেছিলেন যে, রেল লাইনের এপারে রামকোলা গ্রামের জমি এবং ওপারে অন্য গ্রামের জমি। এটা গ্রামের জমির ছোঁয়া নয় তো। তিনি ভাবামাত্র লাফ দিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তবুও যতরকমের কুলক্ষণই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি যেদিকে মুখ করে এসব কথা ভাবছিলেন, সেইদিকেই হাঁটতে শুরু করেছিলেন। মাইলের পর মাইল হাঁটার পরও অমঙ্গলজনক স্থিতি থেকে বেরতে পারেননি। তখন মহারাজজী দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। কান্না আর কিছুতেই থামতে চাইছিল না। রাত্রি এগারোটা বেজে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি বিকেল চারটের। তিনি চারটের থেকে সমানে কেঁদেছিলেন। ভগবানও চুপ করেছিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলছিলেন না। যেন কখনও সঙ্গে ছিলেনই না। মহারাজজী ভেবেছিলেন, এখন কোথা যাই? কোথাও যাওয়ার নির্দেশ পাচ্ছিলেন না। তখন তো বলছিলেন-যাও এখান থেকে, এখন তো তাও না। সাধনাবস্থার শুরুতে যে কুটীরে বসে সাধনা করতেন কাঁদতে-কাঁদতে রাত্রি এগারোটার সময় গ্রামের সেই কুটীরে পৌঁছেছিলেন।

পূজ্য মহারাজজী যখন সেই কুটীরে সাধনা করতেন তখন সেখানে একটা কালো কুকুরও থাকত। কোইরা নাম ছিল তার। চোখ দুটির রং বাদামী ছিল। কুটীর ছেড়ে সকলেই চলে গিয়েছিল। কুটীরটি পরিত্যক্ত অবস্থাতে পড়েছিল, কিন্তু কুকুরটি সেখানেই পড়ে থাকত। এখানে-ওখানে কিছু খেয়ে কুটীরের কাছে চলে যেত এবং রাতদিন সেখানেই থাকত। মহারাজজীকে দেখেই সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। পায়ে খুব করে লুটিয়ে সে গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। যে-যে ভক্ত মহারাজের কাছে আসতেন সে তাদের খাটের উপর লাফিয়ে উঠেছিল। কুঁ-কু করে সে তাদের কাপড় ধরে টানতে শুরু করেছিল। তারপর কুটীরের দিকে ছুট দিয়েছিল। সেখানে মহারাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ে উঠে আবার গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। এবং পাঁচজনকে ঘুম থেকে তুলেছিল। লোকগুলি পরস্পর বলাবলি করছিল যে, আজ কোইরা খুবই প্রসন্ন বোধহয় সন্তজী এসেছেন। তারা কৌতূহলবশতঃ এসে দেখেছিল যে, মহারাজজী বসে-বসে কাঁদছেন। তারা মহারাজজীকে বলেছিল-মহারাজ! সাধু তো হয়েই গিয়েছেন এখন কেঁদে কি হবে? মহারাজজী চুপ করেছিলেন। কয়েকটা দিন পার হয়ে গিয়েছিল। এই কটা দিন তিনি শুধু কেঁদেছিলেন। লোকে ব্যঙ্গ করতে শুরু

করেছিল যে, সাধু হয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল অর্থাৎ মরে গেলেও হত। এখন কাঁদো-কাঁদো মুখ নিয়ে এখানে কি বসে আছো। মহারাজ বলেছিলেন-''হো! আমি গিয়েছিলাম সাধু হয়েছি এই দেখাতে, কিন্তু লোকে শুধু আমার কান্নাটাই দেখেছিল।''

মহারাজজী যখনই ভজনা করতেন ভগবান বলতেন-দূর হও এখান থেকে। তিনি নাম জপ করতে বসা মাত্র ভগবান বলতেন-ছেড়ে দাও, কেন ঢঙ্গ করছ? ভগবান বকে দিতেন। এ সময় মহারাজজী শুধুই কেঁদেছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন-মরেও যদি যাই, যাব, কিন্তু বাড়ি আর যাচ্ছি না। খুব ভুল করেছি ক্ষমা করে দিন। দেড় বছর পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আর কখনও আসবে না? মহারাজ বলেছিলেন-কখনও না। ভগবান বলেছিলেন-থুতু ফেলে সেটা চাট। ভগবান তাঁকে থুতু ফেলে সেটা চাটতে বাধ্য করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন-ওঠ! মহারাজজী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভগবান বলেছিলেন-এক্ষুণি প্রস্থান কর। খাঁচা থেকে যেমন তৎপরতাপূর্বক পশু পাখি বেরিয়ে যায়। মহারাজজীও সেইভাবে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন তখন বাজে রাত দুটো। সেই রাতেও একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল-সন্তজী! কোথায় যাচ্ছেন? মহারাজ বলেছিলেন-এবার যাচ্ছি। সে বলেছিল-''ভাল, তোমার পক্ষে এটাই শোভনীয়।'' সাধুবেশ ধারণ করলেই কেউ সাধু হয় না। ভগবানের আদেশ পালন করাটাই সাধুতা।

উপদেশকালে তিনি প্রায়ই বলতেন-দেখ, সাধু হওয়া এবং মৃত্যু হওয়া এক ব্যাপার। পৃথিবীতে আপন হলে কেউ হতেও পারে, কিন্তু আত্মীয় বলতে কেউই যাতে আপনার না থাকে, ভগবান পরম দয়ালু, তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেমন আপনি ও আমি বলাবলি করছি। **জানি গরল জে সংগ্রহ করহীঁ। কহহু উমা তে কাহে ন মরহীঁ।** ভগবান রক্ষাকর্তা হওয়ার পর আর বিষপান করতে দেন না। এরপর তিনি চিরকালের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অসীম বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় সঙ্গে করে জন্মভূমির প্রতি মমতা ত্যাগ করে পুনরায় সাধনার প্রশস্ত পথে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনার উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝাতেন যে, সাধনা কালে জন্মভূমির প্রতি অল্প আসক্তিও থাকা উচিৎ নয়; কারণ এইরূপ ভাব দ্বারা প্রেরিত হলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধুর পথই হল, **জো ঘর ফুঁকে আপনা, চলৈ হমারে সাথ**-অর্থাৎ

যে ঠিক-ঠিক গৃহত্যাগী, সেই আমার সঙ্গে এই পথে চলার উপযুক্ত পথিক।

জম্মু থেকে চিত্রকূটে প্রস্থান

উপর্যুক্ত ঘটনার পর মহারাজজী কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। হাঁটতে-হাঁটতে জম্মু পৌঁছেছিলেন। স্টেশনে নামামাত্র এক সর্দারজী এসে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেছিল "মহারাজজী! আপনি কাশ্মীর যাবেন কি?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন-কাশ্মীরে বাকী জীবন কাটাব। সেই সর্দার তাঁকে দেখে ভেবেছিল-এঁর হয়ত কাপড়ের অভাব হবে, সেইজন্য বিনীতভাবে বলেছিল-কাশ্মীরে খুব শীত পড়ে। আপনি বস্ত্র গায়ে না দিয়ে কি করে শীতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। আপনি অপেক্ষা করলে আমি কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারি। ক্ষণিক পরে সে আঙ্গুর নিয়ে এসে তাঁর সেবাতে অর্পিত করেছিল। কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য সেখান থেকে সত্বর প্রস্থান করেছিল। সেই সর্দার চলে যাবার পর মহারাজজী বিচার করেছিলেন যে, সারাটা জীবন কিভাবে থাকব। তিনি কিছু স্থির করতে পারছিলেন না এর মধ্যেই আকাশবাণী হয়েছিল-চিত্রকূট চল। সাধু হওয়ার ফলস্বরূপ ভেবেছিলেন চিত্রকূট তো হৃদয়-রাজ্যে স্থিত। সেই চিত্রকূট অথবা বাইরে যে চিত্রকূট স্থিত সেখানে যাব। যথার্থতঃ চিত্ত যখন কূটস্থ হয় তখন চিত্তই চিত্রকূট হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ ইষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে, স্থূলদেহে অবস্থান করার জন্য চিত্রকূট নামক স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর। রাত্রিতেই তিনি জম্মু থেকে চিত্রকূটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। যে সর্দারজী কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য গিয়েছিলেন, মহারাজজীকে সেখানে দেখতে না পেয়ে তার মনের যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা না ভাবাই ভাল।

জ্যোতিষীর উপর কৃপা

জম্মু থেকে চিত্রকূট যাওয়ার পথে মহারাজজী জৌনপুর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেনারস যাবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। বেনারস যাবার পথে একটা ঘরে চোখ পড়েছিল, গৃহস্বামীর দৃষ্টি মহারাজজীর উপর পড়তেই তিনি ছুটে এসেছিলেন এবং শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করে তিনি মহারাজজীকে একটি তক্তাপোষে বসিয়ে যত্নপূর্বক ভোজন করিয়েছিলেন। মহারাজজী সেখানে পৌঁছাবার আগে থেকেই সেখানে একজন পণ্ডিত বসেছিলেন। মহারাজজীর ভোজন গ্রহণের পরে সেই পণ্ডিত নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন "মহারাজজী! আমি ব্যাকরণ এবং

জ্যোতিষবিদ্যা জানি, তা সত্ত্বেও না জানি কোন খারাপ কর্মের জন্য ছেলেপুলেদের জন্য ঠিকমত অন্নের জোগাড়ও করতে পারি না। এমন শিক্ষার লাভ কি?" মহারাজজী সঙ্গে-সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে বলেছিলেন-"আচ্ছা যাও কাল তুমি পাঁচ টাকা পাবে।" তখনকার দিনে পাঁচ টাকার মূল্য অনেক ছিল। দু'কেজি ঘি-এর দাম এক টাকা ছিল। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহারাজজী! সত্যিই পাঁচ টাকা পাবো তো। তিনি হেসে বলেছিলেন, বলে তো ফেলেছি দেখ যদি পেয়ে যাও। দেখ এখন কি হয়?" তারপর সাধনোপযোগী কিছু চর্চা হয়েছিল। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী রাত্রিতে সেখানেই বিশ্রাম করেছিলেন।

পরের দিন সকালবেলা একজন ধোপা সেই পথ দিয়েই দ্রুত পদে যাচ্ছিল। সেই ঘরের মনিব ঠাকুর সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?" ধোপা বলেছিল, পাশের গ্রামে যাচ্ছি পণ্ডিতজীকে ডেকে আনতে, ব্রতকথা শুনব। ঠাকুর সাহেব বলেছিলেন, "পণ্ডিতজী, এই তো এখানে বসে আছেন।" পণ্ডিতজী গিয়ে ব্রতকথা শুনিয়েছিলেন। ধোপা পণ্ডিতজীকে ধুতি-পাঞ্জাবী, কুড়ি কিলো চাল-চিঁড়ে এবং পাঁচটাকা দক্ষিণা দিয়েছিল। পণ্ডিতজী দক্ষিণাতে অনেককিছু পেয়েছিলেন।

দুপুরের আগে মহারাজজী প্রসাদ গ্রহণ করে প্রস্থান করেছিলেন। বেশীদূর এগোননি, সেই পণ্ডিত মাথায় পুঁটলি নিয়ে ছুটতে-ছুটতে তাঁর কাছে পৌঁছেছিলেন। বলেছিলেন-মহারাজজী! অল্প দাঁড়ান। নিজের পুঁটলি মাটিতে রেখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তিনি সংস্কৃতে মহারাজজীর স্তুতি করতে শুরু করেছিলেন, "পরমহংসায় নমঃ মহাপুরুষায় নমঃ দিব্য বিভূতয়ে নমঃ" এইভাবে আরও অনেককিছু বলে যাচ্ছিলেন। পরে স্তুতি থামিয়ে বলেছিলেন- "মহারাজজী! আপনি যেমন বলেছিলেন, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পেয়েছি আরও অনেক কিছু পেয়েছি। মহারাজজী আপনি তো সিদ্ধ পুরুষ।"

মহারাজজী ভেবে দেখেছিলেন যে, গোটা সংসারই তো দুঃখী। জানতে পেরে এখনই গোটা গ্রাম ভিড় করবে, ঝঞ্ঝাট শুরু হবে, সেইজন্য তিনি বলেছিলেন, "না হো, বাণীই তো, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল তাতে কি? এই যে বস্তুগুলি পেয়েছ, সে সম্বন্ধে তো কিছু বলিনি।" পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন "না মহারাজজী! মহাপুরুষ সবসময় আত্মগোপন করে থাকেন। আমাদের অনেক ভাগ্য যে, এখানে আপনার

পদধূলি পড়েছে।” পণ্ডিতমশাই উচ্চস্বরে প্রশংসা করছিলেন, ভীড় হতে শুরু করেছিল।

বিষয় পালটে মহারাজজী বলেছিলেন, পণ্ডিত মশাই! আপনি তো জ্যোতিষী। আমার হাতটা দেখুন তো? পণ্ডিত মশাই তাঁর একথা শুনে বলেছিলেন, “মহারাজজী! আপনি তো কর্ম সংস্কারের উর্ধ্বে স্থিত, কর্মের বন্ধন ছিন্ন করেছেন। আপনার হাত দেখে কি হবে?” মহারাজজী বলেছিলেন “তবুও দেখতে আপত্তি কি?” পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, “মহারাজজী! আপনি সত্যিই বলছেন?” তিনি বলেছিলেন-“হ্যাঁ ভাই! সত্যি বলছি।”

পণ্ডিত মশাই অনেকক্ষণ ধরে মহারাজজীর ডান হাতের রেখাগুলি দেখেছিলেন। মাঝে-মাঝে মহারাজজীর মুখের দিকেও তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন। তারপর বলেছিলেন-“মহারাজজী! আপনার স্বরূপ দেখে তো এমন মনে হয় না কিন্তু যদি জ্যোতিষবিদ্যা ঠিক তবে পাপগ্রহের দশা চলছে।”

পণ্ডিতমশাই এরূপ বলা মাত্র মহারাজজীর বাম বাহু স্ফূরিত হতে শুরু করে। স্ফূরণ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না। তিনি বিচার করেছিলেন যে, একথা তো পণ্ডিত বলছে কিন্তু তাতে আমার বাহু স্ফুরিত হচ্ছে কেন? তাহলে কি পণ্ডিত মশাই ঠিক বলছেন? তিনি অন্তর্জগৎ থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন যে, পণ্ডিত মশাই ঠিক বলছেন। মহারাজজী উদাস হয়ে গিয়েছিলেন কিছু প্রসন্নও হয়েছিলেন যে, ভগবান আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহারাজজী গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

যাত্রাপথে কাশী এবং প্রয়াগ (হঠযোগ)

জৌনপুর থেকে মহারাজজী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পৌঁছেছিলেন। মন্দির পরিসরে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে বসেছিলেন। রাত্রিতে তাঁর মনে ভাব জেগেছিল যে, ভোলানাথ শিবের স্থান এই কাশীতে এখন কোন মহাপুরুষ আছেন কি? ভোর চারটার সময় জানতে পেরেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে নৌকোতে হরিহর বাবা রয়েছেন তিনি শিব স্বরূপ। এই স্বরূপ আপনাকেও লাভ করতে হবে। মহারাজজী তক্ষুণি সেই নৌকোতে গিয়ে উঠেছিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু হরিহর বাবা, তাঁর সেবক বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, “দেখ তো কোন সাধু এসেছেন কি? বিশ্বনাথ দেখে এসে তাঁকে

বলেছিল, ‘‘নৌকোর সিঁড়িতে পাগলের মত একজন দাঁড়িয়ে আছে।’’ হরিহর বাবা তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, সাধু তো এরূপই হন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এস। মহারাজজী গিয়ে হরিহর বাবাকে প্রণাম করেছিলেন। তিনি আশীর্বাদ এবং প্রসাদ দিয়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে, প্রবৃত্ত থাকো, পার হতে আর বেশী সময় লাগবে না। একথা শুনে আনন্দিত হয়ে মহারাজজী তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রয়াগের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন।

প্রয়াগ বাঁধের নিকটে কয়েকজন হঠযোগীর নিবাস ছিল। মহারাজজীকে ভজনাতে বসতে দেখে এক নবযুবক যোগী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে, আমি দেখছি যে, আপনি রাত দুটো থেকেই ধ্যানে বসে যান। কিন্তু ভিতরে মল ভর্তি থাকতে ধ্যান কিরূপে সম্ভব? আমি এখন এটুকু তো জেনে গিয়েছি যে, পেটে মল থাকতে ভজনা হওয়া অসম্ভব। নেতি-ধৌতি আবশ্যক, কিন্তু আপনি এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন না করে ধ্যানে রত হয়েছেন।

মহারাজজী হেসে জবাব দিয়েছিলেন, ‘‘মল তো মনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। স্থূল দেহের অন্ত্র পরিষ্কার করলে হবে কি? জন্ম-জন্মান্তরের দূষিত সংস্কারই মল। সেই মলেরই আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইজন্য এটাই মলাবরণ, যা চিত্তকে চঞ্চল করে দেয়, ভজনাতে বসতে দেয় না, সেইজন্য এই মলাবরণই বিক্ষেপ। এগুলিই মল। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়, মন নিরুদ্ধ হয়, সেটাই যৌগিক প্রক্রিয়া।’’ এই সাধনা জাগ্রত হয় তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ দ্বারা, যা জন্ম-জন্মান্তরের মল পরিষ্কার করে ইষ্টের চিন্তনে নিযুক্ত করে, দেহের সঙ্গে এই মানসিক চিন্তনের কোন সম্বন্ধ নেই। গীতা যোগশাস্ত্র, কিন্তু এর একটা সূত্রও নেতি-ধৌতি-বস্তীর সঙ্গে সম্বন্ধিত নয়। রামচরিত মানসও ইষ্টের সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেয়, কিন্তু মানসেও নেতি-ধৌতি ইত্যাদির বর্ণনা নেই। মহর্ষি পতঞ্জলি এবং কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণও সাধনাতে এইগুলিকে স্থান দেননি। প্রাচীন মহাপুরুষগণ এগুলির কোথাও উল্লেখ করেননি। যদিও তাঁরা পূর্ণ এবং প্রভুর সঙ্গে অভিন্ন স্থিতিযুক্ত ছিলেন। নেতি-ধৌতি-বস্তী ইত্যাদি ক্রিয়া শারীরিক চিকিৎসা মাত্র। পেটে বিকার উৎপন্ন হলে ধৌতি এবং নবলী ক্রিয়ার দ্বারা উপকার হয়। শীর্ষাসন করলে মাথার বিকার দূরীভূত হয়, এই প্রকার কঠিন শারীরিক বিকারের শমন এই মাধ্যমগুলির দ্বারা সম্ভব; কিন্তু যোগের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ প্রভু লাভ করা সম্ভব নয়। যোগের প্রক্রিয়া একটাই-

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্।। *(গীতা, ২/৪১)*

এই কল্যাণ মার্গে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একটাই। অবিবেকীগণের বুদ্ধি অনন্তশাখা বিশিষ্ট, সেই জন্য তারা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে।

মহাপুরুষগণ জঙ্গলে গিয়ে ভজনা করতেন, সেখানে অনেক প্রকারের ব্যাধির প্রকোপ ছিল কিন্তু ঔষুধ সহজে পাওয়া যেত না, সেইজন্য তাঁরা এই ক্রিয়াগুলিকে চিকিৎসার মাধ্যম করেছিলেন। প্রাচীনকালে বর্তমানের মত চিকিৎসার সুবিধা ছিল না। ম্যালেরিয়া জ্বর হলে জ্বর ছাড়তে-ছাড়তে তিনমাস লেগে যেত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত অসুস্থ থাকার ফলে চিন্তনের ক্রম অবরুদ্ধ হত, সেইজন্য যোগীগণ সময় করে এই ক্রিয়াগুলির অভ্যাস করতেন। এইপ্রকার হঠযোগীদের সাধনপথের উপযুক্ত দিশা-প্রদান করে তিনি চিত্রকূট প্রস্থান করেছিলেন।

দেহাধ্যাস

ভোর চারটের সময় একবার তিনি অযোধ্যা গিয়ে পৌঁছেছিলেন। নির্জন পথ দিয়ে তিনি চিন্তনে রত হয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বেগে বাতাস বইছিল, দেখতে-দেখতে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল এবং টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। বৃষ্টি পড়ছিল সেইজন্য শীত বেড়ে গিয়েছিল। মহারাজজী হাঁটতে-হাঁটতে একটা বিশাল ঘর দেখতে পেয়েছিলেন। সেটাকে সাধুর আশ্রম মনে করে ভিতরে ঢুকে ঘরের এক কোণায় বসে পড়েছিলেন। বৃষ্টি থামার পর চলে যাবেন এই ভেবেছিলেন। দ্বিতল থেকে মহিলা এবং বাচ্চাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঁচ কিলোর একটা বড় ঘটি হাতে নিয়ে, যজ্ঞোপবীত কানে গুঁজে, পালোয়ানদের মত পদক্ষেপে একজন মহাত্মা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছিলেন।

মহারাজজীর উপর দৃষ্টি পড়তেই সেই মহাত্মা বলেছিলেন, ‘‘অ্যাঁ! কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? জানো না এটা কার বাড়ি?’’ মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘আমি থাকবার জন্য আসিনি। বৃষ্টি পড়া কম হলেই চলে যাব। আমি কিছু চাইও না। সেইজন্য আপনাকে ডেকে বিরক্ত করিনি। সেই মহাত্মা চটে উঠেছিলেন, ‘‘অ্যাঁ! সাধুদের মত কথা বলছ!’’ যা-তা কিছু কথা বলে তিনি মহারাজজীর ঘাড় ধরেছিলেন।

মহারাজজীও সে স্থান ত্যাগ করা উচিৎ মনে করে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই মহাশয় এত রেগেছিলেন যে, মহারাজজীর ঘাড় থেকে হাত সরাননি। মহারাজজী দরজার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, দু'তিনটে সিঁড়ি নামা শুধু বাকী ছিল। মহারাজজী ঘাড়ে বেশ চাপ অনুভব করেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইছে। যেমনি সে বলপ্রয়োগ করেছিল মহারাজজী পূর্বে পালোয়ান তো ছিলেনই পাঁয়তারা বদল করে নিতম্ব ধরে তুলে সিঁড়িতে আছড়ে দিয়েছিলেন। তারপর দু'চার ঘুসি মেরে বলেছিলেন, "এবার বল! আমাকে কেন ধাক্কা দিচ্ছিলে? রাস্তার উপর পড়লে কে পটি বেঁধে দিত? তোমার তো স্ত্রী, ছেলেপুলে আছে। এবার দাও সেঁক আর খাও হালুয়া।" সে চেঁচিয়ে বলেছিল, "বাঁচাও পাগলটা মেরে ফেলল।" তাকে সেখানে ছেড়ে মহারাজজী সে স্থান ত্যাগ করে রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

সেখানে দু'জন সাধু তিলক লাগিয়ে সাধুবেশে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়িয়েছিল। একজন আর একজনকে সম্বোধন করে বলেছিল, "কেন সীতারামজী, অমুক স্থানের অমুক মহন্ত, যে কখনও কোন সাধুকে একটা রুটি পর্যন্ত দান করেনি, রামের ইচ্ছায় একটা পাগলের সঙ্গে আজ তার দেখা হয়েছিল। ভালভাবে ভাল ঠুকানি দিয়েছে। আমি তাকে দেখে এলাম। তাদের কথা শুনে মহারাজজী ভাবছিলেন, এরা আমাকে দেখে পাগলটার সঙ্গে তুলনা করতে শুরু না করে দেয়। চিনে না ফেলে। কোন বিশ্বাস নেই। এখন তো তার নিন্দা করছে, আমাকে যদি চিনে ফেলে কা-কা করে ঘিরে ধরবে। এইসব ভাবছিলেন ততক্ষণে ট্রেন এসে গিয়েছিল, মহারাজজী তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলেন। গাড়ি ছাড়ার পরই মহারাজজীর মন একাগ্র হয়েছিল। অন্যথা বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনা ঘটা পর্যন্ত মহারাজজীর নিজের দেহের প্রতি গর্ব ছিল যে, আমার দেহে অনেক বল এবং আমার মধ্যে এই গুণ রয়েছে। তিনি ক্রমশঃ দেহের প্রতি যে আসক্তি ছিল, তা জয় করেছিলেন। তিনি উন্মুক্ত হয়ে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। কখনও এক মুঠো ছোলা জুটত, কখনও ঘি দিয়ে তৈরী প্রসাদ পেতেন, কখনও-কখনও কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করা বারণ হত।

বিচরণ করতে-করতে একবার তিনি একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। খেতের মাঝেই তিনি উপবেশন করেছিলেন। ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় পক্ষকাল ছিল।

প্রাতঃকালের বাতাসের শীতল স্পর্শে জড়-চেতন সকলেই কাঁপছিল। শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে মহারাজজী চতুর্দিকে তাকিয়ে দূরে আগুন দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ফসল সুরক্ষার জন্য কোন কৃষক আগুন জ্বালিয়েছে নিশ্চয়, অতএব সেইদিকেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। কাছে গিয়ে দেখেছিলেন, সেখানে সাধুদের কুটীর ছিল। পাঁচজন ত্যাগী সাধু কলা গাছের বল্কল অঙ্গে ধারণ করে, শরীরে বিভূতি মেখে, যোগাসন অভ্যাস এবং মালা জপ করে যাচ্ছিলেন। মহারাজজী নমস্কারের ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ মাথা হেঁট করে ধুনির কাছে গিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ সেই সাধুরা বলে উঠেছিলেন, ‘‘ধুনি স্পর্শ করেছে। ধুনি স্পর্শ করার মন্ত্র জানা আছে? অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার মন্ত্র জান?’’ মহারাজজী সহজভাবে বলেছিলেন, ‘‘ঠান্ডা লাগছিল। একটু পোহাতে দাও, তারপর মন্ত্রও বলব।’’ তাদের মধ্যে একজন মহারাজজীর হাত ধরে তাঁকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, ‘‘যাও এখান থেকে, দেখ একে আবার সাধুদের মত কথা বলছে।’’ মহারাজজীর মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। শুধু এটুকুই মনে এসেছিল, যে, খুব শীত করছিল কিন্তু এরা আগুন পোহাতে দিল না। পুনরায় চিন্তনরত হয়ে শান্তভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেইদিনই ভগবান তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘আজ থেকে তোমার আত্মমর্যাদা বোধও বিলুপ্ত হয়ে গেল।’’ মহারাজজী খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে মহারাজজী যখন অনুসুইয়াতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছিলেন, উপর্যুক্ত সাধুদের মধ্যে তিনজন তীর্থাটন করতে-করতে সেখানে পৌঁছেছিলেন। মহারাজজী তাদের দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। তাদের আদর, আপ্যায়ন করে বসিয়ে শরবৎ পান করার জন্য দিয়েছিলেন। ভোজন-প্রসাদ-ধুনি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। উচিৎ সমাদর করে সকালবেলা বিদায় দেবার সময় বলেছিলেন, ত্যাগী মশাই, মাঝে-মাঝে দর্শন দিয়ে যাবেন। তারা বলে উঠেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! আমরা আর কি ত্যাগী? গ্রামে পড়ে রয়েছি। নির্ধারিত কয়েকটি গ্রাম থেকে অন্ন সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করছি। আসল ত্যাগী আপনি, এই ঘোর জঙ্গলে ভগবান অত্রির মত বিরাজ করছেন। আপনার দর্শন করে আমরা কৃতকৃত্য হলাম। মহারাজজী তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘ত্যাগী মশাই! আপনি দর্শন করেছেনও আবার দর্শনও দিয়েছেন। স্বরূপ একই।’’

তাঁরা কিছু দূর যাবার পর মহারাজজী হাসতে-হাসতে আমাদের বলেছিলেন,

"আমি বলেছিলাম না, কয়েকজন সাধু আমাকে ধুনি পোহাতে দেয়নি, হাত মুচড়ে ধাক্কা দিয়েছিল, এরাই তারা।" ভক্তদের মধ্যে একজন উত্তেজিত হয়ে লাঠি হাতে নিয়ে বলেছিল, "আমাদের গুরু মহারাজের হাত মুচড়েছিল। এই ত্যাগীদের দেখাচ্ছি মজা।" মহারাজজী তাঁকে নিরস্ত করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "এতে ত্যাগীদের কোন দোষ নেই। সেইদিন যদি কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ হতাম, তবে আজ এখানে থাকতে হত না, না জানি কোথায় থাকতাম।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অর্জুন! দেহাভিমানীদের গতি হয় না, শরীর সৌষ্ঠব, বিদ্যা, কুলীনতা, সম্পন্নতা ইত্যাদি অভিমান নিরাধার বিচরণ করলেই নির্মূল হয়।" '**সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী।**' ***(মানস, ৭/১৩/৮)*** দেহাভিমানের নিবৃত্তির জন্য ইষ্টের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পিত করে বিচরণ এবং চিন্তন অপরিহার্য।

কার্বী স্টেশনে বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন

চিত্রকূট যাত্রাক্রমে মহারাজজী ক্রমশঃ কার্বী পৌঁছেছিলেন। অন্তর্জগৎ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন, যে, "এবার ঠিক আছে, ঈশ্বরের দরবারে নিযুক্ত হয়েছ।" একথা জানতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় করেছিলেন যে, স্টেশনে বসেই সমস্ত রাত্রি ভজনা করবেন।

রাত ন'টা বেজেছিল। মহারাজজীর ভজনাতে বসার কিছুক্ষণ পর ধ্যানে তিনি শুভ্রবসন পরিহিতা গৌরবর্ণ দীপ্তমতী এক নারীর দিব্যরূপ দর্শন করেছিলেন। মমতাময়ী দৃষ্টিতে দেখে তিনি স্নেহপূর্বক বলেছিলেন, "হাত পাত।" তিনি হাত পেতেছিলেন। দেবী তাঁর হাতে একটা মণি দিয়েছিলেন, মণির উজ্জ্বল আলোক চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবী বলেছিলেন, "এবার মুঠো বন্ধ কর, এই মণি এখন থেকে তোমার কিন্তু আজ আর ঘুমিয়ো না।" তিনি চৌপাইয়ের নিম্ন পঙ্‌ক্তিটি স্মরণ করেছিলেন-**রাম ভগতি মনি উর বস জাকেঁ।** ***(মানস, ৭/১১৯/৯)***

মহারাজজী ভেবেছিলেন, এ এমন কি বড় কথা। তিনি আসনে স্থির হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘুমে দু'চোখ বুজে এসেছিল। মহারাজজী উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার বসেছিলেন কিন্তু ক্রমাগত ঢুলছিলেন। অত ঘুম জীবনে কখনও পায়নি। তাঁর গোটা-রাত ধরে ভজনা করার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সেদিন ঘুমে

এত বেশী ঢুলছিলেন, যেন দু'তিন দিন থেকে ঘুমাননি।

তন্দ্রার সঙ্গে সংঘর্ষ করতে-করতে চারটে বেজে গেছিল তিনি ভেবেছিলেন একটু পরেই তা সকাল হয়ে যাবে, ঘণ্টা দু'ঘণ্টার ব্যাপার একটু কোমর সোজা করে নিই। অতএব স্টেশনের ছড়ের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমে ঢলে পড়েছিলেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কালো কাপড় পরিধান করে এক কুরূপ নারী তাঁর কাছে এসে বলছেন, "মুঠো খোল।" তিনি মুঠো খুলেছিলেন, সেই নারী তাঁর হাত থেকে মণি নিয়ে তার পরিবর্তে আকন্দের ন্যায় এক রকমের সারহীন ফল দিয়ে বলেছিলেন "মুঠো বন্ধ কর। কেন ঘুমালে!" মহারাজজীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখেছিলেন। চারটে বেজে দশ মিনিট হয়েছিল। ঠিক করে ঘুমও হয়নি। তিনি নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, "আরও ঘুমাও। মণি তো হাতছাড়া হয়েই গেল! এবার সারাটা জীবন ঘুমাও।" তিনি আবার ঘুমাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম আসেনি।

মহারাজজী প্রায়ই বলতেন, "হো! আজ্ঞা পালন করাকেই ভজনা বলে। কোন অসম্ভব নির্দেশ ভগবান কখনও দেন না। তার নির্দেশে নিজের কোন ইচ্ছা যোগ করা উচিৎ নয় এবং ভগবানের নির্দেশ অমান্য করা উচিৎও নয়, সীতা মা নিজের ইচ্ছা অনুসারে একটু চলে, রেখা (আজ্ঞা) লঙ্ঘন করেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।"

হরি কী আজ্ঞা উল্লঙ্ঘি কে, করৈ জো স্বেচ্ছাচার।
জহাঁ জায় তহাঁ কাল হ্যায়, কহৈঁ কবীর বিচার।।

সেদিন যদি জেগে থাকতাম তবে এই অনুসুইয়াতেই সর্বত্র প্রত্যেকটি পাতাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হত, আমার চারধারে পাহারা থাকত, তোমরা আমার দর্শন পেতে না, আর না জানি কত কিছু করতে সমর্থ হতাম। সাধুর মাহাত্য প্রকাশ পেত। এখন তো খোলা দরবার আমার।

চিত্রকূটে মহারাজজী

কার্বী থেকে মহারাজজী চিত্রকূট পৌঁছেছিলেন। তিনি ইষ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "চিত্রকূট তো অনেকটা জায়গা জুড়ে। চুরাশী ক্রোশ ক্ষেত্রফল চিত্রকূটের। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমাই তো পূর্ণ হয় ষাট-সত্তর কিলোমিটার চলার পর, এখন থাকব

কোথায় ?" ইষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন, "অনুসুইয়া যাও !"

চিত্রকূটে মহারাজজী রামঘাটে ছিলেন। যজ্ঞবেদী নামক মন্দিরে একজন সাধু ভাণ্ডারার আয়োজন করেছিলেন। মহারাজজীও ভাণ্ডারাতে সম্মিলিত হয়েছিলেন। মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ? মহারাজজী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তো ছিলেন না, সেইজন্য তাঁকে বলা হয়েছিল, "পেট ভরে প্রসাদ পাবে না। একটা মালপুয়া এবং দুটো লুচি নিয়ে পংক্তি থেকে তফাতে বস, কি জানি কি জাত তোমার ?" মহারাজজী বলেছিলেন, "যদি খাই, পেটভরে খাব তা না হলে কিরকম ভাণ্ডারা ?" তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর অন্য একটা মন্দিরের সাধু তাঁকে প্রণাম করে সাদরে বসিয়েছিল। মহারাজজীকে তিনি শাক, রুটি, ডাল পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন। আহারাদির পর শ্রদ্ধাপূর্বক বিদায় জানিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "হো ! ভগবানই নিজের ভক্তদের খাবারের ব্যবস্থা করেন।"

অনুসুইয়ার পথে

স্ফটিক শিলা পার করার পর গভীর জঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছিল। পথ এত সরু ছিল যে কাঁটাঝোপের মাঝ দিয়ে অনুসুইয়া পৌঁছাতে-পৌঁছাতে শরীরে কাঁটা বিঁধে কাপড় যেখানে-সেখানে ছিঁড়ে যেত। মন্দাকিনী নদীর তীর ধরে মহারাজজী এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে কখনও নালা ডিঙ্গিয়ে কখনও টিলার উপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন-কোন জায়গাতে এত বেশী ঘন ঝোপ ছিল যে, বসে মাথা নীচু করে নির্বস্ত্র দেহকে কোনরকমে কাঁটার স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে অনুসুইয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেইসময় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এখানেও রাস্তা তৈরী হতে পারে। বাবুপুর পেরোনোর পর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে যেতে-যেতে মহারাজজীর মনে কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে আনন্দও জেগেছিল যে, তিনি এমন বনে যাচ্ছেন যেখানে লোকও নেই এবং আদিম জাতিও নেই। যাক পাপগ্রহ থেকে মুক্তি পেলাম; কারণ সাধুর জন্য নারীকেই পাপগ্রহ বলা হয়। এইরূপ ভয়ানক জঙ্গলে সাহসী ব্যক্তিও যেতে ভয় পাবে, সেখানে স্ত্রীলোক কেন যাবে ?

এই সমস্ত চিন্তা করতে-করতে তিনি ঝুরী নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক রাখাল বালকের দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখান

থেকে অনুসুইয়া কতদূর?' সে উত্তরে বলেছিল-'একটু এগিয়ে গেলেই অনুসুইয়া পৌঁছে যাবেন। ঐ পাহাড়ের পাদ দেশে। আর এক ক্রোশ পথ। মহারাজজী অনুমান করেছিলেন, ''সেখানে নিশ্চয় কেউই থাকে না তা সত্ত্বেও মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেখানে কেউ থাকে কি? ছেলেটি বলেছিল-''হ্যাঁ একটি স্ত্রীলোক থাকে। দ্রৌপদীবাই!''

মহারাজজী বিচার করেছিলেন যে, পাপ গ্রহ তো স্ত্রীলোকের রূপে সেখানে পূর্ব হতেই বিদ্যমান, ভগবান সেখানেই বাস করার আদেশ দিয়েছেন। আমি একা। নির্জনে বেশী বিপদের সম্ভাবনা। আমি দিগম্বর, কি করি?

এই সমস্ত চিন্তা করতে-করতে অনুসুইয়া গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আগে দ্রৌপদী বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করে নিই। মা অথবা বোন বলে ডেকে প্রণাম করে নেব। তার মনে কোন নোংরা ভাব থাকলেও সেটার পরিবর্তন হবে। কিন্তু কিছু গোলমাল নিশ্চয় আছে, তার নাম চিন্তা করার সঙ্গে-সঙ্গে অশুভ সংকেত পাচ্ছি। এইরূপ চিন্তা করতে-করতে মহারাজজী তার কুটীরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কুটীরের পাশেই অনুসুইয়া মন্দির ছিল। দ্রৌপদীবাঈ গোটা দিন কুটীরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে থাকতেন।

দ্রৌপদীবাঈ

কুটীরের কাছে গিয়ে মহারাজজী হাঁক দিয়েছিলেন, ''মাতাজী! দরজা খুলুন, দর্শন দিন, আমি সাধু।'' খট-খট শব্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ভিতরে কেউ আছে কিন্তু দরজা খোলেনি। প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর খেয়াল হয়েছিল যে, কি হল আমার? কোন্ বাঈ-এর দর্শন করার জন্য চলে এলাম? শুধু পাপগ্রহ কেন, পাপগ্রহের বাবা হলেও রক্ষা তো ভগবান করেন। নিজের রক্ষা নিজেই করতে শুরু করে দিলাম কেন? তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনুসুইয়া মন্দিরের কাছে সিদ্ধ বাবার আশ্রমের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিলেন। সেখানে একটা তক্তাপোশ জীর্ণ অবস্থাতে পড়েছিল, মহারাজজী তার উপরেই উপবেশন করেছিলেন।

যখন জঙ্গল থেকে সকলেই চলে যেত, তখন দ্রৌপদীবাঈ নিজের কুটীর থেকে বেরিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে-করতে ধূপকাটি জ্বালিয়ে, ঘটিতে জল নিয়ে

মন্দিরে স্থাপিত প্রত্যেকটি মূর্তিতে জল ছিটিয়ে, ধূপকাটি দেখিয়ে চলে যেত। এটাই তার পূজা ছিল। সিদ্ধ বাবার আশ্রমেও হনুমানের একটি ছোট মূর্তি ছিল। সেখানেও পূজা করার উদ্দেশ্যে দ্রৌপদী বাঈ প্রত্যেকদিনের মত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিল।

মহারাজজী তক্তাপোশের উপর শুয়ে ধ্যানে রত ছিলেন। দ্রৌপদী বাঈ উপরে উঠে তাঁকে দেখতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে পালাতেও পারছিল না আবার এগোতেও পারছিল না। যে হনুমানের পূজা করার জন্য উঠেছিল, তাঁর মূর্তি তক্তাপোশের কাছেই স্থাপিত ছিল। মহারাজজীর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি কেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তো, থাকলে থাকতেও পারে জঙ্গল এলাকা, আশে-পাশে বাঘ-ভালুক নেই তো? তিনি আশে-পাশে দেখেছিলেন, কিছু দেখতে পাননি পিছনে ফিরে দেখেছিলেন, বাঈজী দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা বাঈজী পুজো করে নাও। আমিই বাবাজী। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমিই গিয়েছিলাম। তাকে একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলেন, ভয় পাচ্ছে বোধহয়। তিনি একটু তফাতে সরে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদী বাঈ ছুটে গিয়ে হনুমানের মূর্তিতে জল ঢেলে, ধূপকাটি ছুঁড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তিনি তিনদিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদীবাঈকে উপরে দেখতে পাননি।

সিদ্ধবাবার চমৎকারী তক্তাপোশ

মহারাজজী তক্তাপোশের উপর আসীন ছিলেন। যখন ভালভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, নীরব-রজনীতে তক্তাপোশ থেকে নিম্নলিখিত কথা কয়টি শুনতে পেয়েছিলেন, ‘‘এটা আমার জায়গা।’’ মহারাজজী চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে, তক্তাপোশও কথা বলে। পরের দিন আবার শুনতে পেয়েছিলেন, ‘‘এটা আমার জায়গা। আপনি নীচে যান।’’ তার পরের দিন আবার শুনতে পেয়েছিলেন, ‘‘আমি পতিত হয়ে গিয়েছি। এটা আমার জায়গা, আপনার জায়গা নীচে রয়েছে।’’ মহারাজজী মনে-মনে চিন্তা করেছিলেন, মনে হয় ইনি উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ ছিলেন, পরে পতিত হয়েছিলেন। তিনি তো পতিত হয়ে গিয়েছিলেনই, আর এই জায়গারই বা আমার কি প্রয়োজন! ইনি এও জানেন আমার জায়গা পাহাড়ের তলদেশে। তাহলে আমি নিজের জায়গাতে গিয়ে কেন থাকব না। নিজের জায়গার খোঁজে মহারাজজী সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলেন।

সিদ্ধবাবার আশ্রমের সিঁড়ির উত্তরদিকে মন্দাকিনী নদীর তীরে একটা বিশাল শিলাখণ্ড ছিল, লোকে সেটাকে ব্রহ্মশীলা বলত, তিনি গিয়ে সেই শীলার উপর বসেছিলেন। ইষ্টদেব তখন দক্ষিণে যেতে বলেছিলেন, তিনি দক্ষিণে সিঁড়ির কাছে গিয়ে বসেছিলেন। পুনরায় অল্প উত্তরে যাওয়ার সঙ্কেত পেয়েছিলেন, বর্তমান আসন যেখানে আছে মহারাজজী ধীর পদে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে আদেশ পেয়েছিলেন, ''এখানেই বোস। সারাটা জীবন এখানেই থাকবে। এটাই তোমার জায়গা। শুধু বসে থাকো।'' ইষ্টের আদেশ অনুসারে তিনি আসন পেতে বসেছিলেন এবং সমাধি পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

ভোজন গ্রহণের জন্য আদেশ

এক-এক করে চোদ্দোটা দিন পার হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী নিজের স্থানে বসেছিলেন, খাদ্য পানীয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। গ্রীষ্মকাল হওয়ার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছিল। চতুর্দশ দিনে লঘুশঙ্কার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল। তাঁর নিজের উপরই করুণা হয়েছিল। ইষ্টদেবের প্রতিও কিছু শব্দ প্রস্ফুটিত হয়েছিল-''ইষ্টদেব হয়ে বসে আছো। ঘোর জঙ্গলে এখন কি খাবো কি পান করব কিছুই ঠিক নেই! দেহটা না থাকলে ভজনা কে করবে?'' সেইদিনই ইষ্টদেব রুক্ষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন ''আহার যদি গ্রহণ করবেই তবে কাল থেকে গ্রহণ কোরো।''

পরের দিন দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁর মনে হয়েছিল যে, কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেল এবং একটু পরেই ফিরেও গেল। মহারাজের আসন কাছেই ছিল কিন্তু ঘন অরণ্যের জন্য সবকিছু আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। দু'-চার হাত দূরেও কি আছে কি নেই, দেখা সম্ভব ছিল না। প্রায় চারটের সময় তিনি ঘুরতে-ঘুরতে সিঁড়ির কাছে এসে উপরে তাকিয়ে দেখেছিলেন সিঁড়িতে আধমন (প্রায় কুড়ি কিলো) ছোলা রাখা আছে। ছোলার উপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আদেশ পেয়েছিলেন, ''আজ ছোলা খেয়েই থাকো।'' তিনি একমুঠো ছোলা খেয়ে জলপান করেছিলেন। এবং ছোট একটা পাত্রে কিছু ছোলা রেখে নিয়েছিলেন সেই সময় মহারাজজীর কাছে শুধুমাত্র এই পাত্রটাই ছিল। তারপরই সেখানে কিছু বাঁদর এসে জুটেছিল, তারা ঝগড়া করতে-করতে সব ছোলা খেয়ে শেষ করেছিল। পরের দিন থেকেই কারও না কারও মনে প্রেরণার সঞ্চার হত এবং সেই ঘোর জঙ্গলেও তাঁর ভোজনের ব্যবস্থা অযাচিতভাবে হয়ে যেত। সাধুরা

একেই আকাশবৃত্তি বলে। মহারাজজী ভিক্ষা করতেন না। তিনি কখনও কারও কাছে কিছু চাননি। ব্যবস্থা তো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাঁর মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল যে, ভগবান রুক্ষভাবে কেন বললেন, ‘‘খেতে চাও তবে কাল থেকে খেয়ো।’’ তিনি কি চাইছিলেন? সেইদিনই ভগবান তাকে বলেছিলেন, ‘‘একুশ দিন পর্যন্ত উপবাসী থাকলে জীবনে আর আহার করার প্রয়োজন হত না, যেমন বসে রয়েছ তেমনি বসে থাকতে তবুও মুখ মণ্ডল এইরূপ দীপ্ত থাকত।’’

মহারাজজী খুব দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, ‘‘হো, কি যে বলি! সেদিন লঘুশঙ্কাতে রক্ত পড়তে দেখে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। চোদ্দোটা দিন তো পার হয়ে গিয়েছিল, আর মাত্র সাতটা দিন বাকী ছিল। সেগুলোও পার হয়েই যেত। ভগবানও এমন পরীক্ষা নেন যে, মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। যদি ভগবান বলে দিতেন যে, বাবা আর সাতদিন ধৈর্য ধর, তাহলে কি হয়ে যেত? গোটা জীবন আহারের প্রয়োজন হত না। না খেয়ে বসে থাকতাম, তবুও আমি যে খাইনি তা ধরা যেত না। শেষে বলেছিলেন, ‘‘প্রত্যেক সাধকের উচিৎ যে, ভগবানের আদেশের মাঝে, নিজের বুদ্ধি না খাটানো, তা না হলে নিজের জীবনটাই ভার স্বরূপ হয়ে যায়।’’

অনুসুইয়াতে শুরুর দিনগুলিতে

মহারাজজীর আসনের পিছন দিকে ভাঙ্গা চোরা ছোট-ছোট কয়েকটা কুঠুরী ছিল। একটা কুঠুরীতেও দরজা ছিল না। সেগুলোতে সেহুড়ের মোটা-মোটা বৃক্ষ-এর সঙ্গে ছোট-ছোট ঝোপের সৃষ্টি হয়েছিল। ছ’মাস পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, সেখানে কুয়াও আছে। ঝোপঝাড় কেটে তার চারধারের জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছিল, কুয়ার ভিতর থেকে একটা নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে মশার প্রকোপ ছিল। মশাগুলো আকারে বড় ছিল। ঝোপের মাঝে হাঁটতে-হাঁটতে প্রায় ছ’হাত লম্বা-লম্বা সাপ পায়ে জড়িয়ে যেত, ভয়ের চোটে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যেত। সজোরে পা ছুঁড়লে সাপগুলো দূরে গিয়ে পড়ত, আবার সোজা হয়ে ধীরে-ধীরে চলে যেত। তাদের স্বভাবে কোন পরিবর্তন দেখা যেত না।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সিংহের আগমন হত এবং জঙ্গলে কোলাহল সৃষ্টি হত। বাঁদরদের চিক-চিক, চিতা বাঘের হুঙ্কার, কোথাও ভালুকের গর-গর আওয়াজ শোনা যেত। গোটা জঙ্গল অশান্ত হয়ে যেত। এই পরিবেশেই মহারাজজী সেখানে বাস করতে শুরু করেছিলেন।

একদিন নিজের আসনের আশে-পাশে পায়চারি করতে-করতে কুঠুরীগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। একটা কুঠুরীতে কয়েকটা রক্তাক্ত কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল হালেই কারও হত্যা করা হয়েছে। তিনি ভাবছিলেন, এখানে আসে কে? এইরূপ চিন্তা করতে-করতে যেই রাত গভীর হয়েছিল, তিনি একটি চিতাবাঘকে কুঠুরীটির দিকে যেতে দেখেছিলেন। সেই হিংস্র পশুটা বার-বার তাঁকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল এবং তিনি হাসতে-হাসতে আসনে বসে বসেই তাকে গালি দিচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই চিতা বাঘই সমস্ত অস্থি জমা করেছে, কুঠুরীগুলি যে হিংস্র পশুদের বাসস্থান তা জানতে পেরেছিলেন। তবে তো কুঠুরীটি চিতাবাঘের।

পরের দিন তাঁর কাছে একটি আদিবাসী যুবক এসেছিল। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন ''কি! তুমি কুঠুরীটি পরিষ্কার করে দেবে। সে বলেছিল, হ্যাঁ মহারাজজী! গাছের ডাল দিয়ে ঝাঁটা তৈরী করেছিল, তুম্বীতে জল এনে কুঠুরী পরিষ্কার করে দিয়েছিল। তারপর আর সেখানে চিতা বাঘটি যায়নি, কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিল (প্রায় পনেরো বছর) সে, আশেপাশেই থাকত। ভক্তরা তাকে দেখে বলত 'মহারাজজী! ওখানে তো বাঘ বসে রয়েছে।' মহারাজজী হেসে বলতেন, ''হো! ও আমার প্রহরী।''

হিংস্র পশু এবং বর্বর দস্যুদের মাঝে

এটা সর্বজনবিদিত যে, চিত্রকূটের সমীপে অনুসুইয়ার ভীষণ বন্য প্রান্তর হিংস্র এবং বর্বর দস্যুদের কেন্দ্র ছিল।

ইষ্টের আদেশানুসারে এইরূপ দুরূহ এবং বিষম পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেও তিনি প্রকৃতির প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি স্থির চিত্তে চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

চতুর্দশ দিন কয়েকজন দস্যু পায়চারি করতে-করতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। একজন বলেছিল, ''এখানে বাবাজী বসে রয়েছেন।'' তাদের সর্দার বলেছিল, ''তাড়িয়ে দাও।'' ছোট সর্দার বোধ হয় ধার্মিক ছিল, সে বলেছিল, ''বাবাজী সৎলোক তবে উপদ্রব করলে তাড়িয়ে দেব।'' পরস্পর কিছু বাদ-বিবাদ করে, নিশ্চিন্ত হয়ে তারা চলে গিয়েছিল। মহারাজজী শান্তভাবে নিজের আসনে যথাবৎ বসে ভজনে রত ছিলেন।

দিবারাত্র ভজনাতে রত থাকতেন, কিন্তু ভীষণ অরণ্যের নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশে হিংস্র পশু এবং বর্বর দস্যুদের ভয় লোকের লেগেই থাকত। সেইজন্য কোন সাধু অনুসুইয়াতে বাস করার সাহস জোগাতে পারেননি। আশে-পাশে যারা বসবাস করত, তারাও সেখান দিয়ে ভয়ে-ভয়ে যেত। সাধু বা তীর্থযাত্রী, যারাই সেখানে দু'চারদিন থাকার সাহস করেছিল, তাদেরই প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সেখানে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটত, তার মধ্যে একটা মহত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

মন্দাকিনী নদীর তীরে চোর-ডাকাত লুট, চুরির ধনরাশি ভাগ করে নিত। সে সময় ছোট-ছোট রাজ্য ছিল, রাজ্যের তরফ থেকে সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেইজন্য আশেপাশের গ্রামে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি এবং হত্যার ঘটনা ঘটত। একবার কয়েকজন ডাকাত মহারাজের আসন থেকে একটু দূরে বসে প্রাপ্ত ধন ভাগ করছিল এবং হাসি ঠাট্টা করতে-করতে শরবত তৈরী করেছিল। এক ডাকাতের দৃষ্টি মহারাজের উপর পড়েছিল। সে সঙ্গীদের বলেছিল, ''এখানে একজন বাবাজীও বসে আছেন।'' তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, ''বসে আছেন তো আমরা কি করব?'' আগের জন একটু উদার প্রকৃতির ছিল, সে বলেছিল-বাবাজীকেও শরবত দিয়ে আসি। সে মহারাজের কাছে গিয়ে তিন-চারবার আগ্রহ করেছিল, কিন্তু মহারাজজী বলেছিলেন, ''আমি চুরির জিনিষ গ্রহণ করি না'' তিনি বারণ করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে ক্রূর স্বভাবের একজন ডাকাত রেগে হাতে লাঠি নিয়ে তাঁকে প্রহার করার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য সঙ্গীটি শরবতের পাত্র ছুঁড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে নিজের-নিজের ভাগ নিয়ে রাত্রেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিল।

আশ্রম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে ঝুরী নদীর কাছে তারা ভয়ঙ্কর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। পরের দিন প্রতিশোধের ভাব নিয়ে তারা ঘর থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পেয়েছিল। তাদের কখনও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, তারা প্রায়ই সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করত। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিল যে, বাবাজী বোধহয় কিছু বিদ্যা জানেন, এ কাজ তাঁরই। এইসব বলতে-বলতে কোন রকমে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু যে ডাকাতটি প্রহার করার জন্য লাঠি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল, সে সন্নিপাতের ভীষণ রোগে

আক্রান্ত হয়েছিল। নিরন্তর কিছুদিন উপবাস করার ফলস্বরূপ মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার যে সঙ্গীটি শরবত পান করাতে চেয়েছিল, সে অজ্ঞাত প্রেরণার বশীভূত হয়ে তাঁর কাছে কৃপা যাচনা করার জন্য পৌঁছেছিল। তাকে দেখেই মহারাজজী হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘কি ব্যাপার? আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে সে ক্ষমা যাচনা করেছিল। বিনম্রস্বরে নিবেদন করেছিল, ‘‘মহারাজজী! আমার সঙ্গীটি মৃতপ্রায় অবস্থাতে পড়ে আছে।’’ তিনি স্বভাবতই খুব দয়ালু ছিলেন, সেইজন্য বিভূতি নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে বলেছিলেন। বিভূতি গ্রহণ করার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সুস্থ হবার পর কুকৃত্যগুলির জন্য পশ্চাতাপ করতে-করতে সে মহারাজজীর পায়ে পড়ে ক্ষমা যাচনা করেছিল। চিরদিনের জন্য চুরি করা ছেড়ে দিয়েছিল। এইরূপ অলৌকিক হৃদয় পরিবর্তন দেখে জনসাধারণের মনে সাধু-মহাত্মাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মেছিল। সমস্ত এলাকা এই চোর ও বর্বর ডাকাতদের ভীষণ আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছিল।

কোল-ভীল জাতির লোকেদের হৃদয় পরিবর্তন

ভগবান রামের সময় থেকেই চিত্রকূট কোল-ভীল জাতির লোকেদের নিবাস স্থান। সাধু, মহাত্মা কাকে বলে, এরা সেসব জানে না; কারণ অসমতল ভূমির পরিবেশ এবং শিক্ষার অভাবের ফলস্বরূপ এরা স্বভাবতঃ জড় এবং অসভ্য। কয়েকজন কোল-ভীল একবার অনুসুইয়া আশ্রমের সমীপে জঙ্গলের ভিতর মধু সংগ্রহ করার জন্য এসেছিল। মহারাজজী তাদের বারণ করে বলেছিলেন, ‘‘আশ্রমের সমীপে মধু সংগ্রহ করা তোমাদের উচিৎ নয়।’’ তারা একথা স্বীকার করেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর কথা অবহেলা করে পাহাড়ের উপর চড়ে মৌচাক ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল। তাদের এরূপ ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হয়ে পুনরায় বারণ করেছিলেন, তখন তাদের মধ্যে একজন বলেছিল যে, গোটা জঙ্গলে আপনি আপনার অধিকার দাবি করছেন। এটাই তো আমাদের কাজ। উত্তম স্থিতির একজন সাধক বিনম্রভাবে বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! এরা জাতিতে কোল-ভীল, এরা কি জানে সাধু কাকে বলে? পাথর ছুঁড়ে না মারে।’’ মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘ঠিক আছে বাছা! কিভাবে ভাঙ্গছ দেখছি? এবার আমি উল্টো মালা জপ করছি।’’ এরূপ বলে তিনি আসনে এসে বসেছিলেন। যে বাঁশে চড়েছিল, চাক ভাঙ্গার পূর্বেই কিছুক্ষণের মধ্যে তাতে আগুন লেগে গিয়েছিল। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল-বাঁচাও! বাঁচাও! যারা নীচে দাঁড়িয়েছিল

তারা বাঁচাবার জন্য এগিয়ে যেতেই তাদের পদশব্দে একটা অজগর ফোঁস করে উঠেছিল। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, দেখতে-দেখতে সেই লোকটি ধপাস করে পড়েছিল। সে আহত হওয়াতে, তারা পরস্পর চর্চা শুরু করেছিল যে, মনে হচ্ছে বাবাজী কিছু করেছেন। এই সমস্ত বলাবলি করতে-করতে তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে অন্য একজন কোল আবার একটা বটবৃক্ষে চড়ে মৌচাক ভেঙ্গে মধু সংগ্রহ করছিল। কিন্তু টাল না সামলাতে পারার জন্য মাটিতে পড়ে গিয়েছিল এবং তার মৃত্যু হয়েছিল। যারা সঙ্গে ছিল তারা তাকে বয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। দৈবযোগে তিনদিন পর গোটা গ্রাম ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলস্বরূপ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, কয়েকজন ব্যক্তি গ্রাম ছেড়ে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিল।

একমাস পর তারা সকলে পাথরা গ্রামের পণ্ডিত মশাই গণেশ নম্বরদারের কাছে গিয়ে বলেছিল, ‘‘আমরা বলতে পারছি না, আমাদের সঙ্গে আপনি চলুন মহারাজজীর কাছে, তাঁকে বলবেন তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন।’’ পণ্ডিতমশাইয়ের পিছন-পিছন পূজার সামগ্রী ধূপ, নারকেল, বাতাসা সঙ্গে নিয়ে সকলে অনুসুইয়া আশ্রমে পৌঁছেছিল। পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, ‘‘মহারাজ জী! এরা অজ্ঞানী, সরল স্বভাবের, সাধুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিৎ, এরা সেসব জানে না। ভগবান রামকেও এরা এই কথা বলেছিল-’’

পাপ করত নিসি বাসর জাহীঁ।
নহিঁ পট কটি নহিঁ পেট অঘাহীঁ।। *(মানস, ২।২৫০।৫)*

ইয়হ হমারি অতি বড় সেবকাঈ।
লেহি ন বাসন বসন চোরাঈ।। *(মানস, ২।২৫০।৩)*

তা সত্ত্বেও একজন ভীল, যার নাম খটখটা ছিল, সে সীতা মা-এর কাপড়-গয়না নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাকে লক্ষণ গুপ্ত গোদাবরীতে গিয়ে ধরেছিলেন। এই কোল-ভীলদের অপরাধের পরিণাম স্বরূপ গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মহারাজজী! এবার এদের ক্ষমা করে দিন।’’

মহারাজজী হেসে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আর কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। কুশলতা পূর্বক জীবন-যাপন কর। তারা প্রণাম করে ফিরে গিয়েছিল।

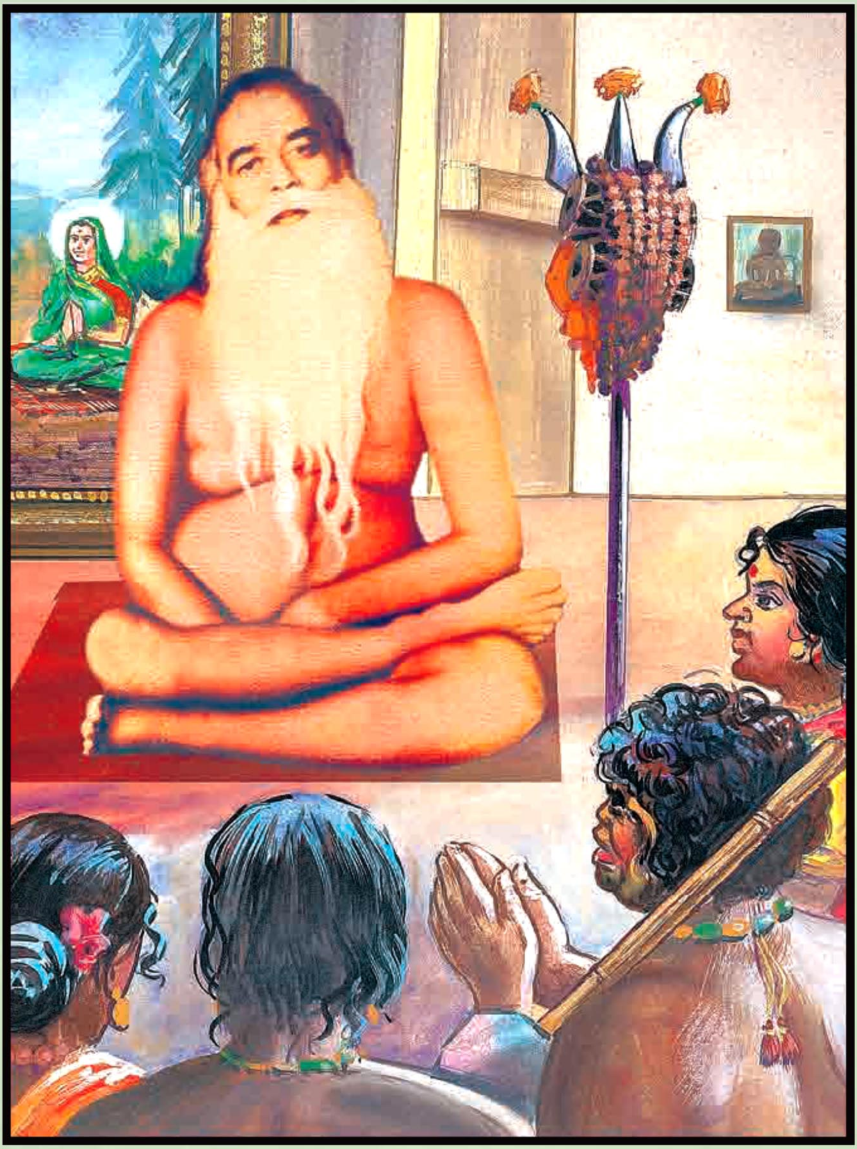

কোল-ভীল জাতির লোকেদের হৃদয় পরিবর্তন

এই ঘটনার ফলস্বরূপ জড়বুদ্ধি কোল-ভীলদেরও হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছিল এবং জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে তারা যথাসাধ্য আশ্রমের সেবা করতে শুরু করেছিল।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

মন্দাকিনী নদীর উদ্‌গম স্থান এবং জলবায়ু সমশীতোষ্ণ হওয়ার জন্য অনুসুইয়ার গভীর জঙ্গলে মশার খুব প্রকোপ ছিল। যখন থেকে মহারাজজী সেখানে থাকতে শুরু করেছিলেন, তারপর থেকেই তাঁর কাছে দর্শনাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের যাতায়াত শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রস্ত হয়ে থাকত, কারও দু'দিন, কারও তিনদিন, কারও চারদিন অন্তর নিয়মিত ভাবে জ্বর হত। সেই ঘন জঙ্গলে ডাক্তার, বদ্যিরও অভাব ছিল। সকলে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করত, 'মহারাজজী! কয়েকমাস ধরে জ্বরে ভুগছি, এখন তো মরতে বসেছি।' সস্নেহে দেখে তিনি বলতেন, ''পাপী কোথাকার! মরতে বসেছি বলছে। আচ্ছা, নে বিভূতি খেয়ে নে আর দণ্ডবৎ প্রণাম কর।'' যেমনি সে নত হয়ে প্রণাম করত, মহারাজজী এক ছড়ি পিঠে বসিয়ে দিতেন এবং হেসে জিজ্ঞাসা করতেন ''কতদিন পর-পর জ্বর আসছে?'' কেউ বলত একদিন পর, কেউ বলত, তিনদিন পর-পর, আবার কেউ বলত চারদিন পর-পর আসছে। মহারাজজী তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, এবারের মত ভোগ করে নাও, তারপরে এসো, দেখ কি হয়। তারা সেই সময়টা পার করে খুব উৎসাহিত হয়ে দুধ ইত্যাদি নিয়ে আসত এবং বলত যে, আর জ্বর আসেনি। মহারাজজী বলতেন, ''হুঁ! পাপ করবে তোমরা আর পাপের ফল ভোগ করবেন বাবাজী! যাও, জ্বর ছেড়ে গেছে।''

মহাপুরুষগণ ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করে তাকে পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। ''**তুরত বিভীষন পাছে মেলা। সন্মুখ রাম সহেউ সোই সেলা।।**'' ***(মানস, ৬।৯৩।২)***

এইরূপ প্রায় প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ আশ্রমে চলে আসত। অতএব মহারাজজীও ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে থাকতেন। ক্রমশঃ প্রত্যেকদিনই জ্বর আসত।

অনুপানে দুধের বিধান

মহারাজজীর খ্যাতি শুনে 'বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন'-এর সঞ্চালক রামনারায়ণ শাস্ত্রী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করেছিল। শাস্ত্রী মশাই তাঁর

জন্য ম্যালেরিয়ার ঔষুধ, সেবন বিধি বলে, ঠিক হয়ে যাবেন এ কথা নিশ্চয় করে বলে দিয়ে ঔষুধ রেখে যেতেন। তিনি হ্যাঁ, হুঁ! করে নিয়ে নিতেন, কিন্তু তারা আবার যখন আসতেন, তখন সেই ঔষুধ যেমনকার তেমন রাখা আছে, দেখতেন। তাঁরা দুখী হয়ে বলতেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত আপনি ঔষুধ সেবন করেননি কেন? দেখুন আপনার শরীর কালো হয়ে গেছে, জ্বর যেমন ছিল, তেমনি আছে।’’ তাঁরা ওষুধ সেবন করার জন্য আগ্রহ করতেন কিন্তু মহারাজজী বলতেন, ‘হো! ভগবান ঔষুধ সেবন করার আদেশ দেননি।’ তাঁরা প্রার্থনা করে পুনরায় ঔষুধ রেখে যেতেন, তা সত্ত্বেও মহারাজজী তা সেবন করতেন না। ঔষুধের দিকে দৃষ্টি পড়ত, ভগবান বারণ করতেন যে, সেবন করবে না, এটা ভোগ।

জ্বরের প্রকোপ শান্ত হয়নি। কবিরাজ মশাইয়ের ঔষুধ যেমনের তেমন রাখা ছিল। দুধ ছিল সেই ওষুধের অনুপান। দৈববশতঃ সেই সময় এক গোপালক কয়েকটি গাভী নিয়ে গিয়ে অনুসুইয়াতে বসবাস করতে শুরু করেছিল। এ কথা জানতে পেরে মহারাজজী বিচার করেছিলেন যে, দু-একদিন ঔষুধ সেবন করে নিলে কবিরাজ মশাইয়েরও মান রাখা যেত। অতএব তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘‘ঔষুধ সেবন করার জন্য আমার দুধের প্রয়োজন আমাকে একটু দুধ দেবে কি?’’ গোপালক সাদরে প্রণাম করে বলেছিল কেন দেব না! সব তো আপনার; কিন্তু আপনি দ্রৌপদী বাঈ-এর সঙ্গে যদি কথা বলে নিতেন, তবে ভাল হত, কারণ সব দুধ আমি তাকেই দিয়ে দিই। পরিবর্তে তিনি আমার জন্য রুটি তৈরী করে দেন।’’ মহারাজজী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয় ভেবে চুপচাপ ফিরে গিয়েছিলেন।

মহারাজজী গোপালকের কাছে গিয়েছিলেন, দ্রৌপদীবাঈ এ কথা জানতে পেরেছিল। সে গোপালকের কাছে গিয়েছিল। সব কথা শুনে পাহাড়ের উপর দিয়ে কিন্তু ঘুরপথে না গিয়ে সোজাপথে অনুসুইয়া মন্দিরে এসেছিল। মহারাজজী মন্দাকিনী নদীর তীর ধরে আশ্রমে ফিরছিলেন। মন্দির থেকে দ্রৌপদীবাঈ বলেছিল, ‘‘দণ্ডবৎ পরমহংসজী! এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন? কিছু কাজ ছিল কি?’’ তিনি বলেছিলেন, ‘‘কোন বিশেষ কাজ ছিল না, এমনি একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘তাও কিছু ব্যাপার নিশ্চয় আছে।’ মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘না কোন ব্যাপার নেই।’’

মন্দাকিনী নদীর তীরে পৌঁছেই মহারাজজী দ্রৌপদীবাঈকে গোপালকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফেলেছিলেন। দ্রৌপদীবাঈ সবকিছু জেনেও না জানার ভান করছিল, সেই জন্য তার প্রত্যেকটি বাক্যে জ্বর সন্তপ্ত মহারাজজীর অপ্রসন্নতা বেড়ে যাচ্ছিল। সে পুনরায় বলেছিল, "অনুসুইয়া মায়ের অন্ততঃ দর্শন করে নিন।" তিনি বলেছিলেন, "না দর্শন করব না।" সে বলেছিল, "যদি আপনি দেবী-দেবতাদের দর্শন করেন না, তবে এখানে কার ভজনা করেন?"

সেই সময় মহারাজজীর কাছে হাঁটু থেকে নীচু পর্যন্ত ঢিলা একটা মাত্র পাঞ্জাবি ছিল। সেটাই পরিধান করেছিলেন, নীচে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। তিনি সেই পাঞ্জাবি উপরে তুলে বলেছিলেন, "এর ভজনা করি! না ভজন, না চিন্তন, দুষ্টা কোথাকার। শুধু পিছনে লাগবে।"

দ্রৌপদীবাঈ হাসতে-হাসতে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে গিয়েও সে অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একজন বেঁটে পূজারী মশাই সেখানে যাতায়াত করতেন। তিনি এক ঘণ্টা পরে এসেছিলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন দ্রৌপদীবাঈ বলেছিল, "পরমহংসজী বিলক্ষণ মহাপুরুষ"-এবং পুনরায় হাসতে শুরু করেছিল। পূজারীমশাই মহারাজজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, দ্রৌপদীবাঈকে আপনি কি বলেছেন, আজ সে খুব আনন্দিত, কেবলই হাসছে। মহারাজজী বলেছিলেন, "সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কার ভজনা করেন, আমি বললাম, এই জননেন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস ও পূজা করি; কারণ যিনি জননেন্দ্রিয় ও জিহ্বাকে সংযম করেছেন, তিনি যে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন।"

এই প্রকার মহারাজজী কথাবার্তার মাঝেও যোগবিদ্যার গুহ্যতর রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটিত করতেন। এই ঘটনার পর মহারাজজীকে দেখে দ্রৌপদীবাঈ শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করত।

মহর্ষি অত্রির বিদ্যমানতা

অনবরত জ্বর থাকার দরুন মহারাজজীর শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, আগ্রা যাই, সেখানে ভক্তরা আছেই, গিয়ে দশদিন থাকব, সেরে উঠে পুনরায় ফিরে আসব। তিনি ট্রেনে আগ্রা গিয়েছিলেন। সেখানে লোকেরা খুব

ভক্তিভরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

রাত দুটোর সময় মহারাজজী মহর্ষি অত্রির স্বরূপ ধ্যানে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি মহারাজজীকে বলেছিলেন, "যদি দেহের চিন্তা করেন, তবে ভজনা করবেন কি করে? আশ্রমে চলুন।" মহারাজজী সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? সেখান থেকেই সঙ্কেত পাঠিয়ে দিতেন, আমি পৌঁছে যেতাম।" অত্রি মহারাজ বলেছিলেন, "আপনি চলে এলেন, তাই আমাকে আসতে হল।" মহারাজজী চিন্তন থেকে উঠে বসেছিলেন এবং সেই সময়ই অনুসুইয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। ভগবান ঔষুধ সেবন করার অবসর পর্যন্ত দেননি।

এই ঘটনার অনেক পরে মহর্ষি অত্রি পুনরায় একবার মহারাজজীকে দর্শন দিয়েছিলেন। একজন পণ্ডিত মশাই মুম্বাই থেকে অনুসুইয়া এসেছিলেন। তিনি অনুসুইয়া মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন। এইরূপ একজন মুম্বাই থেকে এসেছে মহারাজজীও সেটা জানতেন। এক রাত্রিতে পুনরায় মহর্ষি অত্রির স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এসে বলেছিলেন, "এই পণ্ডিত সাতদিন ধরে ধরনা দিয়ে পড়ে আছে। প্রাণ দেবার উদ্যোগ করছে। একে কিছু দিয়ে দেওয়া যাক, আপনি কি বলছেন।"

মহারাজজী বিনম্রভাবে বলেছিলেন, "আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার যা ইচ্ছা, তা দিন।" তিনি বলেছিলেন, "আপনাকে ছাড়া এখানে আর কে আছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করব?"

মহারাজজী বলতেন যে, অত্রি, অনুসুইয়া সকলেই নিজের সূক্ষ্ম শরীর, সহজ স্বরূপে নিজের স্থানে বিরাজমান। স্থূল দেহ তো রাম এবং কৃষ্ণেরও নেই, কোন অছিলায় আমার দেহও যাবে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে সর্বদা বিরাজ করব। ঋষি-মহর্ষি সকলেই স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন। যে কেউ শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে স্মরণ করবে, সেই আমার দর্শন পাবে। বাস্তবে এখনও মহারাজজী দর্শন দেন। যে কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তন করে, তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।

রামলখনদাসজীর আগমন

মহারাজজীর জ্বর উগ্ররূপ ধারণ করেছিল। দুর্বলতা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি এত বেশী দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, জল পান করতে যাবার শক্তিটুকুও বাকী ছিল না। মন্দাকিনী নদী এক'শ গজ নীচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল। সেখান পর্যন্ত

গিয়ে জল পান করে আসন পর্যন্ত ফিরে আসাটাও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। বহু কষ্টে নদীর কাছে গিয়ে জলপান করতেন, সঙ্গে করে যে পাত্রটা নিয়ে যেতেন, তাতে জল পূর্ণ করে ফিরে আসতেন। আসন পর্যন্ত এসেই সেটুকুও পান করে নিতেন। পুনরায় যাওয়া আর আসা। সেই তৃষ্ণার্ত অবস্থাতে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন গোটা বিশ্বের লোকের পিপাসা তাঁর ভিতর এসে ঢুকেছে।

একদিন জ্বরের ঘোরে মহারাজজী ইষ্টকে কিছু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "ইষ্ট হয়ে বসে আছো! ঘোর জঙ্গলে এনে ফেলেছ। দেখা-শোনা করারও কেউ নেই। আমার একজন সেবকও নেই যে একটু জলই না হয় খাইয়ে দিত।" জ্বরের ঘোরে কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন।

এই ঘটনার তিনদিন পর একজন সাধু এসেছিলেন এবং তাঁর সেবাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সাধুটি খুব তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে খাওয়াতেন, ধুনী জ্বালিয়ে রাখতেন কখনও আশ্রম পরিষ্কার করতেন। সব সময় কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনদিন পরে মহারাজজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে তুমি? আমার পিছনে কেন লেগেছ?" তিনি বলেছিলেন "মহারাজজী! আমি সাধু, আমার নাম রামলখন দাস। আমি ছোটবেলা থেকেই সাধুবেশে বিচরণ করছি। এখন আমার বয়স ষাট। যতদূর সম্ভব, সাধুদের করণীয় কর্তব্য পালন করেছি। তীর্থাটনে আমার রুচি।"

তিনদিন পূর্বে আমি প্রয়াগের মেলায় ছিলাম। রাত্রিবেলা স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলাম যে, অনুসুইয়ার পরহংসজীর সেবা কর, তাহলেই তোমার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীতে স্নান করা হবে। তারপরের রাত্রিতেও সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম। তার পরের রাত্রিতেও আবার আদেশ পেয়েছিলাম যে, এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। অনুসুইয়া গিয়ে তাঁর সেবা কর। তোমার গঙ্গা-যমুনা-তীর্থে স্নানের ফল এটাই। যখন পর পর তিনরাত এই এক স্বপ্নাদেশ পেলাম, তখন গঙ্গা-যমুনাকে প্রণাম করে সত্বর আপনার কাছে চলে এলাম। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "স্বপ্নে যে মহাপুরুষের সেবা করার নির্দেশ পেয়েছিলে, সে কি আমিই? অন্য কেউ নয় তো, যদি হয়, তবে যাও খোঁজ গিয়ে।" তিনি বলেছিলেন, "মহারাজজী! এই স্বরূপই পরপর ত্রিরাত্রি দেখেছি। এখন আপনি দয়া করে আমাকে নিজের সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না।" এইভাবে পূজ্য শ্রী মহারাজজীর সেবা করার প্রথম সৌভাগ্য দৈব প্রেরণাতে শ্রী রামলখনদাসজী লাভ করেছিলেন।

দ্রৌপদীবাঈ-এর ষড়যন্ত্র

যখন থেকে মহারাজজী অনুসুইয়াতে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে সতী অনুসুইয়ার আশ্রম সকল প্রকার বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত হয়েছিল। যাত্রী এবং বৈরাগী সাধুরা স্বেচ্ছাপূর্বক যাতায়াত করতে শুরু করেছিলেন। ভজনার উপযুক্ত স্থান মনে করে কয়েকজন সাধু সেখানে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাদের সংখ্যা ন'তে দাঁড়িয়েছিল। তারা জঙ্গলে ঘাসের কুটীর নির্মাণ করে বাস করছিলেন।

একদিন মহারাজজী ভজনাতে বসেছিলেন, ভোর চারটের সময় তিনি মহিলার গলার স্বর পেয়েছিলেন। তিনি রামলখনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এত ভোরে কে কথা বলছে? দেখ তো।" তিনি দেখে বলেছিলেন, মহারাজজী! দ্রৌপদীবাঈ এসেছে। ততক্ষণে সে মহারাজজীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, "কেন মহারানী! আমি তোমাকে কয়েকবারই বারণ করেছি যে, রাত্রে এখানে আসবে না, কেন এসেছ?"

দ্রৌপদীবাঈ বলেছিল-একজন বদমাইশ আমার কুটীরের ভিতর এসেছিল। সে আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে। মহারাজজী তার খোঁজ করুন।

মহারাজজী বলেছিলেন, "কেন! তোমাকে আমি হাজারবার সাবধান করেছি যে, তুমি এখানে কখনও সফল হবে না, এটা জঙ্গল-"**বিপিন বিপতি নহিঁ জাই বখানী**" ***(মানস, ২/৬২/২)***-চিত্রকূটে গিয়ে বাস কর; কিন্তু তুমি কখনও গ্রাহ্যই করনি। প্রকৃতি সর্বত্র বিদ্যমান। সদা সাবধান থাকা উচিত। মেয়েমানুষদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে ভজন করার বিধান নেই। শাস্ত্র বারণ করেছে। স্ত্রীলোকের স্বামী, ভাই অথবা পুত্রের সংরক্ষণে থেকেই ভজনা করা উচিত। হ্যাঁ যখন উদাত্ত অবস্থা লাভ হবে, তখন মীরার মত বাইরেও যাওয়া যেতে পারে। কদাচিৎ গৃহত্যাগ করলেও স্ত্রীলোকের সমূহে থাকা উচিত, যেখানে তাদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। এবার দেখলে কেমন বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এখন এখান থেকে যাও, সকালে এসো।

ব্যাকুল দ্রৌপদীবাঈ তখন সেখানে গিয়েছিল, যেখানে অন্যান্য সাধুদের নিবাস ছিল। সেই মহাত্মাদের প্ররোচনায় দ্রৌপদীবাঈ মহারাজজীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও পুলিশে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল যে, পরমহংসজী আমার কুটীরে এসেছিলেন।

সেই সময় ভারতবর্ষ ছোট-ছোট রাজা-রাজড়াদের শাসনে বিভক্ত ছিল। কেবলমাত্র চিত্রকূটেই সাতটি স্টেট ছিল। একটা স্টেটে একজন নগর রক্ষক এবং পাঁচ-সাতজন সৈনিক, এতই সৈন্যবল থাকত। দারোগো, কয়েকজন সেপাই নিয়ে এসে মহারাজজীকে বলেছিল, "আপনার নামে নালিশ আছে, থানায় চলুন।" মহারাজজী বলেছিলেন, "দেখ আমি সত্যিকারের সাধু। ভগবান আমাকে সাধু বানিয়েছেন। আমাকে জ্বালাতন কোরো না। আমাকে দেখে অপরাধী মনে হচ্ছে কি? এখানে আরও লোক থাকে। তুমি সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ কর, যে অপরাধী তাকে ধর। আগে জেনে তো নাও।"

দারোগা সেই ন'জন সাধু এবং দ্রৌপদীবাঈকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তাঁকে বলেছিল, "এদের সকলকে নিয়ে এসেছি, এবার আপনিও চলুন।" মহারাজজী বলেছিলেন, "আগে এদের পৃথকভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা কর। আসন থেকে আমাকে উঠিয়ো না, তা না হলে সবরকমের দুর্গতি হবে তোমার।"

দারোগা জিদ ধরে বসেছিল। বলছিল "মহারাজজী আমরা আইনের অধীন।" মহারাজজী ইষ্টকে প্রার্থনা করেছিলেন, "ভগবন্! এ কি রকম ষড়যন্ত্র?" জবাব পেয়েছিলেন, পাপগ্রহের প্রভাবে এমন হচ্ছে, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক হয়ে ভজনা কর। শুভ সঙ্কেত পেয়ে তিনি আসন ছেড়ে উঠে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। তিনি ভেবে-ভেবে যাচ্ছিলেন যে, দেখি ভগবান পাপ গ্রহের প্রভাব থেকে কি করে মুক্ত করেন? অন্য সব সাধুরা পুলিশের বেষ্টনীর ভিতর হাঁটছিলেন, কিন্তু মহারাজজী তাদের থেকে ব্যবধান রেখে সহজভাবে ধ্যানস্থ হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে যাচ্ছিলেন।

থানা পর্যন্ত পৌঁছাতে-পৌঁছাতে দ্রৌপদীবাঈ পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের শাড়ি ছিঁড়ে খুলে ফেলে দিয়েছিল। কামতানাথ গ্রামের কিছু স্ত্রীলোক ছুটে গিয়ে তাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সে বারবার নির্বস্ত্র হয়ে যাচ্ছিল। সে বলছিল, "পরমহংসজী কিছু তুক করেছেন। আমার একি হল। পরমহংসজী নির্দোষ, এই সাধুদের মধ্যেই কেউ ছিল। একথা শুনে ভীড় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকে ভেবেছিল পরমহংসজীই তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। দ্রৌপদীবাঈ চিৎকার করে বলছিল, "এই সাধুদের উস্কানিতে আমি পরমহংসজীর নাম নিয়েছিলাম, উনি নির্দোষ মহাপুরুষ। একথা বলেই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছিল। মহারাজজী আমাকে ক্ষমা করুন।" তিনি আশীর্বাদ দিয়ে প্রসন্ন মুদ্রাতে বলেছিলেন-

বিনা বিচারে জো করে, সো পাছে পছতায়।
কাম বিগারে আপনো, জগ মে হোত হঁসায়।।

মীমাংসা হওয়ার পর দারোগা বলেছিল "ঠিক আছে, মহারাজজী আপনি যান। ও কিছু ব্যাপার নয়।" মহারাজজী বলেছিলেন, "কিছু নয় কি করে, তুমি আমাকে আসন থেকে উঠিয়ে এখানে নিয়ে এলে। এটাই তো ভুল করলে।"

কয়েকমাস পরে দ্রৌপদীবাঈ সতী অনুসুইয়াতে বাস করার ইচ্ছা নিয়ে ফিরে এসেছিল। কিছু বিঘ্ন আবার ঘটেছিল। তখন সে নির্ণয় করেছিল যে, পরমহংসজী ঠিকই বলেন। তিনি মহাপুরুষ, অতএব সে সর্বদার জন্য অনুসুইয়া ত্যাগ করেছিল।

মহারাজজী বলেছিলেন, "হো! ভগবান রক্ষা করলেই সাধক রক্ষা পায়। যে নিজের বল-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে পথ ভুলে যায়।"

ধরী না কাহুঁ ধীর, সবকে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর তে উবরে তেহি কাল মহুঁ।। ***(মানস, ১।৮৫)***

কিছুদিন পর স্টেটগুলি ভারত সরকারের অধীনে হওয়ার পর, সেই দারোগার চাকরী চলে গিয়েছিল। চাকরীতে থাকাকালীন তিনি যা কিছু জমা করেছিলেন, সেই পয়সা দিয়ে একটা ট্রাক কিনেছিলেন। একটা দুর্ঘটনাতে সেই ট্রাক গভীর খাদে পড়ে খান-খান হয়ে গিয়েছিল। কিছুকাল পর সেই দারোগা একটা ফতুয়া এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পায়জামা পরে অনুসুইয়া গিয়েছিলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলেন। মহারাজজী তাকে দেখে বলেছিলেন, "আরে দারোগাবাবু। এসো বসো।" তিনি বলেছিলেন, "দারোগা কি মহারাজজী, এখন তো সব ফুরিয়ে গেছে। যত টাকা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। ঘরে ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে। গোটা পরিবার খিদেয় মরতে বসেছে। মহারাজজী! এবার দয়া করুন। আমি কায়স্থ, কোন আশ্রয় নেই। ক্ষমা করে দিন। মহারাজজী আশীর্বাদ করুন।" মহারাজজী বলেছিলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে! বিভূতি খাও এবং গিয়ে এবার নিজের সংসার সামলাও।" মহারাজজীর আশীর্বাদ নিয়ে তিনি খুশী হয়ে চলে গিয়েছিলেন, এবং ধীরে-ধীরে তাঁর সংসারে সচ্ছলভাব ফিরে এসেছিল এবং তিনি সংসারে সানন্দে থাকতে-থাকতে মহাপুরুষদের সেবা করা শুরু করেছিলেন।

শাস্ত্রার্থে বিজয়

দ্রৌপদী বাঈ এবং ভক্তদের সান্ত্বনা দিয়ে মহারাজজী বিচরণ করতে-করতে রাজাপুরের দিকে গিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ সন্ত এবং মহাকবি গোস্বামী তুলসীদাসের জন্মভূমি হওয়ার জন্য রাজাপুর বিখ্যাত। রাত্রিতে অনুভবে তিনি জানতে পেরেছিলেন, যে শাস্ত্রীয় আলোচনাতে তিনি বিজয়ী হয়েছেন। মহারাজজীর পার্থিব শিক্ষা শূণ্য ছিল। শাস্ত্রীয় আলোচনা অথবা বাদানুবাদ করা তাঁর স্বভাবও ছিল না। অতএব এইরূপ অনুভব হওয়াতে মহারাজজীর খুব কৌতূহল হয়েছিল।

পরের দিন তিনি রাজাপুর পৌঁছেছিলেন। সেইসময় সেখানে শাস্ত্রীয় আলোচনা হচ্ছিল। লোকে তাঁকে বলেছিল তিনদিন ধরে রামচরিতমানসের একটি পঙ্‌ক্তিকে নিয়ে বিবাদ চলছে যে, গোস্বামীজী অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনগমন প্রসঙ্গে-“**তেহি অবসর এক তাপসু আওয়া। তেজপুঞ্জ লঘু বয়স সুহাওয়া।।**” ***(মানস, ২/১০৯/৭)*** বলে যে তপস্বীর বর্ণনা করেছেন, তিনি বাস্তবে কে ছিলেন? তারা মহারাজজীকে এই সন্দর্ভে বিচার ব্যক্ত করার জন্য অনুনয় করেছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন-“ভাই, মনে করুন আপনি কারও ঘরে গিয়েছেন, তিনি যদি ভাল মানুষ হয়ে থাকেন, তবে দশ পা এগিয়ে এসে স্বাগত জানাবেন। সেইরূপ ভগবান রাম যখন চিত্রকূটে পদার্পণ করেছিলেন, তখন কামতানাথ স্বয়ং বিপ্ররূপ ধারণ করে স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং দেখা করে ফিরে গিয়েছিলেন।”

মহারাজজী যদিও হালকাভাবে এসব কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেটা এত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে, সকলেই বাহ্‌বা করে উঠেছিল। তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করে মালা পরিয়েছিল। মহারাজজী তাদের বলেছিলেন-“এটা মানস। মানস, অন্তঃকরণকে বলে। এটা হল তোমাদের অন্তঃকরণের বিবরণ। এ বিষয়ে তখন বলব, যখন অভ্যাস আরও দৃঢ় হবে। খুব নাম জপ কর।” তাদের বুঝিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন।

হাতে ফোড়া

অনুসুইয়ার নিকটবর্তী গ্রাম নবস্তাতে বলদেব পাণ্ডে নামের একজন ভদ্রলোক থাকতেন। তার হাতে ফোড়া হয়েছিল। খুব বেশী ব্যথার জন্য তিনি তিনদিন ও

তিনরাত ঘুমোতে পারেননি। ব্যাকুল হয়ে মহারাজজীর দর্শন করার জন্য আশ্রমে গিয়েছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন-''পাণ্ডে লুচি বানাবে না?'' তিনি বলেছিলেন, ''আমি তো মরে যাচ্ছি মহারাজজী।'' তিনি বলেছিলেন-''কেন মরছ, এখন তো লুচি তৈরী করতে হবে। যাও গিয়ে তৈরী কর।'' পাণ্ডেজী বলেছিলেন-''হাত যে তুলতেপারছি না।'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''এসো। এখানে এসো। দেখি তো।'' মহারাজজী তার হাতটি অল্প টিপে, টোকা দিয়েছিলেন। তারপর পাণ্ডেজী ধীরে-ধীরে লুচি ছাঁকতে শুরু করেছিলেন। ভক্তরা খাওয়া-দাওয়া করে চলে গিয়েছিল তারপর মহারাজজীর হাতে ব্যথা শুরু হয়েছিল।

নবম দিনে মহারাজজীর হাতে এত ব্যথা শুরু হয়েছিল যে, দিনে রাত্রিতে কখনও এতটুকু আরাম বোধ হচ্ছিল না। তিনি বসে-বসে ফোড়াতে ক্রমাগত জল দিতে শুরু করেছিলেন। ব্যথা এত অসহ্য ছিল যে, চোখে জল চলে আসছিল। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নিবৃত্তি হয়ে গেছে, তবে ফোড়া হল কি করে? ইষ্ট বলেছিলেন-সেই পণ্ডিতের ফোড়া স্পর্শ করে তার ভোগ নিজের উপর নিয়ে নিয়েছ। এই ফোড়ার জন্য তার বারমাস কষ্টভোগ ছিল, তুমি কি বার দিনও ভোগ করবে না? একথা শোনার পর তিনি চোখের জল মুছতেন ও দিন গুনতেন, দশ, এগারো এবং বার-পরশু ঠিক হয়ে যাবে। নিজেকে নিজে বলতেন-''ভোগ করে নাও পরমহংসজী!'' **দয়া বিন সন্ত কসাই। দয়া করী তো আফত আঈ।।** ঠিক দ্বাদশ দিনে ফোড়া থেকে সমস্ত দূষিত রস বেরিয়ে গিয়েছিল এবং হাত সেরে উঠেছিল।''

এই ঘটনার পর মহারাজজী স্পর্শ করার প্রতি সজাগ হয়ে গিয়েছিলেন। স্পর্শ করতেন না এবং স্পর্শ করতে দিতেনও না। তখন থেকে তিনি লোকের কল্যাণ করলেও স্পর্শ করতে দিতেন না। যখন শ্রদ্ধালু ভক্তরা নিজের দুঃখের কথা বলে, কৃপা যাচনা করতেন, তিনি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারাই তাদের সুস্থ করে দিতেন। বিশেষ-বিশেষ কারণে স্পর্শও করতেন, মহারাজজী বলতেন যাঁর নিবৃত্তি হয়ে গেছে সেই মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় স্পর্শ করলে মৃত্যুও কেটে যাবে; কিন্তু সেই ব্যক্তির দুর্ভোগ কেটে গেলেও সেটা মহাপুরুষকে ভোগ করতে হবে। কাঁকরের আঘাতে পাখি মরতে পারে। কিন্তু সেইরকম হাজার-হাজার কাঁকর ছুঁড়ে মারলেও গজরাজের কিছু হয় না। সেইরূপ যে পাপ কোন দেহকে আত্মা থেকে পৃথক করতে সক্ষম, মহাপুরুষ সহজেই তার ফল ভোগ করে তার গতি নিয়ন্ত্রিত করে দেন।

অনুসুইয়ার সিদ্ধ বাবা

স্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ মহারাজজীর কাছে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলেন, একদিন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘এই কুঠুরীগুলি কে তৈরী করিয়েছিলেন?’’ তাঁরা বলেছিলেন ‘‘এগুলি সিদ্ধবাবার আশ্রমের কুঠুরী। প্রায় দেড়’শ বছর আগে এখানে একজন সিদ্ধবাবা থাকতেন। তিনি উচ্চকোটির মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধবাবা এবং তিনি ছিলেনও সিদ্ধপুরুষ। তাঁর শিষ্য এক লক্ষেরও বেশী ছিল। প্রায় চার’শ গাভী তাঁর কাছে ছিল। যে কড়াইতে মালপুয়া তৈরী হত, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ ছিল দশ-পনেরো ফিট। ভক্তগণ চারটি গ্রাম তাঁর সেবাতে অর্পিত করেছিলেন।’’

মহারাজজী তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর বংশের কেউ কি জীবিত আছে? তাঁরা বলেছিলেন, ‘‘একটা ছেলে আছে, তার নাম গুরুপ্রসাদ, জমিদারের বাড়ীতে থাকে।’’ মহারাজজী ভেবেছিলেন, যা হোক, সে সাধুর অংশ। এখানে থাকলে আমার সেবা করত। তিনি গুরুপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যোলো-সতেরো বছরের শীর্ণদেহী একটি ছেলে এসেছিল। সানন্দে সে মহারাজজীর সেবাতে নিযুক্ত হয়েছিল।

তিনদিন পর সে মহারাজজীকে বলেছিল, ‘‘জমিদারকে গিয়ে খবর দিয়ে আসি যে, মহারাজজীর সেবাতে নিযুক্ত হয়েছি, অনুমতি নিয়ে সে চলে গিয়েছিল। যখন ফিরে এসেছিল তখন তার সঙ্গে একটি মেয়েছেলে ছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘কেন রে। এই ভবানী কে?’’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘‘মহারাজজী আমার স্ত্রী।’’ মহারাজজী চটে উঠেছিলেন, ‘‘তুই আগে বলিসনি কেন, যে তোর বিবাহ হয়ে গেছে। এবার যা এখান থেকে, আমি তোকে আর থাকতে দিতে পারব না। যেখান থেকে এসেছিলি, সেখানেই ফিরে যা’’, তাঁর একথা শুনে দু’জনেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। মহারাজজী দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, এখন কি করা যায়? এইভাবে এক একটা দিন পার হয়ে যাচ্ছিল। ধীরে-ধীরে চিত্রকূট পর্যন্ত এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহারাজজীর ছেলে ও মেয়ে এসেছে।

পাপগ্রহের অবসান

একদিন মহারাজজী ধুনির পাশে বসে সৎসঙ্গ করছিলেন। সূর্য বহু আগেই পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। তাঁর কাছে চার-পাঁচজন সাধক ও দু’-চার

জন ভক্ত বসেছিল। গুরুপ্রসাদ ও তার স্ত্রী দূরে বসে কোন কথা নিয়ে ঝগড়া করছিল। হঠাৎ সে নিজের স্ত্রীকে এক চাপড় মেরেছিল। তার স্ত্রী উঠে দ্রুতপদে জঙ্গলে গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিল। গুরুপ্রসাদ কিছুক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। এক ঘণ্টা পার হওয়ার পরেও যখন তার স্ত্রী ফিরে আসেনি তখন সে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল। এদিক-সেদিক খুঁজে না পেয়ে মহারাজজীর কাছে এসে কাঁদতে শুরু করেছিল। বলেছিল তার স্ত্রী জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। তাকে খোঁজার আদেশ দিন সবাইকে, তা না হলে বাঘ-ভালুক খেয়ে ফেলবে। তিনি তাকে বকে বলেছিলেন, ‘‘যদি এতই স্নেহ তার প্রতি, তবে কেন থাপ্পড় মারলে?’’ মহারাজজী ভক্তদের বলেছিলেন, ‘‘যাও খোঁজো গিয়ে, সত্যি বাঘে না খেয়ে ফেলে।’’ ভক্তরা এবং গুরুপ্রসাদ সকলেই মেয়েটিকে খুঁজতে আরম্ভ করেছিল।

জঙ্গলে গিয়ে সকলেই তার নাম ধরে ডাকছিল। এভাবে অনেক রাত হয়েছিল। মহারাজজীর মনেও দয়া হয়েছিল। তিনি শুভাশুভের নির্ণয় করেছিলেন তারপর যেদিকে যাবার নির্দেশ পেয়েছিলেন, সেদিকেই গিয়েছিলেন। তিনি ছাদে গিয়েছিলেন। দেওয়াল ঘেঁসে কালো মতো কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল অজগর সাপ, আরও এগিয়ে গিয়ে বিচার করেছিলেন এ জায়গাটা তো পরিষ্কার, কোন কাঠ পড়ে গেছে কি? হঠাৎ সে উঠে মহারাজজীর দিকে দুবাহু প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাম বাহু স্ফুরিত হয়েছিল। মহারাজজী সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। কাছে আসতেই চিনতে পেরেছিলেন গুরুপ্রসাদের স্ত্রীকে, তিনি তাঁর ছড়িটি তুলে জোরে ধমকে উঠেছিলেন, ‘‘পেত্নী কোথাকার। গা ঘেঁষতে চাইছে। দেখ তো রে! তোর স্ত্রী এখানে ছাদে রয়েছে।’’ বকুনি খেয়ে সে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে গুরুপ্রসাদ এসে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই রাতেই মহারাজজী অনুভব দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, আজ থেকে পাপগ্রহের প্রভাব শেষ। যেন শূর্পনখার নাক কান কাটা গেল। জীবনে আর কোন বাধা নেই। মহারাজজী আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে, ওহ! সরল মনের এই বাচ্চাদের ভিতর প্রবেশ করে পাপগ্রহ তার প্রভাব দেখাচ্ছিল। পরদিনই পাথরা গ্রামের এক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি গণেশ নম্বরদারকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে যখন এসেছিল, তখন বলেছিলেন, যেমন করেই হোক এদের জন্য গ্রামে থাকার একটা ব্যবস্থা কর এবং আজকেই এদের এখান থেকে নিয়ে যাও। দেখো, এদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

নম্বরদার তিনশো টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনেছিল এবং তাদের সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন মহারাজজী খুব প্রসন্ন ছিলেন, যে, পাপগ্রহের প্রভাব কেটে গেছে। ভবিষ্যতে তাঁর আর কোন বিপদ হবে না।

তুলসীদাস এহি জীব মোহ-রজু, জেহি বাঁধ্যো, সোই ছোরৈ। ***(বিনয়০, পদ ১০২)***

সাধককে সর্বদা ভগবানের উপর ভরসা করে চলা উচিত।

সিদ্ধবাবার তক্তাপোষ ও মহাত্মা

আশ্রমে বসার জন্য কিছু ছিল না। ভূমিতেই আসন পাতা ছিল, অতএব মহারাজজী সিদ্ধবাবার তক্তাপোষটি আশ্রমে আনিয়েছিলেন। তিনি তক্তাপোষটির উপর বসতে শুরু করেছিলেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তি এবং সাধু মহাত্মাদের আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। এক সাধু মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘আপনি সিদ্ধবাবার তক্তাপোষের উপর বসেন কেন?” মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘সিদ্ধপুরুষের তক্তাপোষে সিদ্ধপুরুষই বসতে পারেন, সেইজন্য তো বসেছি।” উপর্যুক্ত সাধুবাবা জিদ ধরেছিলেন যে, সিদ্ধ বাবা আমাদের সম্প্রদায়ের ছিলেন, আমি এই তক্তাপোষেই বসব। ব্যর্থ বিবাদে পড়া উচিত নয় ভেবে মহারাজজী সেই তক্তাপোষটি সেখান থেকে সরিয়ে রাখতে বলেছিলেন। তিনি তক্তপোষ থেকে উঠে গিয়েছিলেন এবং নিজের আসনে গিয়ে বসেছিলেন। সেই সাধুবাবু মালার থলিতে হাত ঢুকিয়ে তক্তাপোষের উপর গিয়ে বসেছিলেন।

পরের দিন সকালবেলা মহারাজজীর সব কথা মনে পড়েছিল। তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু সেই সাধুবাবাকে কোথাও দেখতে পাননি। তিনি আশ্রমের সাধুদের ডেকে বলেছিলেন, ‘‘সাধুবাবাকে খোঁজ, তিনি কোথায় চলে গেলেন? খুঁজতে-খুঁজতে সকলেই সাধুবাবাকে একটা গুহার ভিতরে দেখেছিলেন। সেই গুহা থেকে অসুস্থ দেহের গন্ধ আসছিল। মহিষের ন্যায় রক্তনেত্রে তিনি সকলকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তীব্র জ্বরে তাঁর দেহখানি কাঁপছিল। একজন সাধু বলেছিলেন-‘‘দেখ, গিয়ে মহারাজজীর পায়ে পড়ে ক্ষমা যাচনা কর, তা না হলে কাঁপতে-কাঁপতে মরেও যাবে। কাল অকারণে মহারাজজীর সঙ্গে শঠতা করেছিলে।” সাধুবাবা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মহারাজজীর কাছে গিয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। মহারাজজী আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন,

"ধুনিতে প্রণাম করে বিভূতি মেখে বিভূতি খেয়ে নাও, বিভূতি খেয়ে তিনি বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, "মহারাজজী, এটা বিলক্ষণ তক্তাপোষ। রাত্রে আমাকে মাটিতে ফেলে তক্তাপোষটাই আমার উপর চেপে বসেছিল। সকালবেলা কোনরকমে এর তলা থেকে বেরিয়ে গুহায় গিয়ে শরণ নিয়েছিলাম। কোনরকমে প্রাণ রক্ষা হয়েছে। এখন আশীর্বাদ করুন যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ কোন অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে। এবং যেন ভক্তি লাভ হয়। আপনি মহাপুরুষ। মহারাজজী! আপনি থাকুন এখানে। এই তক্তাপোষে আমি আর বসব না। এইপ্রকার নিবেদন করে তিনি চলে গিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার শমন

অল্পাবধিতেই শ্রী পরমহংসজী অনুসুইয়া আশ্রমে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধি দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধু-মহাত্মাদের সমূহে যারা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ বিচারধারা যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রতিস্পর্ধার মনোভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল, পরিণামস্বরূপ এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধুবেশধারীগণ তাঁকে অঘোরী, ভণ্ড ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অপমানিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তাদের দুরভিসন্ধির কোন প্রভাব পড়ত না মহারাজজীর উপর। মহারাজজী সহজ বাণীতে তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, ভগবৎ পথে কোন সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ বা হীন নয়। এগুলি গোঁড়ামী ছাড়া কিছু নয়। আমি সব মত-মতান্তরের মধ্যে দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমি এগুলি বিশ্বাস করি না এবং আমার কোন সম্প্রদায়ও নেই। ধীরে-ধীরে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক সাধু মহাত্মাদের ভ্রম দূর হয়েছিল। তাদের হৃদয়ে মহারাজজীর সাধুতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও মহাত্মাদের একটা বর্গ তখনও এমন ছিল, যারা মহারাজজীর বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছিল। সেই সঙ্ঘের সাধুরা মিলে এক নাগাবাবাকে প্ররোচিত করে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। সেই নাগাবাবা পরিকল্পনানুযায়ী হত্যা করার জন্য ছুরি নিয়ে অনুসুইয়া আশ্রমে এসে পৌঁছেছিল। মহারাজজীকে ছুরি দেখিয়ে দূর থেকেই বলছিল, "পরমহংসজী! এই তীক্ষ্ণ ধার ছুরিটি আপনার জন্যই এনেছি। সাধুদের খুব তো বিরক্ত করেন। এ জায়গা আমাদের।"

মহারাজজী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভগবন্! ভজনাই তো করার

ছিল, তবে এই রাগ-দ্বেষের জায়গাতে কেন নিয়ে এলেন? কেউ বলে আমাদের জায়গা, কেউ বলে মেরে ফেলব আপনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের।" ভগবান তখন বলেছিলেন, "আমি বসিয়েছি, অতএব শুধু বসে থাকো, এসবের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন।" একথা শুনে মহারাজজী নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রাত্রির ঘন অন্ধকারে যেমনি সেই দুরাত্মা ষড়যন্ত্রের পূর্তি হেতু আশ্রমের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তেমনি পক্ষাঘাতে পীড়িত হয়েছিল। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। এদিকে মহারাজজী শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন। সকালবেলা চাদরের ঝুলিতে বাঁশের সাহায্যে পালকির মত করে তাতে সেই নাগাবাবাকে বসিয়ে দুজন সাধু, একজন আগে ছিল একজন পিছনে, আশ্রমে বয়ে নিয়ে এসেছিল। তৃতীয় একজন সাধু নাগাবাবার কাপড় চিমটা নিয়ে তাদের পিছু-পিছু এসেছিল। মহারাজজী নিজের আসনে বসেছিলেন। সম্মুখ দিয়ে মন্দাকিনী নদী বয়ে যাচ্ছিল, নদীর কুল ধরে তারা এগিয়ে এসেছিল। সেই নাগাবাবা সুস্থ হাতটা ঝোলা থেকে বার করে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল, "পরমহংসজী দণ্ডবৎ।" মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কে ভাই?" সে বলেছিল, "মহারাজজী আমি সেই নাগাব্যক্তি, যে আপনাকে ছুরি দেখিয়েছিল।" তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার কি হয়েছে?" সে বলেছিল, "মহারাজজী! পক্ষাঘাত হয়েছে। ডান দিকটা অবশ হয়ে গিয়েছে। মহারাজজী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মহারাজজী দয়ার্দ্র হয়ে সেই বাবাজীকে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তার হৃদয়ে মহারাজজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল।

এইপ্রকার মহারাজজীর ভজনপথে যত বাধা বিপত্তি ছিল, সব স্বতঃ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্বিঘ্নে যোগ-সাধনাতে প্রবৃত্ত থেকে জনজীবনের কল্যাণ করছিলেন। প্রায়ই মহারাজজী সাধকদের বোঝাতেন যে, বস্তুতঃ ভগবান যখন দয়া করেন, তখন বিপত্তিই সম্পত্তি হয়ে যায়। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ-এর জীবনে ভগবৎ কৃপাতে বিপত্তিগুলিই সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য নির্ভয়ে বিপত্তিগুলিকে স্বাগত জানানো উচিত।

যে প্রকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিন্ন-ভিন্ন বেশ দেখা যায়, কিন্তু তাদের শিক্ষা এবং শিক্ষালব্ধ উপাধিগুলি এক রকমের, সেইপ্রকার সাধকদের জীবন যাত্রার রীতিতে যে পার্থক্য দেখা যায়, সেটা ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর জন্য দেখা যায়। কেউ সাধনের

আরম্ভিক স্তরের, কেউ মধ্যম স্তরের, কেউ উন্নত এবং উচ্চতম অবস্থা যুক্ত, সেইজন্য এদের জীবনযাত্রার রীতিও পৃথক হবে। পরমাত্ম পথে যে যোগক্রিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া যায়, তা এক। অনুভূতি একরকমের, পরিণামও এক, তবে কিরূপ সম্প্রদায়? তিলক, স্বরূপ, বেশভূষা ইত্যাদি গুরুকূলের পরিচয়। কিন্তু সকলেই এক পথের পথিক।

আকাশবৃত্তি দ্বারা আশ্রমের ব্যবস্থা

রামলখনদাস নামের যে সাধুটি প্রয়াগ থেকে এসেছিলেন, তিনি সকাল ন'টা পর্যন্ত মহারাজজীর সেবা কার্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে যেতেন, পুনরায় সন্ধ্যাবেলাতেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। একদিন মহারাজজী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, সারাদিন কোথায় থাকো? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! আমি ভিক্ষা করে বেড়াই।’’ মহারাজজী তার কথা শুনে বলেছিলেন, আমার ব্যবস্থা আকাশ বৃত্তি দ্বারা হয়। তিনি রামলখনদাসকে ভিক্ষা করতে বারণ করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, ব্যাপারটা এই হচ্ছে মহারাজজী, কিছু সাধু মহাত্মাও তো এখানে আসেন। ভিক্ষা দ্বারা তাদের সেবা হয়। মহারাজজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভিক্ষা করাটা এর অভ্যাস হয়ে গেছে, এত তাড়াতাড়ি যাবে না। তিনি শুধু এটুকুই বলেছিলেন, ‘‘দেখ! ভিক্ষার একটা কণাও আমাকে খেতে দিও না। আমি যে কুঠুরীটিতে থাকি, সেখান থেকে জিনিষ নিয়ে যেও এবং রান্না করে খেতে দিও তা না হলে তুমি আমার চিন্তা ছাড়।’’ কিন্তু এত কথার পরেও রামলখনদাসের ভিক্ষা করা বন্ধ হয়নি।

রামলখনদাস বয়সে প্রবীণ হয়েও স্ফূর্তির ভাণ্ডার ছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পঁচিশ কিলোমিটারেরও বেশী ঘুরে আসতেন। বৈষ্ণব সাধুদের মাঝে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। অনেক সাধু তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। পর্বতের পাদদেশ দিয়ে নদী বয়ে গিয়েছিল তার থেকে একটু উঁচুতেই মহারাজজীর আসন ছিল। রামলখনদাসজী আশ্রমের উপরের খণ্ডে একটি কুঠুরীতে থাকতেন, যাতে মহারাজজীর শান্তি বিঘ্নিত না হয়। বৈষ্ণব মহাত্মাগণ মহারাজজীকে দূর থেকে নমস্কার করে সোজা রামলখনদাসজীর কাছে চলে যেতেন। তাঁরা আগে খাওয়া-দাওয়া করতেন তারপর চিমটা বাজিয়ে অনুরাগপূরিত হৃদয়ে কীর্তন করতেন-‘‘সীতারাম-সীতারাম-সীতারাম জয় সীতারাম।’’ কীর্তনের অক্ষরগুলি এই ছিল।

মহারাজজী বলতেন, সাধুদের এই কীর্তন শুনতে খুব ভাল লাগত। কারণ তারা ভগবানের নামই তো নিত। কখনও-কখনও আমি বসে শুনতাম, তারপর কিছুক্ষণ শোনার পর মনে হত, এইভাবে মাথার উপর টন-টন কতদিন চলবে? এখন তো আমার শান্ত, নিরিবিলিতে চিন্তন-কার্য-এ বাধা পড়ছে। এ বিষয়ে তিনি সাধুদের সচেতন করেছিলেন, ‘‘জঙ্গলেও বাধা! সীতারাম-সীতারাম! সীতারাম কি কালা যে চিৎকার করছ? তাঁরা কি কোথাও চলে যাচ্ছেন, যে সমানে ডেকে যাচ্ছ, কি বলব। নিজের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করতে নেই। ইষ্টের চিন্তা করতে-করতে মনে-মনে তাঁর নাম নিতে হয়। হৃদয়ে স্মরণ যখন অনবরত চলতে থাকে, তখন একেই ভজনা বলে।’’

কোন-কোন সাধু রেগে বলতেন যে, ইনি কি ধরণের মহাপুরুষ? নিজে রাম নাম জপ করেন না, আবার আমাদেরও জপ করতে দেন না। রামলখনদাসজী তাঁদের বোঝাতেন যে, মহারাজজীকে কিছু বোলো না। তিনি মহাপুরুষ, ভজনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত। রামলখনদাসজীকে তো তাঁরা কিছু বলতে পারতেন না, কিন্তু মনে দুঃখ পেতেন।

কয়েকদিন পর তাদের মধ্যে কয়েকজন সাধু বেদান্তাচার্যের নিকট অযোধ্যা গিয়েছিলেন। বেদান্তাচার্য অযোধ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ, শাস্ত্র সমূহের নিষ্ণাত বিদ্বান এবং ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। সেই সাধুরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন, বেদান্তাচার্য মহারাজ, আপনি এত বড় মহাপুরুষ, অযোধ্যার সর্বোপরি মহাত্মা, আপনার শিষ্য একজন পরমহংস মহারাজের সেবা করছে। কি জানি তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। স্নান-টান কিছুই করেন না। চলুন নিজের শিষ্যকে রক্ষা করুন। খুব অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে।

বেদান্তাচার্য মশাই বলেছিলেন, ‘‘সেরকম তো কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমরা বলছ যখন, তখন চল।’’ অতএব দশজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে তিনি অযোধ্যা থেকে অনুসুইয়া গিয়েছিলেন। সেই সাধুটিও তাঁদের পথ দেখিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা এগারোজন মহাত্মা এবং সাধুটি মহারাজজীর আসনের সম্মুখে যে পায়ে চলা সংকীর্ণ পথ ছিল, সেখান দিয়ে সোজা রামলখনদাসের কুঠুরীতে চলে গিয়েছিলেন। রামলখনদাস গুরু মহারাজজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। তাঁর কাছে কয়েকটা বস্তা ছিল, তাতে সকলকে বসিয়ে, তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা

করেছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে যা কিছু ছিল (ছোলার রুটি এবং কয়েতবেলের চাটনী) যত্ন করে তাদের তাই খেতে দিয়েছিলেন।

তাদের সেবা থেকে রাত বারোটার সময় নিবৃত্ত হয়ে রামলখনদাসজী মহারাজজীর সেবাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ধীরে-ধীরে মহারাজজীর পদসেবা করতে শুরু করেছিলেন। মহারাজজী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আজ তোমার কুঠুরীতে কারা এসেছে, তারা তো সংখ্যাতে এগারো-বারোজন কিন্তু অল্পও সাড়া শব্দ হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা থেকেই খুব নিস্তব্ধ।'' মহারাজজীর কথা শুনে রামলখনদাস বলেছিলেন-''আজ্ঞে আমার গুরু মহারাজ এসেছেন।'' মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আচ্ছা, আচ্ছা! তাঁর সেবা করেছ?'' রামলখনদাস উদাস হয়ে বলেছিলেন-''কি করে সেবা করতাম, হঠাৎ চলে এলেন। ছোলার রুটি এবং কয়েতবেলের চাটনী ছিল।'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''দেখ তিনি তোমার গুরু মহারাজ, সেইজন্য বিধিপূর্বক সেবা কর। আমার কুঠুরীতে যা কিছু রয়েছে। সব নিয়ে যাও এবং আদর যত্ন করে তাদের খেতে দাও।''

পরের দিন সকালবেলা যে খাবার তৈরী হয়েছিল তাতে ছিল-ঘি মাখানো গমের আটার রুটি, দু রকমের তরকারি, ডাল, ভাত, চাটনী। এসব খাদ্যদ্রব্য মহাত্মাদের পরিবেশন করা হয়েছিল। দু'এক গ্রাস মুখে তুলে বেদান্তাচার্য মশাই রামলখনদাসজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''রামলখন! আমি তোমার গুরু এবং তুমি আমার শিষ্য। ঠিক? তিনি বলেছিলেন, ''হ্যাঁ গুরু মহারাজ, এতে দ্বিমত নেই, এটা সত্য।'' বেদান্তাচার্য মশাই বলেছিলেন, ''আমি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি, তাহলে কপটতা তো করবে না?'' তিনি বলেছিলেন, ''কখনও না।''

বেদান্তাচার্য মশাই বলেছিলেন, ''কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা যখন এসেছিলাম, তখন প্রথমবার আমাদের সকলকে তুমি ছোলার রুটি খাইয়েছিলে, আজ সকালেই এই পুষ্কল ব্যবস্থা! এই পার্থক্য কেন? এগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?'' রামলখনদাস বলেছিলেন, ''গুরুদেব, কাল আমার কাছে সেগুলোই ছিল।'' মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর যে-যে কথা হয়েছিল, তা অবগত করানোর পর তিনি বলেছিলেন, ''গুরুদেব এসবই পরমহংসজীর দেওয়া প্রসাদ।''

বেদান্তাচার্য তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আচ্ছা বল দেখি, তাঁর কাছে এই রেশন কোথা থেকে আসে?'' রামলখন বলেছিলেন, ''গুরুদেব আমি তো সারাদিন

ভিক্ষা করি, যা কিছু পাই নিয়ে আসি। কিন্তু পরমহংসজী নিজেও ভিক্ষা করেন না, আবার অন্য কাউকে করতেও দেন না। আমি যে ভিক্ষা করে আনি, তার একটা কণাও গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন যে, আমার কুটীরে যদি কিছু আছে। তবে সেটা তৈরী করে দাও, অন্যথা আমার চিন্তা ছাড় তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। যখনই কোন ভক্ত দ্রব্যসামগ্রী অর্পণ করেন, তখন তাকে দু'বার ধমক নিশ্চয় দেন।"

বেদান্তাচার্যমশাই তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি রাতদিন ভিক্ষা কর, তা সত্ত্বেও ছোলার রুটি, এবং তিনি কারও কাছে কিছু ভিক্ষা করেন না, তবুও কিছুর অভাব নেই। তিনি নিশ্চয় সিদ্ধপুরুষ। তিনি খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত ধুয়ে মহারাজজীর কাছে গিয়েছিলেন, দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলেছিলেন, " মহারাজজী, কয়েকজন এখান থেকে আমার কাছে অযোধ্যা গিয়েছিল, আমার কান ভাঙ্গিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমার সৌভাগ্য যে, এইভাবে আপনার দর্শন হয়ে গেল। এই ঘোর জঙ্গলে আপনার এইরূপ বাসস্থান দেখে খুব আনন্দিত হলাম।"

তিনি রামলখনদাসকে বলেছিলেন, "দেখ রামলখনদাস! আমি তোমার গুরু, সেইজন্য আদেশ দিচ্ছি যে, সারাজীবন, এই মহাপুরুষের সেবা কর। এঁর সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে।" বেদান্তাচার্য মশাই শ্রদ্ধাপূর্বক দেখা করে অন্যান্য তীর্থদর্শন করেছিলেন এবং অবধধামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। রামলখনদাস মহারাজজীর সেবাতে পুনরায় রত হয়েছিলেন।

মহারাজজী প্রায়ই বোঝাতেন, "হো! সাধুদের জন্য শিলোচ্ছ, ভিক্ষা এবং আকাশবৃত্তি ইত্যাদিগুলি মান্য বৃত্তি। তিনটিই যথোচিত। কিন্তু এগুলির মধ্যে আকাশবৃত্তি সর্বোপরি। কিন্তু ভজনা যখন ভগবানের তত্ত্বাবধানে হয়, তখন এগুলির মধ্যে একটা বৃত্তিও সহায়ক নয়। সেই সময় একটাই বৃত্তি থাকে যে, ভগবানের কি ইচ্ছা? তাঁর ইচ্ছাই সর্বোপরি। দেরাদুনে না চাইতেই দুধ অর্পণ করেছিল কেউ। এটাই তো আকাশবৃত্তি। উজ্জয়িনীতে না চাইতেই অনেককিছু পেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান সেসব জিনিষ স্পর্শও করতে দেননি। যখন ভগবান সাধককে উত্তমরূপে বরণ করে নেন, তখন সেই সাধককে ভগবান যতটুকু গ্রহণ করার স্বীকৃতি দেন, ততটুকুই কেবল তার নিজের। বাকী খাদ্যসামগ্রী, ধারণযোগ্য এবং নিবাসস্থান কোনটাই তার নয়। ভগবান তাকে তা'ই দেন, যাতে তার শাশ্বত হিত নিহিত।

সেইজন্য সকলে শ্রদ্ধা ও সমর্পণের সঙ্গে নাম জপ কর, সদ্‌গুরুর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ কর, তোমরাও লাভ করবে। শুধু বললে বুঝতে পারা যায় না, যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না হয়।

জাতিগত মোহ

রামলখনদাসজীর স্বভাব উগ্র ছিল। তিনি আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন ছিলেন। একটুতেই রেগে যেতেন। কুলীন ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য বর্ণব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন।

একদিন মহারাজজী নিজের আসনে বসেছিলেন। পাঁচজন মহাত্মা মহারাজজীর নিকটে গিয়েছিলেন। মহারাজজীর অনুভব হয়েছিল যে, এই পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে একজন উচ্চস্তরের সাধুও রয়েছেন, যাঁর বৃত্তি রয়েছে, যিনি যোগসাধনা সম্বন্ধে অবগত। মহারাজজী যখনই দেখতেন উচ্চস্তরের সাধু, তখনই তাঁকে খুব খাতির করে ডেকে বসাতেন। তিনি যে কোন বেশেই থাকুন না কেন। সেই পাঁচজন মহাত্মার বিষয়ে সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাদের ডেকে আদর আপ্যায়ন করেছিলেন-আসুন সাধুবাবা, আসুন ত্যাগীমশাই বসুন, তাদের বসিয়ে মহারাজজী তাদের কিছু-কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়েছিলেন। জল দিয়েছিলেন। তারপর সকলে গঞ্জিকা সেবনে মন দিয়েছিলেন।

হঠাৎ রামলখনদাসজী উপর থেকে নীচে নেমেছিলেন, সাধুদের চেহারা দেখে বলেছিলেন, ‘‘অ্যাঁ কি জাত তোমাদের?’’ সাধুরা উত্তর দেননি। রামলখন দাসজী এই অবহেলা সহ্য করতে পারেননি। তিনি রেগে বলেছিলেন, ‘‘কিছু বলছ না কেন, শুনতে পাচ্ছ না?’’ মহারাজজী তাকে বকে বলেছিলেন, ‘‘পাগল হলে নাকি?’’

সাধুদের মধ্যে যাঁর স্তর উচ্চ ছিল, তিনি বলেছিলেন, দেখুন দেহটা তো আমাদের পাঁচজনেরই চামারের এবং পাঁচজনই ভজনা করছি। একথা শুনে রামলখনদাস পুনরায় রেগে বলেছিলেন ‘‘যদি তোমরা ভজনা করতে শুরু কর, তবে চাষ কে করবে? যারা বড়লোক তাদের কাজ চলবে কি করে?’’

মহারাজজী তাকে শান্ত করে বলেছিলেন, ‘‘মূর্খের মত কেন কথা বলছ, সাধুদের আবার জাত? যে জাত-পাতের জালে আবদ্ধ সে কি সাধু হবে।’’ রামলখনদাস মহারাজজীকে প্রণাম করে তখনকার মত সেখান থেকে সরে

গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার রেগে দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, ''শাস্ত্রে তোমাদের ভজনা করার কথা কোথায় লেখা রয়েছে-**সব জাতি কুজাতি ভএ মগতা।**'' ***(মানস, ৭/১০১, ছন্দ)*** মহারাজজী পুনরায় ধমক দিয়েছিলেন, ''যাবে এখান থেকে।'' আচ্ছা মহারাজজী! বলে তিনি প্রণাম করে চলে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় সেখানে এসেই বলতে শুরু করেছিলেন-''ঘোর কলিযুগ এসে গেছে-'**তে বিপ্রহু সন আপু পুজাবহিঁ। উভয় লোক নিজ হাথ নসাবহিঁ।।**' ***(মানস, ৭/৯৯/৭)*** সাধু কেন হয়েছ? মাথা খারাপ হয়েছে না কি?'' সাধুদের মধ্যে যিনি উচ্চকোটির ছিলেন, তিনি বলেছিলেন-''ঠিক আছে বাবাজী! তিনবার আপনি তিরস্কার তো অনেক করলেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই আপনি মারাও যাবেন।'' রামলখনদাস বলেছিলেন-''যাও, যাও, চামারদের অভিশাপেকোন চতুষ্পদ প্রাণীর মৃত্যু হয় না।'' সেই পাঁচজন সাধু মহারাজজীকে প্রণাম করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

মহারাজজী রামলখনদাসকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, সাধুদের অপমান করা উচিত নয়।

এই ঘটনাটি ধীরে-ধীরে সকলেই ভুলে গিয়েছিলেন। প্রায় তিনমাস পর একদিন রামলখনদাস মহারাজজীকে বলেছিলেন, ''গুরু মহারাজজী! গ্রামে খাদ্যসামগ্রী রেখে এসেছি, অনুমতি দিলে নিয়ে আসি।'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''থাক, খাদ্যসামগ্রী এনে কি হবে?'' তিনি বলেছিলেন, ''মহারাজজী! সাধুদের জন্য কিছু খাবার নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। আমি ভিক্ষা করে সেমরিয়া গ্রামে রেখে এসেছি, নিয়ে এলে ভাল হত। অনুমতি দিলে নিয়ে আসতাম।'' মহারাজজী তা সত্ত্বেও বারণ করেছিলেন, কিন্তু তার জিদ দেখে পরে আর কিছু বলেননি।

'মৌনং স্বীকৃতি লক্ষণম্' ভেবে রামলখনদাস মহারাজজীকে প্রণাম করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। গ্রামে পৌঁছাবার পরই তিনি জ্বরে পড়েছিলেন। একজন গ্রামীণ মহারাজজীকে খবর দিয়েছিল যে, রামলখনদাসের জ্বর হয়েছে। মহারাজজী শুনে বলেছিলেন, ''যদি সেখানে অসুখ না সারে তবে আমার কাছে নিয়ে এস।'' তৃতীয় দিন গ্রামের লোকেরা রামলখনদাসকে মহারাজজীর কাছে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে করতেই অবস্থার দ্রুত অবনতি

ঘটে। এবং তার মৃত্যু হয়।

তার মৃত্যুর খবর শুনে সেই পাঁচজন সাধুর কথা মহারাজজীর মনে পড়েছিল। তিনি দিন গুনে দেখেছিলেন, সেইদিনটি তৃতীয় মাসের শেষ দিন ছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘ওহ ! মৃত্যুর সময় তার মাথা খারাপ হয়েছিল, সাধুর বাণী সত্য করার জন্যই ভগবান তার বুদ্ধি বিকৃত করে তাকে গ্রামে যাবার জন্য প্রেরিত করেছিলেন। তার পাপ তাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে থাকলে মৃত্যু তো হত না। একজন সাধু শাপ দিলে, আরেকজন বাঁচাতেও তো পারেন।’’

রামলখনদাসের রোগ ব্যাধি কিছু ছিল না। হঠাৎ সব ঘটেছিল। মাত্র তিনদিনের জ্বরে শরীর ছেড়ে গিয়েছিল। ‘**কোঈ কহা সন্ত হম চীহ্না। তুলসী কানোঁ পর হাথ ধরি লীহ্না।।**’ তুলসীদাসকে কেউ বলেছিল, ‘‘আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি, তিনি উচ্চস্তরের মহাপুরুষ।’’- একথা শুনে তুলসাদীসজী নিজের দু’কানে আঙ্গুল দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘কোন চোখে আপনি মহাপুরুষ দেখেছেন?’’ ভগবান মন-বুদ্ধির অতীত, মহাপুরুষগণও মন-বুদ্ধি নিরুদ্ধ করে ঈশ্বরের সদৃশ্য হয়ে যান। এই প্রকার তাঁরাও মন-বুদ্ধির অতীত। ভগবান জানিয়ে দিলেই জানা যেতে পারে-‘‘**সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ।**’’ ***(মানস, ২/১২৬/৩)*** তাঁদের চেনার অন্য কোন উপায় নেই। তাঁরা সম্প্রদায়, ধর্ম, দেশ, জাতি, বর্ণ, রং ভেদের অতীত।

রামলখনদাসের দেহের সৎকার করা হয়েছিল। এই প্রকার মহারাজজীর প্রথম সেবকের তিরোভাব তিনি ইহলোকে থাকতেই হয়েছিল।

অনুসুইয়া আশ্রমের পূর্ব ব্রহ্মচারীমশাই

প্রাচীনকাল থেকেই অনুসুইয়া যোগসাধনার কেন্দ্র। এই ভূমি অত্রি, দত্তাত্রেয়, চন্দ্রমা, দুর্বাসা, সতী, নর্মদা, সিদ্ধবাবা প্রভৃতি মহর্ষিদের তপশ্চর্যার স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে নির্জন গুহায় বাস করে অনেকানেক মনীষীগণের এখানে আত্মানুভূতি হয়েছিল। এইরূপ একজন সাধু সাধনার আরম্ভিক অবস্থাতে বাল ব্রহ্মচারী রূপে (অনুসুইয়ার ঘন জঙ্গলে) তপস্যা করার জন্য যত্র-তত্র ভ্রমণ করতে-করতে অনুসুইয়ার জঙ্গলে এসেছিলেন এবং এখানের প্রশান্ত পরিবেশ দেখে বাস করতে শুরু করেছিলেন। ব্রহ্মচারীমশাই দু’মাস পর্যন্ত কন্দ-মূল-ফল ইত্যাদি সেবন করে ভজনাতে রত ছিলেন। শুরুতে তিনি পরমহংসজী মহারাজকে দূর থেকেই দর্শন করতেন, কারণ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পরমহংস মহারাজ জাদু জানেন। কিছুদিন

পূজ্য স্বামী শ্রী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ এবং পরম পবিত্র ধারকুণ্ডী আশ্রম

অতিবাহিত হওয়ার পর বিচরণ করতে-করতে ব্রহ্মচারীজী জানকী কুণ্ড পৌঁছেছিলেন এবং সেখানেই বাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর জীবন যাত্রার রীতি দেখে সেখানের প্রসিদ্ধ সাধু শ্রী রণছোড় দাসজী ব্রহ্মচারীজীকে সেখানের মালিক রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মচারীজীকে তিনি বলেছিলেন, " আমি প্রায়ই বাইরে থাকি, আপনিই এখানের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।" কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি সেখানের সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, কিন্তু তার মন শান্ত হয়নি। কারণ তাঁর অন্তর পরমশান্তি লাভের জন্য ব্যগ্র ছিল। পরিণামস্বরূপ তিনি জানকীকুণ্ড আশ্রম ত্যাগ করে অযোধ্যাতে গিয়েছিলেন। সেখানে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু সেখানেও তাঁর অন্তরে দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হত। এই অস্থিরতার মাঝে শ্রী পরমহংসজী মহারাজজীর পরমশান্ত মূর্ত্তি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ব্রহ্মচারী মশাই শিষ্যরূপে

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝেই ব্রহ্মচারীজী স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন যে, অনুসুইয়া আশ্রমে যাও, সেখানেই পরমশান্তি লাভ করবে। এদিকে পরমহংস মহারাজজীও সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, এক যুবক সাধু আপনার শরণে আসছে, তাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন। স্বপ্নাদেশের অনুসারেই ব্রহ্মচারীজী শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। মহারাজজীও আশ্রমে নির্দিষ্ট সাধকের অপেক্ষা করছিলেন, দেখতে-দেখতে ব্রহ্মচারীজী অনুসুইয়া আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন। মহারাজজীর চরণযুগল প্রথমবার দর্শন করার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মচারীমশাই-এর মনের সব দ্বন্দ্ব শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। গদ্‌গদ্ হয়ে গিয়েছিলেন। সদা-সর্বদার জন্য তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ করে ব্রহ্মাচারীজী বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রী পরমহংস মহারাজজীর আশ্রয়ে সতত সাধনায় রত থেকে জীবনের কয়েকটা বছর কাটানোর পরই গুরুদেবের অশেষ কৃপার ফলস্বরূপ তিনি জীবন্মুক্ত হয়ে স্ব-স্বরূপে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সাধু

একবার ব্রহ্মচারীজীর অনুভব হয়েছিল যে, একটা কুকুর বেদপাঠ করছে। আরোহ-অবরোহ, গতি-লয় ঠিক রেখে মধুর ধ্বনিতে বেদপাঠ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক

মনে হচ্ছিল। ব্রহ্মচারীজী নিজের অনুভবের কথা মহারাজজীকে জানিয়েছিলেন। শুনে তিনি বলেছিলেন, ‘‘দেখ, কুকুরের মত মনে হবে কিন্তু আলুথালু বেশে কোন উচ্চস্তরের মহাপুরুষ আসছেন। সতর্ক থেকো, তিনি যাতে চলে না যান।’’ সকলেই মন্দাকিনীর তটবর্তী পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। দশটা নাগাদ পাগলের মত বেশে এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে শিষ দেওয়ার ভঙ্গীতে কুকুরের মত ‘ওহুম ওহুম’ ধ্বনি করতে-করতে যাচ্ছিল। তাঁর উপর দৃষ্টি পড়তেই মহারাজজী সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, যে কুকুরটি বেদপাঠ করছিল, এই সে ব্যক্তি।

মহারাজজী সাদরে সেই মহাত্মাকে আশ্রমে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। এইরূপ ব্যক্তিও মহাত্মা হতে পারে, কেউ ভাবতেও পারেনি। ব্রহ্মচারীজী তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আশ্রমের ভিতর নিয়ে এসেছিলেন। আশ্রমেও তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করে যাচ্ছিলেন। মহারাজজী তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘এখন কিছুক্ষণের জন্য জপ বন্ধ কর, আগে বিচার তো করে নাও যে, কোথায় এসেছ?’’ তিনি অল্প হেসে শান্ত হয়ে বসেছিলেন।

ব্রহ্মচারীজী স্বহস্তে আহার প্রস্তুত করে তাঁকে নিবেদন করেছিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘‘খুব সুন্দর! খুব ভালো! তিন বছর, না না ছ’বছর! একদম পার হয়ে যাবে। গুরু মহারাজের সেবায় রত থাক।’’ সম্মুখে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এখানের জঙ্গল কাটা যাবে।’’ কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন, ‘‘এখানে গরু চরে বেড়াবে।’’ পরের দিন তিনি প্রস্থান করেছিলেন, ব্রহ্মচারীজী তাঁকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সসম্মানে বিদায় দিয়েছিলেন।

সেই সময় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, সেই জঙ্গল কেটে ফেলা হবে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সরকারের তরফ থেকে জঙ্গল কাটার ঠিকা দেওয়া হচ্ছিল। নদীর এপারে, আশ্রমের সম্মুখে যে জঙ্গল ছিল, টেকরিয়ার ভাগবত প্রসাদ সেই বৃক্ষগুলি কাটার ঠিকা নিয়েছিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করতে-করতে আশ্রমের সম্মুখের বৃক্ষগুলি কাটবার উদ্যোগ করতেই মহারাজজী সাবধান হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘এই কসাইগুলো কোত্থেকে এল। দূর হও এখান থেকে। আরে! এই গাছের ছায়াতে হাজার-হাজার পশু-পাখি বিশ্রাম করে। এই গাছগুলো অন্তত ছেড়ে দাও।’’

শ্রমিকেরা মহারাজজীর মন্তব্য ভাগবত প্রসাদজীকে গিয়ে বলেছিল, শুনে তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরে বলেছিলেন-ঠিক আছে,

মহারাজজীর আজ্ঞা পালন কর। সেই বৃক্ষগুলি এখনও আছে। বন্য পশুরা সেই বৃক্ষগুলির ছায়াতে দল বেঁধে বসে থাকে।

কিছুকাল পর একজন ত্যাগী মহাপুরুষ সেখানে এসেছিলেন। তাঁর কাছে চল্লিশটি গাভী ছিল। জঙ্গলে পরিষ্কার জায়গা দেখে তিনি গাভী গুলিকে সেই পাহাড়েই চরাতে শুরু করেছিলেন। মহারাজজীর দৃষ্টি যখন সেদিকে পড়েছিল তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন রে! ঐ পাহাড়ে সাদা সাদা কি ওগুলো?" ভক্তরা বলেছিল, "মহারাজজী ওগুলো গাভী।" মহারাজজী বলেছিলেন, "আরে! সেই মহাত্মা বলেছিলেন জঙ্গল কাটা যাবে, দেখ কাটা গেছে। তিনি আরও বলেছিলেন, এখানে গাভী চরে বেড়াবে, দেখ, চরে বেড়াচ্ছে। তিনি আর কি-কি বলেছিলেন?" ভক্তরা বলেছিল, "ব্রহ্মচারীজীকে তিনি বলেছিলেন, মহারাজজীর সেবাতে রত থাকো, ছ'বছরে লক্ষ্যপ্রাপ্তি হবে।"

এ কথা শুনে ব্রহ্মচারীজী খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। অনুরাগপূরিত হৃদয়ে তিনি ঈশ্বর চিন্তনে রত হয়েছিলেন। সেবা এবং স্মরণ-মনন-এ তিনি রাত-দিন এক করে দিয়েছিলেন। ছ'বছরের ভিতরেই মহারাজজীর কৃপাতে ধারকুণ্ডী গিয়ে স্থিতি লাভ করেছিলেন।

বস্তুতঃ **'না জানে কিস বেশ মে নারায়ন মিল জায়।'** -বেশভূষা দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা সম্ভব নয়। মহাপুরুষদের তিনিই চিনতে পারেন, যাদের ভগবান জানিয়ে দেন যে, ইনি মহাপুরুষ। আমাদের দাদাগুরু সৎসঙ্গী মহারাজের এই বেশই ছিল। মহারাজজীর প্রতি আকাশ বাণী হয়েছিল যে, এই মন্দিরে তোমার গুরু মহারাজজী রয়েছেন। তিনি গুরু হতে পারেন, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, কিন্তু তিনি অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞাতা ছিলেন।

পশুপক্ষীর প্রতি সমত্বভাব

ঋষি পরম্পরানুযায়ী তাঁর আশ্রমেও একটি টিয়া পাখি ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, মহাপুরুষদের টিয়া 'রাম রাম' বলে এবং অসৎ ব্যক্তিদের পোষা পাখি তাদের আচরণ অনুযায়ী ভাল-মন্দ কথা বলতে শিখে যায়। শ্রী পরমহংসজীর সান্নিধ্যে থাকতে-থাকতে স্নেহ দ্বারা প্রতিপালিত সেই পাখিও 'রাম রাম' বলতে শুরু করেছিল। সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে জরা-মরণের সম্বন্ধ জড়িয়ে রয়েছে। অতএব সেই টিয়া পাখিও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শরণাগতের উপর তাঁর দয়া হয়েছিল, তাকে কোলে

নিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, তপস্বী সাধ্বীদের খুব ক্ষমতা শুনেছি, সতী-সাবিত্রী সতীত্বের জোরে যমের হাত থেকে নিজের পতির প্রাণরক্ষা করেছিল। অতএব আমিও দেখছি যে, কি করে এই শুক কালের গ্রাস হয়। এইরূপ বলে আসনে বসে বারবার তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর কাছে একজন ব্রাহ্মণ, একজন নাপিত এবং ব্রহ্মচারীজী ছিলেন। দিবা অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রমের সম্মুখে যে বৃক্ষটি ছিল, সেখান থেকে অজ্ঞাত কোন সত্তাধারীর কাশীর শব্দ শোনা গিয়েছিল। যারা সেখানে বসেছিলেন তাদের মনে সংশয় জেগেছিল। পরে সেই শব্দ নদীর ওপারে হয়েছিল এবং যত্র-তত্র সর্বত্র থেকে কাশির বিলক্ষণ শব্দ হচ্ছিল। যারা সেখানে বসেছিল তারা ভয় পেয়েছিল। তখন মহারাজজী বলেছিলেন ভয় পেয়ো না। উনি যমরাজ-এই বলে সকলকে বিশ্রাম করতে বলেছিলেন এবং স্বয়ং আসনে গিয়ে বসেছিলেন। ভয় এবং জিজ্ঞাসার ফলস্বরূপ রাত্রিতে কেউ ঘুমোতে পারেননি। কাশির সেই বিলক্ষণ শব্দ রাত্রির নীরবতা প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত ভঙ্গ করেছিল। এই উৎপাতের মাঝেই মহারাজজী টিয়া পাখিটিকে নিয়ে ভিতরের আসনে গিয়ে বসেছিলেন এবং ভজনা করতে শুরু করেছিলেন।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মহারাজজী ছড়ি নিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিলেন এবং অজ্ঞাত সত্তাধারীকে বকে বলেছিলেন ধুত্তোর! এখান পর্যন্ত আসার ধৃষ্টতা হয় কি করে? এরই মাঝে দেওয়ালের আড়ালে নেউল দেখতে পেয়ে বিচার করেছিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে কাল অন্য বেশ ধরে গিয়ে টিয়া পাখিটিকে খেয়ে না ফেলে। তিনি ছুটে সেই অবোধ পাখিটির কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, পাখিটি জীবিত।পুনরায় আসনে বসার পর সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, পাখিটি বেঁচে যাবে।

সকালবেলা উঠে সকলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মহারাজজী বলেছিলেন, "ওঠ! তোমরা এখনও ঘুমাচ্ছ। যম এসেছিল, চলে গেছে।" এরপর শুক পাখিটি সুস্থ হয়ে "পড়ো পরবতে সীতারাম"-এর আবৃত্তি করতে শুরু করেছিল। মহারাজজী তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন এখন সীতারামকে মনে পড়ল, ভজনাই যদি করতে, তবে যম কেন আসত।

যে বাঁদরগুলো আশ্রমের ধারে কাছে ঘুরে বেড়াত, তাদের মহারাজজী প্রায়ই

ছোলা দিতেন। তাঁর এক ডাকে হর্ষধ্বনি করতে-করতে বাঁদরগুলো কাছে চলে আসত। তিনি হাসতে-হাসতে তাদের ছোলা খাওয়াতেন। হিংস্র প্রাণীদের শিকারও তিনি বন্ধ করিয়েছিলেন। এই প্রকার তাঁর স্নেহ দ্বারা প্রতিপালিত পশু-পাখি স্বচ্ছন্দতাপূর্বক বনে বিচরণ করে বেড়াত।

সত্যযুগের মহাত্মা

ধর্মপ্রাণ ভারতে প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী এই চারটি স্থানে কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। মহারাজজী যখন স্থায়ীভাবে অনুসুইয়াতে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন, সেইসময় প্রয়াগে কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান-সেরে সাধুরা অবশ্যই চিত্রকূট দর্শনে যেতেন। চিত্রকূট যাত্রার পথে তাঁরা অনুসুইয়া দর্শন সেরে নিতেন। কুম্ভমেলার সময় অন্তত- আড়াইশো-তিনশো যাত্রী সেখানে যেতেন। সেই সময় পথ, পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। সেইজন্য যখন তাঁরা চিত্রকূট পৌঁছাতেন বেলা পড়ে যেত। ফলে তাঁরা সেখানেই রাত্রিবেলার খাবার তৈরী করে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতেন। পরের দিনই চিত্রকূট ফেরা সম্ভব হত।

প্রয়াগ ফেরত তীর্থযাত্রীরা মহারাজজীকে গিয়ে বলেছিলেন-“মহারাজজী! কুম্ভমেলাতে সত্যযুগের একজন মহাপুরুষ আপাততঃ হিমালয় থেকে এসেছেন। যারাই প্রয়াগ থেকে আসছিল, তারাই এই ধরণের চর্চা করছিল। কিছু লোক তাঁকে বলেছিল-মহারাজজী! আমরাও দর্শন করেছি। পরিষ্কার গায়ের রং। তিনি সত্যযুগের হলেও বয়স তাঁর তিরিশের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। তাঁর বয়স কয়েক লক্ষ হবে। তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদেরও হয়েছে।”

মহারাজজী মনে-মনে চিন্তা করেছিলেন যে, আমি রোজ-রোজ একি শুনছি। এরূপ হওয়া তো সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও মাসাধিক কাল শুনতে-শুনতে মহারাজজীর মনে হয়েছিল যে, গিয়ে দেখিই না যে, কি সত্যি আর কি মিথ্যা। দিনের বেলা গেলে রাত্রি পোহাবার পর ফিরেও আসা যাবে। যেই তাঁর মনে এই ধরনের খেয়াল এসেছিল যে, যাওয়া যাক, ভেবে উঠেও দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি যাত্রা না করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। মহারাজজী প্রয়াগ যাত্রা করার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কৌতূহল ছিল যে, রোজই একি শুনছি। যে সেখান থেকে আসছে, সেই বলছে। কি তথ্য রয়েছে এতে? এটা তো সম্ভব নয়।

মহারাজজীর মনে এইরূপ ভাব উদয় হওয়ার ঠিক তিনদিন পর পরিষ্কার গায়ের রং, লম্বা একজন সাধু অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। তিনি গিয়ে মহারাজজীকে প্রণাম করেছিলেন। মহারাজজী অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছিলেন-"বসুন স্বামীজী! কোথা থেকে আসছেন?" তিনি বলেছিলেন-"প্রয়াগ থেকে।" মহারাজজী বলেছিলেন-"হো স্বামীজী! আমি রোজই একথা শুনতাম যে, প্রয়াগে সত্যযুগের একজন মহাপুরুষ এসেছেন! সত্যি কথাটা কি?"

সেই মহাত্মা বলেছিলেন-"মহারাজজী! লোকে আমার বিষয়েই এরূপ বলাবলি করছে। মেলাতে একটা মাস কাটানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু এত ভীড় হতে শুরু করেছিল যে, বাধ্য হয়ে মেলা স্থান ত্যাগ করে আমি এখানে চলে এলাাম, কারণ সেখানে ভজনা করা আর সম্ভব ছিল না।"

মহারাজজী বলেছিলেন-স্বামীজী! এখানে এসে ভালই করেছেন, তা না হলে আমিও ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, রোজ-রোজ কি আবোল-তাবোল শুনছি। আমি এখানে বসেই আপনার দর্শন পেলাম। অনেক কৃপা আপনার। মহারাজজী তাঁর জন্য আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আহারান্তে তিনি বলেছিলেন-মহারাজজী! এখানে মেলার জন্য খুব ভীড়। কোথাও উনুন জ্বলছে, কেউ গান গাইছে। কোন নিরিবিলি স্থানের সন্ধান দিন, যাতে আমি চিন্তন-ভজন করতে পারি। মহারাজজী বলেছিলেন-"নির্জনে! আচ্ছা এই সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উপরে চলে যান। উপরটা একদম নির্জন। সেই মহাত্মা সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়েছিলেন, যেখানে সিদ্ধবাবার স্থান ছিল, সেই শান্ত নির্জন স্থানে সিদ্ধ বাবার তক্তাপোষ ছিল, তিনি উপরে গিয়ে সেটার উপরই বসেছিলেন। রাত্রিবেলা ন'টা নাগাদ পূজ্য মহারাজজী জঙ্গলের অল্প ভিতরে শৌচে যেতেন। তিনি পাহাড়ের উপরে স্বামীজীর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। "আমি ব্রহ্মদণ্ডী, আমি উঠব না। প্রত্যুত্তরে ক্ষীণ স্বরে কেউ কিছু বলছিল। স্বামীজী পুনরায় উত্তেজিত স্বরে বলেছিলেন-"আমি স্থান ত্যাগ করব না। মহারাজজীর অদ্ভুত ঠেকেছিল ব্যাপারটা-ভাবছিলেন, অ্যাঁ! আমি তো স্বামীজীকে নির্জনে পাঠিয়েছিলাম, সেখানে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে কে গেল? মেলাতে ভীড় দেখে অন্য কোন ব্যক্তি উপরে গিয়ে থাকতেও পারে। জঙ্গল থেকে ফিরে মহারাজজী বলেছিলেন, "হো! স্বামীজী খুব জোরে তর্জন-গর্জন করছেন যে, আমি ব্রহ্মদণ্ডী, স্থান ত্যাগ করব না। ওখানে কে গেল?"

শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া (প্রাচীন মহর্ষিগণের তপঃস্থলী)

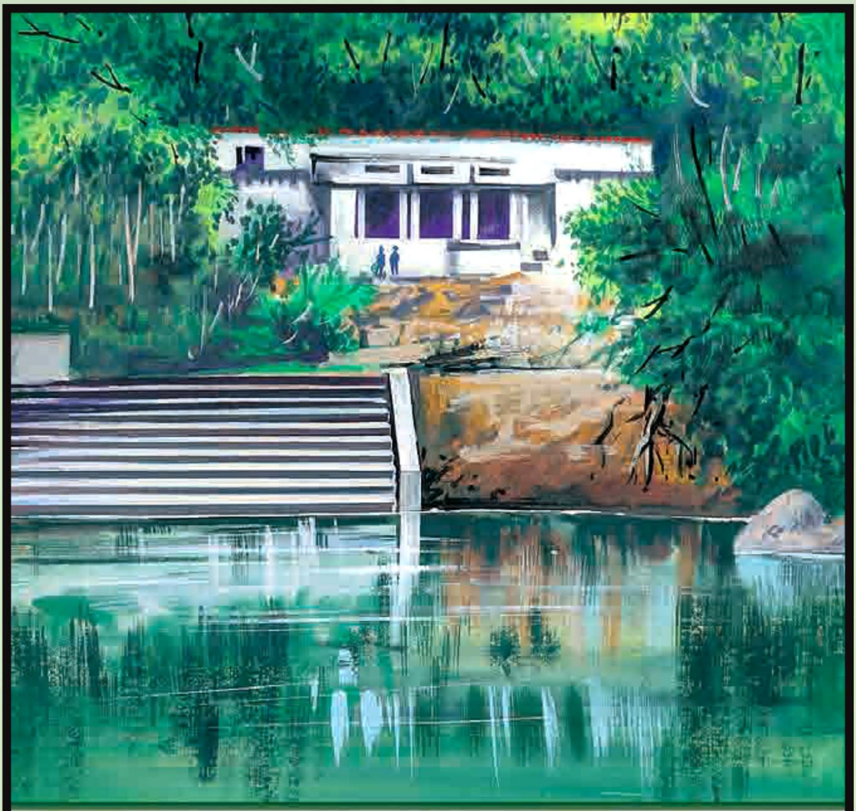

পশু-পক্ষীদের প্রতি সমভাব

মহারাজজী কাউকে পাঠানোর কথা ভাবছিলেন, কিন্তু মেলাতে ভীড় থেকে কেউ তাওয়া চাইল, কেউ আলু, কেউ অন্য কিছু চাইছিল। এইসব কাজে কাউকে পাঠানোর কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই স্বামীজী পৌঁছেছিলেন তাঁর কাছে এবং বলেছিলেন-‘‘মহারাজজী! আপনি আমাকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন? ওখানে তো সিদ্ধ বাবা থাকেন। আমি যেমনি তাঁর তক্তাপোষে বসেছি অমনি তিনি ছুটে আমার কাছে এসে বলেছিলেন-‘‘ওঠ এখান থেকে। এটা আমার জায়গা। এটা আমার তক্তাপোষ। অন্য কোন স্থানে যাও। আমি ভাবছিলাম যদি আমি এখান থেকে উঠে যাই তবুও ইনি পিছন থেকে গর্দান ধরে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দিতে পারেন এবং আমি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে মরতেও পারি। উঠলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। সেইজন্য আমি তক্ষুণি ‘ওম’ জপ করতে-করতে নিজের চারপাশে একটা গোলক এঁকে তার ভিতরে সজাগ হয়ে বসেছিলাম। গোলকের ভিতরে তিনি ঢোকেননি কিন্তু তার বাইরে থেকেই বলছিলেন, ‘‘তোমাকে উঠতেই হবে এটা আমার জায়গা।” আমিও বলেছিলাম-‘‘আমি চিন্তনরত সাধু, উঠতে পারি না। সারারাত তিনি সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জপ একটু শিথিল হওয়া মাত্র কাছে চলে আসছিলেন। জোরে ‘ওম’ উচ্চারণ করা মাত্র দূরে সরে যাচ্ছিলেন। শান্তিতে চিন্তনও করতে পারিনি এবং চোখের পলকও এক করতে পারিনি। সারারাত বসেই কাটিয়েছি, ভোর চারটের পর এই উপদ্রব বন্ধ হয়েছে এবং আমিও সোজা নেমে এসেছি।”

মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘হ্যাঁ স্বামীজী! আমি জানি ব্যাপারটা, কিন্তু ভীড়ের গোলমালে আপনাকে এ বিষয়ে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমিও ওই তক্তাপোষে তিনদিন বসেছিলাম। আমাকেও তিনি বলেছিলেন যে, ‘আপনি নীচে যান, আপনার স্থান নীচে রয়েছে। এটা আমার স্থান। আমি পতিত হয়ে গেছি।’ আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনিও মহাপুরুষ ছিলেন কিছু অপরাধ করে ফেলেছিলেন সেইজন্য জন্মগ্রহণ করতেও পারছেন না আর এই পথে অগ্রসর হতেও পারছেন না। নিজের আসনে পড়ে রয়েছেন। তিনি আজ পর্যন্ত কারও অনিষ্ট করেননি। হ্যাঁ ভণ্ডদের সহ্য করতে পারেন না, আপনি নির্ভয়ে যান। তিনি আপনার কিছু ক্ষতি করেননি, ভবিষ্যতেও করবেন না।” গুরু মহারাজ সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। মহারাজজীর মনে কৌতূহল উৎপন্ন হওয়াতে ভগবানই সত্যযুগের মহাত্মার সম্বন্ধে নির্ণয় তাঁকে সেখানেই দিয়েছিলেন এবং তাঁর শঙ্কার সমাধান করেছিলেন।

অনুসুইয়ার জঙ্গল

অনুসুইয়া আশ্রম ঘোর জঙ্গলে স্থিত। হাতি এবং গণ্ডার বাদ দিয়ে সেখানে সব রকমের ছোট-বড় বন্য পশু ছিল। মহারাজজী যখন সেখানে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তখন সেই জঙ্গল পশুতে ভর্তি ছিল। পাঁচ প্রকারের বাঘ সেই জঙ্গলে ছিল। সব থেকে ছোট বাঘকে চিতা বাঘ বলে। চিতা বাঘ ছোট-ছোট পশু, বাছুর ইত্যাদির শিকার করে। বড় পশুদের শিকার করতে পারে না। আর এক ধরণের চিতা বাঘ এর থেকে একটু বড় হয়। এদের গতি খুব তীব্র। নব্বই কিলোমিটার প্রতিঘণ্টা বেগে ছুটতে পারে। এরা খুব চঞ্চল এবং মানুষকেও আক্রমণ করে। মানুষকে আক্রমণ করা যদিও এদের স্বভাব নয়। কঠিন পরিস্থিতিতেই আক্রমণ করে। তৃতীয় প্রকারের বাঘকে গুলবাঘ বলা হয়। এই পশু বাঘ এবং চিতা বাঘের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই পশু বড়-বড় প্রাণীকে শিকার করতে সমর্থ। চতুর্থ প্রকার ডোরা কাটা বাঘ, অনুসুইয়ার জঙ্গলে এদের সংখ্যা অনেক। পঞ্চম প্রকারের হল বর্বরী দেশের বড় সিংহ, একজোড়া সেই জঙ্গলেও ছিল। ইংরেজ অধিকারী (ডী.এফ.ও.) সিংহকে শিকার করেছিল। কিন্তু সিংহী সেখানেই বিচরণ করত।

একবার মহারাজজী মন্দাকিনী নদীর তীরে শিলাভূমির উপর বসেছিলেন। সময়টা গ্রীষ্মকাল ছিল, বেলা প্রায় সাতটা হবে। গরমে নদীর জলের ধারা খুব সরু হয়ে গিয়েছিল। নদীর ওপার থেকে সেই সিংহী প্রায় এক হাত লম্বা জিভ বার করে ধীরে-ধীরে চলে আসছিল। মহারাজজীর পিছনে ব্রহ্মচারীজী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বলেছিলেন-“মহারাজজী! বর্বরী সিংহী” এবং তাঁর মুখ থেকে ‘হু’ শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী তাঁকে বলেছিলেন, “পাগল হলে নাকি? বন্য পশুদের কি ভরসা?” কিন্তু সিংহীর উপর সেই শব্দের কোন প্রভাব পড়েনি। তাকে কে উসকানি দিচ্ছে সে তাকিয়েও দেখেনি। সে একইভাবে চলতে-চলতে মহারাজজীর সম্মুখে এসেছিল এবং তারপর পায়ে চলা পথ ধরে মন্থর গতিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

একদিন আশ্রমের ভিতরে বাঘ ঢুকেছিল। মহারাজজী তাঁর আসনে শুয়েছিলেন। রাত দশটা-এগারোটা হবে। সম্মুখে কুয়োর চাতালে শ্রী ব্রহ্মচারীজী শুয়ে-শুয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এ জপ করছিলেন। আশ্রমে আর কেউ ছিল না। জঙ্গল

অশান্ত হয়ে উঠেছিল। এই রকম গোলমাল প্রায়ই হত। মহারাজজী যেখানে বসতেন তার পিছনে সারি-সারি কুঠুরী ছিল, কিন্তু কপাট কোনটাতেই ছিল না।

হঠাৎ ছাদের উপর থেকে একটা পশু ধম্ শব্দ করে লাফিয়েছিল। তার পিছনে-পিছনে তার থেকে বেশী ভারী অন্য একটা পশু ধড়াম শব্দ করে লাফ দিয়েছিল। দুজনেই মহারাজজী এবং ব্রহ্মচারীজীর মাঝ থেকে সন্-সন্ করে পার হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী উঠে বসেছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ‘‘আগে কে লাফ দিয়েছিল আর তার পিছনে কে লাফ দিয়েছিল?’’ ব্রহ্মচারীজী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট সবকিছু দেখা যাচ্ছিল। তিনি দেখে বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী আগে-আগে বাঁদর ছুটছে, তার পিছনে গুলবাঘ ছুটছে আর এইমাত্র সে বাঁদরটিকে ধরে ফেলল।’’

মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘তাহলে দেখছ কি? মুক্ত কর বাঁদরটাকে! সাধুদের আশ্রমে হিংসা করা চলে না। বাঘের যদি খাবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাহলে জঙ্গলে যে কোন জায়গায় গিয়ে ধরতে পারতো, আমাদের আশ্রমেই ধরার জায়গা পেল। শ্রী ব্রহ্মচারীজী মহারাজজীর কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু মহারাজজী তখনই পাথর তুলে বাঘটার দিকে ছুঁড়েছিলেন। লদ্দ মত একটা শব্দ তখনই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। পাথরটা বাঘটার পেটে লেগেছিল, আঘাত পেয়ে ধৃতকরণ আলগা হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁদরটা ছাড়া পেয়েই গাছে উঠে গিয়েছিল। বাঘটা সেখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মহারাজজীকে সমানে দেখে যাচ্ছিল। তারপর ল্যাজে মোচড় দিয়ে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজীর আশ্রমই সেই বাঘটার বাসস্থান ছিল। তিনি সেখানে যাওয়ার পর সে আশ্রমের ধারে কাছেই গুহায় কিম্বা ঝোপের আড়ালে থাকত কিন্তু আশ্রমের কাছে সে আর কখনও কোন পশুর শিকার করেনি। বাল্মীকি মুনির আশ্রমের যে প্রভাব ছিল সেটা এখানেও দেখা গিয়েছিল। যেমন-‘**করি কে হরি কপি কোল কুরঙ্গা। বিগত বৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা।।**’ *(মানস, ২/১৩৭/১)*

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আশ্রমে

বাঁদা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পূর্ব হতেই শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়ার বিষয়ে বহু বিলক্ষণ চর্চা শুনেছিলেন। জিজ্ঞাসাবশতঃ তিনি সপরিবারে সশস্ত্র সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং যথোচিত দণ্ডবৎ প্রণাম করে বসেছিলেন। কথোপকথনের মাঝেই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, রাত্রিবেলা

বাঘ এবং চিতা প্রায়ই আসে। যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে আমি তাদের শিকার করব। মহারাজজী তার কথা শুনে বলেছিলেন যে, এটা সন্ত-স্বভাবের অনুকূল নয়। তোমার বোঝা উচিত যে, হিংসা করা উচিৎ নয়। রাত্রিবেলা পুলিশ অধিকারী সপরিবারে উপরে ঘুমিয়েছিলেন এবং সঙ্গে যে সশস্ত্র সেপাই ছিল, তারা কুয়োর চাতালে শুয়ে ছিল। সকলে ঘুমানোর পর রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেছিল। গোটা পরিবেশ ভীতিজনক হয়ে উঠেছিল। সেপাইরা পালিয়ে উপর দিকে যে কুঠুরীগুলি ছিল সেগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করতে শুরু করেছিল, তখন মহারাজজী বাইরে বেরিয়ে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, শিকারীরা কে কোথায় লুকিয়ে আছো! বেরিয়ে এসো! শিকার এসে গেছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মশাই বিনম্রভাবে বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! ভয় করছে, আপনার সামনে আমরা কি করে শিকার করব।’’ সকালবেলা তিনি মহারাজজীর কাছে রাত্রিবেলার ঘটনার চর্চা করে ক্ষমা-যাচনা করেছিলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে ফিরে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি সময়ে-সময়ে আশ্রমের সেবা করতেন।

আসামের পণ্ডিত তীর্থভ্রমণের পথে

একবার আসাম থেকে একজন পণ্ডিত অনুসুইয়া তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়েছিল। বর্তমানে যেভাবে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে এবং মন্দিরগুলিতে টাকা দিয়ে তবেই থাকার ব্যবস্থা হয়, সেইরকমই কিছু কল্পনা করে সেই ব্রাহ্মণ মহারাজজীর কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, আমাকে একটা কুঠুরীতে থাকার অনুমতি দিন, তার জন্য যদি দুশো টাকা দিতে হয়, তাতেও আমি রাজি। মহারাজজী সেই ব্রাহ্মণের মনের ভাব পরীক্ষা করে তাকে বকে বলেছিলেন-এখানে কি কোন ব্যবসা হয় নাকি? কিছুক্ষণ পরে একজন শিষ্যকে তার থাকার জন্য একটা কুঠুরীতে ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন। সেখানে একদিন থাকার পর ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভগবন্! মাথা ধরা রোগের জন্য আমার স্ত্রীর মনে খুব কষ্ট। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এখানে এসেই জানতে পেরেছি যে, আপনার কৃপায় অসাধ্য রোগও সেরে যায়। সেইজন্য আমিও দুঃসাহস করছি, অপরাধ মার্জনা করবেন। মহারাজজী ছড়িটি দিয়ে তার স্ত্রীর মাথা স্পর্শ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের স্ত্রী শিরঃপীড়া থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

আশ্রমের পরিবেশ দেখে সেই ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, এখানে যারা টাকা পয়সা দেয়, তাদের নিষেধ করা হয় কিন্তু অন্যান্য মন্দির এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলিতে ধন অর্পণ করে যারা, তাদের খুব আদর আপ্যায়ন করা হয়। তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, মহাপুরুষগণ এইভাবেই দুর্বোধ্য বাণী দ্বারা ভক্তদের কল্যাণ করেন আমরা কখনও জানতে পারি, কখনও পারি না। তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করে পরের দিন সেখান থেকে রওনা দিয়েছিলেন।

জ্বর থেকে নিবৃত্তি

যে পাপী ব্যক্তিরা ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করত, মহারাজজী প্রায়ই তাদের স্পর্শ করে কুকর্মের ফলভোগ থেকে তাদেরও নিবৃত্ত করে দিতেন; কিন্তু তার ফল কোন না কোন রূপে তাঁকে ভোগ করতে হত। এইরূপ সংস্কারজন্য প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ মহারাজজী অনেকদিন জ্বরে পীড়িত ছিলেন।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত ভুগেছিলেন। একবার মহারাজজী মনে বিচার করেছিলেন যে, গমনাগমন থেকে যখন নিবৃত্তি হয়ে গেছে, যমের বাঁধন কেটে গেছে, তবে জ্বরের মত ভয়ঙ্কর রোগ কেন হয়েছে। ভগবান সেইদিনই তাঁকে বলেছিলেন যে, স্পর্শ করে আপনি যাদের ব্যথা মুক্ত করে, জ্বর সারিয়ে দেন, তা কে ভোগ করবে? মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তবে কি সে সব আমাকে ভোগ করতে হবে?" উত্তর পেয়েছিলেন, "হ্যাঁ!" তিনি চিন্তা করেছিলেন, ওহ্! আমি তো বহু ব্যক্তিকে কষ্ট থেকে মুক্ত করেছি, কতদিন ভোগ করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনুভবে একজন কালো, দুর্দশাগ্রস্ত ডোমকে দেখেছিলেন। সে বলেছিল, "মালিক তিন আনা বাকী আছে।" মহারাজজী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি রে, তিন আনা কাকে বলে?" সে বলেছিল, এখন এই জ্বর আরো তিন মাস ভোগাবে। মহারাজজী রেগে বলেছিলেন-বাহ রে পাপ! এক আনার জন্য এক মাস কষ্ট দেবে। (আনা তখনকার দিনের এক সিকে ছিল, যার মূল্য বর্তমানে ছয় পয়সার সমান।)

ভোগের অবধি নির্ধারিত জেনে মহারাজজী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি আশ্রমবাসীদের বলেছিলেন, "হিসেব করে বল তো এটা কোন মাস?" শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, আশ্বিন মাসে আমার জ্বর ছাড়বে। কোন ঔষুধ না নিয়েও জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছিলেন। আশ্বিন মাসে মরশুমি জ্বর হয়,

কিন্তু মহারাজজীর ছেড়ে গিয়েছিল। মহারাজজীকে জ্বরাক্রান্ত দেখে কিছু ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, "মহারাজজী! নিবৃত্তির পরেও কি রোগ হয়?" তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, নিবৃত্তি হওয়ার পর রোগ হয় না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে তার পাপের ফলভোগ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তবে তার ফলভোগ নিজেকে করতে হয়। তা নাহলে-"**কাল ন খায় কলপ নহিঁ ব্যাপৈ, দেহ জরা নহিঁ ছীজৈ।**" তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার ফলে, আমি জ্বরাক্রান্ত।

তর্কশাস্ত্রের ছাত্রী সত্যানুসন্ধানে

একবার এক বুদ্ধিমতী ছাত্রী গৃহকলহ থেকে উত্ত্যক্ত হয়ে চিত্রকূট গিয়েছিল। চিত্রকূটে যেখানে-সেখানে তার সমালোচনা করা হচ্ছিল যে, মেয়েটি নিশ্চয়ই সরকারী গুপ্তচর, অন্য কোন রহস্যের ব্যাপারও থাকতে পারে। এইপ্রকার বহু অযথার্থ ধারণার জন্য তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রী ছিল, সেইজন্য তার মনে হয়েছিল যে, সাধারণভাবে জীবন কাটানোর থেকে ভজনা করা শ্রেষ্ঠ। বিধাতা তাকে শ্যামবর্ণের করেছিলেন তা ছাড়া সব সদ্‌গুণ তার মধ্যে ছিল। শ'য়ে একটাই সেরকম সদাচারিণী হয়, তবুও এক মহাশয় শুধু শ্যামবর্ণের জন্য তার সঙ্গে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাড়ির একজন সদস্য তাকে তার রূপের জন্য ভর্ৎসনা করেছিল, সেইজন্য সে ব্যথা পেয়ে এই বলে গৃহত্যাগ করেছিল যে, এবার আমি এমন ব্যক্তিকে স্বামী বলে গ্রহণ করব, যিনি হবেন সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন, সুন্দর এবং জ্ঞানবান।

ভজনা করার উপযুক্ত কারণ পেয়ে সে সদ্‌গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়ার ফলস্বরূপ তার ভিতর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা জেগেছিল। সদ্‌গুরুর খোঁজে বিভিন্ন তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করে চিত্রকূটে পৌঁছেছিল। সে যেখানেই যেত সেখানেই শাস্ত্রীয় আলোচনা শুরু করে দিত। শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনায় তার কাছে কেউ টিকতে পারছিল না। মহারাজজীর কানেও গিয়েছিল এসব কথা। তিনি বলতেন-"হো! এক মেয়ে গোলমাল করছে।"

এইপ্রকার ভ্রমণ করতে-করতে সে চিত্রকূট স্থিত সিরসাবনে পৌঁছেছিল। বাঁদা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রী পরশুরামজী সদলবলে সেখানে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য সেই যুবতীটি তাঁকে জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেছিল। বিচার-বিমর্ষে প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বিবাদ তখনও শেষ হয়নি, বিবাদ চলাকালীনই অনুসুইয়া আশ্রমের

ব্রহ্মচারীজী চিত্রকূট থেকে আশ্রম ফেরার পথে সেখানে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারীজীর পরিচয় দিয়ে পরশুরামজী বলেছিলেন, ''তিনি একজন পবিত্র সাধক'' এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে আসন দিয়ে বসতে অনুরোধ করেছিলেন যে,''আসুন স্বামী সচ্চিদানন্দজী বসুন।'' তাঁকে দেখে সেই যুবতীটি বিনম্রভাবে বলেছিল, ''আমার জন্য তো সকলেই পূজনীয়, আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আপনিই উত্তর দিয়ে আমার শঙ্কাগুলির সমাধান করুন। প্রশ্নগুলি হল -মোক্ষ লাভের জন্য মানুষ গৃহত্যাগ কেন করে? পরমাত্মাকে লাভ করার উপায় কি? ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য তীর্থ করে এখন পর্যন্ত আমি যা অনুভব করেছি, তাতে তৃপ্ত হতে পারিনি, কারণ বেদান্ত দ্বারা নির্দিষ্ট সাধনা ক্রমে স্বীয় স্বরূপই পরমাত্মা কিন্তু কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ষড়বিকার থাকতে সেই অবিনাশী জ্ঞান লাভ হয় না। নিত্য-অনিত্যের বিচার দ্বারা সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে। আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বরূপ, তোমার স্বরূপও সেটাই -এইরূপ বিচার করতে-করতে জ্ঞান উদয় হয়। জীব ও ব্রহ্ম এক বোধ হলেই অজ্ঞান নাশ হয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। স্বরূপস্থ ব্যক্তি তখন বলে ওঠেন, 'অহম ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি' কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, বুদ্ধি দ্বারা গুণ-ভাগ করলে এবং জিহ্বা দ্বারা তা প্রস্তুত করলে, মোক্ষ প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব; কারণ ''**তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ।**''-গীতার অনুসারে বুদ্ধি অচল, স্থির হলেই যোগী স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্বামীজী বলেছিলেন, ''দেখ! গৃহত্যাগ কেউ করে না, ত্যাগ করতে হয়। কেউ পাগল হতে চায় না, তা সত্ত্বেও হয়ে যায়। কেউ মরতে চায় না, তবুও মৃত্যু হয়। সেইরূপ গৃহত্যাগ করে কেউ সাধু হয় না, হতে বাধ্য হয়। এটাও একটা সংস্কার। কয়েক জন্মের পুণ্যসমূহ গৃহত্যাগের সংস্কার তৈরী করে দেয়। সেই সংস্কারই গৃহত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ফলস্বরূপ সাধক শাশ্বত শান্তির পথে অগ্রসর হয়। লক্ষ্য প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ স্বীয় স্থিতির উপর আলোকসম্পাত করে গেছেন যে, আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ। সেখানে সুখ, দুঃখ নেই; পাপ-পুণ্য নেই। প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ যে ধরাতল পেয়েছিলেন, এটা তারই চিত্রণ, এটা সাধনা অথবা চিন্তনের বিধি নয়। সেই স্থিতি লাভ করার জন্য তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণ, তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট সাধনা-পদ্ধতি অনুসারে প্রবৃত্ত হলে, যার নাম ভজনা, তা জাগ্রত হয়। সদ্‌গুরুর কৃপাতে জাগ্রত হয়। ভজনা জাগ্রত হলে সদ্‌গুরু সেবককে রক্ষা করেন। স্ব স্বরূপে দেখা দেন, সাধনা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন। মহাপুরুষের সংরক্ষণে এই

পথে চলাকেই ভজনা বলে। পথ চলতে-চলতে প্রকৃতিজাত কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ষড়বিকারের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে, ধ্যান এবং সমাধি গভীর হতে থাকে, মায়ার অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়, সাধক ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন করে। নিরুদ্ধ চিত্তের সংস্কারের বিলুপ্তি ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে যে ভক্ত ভজনা করছিলেন, তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রবাহিত হন। তাঁকে জেনে সেই ভক্তও ভগবানের সমান হয়ে যান। এটা হল প্রাপ্তির পর মহাপুরুষদের স্থিতির চিত্রণ। শুধু মুখে বলে গেলেই এই স্থিতি লাভ সম্ভব নয়।"

তর্কশাস্ত্রের ছাত্রীটি তাঁর কথা শুনে বলে উঠেছিল, "দেখ! এই হল উত্তর! কত সাবলীল, কত স্পষ্ট এবং অল্প শব্দে আপনি উত্তর দিলেন, আর একটা নিবেদন রয়েছে-প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষগণ নারীর নিন্দা করেছেন। নারীর জন্য ভজনার সুযোগ সর্বত্র কিন্তু নিন্দা তার থেকেও বেশী জোটে। সেইজন্য আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, নারীদের ভজনার অধিকার রয়েছে কি? যদি আছে, তবে এত সমালোচনা করা হয় কেন?"

ব্রহ্মচারীজী বলেছিলেন-তোমাদের দৃষ্টি স্থূল দেহ মধ্যে মানে খুঁজে বেড়ায়। এই দৃষ্টিকোণ বাহ্যিক। এই পরিস্থিতিতে কারণ জানা যাবে না। যতক্ষণ আমরা অন্তর্মুখী হব না, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক স্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বোঝা অসম্ভব। যে মহাপুরুষদের সেই পরমতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল অথবা আছে তাঁদের জ্ঞান সূক্ষ্ম দেহ অথবা মনে আধারিত। নারী অথবা পুরুষ যে হোক, গুণ-অবগুণ সকলের ভিতর সমানভাবে থাকে। এই বিকারগুলির প্রসারণই মায়া, **"তিহ্ন মহঁ অতি দারুন দুখদ, মায়ারূপী নারি।" (মানস, ৩।৪৩)** এই মায়াই হল নারী। এর দুটি ভেদ। এরই অপরপক্ষের নাম অবিদ্যা। এই বিকারগুলির প্রসার আগে চিত্তে দেখা দেয়। চিত্তের সঙ্গে-সঙ্গে এই বিকারগুলি শরীরে প্রকট হয়। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, লোভ, মোহ, কাম, অবিদ্যা ইত্যাদি বিকারগুলি এই চিত্তের দ্বারা প্রসার লাভ করে, সেইজন্য চিত্তবৃত্তিই মায়া, চিত্তবৃত্তিই নারী, আপনারা নন। পরমকল্যাণের উপলব্ধিতে এই চিত্তবৃত্তিই বাধকের কাজ করে। অতএব এর পার-এ গেলেই পরমপদ লাভ হয়। পার-এ যাবার উপায় হল ধ্যান এবং এর সঙ্গে সম্বন্ধিত প্রক্রিয়া। যখন আমরা নিজের বুদ্ধির অনুসারে নির্জনে বসে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে প্রবৃত্ত হই, তখন সেখানে সব শত্রুকে দেখতে পাই। চিত্তের ভিতর সব বিকার একটি আরেকটিকে প্রবল করে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ইত্যাদিই মনের মধ্যে দেখা যায়। মনে কখনও স্ত্রী লোকের ছবি

অঙ্কিত হয়, কখনও পুরুষের, কখনও অজ্ঞানজনিত আবেগ উৎপন্ন হয়। এখন আপনি মহাপুরুষদের বাণীর উপর বিচার করে দেখুন, বোধহয় বুঝতে পারছেন যে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি শত্রুর রূপ এত ভয়ঙ্কর যে, ভাল-ভাল চিত্তেও ভ্রম উৎপন্ন করে। যখন এই বিকারগুলি চিত্তে নিরন্তর প্রসারিত হতে থাকে, তখন বুদ্ধিনাশ করে দেয়। বস্তুতঃ যদি চিত্ত বিকারে লিপ্ত, তবে আমরা শুধুমাত্র বিচার করে সংযত করতে পারব না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-হে অর্জুন! ভোগে অতৃপ্ত এই কাম দুর্জয় শত্রু। এই কাম জ্ঞান বিজ্ঞান নাশ করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য কালের ন্যায় চিরকালের শত্রু। বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে স্থিত এই সংশয় ছেদন করে, সঙ্গ-দোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে হৃদয়কে নির্মল কর এবং কামরূপ শত্রুকে পরাজিত কর।

মনে করুন কোন ব্যক্তি ভজনা-ধ্যান করতে শুরু করেছেন এবং নিয়মিত রূপে করেন, কিন্তু তিনি না চাওয়া সত্ত্বেও বিকারগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এখন বিচার করুন যদি এই বিকারগুলির অনুরূপ সঙ্গ জুটে যায় তবে দোষী হওয়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই শতাংশ। সাধক, সাধক থাকতে পারেন না, পতিত হন। এইরূপ সাধিকাদেরও পতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ কাম বুদ্ধি বিকৃত করে, অসংযত করে দেয়। অতএব স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষদের সঙ্গ এবং পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গ মায়ার রূপ নিয়ে নেয়।

বাইরে নির্জনে বাস করে কল্যাণ লাভে সফল স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষেরাই বেশী হয়েছেন। কতিপয় দুষ্কর্মকারীদের জন্য স্ত্রীলোকের জন্য ঘরে থেকে ভজনা করার বিধান রয়েছে। এই কারণেই 'কিং দ্বারমেকং নরকস্য নারী' বলে সাধকদের সাবধান করা হয়েছে। কারণ গৃহত্যাগ করেই পুরুষদের জন্য ভজনা করার বিধান এবং সঙ্গদোষের কারণ হয় স্ত্রীলোক, এ কথা প্রমাণিত। সেইজন্য এই কল্যাণ পথে সঙ্গ বর্জিত। বিকারগুলি থাকতে ইষ্টপ্রাপ্তি অসম্ভব। বাইরে-বাইরে বিকারগুলি ত্যাগ করে মনে-মনে যদি সেগুলির চিন্তন করা হয়, তবে এর থেকে বড় বিকার আর কি হতে পারে? আগে স্থূলদেহকে বিকারমুক্ত করতে হবে, তবেই মনের বিকার দূর করার প্রবৃত্তি হবে। যখন মনের এবং স্থূলদেহের বিকার দূর হয়ে যাবে, তখন কারণ শরীরের বন্ধন ছিন্ন করার স্থিতি উৎপন্ন হবে। এই স্থিতি লাভ হলে তারপর চেতন সত্তাই সবকিছু বুঝিয়ে দেয়।

মহাপুরুষগণ শুধু-শুধু কোন পক্ষের নিন্দা করেননি। চিত্তবৃত্তিকেই নারী বলে। সঙ্গ-দোষ এড়িয়ে চলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যে স্ত্রীলোক সাধন-পথের পথিক, তার জন্য পুরুষের সঙ্গ-দোষ, ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এবং সাধনোন্মুখ পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গ-দোষ, তার চিত্তবৃত্তিকে চঞ্চল করে দেয়, যা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। অতএব সঙ্গ থেকে পৃথক অবস্থান করে ভগবৎ পথে অগ্রসর পথিকদের সতর্কতার সঙ্গে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। শ্রী ব্রহ্মচারীজীর বাণী হৃদয়ঙ্গম করে ছাত্রীটি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল, ‘‘স্বামীজী, আপনি ধন্য।’’

এদিকে ব্রহ্মচারীজীর অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তিনি মর্যাদা রক্ষার কথা ভেবে গুরুদেবের ভয়ে তক্ষুণি আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। আশ্রমে পৌঁছে শ্রী মহারাজজীকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারীজী আশ্রমে পৌঁছানোর দু’ঘণ্টা পরে ভজনা পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য লালায়িত সেই তরুণীও শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়াতে উপস্থিত হয়েছিল। মহারাজজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে শান্তভাবে বসে গিয়েছিল। আলাপ পরিচয়ের পর সে ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে যে বিচার-বিমর্ষ হয়েছিল, তার চর্চা মহারাজজীর কাছে করে তাঁর শরণে থেকেই ভজনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। শ্রী পরমহংস মহারাজজী তার মনোভাবের সমর্থন করে বলেছিলেন, ‘‘খুব ভাল কথা মা। সকলেরই ভজনা করার অধিকার আছে। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরেই ভজনা কর। ছাত্রীটি বারবার অনুনয়-বিনয় করে সেখানেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। মহারাজজী তখন অন্তর্জগত থেকে সঙ্কেত নিয়ে বলেছিলেন যে, এখন তোমার অবস্থা এমন যে, ঘরে থেকেই তোমার ভজনা করা উচিত। কারণ বর্তমানে বহু জায়গায় সাধুদের সম্প্রদায়ে দোষ দেখা গেছে এবং তোমার অবস্থাও এমন যে, সঙ্গদোষ তোমার এড়িয়ে চলা উচিত। এই বলে তিনি ছাত্রীটিকে ভজনা করার বিধান সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলেছিলেন, এবং ধ্যান, জপ-ক্রিয়ার বিষয়ে অবগত করানোর পর তাকে বাড়ি ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল অনুরাগের জন্য ছাত্রীটি আশ্রমে থেকে গিয়েছিল।

ধীরে-ধীরে আটটা দিন পার হয়ে গিয়েছিল। সেমরিয়া গ্রামের গপ্পা পাণ্ডে দু’একজন শ্রদ্ধালু সঙ্গীদের সঙ্গে আশ্রমে এসেছিলেন। মহারাজজী তাকে আদেশ দিয়েছিলেন তরুণীটিকে সসম্মানে গ্রামে নিয়ে যেতে।

শহরের চটপটে ছাত্রীটির প্রতি গ্রামের মহিলাদের আকর্ষণ ছিল। সেই ছাত্রীটি সব মহিলাদের একত্র করে বুঝিয়ে বলেছিল, আপনারা ভাগ্যবতী যে, এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। সকলেই আপনারা মহারাজজীর সেবা করুন। আর কিছু করতে না পারলে অন্ততঃ তাঁর দর্শন করে নেবেন। আমাকে তিনি আদেশ দিয়েছেন-‘‘ঘরে গিয়ে ভজনা কর মা। এখানে থেকে ভজনা করলে যা লাভ করতে, তা আমি তোমায় ঘরে থেকে ভজনা করলেও দিয়ে দেব।’’

নির্মলদাসজীর দুরাগ্রহ

কার্বীর একজন পণ্ডিতমশাই মহারাজজীর ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, মহারাজজী, একদিন কার্বী চলুন। তখন পর্যন্ত মহারাজজীর আশ্রমে দু’একজন সাধকই প্রবেশ পেয়েছিলেন। মহারাজজীর তিরস্কার ও ছড়িটির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনসাধারণ মহারাজজীকে সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে করত। কেউ বলত তিনি যোগিনী সিদ্ধ, কেউ বলত তিনি যক্ষিণী সিদ্ধ, যার যা মনে আসত, সে তাই বলত। সেই পণ্ডিতমশাই বারবার অনুরোধ করাতে মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘এমনিতে আমি আশ্রম ছেড়ে কোথাও যায় না, কিন্তু তোমার প্রবল আগ্রহ এবং ভগবানও বলছেন সেইজন্য চল ঘুরে আসি।’’ পণ্ডিতমশাই একটা চাদর, কম্বল ও কমণ্ডলু নিয়ে মহারাজজীর পিছনে-পিছনে চলতে শুরু করেছিলেন। পায়ে চলা পথ ছিল। চলতে-চলতে মহারাজজী স্ফটিক শিলাতে এসে পৌঁছেছিলেন।

স্ফটিক শিলাতে ভগবান রাম জানকী মাকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং জয়ন্তের অভিমান ভঙ্গ হয়েছিল। মহারাজজীর সময় সেখানে নির্মলদাস নামে এক মহাত্মা বাস করতেন। যখন তিনি হাঁটতেন তখন তাঁর জটা মাটিতে গড়াগড়ি যেত। তিনি প্রতিদিন রাত তিনটের সময় উঠে কামদগিরি হেঁটে পরিক্রমা ‘রাম রট, রাম রট’ বলে করতেন, শব্দ শুনেই লোকেরা বুঝে যেত যে, নির্মলদাস পরিক্রমা করছেন। কিছু-কিছু সম্প্রদায়ে পরিক্রমা, স্নান এবং বেশকেও ভজনার অঙ্গ বলা হয়েছে। সেইজন্য সাধু সমাজে নির্মলদাসজীর খুব সম্মান ছিল।

সেইদিনই নির্মলদাসজী আসনে বসে কিছু লিখছিলেন। পণ্ডিতমশাই নিজের কম্বল পেতে দিয়েছিলেন, মহারাজজী তার উপর বসেছিলেন। নির্মলদাসজী মহারাজজীকে হাত তুলে নমো নারায়ণ বলেছিলেন। পণ্ডিতমশাই তাঁকে দণ্ডবৎ

প্রণাম করে মহারাজজীর পরিচয় দিয়েছিলেন যে, ইনি অনুসুইয়ার পরমহংসজী। নির্মলদাসজী শুনে বলেছিলেন-''অ্যাঁ!'' চশমা খুলে বলেছিলেন, ''অনুসুইয়ার পরমহংসজী! আপনি গালি দেন কেন? শাস্ত্রে কোথায় লেখা রয়েছে যে, গালি দিতে হয়? সিদ্ধ হওয়ার ভান করেন?'' **''মন কো মারি গগন চঢ়ি জাবে, অমৃত ঘর কী ভিক্ষা পাবে, উজড়া শহর বসাবৈ।''** সিদ্ধ তো তিনি।

''আপনি সিদ্ধপুরুষ হওয়ার ভান করেন'' বলে নির্মলদাসের কয়েকবার আক্ষেপ করার পর মহারাজজী বলেছিলেন, ''দেখ আমি সত্যিকারের সিদ্ধ পুরুষ, আর কিছু না হই কিন্তু তোমার জন্য আমি সিদ্ধ পুরুষ। কি সিদ্ধি দেখতে চাও বল? একমাসের মধ্যে যদি তোমার সবরকমের দুর্দশা না হয়, তবে আমি বাবাজী নই। আর '**মন কো মারি গগন চঢ়ি যাবৈ**' -এটা তোমার নয় আমার অনুভূতি। তুমি কি জানবে এসব? তুমি জলই ছিটিয়ে যাও আর পরিক্রমাই কর।''

মহারাজজী রেগে গেলে কাউকেই শোনাতে ছাড়তেন না। পণ্ডিতমশাইয়ের মিনতিতে শান্ত হয়ে রামঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

স্ফটিক শিলার কাছেই মোহকম গড়ে রাম ও লক্ষণ নামে দুই ভাই থাকত। তারা গাজীপুরের মূল নিবাসী ছিল এবং জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল। দুজনেই জলসেনাতে চাকরী করত। তারা বায়সরায়কে একটা চিঠি লিখেছিল যে, আপনি এক্ষুণি শাসনের ভার গান্ধীজীকে সপেঁ দিন, আপনাদের সমুদ্রের পারে যেতে হবেই। এই ধরণের চিঠিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধ বিচার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, তাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

রামজীর আদর্শ ভগবান রাম ছিলেন, তিনি নিজেকে রাম বলেই মনে করতেন, রামের ভাই লক্ষণও দাদার আজ্ঞাকারী ছিল। রামলক্ষণের সঙ্গে রামের স্ত্রীও থাকতেন, যার নাম সীতা ছিল, রামায়ণের পাত্রগুলির সঙ্গে নামের অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। রাম-সীতার দুটি ছেলে ছিল।

ভাগবতের কাহিনী শোনার সীতার মনে অভিলাষা জেগেছিল। লক্ষণ একজন পণ্ডিতকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। ভাগবত পাঠ সমাপ্তির পর পণ্ডিতমশাইকে রামজী সওয়া শ' টাকার স্থানে সাত'শ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে বস্ত্রাভূষণ, পাত্র ও বিবিধ সামগ্রী দান করে বিদায় দিয়ে রাম-লক্ষণ জঙ্গলে গিয়েছিল।

দুইভাই ফিরে এসে দেখেছিল পণ্ডিতমশাই তখনও সেখানেই বসে রয়েছেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘‘দেবতা! আপনি এখনও এখানে কেন বসে রয়েছেন?’’ পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, ‘‘সীতাজীর কাছেও কিছু আশা করছি, তিনিও কিছু দান করুন।’’ রাম তাঁর কথা শুনে লক্ষণকে বলেছিলেন, ‘‘লক্ষণ! অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা-অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ নষ্ট হয়ে যায়। ইনি পণ্ডিতকূলের জন্য কলঙ্ক। এঁকে সওয়া শ’ টাকাই দেওয়া উচিত ছিল, আমরা এঁকে সাতশ’ টাকা, তার সঙ্গে পর্যাপ্ত সামগ্রী দিয়েছি, তা সত্ত্বেও বলে কিনা, এখন সীতাজীর কাছ থেকেও আশা করছি। রামের কর্তব্য হল দুর্ব্যবস্থা ঠিক করা। তাই হে লক্ষণ! এই পণ্ডিতকে উত্তম মধ্যম দাও।’’ তক্ষুণি লক্ষণ আজ্ঞা পালন করেছিল।

পণ্ডিতমশাই মার খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে নির্মলদাসজীর কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা বলেছিলেন। নির্মলদাসজী শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। খড়ম পায়ে দিয়ে তক্ষুণি রাম-লক্ষণের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির দিকে তাঁকে আসতে দেখে রাম বলেছিলেন, ‘‘লক্ষণ! মনে হয় কোন সাধু আসছেন, চেয়ার নিয়ে এস।’’ লক্ষণ চেয়ার এনে তাঁকে সাদরে বসিয়েছিলেন। জলখাবার এনে তাঁকে দিয়েছিলেন,কিন্তু নির্মলদাসজী তো রাগে গর্ গর্ করছিলেন, খেতেন কি করে? তিনি রামকে বলেছিলেন, ‘‘তোমরা খল, রাম-লক্ষণ নও! তোমরা কলিযুগের! তোমরা কপটতা করছ! পণ্ডিত মশাইকে তোমরা মারধোর করেছ কেন, জিনিষপত্র কেন কেড়ে নিয়েছ?’’ রাম কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নির্মলদাস কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন না। তখন রাম বলেছিলেন, ‘‘লক্ষণ! মনে হয় স্ফটিক শিলা থেকে জয়ন্ত এসে গেছে। এর মাথার চুল কেটে ফেল।’’ লক্ষণ কাস্তে হাতে নিয়ে ছুটে গেছিল এবং তাঁর জটা কেটে ফেলেছিল। হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, নির্মলদাসজীর জটা কাটা গেছে। পুলিসে অভিযোগ করা হয়েছিল।

এ খবর পেয়ে নির্মলদাসজীর এক শিষ্য তাঁর কাছে এসেছিল। নির্মলদাসজী শিষ্যটিকে নিজের কঠোর সাধনা-স্থলী দেখাতে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। হনুমান ধারার নীচে একটি গুহা ছিল। সেই গুহার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নির্মলদাস বলেছিলেন, ‘‘এই গুহাতেই আমি ভজনা করেছিলাম।’’ দৈববশতঃ সেদিন ভিতরে ভালুক বসেছিল। সে নির্মলদাসের হাতটা কামড়ে ধরেছিল। তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলেন। শিষ্যটির হাতে শাবল ছিল, সেটা দিয়ে সে ভালুকের মুখে প্রহার

করেছিল। ভালুকের চোখে গিয়ে সেটা লেগেছিল। ভালুকটা নির্মলদাসের হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। নির্মলদাস বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন যার জন্য তাঁর একট পা গুহার ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। ভালুকটা এবার তাঁর পা-টাকে ধরেছিল। শিষ্যটি কিছুক্ষণ তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপর প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল। নির্মলদাসকে ভালুকটা খেয়ে ফেলেছিল। রাম এবং লক্ষণ এ খবর জানতে পেরে মহারাজজীর দর্শন করার জন্য আশ্রমে গিয়েছিল। সাদর দণ্ডবৎ করে নির্মলদাসজীর দুর্দশার কথা বলে তারা তাঁকে বলেছিল-"**হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাষা।" (মানস, ১।৬৪।৪),** আমরা কোন সাধুকে কি জ্বালাতন করতে পারি, এটা আপনার বাণীর প্রভাব ছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, "না রে! বাণীই তো, মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেটা সত্য করা, না করা ভগবানের কাজ।"

চরখারীর পুরোহিত

চরখারী স্টেটের রাজ পুরোহিতের মনে বৈরাগ্য জেগেছিল। তিনি কিছু না বলেই সেখান থেকে চিত্রকূট চলে গিয়েছিলেন। সারাটা দিন পথের ধারে লাইনের কাছে একটা জায়গাতে বসে লোকের কাছে কিছু না কিছু চাইতেই থাকতেন যে, ভাই! আমাকেও কিছু দান কর। এই পেটটা খুব পাপী ইত্যাদি এইসব বলে যেমনি কিছু পয়সা পেতেন, ছেলেদের ডেকে বলতেন, "এসো, আমার সঙ্গে জুয়া খেলবে?" ছেলেরাও এই অপেক্ষাতে থাকত কারণ তিনি জুয়াতে প্রত্যেকবার হেরে যেতেন। তিনি জেনেশুনে এই ক্রীড়া করতেন এবং নিশ্চিন্তে ভজনা করতেন।

তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে চরখারী নরেশ চিত্রকূট গিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে পেয়েও ছিলেন। আগে তো রাজা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু ভজনে তাঁর রুচি দেখে রাজা চিত্রকূটের দোকানদারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই মহাত্মার সর্বপ্রকারে সেবা করুন এবং যা কিছু খরচ হবে এঁর সেবাতে, তা রাজকোষ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মহারাজজীর সেবাতে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

একদিন রাজা তক্তাপোষের উপর আসন পেতে বসে নিবেদন করেছিলেন, "পুরোহিত মশাই! আজকে কিছু উপদেশ দান করুন। পুরোহিত মশাই বিদ্বান তো ছিলেনই, রাজাকে একদিন তিনি বিধিপূর্বক কাহিনি শুনিয়েছিলেন। সংস্কৃতে তিনি

গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন।”

রাজা সাহেব যতদিন চিত্রকূটে ছিলেন তিনি পুরোহিত মশাইকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকে যাবার পরই পুরোহিতমশাই সব জিনিস দীন-হীনদের মাঝে বিতরণ করেছিলেন এবং নিজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন।

রামঘাট পৌঁছাবার পরই মহারাজজী শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন। তিনি বিচার করতে শুরু করেছিলেন যে, কি ব্যাপার! এখানে কোন উচ্চস্তরের মহাত্মা আছেন বোধহয়। তিনি বালিতে একজন মহাত্মাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। মহারাজজী তাঁর দিকেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজজীকে তিনি দূর থেকেই আসতে দেখে উঠে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। স্নেহরসে বিগলিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, “কত ভাল সময়ে আপনি এসেছেন।” জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছিল। মহারাজজী নিজের ওড়নাটি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সস্নেহে বলেছিলেন, “এতে কাঁদার কি আছে? দেহ তো নশ্বর। আপনি তো সহজ স্বরূপে স্থিত এখন শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করে যান।” পুরোহিত মশাই বলেছিলেন “এটা তো আনন্দাশ্রু। আপনি খুব ভালো সময়ে এসেছেন। আপনার কৃপা লাভ করে আমি ধন্য হলাম।” মহারাজজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কার্বী গিয়েছিলেন। সেই দিনই পুরোহিত মশাই দেহ ত্যাগ করেছিলেন। মহারাজজী যখন কার্বী থেকে ফিরছিলেন, তখন ধূমধাম করে পুরোহিত মশাইয়ের মৃতদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মহাপুরুষই মহাপুরুষকে চিনতে পারেন।

আশ্রমে ডাক্তার রামকুমার বর্মা

প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার রামকুমার বর্মা চিত্রকূট পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অনুসুইয়া আশ্রমের নিকটবর্তী গ্রামের কিছু ছাত্র তখন প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। তাদের মধ্যে একটি ছাত্র কার্বীর ছিল। সে ডা. বর্মাকে স্বাগত জানাবার জন্য হাতির ব্যবস্থা করে চিত্রকূট পৌঁছেছিল। শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়ার চর্চা ছাত্রদের কাছে শুনে ডা. রামকুমার বর্মা সেই হাতিটির পিঠে আরোহণ করে চিত্রকূট থেকে অনুসুইয়া আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। পথে সেই ছাত্রটিই বিনম্রভাবে প্রশ্ন করেছিল যে, শ্রীমানজী! গোস্বামী

তুলসীদাসজীর চতুষ্পদী-"**উলটা নামু জপত জগু জানা। বালমীকি ভয়ে ব্রহ্ম সমানা।।**" *(মানস, ২/১৯৩/৮)* এর আশয় স্পষ্ট করুন। ডাক্তার রামকুমার বর্মা ছাত্রটির এই জিজ্ঞাসা শান্ত করার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আশয় স্পষ্ট করেছিলেন কিন্তু ছাত্রটি তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। সে বলেছিল, "আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমি অনুগৃহীত। আপনি অনেক তর্ক এবং উদাহরণের মাধ্যমে আশয় স্পষ্ট করেছেন, কিন্তু সেগুলি আমার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। এই তর্কে-বিতর্কে জড়িয়ে ডা. বর্মা সপরিবারে কবি এবং ছাত্রদের সঙ্গে পরমহংস আশ্রম পৌঁছেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু এমন ব্যক্তিও ছিল, যারা আশ্রমের পূর্ব পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ডা. বর্মার পরিচয় শিষ্টতাপূর্বক মহারাজজীকে দিয়েছিলেন। তিনি প্রণাম করে বসে পড়েছিলেন। উপর্যুক্ত প্রশ্নটি ডা. বর্মা এবং ছাত্রটির মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রশ্নটি মহারাজজীর সমক্ষে রাখা হয়েছিল। মহারাজজী শুনে সহজভাবে তাদের সকলকে সম্বোধিত করে বলেছিলেন যে, এই চতুষ্পদী মানসের। তাঁর উল্টা নামের অর্থ 'মরা মরা জপ নয়।' রামাবতারের পূর্বে ওঁ, শিব ইত্যাদি নাম জপ দ্বারা একই লক্ষ্য প্রাপ্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে রাম, হরি ইত্যাদি নাম জপ দ্বারা আজও সেই স্থিতি লাভ হয়। বিচার করুন, বাইরের উল্টো কি? ভিতর! সোজার উল্টো কি? উল্টো! এইরূপ জপের উল্টো হল অজপ সেই জন্য গুহ্যতম কথাটি লুকিয়ে গোস্বামীজী উল্টো নাম লিখে দিয়েছেন, যার তাৎপর্য-'**অজপা (উলটা) নামু জপত জগু জানা। বালমীকি ভয়ে ব্রহ্ম সমানা।।**' এই নাম জপ করার প্রয়োজন হয় না পরন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা ক্রমাগত চলতে থাকে। এইরূপ এর পরিপক্ক অবস্থাতে ব্রহ্ম এবং সাধক অভিন্ন এই স্থিতি লাভ হয়। মহর্ষি বাল্মীকি এই নামই জপ করতেন এবং এই ক্রিয়া বিশেষ দ্বারাই ব্রহ্ম সমান স্থিতি লাভ করেছিলেন। পরমহংস মহারাজের কাছে এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ডা. বর্মা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল যে বাল্মীকির মত ডাকাত (যে প্রায়ই হত্যা করত) অজপার ন্যায় সাধনাত্মক প্রক্রিয়ার উচ্চশ্রেণী কিরূপে লাভ করলেন? তাঁর শঙ্কা সমাধান করে মহারাজজী বললেন, যে সময় বাল্মীকি পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলস্বরূপ মহর্ষির দর্শন লাভ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্জগত থেকে প্রাপ্ত বিশেষাধিকার দ্বারা বাল্মীকিকে অজপার স্থিতি প্রদান করেছিলেন, এতে শঙ্কার কিছু নেই। কারণ চিরকাল এইরূপ হয়ে এসেছে। মহাপুরুষ ইচ্ছা করলে কৃপা করে যে কোন ব্যক্তিকে উত্তম স্থিতি প্রদান করতে পারেন।

শ্রীপরমহংস মহারাজজীর অনুভূতিজন্য সাবলীল ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ডাক্তার বর্মা এবং ছাত্রদের সমস্ত শঙ্কার সমাধান হয়ে গিয়েছিল।

ডা. বর্মার মনে যে প্রশ্ন উদিত হয়েছিল তার সমাধান হয়েছিল। তাঁর ছাত্রটি বলেছিল, ‘‘মহারাজজী! ডা. সাহেব কবীরের বাণীর অনুসন্ধান কার্যে রত।’’ তার কথা শুনে মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘খুব ভালো কথা, আমাকেও কিছু শোনান। জঙ্গলে এ সব দেখার শোনার অবসর আমাদের কোথায়? কবীরের যে কোন পদ শোনান।’’ ডা. সাহেব নিম্নলিখিত পদটি শুনিয়েছিলেন। ‘**কাহে রে নলিনী তু কুমহ্‌লানী, তেরে হী নাল সরোবর পানী**।’ অল্প শুনিয়ে তিনি হঠাৎ বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী, আমরা শোনার জন্য এসেছি আমি যা কিছু অনুসন্ধান করেছি সেটা শুধু বুদ্ধিবিলাস। আমি তাতে সন্তুষ্ট নই, মনেও শান্তি নেই সেইজন্য আপনার মত সাধুদের দর্শনের অভিলাষা নিয়ে চিত্রকূটে এসেছি। আপনিই কিছু বলুন।’’ তাঁর অনুরোধে মহারাজজী নিজের পছন্দের কবীর দাসজীর একটা ভজন তাঁকে শুনিয়েছিলেন-

কা কহীঁ কৈসে কহীঁ কো পতিআঈ ফুলবা কো ছুঅত ভঁওর মরি জাঈ।
গগন মণ্ডল মহঁ ফুল এক ফুলা, তর ভৌ ডার উপর ভৌ মূলা।।
জোতিয়ে না বোইয়ে সীঁচিয়ে না সোঈ, বিনু ডার বিনু পাত ফুল এক হোঈ।
ফুল ভল ফুলল মালিনী ভল গাঁথল, ফুলবা বিনসি গয়ো ভঁওর নিরাসল।
কহত কবীর সুনো সন্তো লোঈ, পণ্ডিতজন ফুল রহত লুভাঈ।।

এই পদটির তাৎপর্য বলে মহারাজজী বলেছিলেন-হো! ‘কা কহী’-তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটা বাণীর বিষয় নয়, এটা অনুভবগম্য। ‘**কৈসে কহীঁ**’-কাকে বলা হবে? এটা শুধু অধিকারীদের জন্যই সুরক্ষিত, সকলের জন্য নয়। ‘**গূঢ়উ তত্ত্ব না সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ।।**’ *(মানস, ১/১০৯/২)* ‘**কো পতিআঈ**’-কে বিশ্বাস করবে? শুধু বলে বিশ্বাস করানো যেতে পারে না। বিশ্বাস তখনই হয়, যখন ভিতরে অনুভবে প্রকট হয়ে যায়, সেই বার্তা কি? তা হল-‘**ফুলবা কে ছুঅত ভঁওর মরি জাঈ**’-সন্ত কবীর সেই পরমাত্মাকে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মকে ফুলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুগন্ধ তিনি, যাঁর নেশাতে মানুষ সদা-সর্বদা তাঁর চিন্তনে মগ্ন হয়ে থাকে। ভ্রমর যখন ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করে, তখন তাতেই মগ্ন হয়ে যায়। বিভোর হয়ে যায়। এখানে কবীর সেই পরমতত্ত্বকে ফুলের সংজ্ঞা দিয়েছেন, কারণ

তাঁর কোন আকার নেই। '**বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা।।**' *(মানস, ১/১১৭/৫)* —তিনি কান না থাকা সত্ত্বেও শোনেন, পা না থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র বিচরণ করেন, হাত না থাকা সত্ত্বেও সব কর্ম করেন। এইরূপ পরমাত্মাকে সন্ত কবীর ফুলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যখনই সেই ফুলকে স্পর্শ করে, -'**ভঁওর মরি জাঈ**'-বিরহী মনই ভ্রমর, পরমাত্মার অনুসন্ধানকারী সেই, তাঁকে লাভ করার জন্যই হন্য হয়ে বেড়ায়। লক্ষ লক্ষ বস্তু এবং গাছপালা থাক না কেন, কিন্তু যেখানে ফুল ফুটে থাকে, ভ্রমর সেখানে গিয়েই তৃপ্তি লাভ করে, তাঁর কাছে পৌঁছে বিরহী মন যখনই তাঁকে স্পর্শ করে, তখনি '**জানত তুম্হহি তুমহ্ই হোই জাঈ।।**' *(মানস, ২/১২৬/৩)*-ভ্রমরের মৃত্যু হয়। সেবক সদার জন্য হারিয়ে যায় এবং প্রভুই শুধু থেকে যান। '**দেখতে—দেখতে কেয়া সে কেয়া হো গয়া, কতরা দরিয়া মে গিরা তো ফনা হো গয়া।**' বিন্দু সিন্ধুতে পড়লে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। সিন্ধুই শুধু থেকে যায়। '**ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী**' *(মানস, ৭/১১৬/২)* —পরমাত্মা যেরূপ, তার অংশ জীবাত্মাও সেইরূপ। যখনই মূলের স্পর্শ করে, তখনই অংশ, যা কম ছিল, তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, এবং যে অধিক, সেই পরমাত্মার অস্তিত্বই থাকে শুধু। এই জীবাত্মা মূলের স্পর্শ করে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। নিজের অন্তরে সেই পরম চেতনাকে লাভ করে। চেতন তার মধ্যে প্রবাহিত হয়। মনরূপ ভ্রমর তাঁকে স্পর্শ করেই বিলীন হয়ে যায়।

সেই ফুল কোথায় ফোটে? '**গগন মণ্ডল মহঁ ফুল এক ফুলা, তর ভৌ ডার উপর ভৌ মূলা**'-আকাশ বলা হয় শূন্যকে, আকাশ শূন্যস্থানকে বলে। মন যখন সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হয়ে শূন্যে টিকে থাকার ক্ষমতা লাভ করে, সেটাকেই চিদাকাশ বলে। তখন ভিতরে কোন সঙ্কল্পের স্ফূরণ ঘটে না এবং বাহ্য বায়ুমণ্ডলের সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এই নিরুদ্ধ অবস্থাকে আকাশ ধারণ বলে। সাধক যখন শূন্যে প্রবেশ করে, তখন সেই ফুল, পরমাত্মার ক্ষণিক দর্শন সুগন্ধ পায়, এর পূর্বে নয়। এই পর্যন্তই সাধনা করতে হবে। '**কোউ অবকাস কি নভ বিনু পাবই।**' *(মানস ৭/৮৯/৩)* —যতক্ষণ শূন্যে টেকার ক্ষমতা লাভ হয় না, ততক্ষণ কেউ শান্তি লাভ করতে পারে না, নিবৃত্তি হয় না। সঙ্কল্প-বিকল্পহীনতার সেই অবস্থাতে, '**ফুল এক ফুলা**'- যেখানে বহু নেই, যিনি এক এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত সেই পরমাত্মার আভা বিদিত হয়। তাঁকে ভালভাবে জানা মানে এটাই হল সেই ফুলের ফোটা। সেই পরমাত্মার, '**তর ভৌ ডার উপর ভৌ মূলা**'-নিম্নের ভৌ, ভব বলে সংসারকে।

নিম্নের সংসার হল কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা এবং উপরের পরমাত্মা হলেন সংসারের মূল, সাধক যাঁর স্পর্শ লাভ করে। গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সংসার হল বৃক্ষস্বরূপ, '**উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।**' *(গীতা ১৫/১)* অর্জুন! উর্ধ্বে পরমাত্মাই যার মূল এবং নিম্নে প্রকৃতিই যার শাখা-প্রশাখা এইরূপ এই সংসার হল অশ্বত্থ বৃক্ষ। বেদকে এর পাতা বলা হয়েছে। যিনি উর্ধ্ব এবং মূল সহ এই সংসার বৃক্ষকে জানতে পারেন, তিনি বেদের তাৎপর্য বুঝতে পারেন, সেই অবস্থাতে তিনিই বেদবিৎ। যিনিই মূল স্পর্শ করেন, তিনিই বেদের জ্ঞাতা। অর্থাৎ বেদ কোন গ্রন্থ নয় যে, কেউ ক্রয় করে পাঠ করে নেবে। যদি বেদকে গ্রন্থ বলা হয়, তবে তা নিশ্চয় কিছু ব্যক্তির যৌথ প্রয়াস, তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে। তবে সেটা অপৌরুষেয় কি করে হবে? সাধনার সঠিক দিশাতে এগিয়ে গেলে প্রভু নিজেকে একটু-একটু করে ধরা দেন, সেটাই বেদ। সেই বেদের শিক্ষক যখন পরমাত্মা হন, তখনই তা বোধগম্য হয়। ইষ্টের বাণী শ্রবণ করে যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি বেদের জ্ঞাতা এই কারণেই প্রাপ্তিযুক্ত প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্তে দেখা যায় এমনি কিছু কথা যেমন-ভগবান এই বলেছেন, ভগবান এই করেছেন, পরমাত্মা আকাশবাণী করেছেন, উঠিয়ে, বসিয়ে সাবধান করেছেন, বারণ করেছেন ইত্যাদি। সেই পরমাত্মার শ্রীমুখ থেকে শেষে শাশ্বতের উপলব্ধি হয়, তাকেই বেদ বলে। বর্তমানে যদি কেউ বেদবিৎ, তবে তিনি ভগবানের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই হয়েছেন।

গোটা দুনিয়াতে ফুলের জন্য মাটি খুঁড়ে গাছ লাগিয়ে ফুলের চাষ করা হয়, কিন্তু এই অধ্যাত্ম পথে, এরকম কিছু করার প্রয়োজন হয় না। এই ফুলের বাগানে রাশি-রাশি ফুল থাকে, এমন কথাও নয়। '**জোতিয়ে না বোইয়ে সীঁচিয়ে না সোঈ, বিনু ডার বিনু পাত ফুল এক হোঈ।**' একটাই ফুল ফোটে তাও তখন, যখন মোহ-মায়ার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, প্রকৃতির একটা ডাল-পালাও অবশিষ্ট থাকে না।

'ফুল ভল ফুলল মালিন ভল গাঁথল, ফুলবা বিনসি গয়ো ভঁবর নিরাসল।' ভল অর্থাৎ বিলক্ষণ, বিচিত্র ফুল ফোটে এবং '**মালিন ভল গাঁথল**' —ইষ্টোন্মুখী মানসিক প্রবৃত্তিই হল মালিনী এই মানসিক প্রবৃত্তি স্মৃতিতে ভালভাবে গেঁথে নেয়, সেই পরামাত্মাকে মনে উত্তমরূপে আঁকড়ে ধরে এবং উত্তমরূপে মনের মধ্যে স্থির

করার সঙ্গে-সঙ্গে '**ফুলবা বিনসি গয়ো ভঁবর নিরাসল**'-যে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য সাধক লালায়িত ছিলেন, তাঁকে স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার পৃথক অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থাতে পরমাত্মা সাধকের স্বরূপে প্রবাহিত হন। পরমাত্মা, সাধক একাকার হয়ে যান, একত্ব প্রাপ্ত করেন। তিনি সাধক থেকে পৃথক থাকেন না। যদি তিনি পৃথক, তবে অনুসন্ধান কার্য এখনও অসম্পূর্ণ, শেষ হয়েছে কোথায়? মানসিক তল্লীনতার দ্বারা উত্তমরূপে নিজের মধ্যে সমাহিত করে নিলেই বাইরে তার স্বরূপ সমাপ্ত হয়ে যায়। অভিন্ন এবং অদ্বৈত স্থিতি লাভ হয়। '**ভঁওর নিরাসল**'-মন ভ্রমর নিরাশ হয়। তার ছোটাছুটি শেষ হয়। কিছু করা তার বাকী থাকে না। তাছাড়া আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সদা-সর্বদার জন্য নিবৃত্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যায়।

এই ফুলের ক্রেতা কে? কবীর বলেছেন-'**সুনো সন্তো লোঈ**' -সাধারণ সাধু নয়, 'লোঈ' যিনি তন্ময় হন। অনুরাগী সাধুগণ, শুনুন, বিরহী সাধুগণ! শুনুন, যাঁর অন্তর বিরহ-বৈরাগ্যে পূর্ণ, অনবরত ব্যাকুলতা জাগে, সতত প্রীতিপূর্বক যুক্ত হন যাঁরা, সেই সাধুগণ! শুনুন। '**পণ্ডিত জন ফুল রহত লুভাঈ**'-পণ্ডিত কে? তিনিই পণ্ডিত, যিনি সাধনা পথের জ্ঞান রাখেন, যাঁর সাধনা পথ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। চিন্তন পথের সোপান চারটি, তার মধ্যে শেষের সোপান হল পণ্ডিত। সেই পণ্ডিতগণ এই পুষ্পরূপ পরমাত্মাকে কামনা করেন।

ভজনের অর্থ বলার শেষে ডা. বাবু বলেছিলেন, "মহারাজজী! বলা এবং করাতে অনেক তফাৎ। আমরা মনে করতাম যে, আমরাই তত্ত্বজ্ঞাতা, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, তত্ত্ব অন্য জিনিষ। আমরা তো শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই বিচার করি।" '**জিমি নিজ বল অনুরূপ তে, মাছী উড়ই অকাস**' ***(মানস, ৬/১০১ ক)***-আজ বুঝতে পারছি, এটা সাধনগম্য, এটা ক্রিয়াত্মক পথ। কৃপা করে আমাদের সাধনা-ক্রম সম্বন্ধে বলুন, যার আচরণ করলে আমাদের মঙ্গল হবে।

মহারাজজী বলেছিলেন, "হো! সাধনা নির্জনে করতে হয়। সত্যি-সত্যি যদি সাধন ক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে চাও, তবে পরে সময় করে আসবে।" এরপর কার্যক্রম অনুসারে অনুসুইয়ার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে ডা. বর্মা সঙ্গীদের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন।"

শিষ্যদের নিযুক্তি

শ্রী ব্রহ্মচারীজী পৌঁছাবার পরে ক্রমশঃ শিষ্যত্ব প্রাপ্তির জন্য অনেকানেক শ্রদ্ধালুর ভিড় হতে শুরু করে। মহারাজজী উত্তম জেনে পরখ করে দেখে আট-দশজন মুমুক্ষুকে শিষ্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। মহারাজজী বলতেন, যদি আমি শিষ্য বানাতাম, তবে হাজার-হাজার বৈরাগ্যবান আমার শিষ্য হত। তাঁর কাছে যাঁরা শিষ্যত্ব লাভের জন্য আসতেন, তাদের তিনি এই বলে এড়িয়ে যেতেন যে, এই সংসার অনেক লম্বা চওড়া। চিত্রকূট, অযোধ্যা, ঋষিকেশ ইত্যাদি স্থানগুলিতে সর্বত্র মহাত্মাদের ভিড়, এই সব স্থানের মধ্যে কোথাও গিয়ে কারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে যাও।

যে ব্যক্তি মহারাজজীর কাছে যেত, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জানতে পারতেন যে, তার মধ্যে সাধু হওয়ার লক্ষণ আছে কি নেই? সেইজন্য তিনি তক্ষুণি চলে যেতে বলতেন। তা সত্ত্বেও যদি না যেত,তবে বকতেন, তিরস্কার করতেন। যদি কেউ কোন রকমেই যেতে না চাইত, তখন তাকে আশ্রমে এক দু'দিন থাকতে দিতেন, সস্নেহে বোঝাতেন। যদি তারপরেও যেতে না চাইত, তখন তিনি চুপি-চুপি তার ঘরে টেলিগ্রাম করে দিতেন। বহু ব্যক্তিকে মহারাজজী এইভাবেই তাদের ঘরের লোকেদের ডেকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। যাকে-তাকে সাধু হওয়ার অনুমতি কখনও তিনি দেননি।

শিষ্য বানানোর প্রবৃত্তি মহারাজজীর মধ্যে এত কম ছিল যে, কখনো-কখনো যোগ্য ব্যক্তিও তাঁর শিষ্যত্বলাভ করতে পারতেন না। মুম্বাই থেকে একটি ছেলে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিল। তার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন যে, একে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করুন। মহারাজজী মনে-মনে চিন্তা করেছিলেন যে, কাল দেখা যাবে। কিন্তু রাত্রিতেই ছেলেটি সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। মহারাজজী এ সম্বন্ধে বলতেন, 'হো! আমাকে তক্ষুণি বলে দেওয়া উচিত ছিল, সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল কিন্তু ক্ষীণ সংস্কার থাকার ফলস্বরূপ চলে গিয়েছিল।'

এইপ্রকার তেরো বছরের এক ব্রাহ্মণ বালক মহারাজজীর সান্নিধ্যে পৌঁছেছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের ছিল সে। তার পিতার একটি কারখানা ছিল। কারখানাটি ছেলের নামে ছিল। মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল। সে মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল যে, মহারাজ তাকে যেন নিজের শরণে রাখেন। আশ্রম ঝাঁট দেওয়া,

জল নিয়ে আসা, বাসন মাজা ইত্যাদি সব কাজই সে অত্যন্ত তৎপরতাপূর্বক করত, কিন্তু অন্ন গ্রহণ করত না। এইভাবে তেরোদিন পার হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজজী তাকে রোজই বোঝাতেন যে, ‘‘বাছা! এখন তুই বাড়ি যা। যখন তুই বড় হয়ে যাবি, একুশ-বাইশ বছরের হয়ে যাবি, তখন আসিস আমি তোকে স্থান দেব। এখানে থাকার সামর্থ্য এখন তোর মধ্যে নেই। সাধুর পথ বুঝে-সুঝে চলার পথ। অনভিজ্ঞের পক্ষে এই পথে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ছোট ছেলেদের কথাবার্তাই মিষ্টি-মিষ্টি লাগে, তাদের ভিতরটা অন্তঃসারশূন্য। ভিতরে সার বস্তু বলতে কিছু থাকে না। শরীরটা বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ-মধ্যস্থ শত্রুগুলিও বড় হয়ে যাবে। দেহটা যোলো বছরের হলে এর বুদ্ধিও যোলো বছরের কিশোরের মত পরিপক্ক হবে এবং কাম- ক্রোধ- লোভ-মোহ- মদ-মৎসর এগুলিও যোলো বছরের হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি বস্তু বড় হয়ে যায়। সদ্‌গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে, এখন তুই যা, আমি তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি এমন কথা নয়, বড় হয়ে আসিস। এখন থেকে তোকে থাকতে দিই, এটা ভাবামাত্রই খুব অলক্ষণ দেখছি। এখন তোর মধ্যে সাধু হওয়ার একটা লক্ষণও নেই। এখন তোর খুব বিপদ।” ছেলেটি রোজই একথা শুনত, শুনে যা-ই বুঝত শুধু বলত যে, বাড়ি ফিরে যাবে না, সেবা করবে।

সে যখন তেরো দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটিয়ে দিয়েছিল, তখন মহারাজজীর মনে দয়া উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি ব্রহ্মচারীজীকে বলেছিলেন-‘‘দেখো! একে ধরে কিছু খাওয়াও। ব্যর্থই অজ্ঞতাবশতঃ প্রাণ দিতে চাইছে।” ব্রহ্মচারীজী গেলাসে ছাতু গুলে বকা-ঝকা করে কোনক্রমে তাকে ছাতু খাইয়েছিলেন। ছাতু খেয়ে সে গেলাস ধুতে-ধুতে কাঁদছিল-উঁ... বাবাজী আমার ধর্ম নষ্ট করে দিলেন। মহারাজজী শুনে বলেছিলেন-‘‘একে জিজ্ঞাসা কর কিরূপে আমি এর ধর্ম নষ্ট করেছি?” সে বলেছিল-আমাকে খাইয়ে। মহারাজজী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন-‘‘আমরা অন্নগ্রহণ করি, তবে কি আমরা সাধু নই?” সে বলেছিল-‘‘উঁহু! আপনারা সাধু নন। সাধু আবার অন্নগ্রহণ করে নাকি?” মহারাজজী বলেছিলেন-‘‘দেখছ! কি বলছে।” মহারাজজী মনে-মনে চিন্তা করেছিলেন যে, ছেলেটি এখন কোনরকমে গেলে হয়।

ঠিক সেইসময় পাঁচজন ত্যাগী সাধু পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভস্ম মেখে কেউ কুশের কৌপীন, কেউ কলাপাতা, কেউ বৃক্ষাদির মূল ধারণ করে, হাতে কমণ্ডলু

নিয়ে আশ্রমের সিঁড়ি দিয়ে নেমে মন্দাকিনী নদীর তীর ধরে আসছিলেন। তাদের দেখতে পেয়ে মহারাজজী বলেছিলেন-"দেখ! এদের দেখতে কি ভাল লাগছে, তুই এদেরই কাউকে নিজের গুরুরূপে বরণ করে নে।"

মহারাজজী রসিকতা করে বলেছিলেন, কিন্তু সেই সাধুরা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কেউ শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বলেছিলেন, "চলো ছেলে! ত্যাগীর স্থান সর্বোপরি।" 'রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।' আমরা তোমাকে রাম মন্ত্র দেব।" সেই সরল ছেলেটি দেখল যে মহারাজজী থাকতে দেবেন না, এখন কোথায় যায়? বেচারা তাদেরই সঙ্গ ধরেছিল। তার চলে যাওয়ার সময়ও মহারাজজী অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন যে, ছেলেটি যাতে না যায়; কিন্তু থাকতে দিতেও নিষেধ হচ্ছিল। অতএব মহারাজজী ভাবলেন, যাক। সংস্কারে যা আছে, দেখা যাবে। আপদ্ দূর তো হোক।

সেই ত্যাগীরা ছেলেটিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। চারদিন পর ছেলেটি পালিয়ে আবার অনুসুইয়া আশ্রমে পৌঁছেছিল। দূর থেকেই মহারাজজীকে দেখে সে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। কিছুতেই তার কান্না থামছিল না। এক ঘণ্টা প্রায় কাঁদার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়েছিল, তখন মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি ব্যাপার? কিছু তো বল...! তুই তো ত্যাগীদের সঙ্গে গিয়েছিলি" সে বলেছিল-মহারাজজী! তারা সকলেই সাধুবেশে ধূর্ত, প্রতারক। সাধু বেশকে কলঙ্কিত করেছে। তারা আমাকে প্রয়াগের মেলাতে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে বদ আচরণ করেছে। আমার উপর পাহারা বসিয়েছিল। ভীড়ে কোনক্রমে তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। এমন গ্লানি বোধ হচ্ছিল যে, গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করি। তারপর মনে হল যে, মহারাজজীর দর্শন করে নিই। তার করুণ কাহিনী শুনে মহারাজজীর মন দয়াতে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর দু'চোখ অশ্রুপাত পূরিত হয়ে উঠেছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, "হো, আমাকেও ভগবান বলেছিলেন যে, এরা সাধু নয়।" তখন ছেলেটি রাগে ফেটে পড়েছিল-"আপনি জানতেন যে, তারা সাধু নয়, তবে কেন আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে দিলেন?" মহারাজজী বলেছিলেন-"বাছা এখনও বলছি বাড়ি ফিরে যা।" তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, বুঝিয়ে ভাড়া দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন।

ছেলেটি তখনকার মত চলে গিয়েছিল কিন্তু বিকেল চারটের সময় মহারাজজী বলেছিলেন-"হো, মনে হচ্ছে ছেলেটি যায়নি, এই জঙ্গলেই রয়েছে, ওর শ্বাস একথা

বলছে। ওকে খুঁজে বার কর, তা না হলে বাঘ-ভালুক, খেয়ে ফেলবে। একটা আত্মাই তো, দেখ, ওকে বাঁচাও।” আশ্রমের সেবক-শিষ্য ব্রহ্মচারীজী, ভগবানানন্দজী, পাথরার এক নাপিত এবং অন্য যে কেউ সে সময় আশ্রমে ছিল, সেই ছেলেটিকে খুঁজতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু ছেলেটিকে খুঁজে বার করতে পারেনি। মহারাজজী দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিনও বলেছিলেন যে, ওর শ্বাস চলছে। চতুর্থ দিনও সকলেই খুঁজেছিল কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পায়নি। সকলেই ভাবছিল যে, এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কেউ কি করে থাকবে? মহারাজজী এমনিই বলছেন। ষষ্ঠদিন মহারাজজী বলেছিলেন-“এখন তো তার শ্বাস খুবই ক্ষীণ হয়ে গেছে। হয় সে এখান থেকে চলে গেছে অথবা তার মৃত্যু নিকটে। আশ্রমবাসীরা আলোচনা করছিল যে, মহারাজজী এই প্রকার বলেনই। এই জঙ্গলে ছোট ছেলে কিরূপে থাকতে পারে? কোথাও চলে গিয়েছে নিশ্চয়।”

সপ্তম দিন শকুনিরা অনুসুইয়া আশ্রমের পিছনের পাহাড় থেকে একটা লাশ ফেলেছিল। অনুসুইয়া মন্দিরের পূজারী ছুটে মহারাজজীর কাছে এসে বলেছিলেন, একটা লাশ পড়েছে। মহারাজজী বলেছিলেন, পুলিশে খবর দাও। সকলেই গিয়ে লাশটিকে নিয়ে এসেছিল এবং দেখেছিল যে, সেই ছেলেটির লাশ। সে কোন্ পথ ধরে যে পাহাড়ে চড়েছিল। গ্লানির বশীভূত হয়ে হঠকারিতা করে প্রাণ ত্যাগ করেছিল এবং শকুনিরা টানাটানি করাতে নীচে পড়ে গিয়েছিল।

মহারাজজী খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলতেন-“হো, কি যে বলি। আমি যদি জানতাম যে, সে সত্যিই প্রাণ ত্যাগ করবে তাহলে তাকে থাকতে দিতাম, একটা পতিত চেলাই থাকত। আর কি হত?” ভাবুকতা, সহৃদয়তা মহারাজজীর মধ্যে পর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু শিষ্যরূপে তাদেরই স্বীকার করেছিলেন, যাঁদের জন্য ভগবানের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন।

শিষ্য (অখণ্ডানন্দজী) এর প্রবেশ

একজন ব্রাহ্মণ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সাধু বেশে লক্ষ্য প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা নিয়ে যত্রতত্র ভ্রমণ করতে-করতে একবার অনুসুইয়া গিয়ে পৌঁছেছিলেন। পূজ্য মহারাজজীর বিষয়ে তিনি চিত্রকূটেই সব জানতে পেরেছিলেন। অতএব সেই আধারে সশঙ্কিত মনে এসে দর্শন করেছিলেন। দর্শন করার পর মহারাজজীর প্রতি তাঁর আস্থা আরও গভীর হয়েছিল। কিন্তু কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করতেন, সেইজন্য কুড়িদিন

পর্যন্ত আলাদা একটি মন্দিরে নিবাস করেছিলেন এবং তার সঙ্গে চিন্তা করে যাচ্ছিলেন যে, মহারাজজী তো মহাপুরুষ, কিন্তু কোন্ জাতির লোক তিনি। তিনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কোন উঁচু জাতের কি না যদি জানতে পারতাম, তবে নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করে দিতাম। বিচরণ করতে-করতে এতগুলি বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু লক্ষ্যের বিষয়ে এতটুকু আভাস পাওয়া গেল না।

যদিও তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, পরমহংসজী মহাপুরুষ কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে মনের মধ্যে প্রচলিত কুরীতির জন্য সঙ্কীর্ণতা ছেয়েছিল। সেইজন্য গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কুড়িদিন পর্যন্ত তিনি অন্য স্থানে ছিলেন। সদ্‌বিদ্যার প্রতি প্রবল জিজ্ঞাসু সেই সজ্জন ব্যক্তিটি কুড়ি দিনের পর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, পরমহংসজী ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ সন্ন্যাসের স্থিতিতে বিরাজিত, স্বপ্নেই ছুটে গিয়ে প্রণাম করেছিলেন। তখন মহারাজজী তাকে গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কৃপা করে তাঁর পূর্ব সমস্ত শঙ্কার নিরাকরণ করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে ভাবীপথের দিশার সঙ্কেত করেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহারাজজীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য পৌঁছেছিলেন। অন্তর্যামী মহাপুরুষ তাঁর মনোগত বিচারগুলি বুঝে, তাঁকে বলেছিলেন, ভাই আমার জাতি তো খুবই খারাপ-**মাঈ ধোবিন বাপ চামার তাকর জনমল হাম বনওয়ার।।**

তখন তিনি নিষ্কপটভাবে বলেছিলেন, "মহারাজজী আজ কুড়িদিন ধরে আমি নিরন্তর আপনার জাতি সম্বন্ধে ভেবে গেছি কিন্তু আজ কৃপা প্রসাদ পেয়ে গেছি। আমি আপনাকে পরমার্থের শুদ্ধস্বরূপে দেখেছি। এখন আপনি যা'ই হোন, আমার জন্য কিন্তু মহান আত্মা। ভগবন্! দয়া করে আপনি আমার পথ-প্রদর্শন করুন। সর্বপ্রথম তো কবিতার পঙ্‌ক্তির উপর আলোকপাত করুন। যা এখন শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। যাতে আমার ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদন হয়।

মহারাজজী দেখলেন যে, এই ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সাধনাতে প্রবৃত্ত হতে চায়, মহারাজজী সঙ্কেত পেয়েছিলেন যে, এই ব্যক্তিটি উত্তম, তখন বলেছিলেন, "ভাই! স্থূলদেহের উৎপত্তি তো মাতা-পিতার সংযোগে হয়। কিন্তু এঁরা শুধু স্থূল পিণ্ডেরই জন্মদাতা, স্বরূপের নন। স্বরূপের আবির্ভাবের জন্য তো ধ্যানই ধোপা, যার দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের মল পরিষ্কার হয় এবং গতি লাভ হয়, এই চিত্তই চামার, চামড়ার প্রতি আসক্তিতে পূর্ণ। যেরূপ আসক্তি, ভবিষ্যতে সেইরূপ চামড়ার প্রাপ্তি

ঘটে। জড়-চেতন, জঙ্গম-স্থাবর সমস্তই এই চিত্তের জন্যই এইসব আকারের প্রাপ্তি হয়। যখন এই চিত্ত সবদিক থেকে সঙ্কুচিত হয়ে ধ্যানে তদ্রূপ হয়, ধ্যানস্থ হয়, তখন তৃতীয় সত্তা ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেটাই আমাদের স্বরূপ। সেটাই আত্মদর্শনের চরমোৎকৃষ্ট স্থিতি।" '**তাকর জনমল হম্ বন্‌বার।**' অনন্ত জীবধারীগণের খনি এই জগৎ এবং এর দ্বন্দ্ব হল একটা জঙ্গল। আমরা এই সংসাররূপ অরণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ নই, পরন্তু এর সঞ্চালক। অন্য শব্দে তিনিই সদ্‌গুরু, কারণ ব্রহ্মের স্থিতিতে লেশমাত্রও প্রভাব পড়ে না। এই কারণেই মুমুক্ষু সর্বস্ব ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রম করে। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রসুপ্ত অবস্থাতে বিদ্যমান, কিন্তু ধ্যান বিনা তাঁর দর্শন সম্ভব নয়। ধ্যানের দ্বারা যখন চিত্তের বিলুপ্তি ঘটে সেই অবস্থাতে চেতন ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। অতএব সাধন-পদ্ধতি জেনে কিছুকাল সাধনা করেই তিনি মহাপুরুষের স্থিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবধের নিকট পূজ্য গুরুদেব ভগবান যেখানে চাতুর্মাস্যা করেছিলেন, সেই মধ্‌বাপুর গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। আগে সেখানে জঙ্গল ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই আশ্রম শ্রী পরমহংস আশ্রম মধ্‌বাপুর (গোণ্ডা) রূপে বসতিতে পূর্ণ।

শ্রী ভগবানানন্দজীর প্রবেশ

কিছুদিন পর সন্ধ্যাবেলাতে একটি রোগা যুবক মহারাজজীর কাছে পৌঁছেছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁকে, "বাড়ি কোথায়?" ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, "ভগবন্! কানপুর।" মহারাজজী বলেছিলেন, "হুঁ, কানপুরিয়াগুলো তো পুরো ঠগ হয়। যাইহোক কিছু খেয়েছ?" সে বলেছিল, "না মহারাজজী।" মহারাজজী ছোলার আটার দুটো রুটি, একটু নুন-লঙ্কার সঙ্গে তাকে দিতে বলেছিলেন। ছেলেটিকে বলেছিলেন-"যাও গঙ্গার ধারে বসে খেয়ে নিও।" সেই ছেলেটি রুটিগুলো হাতে নিয়ে মন্দাকিনী (গঙ্গা)র তীরে গিয়েছিল। তিনিই হলেন শ্রী ভগবানানন্দজী।

সারাদিনের খিদের পর সে রুটি দুটো খেতে বড় সুস্বাদু বোধ হয়েছিল। নীরব, শান্তির সেই সাম্রাজ্যে তাঁর মন এত মুগ্ধ হয়েছিল যে, তিনি চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, "যদি দুটো করে রুটি খেতে পেতাম, তবে আজীবন মহারাজজীর সেবা করতাম। সংসারের গোলমাল এবং ছল প্রপঞ্চ থেকে দূরে এই তপোভূমিতে মহারাজজীর সান্নিধ্য লাভ হবে কি?"

এদিকে মহারাজজী শিষ্যদের বলছিলেন যে, এই কানপুরী কী ভাবছে জানো,

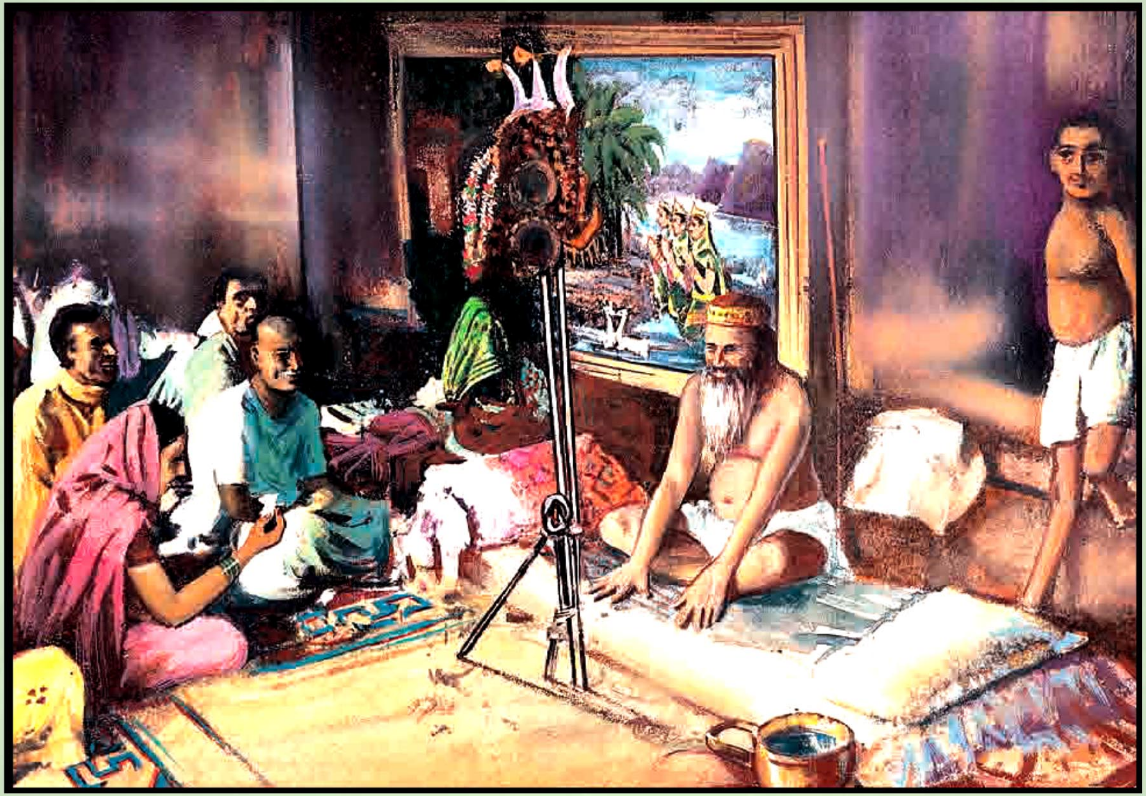

শ্রী পরমহংস আশ্রম স্থানাসীন স্বামী শ্রী ভগবানানন্দজী মহারাজ

এ ভাবছে, যদি দুটো করে রুটি খেতে পেতাম তবে এখানে থেকেই সেবা করে যেতাম। হচ্ছে তো ছেলেটি ভড়্ডরী, কিন্তু এর বুদ্ধি বড় বিচিত্র। ছেলেটি সেবাতে থাকার উপযুক্ত। অখণ্ডানন্দজী শুনে মহারাজজীকে বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! ছেলেটি সুকুমার জাতির বণিক। জঙ্গলে থাকতে পারবে কি?’’ মহারাজজী বলেছিলেন ‘‘না রে! অদ্ভুত এই ছেলেটি।’’ এইরূপ ভগবানানন্দ স্বামীজী আশ্রমে স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন। কানপুরের সিকটিয়াপুরবা নামক স্থান থেকে ষাট-পঁয়শট্টি জন ব্যক্তি স্বামীজীকে খুঁজতে-খুঁজতে আশ্রমে পৌঁছেছিল। স্বামীজীর স্ত্রী এবং মাতৃদেবী বাকী সকলের সঙ্গে মহারাজজীর সমক্ষে হাতজোড় করে বসে গিয়েছিলেন। সকলেই স্বামীজীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা করছিল।

মহারাজজী স্বামীজীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি এবং তোমার স্ত্রীর মাঝে একটা আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই জীবনেই তাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার মাধ্যম হয়ে যাও, অন্যথা শুধু এর জন্যই আর একটা জন্ম নিতে হবে। ছেলেটি তোমার স্ত্রীর অবলম্বন হবে। তাদের জন্য কিছু জমির ব্যবস্থা করে আবার চলে এসো। এতে ঘরের লোকেদের মনেও অসন্তোষ হবে না। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তিনি আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরে যাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা যে ঠিক নয় বেশ বুঝতে পারছিলেন। তিনি সমানে অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। কার্বীতে কুলানন্দজী (সাচ্চা বাবা)র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি মাঝে-মাঝে অনুসুইয়া আসা-যাওয়া করতেন। কুলানন্দজীও সে সময় তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে এবং পুত্র প্রাপ্তির পর ফিরে আসতে বলেছিলেন। স্বামীজী আশ্রমের নতুন শিষ্য ছিলেন, তাঁর কথামত মনকে স্থির করে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

এক বছরের মধ্যেই পুত্র প্রাপ্তি হয়েছিল। খেত ইত্যাদির ব্যবস্থাও অনায়াসে হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজী ঘরেও ধ্যান ও চিন্তনে সময় দিতেন।

পুত্র প্রাপ্তির পর তাঁর স্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন যে, পুত্রপ্রাপ্তির পর ইনি আর কোথাও যাবেন না। ছেলে আমার যত প্রিয়, ততটাই এঁরও তো হবে। তিনি মজা করে তাঁকে স্বামীজী-স্বামীজী বলে ডাকতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলতেন-স্বামীজী হাত ধুয়ে নিন। স্বামীজী ভোজন গ্রহণ করুন। স্বামীজী জলখাবার খেয়ে নিন। স্ত্রীর ব্যঙ্গ বাণে জর্জরিত হয়ে তিনি দিন গুনছিলেন, মহারাজজীর আদেশের।

এক রাত্রে স্বামীজী অনুভবে দেখেছিলেন যে, মহারাজজী তাঁর জন্য একটা বিমান পাঠিয়েছেন, যাতে চেপে তিনি অনুসুইয়া পৌঁছেছেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটতেই ভগবানানন্দজী গৃহত্যাগের নিশ্চয় করেছিলেন। তাঁর ঘরের বাকি সদস্যরা দোতলার কক্ষগুলিতে শুয়েছিল। স্বামীজী তাদের দরজায় শিকল তুলে দিয়েছিলেন, যাতে যাবার সময় কেউ তাঁকে বাধা দিতে না পারে। উঁচু-নীচু পথ দিয়ে যেতে-যেতে পাণ্ডবনদী পার করে স্বামীজী সারারাতে কুড়িমাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে চলে তৃতীয়দিন অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন।

যেমনি তিনি অনুসুইয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, গুরু মহারাজজী তাঁর গৃহত্যাগের সঙ্কেত পেয়েছিলেন। তৃতীয় দিন তিনি অখণ্ডানন্দজীকে বলেছিলেন, ‘‘হো! ওই কানপুরীটা আসছে।’’ অখণ্ডানন্দজী বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! একবছর তো পার হয়ে গেল, আর কি সে আসবে।’’ মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘সে ঠিক আসছে। এখন তো মনে হচ্ছে সে খুব কাছে চলে এসেছে।’’ আশ্রমে যত লোক ছিল, সকলেই ভাবছিল যে, রাত নটার সময় এই ঘন জঙ্গলে কে আসবে? মহারাজজী এমনিই হয়ত বলছেন। ততক্ষণে নদীর ধারে হাত মুখ ধোয়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। সেই অন্ধকারে মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘দেখবে যাও কানপুরিয়া ঘাটে পৌঁছে গেছে।’’ সকলেই অবাক হয়েছিল তাঁকে দেখে, তিনি কানপুরের সেই সজ্জন ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি মহারাজজীর কাছে এসে তাঁকে সাদরে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন।

মহারাজজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘সকলের অনুমতি নিয়ে এসেছ তো?’’ ভগবানানন্দ স্বামীজী বলেছিলেন, ‘‘আজ্ঞে মহারাজজী! সকলেই আমাকে স্বামীজী বলতে শুরু করেছিল তাই ভেবেছিলাম যে, এরা আমাকে স্বামীজীর বেশেই দেখতে চাইছে। এর মধ্যেই আপনার আদেশ পেয়ে চলে এলাম।’’

স্বামী ভগবানানন্দজীর সেবাকার্য প্রশংসনীয় ছিল। তাঁর পূর্বে যাঁরা আশ্রমে প্রবেশ পেয়েছিলেন, সেইসব সাধকদের এবং মহারাজজীর সাধন-ভজনের অনুকূল ব্যবস্থা করে রাখাটা তিনি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। স্বামীজীর ভজন এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পথ দুর্গম হওয়ার জন্য তখন অনুসুইয়া আশ্রম পর্যন্ত আসা যাওয়ার কোন সুবিধা ছিল না। বিশিষ্ট ভক্ত এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই শুধু পায়ে হেঁটে এখানে

আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু কয়েক বছর পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য সড়ক পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। তারপর থেকে চার ছ'টা যাত্রী গাড়ী আশ্রমে যেত, সেইজন্য সবসময় সেখানে ভীড় থাকত। মহারাজজী একদিন হেসে বলেছিলেন, এখানে নির্জন দেখে ভজনা করার জন্য থাকতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু ভীড় হওয়ার জন্য পরিবেশ কোলাহলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই কথা শুনে পাশেই উপবিষ্ট শিষ্য শ্রী ভগবানানন্দজী বলে উঠেছিলেন, মহারাজজী, আপনি নির্জনে কোথাও থাকুন, আমরা আশ্রম দেখাশোনা করব। একথা শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, আরে! এতো দেখছি আমার গদি নিতে চায়। শ্রী ভগবানানন্দজী নতমস্তকে ক্ষমাযাচনা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষদের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। কালান্তরে তা সত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনিই মহারাজজীর গদিতে বিরাজমান।

অনুসুইয়া আশ্রমে বসবাসের পূর্বেই তিনি বেনারসের নিকট ভগীরথীর পবিত্র তীরে স্থিত শ্রী পরমহংস আশ্রম জগতানন্দে বাস করতেন। তাঁর জ্ঞান ও সাধুতার প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে শান্তি এবং সন্তোষের সঞ্চার হচ্ছিল। তাঁর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের প্রেরণা এবং শ্রী স্বামী ধারকুণ্ডী মহারাজজীর আজ্ঞাতে পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়ার দায়িত্ব নিতে হয়। শ্রী পরমহংস মহারাজজী উপদেশ দেবার সময় বলতেন যে, আশ্রমের কোন মহত্ব নেই। যখন হৃদয়ে মহাপুরুষত্বের উপলব্ধি হয়, তখন আপনি যেখানেই থাকুন, কিছু যায় আসে না। শ্রী ভগবানানন্দজী মহারাজজীর স্নেহ ছায়ায় অনুসুইয়া আশ্রমের কাজ সুচারু রূপে এগিয়ে চলেছে এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের মন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাতে পরিপূর্ণ।

স্বয়মানন্দজীর আগমন

কয়েক মাস পরে স্বয়মানন্দ নামের একজন সাধু মহারাজজীর সেবাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বয়মানন্দজী উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ ছিলেন। পৌরহিত্য তাঁর পেশা ছিল। সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, উড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি কয়েকটা ভাষাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। অবাধে সংস্কৃত বলতেন। বি.এ. পাশ করেছিলেন। বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রতি মনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বর্ণব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে স্থিত ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেনই, সেইজন্য মুক্তি লাভ করা, তিনি জন্মসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করতেন।

মহারাজজী মহাপুরুষ ছিলেন এই শিক্ষিত ব্যক্তির জন্যও মহারাজজীর মনে অপার দয়া ছিল। তিনি ক্রমশঃ অধ্যাত্মের উন্নত সোপান গুলিতে তাঁকে আরোহণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রকার আরোহণ করানো এই শাস্ত্রাভিমানী মহাত্মার অসহ্য ছিল। মহারাজজী বলতেন-''হো! একটা-দুটো এমনও থাকা উচিৎ। কুরীতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বয়মানন্দজীর মনে মহারাজজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর বেশীরভাগ সময় অনুসুইয়াতেই কেটেছিল। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বার্ধে অনুসুইয়াতেই তাঁর তিরোভাব হয়েছিল। তিনি ''অবধূতোল্লাস'' নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন।

স্বামী শিবানন্দজী

স্বয়মানন্দজীর পরে শিবানন্দজী মহারাজজীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি জটাধারী মহাত্মারূপে আশ্রমে এসেছিলেন। কোমর পর্যন্ত লম্বা ঘন জটা দেখতে খুব ভাল লাগছিল। খর্বকায় সেই মহাত্মা খড়ম পায়ে, হাতে লম্বা একটা ত্রিশূল নিয়ে খুব গর্বের সঙ্গে হেঁটে যেতেন। তিনি মহারাজজীর সমক্ষে এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করে একপাশে বসেছিলেন। মহারাজজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''কোথায় বাড়ি?'' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ''বদ্রী নারায়ণ থেকে চলে আসছি।'' ''দিদার কাছে মামা বাড়ীর বর্ণনা-এই দেহটার জন্ম কোথায় হয়েছিল?'' মহারাজজী ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ''আজ্ঞে এখানেই হামীরপুরে।'' মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''এত বড় ত্রিশূল নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? ত্রিশূলের অর্থ জানো? সত্ত্ব-রজ-তম এই তিনটি গুণ-ই তিনটি শূল। যিনি এই শূলগুলোর ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, তিনিই ত্রিশূল ধারণ করার যোগ্য, কিন্তু হৃদয়ের স্থিতির চিত্রণ এটা। শুধু জটাটাই ফকিরের বাকী সবই গৃহস্থের।'' তোমার কাছে এটা এল কোত্থেকে?'' তিনি বলেছিলেন, ''আজ্ঞে! ঘরে লোহার যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়। তাই আমিও এই ত্রিশূল তৈরী করেছিলাম। যতদূর গুণগুলির উর্ধ্বে স্থিত হওয়ার কথা, তা সেই জন্যই তো তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি।'' মহারাজজী শুভ সঙ্কেত পেয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন-''হুঁ! দাও ত্রিশূল'' ত্রিশূল নিয়ে তিনি ধূনীতে পুঁতে দিয়েছিলেন। শুরুতে মহারাজজী বিনোদবশতঃ সেই ত্রিশূলটা পুঁতেছিলেন, পরে কয়েকজন পণ্ডিত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা বিধিবৎ ত্রিশূল স্থাপন করেছিলেন, যা বর্তমানে পরমহংস আশ্রমের উদ্দেশ্য বোধ করিয়ে দেয়।

রাত্রে মহারাজজী তাঁর সম্বন্ধে একটা অনুভব দেখেছিলেন। সকালবেলা সেই মহাত্মাকে বলেছিলেন, "দেখ, তুমি পূর্বে কোন এক জন্মে আমার খেলার সঙ্গী-সাথী রূপে ছিলে, এখন আমার সেবা কর। এতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। ভ্রমণের ফল তুমি পেয়ে গেছ-

তীরথ গয়ে এক ফল, সন্ত মিলে ফল চারি।
সদ্‌গুরু মিলে অনন্ত ফল, কহৈ কবীর বিচারি।।

আর অকারণে ঘুরে বেড়িয়ো না।" সেই মহাত্মা অল্প হেসে মহারাজজীর সেবাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর নিবাস স্থান ভরুআ-সুমেরপুর। তিনি খুবই শান্ত মহাপুরুষ। মহারাজজী বিনোদবশতঃ বলতেন, "কালকের যোগী হাঁটু পর্যন্ত জটা-কেমন বেশ বানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এখন ঠিক আছে। অহর্নিশ ভজনা কর, সবই লাভ করবে।"

বগ্গড় বাবা

বগ্গড় বাবার জন্ম বিহার রাজ্যে হয়েছিল। তিনি কাহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতাতে তিনি তৌলিকের কর্ম করতেন। প্রায় কুড়ি বাইশ বছর বয়সে তিনি কলকাতাতে একটি সিনেমা দেখেছিলেন। এতে ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্রটি দেখানো হয়েছিল। প্রহ্লাদকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। বিবিধ প্রকারের যাতনা দেওয়া হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ভক্তির প্রভাবে প্রহ্লাদের সামান্য ক্ষতিও হয়নি। না তার ভক্তি কম হয়েছিল। এই দৃশ্যগুলি দেখে বগ্গড়ের মনে গভীর অনুরাগ উৎপন্ন হয়েছিল এবং তিনি তৌলিকের কর্ম ত্যাগ করে হরি দর্শনের লালসাতে অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। বগ্গড় খুব নির্ভীক ছিলেন।

মহারাজজী অনুসুইয়াতে আরম্ভিক দিনগুলিতে সিদ্ধবাবার যে তক্তাপোষ ব্যবহার করেছিলেন, তার উপর কখন, কোন পথ দিয়ে পৌঁছে বগ্গড় গিয়ে বসেছিলেন কেউ জানতে পারেনি। রাত ন'টার সময় সেই তক্তাপোষ কথা বলে উঠেছিল-'তুমি এর উপর বসার যোগ্য নও, যাও নিচে গিয়ে শিবের সেবা কর।' পরের দিনও এই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। তৃতীয় দিন একটি আকৃতি প্রকট হয় ও তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দিয়ে বলে-"পালাও এখান থেকে। আমি কতবার বলেছি-নীচে গিয়ে শিবের সেবা কর তবেই তোমার কল্যাণ হবে। এখানে কেন পড়ে আছো?"

সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে বগ্গড় নীচে পৌঁছেছিলেন। রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছিল, মহারাজজী সাধকদের বলেছিলেন-"খুব উদ্বিগ্ন হয়ে কেউ আসছে। সেইকালে রাত্রি ন'টার সময় কোন ব্যক্তির অনুসুইয়া পৌঁছানোটা আশ্চর্যের থেকে কম ছিল না। ঘন জঙ্গলে অপরাহ্ণ তিনটের পরই যাওয়ার সাহস হত না। তখন তো রাত ন'টা বাজছিল। সকলেই ভেবেছিল মহারাজজী এমনিই বলছেন। এই সময় কেউ কেন আসবে? এদিকে মহারাজজী কোন ব্যক্তির আসার নিরন্তর সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। ততক্ষণে বগ্গড় শিব মন্দিরের চত্বরে ধপাস করে পড়েছিল। সে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল-"দৈত্য, দৈত্য।"

শিব মন্দিরের চত্বরটি আশ্রম সংলগ্ন ছিল। মহারাজজী বলেছিলেন-"দেখ এসে গেছে। একে সামলাও। কোথায় দৈত্য?" আদেশ পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে একজন সাধু ছুটে তাঁকে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন-"এটা আশ্রম এখানে কোন দৈত্য নেই।" কিন্তু সে সমানে দৈত্য-দৈত্য বলে যাচ্ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন-"মহারাজজী এ তো কিছুই শুনছে না, কেবল দৈত্য, দৈত্য বলছে। মহারাজজী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন-"এই দৈত্যকে লাঠির ঘা কতক দাও। যেমনি তিনি প্রহার করার কথা বলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার জড়তা দূর হয়েছিল। সে বলেছিল-"মহারাজজী! সিদ্ধবাবা আমাকে মেরেছেন। তিনি এখন এখানেই দাঁড়িয়েছিলেন, কি জানি কোথায় চলে গেলেন।"

মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"সিদ্ধবাবা কেন মারলেন? তিনি কি কিছু বলেছেন?" সে বলেছিল-"হ্যাঁ মহারাজজী! সিদ্ধবাবা বলেছেন যে, নীচে গিয়ে শিবের সেবা কর। তাতেই তোমার কল্যাণ হবে।" মহারাজজী বলেছিলেন-"আমিই শিব! নে এই কড়াই মেজে নিয়ে আয়। সেবা কর।"

বগ্গড় বাবা যোগ্য সেবক ছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা তাঁর স্বভাব ছিল। ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁর অনুভব জাগ্রত হয়েছিল। দু' তিন বছর পর্যন্ত তিনি আশ্রমের সেবা করে বিচরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পরিব্রাজনের পর তার অন্তিম নিবাস স্থান বেধকের ঘন অরণ্যে সিংহদের গুহার সমীপে ছিল।

সিকটিয়া পুরবার ভক্ত

প্রায় এক বছর গৃহ নিবাসের অবধিতে ভগবানানন্দজী সমবয়স্ক কয়েকজন সঙ্গীদের মধ্যে উত্তমরূপে ভজনের বীজারোপণ করে দিয়েছিলেন। গ্রামের সমবয়স্কদের মাঝে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তার গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এত ভালভাবে গল্প বলতেন যে, মনোরঞ্জনের অন্যান্য সাধনের উপেক্ষা করে সকলেই তাঁর কাছে গল্প শুনতে যেত। তাঁর বলার ধরন এত ভাল ছিল যে, আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা তাঁর কাছে গল্প শুনতে-শুনতে বিভোর হয়ে যেত। যখন তিনি পুনরায় অনুসুইয়া গিয়েছিলেন তখন তাঁর ভজনাকারী বন্ধুরাও তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে অনুসুইয়া গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা করেছিল, যাতে তিনি তাদের সেখানে থাকতে দেন। তারাও ভজন করতে চায় সেই দৃঢ় নিশ্চয়ের কথা মহারাজজীকে জানিয়েছিল। ভগবানানন্দজীর ভজনাকারী বন্ধুরাই পরে শ্রী শরণার্থী স্বামী মহাদেবানন্দ, বংশী স্বামী ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা মহারাজজীর শরণাগত হয়েছিলেন একাগ্র মনে সাধনাতে রত হয়ে ভগবৎ পথের পথিক হয়েছিলেন। পরে আরও কয়েকজন ব্যক্তি আশ্রমে পৌঁছেছিলেন।

মহারাজজী তিন মাস পর্যন্ত তাদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা ফিরে যাবার নাম পর্যন্ত নিচ্ছিল না। জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসত, চোখ বুজে সাধন ভজনও করত কিন্তু মহারাজজী বলেছিলেন যে, সাধু হওয়ার সংস্কার তাদের কারও মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে একজনকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এই নামের সংস্কার তো আছে কিন্তু এই লোকটি সে নয়। তাকেও সদ্‌গৃহস্থাশ্রমে থেকে ভজন করবার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, শরীরটা যেখানেই থাক, মন থেকে আসা-যাওয়া করবে। তাকেও ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার প্রবেশ

মহারাজজী উপর্যুক্ত নামধারী ব্যক্তির অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় দু'বছর পর আমি যখন অনুসুইয়া পৌঁছেছিলাম তখন মহারাজজী অনুভব দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, শ্যামবর্ণের একটি ছেলে নদীর তীরে বসে জোরে জোরে কাঁদছে। সে নদী পার করতে চায় কিন্তু কিভাবে করবে বুঝতে পারছে না। নদীতে ভয়ঙ্কর বেগ। ঠিক তখনই মহারাজজী তার কাছে গিয়েছিলেন। ছেলেটিকে ধৈর্য প্রদান করে বলেছিলেন-"কাঁদছ কেন? পারে যাবে? দেখ এই ভাবে সাঁতার কাট, আমি দেখছি তোমাকে।" ছেলেটি

তাঁর কথা অনুসারে সাঁতার কাটতে শুরু করেছিল। যখন সে ভালভাবে কিছুটা এগিয়েছিল মহারাজজী তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ এইভাবেই সাঁতার কাট। ভয় পেয়ো না, আমি দেখছি। সাঁতার কেটে ওপারে চলে যাও।

এই অনুভবের সম্বন্ধে মহারাজজী বিচার করেছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে ছেলেটি যোগ্য, ভবসাগরের পারে যেতে চায়, কিন্তু সাধনা ক্রম সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু বলার সঙ্গে-সঙ্গে সে সাধনাতে প্রবৃত্ত হয়েছে। অতএব মহারাজজী অপেক্ষা করছিলেন যে, আজ এক সাধক আসবে, যাকে সাধনা-পদ্ধতি বলে দিতে হবে।

সেইদিন আমি চিত্রকূটের এক পাণ্ডার ভৃতের সঙ্গে অনুসুইয়া গিয়েছিলাম। ভৃত্যটি আগে অনুসুইয়া মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। মন্দির দেখিয়ে সে বলেছিল, ‘‘এটাই মহাসতী অনুসুইয়ার মন্দির। মন্দিরে একটা কালো স্ত্রীমূর্তির দর্শন করেছিলাম। মূর্তিটি সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল। মন্দিরের দরজা জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে পূজারী ছিল না। মূর্তিটিকে প্রণাম করে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। ভৃত্যটি বলেছিল, এখানে একজন মহাত্মা পরমহংস বাবাজী থাকেন। ইচ্ছে থাকলে দর্শন করে আসুন।’’

ছোটবেলা থেকেই আমার মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। অতএব আমি গিয়ে সেই তপোধনের দর্শন করেছিলাম। ঋষিকেশ, হরিদ্বার, পাঞ্জাব এবং চিত্রকূটে যত মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মহারাজজীকে সবথেকে বেশী ভাল লেগেছিল। ঘোর জঙ্গলে তাঁর নিবাসস্থান, তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, ভাষা, প্রসন্ন মুদ্রা সবকিছু খুব ভাল লেগেছিল তাঁর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়েছিল। মনে-মনে চিন্তা করেছিলাম, এঁর কাছে ভজনের বিধি শিখে সাধনাপথে অগ্রসর হব, কারণ ভজনাই তো আমি করব। কিন্তু ভজনে যে গুরুর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হতে হয়, এটা আমি জানতামও না।

আমি তাঁকে বলেছিলাম, ‘‘মহারাজজী আগামী কাল আমি আবার আপনাকে দর্শন করতে আসব। আজকে ভৃত্যটি সঙ্গে রয়েছে, কাল একা আসব।’’ পরের দিন আমি একা অনুসুইয়া গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। সাদরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এক পাশে বসেছিলাম। মহারাজজী বসার সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘কি! সাধু হবে?’’ আমি সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম, মনে-মনে চিন্তা করেছিলাম যে, যদি বলি ‘হ্যাঁ হতে চাই’ তাহলে কোন কুরীতিতে জড়িয়ে না দেন, সাধু তো হতে চাইছিলাম, কিন্তু শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও মনে দ্বন্দ্ব ছিল যে, মহাপুরুষের মধ্যে যে-যে গুণ থাকা

উচিত এঁর মধ্যে সেগুলি আছেও কি? মিথ্যা বললে পাপ হবে, সত্যি বললে কুরীতিতে না জড়িয়ে যায় এই ভয় ছিল। সেইজন্য আমতা আমতা করে গোলমাল জবাবই দিয়েছিলাম, 'মহারাজজী! বলা তো যায় না যে, আমি সাধুই হব।'এই প্রকার বলে আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। তারপর এই ভেবে ধীরে-ধীরে সেখান থেকে সরে পড়েছিলাম যে, আবার কিছু জিজ্ঞাসা না করে বসেন।

মহারাজজী অন্য সাধকদের বলেছিলেন, "দেখছ ছেলেটা এখনও কত কৌশল করছে। আমি স্পষ্ট দেখছি, একে এখানেই থাকতে হবে। হো, একথা আমাকে ভগবান বলেছেন।" সেই সময় আমি স্থানীয় হিন্দী শব্দগুলির মানে কি, তা জানতাম না। এটা তো পরে জেনেছিলাম যে, সেদিন মহারাজজী আমাকে লক্ষ্য করেই এই কথাগুলি বলেছিলেন। শুরুতে আমি তাঁর ভাষা বুঝতে পারতাম না। কিছুটা বুঝে নিতাম, তা আন্দাজ করে। এদিকে তিনিও আমার ভাষা বুঝতে পারতেন না। মহারাজজী ব্রহ্মচারীমশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, গ্রামের লোকেরা পায়েস খাওয়াবার জন্য তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ফিরে আসার পর মহারাজজী তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "একে বোঝা, এ আমার ভাষা বুঝতে পারছে না।"

শ্রী ব্রহ্মচারীজীর সম্বন্ধে মহারাজজী বলেছিলেন যে, তিনি খুব উচ্চ স্তরের সাধক, সেইজন্য তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি। ব্রহ্মচারীজীর প্রশংসা শুনে আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে ভাল সাধুর কল্পনা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু যখন তাঁকে দামী রোমশ তোয়ালে কাঁধে ফেলে আসতে দেখেছিলাম, তখন সেটা কল্পনা অনুযায়ী না হওয়ার জন্য মনে একটু আঘাত লেগেছিল। তা সত্ত্বেও হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করেছিলাম।

মহারাজজীর নির্দেশ এবং ব্রহ্মচারীজীর স্নেহ সাহচর্যে আমি অনুসুইয়া আশ্রমে থাকতে শুরু করেছিলাম। দু'আড়াই মাস পরে আমার সর্বাঙ্গে স্পন্দন-স্ফূরণ শুরু হয়েছিল। ভেবেছিলাম কোন রোগ হয়েছে হয়ত। আমি চিন্তিত হয়ে অঙ্গ-স্পন্দনের চর্চা মহারাজজীর কাছে করেছিলাম, তিনি শুনে হাসতে শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, "বাছা! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের লড়াই এবার শুরু হয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। রাবণের মৃত্যু হবে, রামের রাজ্যাভিষেক হবে, তবেই যুদ্ধ বন্ধ হবে, মাঝে বন্ধ করা যাবে না।" শুরুতে আমি এই স্ফূরণ এবং অনুভবের মানে একটুও বুঝতে পারতাম না, কিন্তু মহারাজজী ক্রমশঃ বিভিন্ন স্ফূরণের অর্থ কি,

বলেছিলেন, যা নির্দেশন রূপে ছিল, এই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তারপর থেকেই শ্রদ্ধা স্থির হয়েছিল এবং এই বিজ্ঞান একটু-একটু করে বুঝতে পারছিলাম।

মহারাজজী আমাকে বলেছিলেন যে, শাস্ত্রে যাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে, তারা তত্ত্বদর্শীর রূপ। **'কর পুস্তক দুই বিপ্র প্রবীনা'** *(মানস, ১।৩০২।৮)* পার্বতী স্বপ্নে দু'জন বিপ্রকে দেখেছিলেন, তাঁরা তাঁকে ভজনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বপ্নে যে সঙ্কেত পেয়েছিলেন, সেই অনুসারে তপস্যা করে শিবকে পেয়েছিলেন। এইরূপ স্বপ্নে বিপ্রের উপদেশ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এইরূপ কোন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে যদি আদেশ দেন, তবে সেটাও ভগবানেরই নির্দেশ জানবে।

কিছুদিন পরে স্বপ্নে আমি পূর্বাশ্রমের সুপরিচিত, অত্যন্ত কুলীন, স্বাধ্যায়ী পণ্ডিতমশাইকে কৌপীন ও উত্তরীয় পরিহিত অবস্থাতে দেখেছিলাম। আমি ভগবানের খোঁজ করতে-করতে তাঁর কাছে পৌঁছেছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমার গুরু মহারাজজী কেমন বলুন?' তিনি বলেছিলেন, ''দেখ অনাদিকাল থেকে মহাপুরুষেরা যে-যে গুণ থাকলে মহাপুরুষ বলে অভিহিত হন, যে-যে লক্ষণ মহাপুরুষের মধ্যে থাকা উচিত, এঁর মধ্যে সেই সব লক্ষণ বিদ্যমান এবং ইনি আপনার গুরুদেব।''

এই কথা জেনে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। আমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভজনে বসেছিলাম, বসে-বসে সকাল হয়ে গিয়েছিল। চোখ খুলে দেখেছিলাম সূর্যের রশ্মি কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করছে। অবাক হয়েছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল। মহারাজজী ধুনীর পাশে বসেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম করার জন্য ধুনীর কাছে গিয়েছিলাম। ধূ-ধূ করে ধুনীতে আগুন জ্বলছিল। মহারাজজী প্রশান্ত মুদ্রাতে এমনভাবে বসেছিলেন, যেন কিছুই দেখছেন না। আমি আস্তে-আস্তে কাছে গিয়ে প্রণাম করেছিলাম। মহারাজজী জ্বলন্ত কাঠ তুলে সেটা দিয়ে আমার পিঠে প্রহার করেছিলেন। কয়েক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ পিঠেও পড়েছিল। আমি দু'তিন পা পিছিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিলাম। ততক্ষণে তিনি ধুনী থেকে চিমটা বার করে সজোরে আমার দিকে ছুঁড়েছিলেন, চিমটার দুটো কোণাই আমার বক্ষস্থলে এসে লেগেছিল। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''মহারাজজী! আমি কি ভুল করেছি?'' তিনি বকে বলেছিলেন, ''শরীরে ঘাম হচ্ছে, তবে ঘুম থেকে উঠেছ, এই পরাক্রম নিয়ে ভজনা করবে। সাধককে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা উচিত এবং

সচেতনাবস্থায় চিন্তন করা উচিত।” তাঁর কথা শুনে বলেছিলাম, “আমি তো বসেই ছিলাম।” “আচ্ছা তো তুই বসে-বসে ঘুমাচ্ছিলি।” পুনরায় অনেক সাধনযোগ্য কথা বলেছিলেন। ব্যস, সেইদিনই ভজনের চাবি দেওয়া হয়েছিল, সময় সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। কায়মনোবাক্যে মহারাজজীর প্রতি শ্রদ্ধা স্থির হয়েছিল। বস্তুতঃ মহাপুরুষদের কঠোরতার পিছনে করুণা লুকিয়ে থাকে, যা সাধক-ভক্তদের জন্য কল্যাণের স্রোত হয়ে যায়।

আশ্রমের নিত্যক্রিয়া

মহারাজজীর নিবাসস্থান ধীরে-ধীরে আশ্রমের রূপ নিচ্ছিল, তাঁর কাছে সংগ্রহ নামমাত্রের ছিল। আশ্রমের পিছনে যে কুঠুরী ছিল, সেই কুঠুরীতে একটা টিনের মধ্যে আটা, একটা হাঁড়িতে ঘী, অন্য একটা হাঁড়িতে চাল-ডাল রাখা থাকত। তিন চতুর্থাংশ ছোলার আটা ও এক চতুর্থাংশ গমের আটার মিশ্রণে রুটি তৈরী করা হত। কোন-কোন দিন আটার মধ্যে নুন, লঙ্কা ও হিঙ মিশিয়ে রুটি তৈরি হত। ভাণ্ডারের পাশেই একটা গোল কুঁড়েঘর ছিল, তাতেই খাবার প্রস্তুত করা হত। আহার প্রস্তুত হলে মহারাজজী দুটো রুটি আলাদা করে রেখে দিতেন, কখনও যদি কেউ এসে পড়ে। একবেলা আহার প্রস্তুত করা হত। যতটা ক্ষিদে তার থেকে একটা-দুটো রুটি কম খেতে বলতেন। অতি ভোজনে বেশি ঘুম পায় আলস্য বোধ হয়। আলস্য, ঘুম ভজনার পথে বাধা স্বরূপ। যদি কেউ বেশী খাবার চেষ্টা করত, তখন তাকে দু'একবার বোঝাতেন, কিন্তু তা'ও যদি বুঝতে না চাইত, তখন ধমক দিয়ে বলতেন, “কেন রে, বাপের রোজগার পেয়েছিস? বাবার আটা, বাবার ঘী, সাবাশ-সাবাশ বাবাজী! অন্নের অপব্যবহার করছিস কেন, রাখা থাকলে কোন সাধু-মহাত্মার সেবা হবে-এটা কুটীচক ধর্ম। যারা কুটীরে বাস করে তাদের কিছু-কিছু খাবার তুলে রেখে দিতে হয়। যেদিন খাবার অবশিষ্ট থাকত, সেদিন সন্ধ্যাবেলা টুকরো-টুকরো করে সাধকদের মধ্যে বিতরিত করা হত। যার ইচ্ছা হত, সে নিত, যার হত না সে নিত না। সন্ধ্যাবেলা কিছুক্ষণ ধর্মালোচনা হত, তারপর সকলে যে যার চিন্তনে প্রবৃত্ত হতেন।

রাত্রি দশটার পূর্বে শয়ন করা বারণ ছিল। শয়নের পূর্বে এক দেড় ঘণ্টা আসনে বসে গুরু মহারাজজীর ধ্যান অথবা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করার নিয়ম ছিল এবং জপ যখন অনবরত হতে শুরু হত তখনই ঘুমাতাম। একবার ঘুম ভাঙ্গলে আবার শোয়ার নিয়ম ছিল না। সেইজন্য আবার ঘুমাবার চেষ্টা কেউ করত না।

ধীরে-ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবার পর একবার ঘুম ভাঙ্গার পর আবার ঘুমাবার দরকার বোধ হত না। কখনও যদি কোনও সাধকের উঠতে দেরী হত, সেই সময় মহারাজজী গুনগুন করে ভজন গাইতেন-

মোরি সুরত সুহাগন জাগ রী।
কা সোওত হ্যায় মোহ নিশা মে, উঠকর, ভজনিয়াঁ মে লাগ রী।।

প্রেরণাদায়ক কয়েকটা ভজনের মধ্যে একটা গুণগুণ করে গাইতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আশ্রম ঝাঁট দেওয়া, মোছা হয়ে যেত। মহারাজজী এই কাজে সকলকে সম্মিলিত করতেন, যাতে আলস্য দূর হয়। প্রত্যেক সাধক এক হাতে লালটেন নিয়ে, আর একটা হাতে ঝাড়ু দিতেন। কে কতটা কাজ করবে, মহারাজজী ঠিক করে রেখেছিলেন। যদি কোন সাধক অন্যের কাজে সাহায্য করতে যেতেন, মহারাজজী তাকে বারণ করতেন। আশ্রম পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে সকলেই চিন্তনে রত হতেন। সকালবেলা স্নান করার নিয়ম ছিল না। কারণ তাতেও সময় নষ্ট হত। নিত্যকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে সকাল ন'টা-দশটা পর্যন্ত অনবরত চিন্তনে নিযুক্ত থাকতাম।

গুরুমহারাজের ছড়ি এবং স্পর্শ

একবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ''মহারাজজী! আপনি ছড়ি দিয়ে প্রহার করেন কেন, শ্রী মহারাজজী বলেছিলেন যে, ভগবান যখন নিবৃত্তি দেন তখন তার সঙ্গে কিছু 'শস্ত্র'ও দিয়ে দেন। যখন আমাকে নিবৃত্তি প্রদান করেছিলেন তখন ভগবান আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, ডান হাতে যদি ছড়ি দিয়ে কাউকে প্রহার কর তবে তার মৃত্যু দণ্ডও মাফ হবে। আগামীকাল মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে সেই অবস্থাতে যদি আজ ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করে দাও, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, অন্য যে কোন শাস্তি হতে পারে। বাম হাতে যদি কারও মস্তক স্পর্শ করি তবে তার দুর্গতির শেষ থাকবে না, বামহাতের স্পর্শ শাপরূপে দেখা দেবে।

এক সময়ের ঘটনা মনে পড়লে আমার খুব ভয় হয়। একজন আর্য সমাজের লোক গুরু মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও দু'একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নিজেকে একমাত্র উদ্ভট বিদ্বান বলে ভাবতেন কিন্তু মহারাজজী তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সৎসঙ্গ শুরু হয়েছিল ক্রমে যা বাদ-বিবাদে পরিণত হয়েছিল। আর্য সমাজের সেই ভদ্রলোকের হঠকারিতা এবং দুরাগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি কাছে আসতে বলেছিলেন। ভদ্রলোক কাছে

গিয়েছিলেন। তখন তিনি '**মোরেহু কহেঁ ন সংসয় জাহীঁ। বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ।।**' *(মানস, ১/৫১/৬)*-এইরূপ বলে সেই ভদ্রলোকের মাথাতে বাম হাতে স্পর্শ করে বলেছিলেন, "হুঁ... এরপর যা বলবার বল।" তারপর কি যে হয়েছিল সেই ভদ্রলোক জড়ের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দু'এক ঘণ্টা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিকে সেদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেছিলেন, শয়নকালে শয়নকক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

প্রাতঃকালে তাঁরা অতিশীঘ্র নিত্য ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে পূজ্য মহারাজজীর কাছে গিয়ে বসেছিলেন। আর্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিটি বলেছিলেন, "প্রভু আপনি যোগী পুরুষ, প্রত্যক্ষদর্শী। যথার্থ সম্বন্ধে তিনিই জানেন যিনি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। আমরা বই পড়ে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি ব্যস ওই পর্যন্তই। বুদ্ধি বিলাস আর কি। যা মন এবং বুদ্ধির অতীত, তা আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে জানব কি করে? আপনার বাণী সত্য এ সত্য স্বীকার করছি, এখন দয়া করে আমাদের সাধনা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলুন? গতকাল মহারাজজী! জানি না আমার কি যে হয়েছিল, স্পর্শ দ্বারাও কিছু হতে পারে এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু কাল আপনার হাতের স্পর্শ পেয়েই স্মৃতিলোপ পেয়েছিল। বুদ্ধিশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আপনার কাছে পুনরায় সুস্থ বোধ করছি। এখন শুধু আপনার কৃপা লাভের কামনা করছি। মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন।

একবার কোন কারণ ছাড়াই মহারাজজী ডান হাতে আমাকেও দু'ছড়ি দিয়েছিলেন। প্রথমে তো আমি চমকে উঠেছিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় চিন্তাও এসেছিল যে, কোথাও কোন ভুলও করিনি। মহারাজজী কিছু-কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন কিন্তু সে সবে বিশ্বাস হচ্ছিল না। শুনেই বিশ্বাস হবে, এমনও তো হয় না। দু'ছড়ি মার খাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অসহ্য বেদনা হচ্ছিল। দু'দিন এভাবেই কেটেছিল। তৃতীয়দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে অনুভব প্রসারিত হয়েছিল। চারজন পরিচিত লোক এসে সাদরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অচেনা পথে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অক্ষুন্ন অস্ত্রাগারের কপাট আপনা হতেই খুলে গিয়েছিল। ভিতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে কপাট বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। সেই অস্ত্রগুলি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। হঠাৎ চারজনই এক একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে পরস্পরকে সঙ্কেত করেছিল যে, দেখছ কি, একে মেরে ফেল। সকলে ধরেছিল, আমি কাঁপতে

শুরু করেছিলাম, মৃত্যু আসন্ন মনে হচ্ছিল। কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলাম, ''একবার ছেড়ে দাও... ব্যস, এইবারের মত ছেড়ে দাও।''

কিন্তু তাদের উপর আমার প্রার্থনার কোন প্রভাব পড়েনি। মনে শুধু একটাই সঙ্কল্প জেগেছিল যে, এদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে আমি শুধু আরাধনা করব, তবেই এদের আতঙ্ক সম্পূর্ণভাবে কাটবে। কিন্তু তারা তো প্রাণ নেওয়ার জন্য উদ্যত ছিল। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। হঠাৎ তারা পিছু হটতে শুরু করেছিল। গুরুদেবের ছড়ির কথা আমার মনে পড়েছিল, তাদের বলেছিলাম, ''ব্যর্থই আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। আমি গুরুদেবের ছড়ির স্পর্শ পেয়েছি, অতএব তোমরা আমার অনিষ্ট করতে পারবে না।'' এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ পাল্টে গিয়েছিল। অস্ত্রাগার বিলীন হয়েছিল, ভজনাতে প্রবৃত্ত হওয়ার ভাব নিয়ে আমি সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি সুস্থ বোধ করতে থাকি এবং দ্রুত সেরে উঠি। এইপ্রকার পূজ্য গুরুদেবের ছড়ির প্রতাপ দেখার সৌভাগ্য অনেকবার হয়েছে, মৃতব্যক্তির মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। আবার সুস্থ ব্যক্তিও গুরুদেবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শিত না করার ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করেছে।

কামরূপ কামাখ্যার পাণ্ডা

একবার চিত্রকূট একজন সিদ্ধ পুরুষের চর্চাতে সরগরম হয়ে ওঠে। অন্য জায়গা থেকে একজন সেখানে এসে হাজার-হাজার লোককে প্রভাবিত করে ফেলেছিল। মনের ভাব বলা, অন্য কোন স্থান থেকে বস্তু নিয়ে আসা, দুষ্প্রাপ্য বস্তু বিতরণ করা ইত্যাদি ভেলকি দেখিয়ে চিত্রকূটের অনেক সাধুকেও সে প্রভাবিত করেছিল। তার কয়েকটা ভেলকির মধ্যে একটা ছিল কাজল লাগানো। একটা ছোটো কৌটো থেকে কাজল নিয়ে সে কোন ব্যক্তির নখে সেটা লাগিয়ে দিত এবং ছোট ছেলেকে দিয়ে বলিয়ে নিত যে, এর উপর হনুমানজী ভর করেছেন। তারপর সেই লোকটিকে বলতে বলতেন যে, চিত্রকূটের মধ্যে অথবা এখান থেকে যে সাধু অন্য স্থানে গিয়েছেন, তিনি এখন কোথায়? তার ভেলকি দেখে লোকেরা মহারাজজীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব রেখেছিল যে, এর সিদ্ধাই-এর পরীক্ষা করা হোক।

বহু লোকের সঙ্গে সেই সিদ্ধ পুরুষ অনুসুইয়া আশ্রম পৌঁছেছিলেন। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা মহারাজজীকে তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জানিয়েছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন-''খুব ভাল কথা। জঙ্গলে কিছু দেখার সৌভাগ্য হবে। আমাকেও কিছু

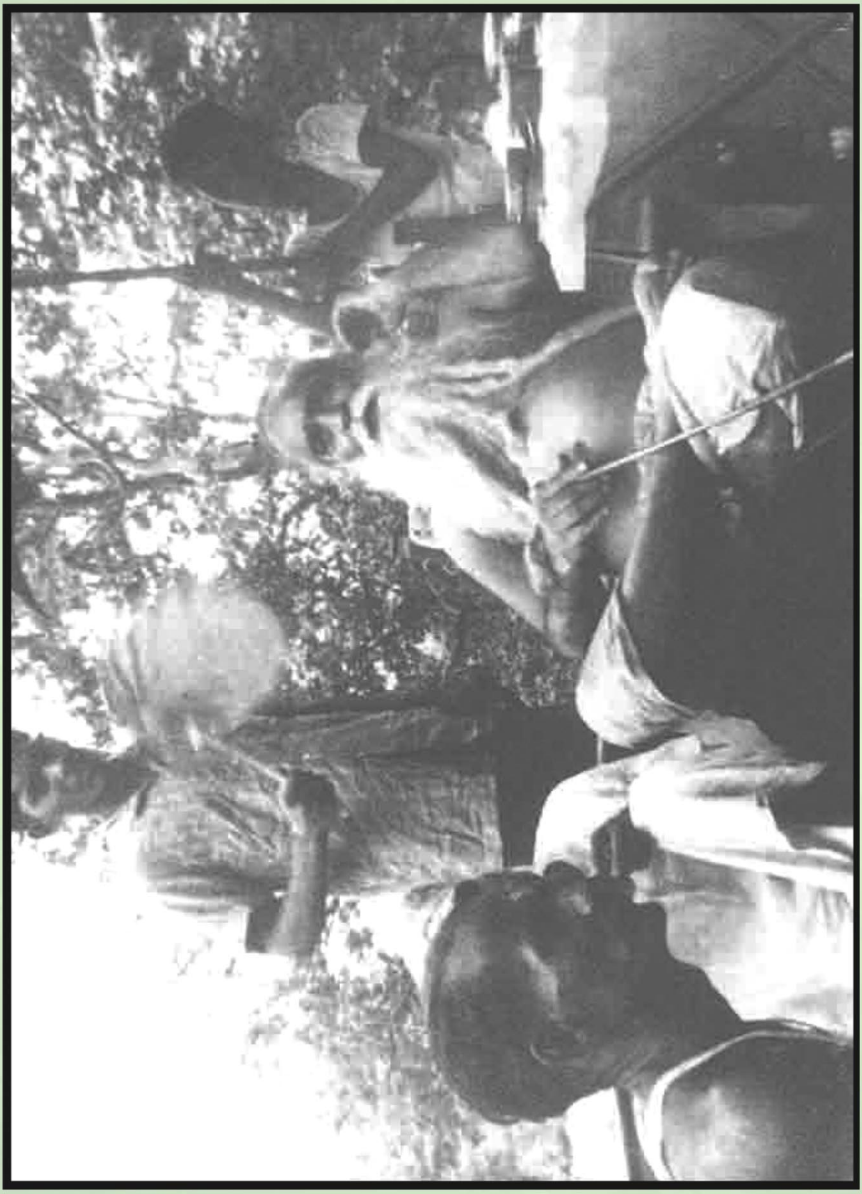

পরমপূজ্য স্বামী শ্রী পরমানন্দ পরমহংসজী মহারাজের ছড়ি

কৌশলের কার্য দেখান।" কিন্তু মহারাজের সমক্ষে তিনি কোন কৌশল দেখাতে সমর্থ হলেন না। তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন। ভীড় এড়াতে তিনি বলেছিলেন-"এখন আমি সরভঙ্গ আশ্রম যাব। অন্য কোনদিন মহারাজজীর কাছে আসব।"

কয়েক দিন পর তাঁর চিঠি আশ্রমে পৌঁছেছিল। আরও কয়েকদিন পরে তিনি একা আশ্রমে এসেছিলেন, বিনীত কণ্ঠে মহারাজজীকে নিবেদন করেছিলেন-"মহারাজজী আমি সাধু নই। আমি কামরূপের (আসাম) পাণ্ডা। লোককে কিছু-কিছু কৌশলের কাজ দেখিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করতাম কিন্তু যখন আপনার সমক্ষে সেই কৌশল প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি, তারপর থেকেই অসমর্থ হচ্ছি। আবাহন করলেও কোন মন্ত্রে কোন কাজ হচ্ছে না। খুব কষ্টে আছি। পূজারীর কর্মও বড় ভাইদের অধিকারে। কৃপা করুন যাতে সিদ্ধাইগুলি ফিরে পাই।"

তাঁর প্রার্থনাতে দয়ার্দ্র হয়ে মহারাজজী বলেছিলেন-"ঠিক আছে, কিন্তু গৃহস্থ হয়ে সাধুদের প্রণাম কেন গ্রহণ করেন?" তিনি বলেছিলেন-"না মহারাজজী! আমি সব সাধুদের মনে-মনে প্রণাম করে নিই।" মহারাজজী বলেছিলেন-'আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু সাধুবেশে অথবা কোন মহাপুরুষের সম্মুখে সেগুলির প্রদর্শন করবে না। এখান থেকে দু'এক মাইল চলে যাওয়ার পর সিদ্ধাইয়ের আবাহন করবে, সেগুলি ফিরে পাবে।' মহারাজজীকে প্রণাম করে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে, আশ্রমে নিয়ম করে চিঠি দিতেন কিন্তু ভয়ের চোটে তিনি আর মহারাজের কাছে আসেননি। মহারাজজী বলতেন এই প্রকারের সিদ্ধাইকে 'আসুরী মায়া' বলা অধিক সঙ্গত হবে। কিন্তু মহাপুরুষের উপর সিদ্ধাইয়ের কোন প্রভাব পড়ে না। যোগলব্ধ সিদ্ধাইও লক্ষ্য-প্রাপ্তির পথে ব্যবধান সৃষ্টি করে, সাধককে সেদিকে মন দেওয়া উচিৎ নয়। মহাপুরুষ চমৎকার প্রদর্শন করেন না। এঁদের কাছে শুধু সিদ্ধি থাকে এবং তা হল 'সঙ্কল্প সিদ্ধি।' তাঁরা যে কামনাই করেন, তা ভগবান পূর্ণ করেন। **জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।** ***(মানস, ৭/১১৩/৪)*** সেই ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। সেইজন্য মহাপুরুষ সেটাকে নিজের উপলব্ধি বলে মনে করেন না। যখন ভক্তরা মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, পাণ্ডার সিদ্ধাইয়ের প্রভাব কি করে শেষ হয়ে গিয়েছিল? তখন মহারাজজী বলেছিলেন যে, কৈবল্যপদ প্রাপ্ত মহাপুরুষের সমক্ষে তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র, যক্ষিণী যাদু, ভূত-প্রেত ইত্যাদি সমস্তই প্রভাবহীন হয়ে যায়। স্বরূপস্থ মহাপুরুষের কথা ছেড়েই দাও, যিনি শুধু একমাত্র

হরির স্মরণ করেন, তাঁর সমক্ষেও এগুলি প্রভাবহীন হয়ে যায়।

শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ

যখন পূজ্য মহারাজজী অনুসুইয়াতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিলেন, তখন ঘন জঙ্গল এবং যাওয়া-আসার সুবিধা না থাকার জন্য সকাল দশটার আগে দর্শনার্থীদের পক্ষে অনুসুইয়া পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠত না। অতএব মহারাজজীর সেবাতে নিযুক্ত পাঁচ-সাতজন সাধক ততক্ষণ পর্যন্ত নির্জনে নির্বিঘ্নে সাধন ভজনে লীন হয়ে থাকতেন। কিন্তু এক বনচারিনী স্ত্রীলোক ঠিক সূর্যোদয়ের সময় আশ্রমের সম্মুখ দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে শুরু করেছিল। মহারাজজী সাধকদের চিত্তের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে তাদের বলেছিলেন যে, সেই মা'কে এই পথ দিয়ে ন'টা-দশটার আগে যেতে বারণ করে দিও। তাও যদি যেতে চায়, পাশে যে পথটা রয়েছে, সেই পথ দিয়ে চুপচাপ যেন চলে যায়।

সাধকেরা তাকে বারণ করেছিল। কিন্তু তার উপর কোন প্রভাব পড়েনি। সেই স্ত্রীলোকটি সাধকদেরই উলটে বলেছিল যে, 'এ কি বাবাজী গলি ছীদ দেত হ্যায়?' অর্থাৎ রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন? সাধকেরা বুঝিয়ে বলেছিল যে, দেখ মহারাজজী রাগ করেন, উনি বারণ করেছেন; কিন্তু তার যাওয়া-আসা পূর্ববৎ ছিল। মহারাজজী সেই মহিলাকে পুনরায় আসতে যেতে দেখে সাধকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''কি? তাকে বারণ করনি? ঐ দেখ আসছে। তার পায়ের আংটার 'ঝন্ন-খট' শব্দ হচ্ছে। (ঐ অঞ্চলের কোল-ভীল মহিলারা একটা পায়ে গিলটের কড়া পরে। কড়ার ভিতর পাথর থাকার ফলে খনখন শব্দ হয়।)

সাধকেরা বলেছিল, ''মহারাজ! আমরা কালকেও বলেছিলাম, পরশুও বলেছিলাম কিন্তু সে শুনতেই চাইছে না, বলেছে যে, আপনারা কি যাওয়া আসার পথটাও বন্ধ করে দেবেন?'' মহারাজজী বলেছিলেন, বারণ করলে, কি করে শুনবে না? তোমরা বারণই করতে পারো না। তোমরা সকলেই বাদামের খোসার মত উপরটা, ভিতরটা অন্তঃসার শূন্য। সে শুনবে না কেন?

প্রতিদিন তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন কিন্তু পরের দিন, তার আসার আগে পর্যন্ত গাঁজা সেবন করে গোঁফে তা দিয়ে বসেছিলেন, এরই মধ্যে 'ঝন্নখট' শব্দ কানে গিয়েছিল তিনি বলেছিলেন-হুঁ... আসছেন। ঝন্ন খট, ঝন্ন খট। হস্তিনী হয়েছেন।

না মুখ দেখার মত, না আলাপ করার মত। আনো দেখি কাস্তেটা! এর পা দুটো কেটে ফেলি। বোঝালেও বুঝতে চাইছে না। জঙ্গলের মধ্যেও বিঘ্ন।

মহারাজজীর কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুটে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী বলেছিলেন-"দেখছি, এবার কি করে আসছে? সাধন ভজন পুনরায় নির্বিঘ্নে শান্তিতে চলতে থাকে। ঐ পথ দিয়ে সেই মহিলাটির আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ছ'মাস পর মহিলাটি অন্য কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আশ্রমে এসে মহারাজজীকে প্রণাম করেছিল। তাকে দেখে মহারাজজী চিনতে পেরেছিলেন, হেসে বলেছিলেন, "মা, তুমি নিশ্চয় আমাকে নিরন্তর ছ'মাস পর্যন্ত গালাগাল দিয়েছ। আমি গালি দিয়েছিলাম। তুমিও দিয়েছিলে। ভালই হল বিনিময় হয়ে গেল।" তাঁর কথা শুনে সেই মহিলাটি বিনীত স্বরে ক্ষমা যাচনা করেছিল যে,"মহারাজ! আমরা অজ্ঞানী। আমাদের জানা ছিল না যে, শব্দ করলে অথবা আসা-যাওয়া করলে ভজনাতে বিঘ্ন ঘটে। আমাকে ক্ষমা করে দিন।" এইপ্রকার পূজ্য মহারাজজী যাকে তিরস্কারও করেছেন, পরবর্তীকালে তার পরমার্থের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়েছিল। পূজ্য মহারাজজী বলতেন, "বকা-ঝকা করলে অথবা ভর্ৎসনা করলে লোকের কুবিচার পরিবর্তিত হয়। সাধক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে দেখে তিরস্কার করতে হয় অন্যথা কটুবাক্য প্রয়োগ সাধুদের কি শোভা দেয়।" মহারাজজীর দৃষ্টিপাত, বার্তালাপ, দর্শন এবং স্পর্শের ফলে নাস্তিকদেরও পূর্ণ আস্তিক হতে দেখা গেছে, যাঁরা অদ্যাবধি পরমার্থে সংলগ্ন রয়েছেন।

ভবিতব্য-পরিবর্তন

কুড়ি বছরের একটি যুবক একদিন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেছিল। সে মহারাজজীকে নিবেদন করেছিল যে, "মহারাজজী! শরণে রেখে নিন।" মহারাজজী তাকে বলেছিলেন-"কি রে তোর মধ্যে তো একটাও সাধুর লক্ষণ দেখছি না, কেন এসেছিস, সত্যি বল।" সে তাড়াতাড়ি বলেছিল-"মহারাজজী! বৈরাগ্য উদয় হয়েছে। মহারাজজী ধমক দিয়ে বলেছিলেন-মিথ্যুক কোথাকার! সত্যি কথা বল, হুঁহ্ বৈরাগ্য উদয় হয়েছে, বল কেন পালিয়ে এসেছিস? সে বকুনি খেয়ে বলেছিল, "মহারাজজী! আমার কুষ্ঠিতে আয়ু মাত্র বাইশ বছরই লেখা রয়েছে। হাতে আয়ু রেখাও নেই। কুড়ি বছর বয়স হয়েই গেছে। এখন দু'বছরে ঘর সংসার আর কি করব? আর মাত্র দু'বছর বাঁচব, তাই ভগবানের ভজনা করব ভেবে আমি পালিয়ে এসেছি, এখনও

পর্যন্ত বিবাহ করিনি।”

মহারাজজী কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের বলেছিলেন-“দেখ তো! কি বলছে। দেখ হাতে রেখা আছে কি নেই। দেখি হাত দেখা!” সকলেই দেখেছিল। তার হাতে সত্যি আয়ু রেখা ছিল না। মৃত্যুর ভয় সবথেকে খারাপ। যুবকটি মাথা নীচু করে উদাসভাবে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মহারাজজী তাঁর ছড়িটি তুলে সজোরে তার হাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তক্ষুণি সে হাত টেনে সী-সী করতে-করতে দশ পা পিছিয়ে বসে পড়েছিল। মহারাজজী স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন-“এদিকে মরতে ভয় পাচ্ছে, আর পালিয়েও বেড়াচ্ছে। মনে হল খটপট, চল বাবার মঠ। আরে যখন মৃত্যু আসবে, তখন পালালেই কি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।” রাত্রিতে সকলেই শয়ন করেছিল। পরদিন সকালবেলা সেই যুবক মহারাজজীকে বলেছিল-“মহারাজজী! রেখা তো ফুটে উঠেছে।” মহারাজজী অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন-দেখ তো! এ কি বলছে? সকলে দেখেছিল সেই রেখা বাস্তবেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-“বল বৎস! এখন কি করবে?” সে বিনীতভাবে বলেছিল-“মহারাজজী! অনুমতি দিলে এখন ঘরে ফিরে যেতাম।” তার কথা শুনে সকলে হাসতে শুরু করেছিল।

আশীর্বাদের ফলে রোগ মুক্তি

মহারাজের আশীর্বাদে মৃত্যু পথ যাত্রীও জীবন ফিরে পেয়েছে। ঐ অঞ্চলে কারও মাথায় ছিট দেখা দিলে, লোকে তাকে নিয়ে মহারাজজীর কাছে পৌঁছে যেত। দড়ি এবং শিকলে বেঁধে তাকে মহারাজজীর কাছে নিয়ে যেত। আঞ্চলিক ভাষাতে বলত, “মহারাজজী! বৈকল হোইগা।” অর্থাৎ এই লোকটি পাগল হয়ে গেছে। মহারাজজী বলতেন আমার কাছে নিয়ে আসার পরও শিকলে জড়িয়ে রেখেছ। শিকল মুক্ত কর একে। ধুনীতে প্রণাম করতে বল। লোকে তাঁর আদেশ অনুসারে পাগলটিকে শিকলমুক্ত করত এবং ধুনীতে প্রণাম করতে বলত। সে যেমনই প্রণাম করার জন্য পিঠ নোয়াতো, মহারাজজী ছড়ি দিয়ে সজোরে প্রহার করতেন এবং তাকে মন্দাকিনী গঙ্গাতে স্নান করাতে বলতেন। তাকে স্নান করিয়ে আনা হত। সে এসে মহারাজজীকে প্রণাম করত বিভূতি খেয়ে, হাসতে-হাসতে ঘরে ফিরে যেত। পাগলটি দু'-চারদিন পর পূর্ব স্বরূপে ফিরে আসত। মহারাজজীর ছড়িতে মার

খেয়ে বহু বিক্ষিপ্ত আজও সুস্থ। তারা সুস্থ হওয়ার জন্য ঔষুধ অথবা অন্য কোন উপায় করেনি।

গোপীপুরের প্রধান মশাই

যখন ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দজী ধারকুণ্ডী গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন, সেইসময় ঘটেছিল এই ঘটনাটি। ধারকুণ্ডীর সমীপবর্তী গ্রাম গোপীপুরের প্রধানের টী. বী. রোগ হয়েছিল। তিনি আশ্রমে যাতায়াত করতেন। ব্রহ্মচারীজীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন রোগের কথা বলে। ধারকুণ্ডী মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘অনুসুইয়া যাও ! মহারাজজীর পা আঁকড়ে ধরবে, ছাড়বে না, তবেই তোমার টিবি রোগ ঠিক হবে।” সেই সময় টিবিকে অসাধ্য রাজরোগ বলা হত।

সেরে উঠবেন এই আশা নিয়ে প্রধান অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। সকালবেলাতেই মহারাজজী ভজনাতে বসে যেতেন। সাধকদের বলা ছিল যে, তোমরা কেউ না কেউ আমার পাশে থাকবে, যাতে ভজনাকালে কেউ এসে বিঘ্ন না সৃষ্টি করে। সেদিন শিবানন্দ অথবা স্বয়মানন্দের থাকার কথা ছিল। এই কঠিন কাজটি আমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। আমি সেইসময় কুঠরীর ভিতর বসেছিলাম। সকাল প্রায় ন'টা হবে। প্রধান অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, মহারাজজী বাইরেই ধ্যানে বসে আছেন, সেসময় দৈববশতঃ তাঁর ধারে কাছে কোন সাধক ছিল না। সুযোগ ভাল ছিল। প্রধান বাতাসার পরাত নীচে রেখেছিলেন এবং ‘‘আরত কাহ ন করে কুকরমূ” ছুটে গিয়ে মহারাজজীর চরণ দুখানি ধরে মাথাটি চরণে রেখেছিলেন। মহারাজজী প্রগাঢ় ধ্যানে ডুবেছিলেন। ধীরে-ধীরে তিনি পা ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। প্রধান পুনরায় পা ধরে বসেছিলেন। মহারাজ পা ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর ধ্যান হালকা হয়ে এসেছিল। প্রধান ফের তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করেছিল। এবার মহারাজ ‘আসা’ অর্থাৎ যে কাঠের দণ্ডটিতে হাত রেখে বসতেন সেটা তুলে দু'তিনবার প্রধানকে প্রহার করেছিলেন। প্রধানের পিঠে এত জোরে সেটা লেগেছিল যে, সে মহারাজের চরণ ছেড়ে ছুট দিয়েছিল। মহারাজজী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, রেগে বলেছিলেন-‘‘দাঁড়া তো দেখি, খল কোথাকার ! কোথায় গেলি ? কে ছিল ? জঙ্গলেও উপদ্রব, শান্তিতে ভজনাও, করতে দেবে না। সকলেই গেল কোথায় ? ভয়ে কোন সাধক মহারাজজীর কাছে যেতে চাইছিল না। কেউ ধুনীর আগুন ঠিক করছিল, আর যে কেউ ছিল সে অন্য কোন কাজ করতে শুরু করেছিল।”

আমিও ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। একজন বলেছিল যে, মহারাজজী রেগে গেছেন। একজন তাঁর চরণ দুখানি ধরে নিয়েছিল, উনি কাউকে পা স্পর্শ করতে দিতেন না। আমি ভেবেছিলাম যে, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। সেই সময় সম্মুখের ধুনা ঘরটি সবেমাত্র তৈরি হয়েছিল। বাঁশের টুকরো রাখা ছিল। আমাকে দেখেই মহারাজজী দু'তিন সিঁড়ি উপর থেকেই বাঁশের একটা টুকরো সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এমন জোরে সেটা লেগেছিল যে, মনে হয়েছিল যেন গোটা শরীর অবশ হয়ে গেছে। আমি সেখানেই সিঁড়িতে বসে পড়েছিলাম। মহারাজজী ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ''ওখান থেকে উঠবে না, না হলে আমার হাতে মার খাবে।'' স্বয়মানন্দজী এবং শিবানন্দজীকেও প্রহার করেছিলেন। এই সময় মঙ্গল এসে পড়েছিল। সে বলেছিল, ''সরকার কি হয়েছে?'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''দেখ শুধু আমার কাছে আসিস না! ওদিকেই থাক।'' কিন্তু সে সিঁড়ি চড়ে উপরে আসছিল। তাকেও মহারাজজী সজোরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন, সেও পালিয়েছিল। সেবক সহদেব সেমরিয়া গ্রামে থাকত। সে এককালে কুখ্যাত বদমাইশ লোক ছিল। তাকেও মহারাজজী পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন, সে তখন তিন-তিন, চার-চার সিঁড়ি টপকে পালিয়েছিল। তাকে এইভাবে পালাতে দেখে মহারাজজীর হাসি পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন-''দেখ-দেখ! বদমাইশ লোক কি ভাবে পালায়।'' মহারাজজীকে পাথর ছুঁড়তে দেখে মন্দাকিনী নদীর তীরে যত দর্শনার্থী ছিল, সকলেই যে যেদিকে পেরেছিল, পালিয়েছিল। চতুর্দিকে হল্লা হয়ে গিয়েছিল যে, ''পালাও রে বাবাজী পাগল হয়ে গেছেন।'' লোকেরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছিল। আশ্রম পরিসর একদম নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজজীর রাগ বেশীক্ষণ থাকত না, রাগও লোক দেখানো ছিল। দশ-পনেরো মিনিট পর তিনি নিজের আসনে গিয়ে বসেছিলেন। তিনি সাধকদের ডাকছিলেন, ''চলো রে, কোথায় লুকিয়ে আছো? চলো ধূনা ঠিক কর। জল কৈ? জল নিয়ে এস।'' সব কিছু আগের মত, যেন কিছুই হয়নি। সকলেই যে যার সেবাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। ধীরে-ধীরে সকলেই মহারাজজীর কাছে আসছিল। হেসে হেসে মহারাজজী বলেছিলেন, ''বলছে বাবাজী পাগল হয়ে গেছেন। নিজেদেরকে দেখবে না শুধু বাবাজীকেই দেখবে। যে আমার পা ধরেছিল, সে গেল কোথায়?'' ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে সেই প্রধান এসেছিলেন। প্রণাম করে বসেছিলেন, মহারাজজী

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কি ব্যাপার? কে তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়েছিল? কেন পা ধরেছিলে?" তিনি বলেছিলেন, "আজ্ঞে! ব্রহ্মচারীজী বলেছিলেন যে, মহারাজজীর পা ধরে নেবে তবেই তোমার যক্ষ্মারোগ দূর হবে।" মহারাজজী বলেছিলেন-এখন যাও, হয়ে গেছে! তিনি প্রণাম করে চলে গিয়েছিলেন। সুস্থ শরীরে আজও তিনি জীবিত।

গুরু পূর্ণিমার ঘটনা

একবার গুরুপূর্ণিমার দিন একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন ভাল ডাক্তারও ছিল, তারা পরীক্ষা করে বলেছিল যে, লোকটি মারা যাবে আর বাঁচবে না। মহারাজজী ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "হো, কি যে বলি, এ আমার গুরু পূর্ণিমা মাটি করে দেবে।" এর মৃত্যুই যদি হয় তবে অন্য জায়গাতেও হতে পারে, এখানে কেন এল? দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। ভক্তরা রাত এগারোটার সময় মহারাজজীকে এসে খবর দিয়েছিল। মহারাজজী গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সে তো মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী বলেছিলেন যে, এর তো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কেউ একে চন্দ্রোদয় রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লেহন করিয়ে দিত। আমার কাছে রাখা আছে। দেহটা গরম তো হত। ভক্তরা মধু মিশিয়ে চন্দ্রোদয় তার মুখে দিয়েছিল। কেউ একবারও চিন্তা করেনি যে, ঔষুধ দ্বিতীয় বারও দিতে হয়। পরদিন সকালবেলা লোকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। সে লুচি ইত্যাদি প্রসাদ গ্রহণ করে হেঁটে স্টেশন গিয়েছিল।

মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে জীবনদান

অনুসুইয়া অঞ্চলের মধ্যে যত গ্রাম ছিল, তার মধ্যে বেশীরভাগ গ্রামের লোকেরা শেষকৃত্য মন্দাকিনী নদীর তীরে স্থিত ভওরাদহে করত। গ্রীষ্মকাল ছিল, একজনের ভাই মারা গিয়েছিল। মৃতের আত্মীয়রা ভেবেছিল যে, রাত্রিতেই আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতে শব নিয়ে গেলে ভাল হয়। সেইজন্য তারা রাত দু'টোর সময়ই শব নিয়ে চলতে শুরু করেছিল। আশ্রমের সম্মুখ দিয়ে তারা মন্দাকিনী নদীর তীরে পৌঁছেছিল এবং সেখানে শব রেখেছিল। শব যাত্রীদের মধ্যে দু'জন মহারাজজীর দর্শন করার জন্য তাঁর কাছে পৌঁছেছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও মহারাজজী দাতুন দিয়ে সকাল-সকাল দাঁত মেজে

নিয়েছিলেন। আমি তাঁর হাতে জল ঢালছিলাম, এর মধ্যে সেই লোক দুটি এসে প্রণাম করেছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘এত সকাল-সকাল কোত্থেকে আসছ? কিভাবে এলে? তারা বলেছিল যে, দদরী গ্রামে বাড়ি আমাদের। ভাই মারা গেছে, তারই শেষকৃত্য করার জন্য এসেছি। পরিচিত দু'জন ব্যক্তি শবের কাছে রয়েছে। শব মন্দাকিনী নদীর ওপারে রয়েছে। মহারাজজী বলেছিলেন, লাশ নিয়ে এসে প্রথমে সেটা দাহ করা উচিৎ ছিল, সেটা ছেড়ে দর্শন করতে এলে কি করে?” তারা বলেছিল, ‘‘মহারাজজী! একটা খটকা লাগছে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসার সময় নাড়ী বন্ধ ছিল এবং শ্বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু নাভির চারপাশে এক টাকার সিক্কা বরাবর জায়গাতে একটু গরমভাব ছিল। আমরা ভেবেছিলাম, এই গরমভাবও কিছুক্ষণ পর শেষ যাবে, এখানে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। কিন্তু এখানে নদীর তীরে পৌঁছানোর পর ছুঁয়ে দেখলাম গরমভাব যেমনকার তেমনি রয়েছে। আমরা ভাবছি যে, এই গরমভাব চলে গেলে মুখাগ্নি দিতাম। আমরা এখন কি করব, আপনি যা আদেশ দেবেন, তাই হবে।”

মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘অ্যাঁ! কি বললে? নাভির চারপাশ এখনও গরম রয়েছে। লু লাগেনি তো। দেখো জ্যান্ত লোকটিকে পুড়িয়ে ফেলো না যেন। এখন বিভূতি নিয়ে গিয়ে তার দেহটাতে মাখিয়ে দিও এবং বাঁশ দিয়ে মুখটা খুলে মুখের মধ্যেও বিভূতি দিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, লেবুর সাতটা অথবা ন'টা পাতা ওই গাছ থেকে তুলে নাও এবং জল মিশিয়ে পাতাগুলিকে কোন পাথরের উপর রেখে বেটে, বাঁশের সাহায্যে তার মুখ খুলে মুখের ভিতরে সেটা দিয়ে দিও। তাড়াতাড়ি যাও। তারা আদেশ পালন করেছিল। দেহটা গরম হতে শুরু করেছিল। লেবুপাতা বাটাও খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধীরে-ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাকে সঙ্গে করে তারা ফিরে গিয়েছিল। এই ঘটনাটির ছ'দিন পর ছেঁড়া জামা পরে কাঁধে কুঠার ফেলে একটা লোক এসে মহারাজজীকে প্রণাম করেছিল। মহারাজজী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘তুই কে রে?” লোকটা বলেছিল, ‘‘সরকার আমি সেই ব্যক্তি, যে মারা গিয়েছিল। আপনিই জীবনদান দিয়েছেন, তা'ই ভাবলাম দর্শন করে আসি।” মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘দেখ দেখি একে ওরা জ্যান্তই পুড়িয়ে মেরে ফেলছিল আর এ বেঁচে ফিরে গেল।”

মহারাজজীর আশীর্বাদে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতেই থাকত কিন্তু আমরা এই সমস্ত ঘটনার দিকে মন দিতাম না। ভাবতাম এটাও পূর্ণত্বের উপলব্ধির অনিবার্য

পরিণাম হবে নিশ্চয়। যিনি এই স্তরে পৌঁছাবেন, তাঁর মনোভাব, তাঁর স্থিতি স্বাভাবিকভাবে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের মত হয়ে যাবে। আমি এটাকে সাধুতার একটা স্তরমাত্র মনে করেছিলাম কিন্তু মহারাজজীর মহাপ্রয়াণের পর অনুভব করেছিলাম যে, তাঁর মধ্যে বিশেষ দিব্যভাব ছিল। এই স্তরের মহাপুরষ খুব কম দেখা যায়। সেইজন্য মহারাজজীর বিদ্যা লিপিবদ্ধ করার খেয়াল এসেছিল। অন্যথা সকলেই তা ধীরে-ধীরে ভুলে যাবে। তারই পরিণাম হচ্ছে জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি নামক এই গ্রন্থটি।

শীতল পণ্ডিত

মহারাজজী যখন স্থায়ীভাবে অনুসুইয়াতে থাকতে শুরু করেছিলেন, তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। দুটো তাওয়া ছিল, একটা মোটা একটা পাতলা। দুটো হাঁড়ি, দুটো ক্ষুদ্র ছোরা, যা দিয়ে সব্জি কাটা হত, বলার অর্থ এই যে খুবই কম জিনিষ ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ছিল না। কুয়োর কাছে বাসন ধোয়ার জায়গা ছিল। একদিন মোটা তাওয়াটা কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল। ওটা কুয়োতে পড়ে যাওয়ার ফলে অসুবিধা হচ্ছিল, কুয়োয় ভিতর থেকে সেটা বার করবে কে?

এই ঘটনার তিন-চার দিন পর একটা লোক আশ্রমে এসেছিল। মহারাজজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলেছিল, "মহারাজজী! আমার নাম শীতল পণ্ডিত, ছাপর গ্রামে থাকি। একটি লোককে হত্যা করে এখানে এসেছি। আমাকে এখন আশীর্বাদ করুন যাতে আমার জীবন রক্ষা হয়।" মহারাজজী তাকে বলেছিলেন "কেন রে! তোর দ্বারা যখন অপরাধ হয়েই গেছে তখন এখানে জঙ্গলে কেন এসেছিস? গিয়ে হাজির হ।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুই কি করেছিস? সত্যি মেরে ফেলেছিস কি? ব্যাপার কি ছিল?" সে সমস্ত ঘটনাটা বলেছিল এবং চিত্রকূটে মহাত্মাদের পাঁচ-সাতটি গদি রয়েছে সে সম্বন্ধেও বলেছিল। এই গদিগুলির অধিকারী উচ্চস্তরের মহাপুরুষেরা, কিন্তু একজন মহান্ত গৃহস্থ আচরণযুক্ত। তিনি একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তার ফলে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। মহান্ত মশাই সেই ছেলেটিকে খুব স্নেহ করতেন।

ছেলেটি যখন জানতে পারে যে কে তার পিতা তখন সে আরো উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। নবযুবক হয়ে সে সাত-আটজন বন্দুকধারী, কয়েকজন লাঠিয়াল

সঙ্গে করে মস্তানি করতে শুরু করে। যে দু'তিনটে গ্রামের মহান্তমশাই জমিদার ছিলেন, সেই গ্রামগুলি সেই মন্দিরের নামে ছিল। এই গ্রামগুলির যে মেয়ে কিম্বা বৌকে ছেলেটির পছন্দ হত, লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের কাছে আনিয়ে নিত। সে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে গোটা অঞ্চল আতঙ্কিত ও ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

গতকাল সে আমার মেয়েটিকে দেখে ফেলে। তার চারজন লাঠিয়াল আমার ঘরেও এসেছিল তারা আমাকে বলেছিল যে, নিজের মেয়েকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, এটা দাদুর আদেশ। ঐ অঞ্চলে 'দাদু' সম্বোধন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছিল। আমি তার লাঠিয়ালদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, "ভাই"! দাদুর পিতা মহান্তমশাই আমাদের জমিদার নিশ্চয়ই কিন্তু এরূপ কাজ তাঁকে শোভা পায় কি, আমার-তোমার মত গরীবদের বোন-মেয়েদের আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করুক। তাঁর উচিৎ কুল এবং পরম্পরা রক্ষা করা। কিন্তু তারা আমার কথা বুঝতে চাইল না। ততক্ষণে তাদের দু'তিনজন সাথী আরো এসে পড়েছিল। তারা ধমক দিয়ে বলেছিল, "মানে-মানে পাঠাচ্ছ কি না?"

আমরা ভেবে দেখলাম, কাজটা কঠিন। এরা তো বদমাইশ! আমাদের মারধোর করে এরা মেয়েটিকে ঠিক নিয়ে যাবে। গ্রামের কেউই এদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। অতএব আমরা সেই বদমাইশগুলোকে বললাম, "আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা আলোচনা করে নিই।" আমি আমার ছেলের সঙ্গে তাদের থেকে তফাতে বসে পরামর্শ করলাম। নিশ্চয় করলাম যে, সম্মানই যদি খোয়া যায় তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? এরপর তো মরব অথবা মারব। সম্মান তো খোয়াতে পারব না। এই নিশ্চয় করে আমি বললাম, "দেখ দাদু আমাদের মালিক, রাজা। তাকে নিজের মেয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একে আমাদের সামনে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে তোমরা, এটা আমাদের ভাল লাগবে না। নিজের ইচ্ছাতে তো এ যাবে না। তোমরা গিয়ে দাদুকে পাঠিয়ে দাও। সে মেয়েকে যেভাবে নিয়ে যাক, আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

লাঠিয়ালরা এই সংবাদ নিয়ে চলে গিয়েছিল। মহন্তের সেই ছেলেটি সাহসী তো ছিলই বন্দুক নিয়ে পাঁচ-সাতজন লাঠিয়ালদের সঙ্গে নিয়ে দরজাতে হাজির হয়েছিল। উঠোনের মাঝখানে খাট বিছানো ছিল। মহন্তের ছেলে গিয়ে খাটে বসেছিল। বন্দুক পাশে রেখেছিল। তার দু'পাশে লাঠিয়ালরা দাঁড়িয়েছিল। আমি

কিছু মিষ্টি এবং জল নিয়ে গিয়ে খাটের উপর রেখেছিলাম এবং তড়িৎ বেগে বন্দুকটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।

পলকের মধ্যে ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়েছিল এবং মহন্তের ছেলেকে দু'লাঠি মেরেছিল। মহন্তের ছেলেটি সেখানেই পড়ে গিয়ে মারা যায়। লাঠিয়ালরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম "খবরদার! কেউ নড়বে না। আমাদের মান-মর্যাদার ব্যাপার এটা। আমরা জ্যান্ত থাকতে এটা হতে দিতে পারি না। তোমরা এ ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। তারা সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল।"

মহারাজজী বলেছিলেন, "পরিস্থিতিবশতঃ যখন অপরাধ করেই ফেলেছ তখন গিয়ে হাজির হও। সব কথা বলে দাও। এখন যা ভাগ্যে লেখা আছে, তা তো সহ্য করতেই হবে। অসাবধানতাবশতঃ ঘটনা যখন ঘটে গেছে, তখন তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। এতে আমি কি করব? কোন উকিল ব্যারিস্টারের কাছে যাও। এখানে কেন এলে?" কিন্তু সে উদাসভাবে একধারে বসেছিল।

মহারাজজী অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি কাউকে বলছিলেন "হো, আমার তাওয়া কুয়োতে পড়ে গেছে। কেউ বার করে দেবে না?" পণ্ডিত আর্তভাবে বসে তো ছিলই একথা শুনে তক্ষুণি কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং এক ডুবেই তাওয়া নিয়ে দড়ির সাহায্যে উপরে উঠে এসেছিল। কুয়োতে একটা ডাল পড়ে গিয়েছিল, সেটা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল না, পণ্ডিত গিয়ে ডালের উপরই পড়েছিল। তার পায়ের তলা ফেটে রক্ত পড়ছিল। মহারাজজীর দৃষ্টি গিয়েছিল সেদিকে, তিনি বলেছিলেন, "কোথায় চোট লেগেছে?" সে বলেছিল, "মহারাজজী! কুয়োতে ছুঁচাল ডাল পড়ে রয়েছে, ওটার উপরই পা পড়ে গিয়েছিল।" মহারাজজী বলেছিলেন, "ব্যস বাবা ব্যস! খুনের বদলে রক্তপাত। যাও শাস্তি যা'ই হোক, ফাঁসি তো দেবে না। গিয়ে হাজির হও। কিছু সাজা ভোগ করে নাও। বিভূতি খাও প্রণাম কর।" যেই সে মাথা নুইয়ে ছিল, মহারাজজী মৃদুভাবে এক ছড়ি মেরেছিলেন। সে খুব ভক্তিভাবে বার-বার প্রণাম করে সেখান থেকে সোজা থানায় গিয়েছিল। পণ্ডিতের সঙ্গে ছেলেও ছিল। দু'জনারই দশ-দশ বছরের জন্য সাজা হয়েছিল, পাঁচ-ছ-বছরের ভিতর তারা সাজা ভোগ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। জেলের ভিতরেও শীতল পণ্ডিত হয়ে পূজা করত। সকলেই সেখানেও

তাকে খুব খাতির করত। সে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা মহারাজজীর কাছে পৌঁছেছিল। মহারাজজী দূর থেকেই তাকে দেখে বলেছিলেন, ''দেখ, শীতল ফিরে এসেছে।'' গদ্‌গদ্‌ভাবে সে বলেছিল, ''আপনি আমাকে চিনতে পারলেন? আমি ভাবছিলাম এতদিন হয়ে গেছে। মহারাজজী আমাকে কি করে চিনবেন? কিন্তু আমার নাম পর্যন্ত আপনার মনে আছে। আপনার আশীর্বাদে মৃত্যুদণ্ড হয়নি। জেলে থাকা সত্ত্বেও কোন কষ্ট হয়নি। আপনার দয়াতে সেখানেও আরামে ছিলাম এবং সেখানের মন্দির থেকে তিন হাজার টাকা দক্ষিণাও পেয়েছি। এইরূপ মহারাজজীর বিভূতি, ছড়ি এবং তাড়নাও অনুকম্পার জন্য প্রযুক্ত হত।''

বাঘ শাবক

স্থানীয় যুবকরা মহারাজজীর সেবাতে নিযুক্ত থাকত। তাদের মধ্যে একটি যুবকের নাম লল্লু ছিল। আশ্রমে বাসন মাজার সঙ্গে অন্যান্য সেবাকার্য করে সে আশ্রমেই থেকে যেত। মহারাজজীর অনুমতি নিয়ে কখনও-কখনও ঘরেও যেত। একদিন বাড়ি থেকে আসার সময় তার সঙ্গে গ্রামের একটা ছেলেও ছিল।

ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসার পথে সেই ছেলেটি ঝোপের ভিতর একটা এক মাসের বাঘের শাবককে দেখতে পেয়েছিল। বুনো ছেলেরা সাহসী হয়েই থাকে, তার মধ্যেও সেই ছেলেটি যে এইরূপ মহাপুরুষের সেবাতে নিযুক্ত, যাকে সে ভগবানের থেকেও বেশী জ্ঞান করত, তার সাহসের সীমা ছিল না। সে শাবকটিকে তুলে চাদরে মুড়ে বগলদাবা করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছিল। ছেলে দুটো জানত যে, যেখানে বাচ্চা থাকে, তাদের মাও আশেপাশেই থাকে দূরে যায় না। বাঘের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়। শাবকটিকে না দেখতে পেয়ে তার গন্ধ শুঁকে-শুঁকে তার মাও ছেলে দুটোর পিছন-পিছন হাঁটছিল। তাকে দেখে ছেলে দুটো তার দিকে পাথর ছুঁড়ে বলেছিল, ''ধর তো একে, দেখিস, চল পালা রে'' এই সব কথা বলতে-বলতে দু'তিন কিলোমিটার দূর আশ্রম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। বাঘিন নিজের বাচ্চার গন্ধ পাচ্ছিল, বাচ্চাকে ডাকার ভাষাতে মুখ দিয়ে ঘুর ঘুর শব্দ বার করছিল, কিন্তু সেই শাবকটি ঘাপটি মেরে ছেলেটির বগলদাবা হয়েছিল, একবারও কোন আওয়াজ মুখ থেকে বার করেনি। যদি সে কোন শব্দ করত অথবা ছটফট করত তাহলে কেউ যদি বাঘ মা-টাকে গুলি করে মেরেও দিত তবুও সে ছেলে দুটোর প্রাণ নিয়েই ছাড়ত।

ছেলেদুটো সেই শাবকটিকে মহারাজজীর সম্মুখে রেখেছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘কেন রে! এটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি? আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করলি তোরা। তা’ই আমি ভাবছিলাম যে ব্যাপার কি? কে বিপদে পড়েছে, তুমি এতক্ষণ ধরে ঘরে করছিলে কি?’’ ‘‘এটাকে আনতে-আনতে দেরী হয়ে গেল।’’তার জবাব শুনে মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘এটা কেন বলছিস না যে খুব জোর বেঁচে গেলি। ঐ দেখ তোর বাঘ মা এতক্ষণে তোদের খেয়ে শেষ করে দিত। এটা তো ভগবানের দয়া যে, বাচ্চাটা কোন শব্দ করেনি।’’ ছেলেটি বলেছিল-‘‘আপনি ওর শ্বাস ধরে বসে গিয়েছিলেন, কি করে তবে সে বলত?’’ মহারাজজী বলেছিলেন-‘‘যা হোক এখন তো নিয়েই এসেছিস।’’

মহারাজজী ছুতোরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং বাচ্চাটার জন্য কাঠের বড় একটা খাঁচা তৈরী করিয়েছিলেন। খাঁচাটির ভিতর বসে শাবকটা কেঁউ কেঁউ করত। ওকে খাওয়ানো দাওয়ানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ছিল মাংসাশী জীব। আশ্রমে তার ভোজনের কি বা ব্যবস্থা হত। সে দুধও খেত না। দুধ রেখে দিলে একটু চেটে রেখে দিত। আশে-পাশের গ্রামগুলিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহারাজজী বাঘের বাচ্চা পুষেছেন। তাকে দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে গ্রামের লোক আসতে শুরু করেছিল। চিত্রকূট থেকে একজন দারোগা দশজন সিপাই সঙ্গে করে বন্দুক হাতে আশ্রমে এসেছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল-‘‘মহারাজজী! শুনেছি আপনি বাঘের বাচ্চা পুষেছেন?’’ মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘হ্যাঁ, হো! ঐ যে শিব ঠাকুরের মন্দিরে মঞ্চের কাছে, ওখানে খাঁচার ভিতর রয়েছে। তারা খাঁচার কাছে গিয়েছিল। অতলোক একসঙ্গে দেখে বাচ্চাটা এককোণাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল। যেমনি তারা খাঁচার কাছে এসে উঁকি মারতে শুরু করেছিল বাঘ শাবকটি দ্রুত তাদের দিকে লাফ দিয়েছিল। দারোগাজী পিছনদিকে পড়ে গিয়েছিলেন। সেপাইরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘আরে ও তো খাঁচার ভিতরে রয়েছে। এখন তো ওর দাঁতও বের হয়নি।’’ দারোগামশাই বলেছিলেন, ‘‘তাও এর নামই ভয় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট, যখন লাফ দিল কিছু মনেই আসেনি। কারণ খেয়ালই ছিল না যে, আমাদের কাছে বন্দুকও রয়েছে।’’

বাঘের বাচ্চাটা প্রায় একমাস পর্যন্ত আশ্রমে ছিল। মহারাজজী একদিন

বলেছিলেন, "দেখো, এর খোরাক আমরা দিতে পারছি না, একে আর এখানে রাখা ঠিক হবে না। সকলেই জানে, কিন্তু বন বিভাগ অথবা চিড়িয়াখানা থেকে কেউ এখনও নিতে এল না। একে জঙ্গলে ছেড়ে দাও। এর মা দেখাশোনা করে নেবে।" এই প্রকার সেই বাচ্চাটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কার সাহস হবে যে, জঙ্গলে, যেখানে আশেপাশে বাঘিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ তার বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়। কিন্তু সেই বুনো ছেলে দুটো মহারাজের উপর বিশ্বাসের জোরে সেটাও নির্বিঘ্নে করে দেখিয়েছিল।

শ্রী স্বরূপদাসজী

স্বরূপদাসজী অনবরত বারো বছর পর্যন্ত মহারাজজীর বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্বে যা-যা ঘটেছিল, সব এঁরই কাজ ছিল। চারদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে শেষে তিনি মহারাজজীর শরণাগত হয়েছিলেন। চরণ স্পর্শ করে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁকে যেন ক্ষমা করে শিষ্যরূপে স্বীকার করেন। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, "দেখ, তুই পাক্কা উপদ্রবী। আমি তোকে ক্ষমা করলেও ভগবান করবেন না। তিনি বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেই যাচ্ছিলেন।"

মহারাজজীকে দর্শন করার জন্য কয়েকজন সাধু আশ্রমে এসেছিলেন। তারা স্বরূপদাসজীকে বলেছিলেন, "স্বরূপদাসজী! আপনি একি বলছেন? পরমহংসমশাই তো ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের কথা শুনে স্বরূপদাস বলেছিলেন, "ইনি মহাপুরুষ। এঁর সেবা করলেই আমার কল্যাণ হবে। আমি অজ্ঞতাবশতঃ বিরোধ করে দেখে নিয়েছি। উনি বাস্তবে মহাপুরুষ, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন।"

ব্রহ্মচারীমশাই তাঁর পক্ষ নিয়ে মহারাজজীকে বলেছিলেন, "মহারাজজী! স্বরূপদাস এখানে এসে প্রায় প্রত্যেকদিন কোন না কোন উপদ্রব করেই। বেশ পরিবর্তন করলে অন্ততঃ আর অন্য লোক তো এর সঙ্গে আসবে না। আপনি কৃপা করলে ভজনাও করে নেবে।" মহারাজজী বলেছিলেন, "কৃপা তো করেছি। তুমি বলছ যখন, তখন রাজিও হচ্ছি, কিন্তু স্বরূপদাস সাধু হবে না। আমার শরণে এসেছে সেইজন্য কল্যাণ হবেই, কিন্তু ভবসাগর পার করতে পারবে না।" মহারাজজী রাজী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপদাসজী মস্তক মুণ্ডিত করে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে মহারাজজীর সমক্ষে প্রণত হয়েছিলেন। স্বরূপদাসজী সাধুর

বেশ ধরেছিলেন। আট-ন'মাস পর্যন্ত, তিনি আশ্রমে মর্যাদা ও সংযমপূর্বক ছিলেন, তারপর তাঁর পুরোনো সংস্কার জেগে উঠেছিল। তিনি ভজনাতে রত থাকতে অসমর্থ হয়েছিলেন। বিচরণ করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পূজ্য মহারাজজী ভবিষ্যৎ বক্তা ছিলেন।

সিদ্ধবাবার উদ্ধার

বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মহারাজজী সিদ্ধবাবার উদ্ধারের ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''হো! সিদ্ধবাবা উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ছিলেন, সামান্য একটু ভুলের জন্য মুক্তিলাভ করতে পারেননি, বর্তমানে প্রেতের স্বরূপে, পড়ে আছেন। এখন এই স্থানে আমি থাকি, অতএব তাঁর মুক্তির উপায় করা দরকার, কিছুদিন পর্যন্ত তিনি সিদ্ধবাবার মুক্তির জন্যই ভজনা করেছিলেন। একদিন তিনি সিদ্ধবাবার পৌত্র মহান্ত গুরুপ্রসাদকে ডেকে বলেছিলেন-''শোন, গয়া ঘুরে আয়।'' সে বলেছিল-''মহারাজজী! গয়ার প্রতি আমার আস্থা নেই।'' মহারাজজী তার কথা শুনে বলেছিলেন-''দেখ, তোর আস্থা থাক না থাক, কিন্তু এটাই রীতি-নীতি, মর্যাদা। তুই সেখানে গেলে কিছু হবে না, আমার কথা রাখ, শুধু আজ্ঞা পালন কর। তুই গয়া গেলে সিদ্ধ বাবার স্থানে যে উপদ্রব হয়, সেটা শান্ত হবে। সিদ্ধ বাবা প্রেত যোনি থেকে উদ্ধার হয়ে যাবেন। মহান্তমশাই গয়া থেকে ঘুরে এসেছিলেন, তারপর থেকে সিদ্ধবাবার স্থানে উপদ্রব হয়নি। তক্তাপোষটি এখনও সেখানেই রয়েছে। এখন যদি কেউ সেখানে বসেও তাঁকে আর দেখতে পায় না। মহারাজজীর কৃপাতে তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।''

নিবৃত্তির স্বরূপ

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''মহারাজজী! ভগবান দর্শন দেন কি? তাঁকে দেখতে কেমন? নিবৃত্তি কাকে বলে?'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''ভগবান তোমার স্বরূপের মতোই দেখতে!'' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ''আমার মত শ্যামবর্ণের, গমবর্ণের অথবা গৌরবর্ণের তিনি?'' তিনি বলেছিলেন, না, দেহটা তো পরিবর্তনশীল আজ এটা শ্যামবর্ণের কোনকালে কাঞ্চনবর্ণের ছিল। আজ হাত-পা যুক্ত, কখনও বিনা হাত পায়ের ছিল, এটা তোমার স্বরূপ নয়। তোমার হৃদয়ে আত্মার যে অবিনাশী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, তার দর্শন করা মানেই ভগবৎ দর্শন পাওয়া। ভগবান নিশ্চয় দেখা দেন। আমাকে দেখা

দিয়েই শান্তি প্রদান করেছেন। অধিকারী ভক্ত তাঁকে না পেলে প্রাণ দিয়ে দেবে। ভগবান দেখা দেন, তোমাকেও দেখা দেবেন, সাধনা তো কর।

আগে ভগবৎ দর্শন হয়, তারপর নিবৃত্তি লাভ হয়। অতএব আগে তাঁকে লাভ করার চেষ্টা কর। দর্শনের পর প্রমাণপত্র রূপে নিবৃত্তি মেলে।

সো সুখ জানই মন অরু কানা। নহিঁ রসনা পহিঁ জাই বখানা।।

(মানস, ৭/৮৭/৩)

অনুসুইয়ার জনশূন্য বনস্থলীতে সতত সাধনারত থাকা, কয়েকমাস হয়ে গিয়েছিল। সেইসময় স্থিতি সম্বন্ধীয় দৃশ্যের অজস্র পঙক্তি মহারাজজীর অনুভবে নিরন্তর অঙ্কিত হচ্ছিল, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধনোপযোগী স্মৃতিকথা পূজ্যপাদের নিকট শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মহারাজজী বলেছিলেন যে, অনুসুইয়াতে চার-ছয়মাস বাস করা হয়ে গিয়েছিল। স্বরূপে স্থিতি লাভ হওয়ার পূর্বে কয়েকটা অনুভবে দেখেছিলাম, বড় একটা চামড়া যেন ঝুলানো আছে, সেটা যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল কে জানে। অনন্ত প্রকারের, অনন্ত যোনির আকার তাতে অঙ্কিত ছিল। সেই যোনিগুলিতে সবরকমের জীব আটকে ছিল। সকলেই কাঁদছিল, চিৎকার করছিল। তীব্র দুঃখে ডুবে ছিল। আমিও আটকে ছিলাম। আমি খুব সহজে সেই চামড়ার পর্দা থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আটকে থাকা সকলেই বলেছিল যে, ইনি কত ভাগ্যবান এঁর নিবৃত্তি হয়ে গেল। গর্ভবাস থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

একটা অন্য অনুভবে মহারাজজী দেখেছিলেন যে, একটা অত্যন্ত বিশাল এবং ভয়ঙ্কর মহিষ মহারাজজীকে তাড়া করছে। তার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তিনি একটা বিস্তৃত জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মহিষটাও ঝাঁপ দিয়েছিল। মহারাজজী জলাশয় থেকে উঠে এসেছিলেন। মহিষটা তাঁকে জলে খুঁজতে-খুঁজতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। তারপর তিনি এই কথাগুলি শুনতে পেয়েছিলেন, আজ থেকে যমের বাঁধন থেকে তুমি মুক্ত। কালজয়ী। ঠিক তখনই সেই মহাপুরুষের স্বরূপ সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, "যাও, তোমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।" সেই মহাত্মার আশীর্বাদের অর্থ তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন। মহারাজজী

বলতেন যে, যদি আমার দেহটা বিজয়ী হয়েও যেত, তবু লাভ কি হত? দেহত্যাগ তো হবেই, এর আয়ু নির্ধারিত আছে। পরিণামে হেরেই যেতাম। মহাবলশালী কালকে পরাজিত করতে পারলেই বাস্তবিক বিজয়লাভ হয়।

তিনি আবার বললেন, অন্য একটা অনুভবে দেখেছিলাম যে, আমার যেন মৃত্যু হয়েছে। নিজের মৃতদেহটা নিজেরই কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আমিই দেহটাকে চিতার উপর রেখে, আগুন দিচ্ছি পুড়িয়ে বাঁশ দিয়ে কুঁচিয়ে সেই স্থানের কালো ভূমি ধুয়ে গঙ্গায় প্রবাহিত করছি। পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে আমি গলদঘর্ম অবস্থাতে বসে পড়েছিলাম। তারপর যেমনি আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখেছিলাম যে আমারই রূপ গঙ্গা নদীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কাঞ্চনবর্ণের অলৌকিক রূপ জ্বলজ্বল করছিল। এরই মধ্যে এই কথাগুলি শুনেছিলাম-এঁকে প্রণাম কর। এটা তোমারই স্বরূপ। তুমি এইরূপেই অবস্থান করবে। এটাই নারায়ণ স্বরূপ, নিজের রূপকেই আমি প্রণাম করেছিলাম। সেই রূপ তারপর আমার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এই অনুভবের পর আমার রূপ পরিবর্তিত হয়েছিল। পূর্বে কালো-কালো, কেমন যেন ছিল। কিন্তু স্বরূপে স্থিতি লাভের পর এখন দীপ্ত হয়ে গেছে। বস্তুতঃ মহারাজজীর দেহ কাঁচের মত স্বচ্ছ ছিল। তিনি কখনও ছ'মাস, কখনও গোটা বছর স্নান না করে থাকতেন, কিন্তু তাঁর ঘামে দুর্গন্ধ ছিল না। তিনি বলেছিলেন-এই স্বরূপ দর্শনের পরেই ভগবান ভজন করতে বারণ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, যেন কিছু হারিয়ে গেছে। কিন্তু যখন স্বরূপ স্পর্শ করেছিলাম, তারপর আমিই হারিয়ে গিয়েছিলাম। স্বরূপটাই শুধু ছিল। কে তখন চিন্তন করবে? নুনের পুতুল যেরূপ সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে মিশে একাকার হয়েছিল। ফিরে এসে কে খবর দেবে? অতএব এটা বাণীর বিষয় নয়। সেইজন্য আপ্তপুরুষগণ তাঁকে অনির্বচনীয় বলেছেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের পরেই তাঁকে জানা যায়।

সেবাতে প্রবৃত্ত লক্ষ্মীর দর্শন

মহারাজজী বলতেন, "হো! মা লক্ষ্মীকে আমি আমার সেবা করতে দেখেছিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সেটা কিরূপে মহারাজজী?" তিনি বলেছিলেন-"হো অনুভবে দেখলাম যেন অনুসুইয়া আশ্রমেই এই আসনেই আমি বসে আছি। কিছুক্ষণ পর মনে এল যে, গিয়ে কুঠুরীর ভিতর বিশ্রাম করি। কুঠুরীর দরজার বাইরে এক দাসী ছিল সে আমাকে ভিতরে যেতে বারণ করে

বলেছিল-‘আপনি দাঁড়ান।’ আমি তাকে জিজাসা করেছিলাম ‘কেন’? সে বলেছিল যে, ভিতরে তিনি বিশ্রাম করছেন এবং মা লক্ষ্মী সেবা করছেন। আমি ভাবতে লাগলাম যে, কুঠুরীতে কে শুয়ে রয়েছে? দরজা একটু ফাঁক ছিল ভিতরে আলো ছিল। আমি দেখেছিলাম যে, ভিতরে আমার তক্তাপোষে আমিই শুয়ে রয়েছি এবং দেদীপ্যমান দেবী আমারই পা টিপছেন এবং এই সেবিকা আমাকেই ভিতরে যেতে বারণ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম— “মহারাজজী! তাহলে এটা কি ছিল?” তিনি বলেছিলেন-“হো, যেটা আমার আত্মস্বরূপ তার তো মা লক্ষ্মী সেবা করছেন এবং সেটা এই স্থূল দেহটাকে বোধ করানো হচ্ছে।”

তখন থেকে আকাশবৃত্তিতে ব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটে গেল। যদিও ব্যবস্থা তো সেইদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যেদিন ভগবান তাঁকে বলেছিলেন, “খেতে চাইছ তাহলে কাল থেকে খাবে।” কিন্তু যখন থেকে মা লক্ষ্মীকে সেবাকার্যে নিযুক্ত দেখেছি, ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বোধটাই নেই আর পরমহংসজীর আশ্রমের খরচ কিভাবে চলে, এটা সকলের কাছে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছু লোক বলেছিল যে, তিনি সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন। সেখান থেকে সোনা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যে টাকা পান তা দিয়ে সব ব্যবস্থা করেন। কিছু অন্য লোকেরা বলেছিল, তিনি টাকা ছাপেন। পাহাড়ে কোথাও মেশিন লাগানো আছে। কিছু লোকেরা ঠাট্টা করে বলাবলি করত যে, চোর-ডাকাত কার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়, কিন্তু পরমহংসজীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পথের সন্ধান দিয়ে দেয়। তিনি ডাকাতি তো করেন না। এসব শুনে মহারাজজী বলতেন-

তওন ঘর চেতিহেঁ রে ভাই, তোরা আওয়াগমন মিটি জাঈ।।
জহাঁ ঘর লক্ষ্মী ঝাড়ু দেত হ্যায়, শম্ভু করে কোতওয়ালী।
জহাঁ ব্রহ্মা ভয়ে টহলুআ, বিষ্ণু করে রখওয়ালী।
তওন ঘর চেতিহেঁ রে ভাই।।

হো! সব ব্যবস্থা ভগবান করেছেন। ভজনা কর, এরূপ সুবিধা সকলেই পায়। ভগবানের দ্বার সকলের জন্য অবারিত, ভজনা তো কর, সকলেই পাবে।

নেহরুর রাজতিলক

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় মহারাজজীর অনুসুইয়াতে পদার্পণ হয়েছিল। ভক্তদের মনে জিজ্ঞাসা ছিল যে, কে ভারতের সর্বোচ্চ পদ লাভ করবে, তারা মহারাজজীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত এবং কয়েকজনের নাম নিত। গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল ইত্যাদির মধ্যেই কেউ হবে, অনুমান করত। মহারাজজী বলেছিলেন, প্রত্যাশী হাজারটা থাকতে পারে, কিন্তু পাবে নেহরুই। সকলেই জিজ্ঞাসা করেছিল-“মহারাজজী! আপনি কি করে জানতে পারলেন?” মহারাজজী বলেছিলেন যে, আমি দেখেছি। যেন আমি উড়ে দিল্লী গিয়েছি। খুব ভীড় সেখানে সভাস্থলে আমার স্বরূপ স্বহস্তে তার কপালে তিলক কেটেছে এটা ভবিতব্য, ঘটবেই। নেহরু ভ্রষ্টযোগী। পরের দিন ঘোষিত হয়েছিল যে, নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। নেহরুর প্রতি মহারাজজীর স্নেহ ছিল।

একবার মহারাজজীর মনে একথা উদিত হয়েছিল যে, কেমন যোগী নেহরু, যে রাজ্য পরিচালনা করছে এবং আমি কেমন যোগী যে ঘোর জঙ্গলে ন্যাংটো শরীরে ভগ্ন আশ্রমে নিবাস করছি। আমি যোগী হতে পেরেছি কি না? সেইদিনই তিনি অনুভবে দেখেছিলেন যে, নেহরুকে ক্ষত্রিয় কুলে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। আবার কর্ম করে সাধনা পথে চলতে হবে, কিন্তু আমার আর জন্ম হবে না। এইরূপ দৃশ্য দেখে মহারাজজীর মনে পরম সন্তোষ হয়েছিল। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ যে বিষয়েই জানতে চান, ভগবান তা জানিয়ে দেন। না চাইলেও আবশ্যক তথ্য প্রকট হতে থাকে। এই দৃষ্টি অনুভব গম্য।

শ্রীব্রহ্মচারী মশাই এবং করপাত্রী মশাইয়ের মধ্যে বার্তালাপ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রচারিত করছিল। সেই দলগুলির মধ্যে একটি দল ছিল ‘রামরাজ্য পরিষদ’ সঞ্চালন করছিলেন প্রসিদ্ধ বিদ্বান স্বামী করপাত্রীমশাই। তিনি ধর্মের জয়ধ্বনি করতে করতে চিত্রকূট পৌঁছেছিলেন। শ্রী করপাত্রী মশাইয়ের সম্বন্ধে শুনে মহারাজজী বলেছিলেন যে, তাঁর তো খুব নাম ছিল, তিনি দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে কি করে জড়িয়ে গেলেন। তারপর রাম রাজ্যের অর্থ বলেছিলেন যে, যোগীর হৃদয় রাজ্যের এক বিশেষ স্থিতিকে রামরাজ্য বলে। ভূখণ্ড এবং পিণ্ডে অনুসন্ধান করলে রামরাজ্যের স্থিতি কখনও লাভ হবে না।

রামচরিতমানসে চর্চিত রামরাজ্য এই প্রকার— মানস বলে মন অথবা অন্তঃকরণকে। যখন চিত্তের বৃত্তিগুলি রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে নিশ্চল হয়ে যায়। এইরূপ চর্চা শিষ্যদের কাছে করে তিনি নিজের শিষ্য ব্রহ্মচারী মশাইকে বলেছিলেন, তুমি চিত্রকূট গিয়ে করপাত্রী মশাইকে জিজ্ঞাসা করবে যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন অনুভব অথবা আদেশ অন্তর্জগত থেকে পেয়েছেন কি না, মহাপ্রভুর আদেশ বিনা কোন কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়।'

মহারাজজীর আদেশানুসারে ব্রহ্মচারীমশাই করপাত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য চিত্রকূট পৌঁছেছিলেন। গুরুদেব যে-যে প্রশ্ন করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে তিনি কথা আরম্ভ করেছিলেন যে, আপনি কি এমন কোন আদেশ পেয়েছেন, যেমন জগত গুরু শঙ্করাচার্য মশাই সনাতন ধর্মের স্থাপনার জন্য পেয়েছিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন-**নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্**-যুদ্ধ তো আমি করব, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, নিশ্চয় বিজয় লাভ করবে। এইরূপ প্রশ্ন শুনে করপাত্রী মশাই বলেছিলেন যে, বর্তমানে সমাজে ধর্মভাব হ্রাসোন্মুখ। সমাজকে তাই সচেতন এবং জাগরুক করার জন্য রাম রাজ্য দলের স্থাপনা করা হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করা হচ্ছে। গোহত্যা করা হচ্ছে, আর সময় নেই, আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। অনুভব এবং আদেশের অপেক্ষাতে কতদিন বসে থাকব। ব্রহ্মচারীমশাই তাঁর এরূপ কথা শুনে তাঁকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে, আপনি অধ্যাত্মপথের পথিক সেইজন্য ঈশ্বরের আদেশ পালন করলেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ দ্বারা সেটা অর্জন করার কল্পনা করা ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। আপনি দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে থাকলেও সফল হতে পারবেন না। এইরূপ কিছু মহত্বপূর্ণ চর্চার জন্য মহারাজজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সেটা মেনে চলা না চলা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। শ্রীপরমহংস মশাইয়ের নাম শুনে করপাত্রী মশাই কিছুক্ষণের জন্য অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কালান্তরে তাঁর কথা অগ্রাহ্য করেছিলেন। মহাপুরুষের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। রাজনৈতিক দল রূপে রামরাজ্য পরিষদের স্থিতি বর্তমানে নগণ্য।

সেবা দ্বারা ভজনের জাগৃতি

মহারাজজীর শরণ গ্রহণ করার পর যখন আমার অনুভব জাগ্রত হয় তখন তিনি আমায় আদেশ দেন যে, সেবা কর। শুরুতে আমার চিন্তাধারা এরূপ ছিল

যে, যারা সাধন ভজন করে, তাদের যে কোন এক জায়গায় শান্তভাবে বসে থাকা উচিৎ। যেমন-যদি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই রইল, যদি বসে আছে, বসেই থাকল। কেউ কিছু খেতে দিলে খেয়ে নিল, সামনে যদি জল বয়ে যাচ্ছে তবে সেটা অঞ্জলি ভরে পান করে নিল। লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি থাকা উচিত। কিন্তু মহারাজজী বলেন ঝাড়পোঁছ কর, এই থালা-বাটি ওখানে রাখ। ধুনীর জন্য কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে এস, সেবা কর-এটা কি ধরণের সাধন-ভজন।

কিছুকাল পর যা শুনেছিলাম, অন্তরে তেমনিই কিছু প্রেরণার সঞ্চার হয়েছিল, তখন বুঝেছিলাম, সেবা ভজনের জাগৃতির জন্য অতি আবশ্যক। সেই সময় থেকে সেবাকার্যে প্রবৃত্তি তো হয়েছিল কিন্তু ভজনের জন্য হঠকারীতা এত প্রবল ছিল যে, আমি সেবা তো করতাম কিন্তু মন থেকে নয়। সারাদিন সেবা করতাম, হাত-পা চলতে থাকত, কিন্তু মন দিয়ে করতাম না। মনকে ইষ্ট চিন্তনে নিযুক্ত করে রাখতাম। উঠতে-বসতে, চলাফেরা করতে-করতে মন কখনও ইষ্ট-চিন্তন থেকে তফাত হত না। ইষ্ট চিন্তনে নিযুক্ত থেকে সেবাকার্যে সামান্যই মনোযোগ দিতাম।

মহারাজজী কিন্তু সেবাকার্যে সামান্যও অবহেলা সহ্য করতে পারতেন না। মহারাজজীর জন্য একদিন জল গরম করে রাখা হয়েছিল। যে পাত্রটাতে জল ছিল সেটা ঢাকা ছিল না। আমি একটা থালা উঠিয়ে ঢাকা দিয়েছিলাম। তারপর কুয়োর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজজী সব দেখেছিলেন তিনি একটা ইঁট তুলে আমার পায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আঘাত অসহ্য ছিল। সেদিকে মন না দিয়ে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-"মহারাজজী! কি ভুল করলাম?" তিনি বলেছিলেন "দেখছ না, এঁটো বাসনেই জল ঢাকা দিয়েছ।" আমি জবাব দিয়েছিলাম-থালাটা এঁটো নয়, তিনি বকে বলেছিলেন-"দেখ কি কালো-কালো ছোপ লেগে রয়েছে।" আমি তাও বলেছিলাম-"এখনও ঐ থালাতে কেউ খাবার খায়নি।" খাবার খেয়ে থালা ধোওয়া না হলেই আমি সেটাকে এঁটো বলে মনে করতাম। কোন দাগ, ছোপকে এঁটো বলে ভাবতাম না। মহারাজজী আমার কথা শুনে বলেছিলেন "এখনও তুমি সাধুদের বাসন দেখনি। অল্প কালো দাগও এঁটোর সমান। তিনি যে পায়ে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেই পায়ে একমাস পর্যন্ত পট্টি বাঁধতে হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ক্ষত চিহ্ন আছেই। সেখান থেকে যখন সরে পড়েছিলাম তখন মহারাজজী অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন, একমাস থেকে সুযোগ

খুঁজছিলাম পাচ্ছিলাম না, আজকে পেলাম। তিরস্কৃত হবার পর থেকে ভজনে একাগ্রতা বেড়ে গিয়েছিল। সাধকদের কল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণ তিরস্কার করেন।"

কালেক্টর চতুর্বেদী মশাই সেবাকার্যে

কার্বীর কালেক্টর চতুর্বেদীমশাইয়ের অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ ছিল, সেইজন্য সাধু-মহাত্মাদের তিনি ভক্তি করতেন। তাঁদের দুরধিগম্য বাণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি চিত্রকূটে সব মহাত্মাদের প্রশ্ন করে বেড়াতেন, তাঁদের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হওয়ার জন্য শেষে বলতে শুরু করেছিলেন যে, মনে হয় আপনাদের থেকে বড় সাধু আমিই। একবার ভক্তরা তাঁকে অনুসুইয়া আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি পরমহংস মহারাজজীর দর্শন এবং সৎসঙ্গ শ্রবণ করে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি মহারাজের কৃপা পেয়েছিলেন। পরগণাধীশ মহারাজজীর কাছে মিনতি করেছিলেন যে, আমি একবার একজন মহাত্মাকে দণ্ড দিয়েছিলাম, তখন থেকে উদরশূলে কষ্ট পাচ্ছি। এখন মনে হয় যে, যদি তিনি মন্দলোকই ছিলেন,তবুও ছিলেন তো সাধুর বেশে। জীবনের শুরুতে বাল্মীকি মুনিও অসৎ ছিলেন। মহারাজজী তার পেট স্পর্শ করে বলেছিলেন-"যাও বিভূতি খেয়ে নাও আর ব্যথা হবে না।" জীবনে তাঁর আর কখনও ব্যথা ওঠেনি।

সেই সময় উত্তরপ্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধানদের নির্বাচন হচ্ছিল। চতুর্বেদী মশাই কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আশ্রমে এসে মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মহারাজজী! দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নির্বাচনে কে বিজয়ী হবে? তিনি হেসে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে যে, একজন ব্রাহ্মণ বিজয়ী হবে। তাঁরা সকলেই মহারাজজীকে প্রণাম করে ফিরে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের পরিণাম ঘোষিত হবার পর সকলেই দেখেছিল যে, সেই ব্যক্তিই বিজয়ী হয়েছে-যার নাম তিনি পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন। সকলেই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত। চতুর্বেদীমশাই তখন থেকে সারাজীবন আশ্রমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই প্রকার শত-শত ভক্তদের হৃদয়ে পূজ্য মহারাজজীর বিশিষ্টতার প্রভাব পড়তে শুরু করে।

আশ্রমে প্রথম নির্মাণ কার্য

পূর্বেই কথিত হয়েছে যে, প্রাচীন ভগ্ন প্রায় কয়েকটি কুঠুরীর নাম আশ্রম ছিল। ধুনীর উপর আচ্ছাদন রূপে জীর্ণ-শীর্ণ তিনটি মাত্র টিনের চাদর ছিল।

পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ ভক্তদের মাঝে

বর্ষাকালে তিনদিক্ থেকে বৃষ্টির ঝাপটা আসত। সেখানে নবনির্মিত কিছু ছিল না। কালেক্টর শ্রী চতুর্বেদীমশাই, ব্যবসায়ী ওচ্ছবলাল পারেখ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত মিলে ধূনীঘর তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিলেন। নির্মাণের জন্য ইঁট আনা হচ্ছিল।

মিস্ত্রিরা কাজ শুরু করেছিল। যখন আশ্রমের ধারে কাছের লোকেরা জানতে পেরেছিল যে, মহারাজজীর আশ্রমে ধুনীঘর তৈরি হচ্ছে, তখন সেবা করার জন্য চারিদিক থেকে লোক আসতে শুরু করেছিল। তিন মাসের মধ্যে নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। আশ্রমে এটা প্রথম নির্মাণ কার্য ছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, "হো! তিনটি টিন ঠিক করতে আমার তিন মাসের ভজনে ব্যবধান পড়ল।"

মহারাজজী বলেছিলেন, "হো! সিংহ, সাধু এবং সাপ কখনও বাসা তৈরী করে না, তৈরী বাসাতে প্রবেশ করে এবং নির্ধারিত সময় সেখানে কাটিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু ভজনপূর্তির পর সাধু যেখানেই বাস করেন, আচ্ছাদন তৈরী হয়েই যায়। কিন্তু সাধককে এসবে মাথা ঘামানো উচিত নয়। চিত্তকে চতুর্দিক থেকে গুটিয়ে হৃদয়েই নিযুক্ত করে রাখার চেষ্টা করা উচিৎ।

আমার নামকরণ

ধূনীঘর নির্মাণের চার-ছয় মাস পূর্বে আমি আশ্রমে এসেছিলাম। সড়ক পথ না থাকার জন্য নদীর ওপার থেকে ইঁট নিয়ে আসা হচ্ছিল। কখনও হেঁটে গিয়ে, কখনও সাঁতার কেটে মাথায় করে ইঁট এপারে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিছু-কিছু ইঁট নদীতে পড়ে যাচ্ছিল সেগুলিকে জলপ্রবাহ কিছুদূর ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, নদী সেখানে গভীর ছিল। সকলেই তন্ময় হয়ে সেবা করছিল। আমি এমন কাজ বেছে নিতে চাইছিলাম, যেটা একা করা যাবে। বুদ্ধি প্রয়োগ করার দরকার হবে না। কারণ মন তো একটাই যদি সে কাজে লেগে পড়ে, তবে ভজনা কে করবে? যেহেতু লোকের ভীড় থেকে আলাদা হয়ে সেবা করা স্বভাব ছিল, তাই আমি ইঁটগুলিকে জলে ডুব দিয়ে বার করতে শুরু করেছিলাম। সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল, সেইজন্য জলে ঝাঁপিয়ে ইঁট বার করছিলাম। উঁচু-নীচু শীলাখণ্ড যুক্ত নদীটি ছিল। ঝাঁপ দিতে গিয়ে একবার মাথাটি নদীস্থিত শীলাখণ্ডে গিয়ে সজোরে লেগেছিল। জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ভক্তরা মাথায় পট্টি বেঁধে দিয়েছিল, তবে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল। মহারাজজী দেখে বলেছিলেন, বোকা কোথাকার! এ একেবারে অড়গড়। পাহাড়ি নদীতে সকলে পায়ে ভর দিয়ে ঝাঁপ দেয় আর এ মাথার ভরে ঝাঁপ দিচ্ছিল। একেবারে অড়গড়, একজন সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিল, "হ্যাঁ মহারাজজী!

এর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। মহারাজজী শুনে বলেছিলেন, "না রে, কি সুন্দর ডুব দিয়ে বার করছিল। বুদ্ধির কথা নয়, ছেলেটা অড়গড়। সেই সময় এই বিশেষণটি আমার জানা ছিল না, কোন বইতেও পড়িনি। কোন আঞ্চলিক ভাষাতেও শুনিনি। এই শব্দটা অনায়াসেই মহারাজজীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। কয়েকজন কৌতুক করে এই নামেই আমাকে ডাকতে শুরু করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কেউ অড়গড়ই বলুক আর বগ্নড়ই বলুক। তাতে কি যায় আসে। মাটির শরীর, এটাকে লোকে কিছু না কিছু বলেই। মহারাজজী বলেছিলেন, "এ আমার সৌভাগ্য।" কিন্তু আমি ভাবছিলাম গুরুদেব এরূপ বলেছেন যখন, তখন এই শব্দের কিছু না কিছু মানে নিশ্চয় হবে।

প্রায় একমাস পরে এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসাতে মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, "হো! **লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার। গুরু বসিষ্ঠ তেহি রাখা লছিমন নাম উদার।।"** *(মানস, ১/১৯৭)* লক্ষণের মধ্যে এই বিশেষ গুণ-ধর্ম ছিল, সেইজন্য গুরু বশিষ্ঠ তাঁর নামকরণ সেই গুণের অনুসারে করেছিলেন। এই প্রকার অড়গড় শব্দটিও ভুল নয়। এটা সঠিক শব্দ। এর মধ্যে এই লক্ষণই রয়েছে।

আমি ভেবেছিলাম কদাচিৎ অড়গড়ের লক্ষণ আমার মধ্যে রয়েছে কিন্তু এই শব্দটির মানে কি? অড়গড়ের লক্ষণ কি? এই বিষয়ে গুরুদেব ভগবানের শ্রীমুখ থেকে সন্ত কবীরের একটা ভজন শুনেছিলাম। ভজনের মধ্যেই এই শব্দের ব্যাখ্যা নিহিত। পদটি এই প্রকার।

অড়গড় মত হ্যায় পূরোঁ কা, ইয়হাঁ নহীঁ কাম অধূরোঁ কা।
সাচ্চা সাফ আমীরী রাস্তা, সাচ্চে সাহিব শূরোঁ কা।
কাচ্চা অরু মটমৈলা রাস্তা, কাচ্চে কায়র কূরোঁ কা।। ইয়হাঁ নহীঁ..
জপ তপ করকে স্বর্গ কামানা, ইয়হ তো কাম মজূরোঁ কা।
দেনা সবকুছ লেনা কুছ নহীঁ, বানা ঝাঁকর ঝূরোঁ কা।। ইয়হাঁ নহীঁ..
বড়া দৈব গদ্দী পর বৈঠা, তব কেয়া ঢোনা ঘূরোঁ কা।
মস্ত হুআ জব অনহদ সুনকর, তব কেয়া সুননা তূরোঁ কা।। ইয়হাঁ নহীঁ..
মুস্কিল অগম পন্থ কা চলনা, ধারা খাঁড়ে ছূরোঁ কা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, অগম পন্থ কোঈ শূরোঁ কা।। ইয়হাঁ নহীঁ..

এর অর্থ হল পূর্ণত্ব প্রাপ্ত মহাপুরুষদের পথ অত্যন্ত কঠিন। চিন্তন-পথ-এর একটি প্রক্রিয়াকে অড়গড় বলে। অড়গড়ের অর্থ হল কঠিন, জটিল। বস্তুতঃ

চিন্তন-পথ অত্যন্ত কঠিন। যারা অর্ধেক মন নিয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাদের জন্য এই পথ নয়। কেবল শূরবীরদের জন্য অড়গড় পথ। এই নয় যে, জপ, তপস্যা করে ভজনের মাঝে স্বর্গীয় সুখের কামনা করে বসলাম। এটা তো ভজন করার পরিবর্তে মজুরি প্রাপ্ত করার সদৃশ হল। তাঁর চরণে সব সমর্পণ করে দাও। নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিলীন হয়ে যায়। এই কণ্টকময় পথে যাঁরা চলেন, তাঁদের ব্রত এটাই। তিনি যেভাবে রাখবেন, সেইভাবেই থাকা উচিত। পরমদেব পরমাত্মা যখন হৃদয়রূপ সিংহাসনে বিরাজমান হন, তখন অন্য কোন বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এ যে অনাহত ধ্বনিত হচ্ছে, যখন তা শ্রুতিগোচর হবে, সাধনা যখন এই পরিমাণ সূক্ষ্ম হবে, সেই অবস্থাতে সেই যোগীর বাহ্য জগতের বাদ্যযন্ত্রের প্রতি রুচি কেন থাকবে? ঈশ্বরের বাণী যিনি শ্রবণ করেছেন, তিনি সাংসারিক ব্যক্তিদের কথাতে কি রস পাবেন? ঈশ্বরের এই মার্গ অগম্য। এটা খুব কঠিন পথ, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট এই পথ। এই পথ হল শুরবীরদের, কাপুরুষদের জন্য নয় এই পথ। অতএব স্নেহবশতঃ, সকলেই শিশুদের নাম রাখেন। কিন্তু সেদিন উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা শ্রবণের পরই নামকরণ করার পিছনে গুরুদেবের অভিপ্রায় কি ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়েছিল।

চিত্রকূটে পূর্ণস্থিতিপ্রাপ্ত মহাত্মা

যখন মহারাজজী স্থিতিলাভ করেছিলেন, তখনকার ঘটনা এটা। অনুসুইয়াতে থাকতে-থাকতে ক্রমশঃ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, গর্ভবাস থেকে তিনি মুক্ত হয়ে গেছেন। যমের বাঁধন কেটে গেছে, ঈশ্বর দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে তাতেই বিলীন হয়ে গেছেন, স্বরূপে স্থিতিলাভ করেছেন, অনুভূতি হয়েছিল যে, এই রূপেই থাকতে হবে। এই অনুভবগুলি ক্রমে হচ্ছিল। একদিন হঠাৎ মহারাজজীর মনে এই ভাব উদয় হয়েছিল যে, চিত্রকূটে তো মহাপুরুষদের হাজার-হাজার কুটীর রয়েছে। মহাপুরুষও হাজার-হাজার রয়েছেন কিন্তু ভগবান যে আমাকে চিত্রকূটে বাস করতে বলেছেন, তবে কি স্থিতিপ্রাপ্ত মহাত্মা আরও কেউ আছেন, না কি শুধু আমিই আছি।

যেদিন এই চিন্তা উদয় হয়েছিল, সেই দিনই মহারাজজীর অনুভব হয়েছিল-ভগবান সভাতে সকলকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হয়েছিল, সুসজ্জিত হাতীর পিঠে আরোহণ করিয়ে একটি উত্তম আসনে বসানো

হয়েছিল। তারপর পীলী কুঠীর অখণ্ডানন্দজীকে আহ্বান করা হয়েছিল, তিনিও এসেছিলেন, সামান্য নীচু আসনে বসেছিলেন। তৃতীয়বার জানকীকুণ্ডের রণছোড়দাসকে আহ্বান করা হয়েছিল, তিনিও অখণ্ডানন্দজীর পাশে তার আসন থেকে নীচু অন্য একটি আসনে বসে পড়েছিলেন। ভগবান সম্মতি দিয়েছিলেন যে, এঁরা সাধু। তখন মহারাজজীর খুব সন্তোষ হয়েছিল যে, তাঁকে ছাড়াও চিত্রকূটে উচ্চস্তরের আরও দু'জন সাধু আছেন।

কিছুদিন পর অখণ্ডানন্দজী দেহত্যাগ করেছিলেন। মহারাজজী তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, ''কেউ গাড়ীর ব্যবস্থা কর, আমিও তাঁর পার্থিব দেহে দুটো ফুল অর্পণ করব।'' ধারকুণ্ডী মহারাজজী বলেছিলেন, ''সরকার! সাধুরা তো স্বরূপের সাহায্যে অন্তর্মন থেকে যাতায়াত করেন। তাঁরা স্থূলদেহে যান না।'' মহারাজজী বলেছিলেন ''হো! আমি যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। ডিম বাচ্চাকে বলছে চুঁ-চুঁ কোরো না। ওরে, তিনি উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি আমারই আর একটা রূপ ছিলেন। আমার যাওয়া উচিত।''

রামানন্দজীর সমর্পণ

রামানন্দজী স্বরূপদাসজীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর গুরুদেবই যখন পরমহংস মশাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর শিষ্য কোথায় আর কার কাছে যেত? দু'মাস পর তিনিও মহারাজজীর শরণাগত হয়েছিলেন। মহারাজজী রামানন্দের মধ্যে যোগ্য শিষ্যের লক্ষণ দেখেছিলেন, সেইজন্য তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ''শুধু প্রবৃত্ত থাকো। তিনি ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।'' এলাহাবাদে তুলসীদাসের জন্মভূমি রাজাপুরের নিকট লৌধনাতে তিনি অবস্থান করেছিলেন। মহারাজজী স্বয়ং সেখানে গিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রূপে আজীবন তিনি সেখানেই বাস করেছিলেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার পর তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। এখনও তাঁর আশ্রমে ভক্তদের ভীড় হয়। ভক্তরা কৃপাযাচনা করলে তাঁর কৃপা লাভ করে।

দুধ ভিক্ষা

যখন মহারাজজী স্থায়ীরূপে অনুসুইয়াতে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তখন কখনও-কখনও তীর্থযাত্রীরা মহারাজজীর সমক্ষে এক পয়সা-দু'পয়সা ছুঁড়ে দিত।

মহারাজজী ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পেতেন, এই পয়সা রেখে নাও।” আগে পয়সা স্পর্শ করতে বারণ করেছিলেন, পরে এই এক পয়সা, দু’পয়সাগুলো রেখে নিতে বলেছিলেন। মহারাজজী ইষ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন হাজার-হাজার টাকা পাচ্ছিলাম তখন তো নিতে দেননি, আজ দু’পয়সার জন্য আদেশ দিচ্ছেন, রেখে নাও, এরকম কেন? তখন ভগবান বলেছিলেন, এটা দুধ ভিক্ষা কোন কামনা করে এই দান করা হয়নি।। যারা এক’শ টাকা, পঞ্চাশ টাকা করে দান করে, তারা সেই টাকার পরিবর্তে হাতী কামনা করে। তাদের দান “হাতী শ্বান লেওয়া দেই” অর্থাৎ কুকুর অর্পিত করে পরিবর্তে হাতী পেতে চায়। এক পয়সা, দু’পয়সা স্বভাববশতঃ দান করা হয়েছে। এগুলো নিলে দোষ হবে না। মহারাজজী বলতেন, “হো! আমার ক্ষেত্রের ব্যাপার দান করা। সত্যিকার দানী আমি, মোক্ষ প্রদান করি।”

সাধকদের রক্ষণাবেক্ষণা

মহারাজজী সাধকদের সেইভাবেই তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করতেন, যেভাবে মাতা-পিতা বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তার দেখাশুনো করেন। সাধক যেখানেই যেতেন মহারাজজী তার সঙ্কল্প জানতে পারতেন। সাধকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যখনই চিত্ত চাঞ্চল্যের সঙ্কেত দিত মহারাজজী তাঁকে সামলাতেন। যখনই সেই সাধক ফিরে আসতেন, তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করতেন যে, পথে সেই সময় কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

একবার তিনি এক প্রতিভাশালী সাধককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কেন রে! পথে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছিলি?” সাধকটি তাঁকে বলেছিলেন “যখন আমি জানকী কুণ্ডে ছিলাম, একটি স্ত্রীলোক সেখানে যাতায়াত করত। সেই স্ত্রী লোকটির সঙ্গেই পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিল।” মহারাজজী ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আর তুমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলে। আরও কিছু ভর্ৎসনা করেছিলেন। এইরকমভাবে তিরস্কৃত হওয়ার পর মাসের পর মাস বুদ্ধি ঠিক থাকত। ভজনে মন বসত এবং মহারাজজীর ভয় সবসময় লেগে থাকত।

অনুসুইয়াতে মন্দাকিনী নদীর ওপারে সকাল প্রায় আটটা-ন’টার সময় ঢোল সদৃশ চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র বিশেষের একসুরে বাঁধা ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়েছিল, সেই সঙ্গে মহিলাদের সমবেত কণ্ঠস্বরও শ্রুতিগোচর হয়েছিল, তারা সকলেই গান গাইছিল।

জঙ্গলে গান-বাজনা নতুন ব্যাপার ছিল। একজন সাধকের কৌতূহল জেগেছিল যে, কি ব্যাপার? তিনি পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছু দেখতে পাননি, গাছের জন্য আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি সিঁড়ির পাশে যে উঁচু পাথর ছিল, সেটার উপর চেপে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখতে পাননি, তখন পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে গোড়ালী উঁচু করে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর যখনই পিছন ফিরে দেখেছিলেন, মহারাজজীকে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই চেয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে ভজনাতে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেমরিয়া গ্রাম থেকে জমুনা পাণ্ডে মহারাজজীর দর্শন করার জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি আশ্রমের ভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজজীর শ্রীচরণে পুষ্প অর্পিত করে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। মহারাজজী তাঁকে বসতে বলেছিলেন। পাণ্ডেজী বলেছিলেন যে, ব্রহ্মচারী মশাইয়ের দর্শন করে নিই। মহারাজজী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেছিলেন, ‘‘কে ব্রহ্মচারী মশাই? ইনি ব্রহ্মচারী। তোমার ব্রহ্মচারী মশাই স্ত্রীলোকদের দেখছিলেন।’’ পাণ্ডে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্রহ্মচারীমশাই তখন বলেছিলেন, ‘‘আমি তো জানি না কখন মহিলাদের দেখছিলাম।’’ মহারাজজী ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, ‘‘এখন বলছ জানি না। যখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওনি তখন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গোড়ালী উঁচু করে দেখছিলে কি না? সাধকের মন সাধনা ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। সাধককে সর্বদা চিন্তনে রত থাকা উচিত।’’ এইপ্রকার অনেক কটূক্তি করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর মন সর্বদার জন্য সাবধান হয়ে গিয়েছিল। যাকে তিরস্কার করতেন, শুধু তারই নয়, অন্য যে-ই শুনত তারও বুদ্ধি নির্মল হয়ে যেত।

গুরু কুম্হার সিষ কুম্ভ হ্যায়, গঢ়ি গঢ়ি কাঢ়ে খোট।
অন্তর হাথ সহার দে, বাহর মারে চোট।। (কবীর)

কুম্ভকারের ন্যায় গুরু মহারাজের তাড়না শুধু মুখেই ছিল। অন্তর থেকে তিনি শিষ্যদের প্রতি অত্যন্ত কোমল ছিলেন। অন্তর থেকে তিনি সাধকদের পূর্ণরূপে সাহায্য করতেন। কিন্তু তাদের কল্যাণের জন্য এইভাবেই গড়তেন, কটূ কথা বলতেন, কখনও গালির মত তাড়না দিতেন। কখনও আদর করে সাধনা পথ প্রশস্ত করে দিতেন।

অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা

ভক্ত যেখানেই থাক, মহারাজজী তার মনের কথা জানতে পারতেন, তাদের পরিস্থিতি কিরূপ মহারাজজী উঠা-বসা, চলাফেরা করতে-করতে জেনে নিতেন।

অনুসুইয়াতে যখন তিনি স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছিলেন তখন থেকেই কিছু-কিছু তীর্থযাত্রী চিত্রকূট থেকে ঘোড়ায় চেপে তাঁর কাছে আসতে শুরু করেছিল। আশ্রমে পৌঁছাতে-পৌঁছাতে তাদের বিকেল হয়ে যেত। কোন-কোনদিন তীর্থযাত্রীরা সৎসঙ্গ শ্রবণ করে রাত্রিতে সেখানেই বিশ্রাম করার জন্য থেকে যেতেন। যে ঘোড়ায় চেপে যেতেন তাকে চরে বেড়ানোর জন্য জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হত। মহারাজজী কখনও-কখনও চমকে বলতেন, "দেখ! আমার কাছে বসে থেকো না, গিয়ে দেখ বাঘ ওত পেতে বসে আছে। বাঘটা আশ্রম থেকে পনেরো কুড়ি হাত দূরেই আছে।" ঘোড়াটিকে যেখানে চরে বেড়ানোর জন্য ছাড়া হত, সেখানে গিয়ে তীর্থযাত্রীরা দেখত, যে, বাঘ সত্যি ওত পেতে রয়েছে। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কোন রকমে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে আসত এবং আশ্রমের সম্মুখেই বেঁধে দিত।

একবার এই প্রকারই আশ্রমের সম্মুখে ঘোড়া বাঁধা ছিল। সকলেই বিশ্রাম করছিল। রাত বারোটার সময় মহারাজজী হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উঠে বসেছিলেন, চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন যে, কে বিপদে পড়েছে। তিনি টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিলেন ঘোড়া এবং বাঘ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহারাজজী সকলকে ডেকে তুলেছিলেন। যার ঘোড়া ছিল সেও উঠে বসেছিল। মহারাজজী বলেছিলেন, "ঘুমিও না। দেখ তোমার ঘোড়াটিকে বাঘ নিয়ে গেল।" সে বলেছিল, "মহারাজজী! এখন আমি কি করি?" মহারাজজী বলেছিলেন, গোলমাল তো কর। গোলমাল শুনে বাঘটা ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছিল। তারপর সারারাত জেগে সে ঘোড়াটিকে পাহারা দিয়েছিল। কারণ বাঘটি ঝোপের কাছেই লুকিয়েছিল। মহারাজজী প্রতি মুহূর্তের খবর জানতে পারতেন যে, কোথায় কি ঘটবে সেই অনুসারেই নির্দেশ দিতেন।

ব্রহ্মচারী বাঁদর

বাঁদর প্রজাতি স্বভাবতই কামী। রামচরিত মানসের একটি পঙ্ক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে- **ম্যায় পাবঁর পসু কপি অতি কামী। (মানস ৪।২০।৩)** অনুসুইয়ার ব্রহ্মচারী বানর এর অপবাদ ছিল। বসন্তকালের আগমন হলে বাঁদর এবং বাঁদরীদের জোড়া জঙ্গলে যত্র-তত্র আমোদ-প্রমোদে রত হয়ে যেত; কিন্তু এই বাঁদরটা তাদের থেকে দূরে থাকত, আশ্রমের সম্মুখের একটা গাছের উপর চুপ করে বসে থাকত।

সকালবেলা পাহাড় থেকে নেমে মহারাজজীর সম্মুখে খুঁটির কাছে এসে বসে যেত। বাঁদর চঞ্চল স্বভাবের হয়, কিন্তু সে এক আসনে বসে থাকত। একটুও নড়াচড়া করত না। কিছুক্ষণ পর-পর অল্প চোখ খুলে দেখে নিত যে, মহারাজজী বসে রয়েছেন অথবা উঠে গেছেন। যখন মহারাজজী চিমটা দিয়ে ধুনীর আগুন নাড়া-চাড়া করতেন, তখন বাঁদরটাও এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করত। মহারাজজী তাকে উৎসাহ দিতেন-"ঠিক-ঠিক বাছা! ভজনে এইভাবেই লেগে থাক।"

মহারাজজী সেই বাঁদরটাকে ভজন করতে দেখে খুব খুশী হতেন। বাঁদরটির জন্য তিনি আটার মধ্যে ভুষি মিশিয়ে একটা মোটা রুটি তৈরী করাতেন এবং ভজনের পর তাকে সেই রুটি খেতে দিতেন। সে উঠে দাঁড়িয়ে রুটি নিত। তারপর পাহাড়ের উপর চেপে সেখানে বসে রুটি খেত। পরের দিন সকালে পুনরায় আশ্রমে উপস্থিত হত।

একদিন মহারাজজী বাঁদরটার উপর অপ্রসন্ন হয়ে তাকে বলেছিলেন, "আমি তোর চাকর, যে দশ মাইল দূর থেকে আটা আনিয়ে তোকে খাওয়াব? যখন ব্রহ্মচারী হয়েছিস, সাধু হয়েছিস তখন নিজের খাবারের ব্যবস্থা করে নে। আর এখান থেকে খাবার দেওয়া হবে না। মহারাজজী কপট রাগ দেখিয়ে খুব ধমক দিয়েছিলেন।"

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেবীদয়াল কুর্মী নামে এক জমিদার একমন ছোলা নিয়ে আশ্রমে এসেছিল। মহারাজজী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি ব্যাপার জমিদার! এত সকাল-সকাল কি মনে করে?" সে তাঁর কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল মহারাজজী! এখানে কোন ব্রহ্মচারী বানর আছে কি? মহারাজজী বলেছিলেন, "আছে কিন্তু তুমি কি করে জানলে?" সে বলেছিল, "মহারাজজী! রাত্রি প্রায় দুটো নাগাদ এমন মনে হয়েছিল যেন কেউ আমাকে জাগানোর জন্য ধরে ঝাঁকাচ্ছে। কিছু-কিছু কথাও কানে এসেছিল-ঘুমাচ্ছ কেন? চলো ওঠ; আমি অনুসুইয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারী বানর। আমার জন্য ছোলা নিয়ে চল, আমি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখেছিলাম যে, কে আমাকে ঝাঁকাচ্ছিল। আমি কে-কে বলে হাঁকও দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলাম। ততক্ষণে কেউ আমাকে এক চাপড় মেরেছিল। তার সঙ্গে এই কথাগুলিও বলেছিল-এখনও ঘুমাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ না। আমি ঘুম থেকে উঠে বসে বিচার করেছিলাম যে, আবার যদি ঘুমাই, বাঁদরটা গলা না টিপে ধরে। তারপর আদেশ পালন করার জন্য ছোলা নিয়ে আশ্রমে

আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। বাঁদরটা কোথায়?”

মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, “বোস। তার আসার সময় হয়ে গেছে।”তিনি একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁদরটা পাহাড় থেকে নেমে মহারাজজীর সমক্ষে এসে বসেছিল। মহারাজজী তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, “এই হল ব্রহ্মচারী বানর। কাল আমি একে বকেছিলাম যে, তুমি যখন সাধু, তখন নিজের খাবারের ব্যবস্থা করে নাও, বাঁদর যোনিতে জন্ম হলে কি হবে, এর আচরণ একদম সাধুদের মতো। সেইজন্য তোমার হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার হয়েছিল। এ হল ব্রহ্মচারী। আচ্ছা বাবা ব্রহ্মচারী! আর কাউকে জাগানোর দরকার নেই। তুমি শুধু ভজনা কর, খাবার পাবে। তুমি সত্যিকারের সাধু।” তা সত্ত্বেও সেই জমিদার ভক্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার বাঁদরদের জন্য ছোলা নিয়ে আসতেন।

সেই বাঁদরটার ব্রহ্মচারী মশাইয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। যখন তিনি ধারকুণ্ডীতে গিয়ে বাস করার আদেশ পেয়েছিলেন, তখন সেই বাঁদরটাকে ধারকুণ্ডীতে দেখতে পাওয়া গেছিল। যদিও আশ্রম থেকে ধারকুণ্ডীর দূরত্ব যাট কিলোমিটার। স্বামীজী তাকে দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন, তাকে বলেছিলেন, “আরে ব্রহ্মচারী! মহারাজজী আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাই তুইও চলে এলি। ঠিক আছে তুইও এখানেই থাক।” তিনদিন পর্যন্ত সে ধারকুণ্ডীতেই ছিল, কিন্তু বিরক্তদের মত সম্ভবতঃ নিরাধার বিচরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। এই প্রকার যে জীবই মহাপুরুষের স্পর্শ অথবা সান্নিধ্য লাভ করে অথবা মহাপুরুষই যার প্রতি দয়ালু হন, সেও পুণ্যাত্মা হয়ে যায়।

গীতা যোগাড়

মহারাজজীর শরণাগত হওয়ার পর ধর্মগ্রন্থ রূপে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা এবং রামচরিত মানস গ্রন্থের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। রামচরিত মানস গ্রন্থটি আশ্রমে ছিল, কিন্তু ভগবদ্‌গীতা ছিল না। গীতাশাস্ত্রে সাধকদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, বলা হয়েছে, মহারাজজীও সেই অনুসারেই আচরণ করার উপর জোর দিতেন। এর ফলে গীতাশাস্ত্রের প্রতি আমার অনুরাগ আকুলি বিকুলিতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় গীতা প্রেসের গীতাশাস্ত্র আড়াই টাকাতে বিক্রি হত। মনে বাসনা জেগেছিল যে, অন্ততঃ তিন টাকা যদি পেতাম, তাহলে গীতাশাস্ত্র কিনে নিতাম। আট-আনা তখনকার দিনে গাড়ি ভাড়ার জন্য পর্যাপ্ত

ছিল। ইচ্ছা প্রবল হচ্ছিল কিন্তু তিন টাকার যোগাড় আর হচ্ছিল না। যাচনা করা স্বভাবে ছিল না। যাঁরা মহারাজজীকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁরা শ্রদ্ধাবশতঃ কিছু-কিছু পয়সা মহারাজজীর শ্রীচরণে অর্পিত করতেন, সেগুলি তুলে রাখার ভার আমার উপরই ছিল কিন্তু নিজের জন্য সে পয়সা খরচ করা, এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। গীতাশাস্ত্রের জন্য আমার আকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, এইভাবে আড়াই বছর পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আড়াই টাকা যোগাড় আর হয়নি। একদিন আমি চিন্তা করেছিলাম যে, আমি একি যোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ভজনের জন্য কি গ্রন্থ অনিবার্য। এই মুহূর্ত থেকে আমার গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এই নিশ্চয় করার সঙ্গে-সঙ্গে মন শান্ত হয়ে গিয়েছিল। খুব হাল্কা বোধ হচ্ছিল। সেদিন চিত্ত ভজনে একাগ্র হয়েছিল, ধ্যান প্রগাঢ়ভাবে হয়েছিল, সেইজন্য মন প্রসন্ন ছিল। পরের দিন নিত্যক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে মহারাজজীর সেবাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি যেখানে বসেছিলেন, পাশেই একটি কুঠুরী ছিল, সেই কুঠুরীর দরজায় গীতাশাস্ত্র রাখা ছিল, দৃষ্টি পড়া মাত্র আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিয়েছিলাম। গীতাশাস্ত্রই ছিল, যেটা পাবার জন্য আমি আগ্রহী ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''মহারাজজী! এই গীতাশাস্ত্রটি কার?'' তিনি বলেছিলেন ''মূর্খের মত কি কথা বলছ, এটা তো তোমারই। তুমিই তো পাঠ কর, এখানে আর কে আছে যে পাঠ করে? এর বুদ্ধি দেখ! আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, গীতাশাস্ত্রটি কার।'' আমি গুরুদেবকে প্রণাম করেছিলাম এবং তিনি যোগাড় করে দিয়েছিলেন, সেইজন্য মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম। গীতাশাস্ত্র পাবার সঙ্কল্প মন থেকে তাড়ানোর পরই কোত্থেকে, কে এনে সেখানে রেখে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সঙ্কল্পের বিষয়ে জানার মহারাজজীর ক্ষমতা এবং সেই অনুসারে যোগাড় যা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সাধকের সম্বল।

সাধকদের বৈরাগ্য

মহারাজজীর সেবাতে অনুরক্ত সাধকদের মধ্যে ব্রহ্মচারী মশাই সকলের থেকে বেশী উন্নত অবস্থাযুক্ত ছিলেন, ভজনা এবং সেবা দুটিতেই তাঁর স্থিতি ভাল ছিল। মহারাজজী সাধকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিরন্তর যত্নশীল থাকতেন। একদিন তিন-চারজন সাধক মহারাজজীর সম্মুখে বসেছিলেন। বৈরাগ্যের বিষয়ে চর্চা হচ্ছিল। মহারাজজীর শব্দ কোষে বৈরাগ্যের অর্থ ত্যাগ

ছিল না। সাধনা কাকে বলে যখন সাধক জানতে পারে, তখন অহর্নিশ সাধনাতে রত থাকতে চায় কিন্তু সামাজিক ব্যবহার, শিষ্টাচার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটা বেশী বাসন থাকলে সেগুলির মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগাটা স্বাভাবিক। অতএব শান্তিতে একা নির্দ্বন্দ্ব বিচরণ করতে-করতে চিন্তনে রাত-দিন এক করার বৃত্তিকেই বৈরাগ্য বলে। শিথিল প্রযত্নশীল সাধকদের প্রতি মহারাজজী ক্ষুণ্ণ ছিলেন। তাদের সাধনপথে চলার জন্য সর্বদা সচেতন করতেন।

একবার রাত্রিতে উপদেশ চলাকালে হঠাৎ একটা প্রকাশ পুঞ্জ আকাশ থেকে নেমে মন্দাকিনী নদীতে প্রবেশ করেছিল। সকলে চেয়ে সেই দিকেই দেখছিল, পুনরায় দেখতে-দেখতে সেই প্রকাশপুঞ্জ উপরে উঠেছিল এবং আকাশে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সকলেই এরূপ দর্শনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী তাদের বলেছিলেন, ‘‘দেখলে এই প্রকাশ।’’ ব্রহ্মচারীমশাই বলেছিলেন, ‘‘হ্যাঁ মহারাজজী! এতে তো গোটা জঙ্গল প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, কি ছিল?’’ মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘ভগবান শুভ সঙ্কেত দিচ্ছেন, তোমার ঈশ্বরীয় প্রকাশ কৈবল্যধামের প্রাপ্তি হবে। এর জন্য ভক্তি জাগা আবশ্যক। কিন্তু বিরহ-বৈরাগ্য বিনা এর প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এই প্রকাশপুঞ্জ দ্বারা ভগবান এই সঙ্কেতই দিলেন।’’

সৎসঙ্গ-এর মাঝেই হঠাৎ ব্রহ্মচারী মশাইয়ের ছড়িটি পড়ে গিয়েছিল এবং তার পাশে যে কমণ্ডলু রাখা ছিল সেটা গড়াতে-গড়াতে মন্দাকিনী নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘দেখলে, কর্মরূপী কমণ্ডলু এবং বৈরাগ্যরূপী লাঠি, তোমার মধ্যে বৈরাগ্যের অভাব রয়েছে এবং ভক্তিও কাঁচা অবস্থাতে রয়েছে। কর্মে দৃঢ়তা নেই, এটাকে তোলো।’’ ব্রহ্মচারীমশাই নিবেদন করেছিলেন ‘‘মহারাজজী! এটা তোলা সম্ভব কি রূপে?’’ মহারাজজী নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘‘নিরাধার বিচরণ করতে-করতে নিরন্তর চিন্তনে নিযুক্ত হও।’’ সৎসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্মচারী মশাই এ বিষয়ে বিচার করেছিলেন যে নিরাধার বিচরণ করবেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীমশাইয়ের সেবাতে প্রীতি ছিল, সেইজন্য এক-একটা করে দিন পার হচ্ছিল। বাইরে বেরোনো হচ্ছিল না।

এই উপদেশের কিছুদিন পর এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা ব্রহ্মচারীমশাইয়ের বিচরণের নিমিত্ত হয়েছিল। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, ব্রহ্মচারীমশাই রন্ধনকার্য সম্পূর্ণ করার পর একজন মহাত্মা মহারাজজীর দর্শন করার জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। মহারাজজী

কুশল সংবাদ নিয়ে সেই মহাত্মার জন্যও খাবার প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছিলেন। অসময়ে সাধু অতিথির আশ্রমে আসাটা ব্রহ্মচারী মশাইয়ের ভালো লাগেনি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, 'মহারাজজী! এটা তীর্থস্থান। সাধু-মহাত্মা তো এখানে সর্বদাই আসেন। এঁকে আটা ডাল দিয়ে দিচ্ছি, ইনি নিজের খাবার তৈরী করে নেবেন। যদি আমি সব সময় খাবারই প্রস্তুত করি, তবে ভজনা কখন করব?' মহারাজজী তাঁর কথা শুনে বলেছিলেন, ''এক কাজ কর, আমার খাবার এঁকে খাইয়ে দাও, আমার ক্ষিদে নেই থাক, আর রান্না করতে হবে না।''

স্বামীজীকে এবার বাধ্য হয়ে খাবার প্রস্তুত করতে হয়েছিল। মহারাজজীর সঙ্গে সাধুটিকে বিধিসম্মতভাবে ভোজন করিয়ে যখন তিনি থালাতে খাবার নিয়ে খেতে বসেছিলেন, তখন মহারাজজী রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর কাছ থেকে থালা সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাঁর ঘাড় ধরে বলেছিলেন, ''বাবার জিনিষ পেয়েছ? যাও এখান থেকে। বলে কিনা ভজন করব কখন। যাও কর ভজনা।''

স্বামীজী নীচে নেমে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন। যতবারই তিনি উপরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ততবারই মহারাজজী বলেছিলেন, উপরে এলে হাত-পা ভেঙ্গে দেব। তুই আমাকে চিনিস না। তুই মনে-মনে ভাবিস আমি সেবা করি, তোর ভরসাতে আমি বসে থাকি।'' এইভাবেই হুমকি শুনতে শুনতে-শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজীর রাগ কিছুতেই কম হচ্ছিল না। স্বামীজী ভেবেছিলেন, ইনি উপরে যেতে দিচ্ছেন না, কি করি? ভজনই তো করব। নাম, রূপ, ব্রহ্ম বিদ্যা, অনুভব সবকিছুই তো জানা আছে, ভজনা অন্য কোথাও গিয়ে করব। এই ভেবে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

সেই সময় আশ্রমের ভক্ত যমুনা পাণ্ডে সেই পথ দিয়েই আসছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী মশাইকে প্রণাম করেছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীমশাই তাঁর প্রণামের কোন জবাব দেননি। পাণ্ডে মহারাজজীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন, ''আজ স্বামীজীকে খুব উদাস দেখলাম, কি ব্যাপার?'' মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, ''ও আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছে।'' সেই ভক্তটি হাঁক দিয়েছিলেন, ''ব্রহ্মচারী মশাই! ফিরে আসুন।'' স্বামীজী যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, মহারাজজী গর্জে উঠেছিলেন, ''ফিরে আসবে না, এবার ভজনা করবে যাও।''

জঙ্গলে হাঁটতে-হাঁটতে ব্রহ্মচারী মশাইয়ের রাত হয়ে গিয়েছিল। একটা

পাহাড়ী নালার ধারে গ্রামের লোকেরা একটা শবের দাহ সংস্কার করছিল। তখন শীত ঋতু ছিল। ব্রহ্মচারী মশাই ভেবেছিলেন, এরা যখন চলে যাবে, তখন আমি এখানেই আগুন পোহাব। তারা চলে যাবার পর তিনি চিতার সম্মুখে বসেছিলেন। মধ্যরাত্রিতে তাঁর খেয়াল হয়েছিল যে, এই চিতাতেই শবদাহ করা হয়েছে সে ভূত না হয়ে যায় ধীরে-ধীরে তাঁর মনে হতে শুরু করেছিল যে, সে ভূত হয়ে উপদ্রব করতে পারে। অতএব তিনি মনে-প্রাণে মহারাজজীকে ডেকেছিলেন।

দেখতে-দেখতে একটা দৃশ্যের মত মহারাজজীর রূপ পৌঁছে তাঁকে বলেছিল, ‘‘আমি যখন তোমার সঙ্গেই রয়েছি, আগে-পিছনে, চারিদিক থেকে তোমাকে দেখছি, তখন কোন ভূতকে ভয় পাচ্ছ।’’ ব্রহ্মচারী মশাই আশ্বস্ত হয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং সেখানেই বিশ্রাম করেছিলেন। সকালবেলা সেখান থেকে গিয়েছিলেন। ভয় চিরকালের জন্য চলে গিয়েছিল। গুরু সর্বদা সাধকের সঙ্গে থাকেন।

মহারাজজী তাঁর সাধনারত জীবন সম্বন্ধে শুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। দেড় বছর পর হঠাৎ এক রাজমাতা তাঁকে সঙ্গে করে গাড়িতে প্রয়াগে তীর্থ করাতে শুরু করেছিলেন। ভদ্রমহিলা খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এদিকে মহারাজজী খুব অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। সেইসময় তিনি ব্রহ্মচারীমশাইয়ের সম্বন্ধে এরূপ বলতে শুরু করেছিলেন যে, এখন পর্যন্ত তো তার বৈরাগ্যের স্থিতি খুব ভালো ছিল, কিন্তু এরপর গোলমাল হতে পারে। এখন আশ্রমে ফিরে আসাতেই তার সবদিক থেকে মঙ্গল।

ওদিকে শ্রী ব্রহ্মচারীমশাইও আশ্রমে ফিরে যাবার সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। তিনিও মনস্থির করেছিলেন যে, স্থিতি লাভ করার পরই আশ্রমে ফিরবেন। সেইজন্য তিনি তখন আশ্রমে ফিরতে চাইছিলেন না। তিনি অনুভবে দেখেছিলেন ইষ্টের তার প্রতি আদেশ তুই ভাবছিস আমি সাধনা করছি, কিন্তু তোর সাধনা নষ্ট হতে বসেছে। এক্ষুণি আশ্রমে ফিরে গুরু মহারাজজীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ক্ষমা চা। এইরূপ অনুভবের পর তাঁর মনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোথাকার রাজা আর কোথাকার রানী। ব্রহ্মচারীমশাই রাত্রির ট্রেনেই আশ্রমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আশ্রমে মহারাজজী ভক্তদের বলছিলেন, ‘‘হো! আজ আমি অনুভবে দেখলাম যে, সচ্চিদানন্দর নাকে দড়ি বেঁধে ঠিক ঘুড়ির মত সুতো গুটিয়ে তাকে এখানে এনে ফেলেছি। সে আসতে চাইছিল না কিন্তু আমি তাকে টেনে এনেছি। এক্ষুণি এল বলে। সকলেই তাঁর আসার অপেক্ষাতে ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই

ব্রহ্মচারীজী পৌঁছেছিলেন। মহারাজজী মনে-মনে চাইছিলেন যে, এক্ষুণি যেন এসে পড়ে, কিন্তু তাঁকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে মুখে বলেছিলেন, ‘‘হো! দেখ, ইনি ফিরে এলেন। কোথাও দুটো রুটি জুটছিল না ব্রহ্মচারীমশাই দণ্ডবৎ প্রণাম করে বসেছিলেন তিনি ভাবছিলেন, গুরু মহারাজজীর কাছে ক্ষমা যাচনা করবেন কিন্তু তিনি প্রণাম করার সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজজী প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কুশল সংসাদ নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘কেমন বৈরাগ্য করে এলে?’’

মা শিশুকে শাসন করে, দু’চার ঘা দেয়, কিন্তু তার চোট লাগে না। গুরু মহারাজজীর স্বভাবও ঠিক এমনিই ছিল তিনি সাধককে তার বিকাশের জন্যই তাড়না দিতেন।

সাধকদের যোগক্ষেম

বিচরণ অনুষ্ঠান তখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। ব্রহ্মচারী মশাই ভজনাতে অহর্নিশ প্রবৃত্ত থাকতে শুরু করেছিলেন। তবুও তাঁর মনে সন্তোষ ছিল না। তিনি সর্বদা ভজনে লীন থাকতে চাইতেন। নতুন কয়েকজন সাধক আশ্রমে প্রবেশ পেয়েছিলেন। তারা সেবাকার্য সুচারুরূপে করছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মচারীমশাইয়ের জন্য কোন সেবাকার্য ছিল না। নির্জনে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রম থেকে কিছুটা দূরে ভজন কুটীরের নির্মাণ করেছিলেন। এই জায়গাটি ঘন জঙ্গলের ভিতরে ছিল। আশেপাশে বাঘ-সিংহ-এর আনাগোনা ছিল। কুটীর তৈরী হবার পর ব্রহ্মচারীমশাই নিবেদন করেছিলেন, ‘‘মহারাজজী আপনি আজ্ঞা দিলে নির্জনে ভজনা করতাম, যখন আদেশ দেবেন, সেবাতে উপস্থিত হব।’’

মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘আমি জানি, দিনের বেলা তোমরা কোথায় যাও? কুটীর নির্মাণ করছ জানি, এটা উচিতও। এইপ্রকারই একাগ্রচিত্তে ভজনাতে অনুরক্ত হওয়া উচিত। ঠিক আছে, ওখানেই ভজনা কর। কিন্তু অন্তর্দেশ থেকে যে-যে আদেশ পাবে, প্রত্যেকটা পালন করবে।’’ ব্রহ্মচারীজী সেই নিভৃতে অনবরত চিন্তনে লীন হয়েছিলেন। যদিও কুটীরে পর্যাপ্ত মাত্রাতে খাদ্য সামগ্রী রাখা থাকত তবুও তিনি শুধু ছাতু গুলে সেটা পান করে নিতেন। দিবারাত্রি একাকী ভজন-চিন্তন-এ তন্ময় হয়ে থাকতেন।

কুটীরের সম্মুখে তিনি আট-দশ ফিট উঁচু কাঠের মাচান তৈরী করেছিলেন। গ্রীষ্মকালে খোলা আকাশের নীচে সেই স্থান শীতল এবং রাত্রিতে ভজনা করার

জন্য উপযুক্ত ছিল। তিনি নিয়মিত রূপে রাত্রি দশটা থেকে বিশ্রাম করতেন এবং রাত্রি দুটোর সময় উঠে চিন্তনে বসতেন। পূজ্য গুরুদেব এই নির্দেশই দিয়েছিলেন।

একরাত্রিতে তিনি বারবার বিপদের সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। অন্তর্জগত থেকে নির্দেশ পাচ্ছিলেন, ঘুমিয়ো না। অতএব তিনি জেগে বসেছিলেন। অর্ধরাত্রি ব্যতীত হয়ে গিয়েছিল। তারার স্থিতি দেখে তিনি অনুমান করেছিলেন যে রাত্রি দুটোর কাছাকাছি হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে, ঘুমাবেন না শুধু কোমর একটু সোজা করে নিই এই ভেবে যেই পা সোজা করেছিলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল, কেউ যেন তাঁর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর বিপদের সঙ্কেত পেয়েছিলেন। উঠে বসেই নীচে কালো কিছু একটা চোখে পড়েছিল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখেছিলেন একটা গুলবাঘ আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে। টর্চের আলো তার উপরে পড়া মাত্র সে ঘুরে ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বামীজীকে লক্ষ্য করেছিল। তারপর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

গুরুদেব ভগবান এইভাবেই নিজের ভক্তদের রক্ষা করতেন, ভক্ত ঘুমিয়ে পড়লেও প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তিনি সব জায়গায় সাধককে রক্ষা করার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন, নির্দেশ দেন। আদেশ অবহেলা করলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অজ্ঞ সাধককেও গুরুদেব শেষপর্যন্ত রক্ষা করেন।

ধারকুণ্ডী যাবার নির্দেশ

স্বামীজী সত্যানুসন্ধানী ছিলেন সেইজন্য পূজ্য গুরুদেব তাঁর নামকরণ সচ্চিদানন্দ করেছিলেন। যথা নাম তথা গুণ-এর পরিভাষা চরিতার্থ হয়েছিল। একদিন মহারাজজী অনুভব দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, লেবু দু-খণ্ড হয়ে গেছে। তিনি ব্রহ্মচারীমশাইকে বলেছিলেন, ‘‘দেখ, নির্গুণ ব্রহ্ম দু’জায়গাতেই সমানভাবে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। তুমি সমস্ত কিছু লাভ করেছ, ভবসাগর অতিক্রম করেছ। এখন তোমার বুকের পাটা থাকলে ধারকুণ্ডীতে গিয়ে থাকো।’’ ব্রহ্মচারীজী বলেছিলেন, ‘‘বুকের পাটার জোরে তো নয়, কিন্তু আপনার কৃপার জোরে আমি ধারকুণ্ডী যেতে পারি।’’ গুরু মহারাজজীর অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচারীজী ধারকুণ্ডী পৌঁছেছিলেন। সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ঈশ্বরীয় বিভূতি স্বামীজীর হৃদয় দেশ-এ প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি আত্মসাক্ষাৎ করেছিলেন। ধারকুণ্ডীর পবিত্র আশ্রম থেকে জনকল্যাণ-এর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়েছিল।

পশু-পাখিদের মানবদেহ লাভ

পরিভ্রমণকালে আমি যখন গাজীপুরে ছিলাম এক পাহাড়ী কুকুর বাচ্চা দিয়েছিল। স্বামী ভগবানানন্দজী কুকুর বাচ্চাটাকে ঝোলাতে পুরেছিলেন এবং সেটাকে নিয়ে গিয়ে মহারাজজীর সমক্ষে প্রস্তুত করেছিলেন। কালো রং-এর চীন দেশীয় কুকুরের মত তার সামনের পা দুটোর উচ্চতা চার-পাঁচ ইঞ্চি এবং পিছনের পা দুটো ছয়-সাত ইঞ্চির মত প্রায় ছিল। উচ্চতা ছিল এক ফুট, কিন্তু লম্বা প্রায় আড়াই থেকে পৌনে তিনফুট পর্যন্ত ছিল। দেখতে খুব সুন্দর ছিল, স্বভাবও খুব তেজী ছিল। দেশী কুকুর দেখতে পেলেই সোজা গিয়ে জড়িয়ে ধরত। পা ছোট ছিল সেইজন্য নীচে থাকতে বাধ্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও কাছে হার স্বীকার করতে হয়নি তাকে। লড়াই করতে ভালবাসত। বোঝার শক্তি পর্যাপ্ত ছিল। মহারাজজী কখনও তাকে আসনে বসিয়ে নিতেন, কখনও নীচেই তার আসন রেখে দেওয়া হত।

দুধপান করার প্রতি খুব উদাসীন ছিল। যখন কোনভাবেই পান করতে চাইত না, তখন মঙ্গলদাদা সেই উচ্ছিষ্ট দুধ পান করে নিতেন এবং বলতেন-হো স্বামীজী! চিনি দিতে থাকুন, এ তো পান করবে না, এটা আমার ভাগের দুধ। মঙ্গলদাদার কাছে এঁটো, শুদ্ধ সব এক ছিল। মহারাজজী বলতেন-‘‘দেখ! কুকুরের এঁটো পান করছে।’’ তিনি বলতেন-‘‘এবার তো প্রসাদ হয়ে গেল মহারাজজী।’’

মহারাজজী কুকুরটার নাম ভৈরব দিয়েছিলেন। সে রোজ বাঘের গুহা থেকে টাটকা হাড় নিয়ে আসত এবং আশ্রম থেকে অল্প দূরে বসে সেগুলো আস্বাদন করত। মহারাজজী ভাবছিলেন যে, ভৈরবকে রাত বারোটার পর দেখা যায় না, সে কোথায় যায়? রাত দুটোয় কোত্থেকে ফিরে আসে। তিনি জানতে পেরেছিলেন টাটকা হাড় নিয়ে আসে। বাঘের গুহা আশ্রমের কাছেই ছিল। ভৈরবের গতিবিধি দেখে মহারাজজী চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-‘‘মনে হচ্ছে একে কোন দিন বাঘ অথবা সিংহ খেয়ে ফেলবে। এ যখন সোজা তাদের গুহাতে চলে যায়, তখন কতদিন একে ছেড়ে দেবে। এ যে সময় যায়, হয়ত তখন গুহাতে থাকে না কিন্তু তারা দু’চারদিন সমানে আরামও তো করে। কি যে বলি, কোনদিন একে বাঘে খেয়ে ফেলবে।’’

মহারাজজী ছড়ি নিয়ে ভৈরবকে বকতেন, ধমক দিতেন, কখনও বোঝাতেন

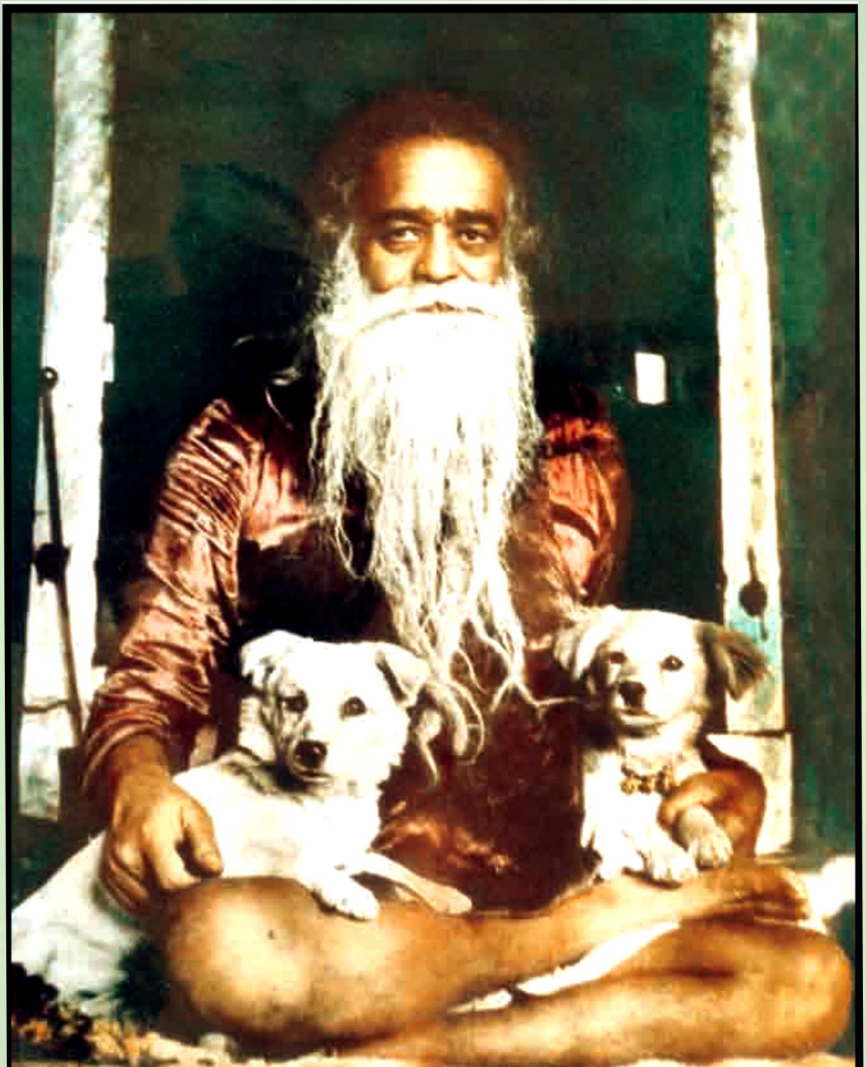

পরমশ্রদ্ধেয় পূজ্য সদ্‌গুরুদেব শ্রী পরমহংসজী মহারাজ

দু'তিনদিন পর্যন্ত সে শাসন মেনে চলত, কোথাও যেত না কিন্তু আবার কোনদিন চোখে ধুলো দিয়ে চলে যেত। এক রাত্রিতে গিয়ে সে সকাল পর্যন্ত ফিরে আসেনি। মহারাজজী বলেছিলেন-"সিংহ তো খেয়ে ফেলেনি। মনে হচ্ছে এখন বেঁচে আছে, ওর শ্বাস চলছে। ভাল করে খোঁজ ওকে।" জঙ্গলে গিয়ে সকলেই তাকে খুঁজেছিল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পায়নি।

আমরা যখন আশ্রম থেকে বাগিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম, ভৈরবকে পথের ধারেই একটা কুটীরে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছিলাম, যেমনি আমরা সেখান থেকে বেরিয়েছিলাম, সে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে তীব্র গতিতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল। সে বলতে চাইছিল যে, আমি হারায়নি, এখানে বসে কর্তব্য পালন করছি। মহারাজজী সব শুনে বলেছিলেন-"এ তো ভাল মাথা খেলিয়েছে। আজ আর একে বকাঝকা করব না। যা হবার হয়েছে, এখনও বুঝুক।"

সে সময় ব্রহ্মচারীমশাই ধারকুণ্ডীতে বাস করতে শুরু করেছিলেন। সেদিন তিনি মহারাজজীকে দর্শন করার জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। ভৈরব বাঘের গুহাতে চলে যায় এই চর্চা হচ্ছিল। আমি বলেছিলাম-ভাল হয় যদি ভৈরবকে ধারকুণ্ডী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজজী এই প্রস্তাবে মৌন ছিলেন। আমি 'মৌন স্বীকার লক্ষনম্' ভেবে ভৈরবকে ধারকুণ্ডী মহারাজজীর যাবার সময় তাঁর জীপ গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম।

গাড়ি কিছু দূর যাবার পর মহারাজজী বলেছিলেন-"কেন রে! তোরা আমার মনোরঞ্জন, শখ দেখতে পারিস না। ও আমার গদিতে বসত। নিজের হাতে দুধ খাওয়াতাম। ওকে কেন দিলি?" আমি বলেছিলাম-ভৈরব বাঘের গুহায় যেত। তিনি শুনে বলেছিলেন-আমি থাকতে তাকে বাঘ খেয়ে ফেলত? বাঘের কবল থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা সচ্চিদানন্দর আছে? যা এবার বাঁচা বাঘের কবল থেকে। আমি ভেবেছিলাম, ধারকুণ্ডীতে থাকলে ভৈরব বাঘের গুহায় যাবে কেন? সেখানে কোথায় গুহা ভৈরব তো জানে না। তারপর এ-বিষয়ে আর কোন কথা হয়নি।

কিছুদিন পর ধারকুণ্ডীতে ত্রিশূল স্থাপনা উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কাছের-দূরের সব জায়গার ভক্তরা একত্রিত হয়েছিল বহু লোকের ভীড় হওয়ার ফলে পরিবেশ কোলাহলে পূর্ণ ছিল। স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে অনেক কুকুরও সেখানে চলে এসেছিল। ভৈরবকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে তারা পালাতে শুরু করেছিল। তার উচ্চতা, আকার অন্য কুকুরদের থেকে ভিন্ন ছিল।

তাকে নিজেদের দিকে আসতে দেখে কুকুরগুলো পালাচ্ছিল। হাজার-হাজার লোকের মাঝে ভৈরব এদিক থেকে ওদিক দ্রুতবেগে ছোটাছুটি করছিল। অন্য কুকুরদের পিছনে ছুটতে-ছুটতে সে জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়েছিল।

বিকালবেলা মহারাজজীর আসার কথা ছিল। যখন তিনি ধারকুণ্ডী থেকে অনুসুইয়া ফিরে যাবার জন্য বেরোচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ভৈরব কোথাও চলে গেছে। তিনি বলেছিলেন-‘‘খোঁজ তাকে, তার বিপদ হতে পারে। স্বামীজী ভৈরবকে খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা মহারাজজীর সঙ্গে জীপে বসে অনুসুইয়াতে ফেরার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম।”

ঘোর জঙ্গলে জীপ ধারকুণ্ডী থেকে বেরিয়ে অনুসুইয়ার পথে কিছুটা এগিয়েছিল হঠাৎ একটা বাঘ পথের একপাশ থেকে আর একপাশে লাফ দিয়েছিল। জীপ থেকে তার দূরত্ব মাত্র দশ ফুট ছিল। লাফ দিয়েই সে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। মহারাজজী বলে উঠেছিলেন-‘‘হো! ভৈরবকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।” হাজার-হাজার লোকের মাঝ থেকে তাকে বাঘ কি করে নিয়ে যাবে? আমি চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু গুরু মহারাজজী বলছেন, কেউ কি করে অস্বীকার করত। অনুসুইয়া পৌঁছে সকলে নিজের-নিজের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এই ঘটনার তৃতীয় দিন ধারকুণ্ডী থেকে খবর এসেছিল যে-‘‘ভৈরবকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। বাঘের গুহাতে তার শিকল এবং পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মহারাজজীর সাবধানবাণী তক্ষুণি আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, ‘‘বাঁচাও এবার বাঘের কবল থেকে!” যেখানে সম্ভাবনা একদম ছিল না, সেখানেও ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, মহারাজজী শুনেছিলেন কিন্তু আমাদের একবারও দোষ দেননি। সত্যি তিনি খুব দয়ালু ছিলেন।

মহারাজজীর মনে ভৈরবের ভবিষ্যত সম্বন্ধে জানার কৌতূহল জেগেছিল যে, ‘‘ভৈরব আমার হাতে দুধ খেত, আমার আসনেও বসত। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। তাকে ওঠানো বসানো, ঘোরানো সাধক, সেবকই করত। সাধু দর্শন এবং স্পর্শের কোন লাভ কি তার হয়েছে? আমার ভৈরব কোন যোনিতে উৎপন্ন হয়েছে? পশু জন্ম তো হবে না, তার তো মনুষ্য যোনিতেই জন্ম হওয়া উচিৎ।” যেদিন তাঁর মনে এই ভাব উৎপন্ন হয়েছিল, সেইদিনই তিনি অনুভবে দেখেছিলেন কয়েকজন দেবদূতকে। তাদের মধ্যে একজন তাঁকে বলেছিলেন,

“মহারাজজী! চলুন আপনার ভৈরব যে দেহ লাভ করেছে, দেখবেন চলুন। মহারাজজী তাঁকে বলেছিলেন-“চল দেখাও। কোথায় সে?” তিনি মহারাজজীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজজী দেখেছিলেন একটা কার্যালয়ে পদস্থ অফিসাররা বসে রয়েছে। মুখ্য অধিকারীর চেয়ারটি খালি ছিল। দেবদূত তাঁকে বলেছিলেন-“মহারাজজী! এই যে চেয়ারটি খালি পড়ে আছে, আপনার ভৈরব এসে এই চেয়ারেই বসবে।” দেবদূত এই কথা বলা মাত্র একজন স্থূলকায় কালো ব্যক্তি এসে সেই খালি চেয়ারে বসেছিল। দেবদূত মহারাজজীকে বলেছিলেন, “এই আপনার ভৈরব, এই রূপ পর্যন্তই এর উন্নতি হয়েছে।” এই কথা শুনে মহারাজজী খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। নিজের অনুভব সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, “হো! ভৈরব মনুষ্য দেহে জন্মগ্রহণ করবে, সাধু তো হবে না কিন্তু অফিসার হবে।”

এর কিছুদিন পর মহারাজজী একটি টিয়া পাখি পুষেছিলেন। টিয়া পাখিটি খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শিখে নিত। খুব চটপটে ছিল। আশ্রমবাসী সকলের নাম তার জানা ছিল। সকলকে প্রণাম করত, কিন্তু ব্রহ্মচারীমশাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই থাকত।

একদিন অসুস্থ হয়ে সে মারা যায়। মহারাজজী বলেছিলেন-“অ্যাঁ, অসুস্থ হল আর মরেও গেল? আমার তো খাঁচাটাই শূন্য করে গেল। কি জানি কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে? পশু-পাখি তো সে হতে পারে না। আমার হাত থেকে দানা খেয়েছে, আবার রাম-রাম বলতে শিখেছিল। সাধু সাধকদের স্পর্শ লাভ করেছিল। তাহলে সাধুসঙ্গ এবং স্পর্শ দ্বারা তার কি লাভ হল?”

সেইদিনই মহারাজজী অনুভবে দেখেছিলেন যে, নিকটবর্তী গ্রাম সেমরিয়াতে নওল পণ্ডিত নামের এক ব্যক্তি বাস করে, তার ঘরে সে জন্মগ্রহণ করবে। পরের দিন মহারাজজী সেই পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন-দেখ! আমার টিয়া পাখিটি কাল মারা গেছে। সে কন্যারূপে তোমার ঘরে জন্ম গ্রহণ করবে। সে পক্ষী যোনি থেকে সোজা পণ্ডিতের ঘরে মানব দেহ লাভ করতে যাচ্ছে। দেখো, তাকে যত্ন করে পালন কোরো। তার যেন কোন কষ্ট না হয়।

পণ্ডিতমশাই একটি কন্যার জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁর মনোরথ পূর্ণ হয়েছিল। যথা সময়ে কন্যার জন্ম হয়েছিল। ফর্সা রং-এর খুব সুন্দর মেয়ে ছিল।

পণ্ডিত দম্পতি খুব যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। তার বিবাহ স্থির হওয়ার পর পণ্ডিতমশাই নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে আশ্রমে এসেছিলেন এবং মহারাজজীকে বলেছিলেন-"মহারাজজী! আপনার টিয়া পাখির বিবাহ, চলুন।" মহারাজজী বলেছিলেন, "দেখ আমার কৌতূহল ওই পর্যন্তই ছিল। এখন টিয়া তোমার কন্যা, বিভূতি নিয়ে যাও, সব ব্যবস্থা কর গিয়ে।" অতএব মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হলে পশু-পাখিদের যোনিতেও পরিবর্তন হয়।

রামচরিত মানসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান রাম বন-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় যে-যে পশু-পাখি প্রভুকে দেখেছিল অথবা তারা দেখেনি, প্রভুই তাদের দেখেছিলেন-'**তে সব ভএ পরম পদ জোগু।' (মানস, ২।২১৬।২)** তাদের সকলের অন্তরে পরমকল্যাণের সংস্কারের সৃজন হয়েছিল। মহাপুরুষগণ কল্যাণস্বরূপ। যে-যে পশু পাখি মহারাজজীর সান্নিধ্যে ছিল, তারা সকলেই উন্নত যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিল।

তহশীলদার স্বামী

বিচরণশীল সাধুরা অনুসুইয়া আশ্রমে প্রায়ই আসতেন। এই ক্রমেই একজন সাধু অনুসুইয়া এসেছিলেন। তাঁর দেহ সিঁদুরের মত লাল ছিল। মহারাজজীকে সাদরে প্রণাম করে তিনি এক পাশে বসেছিলেন। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোথা থেকে আগমন হয়েছে? কখন থেকে এই বেশ ধরেছেন? মনে শান্তি আছে তো?" তিনি বলেছিলেন, "মহারাজজী! আমি পূর্বে তহশীলদার ছিলাম। সাধু মহাত্মাদের বাণী শুনে এই নিষ্কর্ষে পৌঁছেছিলাম যে, ভজনাই সার। অতএব সবকিছু ত্যাগ করে আমি ঈশ্বর পথের পথিক হয়েছি। এই বেশে দু'বছর ধরে আছি। শান্তির বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো এই বলব-মহারাজজী! সব জায়গা ঘুরে দেখে এই মনে হচ্ছে যে, মায়া জিতছে এবং ব্রহ্ম হেরে যাচ্ছে।"

মহারাজজী তাকে বলেছিলেন, "আচ্ছা! মায়া কি করবে? যখন ভগবান রক্ষা করার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন, তখন মায়া কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারে না।" তাঁর কথা শুনে তহশীলদার বলেছিলেন, "মহারাজজী! আপনি গভীর জঙ্গলে ত্যাগবৃত্তি নিয়ে বাস করেন, সেইজন্য মায়াকে আহ্বান করছেন। তা সত্ত্বেও আমি দেখব আপনি কতদিন পর্যন্ত এইরূপ বলতে পারছেন।" মহারাজজী

বলেছিলেন, ''ঠিক আছে।'' তহশীলদার বিচরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

দু'বছর পর তিনি পুনরায় অনুসুইয়া আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি এসে মহারাজজীর অবস্থা আগের চেয়েও ভালো দেখেছিলেন। তিনি মহারাজজীকে সাদর প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন? মহারাজজী বলেছিলেন, ''তহশীলদার স্বামী না?'' তিনি বলেছিলেন, ''হ্যাঁ মহারাজজী, আমি সেই।'' মহারাজজী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আর সব খবর কেমন বল, ব্রহ্ম জিতছে অথবা মায়া? আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন।''

তারপর মহারাজজী কমণ্ডলুটি নিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে তহশীলদার স্বামীর নেত্র থেকে অশ্রুপাত হচ্ছিল। যখন মহারাজজী ফিরে এসেছিলেন, তখন ভক্তগণ মহারাজজীকে বলেছিলেন যে, তহশীলদার স্বামী তো কাঁদছেন। মহারাজজী বলেছিলেন, ''এখন কাঁদলে কি হবে-

কেরা তবহিঁ না চেতিয়া, জব ঢিগ লাগী বের।
অব কে চেতে কেয়া হুআ, কাটহ্ন লীহ্না ঘের।।

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-এসব হল কি করে?'' তহশীলদার স্বামী উত্তরকাশীর ধর্মশালাতে ঘটিত ঘটনার বৃত্তান্ত বলে শুনিয়েছিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে সেখানের লোকেরা যদিও কিছু জানতে পারেনি, কিন্তু তবুও আমার আত্মাই আমার শত্রু হয়ে গেছে।

ভক্তরা সেবা করে ঠিকই কিন্তু এখন আমার প্রতি তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাব নেই। মনে-মনে এই চায় যে, কখন আমি চলে যাই। আমি ভাবতাম যে, সেই ঘটনা সম্বন্ধে শুধু আমি জানি আর কেউ জানে না। কিন্তু **'উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন।'** ***(মানস, ৭/১১২/১)*** মনে হয় সকলের হৃদয়ে খবর হয়ে যায়। এখন আর ভজনাতে মন বসে না। এইরূপ বলে তিনি পুনরায় কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

মহারাজজী বলেছিলেন, ''কাঁদলে কি হবে? এবার তুমি বিশ্বামিত্রের মত ধৈর্যধারণ করে পুনরায় প্রবৃত্ত হও। যে পরাভব স্বীকার না করে আবার যুদ্ধ করে তাকে কাপুরুষ বলা যেতে পারে না। উদ্যম হারিয়ে ফেলছ কেন? মায়াকে সর্বদা ভয় পাওয়া উচিত। মায়াই হল নারী। ঘর ছেড়ে আপনি সাধু হলেন, সাধুবেশ ধারণ করলেন। জ্ঞান ধ্যানের বিষয় বলতে শুরু করলেন কিন্তু যতক্ষণ তত্ত্বস্থিত

মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ না হয় এবং তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট সাধনার অভ্যাস এবং সেবা না করলে সাধনা হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। আপনি শুধু এই ভুল করেছেন যে, কোন মহাপুরুষের শরণে যাননি। সেইজন্য সদ্‌গুরুর দরবারে অভিমান ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পড়ে থাকতে হয়। যখন ভজন পথে চলার ক্ষমতা লাভ হয়, সাধনা জাগ্রত হয়, তার পরেই আসে নিরাধার বিচরণের বিধান। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাধক-

কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা। কতহুঁ বিলোকত মন অভিরামা।

(মানস, ২।৩১১।৫)

রামনগরের রামলীলা

ভগবান রামের রামলীলা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, ভগবান মহাবীর, ভগবান বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ, হরিশ্চন্দ্র, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি ভক্তদের জীবনের ঘটনাবলী ভারতে অনাদিকাল থেকে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। আধ্যাত্মিক দেশ ভারতবর্ষে রামলীলা, রাসলীলা সম্বন্ধে সকলেই অবগত। এই নাটকগুলি দেখে ছোট-ছোট ছেলেদের মনও শ্রদ্ধাতে ভরে ওঠে। অধ্যাত্ম ক্রিয়ার এটা প্রথম শ্রেণী। প্রবেশিকা থেকে সাধনার সঠিক পথ পর্যন্ত পৌঁছানোর সংস্কার এই নাটক, রূপকথাগুলি থেকেই পাওয়া যায়। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এই দৃশ্যগুলি দেখে শিক্ষা লাভ করে।

ভারতবর্ষ কখনও মূর্তি পূজক ছিল না। বাল্যকাল থেকেই এই আধ্যাত্মিক সংস্কারগুলির সৃজন মূর্তির মাধ্যমে হয়। আত্মদর্শন অভিলাষী সেই পথিক, যখন উন্নত স্তরের আচরণ করতে সমর্থ হয়, তখন জীবনে আর কখনও সে মূর্তির কাছে যায় না। সেই মূর্তিপূজককে নির্জনে, গাছের তলায়, ভগ্নগৃহে, বনস্থলীতে কুটীরে দেখা যায়।

সংসারের সমস্ত বিদ্যার জ্ঞাতাও অধ্যাত্ম পথে প্রবেশিকার ছাত্র। তিনি জীবিকা নির্বাহ হয় কি করে, জানেন কিন্তু আত্মানুভূতির ক্রিয়া জানেন না। ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত তখন হন, যখন চিন্তন দ্বারা হৃদয়ের ময়লা ধুয়ে যায় এবং আত্মা রথী হয়ে যায়। ভারতবর্ষে বারোমাস এই লীলাগুলির আয়োজন করা হয়। কিন্তু বর্ষার মধ্যভাগ থেকে শ্রাবণ-আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই সময়টা লীলাগুলির জন্য

নির্ধারিত আছে। গ্রাম এবং জনপদে এই লালীগুলির বন্যা বয়ে যায়। মহারাজজী বাল্যকাল থেকেই এই লীলাগুলি দেখেছিলেন। কাশীর রামনগরের লীলা তাঁর খুব ভালো লাগত। আশ্বিন মাস আসার পরই মহারাজজীর মনে ইচ্ছা জেগেছিল যে, কাশী গিয়ে রামনগরের রামলীলা আর একবার দেখে আসলে হয়। যেমনি যাবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন, ভগবান বারণ করেছিলেন, যেও না, তা সত্ত্বেও তিনি ভেবেছিলেন যে, ভগবান আদেশ দিলে দেখে আসতাম।

এই কথা মনে আসার পর যখনই মহারাজজী সন্ধ্যাবেলা ধ্যানে বসতেন, তাঁর দেহটা অনুসুইয়াতে থাকত, কিন্তু স্বরূপ উড়ে রামনগরের রামলীলাতে চলে যেত। সমস্ত চেতনা রামনগরে চলে যেত। যখন রামলীলা শেষ হত, তখন তাঁর স্বরূপ পুনরায় উড়ে অনুসুইয়া পৌঁছে যেত, তখন তিনি পুনরায় সচেতন হতেন। রামনগরের রামলীলার সমস্তটা যেমন ঘটনাবলী ঘটত, তিনি দেখতে পেতেন। কয়েকদিন এই ভাবেই পার হয়েছিল।

একদিন তিনি চিন্তিত ছিলেন। বলেছিলেন, ‘‘হো! আজ রামনগরের রামলীলাতে রাজার হাতী ক্ষেপে উঠেছিল। মেলা ক্ষেত্রে হুলস্থূল বেধে গিয়েছিল। আমিও চাপা পড়তে-পড়তে কোনরকমে বেঁচেছিলাম। ব্যাসমুনি রামের হাত ধরে পালাচ্ছিলেন। সকলে বিদ্রূপ করছিল।’’

মহারাজজী ভক্তদের এইসব কথা বলছিলেন, সেই সময়ই চিত্রকূটের তীর্থ পুরোহিত কাশী থেকে কয়েকজন যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে মোটরে চেপে মহারাজজীকে দর্শন করার জন্য অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। মহারাজজীর মুখ থেকে এই ঘটনা সম্বন্ধে শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন মহারাজজী! আপনি কখন এলেন? তখন আমরাও সেখানেই ছিলাম, সোজা সেখান থেকেই আসছি। আপনি আমাদের আগেই পৌঁছে গেলেন-এটা কি করে সম্ভব? মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘আমি কোথাও যাইনি। এখানে বসেই সব দেখি। ভগবান চাইলে নিজের ভক্তকে সবই দর্শন করাতে পারেন। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। জেলখানাতে নানকের জাঁতা ঘুরতে শুরু করেছিল। সবই করেন ভগবান, শ্রেয় ভক্তকে দেন।’’ **করত করাওত আপ হ্যাঁয়, পলটু পলটু শোর।**

জঙ্গলে রেডিয়ো

সেইসময় ভারত-চীন সীমাতে যুদ্ধ হচ্ছিল, লোকের মুখে একথা শুনে মহারাজজী বলতেন, ‘‘হো! কেউ আমাকেও ঠিক-ঠিক লড়াইয়ের খবর অন্ততঃ শোনাত। কার্বী

গ্রামের বাসুদেব নামের এক ভক্ত তাঁকে একটা রেডিয়ো দিয়ে বলেছিল, 'মহারাজজী! এ আপনাকে জঙ্গলেও সঠিক খবর দিতে থাকবে। তখনকার দিনে বাঁদা জেলাতে রেডিয়ো দুর্লভ বস্তু ছিল। অনুসুইয়া চিত্রকূটে কারও কাছে ছিল না। কার্বীর দু'একজন ব্যবসায়ীদের কাছেই ছিল। বড়-বড় শহরেই রেডিয়ো শোনার প্রচলন ছিল। রেডিয়ো দেখে আমার খুব চিন্তা হয়েছিল, কারণ এতে ভাল-মন্দ সব ধরণের গান প্রসারিত হয়, এসব শুনলে সাধকদের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অতএব আমি মহারাজজীর কাছে অনুরোধ করেছিলাম, "মহারাজজী! আশ্রম থেকে রেডিয়ো যেন সরিয়ে দেওয়া হয়। শহরে তো লোকেরা দিন-রাত সিনেমাই দেখে আর রেডিয়োতে গানই শোনে। জীবনযাত্রায় যন্ত্র প্রাধান্য পেলে মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, হয়েছে তাই। চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই তো মানুষ জঙ্গলে সাধু দর্শনে আসে।"

মহারাজজী বলেছিলেন, "দেখ আমার জন্য বিধি নিষেধ বলে আর কিছু নেই। আমি এটা নিয়ে আসতেও বলিনি আর আমার রেডিয়ো পাওয়ারও কোন ইচ্ছা ছিল না। কি জানি, কি করে এই বস্তুগুলি যোগাড় হয়ে যাচ্ছে এটা এখানে থাকাতে কোন বাধাও তো দেখছি না।"

আমি বলেছিলাম-"তা সত্ত্বেও মহারাজজী! লোকদৃষ্টিতে এটা উচিৎ নয়।" মহারাজজী বলেছিলেন "আচ্ছা, তুই বলছিস, তখন আমি এটাকে রাখব না।" মহারাজজী ভক্তটিকে রেডিয়ো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সেইদিন সেচন বিভাগের একজন ওভারসিয়ার মহারাজজীকে দর্শন করার জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মহারাজজী! আমি শুনলাম আপনাকে এক ভক্ত রেডিয়ো এনে দিয়েছে।" মহারাজজী বলেছিলেন-"হ্যাঁ! এনে তো ছিল, কিন্তু আমার এক শিষ্য বলছে যে, রেডিয়ো যেন না রাখা হয়। সাধকদের উপর খারাপ সংস্কার পড়তে পারে। সেইজন্য আমি রেডিয়োটা যার ছিল, তাকেই ফেরত দিয়ে দিয়েছি।"

ওভারসিয়ার বলেছিল, "মহারাজজী আপনি যোগীপুরুষ। আপনার আবার কিসের বিধি-নিষেধ?"

অবধূ সহজ সমাধি ভলী।
জহঁ জহঁ জাউঁ সোঈ পরিকরমা, জো কুছ করুঁ সো পূজা।
ভীতর বাহর এক হী দেখূঁ, ভাব মিটা সব দূজা।।

আপনার জন্য কর্তব্য বা অকর্তব্যের সীমা কি আর আছে।

মহারাজজী তক্ষুণি বাগিয়া থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওভারসিয়ারের কাছে বলেছিলেন, ‘‘দেখ, ইনি কি বলছেন?”

আমি সব শুনে বলেছিলাম, ‘‘মহারাজজী! ইনি বলছেন তো ঠিক, আপনার উপর তো এর কোন প্রভাব পড়বে না। রেডিও বাধা তো আমাদের জন্য। মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘তাহলে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলো। যে ভজনাকারীর মন লক্ষ্যে স্থির, বাদ্যযন্ত্র অথবা রেডিও তাকে বিচলিত করতে পারে না। তারা অন্য কিছু শোনেও না, দেখেও না। রেডিও আবার আশ্রমে নিয়ে আসা হয়েছিল। মহারাজজী তাতে খবর শুনতেন এবং মাঝে-মাঝে দুপুর দুটোর সময় গোরখপুর থেকে প্রসারিত লোকগীতি শুনতেন। অন্য সময় রেডিও বন্ধ অবস্থাতে পড়ে থাকত।

দানে প্রাপ্ত বস্তুর পুনরায় দান

অনুসুইয়া আশ্রমের প্রতি ভক্তদের ভক্তিতে বৃদ্ধি হচ্ছিল। মঙ্গল যাদব আশ্রমের কাছে একটা ফলের বাগান লাগিয়েছিল। তিন-চারটি গাভীর ব্যবস্থা করেছিল, যাতে মহারাজজীর সেবাতে দুধ অর্পণ করতে পারে। যমুনা নদীর তটবর্তী গ্রাম সিলৌটার জমিদার ঠাকুর নহ্নকু সিং তীর্থযাত্রা সমাপন করার আগে মহারাজজীর দর্শন করার জন্য অনুসুইয়া এসেছিলেন। তিনি অনেক সাধু-মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু মহারাজজীর দর্শন এবং উপদেশ শ্রবণ করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি নিজের হাতিটি মহারাজজীর সেবাতে অর্পিত করেছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘হো, হাতি নিয়ে আমি কি করব? সাধুদের এসব মানায় না? তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করে বলেছিলেন, ‘‘ভগ্‌বন! এবার তো এই হাতি আপনার। দানের সঙ্কল্প ফিরিয়ে নিতে পারি না।” সেই সময় পাঁচ-ছ’শো জন মহাত্মাদের একটা সমূহ নিরঞ্জনী আখাড়া চিত্রকূটে চাতুর্মাস্যা করছিল। মহারাজজী তাদের সকলকে আমন্ত্রিত করে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বস্ত্র ইত্যাদি মাঙ্গলিক পদার্থ দ্বারা সুসজ্জিত করে হাতিটি মহাত্মাদের দান করেছিলেন। মহারাজজী বলতেন-‘‘**দান মে সে দান দে, তিনো লোক জীত লে।**”

গাছী-বাছী-দাসী

স্থানীয় ব্যক্তিদের গাভীগুলি জঙ্গলে চরতে আসত। মহারাজজীর কিছু ভক্ত তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, গোটা জঙ্গল পড়ে রয়েছে অন্য কোথাও নিয়ে

গিয়ে গাভীগুলি চরাবার ব্যবস্থা কর। শুধু এই পাহাড়ের তলদেশ বাদ দিয়ে দাও, এতে বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। এই পরামর্শ তাদের মনে ধরেনি। যাদের বারণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন ভক্ত শ্রী ব্রহ্মচারী মশাইয়ের ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা ধারকুণ্ডী গিয়ে স্বামীজীকে প্রার্থনা করেছিল, ‘‘আপনি এখানে আসার পর অনুসুইয়াতে গাভী আনা হয়েছে। একটা ফলের বাগান তৈরী করা হয়েছে। পশুদের জন্য সেখান থেকে চারার ব্যবস্থা করতে বারণ করা হয়েছে। কিছু দিন পর চাষ করাও হবে, আয়োজন দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আমাদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে।’’

স্বামীজী টেলিগ্রাম করে জগতানন্দ থেকে স্বামী শ্রী ভগবানানন্দজীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ভগবানানন্দজী ধারকুণ্ডী পৌঁছেছিলেন। তাদের সকলকে এবং দু’চারজন অন্য ভক্তদের নিয়ে ধারকুণ্ডী মহারাজজী অনুসুইয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এদিকে অনুসুইয়াতে মহারাজজী ভক্তদের মাঝে বসে, হঠাৎ তিনি বলেছিলেন, ‘‘বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার? হুঁ এখন বুঝতে পারছি সকলে মিলে আসছে আমাকে জ্ঞান দিতে।’’ সকলে আশ্চর্য হচ্ছিল যে, মহারাজজী কার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলছেন।

সূর্যাস্ত হয়ে এসেছিল। অন্ধকার ঘনাবার আগেই সকলে ট্রাকে করে অনুসুইয়া হাজির হয়েছিল। সকলে মহারাজজীকে প্রণাম করেছিল। মহারাজজী শান্তভাবে বসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘হঠাৎ এতলোক সঙ্গে এসেছ, কিছু বলবে কি?’’ কথার সূত্র ধরে ধারকুণ্ডী মহারাজজী বলেছিলেন, ‘‘মহারাজজী! আশ্রমে গাভী আনানো হয়েছে। বাগানে পনেরো কুড়িটা গাছ লাগানো হয়েছে, সাধুদের এসব শোভা পায় না। এর ফলে উৎসাহিত হয়ে কিছুদিন পরে লোকে চাষ করতে শুরু করবে। আপনি বলতেন-গাছী বাছী দাসী, তিনো সাধু কি ফাঁসী।।’’

মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘এটা তো আমি এখনও বলছি এবং একথা সত্য, সাধকের জন্য সর্বদা ফাঁসী এসব। কারণ সঙ্গদোষ লেগে থাকে। কিন্তু এখন আমার জন্য বিধি-নিষেধ বলে কিছু নেই। যোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়।’’

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।

(গীতা, ২/৭০)

তোমরা সতর্কে থেকো। এখন গাভী সম্বন্ধে বলি, আমি গাভী আনায়নি এবং রাখিনি। আমি এও জানি না যে, কোথায় গাভী এবং কোথায় বাগান করা হচ্ছে। আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি। ঐ মঙ্গলই কোথা থেকে দু'তিনটি গাভী হবে জানি না চেয়ে এনেছে এবং তাদের নিয়ে পাশের জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। ঐ হচ্ছে নষ্টের মূল। ওকেই তাড়াও। দুধ পান করার প্রয়োজন আমার নেই। হ্যাঁ মঙ্গল থাকাতে সুবিধা অবশ্য হয় কারণ গোরখপুর, কানপুর, বেনারস থেকে যে শহুরে ভক্তরা আসে, তারা চায়ের প্রতি আসক্ত। ঘোর জঙ্গলে চা না পেলে ছটফট করে। এই আহির পোয়া-সের দুধ তুলে রেখে দেয়, ফলে তারা এলে চায়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। গাভীগুলির দেখাশোনা সুবিধা অনুসারে করে। প্রয়োজন হলে দুধের ব্যবস্থাও করে দেয়। আমার অথবা আশ্রমের উপর সেই গাভীগুলি দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেই।

ধারকুণ্ডী মহারাজজী বলেছিলেন, ''মহারাজজী! আপনার পবিত্র আশ্রমে এটা তবুও শোভনীয় নয়।" মহারাজজী কিঞ্চিৎ রেগে বলেছিলেন, ''আচ্ছা। তুমিও বলছ। যাও তোমাকেও এসব করতে হবে। বুঝেছ। এখন আসতে পারো। পরিবেশ সহজ করার জন্য ভগবানানন্দজী বলেছিলেন, ''মহারাজজী! প্রসাদ তো এখনও পায়নি।" তিনি রেগে বলেছিলেন, ''প্রসাদ পাবে না, যাও এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

তখন সকলে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় মহারাজজী সকলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, প্রসাদ দিয়েছিলেন এবং সস্নেহে কুশল সংবাদ নিয়েছিলেন, যেন কিছুই হয়নি। এর পরিণাম এই হয়েছিল যে, মহারাজজীর আশ্রমে তো গাভীর নামমাত্র ভূমিকা ছিল। শুধু তিন-চারটি গাভী, কুড়ি-তিরিশটা চারাগাছ এবং সামান্য জায়গাতে ফুলের গাছ ইত্যাদি বপন করার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এদিকে ধারকুণ্ডী আশ্রমে এখন প্রায় দেড়-শ গাভী, চল্লিশটা মহিষ এবং কয়েক শো একর জায়গা জুড়ে বাগান রয়েছে। চাষবাসের ব্যবস্থাও আছে।

হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাষা। ***(মানস, ১।৬৭।৪)***

আমি একবার ধারকুণ্ডী মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনার আশ্রমে ইলাহি ব্যাপার? কি করে এতসব। তিনি বলেছিলেন, ''মহারাজজী যে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তাই এতসব কিছু দেখছ।" পূজ্য মহারাজজী বলতেন, ''লোকে সিদ্ধাই-সিদ্ধাই করে কিন্তু সিদ্ধাই বলে কিছু নেই। মহাপুরুষ

আন্তরিকভাবে যা বলেন তা ঘটেই। মহাপুরুষগণ বাক্‌সিদ্ধ হয়ে যান। তাঁরা জোর দিয়ে যা বলেন, তা ঘটেই। সবকিছু পাওয়ার পরেও গুরুর মহিমা অতুলনীয়। তাঁদের কাছে আত্মপ্রশংসা করার ধৃষ্টতা করা উচিৎ নয়। আর কিছু না থাক গুরুর প্রতি ভক্তি সর্বদা থাকা দরকার।

ঈশ্বরপথে নকল করা উচিৎ নয়

মহারাজজী অনুসুইয়াতে তিন-চার বছর থাকতে না থাকতেই এই বনপ্রদেশ নির্বিঘ্ন হয়ে গিয়েছিল। সাধু-মহাত্মা এবং ভক্তদের সেখানে আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল। এক মহাত্মা দণ্ড হাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন পরমহংস মশাই দিগম্বর, দেহে বস্ত্র নেই, কিন্তু প্রসন্ন মুদ্রাতে বসে আছেন। দু'চারজন সাধক আশে-পাশে সেবারত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, এই বেশভূষার জন্যই সাধুকে প্রশংসা করা হয়। অতএব নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু এবং বস্ত্র একজন অন্য সাধুকে দিয়ে স্বয়ং দিগম্বর হয়ে একদিকে হেঁটে গিয়েছিলেন, তিনি ধারে কাছেই বিচরণ করছিলেন। নিজের হাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেউ খাইয়ে দিলে তবেই খেতেন, নদীতে জল বয়ে যেত, সেই জল অঞ্জলি ভরে পান করতেন।

কিছুদিন পর তিনি পুনরায় অনুসুইয়া পৌঁছেছিলেন। দেখেছিলেন যে, পরমহংসজীর কাছে দুঃখী ব্যক্তি এবং ভক্তদের ভীড় সর্বদা লেগে থাকে। তিনি তাদের বকাবকি করছেন। আরও বেশী জাঁক দেখেছিলেন। সেইদিন থেকে তিনি মৌন ভঙ্গ করেছিলেন এবং কিছু-কিছু বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি গালাগালি দিতেন, তখন লোকেরাও তাঁকে কিছু-কিছু শুনিয়ে দিত। লোকের প্রত্যুত্তরে উত্যক্ত হয়ে তিনি মহারাজজীর স্থিতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য পুনরায় অনুসুইয়া আশ্রমে এসেছিলেন।

তক্তাপোষের উপর গদি বিছানো দেখেছিলেন। মহারাজজী তার উপর বসেছিলেন। কেউ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ চামর ব্যাজন করছে। এসব দেখে তিনি একটা ভগ্ন-গৃহের মধ্যে তক্তপোশে আসন পেতে বসেছিলেন। প্রচার করেছিলেন যে, সোমবারে তাঁর কাছে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে। দু-একমাস পর্যন্ত এই ভাবেই কেটেছিল, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, যার ফলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

স্থানীয় ভক্তদের কাছ থেকে মহারাজজীও তাঁর চলে যাবার সূচনা পেয়েছিলেন। মহারাজজী বলেছিলেন-“বেশ বানিয়ে অথবা বস্ত্র ত্যাগ করলে, কি হবে? তিনি কিছুদিন আমার কাছে থাকলে যোগ সাধনা জাগ্রত হত এবং চিরকালের জন্য সব ঠিকও হয়ে যেত। তাঁর নিশ্চয় দৃঢ় ছিল।” **‘অবধূ! ভজন ভেদ কছু ন্যারা। জানে কোঈ জাননহারা। পশু সম নগন ফিরে কা হোঈ, চন্দন ঘিসে লিলারা।’** আরে, তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্য বিনা ভজন জাগ্রত হবে কি করে? যতদিন সদ্‌গুরু আত্মার তদ্রূপ হয়ে রথী না হন, ভজনার চাবিকাঠি ততদিন পর্যন্ত পাবে না। সেইজন্য সাধককে কখনও কারও নকল করা উচিৎ নয়। সাধককে নিজের স্তর দেখে চলা উচিৎ। আমি কোথায়, কোন স্তরে দাঁড়িয়ে, যে স্তরের তিনি, সেখান থেকেই তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। যদি সাধক মহাপুরুষের নকল করে, কর্ম থেকে বিরত হয়, তবে সে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। চিন্তন-পথে নকল অনেক বড় ব্যবধান। সাধককে এসব থেকে সাবধান হয়ে ধৈর্যপূর্বক চিন্তনে নিযুক্ত থাকা উচিৎ।

মহারাজজী দ্বারা ভাণ্ডারার আয়োজন

মহারাজজীর সেবাতে একদিন দশ-পনেরো জন ব্রাহ্মণ একত্রিত হয়েছিল। তারা সুপারি-তামাক খেয়েছিলেন বাণী শ্রবণ করেছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন, “মহারাজজী! আপনি ব্রাহ্মণদের কেন ভোজন করান না?” মহারাজজী বলেছিলেন, “হো! আমার জন্য পাপ-পুণ্য বলে আর কিছু নেই, তোমাদের ইচ্ছা হলে কর ব্যবস্থা। আমাকে ভগবান মান্য করেন। যেমন চাও, যা চাও, খাও-খাওয়াও আমার কাছে কোন বস্তুর অভাব নেই। কিন্তু ঝগড়া কোরো না-“**তিন জাতি লড়হোড়া, ব্রাহ্মণ কুত্তা ঘোড়া।**” তাঁরা প্রসন্নচিত্তে কীর্তন ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ-ভোজন হচ্ছিল, কিন্তু যেই শুনেছিল যে, মহারাজজীর আশ্রমে কীর্তন হচ্ছে, ভাণ্ডারা ভেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সকলে আশ্রমে আসতে শুরু করেছিল। এক চামার ভক্ত গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে সেটা বাজাতে-বাজাতে মণ্ডপের চারধারে পরিক্রমা করতে শুরু করেছিল। মণ্ডপে কীর্তন হচ্ছিল। মহারাজজীর আসন থেকে প্রায় পঁচিশ মিটার দূরে সেই মণ্ডপ সাজানো হয়েছিল। রাত্রি প্রায় দশটা-এগারোটা বেজেছিল, মহারাজজী আসনে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিলেন। সেখানে অনেক ভক্ত

বসেছিল কিছুক্ষণ পরেই কীর্তন ব্যবস্থাপক এসে তাঁকে বলেছিল, ‘‘মহারাজজী! সব ব্যবস্থা ভেস্তে গেল। কীর্তন তো পণ্ড হয়ে গেল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘কি হল রে। ঘী পড়ে গেল তো আরও আছে নিয়ে নে। কিছু কম পড়েছে তো বল। কি ভেস্তে গেল? সে বলেছিল, ‘‘না মহারাজজী! একটা চামার মণ্ডপ পরিক্রমা করেছে, মণ্ডপ স্পর্শ করেছে। আরে রাম-রাম, ধর্ম তো নষ্ট হয়ে গেল।” মহারাজজী হেসে বলেছিলেন, ‘‘কেন রে! ভগবানও কখনও নষ্ট হন যা শাশ্বত তা নষ্ট হবে কি করে? ধর্ম নষ্ট হল কি করে?” কিন্তু বিবাদ বেড়েই গিয়েছিল। মহারাজজীর হিতাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতগণও বিপক্ষে বলতে শুরু করেছিলেন।

ততক্ষণে ভারতীয় স্থলবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন পণ্ডিত সৈনিক এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি চাকুরী করাকালীন সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে মদেরও সেবন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি এসেই বলেছিলেন, ‘‘অনর্থ হয়ে গেল মহারাজজী! খুব বেশী অনর্থ। আমাদের ব্রাহ্মণদের তো নিয়ে ডুবাল মহারাজজী।” মহারাজজী তাকে দেখে বলেছিলেন, ‘‘অ্যাঁ এও এসে পড়েছে।” এক ভক্তকে বলেছিলেন, ‘‘দে একে এক পোয়া” মদ্যপান করে তিনি বলেছিলেন, ‘‘একদম ঠিক তো হচ্ছে। মহারাজজী মহাপুরুষ, এঁর দরবারে কেউ বড় নয় আবার কেউ ছোটও নয়। জগন্নাথের ভাতের মত এখানের সবকিছু মহারাজজীর প্রসাদ। যে খেতে চায় খাবে, না হলে যাও। সে রেগে যাওয়াতে অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁকে বলেছিল, ‘‘কি বলছেন গর্গজী? চুপ করুন। গর্গ বলেছিলেন, ‘‘দেখ। আমি তো চুপ করেই আছি। আমি মিলিটারীতে চাকুরী করতাম। সব জাতের লোকেদের সঙ্গে আমি খেয়েছি। তোমরাও হোটেলে খাও, মোটর গাড়ীতে সকলের সঙ্গে গা ঘেঁসে বস। ভগবান কী করে নষ্ট হলেন। যদি ছুঁলে ভগবান নষ্ট হয়, তবে তীর্থের সব ভগবান নষ্ট হয়ে গেছেন। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী সকলেই তো তীর্থে যাচ্ছে। তারা সকলেই বলেছিল, ‘‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা হবার হয়েছে। গুরু মহারাজজীর শরণে সব ঠিক আছে।” কীর্তন-ভাগবত যথাবৎ আরম্ভ হয়েছিল।

কীর্তন সমাপনের পর ভাণ্ডারা হয়েছিল। শুদ্ধ দেশী ঘিয়ে লুচি ছাঁকা হচ্ছিল, দেশী ঘি দিয়েই বোঁদে তৈরী করা হয়েছিল। বড়-বড় কড়াইতে তরকারি তৈরী হচ্ছিল। সকলেই কোন না কোন সেবা করছিল, দূর-দূরান্ত থেকে ব্রাহ্মণরা নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিল। আশ্রমেরই ভক্ত গুর্দ্বান নামের এক পণ্ডিতমশাই একটা কড়াইতে লুচি

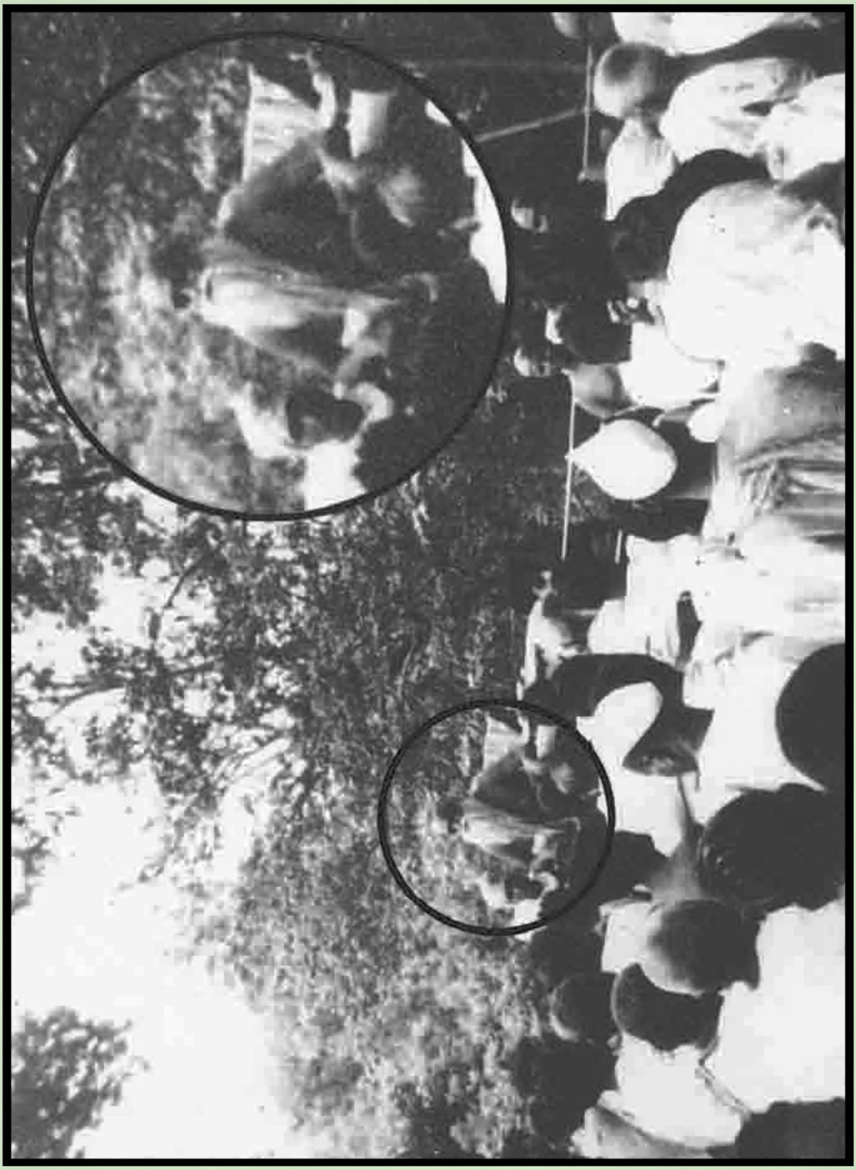

বিশেষ উৎসবে সাধক এবং ভক্তদের মাঝে শ্রী পরমহংসজী মহারাজ

ছাঁকছিলেন। যে-যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ছিল, তাঁরা পণ্ডিতমশাইকে লুচি ছাঁকতে দেখে মহারাজজীর কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন "ওহ্ মহারাজজী! আপনি দেখছি সব ওলট-পালট করে দিলেন '**ধর্ম হেতু অবতরেহু গোসাঈঁ। মারেহু মোহি ব্যাধ কী নাঈঁ।।**' *(মানস ৪।৮।৫)* মহারাজজী আমরা ভোজন করব না। আমাদের ডেকে পাঠালেন কেন?" মহারাজজী বলেছিলেন, "আবার কি হল? কে তোমাকে মেরে ফেলল?" গুর্দবানের প্রতিবেশী বলেছিলেন, গুর্দবান পণ্ডিত লুচি ছাঁকছেন, তাদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা এবং খাওয়া-দাওয়া আজ ছ'মাস ধরে বন্ধ। মহারাজজী তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "দেখ নিজের বাড়ি পর্যন্তই এই বিবাদ সীমিত রাখ। ওদের সঙ্গে তোমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আজ বন্ধ, তো কি হয়েছে, কাল এক হয়ে যাবে। গ্রাম ঘরে তো এসব লেগেই থাকে। চারটে বাসন যেখানে থাকে, খন্ন-খট হয়ই। আমার কাছে সকলেই সমান, তোমার তরফ থেকে কি আমি লাঠি চালাব?" কিন্তু তারা বলেছিল, "মহারাজজী! জিয়ত মাখী না খাঈ হোঈ।" তাদের কথা শুনে মহারাজজী বলেছিলেন, "কেন রে, তুই তো জানিস মহারাজজীর কাছে সকলেই সমান", তারা বলেছিল, "আজ্ঞে মহারাজজী এটা তো জানতাম।" মহারাজজী বলেছিলেন, "যখন জানতে যে, বাবার কাছে সকলে সমান, সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তখন তুই এলি কেন? বাড়ি থেকেই বলে পাঠাতিস যে বাবার নিকুচি করেছি। আমি যাবো না। এখন শোন, আমি তোর ব্রাহ্মণ জাতের নিকুচি করেছি, দূর হ এখান থেকে নিজের জাতি-পাতি, ভেদ-ভাব নিয়ে। আমি তো এইজন্য খাওয়াচ্ছি, যাতে লোকে পরম্পরা মেনে একে অপরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে থাকে। এটা কি আমার মেয়ের বিয়ের আয়োজন, যে আমার উপর বিরক্ত হচ্ছ? তুমি খেতে না চাইলে আমি কি করতে পারি?" মহারাজজীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে অধিকাংশ লোক পঙ্‌ক্তিতে বসে পড়েছিল। প্রসাদ বিতরিত করা হচ্ছিল। যে দু'চারজন বিরোধ ব্যক্ত করছিল তারা মন্দাকিনী নদীর তীরে বসে পরস্পর বিচার-বিমর্শ করেছিল যে, "মহারাজজী তো রেগে গেছেন। ঘরের-গ্রামের ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হয়নি। মহারাজজীকে রুষ্ট করে যাওয়া উচিত হবে না।" এইরূপ পরস্পর আলোচনা করে এক ঘণ্টা পরে পুনরায় মহারাজজীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, "মহারাজজী! আমাদের বোঁদে প্রসাদ দিতে বলুন।" মহারাজজী বলেছিলেন, "তোমাদের জন্য আমার কাছে কিছু নেই।" তাঁর কথা শুনে পঙ্‌ক্তিতে বসে তারা সকলের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেছিল। সেইদিন থেকে তাদের পারিবারিক বিবাদ মিটে গিয়েছিল। ভক্তদের শ্রদ্ধা অনুসারে আশ্রমে ক্রমে ভাণ্ডারার

চলন শুরু হয়। অতীতের শত্রুতা ভুলে স্থানীয় সব ভক্তরা সহযোগের মনোভাব নিয়ে মহারাজজীর সেবাতে তৎপর থাকতেন। মহাপুরুষের সাহচর্যে —"**বিগত বৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা**" *(মানস, ২/১৩৭/১)* মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে পরস্পরের মধ্যে যে কটূ সম্বন্ধ ছিল, তা চিরকালের মত শেষ হয়েছিল।

মহাপ্রয়াণের সময়

সাধনা দ্বারা সাধ্যের উপলব্ধি হলে, লক্ষ্যে স্থিত হলে সাধকের সাধনা থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। শাশ্বত অমরত্বের গুণে বিভূষিত হলে, তাঁরা কালজয়ী হয়ে যান। শ্রী পরমহংস মহারাজজীও স্থিতির দিগ্‌দর্শন করে একবার বলেছিলেন, আমার মৃত্যু হবে না। কালের কবল থেকে আমি মুক্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু কোন শিষ্য যদি শব্দের বাণে কষ্ট দেয়, তবে দেহত্যাগ অবশ্য করব। '**শব্দে মারা গির পড়া, শব্দে প্রাণ পয়ান।**' যে কোন মহাপুরুষকে শব্দের আঘাত গুলির থেকেও বেশী কষ্ট দেয়। এই মনে করব যে, এদের আর আমার প্রয়োজন নেই। তখন আমি বিনয় পূর্বক আগ্রহ করেছিলাম যে, এই মাধ্যম অথবা অন্য মাধ্যম দ্বারা দেহ ত্যাগ করাতে পার্থক্য কি? তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, "কোন না কোন অছিলায় দেহত্যাগ তো করতেই হবে। রামও দেহ রাখেননি, লক্ষণের অজুহাত নিয়ে সরযুতে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে মাধ্যম করে শরীর ত্যাগ করেছিলেন। আমিও কোন মাধ্যম খুঁজে নেব।" অতঃপর আমি মহারাজজীকে এই প্রশ্ন করেছিলাম যে, "মহারাজজী! দেহরক্ষা করা যেতে পারে?" তিনি বলেছিলেন, "বাল্মীকি, নানক, কবীর, মহাবীর, গৌতমবুদ্ধ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষি-মহর্ষিদের মধ্যে কারও শরীর তো বর্তমানে দেখছি না। এই দেহ নশ্বর। যে উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য এই দেহধারণ করা হয়েছে, তার প্রাপ্তি হলে এই দেহের উপযোগিতা ফুরিয়ে যাবে, যে অবস্থাতে যেমন করে হোক ত্যাগ করলেই হয়। যেহেতু উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রাপ্তযোগ্য কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নেই। এটা মহাপুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য আমার মৃত্যু তো হবে না, সূক্ষ্মদেহে সদা তোমাদের নিকটে থাকব এবং কল্যাণও করব।"

একজন সাধক কিছু ভুল করে ফেলেছিলেন। যখন তিনি প্রথমবার আশ্রমে এসেছিলেন তখন মহারাজজী বলেছিলেন, "এ তো ভ্রষ্ট যোগীও নয়, এর মধ্যে সাধুর কোন লক্ষণও নেই। হ্যাঁ তবে এটা দেখছি যে, আশ্রমে আমার কাছে থাকার এর সংস্কার আছে।" তার চরিত্রে দোষ দেখার পর মহারাজজী বলেছিলেন, "এর জন্য আমার নাক কাটা গেছে।"

মহারাজজীর হৃদয়ে যথেষ্ট করুণা ছিল। তিনি কখনও কাউকে ত্যাগ করেননি। খুব পাপী হলেও মহারাজজী তার উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট থাকতেন বলতেন **'সরনাগত কহুঁ জে তজহিঁ, নিজ অনহিত অনুমানি। তে নর পাবঁর পাপময়, তিন্‌হহি বিলোকত হানি।'** ***(মানস, ৫।৪৩)*** মহারাজজী সেই সাধকের জন্যও চিন্তিত ছিলেন। ভয়বশতঃ তিনি মহারাজজীর কাছে যেতে পারছিলেন না। মহারাজজী একথা শুনে বলেছিলেন, ''হো, একবার কেউ তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসত, তাহলে আমি তাকে দিয়ে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার তুলে নিতাম।''

তাঁর দেহত্যাগের একদিন আগে আমি মহারাজজীকে বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ''আপনার কথা অনুযায়ী আগে এখানে যোগ্য ব্যক্তিদেরই স্থান দেওয়া হত, কিন্তু এখন অনাধিকারীদের কেন থাকতে দেওয়া হচ্ছে?'' তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, ''তুই কথা এমন বলিস যে একদম গুলির মত বিদ্ধ করে।'' তাঁর কথা শুনে আমি সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলাম, তা দেখে তিনি বলেছিলেন, ''আমি কি করে বোঝায় যে, তোমরা বাণীরূপী গুলি দিয়ে প্রহার করছ, যা দেহটাকে ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।''

সেই সময় পাথরাগ্রামের একজন পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন। মহারাজজী তাঁকে বলেছিলেন, ''পণ্ডিত, তুমিও বৃদ্ধ হয়েছ, আমিও হয়েছি আর বেশী সময় নেই, তুমি যা ভোগ করতে চাইছ এখনই করে নাও। আমার এই যে দেহটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আর থাকবে না। অন্য একজন ভক্ত বলেছিলেন, ''মহারাজজী, আমি স্বপ্ন দেখেছি আপনি দেহত্যাগ করেছেন।'' মহারাজজী বলেছিলেন, ''হ্যাঁ হো! ঠিকই দেখেছ, আমিও তো তাই বলছি যে, এই শরীরটার সময় হয়ে গেছে। পাঁচদিন ধরে মহারাজজী প্রায় এটাই বুঝিয়েছিলেন যে, আমার আর কোন কাজ বাকী নেই।'' পঞ্চম দিন সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজজী সাধকদের কাছে ডেকেছিলেন এবং আদেশের ভঙ্গিতে কায়মনোবাক্যে সাধনাতে প্রবৃত্ত হতে বলেছিলেন, **'রাম রাম রাম জীহ জৌলৌঁ তু ন জপিহৈ। তৌলৌঁ, তু কহুঁ জায়, তিহুঁ তাপ তপিহৈ।।'** -স্বর্গে গেলেও ত্রিতাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। **'সুরসরি তীর বিনু নীর দুখ পাইহ্যা।'** —গঙ্গারতীরে থাকলেও তৃষ্ণার্ত অবস্থাতে মৃত্যু হবে। **'সুরতরু তরে তোহি দারিদ সতাইহ্যা।।'** কল্পবৃক্ষের নীচে বসে থাকলেও দরিদ্রতা ঘুচবে না। **'ছুটিবে কে জতন বিসেষ বাঁধো জায়গো।'** —ভজনা না করলে মুক্ত

হওয়ার যত চেষ্টা করবে, বিশেষভাবে আবদ্ধ হবে।' **'হবৈহ্যা বিষ ভোজন জো সুধা-সানি খায়গো।'** -অমৃত মিশিয়ে যদি ভোজন কর, সেটাও বিষের কাজ করবে। **'জাগত, বাগত, সপনে ন সুখ সোই হ্যায়। জনম জনম, জুগ জুগ জগ রোইহ্যায়।।'** -জেগে-জেগে বাগতে অর্থাৎ চলাফেরা করতে-করতে যেখানেই যাবে, স্বপ্নেও সুখে ঘুমাতে পারবে না। প্রত্যেক জন্মে যুগ-যুগান্তর পর্যন্ত জগতে কেঁদেই বেড়াবে। **'তুলসী তিলোক তিহুঁ কাল তোসে দীন কো। রামনাম হী কী গতি জইসে জল মীন কো।।'**- আর কেউ স্বীকার করুক অথবা না করুক, তুলসীদাস তোমার মত দীনের জন্য তো রামনামই আশ্রয়। তোমার কল্যাণ তাতেই হবে।

সেদিন তিনি অনবরত উপদেশ দিয়েছিলেন। সাধন-ভজনে বিশেষ জোর দিয়ে তাতেই প্রবৃত্ত থাকার জন্য শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। সূর্যাস্তের সময়ও মহারাজজী এই পঙ্‌ক্তিগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন- **'রাম রাম রাম জীহা জৌলৌঁ তু না জপিহে।'**- তারপর বলেছিলেন, দেখো, জপ করা উচিত, ভজনা না করলে কোথাও আশ্রয় জুটবে না, সেইজন্য সবসময় নাম, রূপ, লীলা, ধামে ব্রহ্মবিদ্যা, চিন্তনে, প্রার্থনাতে মনকে নিযুক্ত রাখবে। গোটা বছরে এত উপদেশ মহারাজজী কখনও দেননি।

সূর্যাস্তের পর মহারাজজীর দরবার বসেছিল। কয়েকজন ভক্ত ছিলিম তৈরী করছিল। একজন বেনারসী পণ্ডিত দীনানাথ ত্রিপাঠী সৎপ্রসঙ্গের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, অবধ ধামে দেহ ত্যাগ করলে কি পুনর্জন্ম হয় না? শেষ সময়ে মহাপুরুষদের স্থিতি কি প্রকার হয়? মহারাজজী বসে-বসে সব দেখছিলেন, শুনছিলেন, তখন বেলা প্রায় পৌনে দশটা হবে। দরবারে সৎসঙ্গ অনুরাগীদের মধ্যে রঘুবীর দাসের দিকে ছিলিমটা এগিয়ে দিয়ে মহারাজজী বলেছিলেন-''নাও এখন তোমরা খাও। আমার দম দেওয়া শেষ হল। আমার ভোগ শেষ হয়ে গেল। তাদের জন্য গাঁজার ব্যবস্থা মহারাজজীই করতেন, অতএব মহারাজজীর এই নিশ্চয় শুনে তাঁরা দুঃখ পেয়েছিলেন। মহারাজজী তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ''আমি না খেলে কি হবে? তোমরা পাবে।'' মহারাজজী পদ্মাসনে বসে রামায়ণের অবধ-প্রসঙ্গ শুনছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবচন সমাপ্ত হয়েছিল।

একজন ভক্ত মহারাজজীকে বাতাস করছিল, আমি তার হাত থেকে পাখা নিয়ে তিনবার মাত্র বাতাস করেছিলাম তারপরই মহারাজজী শুয়ে পড়েছিলেন। আমি ভাবছিলাম, আজ গুরুদেব ঝট্ করে কেন শুয়ে পড়লেন, কাছেই দাঁড়িয়েছিল

যাদবভক্ত রামকুমার, সে আমার হাত থেকে পাখাটা নিয়ে মহারাজজীকে বাতাস করতে শুরু করেছিল। আমি কুয়োর দিকে যাচ্ছিলাম, তক্ষুণি রামকুমার ছুটে আমার কাছে এসে বলেছিল, ‘‘মহারাজজীর মুখ থেকে কিছু শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ডেকেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন কথা বলেননি, ভয় পেয়ে আমি তাঁর নাড়ী দেখেছিলাম, নাড়ীবন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্বাস নিচ্ছিলেন না। ভয় পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ ডান অঙ্গ এক সঙ্গে স্ফুরিত হতে শুরু করেছিল। আমি ভেবেছিলাম যে, এখন তিনি সমাধিস্থ, হয়ত এক্ষুণি উঠে বসবেন কিন্তু রাত্রি দুটোর সময় ডাক্তার বলেছিল যে, মহারাজজী তো নির্বাণ প্রাপ্ত করেছেন, তখনও শুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলাম। ডান অঙ্গ সমানে স্ফুরিত হচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে, এর থেকে বড় ক্ষতি কি হবে? আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল। পথ-প্রদর্শক দেদীপ্যমান আলোক তিরোহিত হয়েছিল। এই প্রকার সেই মহাপুরুষ পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল সপ্তমী সংবৎ ২০২৭ তদনুসারে ২৩ মে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন।

আমি তখন প্রারম্ভিক অবস্থার সাধক ছিলাম, সেইজন্য ভুলবশতঃ অধিকারী এবং অনাধিকারীর বিষয়ে মহারাজজীকে প্রশ্ন করে বসেছিলাম। অন্তর্জগত থেকে পরীক্ষা করে মহাপুরুষগণই বুঝতে পারেন যে, কে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে অনাধিকারী। বাইরেটা দেখে আমরা যাকে অধিকারী বলে মনে করি, হতে পারে অন্তর্দেশ থেকে সেই অনাধিকারী।

আশ্রমের যে-যে শিষ্য অন্যত্র ছিলেন, তাদের খবর দেওয়া হয়েছিল। ধারকুণ্ডী স্বামীজী এসেছিলেন। ভগবানানন্দজী মধ্বাপুর থেকে এসেছিলেন। ভক্তরা এসেছিল। শ্রদ্ধালুদের ভীড় উপচে পড়েছিল। মেলা লেগে গিয়েছিল, তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে; তাঁকে লোকে কত ভালবাসে। সকলেই উদাস অশ্রু পূর্ণ নয়নে সেই মহান আত্মাকে ব্যথিত চিত্তে বিদায় দিচ্ছিলেন চতুর্থ দিন সমাধি দেওয়া হয়েছিল। ধূমধাম করে মহারাজজীর ভাণ্ডারা হয়েছিল। হাজার-হাজার ভক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পিত করেছিল।

ভক্তদের শ্রদ্ধা অনুসারে মহারাজজীর সমাধি মন্দিরের নির্মাণ করা হয়েছিল। মহারাজজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ নিজের-নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। অন্যান্য যারা আশ্রমে বাস করতেন, তারা না বলেই আশ্রম থেকে চলে গিয়েছিলেন, জনশূন্য স্থানে স্থিত সেই বিশাল আশ্রমের ব্যবস্থা সঞ্চালন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মহারাজজী অনুসুইয়াতে নিবাসের অবধিতে সেখানে একটাও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এখন বরিষ্ঠ কোন মহাপুরুষকে তাঁর জায়গাতে না দেখে, তাঁর শূন্য আসন দেখে কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে, সেটা আশ্রমের মর্যাদার বিরুদ্ধে হবে। এইসব ভেবে মনে-মনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি অনুরোধ করে স্বয়মানন্দজীকে তাঁর আশ্রমে ফিরে যেতে দিইনি, এদিকে রোজই তিনি যাবার কথা বলতেন, এবং একদিন চলেও গিয়েছিলেন। চিন্তার সেই দিনগুলিতে মহারাজজীকে তাঁর আসনে বসে থাকতে দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ''কেন রে! আমি আসনে বসে তো রয়েছি, সব দেখছি-তুই কেন চিন্তা করছিস?'' সেদিন থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর বাণী, ''হো! আমার মৃত্যু হবে না। সূক্ষ্ম দেহে সর্বদা এখানে বিরাজ করব। যে স্মরণ করবে, আমি তারই কল্যাণ করব।''

এই ছিল সেই মহাপুরুষের জীবনের আদর্শ এবং পরমকল্যাণের উৎকর্ষতা, যা সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়ে যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন জনসাধারণের কল্যাণ করবে।

।। ওঁ ।।

অমরবাণী বারহমাসী (বারোমাস্যা)

ভূমিকা

প্রস্তুত অধ্যায়ে পরমশান্তি পথ-নির্দেশিকা তাঁর অমর বাণী আত্মানুভূতির পরিবেশে সাধুসন্তদের হিতার্থে বারমাস্যার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে প্রবেশিকা থেকে আরম্ভ করে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিশা-নির্দেশ করা হয়েছে।

আমরা যেরকম গ্রন্থে পড়েছি, সেরকম কোথাও কিছু ঘটেনি। পিণ্ডরূপে রামের অস্তিত্বও ছিল না এবং ভূখণ্ডরূপে অযোধ্যারও অস্তিত্ব অযোধ্যা বলে কিছু ছিল কি না বলা কঠিন। '**কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি।**' *(মানস, ৭/১২৭/৪)*-কামী, ক্রোধী এবং লোভীকে বলা উচিৎ নয়। এখন আপনি বিচার করুন যে, যখন ঘরে–ঘরে রামায়ণ রয়েছে তখন না বলার প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে? কিন্তু গোস্বামীজী আসল কথা গোপন করে লিখেছেন। পাঠক গণ নিজের-নিজের বুদ্ধি অনুসারে এর অর্থ গ্রহণ করেন। মহারাজজীর গীতার প্রতিও এইরূপ ধারণা ছিল। কবীরের বাণী প্রায়ই গুনগুন করে গাইতেন। একদিন তাঁর শ্রীমুখ থেকে বারোমাস্যার অমরবাণী প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন, "আকাশ বলছে, লিপিবদ্ধ করতে চাইলে করে নাও। এইরূপ বলে তিনি গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছিলেন। শিষ্যগণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এতে সাধকের প্রবেশিকা থেকে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত সাধনাক্রম উক্ত হয়েছে। সাবধান বাণী থেকে শুরু করে ভজনের প্রবেশিকা, মধ্য এবং শেষ পর্যন্ত যে স্থিতি তার চিত্রণ রয়েছে। বারোমাস্যার রূপ শুরুর কয়েকটা পদে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় বারো ভাগে বিভাজিত করে বারোমাস্যার মাধ্যমে যোগের সূক্ষ্ম ভূমিকাগুলির বিস্তার করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম আপনি বারোমাস্যার সম্পূর্ণ ছন্দগুলি দেখুন এবং তদনন্তর অর্থ সহিত তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করে উপকৃত হোন। এই অমরবাণী পাঠ করার পূর্বে আপনাকে একথা মনে রাখতে হবে যে, মহাপুরুষের দৃষ্টি সদা সেই পরম লক্ষ্যের উপরই থাকে, মানব নির্মিত ভাষার উপর থাকে না। ভাষা পরিবর্তিত হয়। বহু মান্যতাপ্রাপ্ত ভাষা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। সঠিক অর্থ হলে তৎসাময়িক ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে লক্ষ্য বিশেষের দিগ্‌দর্শন করতে থাকবে।

বারোমাস্যা

দোহা- চৈত চহত চিতচোরকো, চেলা চতুর সুজান।
চিত কে মিলে ন চৌধরী, ভঈ চিত মে গলতান।।
চতুর ক্যা করী চতুর নে চতুরাঈ,
হামার চিত চেত চকোর কিয়া।
অপনে চিত চাঁদনি চমকাঈ।।
চকচান অচানক চন্দ চঢ়া,
চন্দা কী চমক চিত পর ছাঈ।
চন্দা চহুঁ ওর চকোর চলা,
চিত চেতন মে গিরদী খাঈ।।
ধরনী পর আয়া, চমক মে খো দঈ কায়া।
চলা গয়া চিতচোর, চতুর জব তক চলনে নহিঁ পায়া।।

লাওনী

লাওনী সুন বারহমাসী।
কটৈ জাসে জনম মরণ ফাঁসী।। টেক।।
চৈত মে চিন্তা ইয়হ্ কীজৈ,
কি ইয়হ্ তন ঘড়ী ঘড়ী ছীজৈ।
ইসসে করিয়ে তনিক বিচার,
সার বস্তু হ্যায় কেয়া সংসার?।।
দোহা- সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগত পসার।
নিত্যানিত্য বিবেকিয়া, লীজৈ বাত বিচার।।
ফিরৈ কেয়া মথুরা অরু কাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।১।।
বৈসাখ মে বক্‌ত তুনে পায়া,
ইহাঁ কোঈ রহন নহীঁ আয়া।
কাল নে সবহী কো খায়া,
ইয়হ্ সব ঝুঠী হ্যায় মায়া।।

ধ্যানমগ্ন সদ্‌গুরুদেব পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ

দোহা- ভোগ লোক পরলোক কা, সবহী ত্যাগে রাগ।
রহে ন ইনকী কামনা, তাহি কহৈঁ বৈরাগ।।
তিতিক্ষা তো সোঁ পরকাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।২।।
জেঠ মে জতন ইয়হী করনা,
মিটে জাসে জনম অওর মরনা।
মন ইন্দ্রিয় বিষয়োঁ সে পরিহরনা,
লীজিএ সন্তো কা সরনা।।

দোহা- শ্রদ্ধা কর গুরু বেদ মে, কর মন কা সমাধান।।
কর্ম অকর্ম কে সাধন ত্যাগে, সহে মান অপমান।।
জগত সে রহনা নিত্য উদাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।৩।।
আষাঢ় মে সৎ সঙ্গতি করনা,
ওহাঁ তু পাওে সব মরমা।
তুঝে উহাঁ হোওে জিজ্ঞাসা,
তব লগে মোক্ষ কী আসা।।

দোহা- পরমানন্দ কী প্রাপ্তি, অরু অনরথ কা নাস।
ইয়হ্ ইচ্ছা মন মে রহে, কহে মুমুক্ষা তাস।।
হানি হো জিস্‌সে চৌরাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।। ৪।।
সাওন মে শরণাগত হোনা,
পৈর সদ্‌গুরু কে ধো পীনা।
সাফ জব হোয় তোহরা সীনা,
রঙ্গ তব রহনী কা দীনা।।

দোহা- তত্ত্বমসী কে অরথ কো, তোয় করুঁ পরকাস।
সংশয় শোক মিটে তেরা, হোয় অবিদ্যা নাস।।
মিটে তব ভরম ভেদ রাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।৫।।

মাহীনা ভাদোঁ কা আয়া ভরম সব ছীজৈ।
গুরু কী ভক্তি চিত্ত ধার প্রেম রস পীজৈ।।
ঈশ্বর সে অধিক ভক্তি গুরু কী কীজৈ।
ইস মানব তন কো পায় সুফল করি লীজৈ।।

দোহা- ব্রহ্মবেত্তা বক্তা সুরতি, গুরুকে লক্ষণ জান।
ইচ্ছা রাখে মোক্ষ কী, তাহি শিষ্য পহচান।।

হোয় অমরাপুর বাসী।
লাওনী সুন বারহ মাসী।।৬।।
কোয়ার মে করনা ইয়্হী উপায়,
তত্ত্বমসী শ্রবণন মন লায়
জুগুতি সে মনন করো প্যারে,
খুলে জাসে অন্দর কে তালে।।

দোহা- নিদিধ্যাসন কে অন্ত মে, এইসা হোওে ভান।
ব্রহ্ম আত্মা এক লখ, তব হোয় ব্রহ্ম কা জ্ঞান।।

তহাঁ মিথ্যা জগ নাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।। ৭।।
কার্ত্তিক মে করম সভী নাশা,
জ্ঞান জব উর মে পরকাশা।
তব অপনা আপ রূপ ভাষা,
উসী কা লখো তমাশা।।

দোহা- আর-পার হমরো নহীঁ, নহিঁ দেশ কাল সে অন্ত।
ম্যায় হী অখণ্ডিত এক হুঁ, সব বস্তু কা তন্ত।।

ম্যায় হী চেতন অবিনাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।। ৮।।
অগহন মে জ্ঞান অগিনি জাগী,
লোক সব দাহন কহঁ লাগী।
ফূঁক দিয়ে ব্রহ্মা অরু বিষ্ণু,
ফূঁক দিয়ে রাম অরু কৃষ্ণু।।

দোহা- জলত জলত এইসী জলী, জাকো আর ন পার।
ঈশ্বর জীব ব্রহ্ম অরু মায়া, ফূঁক দিয়ো সংসার।।
বিনা ইঁধন কে পরকাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।৯।।
পূষ মে পূরন আপৈ আপ,
নহিঁ তহাঁ পুন্য অরু পাপ।
কহো অব জপূঁ কৌন কা জাপ,
মিটা সব জনম-মরণ সন্তাপ।।
দোহা- জ্ঞাতা জ্ঞান না জ্ঞেয় কছু, ধ্যাতা ধ্যান না ধ্যেয়।
মম নিজ শুদ্ধ স্বরূপ মে, উপাধ্যেয় নহিঁ হেয়।।
করু ফির কিসকী তল্লাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।১০।।
মাঘ মে মিটী মিলন কী ভূখ,
তহাঁ পর নহিঁ আসিক মাশূক।
ইশ্‌ক ফির কিসকা হোওে,
বৃথা ওয়াক্ত তূঁ কিয়ুঁ খোওে।।
দোহা- ব্যাপক পরমানন্দ মে, নহিঁ আসিক মাশূক।
লক্ষ্য রূপ মে মার নিশানা, বৃথা বিলোকে থূক।
করাবৈ কিয়ুঁ জগ মে হাঁসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।১১।।
বসন্ত ঋতু ফাল্গুন মে আওে,
খেল ইয়হ্ প্রারব্ধ রচওয়াওে
ইত্র গুলাল জ্ঞান রোরী,
খেলতে ভর-ভর কে ঝোরী।।
দোহা- হোলী অবিদ্যা ফূঁকি কে, হো গয়ে গুপ্তানন্দ।
সমঝে কোঈ সূঘড় বিবেকী, কেয়া সমঝে মতিমন্দ।।
জগত কী ধূল উড়ী খাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।১২।।
কটৈ জাসে জনম মরণ ফাঁসী।।

স্পষ্টীকরণ

এই অমরবাণী বারোমাস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট করা হয়। এই বাণী অধ্যয়ন এবং মনন করলে যোগের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। চৈত্রমাস থেকে কবিতা প্রারম্ভ হয়েছে। প্রায়ই-

মোহনিসাঁ সবু সোওনিহারা।
দেখিঅ সপন অনেক প্রকারা।। *(মানস, ২/৯২/১)*

মোহরূপ রাত্রিতে সকলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। দিবা রাত্রি চেষ্টা করে যা কিছু অর্জন করে তা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। মোহরূপ অচৈতন্য অবস্থাতেই অধিকাংশ ব্যক্তি চৈতন্য-অচৈতন্যের সীমা নির্ধারিত করেছে। যেমন-

ভোটের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে যে, আমার প্রতিবেশী পশ্চাত্তাপ করছেন কিন্তু আমি ভোটের আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু সঞ্চয় ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বীতাতে সফল হওয়ার জন্য পূর্বেই একত্রিত করেছিলাম। যারা ব্যবসা করে, তারা যেমন বলে যে, আমি তো মেঘ দেখেই হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিলাম যে, তিলের মূল্যে পরিবর্তন হবে। কিন্তু এরা সকলেই অচৈতন্যই (পরাধীনই)। চিত্তের হুঁশ হয়েছে, তখনই বলা যেতে পারে, যখন এই আত্মা স্ব স্বরূপ লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়। ভরত এবং কাকভুশুণ্ডি এই শ্রেণীরই জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। অবধ রাজ্য তৃণবৎ ত্যাগ করে রামের স্নেহ পাবার জন্য ভরত ব্যাকুল হয়েছিলেন। কাকভুশুণ্ডির যখন চৈতন্য হয়েছিল, তখন তাঁর মন থেকে সমস্ত বাসনা দূর হয়েছিল। যেমন-

মন তে সকল বাসনা ভাগী।
কেবল রাম চরন লয় লাগী।। *(মানস, ৭/১০৯/৬)*

বাস্তবে জ্ঞানলাভ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন শুধু চিত্তের চোরকে লাভ করার অভিলাষা বাকী থাকে। ভগবানই চিত্তচোর, তাঁকে স্পর্শ করলে চিত্ত তাঁতেই বিলীন হয়ে যায়। চুরি করা বস্তু সর্বদার জন্য হারিয়ে যায়। এই আধারেই অমরবাণী আরম্ভ হয়েছে। আগে বারো মাসের সারাংশ উল্লিখিত এবং পরে লাওনীর বিষয়ে বলা হয়েছে। সারাংশ শব্দসমূহে দেখুন।

দোহা- চৈত চহত চিতচোর কো, চেলা চতুর সুজান।
চিত কে মিলে ন চৌধরী, ভঈ চিত মে গলতান।।

অর্থ- চিত্তের চৈতন্য হয়েছে তখনই বুঝবেন যখন শুধু চিত্তচোরকে লাভ করার কামনা বাকী থাকবে। চেলার স্থিতি এটা, সেই চতুর এবং সুজানের স্থিতি যুক্ত। প্রায় সকলেই চতুর হওয়ারই তো ভান করে, কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে অন্যত্র কোথাও চতুরতা করার স্থান নেই। যেমন উক্ত হয়েছে-

চতুরাঈ চুলহে পড়ী, ঘূরে পড়ে অচার।
তুলসী রাম ভজন বিনু, চারো বরন চামার।।

এমন চাতুরীতে আগুন লাগুক, যা ভগবৎ চিন্তন বিহীন এবং নিয়মাদি আবর্জনার পাত্রে ফেলে দেওয়া উচিত, যা আমাদের ভগবৎ-ভজন থেকে বঞ্চিত করে রাখে। চিতচোরকে লাভ করার ইচ্ছা তো জন্ম হল কিন্তু চিত্তের চৌধুরী অর্থাৎ চিত্তকে স্থির করার জন্য সদ্‌গুরুর প্রয়োজন, সদ্‌গুরু না জোটা পর্যন্ত মনে গ্লানি থেকেই যায়।

ব্যাখ্যা-দু'ঘণ্টা ভজনে বসেও আমরা দশ মিনিটের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারি না। শেষে হতাশ হয়ে পড়ি। তার সঙ্গে এও বলি যে, মন একাগ্র হয় না। যতক্ষণ চিত্তের চৌধুরী অর্থাৎ এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সদ্‌গুরু লাভ হয় না, ততক্ষণ স্থির হয় না। সেই মহাপুরুষ হৃদয় দেশ থেকে চিত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় থাকে না।

সম্বন্ধ- চতুরতা কাকে বলে?

চতুর কেয়া করী চতুর নে চতুরাঈ,
হামারা চিত্ত চেত চকোর কিয়া।
অপনে চিত চাঁদনি চমকাঈ।।

অর্থ- যিনি চতুর তিনি কি চতুরতা করেছেন? যেহেতু মহাপুরুষগণই বলেন, সেইজন্য এঁদের স্থিতিলাভ করার জন্য চকোরের ন্যায় হয়ে যান। এইরূপ চকোর হতে পারলে মহাপুরুষের চিত্তের প্রকাশে নিজের চিত্ত ওতপ্রোত দেখতে পান। যেমন '**অপনে চিত্ত চাঁদনি চমকাঈ।**'

চকচান অচানক চন্দ চঢ়া,
চন্দা কী চমক চিত পর ছাঈ।

সেই প্রকাশ আসে কি করে? আপনি শুধু চকোরের মত প্রবৃত্ত হন, এরূপ

হলে অনায়াসেই সেই প্রকাশ চিত্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা-চাঁদ এখানে আকাশের চাঁদকে বলা হচ্ছে না, পরন্তু পরমাত্মার সেই প্রভাকে বলা হচ্ছে। চকোরের ন্যায় হলে চিত্তে সেই প্রকাশ স্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহাপুরুষগণ জগতের দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে অন্তরের স্থিতিগুলি অবগত করাতে থাকেন। এই ভগবৎ পথে আকাশের চাঁদের কোন প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ—'**মন সসি চিত্ত মহান**' ***(মানস, ৬/১৫ক)***। মনই চন্দ্রমা এবং আকাশকে শূন্য বলা হচ্ছে। যখন মন শূন্যে টিকবার ক্ষমতা লাভ করে, তখন এই মনকেই চন্দ্রমা বলা হয়। (এটাই চন্দ্রমার সংজ্ঞা স্থিতি) এই কারণেই সেই চন্দ্র অন্য কোন স্থানে ওঠে না, পরন্তু চেতনের প্রকাশই চিত্তে ছেয়ে যায়। এটা তখনই সম্ভব যখন চকোরের গুণধর্ম আপনার মধ্যে দেখা যাবে।

চন্দা চহুঁ ওর চকোর চলা,
চিত চেতন মে গিরদী খাঈ।।

এই অবস্থাতে সেই চেতনের প্রকাশ, যা চিত্তে ছেয়ে আছে, চিত্ত পর্যন্তই সীমিত না থেকে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে। সর্বত্র সেই স্বরূপই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

সরগু নরকু অপবরগু সমানা।
জহঁ তহঁ দেখ ধরেঁ ধনু বানা।। ***(মানস, ২/১৩০/৭)***

চিত্ত সেই প্রকাশে প্রকাশিত হলে স্বর্গ-নরক বলে কিছু থাকে না। যতক্ষণ এক হয় না, ততক্ষণ পথ চলা বাকী থাকে। সেইজন্য—"**চকোর চলা, চিত চেতন মে গিরদী খাঈ।**" আরও এগিয়ে গেলে চিত্ত সেই রূপের স্পর্শ করে তাতেই একাকার হয়। সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু পৃথক থাকার জন্যই চকোর হয়ে আছে, স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাতেই বিলীন হয়ে যায়।

ধরনী পর আয়া, চমক মে খো দঈ কায়া।

যখন সেই রূপের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখন আর এমন কোন সত্তা থাকে না যার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এইরূপ স্থিতিলাভ হয় কোথায় ? এই দেহরূপ পৃথিবীতেই। যেমন-

ধড় ধরতী কা একৈ লেখা। জস বাহর তস ভিতর দেখা।

ধড় শরীরকে বলা হয় এবং ধরতী বলে এই পৃথিবীকে। যা কিছু দেহের ভিতরে দেখা যায়, তা বাহ্য জগতের মতই। দেহরূপ পৃথিবীতে চিত্ত চেতনের অনুরূপ হয়ে গেল এবং জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়া শেষ হল। কায়া হল জন্ম-মৃত্যুর সেই বিধান, যা জীবাত্মাকে পিণ্ডরূপ প্রদান করে। এই দেহই শেষ হয়ে গেল, তবে আর কিরূপ সংসার? তদ্রূপ হওয়ার পর একের মধ্যে এক-এর ভানও থাকে না, সেইজন্য চিতচোর বলে আর কেউ থাকে না।

চলা গয়া চিতচোর, চতুর জব তক চলনে নহিঁ পায়া।।

এর বেশী কামনা চতুরের নেই। বিলয়কাল পর্যন্ত চতুর চলতে পারে না। যতদূর পর্যন্ত মন-বুদ্ধি ধারণা করতে পারে, সেইটুকু দূরত্বই সাধক নিজে থেকে অতিক্রম করে। এরপরের অবস্থাতে চেতন (ইষ্টদেব)ই সাধককে পরিচালিত করে নিজের স্থিতির সমতুল্য স্থিতি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা- পরবর্তী মাসগুলিতে এই বিষয়েই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, যা বুঝে সাধক সাধনাতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি এটা কিন্তু কোন না কোন অবস্থাতে পরে সকলের জন্য সুলভ হতে পারে।

লাওনী

যে নিয়ে আসে তাকে ‘লাওনী’ বলে। ভজনের প্রবৃত্তি সেই পরমচেতনাকে নিয়ে আসতে সক্ষম। অতএব চিন্তনের প্রবৃত্তিকে লাওনী বলে। নিষ্ঠা, লাওনী লও ইত্যাদি শব্দগুলি একে অপরের পর্যায়ভুক্ত। এগুলির মধ্যে যেটাই বলা হবে, মানেটা সেই একই হবে, শুধু অল্প ওঠা-পড়া আছে। যখনই কারও নিষ্ঠা চেতনাকে লাভ করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন তার রূপ এই থাকে।

জাগত মে সুমিরন করে, সোবত মে লও লায়।
সুরতি ডোর লাগি রহে, তার টুটি ন জায়।।

অষ্টপ্রহর অর্থাৎ নিদ্রা যাবার সময় এবং জাগ্রত অবস্থাতে তৎপরতা এমন থাকা উচিত, যাতে চিন্তনের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে। এমন যেন না হয় যে, গ্রীষ্মে হল না তো শীতে হবে। প্রত্যেক দেশকালে স্মরণে নিযুক্ত করতে হবে, সেইজন্য একে বারোমাস্যা বলে। নিয়ম শুধু সকাল-বিকাল পর্যন্তই অন্যসময় মনকে

নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা, এটা ভজনা নয়। এটা তো শুধু চেষ্টা করা, যাতে পথে এগোনো যেতে পারে। এখন এই পদ প্রসঙ্গে দেখুন-

লাওনী সুন বারহমাসী।
কটৈ জাসে জনম মরণ ফাঁসী।। (টেক) ।।

এখন সেই নিষ্ঠা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করুন, যাতে অষ্টপ্রহর, বারোমাস নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকলে জন্ম-মৃত্যুর ফাঁস ছিন্ন হয়। এবং জীবাত্মা পরম চেতন স্বরূপ লাভ করে। যেমন '**দিন-দিন বঢ়ত সওয়ায়ো।**' প্রত্যেকদিন সোয়া বৃদ্ধি হলেই মঙ্গল হয়। এইরূপ নিষ্ঠার মহত্ব সর্বদা ছিল এবং আছে, যা জন্ম মৃত্যুর ফাঁস ছিন্ন করতে সমর্থ।

সম্বন্ধ- এখানে শুধু ভজনাকারীদের জন্য বলা হচ্ছে এমন কথা নয়, না হলে সাংসারিক ব্যক্তিদের জন্য কোন উপায়ই থাকবে না। সেইজন্য যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাকে সেখান থেকেই হুঁশিয়ার করে আরো ক্রিয়াত্মক বিস্তার করা হয়েছে।

সাধনা-ক্রম মে বারহ মহীনে।
চৈত মে চিন্তা ইয়হ্ কীজৈ'
কি ইয়হ্ তন ঘড়ী-ঘড়ী ছীজৈ।
ইসসে করিয়ে তনিক বিচার,
সার বস্তু হ্যায় কেয়া সংসার?

অর্থ- যতক্ষণ আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে আছি ততক্ষণ একথা সত্য যে চৈতন্য হয়নি। এখন চৈতন্য লাভ করার জন্য দেহের স্থিতির উপরও বিচার করা আবশ্যক যে, প্রতিক্ষণে এর ক্ষয় হচ্ছে। আমরা ভাবি যে, বেশী বয়স হয়ে গেছে এখন কি করে হবে, কিন্তু এটা ভাবা ভুল। মনে করুন যে, আমার আয়ু ৬০ বছর মাত্র আর আমি ৫০ বছরের হয়ে গিয়েছি, তবে দশ বছরই তো বাকী রইল। দেহটা প্রতিক্ষণে কালের কবলে আরও ভালভাবে জড়াচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা পিতা এবং পরমপ্রিয় পুত্রকে ফেলে আসতে দেখি। এই দেহটাই নাশবান, তাই ভোগ্য পদার্থ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে টেনে জোর করে কোথায় যে ফেলে আসবে। একগ্রাস বেশী খাবার জো নেই। ভোগ্য পদার্থই তো সংসার। যেমন,

ম্যায় অরু মোর তোর তঁ্যায় মায়া। *(মানস, ৩।১৪।২)*

দেহটাই মরণধর্মা, তবেই বিচার করুন যে, এই সংসার কি সত্য? একথা প্রমাণিত যে, সংসার মিথ্যা।

ব্যাখ্যা- মনে রাখবেন-

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ।
সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।। *(মানস, ৩।১৪।৩)*

মনকে বশীভূত করে ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব-স্ব বিষয়ে যতদূর পর্যন্ত ধাবিত হয়, ততদূর পর্যন্ত নিজের ভোগের সামগ্রীই খুঁজে বেড়ায়। এ সবই মায়া, এরই নাম সংসার। শেষ সময়ে সবকিছু ছেড়ে যেতে হয়। এসব দেখেই মহাত্মা বুদ্ধের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু দেবতাদের জন্যও দুর্লভ। এই দেহ আমাকে লাভ করার সাধন এবং ভব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম।

সম্বন্ধ- যে দেহের জন্য ভোগ্য পদার্থ অথবা সংসার আমাদের প্রিয় বলে বোধ হয়, সেটাই নাশবান্, তবে সত্য কি?

দোহা— সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগত পসার।
নিত্যানিত্য বিবেকিয়া, লীজৈ বাত বিচার।।

অর্থ- সত্য বস্তু অথবা যা পরমসত্য তা হল আত্মা। এই নির্ণয় মহাপুরুষের। জগৎ দেখতে খুব সুন্দর লাগে, কিন্তু হচ্ছে একদম মিথ্যা। '**নিত্যানিত্য বিবেকিয়া**'- সত্য কি আর অসত্যই বা কি? এটা বিচার করুন। এই বার্তা সম্বন্ধে বিচার করা উচিৎ। এখানে বিচারহীনদের জন্য কোন স্থান নেই।

ব্যাখ্যা- বিচার না করলে সময় পার হয়ে যাবে, ফাঁকিতে পড়তে হবে, বিচারহীনদের কাছে বহুমূল্য মানবদেহ তুচ্ছ।

ফিরৈ কেয়া মথুরা অরু কাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

কাশী, মথুরা ইত্যাদি বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গে এই নিষ্ঠার কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো মানসিক প্রবৃত্তি, যা প্রভুর দিকে নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে

এবং এর ফলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়। নিষ্ঠার এই পরিস্থিতিতেই এগিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়।।

বৈসাখ মে ওয়াক্‌ত তুনে পায়া,
ইয়াহাঁ কোঈ রহন নহীঁ আয়া।
কাল নে সবহী কো খায়া,
ইয়হ্ সব ঝূঠী হ্যায় মায়া।।

অর্থ-বৈশাখ=বিশেষ প্রমাণ। দেহটা কালের কবলে রয়েছে, সংসারের নশ্বরতা থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে। দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে বিচার করে সংসার নশ্বর এই বোধ হলে আমরা চিন্তিত অবশ্যই হব, সেইজন্য সময় পাওয়া গেছে। কিরূপে-

বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাওয়া। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাওয়া।।
সাধনধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁওয়ারা।।

(মানস, ৭/৪২/৭-৮)

সো পরত্র দুখ পাওই, সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈস্বরহি, মিথ্যা দোস লগাই।।

(মানস ৭/৪৩)

বড় ভাগ্য যে মানব দেহ লাভ হয়েছে। এটা সাধনের ধাম এবং মোক্ষের দুয়ার। যে ব্যক্তি এই মানব দেহ লাভ করে গমনাগমন থেকে মুক্ত হয় না, সে মাথা কুটে পশ্চাত্তাপ করে। কাল, কর্ম এবং ঈশ্বরের উপর বৃথা দোষারোপ করে, যদিও এখানে সব দোষ তার। মানব-দেহ সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার সাধন, শেষ যোনিগুলি শুধু ভোগ করে যাওয়ার জন্য প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য মহাপুরুষগণ বলেন, তুমি সময় পেয়েছ। নিঃসন্দেহে এটা ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু আজকের দিনটা হাতে রয়েছে। বর্তমান তো রয়েছে। হয়ত এর পরেও সংসারের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারে, সেইজন্য বলছেন, যে কাল সকলকে বলপূর্বক ভক্ষণ করেছে। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি কাউকেই তো দেখছি না। এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মায়া সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ব্যাখ্যা- সেই মহাপুরুষগণ দেহ থাকতে থাকতেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার

করেছেন। তাঁরা দেহ থেকে পৃথক ব্যাপক স্থিতি উপলব্ধি করেছিলেন। এটাই তো করতে হবে-

'সন্তো! জীবিত হী করু আশা।'
জীবিত মে মরনা ভলা, জো মর জানে কোয়।
মরনে সে পহলে মরে, অজর অমর সোই হোয়।।

সম্বন্ধ- মায়া সম্পর্কে পুনরায় সতর্ক করছেন,কারণ একবার শুধু বুঝে গেলে এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। প্রায় সকলেই তো বইয়ের পাতাই উলটাচ্ছে কিন্তু যথার্থ কি, তা বোধগম্য হয় না। সেইজন্য মহাপুরুষ বৈরাগ্যের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে বলছেন-

দোহা- ভোগ লোক পরলোক কা, সবহী ত্যাগে রাগ।
রহে ন ইনকী কামনা, তাহি কহৈঁ বৈরাগ।।

ইহলোকের ভোগ, যা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রগুলিতে পর্যন্ত উপভোগ করা হয় এবং পরলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদির যে ধারণা রয়েছে, যখন এ সকলের লেশমাত্রও কামনা থাকবে না, তখন বুঝতে হবে যে বৈরাগ্য হয়েছে। বৈরাগ্যের তাৎপর্য হল আসক্তির অভাব।

তিতিক্ষা তো সোঁ পরকাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

তিতিক্ষা- ত্যাগের ইচ্ছা। ত্যাগের ইচ্ছা কত তীব্র এটা তো সাধকের উপর নির্ভর করে। যদি জন্ম-মৃত্যুর ফাঁসকে ছিন্ন করতে ইচ্ছুক, তবে ত্যাগের ইচ্ছা তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে। তিতিক্ষার প্রকাশ তোমার দ্বারাই হবে। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এটা মহাপুরুষের ক্ষেত্রের বিষয় নয়। তিনি তখন দেখবেন যখন আমাদের অন্তরে ত্যাগ এবং লাভ করার ইচ্ছা প্রবল হবে।

জেঠ মে জতন ইয়হী করনা,
মিটে জাসে জনম অওর মরনা।
মন ইন্দ্রিয় বিষয়োঁ সে পরিহরনা,
লীজিএ সন্তো কা সরনা।।

অর্থ- জেঠ = যার আগে জন্ম হয়। সাধনার প্রথম অবস্থাতে শুধু এই চেষ্টা

করতে হবে, যাতে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়। ঋদ্ধি এবং সিদ্ধিতে জড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। কিরূপ চেষ্টা? মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে সবলে আকর্ষণ করে মহাপুরুষের শরণাগত হতে হবে।

সম্বন্ধ- এখন অন্যান্য মহাত্মাদের সঙ্গে সদ্‌গুরুর বিশেষ স্থান দেখিয়ে বলছেন যে,

দোহা- শ্রদ্ধা কর গুরু বেদ মে, কর মন কা সমাধান।
কর্ম অকর্ম কে সাধন ত্যাগে, সহে মান অপমান।।

সাধুদের মধ্যে যিনি সদ্‌গুরু তাঁর প্রতি এবং তাঁর বিদিত বাণীতে মনের সমাধান সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে করুন। আর কোথাও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। যদি করে থাকেন তবে এখনও সাধকের পর্যায়ে পড়েন না। কর্ম-অকর্ম-এর তাৎপর্য নিষ্কামভাবে করে যাওয়া। বুদ্ধির স্তরে এইভাব নিয়ে চলতে হয় যে, আমি কর্ম করছি না, যাতে কর্মের প্রতি অনুরাগ না উৎপন্ন হয়ে যায়। ফললাভ করার ইচ্ছা না জাগ্রত হয়। এরূপ দায়িত্ব ত্যাগ করুন। মান-অপমান যা কিছু সব সহ্য করে যান।

ব্যাখ্যা- মন সদ্‌গুরুর চরণযুগল ধ্যান করে যদি সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পায়, তাহলে আর কোন্ সাধনা বাকী রইল? মন যখন বাইরে বেড়াবার সুযোগ পায় না, তখন কামনা করবে কি করে? ক্রিয়া এটাই, কিন্তু এটা মহাপুরুষের উপর নির্ভর করে।

জগত সে রহনা নিত্য উদাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

জগৎ সম্পর্কে উদাস থাকতে হবে। যদি জগতের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, তবে গুণ-ধর্ম এবং তাঁর বাণী অনুসরণ সবকিছু অবরুদ্ধ হবে, এরূপ স্থিতিতে মনের বিলুপ্তি ঘটা অসম্ভব। যদি মনে জাগতিক চিন্তা আসে আসক্তি উৎপন্ন হয় তবে শ্রদ্ধা এবং সমর্পণের ভাব নষ্ট হয়। যে প্রবৃত্তি সেই চেতন তত্ত্বকে নিয়ে আসে, তার বিষয়ে শোন, যা নিরন্তর প্রবাহিত থাকে এবং এতে কালের পার্থক্য নেই।

সম্বন্ধ- সাধুদের মধ্যে যিনি সদ্‌গুরু তাঁতে এবং তাঁর বাণীতে মনকে সমাহিত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু হুট করে মন লাগে না। এরূপ পরিস্থিতিতে কিছু করতে হবে।

আষাঢ় মে সৎ সঙ্গতি করনা,
ওহাঁ তু পাওে সব মরমা।
তুঝে ওহাঁ হোওে জিজ্ঞাসা,
তব লগে মোক্ষ কি আসা।।

অর্থ- আষাঢ়=আষ + আঢ়=পুরোনো আশা। সেই আশা যা পুরোনো, যা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য জাগ্রত হয়। তা জাগার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুলভ হয়। তখন সাধকের কর্তব্য সৎসঙ্গ করে যাওয়া, এই সৎসঙ্গের প্রভাবে সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। সৎসঙ্গের তাৎপর্য শুধু শ্রবণ নয়, পরন্তু ধ্যান এবং চিন্তনকেও সৎসঙ্গ বলা হয়েছে। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, **'সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা'** আত্মাতে মনকে স্থির করতে হবে। আত্মা সত্য ঠিকই, কিন্তু একে যে দেখা যায় না। যে মহাপুরুষ আত্মসাক্ষাৎ করে পরমাত্ম স্বরূপে স্থিত, তাঁর স্বরূপে মনকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে নিযুক্ত করতে হবে অথবা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। যেমন-যেমন গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, তেমন-তেমন তাঁকে জানার ইচ্ছা প্রবল হবে, তখন মোক্ষ লাভ করার আশা জাগবে। বাস্তবে এই পথেই মুক্তি লাভ হয়, তার আগে পর্যন্ত সকলেই শুধু বলেই বেড়ায় কিন্তু-

জানে বিনু ন হোই পরতীতী।
বিনু পরতীতি হোই নহিঁ প্রীতী।। *(মানস, ৭।৮৮।৭)*

ব্যাখ্যা- সুগ্রীব যখন রামের অতুলনীয় জোরের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তখনই তাঁর আশা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল।

সম্বন্ধ- মোক্ষের আশা জেগেছিল, কিন্তু মোক্ষ অথবা মুমুক্ষা হয় কিরূপ?

দোহা- **পরমানন্দ কী প্রাপ্তি, অরু অনরথ কা নাশ।**
ইয়হ্ ইচ্ছা মন মে রহে, কহে মুমুক্ষা তাশ।।

যে ক্ষেত্রে অনর্থ অথবা শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রের নাশ এবং পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি হোক। মনের মধ্যে শুধু এই কামনা বাকী থাকলে, একেই মুমুক্ষা বলে।

হানি হো জিস্‌সে চৌরাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

চুরাশী লক্ষ যোনিতে আবদ্ধ সংসারের নাশ এর দ্বারা হবে। কিছু-কিছু যুক্তি দ্বারা এই (চুরাশী লক্ষ) ধারণা, মাপদণ্ড আগে থেকেই চলে আসছে। যে-যে প্রযত্ন দ্বারা গমনাগমন থেকে মুক্তি লাভ হয়, তার বিধান হল যে, যতক্ষণ সেই তত্ত্বকে দেখা না যায়, ততক্ষণ সতত চেষ্টা করতে হবে। যেমন-

আঠ পহর লাগা রহে, ভজন তেল কী ধার।
জগত বলাবলি খাক হ্যায়, হরি রস হ্যায় আধার।।

এখন শুধু মোক্ষের ইচ্ছা বাকী। এরূপ স্থিতিতে যে সাধক, সেই সাধকের লক্ষণ কিরূপ?-

সাওন মে শরণাগত হোনা,
পৈর সদ্‌গুরু কে ধো পীনা।
সাফ জব হোয় তোহরা সীনা,
রঙ্গ তব রহনী কা দীনা।।

অর্থ- শ্রাবণ=শ্রবণ করা। ইষ্টদেবের কাছ থেকে যে-যে নির্দেশ আসবে, সেই অনুসারেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। যখন নিরন্তর নির্দেশ আসতে থাকে, তখন সদ্‌গুরু অভিন্নহৃদয় হয়ে পথ প্রদর্শন করেন। সেই নির্দেশগুলি পালন করতে-করতে ইষ্টের শরণাগত হয়ে তাঁর চরণ যুগল ধরে মনে-মনে ধুয়ে, সেই চরণামৃত পান করতে হবে। স্থূল দেহের চরণযুগল ধোয়ার বিধান নেই। যেমন-যেমন আমরা সদ্‌গুরুর চরণে ধ্যান কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করব, তেমন-তেমন সেই স্থিতি হৃদয়ে প্রকট হবে।

ব্যাখ্যা- জন্ম-জন্মান্তরের মল-আবরণ অথবা বিক্ষেপ দূর হলে মহাপুরুষের স্থিতির অনুরূপ স্থিতি লাভ হয় অথবা স্থিরতা আসে। যেমন-

(হে হরি) কবহুঁক হৌঁ ইয়হি রহনি রহৌঁগো।
বিগত মান, সম সীতল মন, পর-গুন নহিঁ দোষ কহৌঁগো।। ***(বিনয়০, ১৭২)***

এই অবস্থাতে সাধুদের স্থিতির অনুরূপ স্থিতি আসতে থাকে।

দোহা- তত্ত্বমসি কে অরথ কো, তোয় করুঁ পরকাস।
সংশয় শোক মিটে তেরা, হোয় অবিদ্যা নাস।।

যখন হৃদয়ের মলাবরণ এবং বিক্ষেপ কমতে থাকে এবং স্থিতি লাভ হয়, তখন পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ তিনি অন্তর থেকে 'তত্ত্বমসি'-এর অর্থপ্রকাশ করেন অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মা ও তুমি অভিন্ন, তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ অনুভবের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটিত করেন। পরিণামস্বরূপ সংশয়-শোক চিরকালের জন্য দূরীভূত হয় এবং অবিদ্যা নাশ হয়। নিরন্তর প্রযত্ন করে গেলেই এটা সম্ভব হয়।

মিটে তব ভরম ভেদ রাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

এর সাথেই ভ্রম এবং ভেদাভেদ মিটে যায়, সাধনাতে ছেদ যাতে না পড়ে।

সম্বন্ধ- যখন ভক্ত স্থিতি লাভ করেন, অন্য শব্দে সাধকের হৃদয় ইষ্টের অনুরূপ স্থিতিতে পরিণত হয়। যেমন ভাদ্র মাসে ফসল পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে এই স্থিতিতে ভজনের পরিপূর্ণতা থাকে।

মহীনা ভাদোঁ কা আয়া ভরম সব ছীজৈ।
গুরু কী ভক্তি চিত্ত ধার প্রেম রস পীজৈ।।
ঈশ্বর সে অধিক ভক্তি গুরু কী কীজৈ।
ইস মানব তন কো পায় সুফল করি লীজৈ।।

অর্থ- ভাদ্র = ভজনার পরিপূর্ণতা। এখন ভজনের পূর্ণতাতে ক্ষীণ ভ্রম, গুরুর প্রতি অনুরাগী এবং প্রেম রসে সিক্ত থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ এই মহাপুরুষদেরই কৃপার ফলস্বরূপ আজ এরূপ স্থিতি লাভ হয়েছে, কিন্তু মহাপুরুষগণ আদেশ দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের থেকে বেশী ভক্তি সদ্‌গুরুকে করবে। মহাপুরুষগণ বলেছেন যে, ভক্তি করাটা স্বাভাবিক কিন্তু সন্দিগ্ধ ভক্তিকে, ভক্তি বলা চলে না। ঈশ্বরের থেকে বেশী ভক্তি গুরুকে করলে তবেই এই মানবদেহ ধারণ সফল হবে। যে কাজের জন্য এই দেহ ধারণ, যখন সেই কাজ সম্পূর্ণ হবে সফলতা লাভ তখনই হবে। লোকের ধারণা যে ঈশ্বর বলে ভিন্ন কোন সত্তা আছে এবং তিনি মহান, ফলে সদ্‌গুরুর সর্বতোভাবে ভজনা করতে পারে না। সাক্ষাৎকার করার জন্য ঈশ্বর নামের কোন বস্তু নেই। গুরুর গুরুত্ব লাভ হলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, এর পূর্বে নয়।

'তুম্হ তেঁ অধিক গুরহি জিয়ঁ জানী।' *(মানস, ২/১২৮/৮)*

'গুর বিনু ভব নিধি তরই ন কোঈ।
জৌঁ বিরঞ্চি সংকর সম হোঈ।।'

(মানস, ৭/৯২/৫)

'ইয়হ্ তন বিষ কী বেলরী, গুরু অমৃত কী খান।
সীস দিয়ে সদ্‌গুরু মিলেঁ, তো ভী সস্তা জান।।' (কবীর)

সেই গুরু কিরূপ, যাঁকে ভক্তি করতে হবে?

দোহা- ব্রহ্মবেত্তা বক্তা সুরতি, গুরু কে লক্ষণ জান।
ইচ্ছা রাখে মোক্ষ কী, তাহি শিষ্য পহচান।।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন এবং ব্রহ্মের বিষয়ে ব্যক্ত করতে সক্ষম, মনের দৃষ্টির গতিবিধিতে প্রবেশ দিতে সক্ষম, তিনিই গুরু। এটা যোগের বিষয়। শুধু মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষী, যে সিদ্ধাই এবং সম্মান কামনা করে না, সেই শিষ্য।

হোয় অমরাপুর বাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

এইরূপ যোগাযোগ ঘটলেই অজর, অমর এবং শাশ্বত পুরে স্থান পাওয়া যায়। যে প্রবৃত্তি ইষ্টের সমান স্থিতি এনে দেয়, এর নিয়ম সম্বন্ধে শোন, এতে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকতে হবে।

সম্বন্ধ- মন যখন সদ্‌গুরুর চরণযুগল ধ্যান করে সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পায়, তখন সেই পরমতত্ত্বের সঞ্চার অনুভবে ধরা পড়ে, যাকে লোকে 'আমি আছি'-এইপ্রকার বলে।

কোয়ার মে করনা ইয়হী উপায়,
তত্ত্বমসি শ্রবণন মন লায়।
জুগুতি সে মনন করো প্যারে,
খুলে জাসে অন্দর কে তালে।।

অর্থ- কোয়ার = বিকারগুলি নাশ হওয়া। 'কু' বলে দূষিতকে এবং 'আর' বলে ছেদন করাকে। সাধক দ্বারা যেমন-যেমন বিকারগুলি শান্ত হবে, তেমন-তেমন তিনি তত্ত্বমসীর আদেশ পাবেন। যেমন সদ্‌গুরু পূর্বেই বলে থাকেন

যে, যখন হৃদয় শুদ্ধ হবে, তখন সেই তত্ত্বমসীর সঞ্চার আমি করব। অন্তর থেকে যে-যে আদেশ পাবেন সেগুলি শোনা এবং তাতেই মনকে নিযুক্ত করা, সাধকের জন্য এটুকু উপায়ের বিধান রয়েছে। সাধক মনকে সেই তত্ত্বে স্থির করে যুক্তি সহকারে তা মনন করবেন, তাহলে অন্তরের তালা খুলে যাবে, যা আত্মা এবং পরমাত্মাতে পার্থক্য করে রেখেছে।

ব্যাখ্যা- সেই আদেশ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ অন্তিম স্থিতির আদেশ সুলভ হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন না কোনরূপে তালা বন্ধই থাকে। এখন রইল যুক্তি সহকারে মনন, তার জন্য আমরা যেমন রামনাম করে থাকি, তেমন নয়। যখন এই নামই মননের স্থিতিতে চলে আসে, তখন তার বাণীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না।

দোহা- নিদিধ্যাসন কে অন্ত মে, অইসা হোওে ভান।
ব্রহ্ম আত্মা এক লখ, তব হোয় ব্রহ্ম কা জ্ঞান।।

নিদিধ্যাসনের শেষে এরূপ বোধ হয় যে, ব্রহ্ম এবং আত্মাতে কোন পার্থক্য নেই। এই একত্ব দর্শনের পরিণামই ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্যাখ্যা- প্রত্যেক ক্ষেত্রের সীমা দুটি-একটি ন্যূনতম এবং অন্যটি অধিকতম অর্থাৎ প্রবেশিকা এবং পরাকাষ্ঠা। উদাহরণস্বরূপ ভক্তি প্রসঙ্গেই দেখুন। যখন থেকে ভক্তি করতে শুরু করা হয় তখন তা ন্যূনতম সীমাতে থাকে এবং যখন সেই লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ করার স্থিতিতে পৌঁছে যায়, সেটাকে অধিকতম সীমা বলা হয়। এই প্রকার নিদিধ্যাসন, যেখান থেকে চিন্তনের দ্বারা জড়-অধ্যাস বিলুপ্ত হতে শুরু করে, সেটা প্রবেশিকা এবং চিন্তনের পূর্ণতাতে যেখানে অধ্যাস সমাপ্ত হয়ে যায়, সেটাকেই পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ অন্ত বলা হয়।

তহাঁ মিথ্যা জগ নাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

এই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোতে মিথ্যা জগৎ শান্ত হয়ে যায়। অতএব চিন্তন কর। এখানে নিষ্ঠা অনিবার্য।

সম্বন্ধ- যখন ব্রহ্ম, আত্মা এক হয়ে যায়, তখনও কি কর্ম (চিন্তন-ক্রম) করতে হয়? না চিন্তন সমাপ্ত হয়। এরই উপর আধারিত পরবর্তী মাস কার্ত্তিক-

কার্ত্তিক মে করম সভী নাসা,
জ্ঞান জব উর মে পরকাসা।
তব অপনা আপ রূপ ভাষা,
উসী কা লখো তমাসা।।

অর্থ- কার্ত্তিক অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ। যখন ব্রহ্ম এবং আত্মা অভিন্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন ভজন সমাপ্ত হয়ে যায়। কারণ ব্রহ্ম থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, থাকলে তবে তো অনুসন্ধান করা হত। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে সব কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। শুভাশুভ কর্ম-ইষ্টকে উপলব্ধি করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেটা শুভ কর্ম। এবং জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারই হল অশুভ। এই প্রক্রিয়া বিষয়োন্মুখ। এটা তখনই সম্ভব, যখন হৃদয় জ্ঞানের প্রকাশে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই জ্ঞান বলে, এটা প্রলাপ নয়। বাক্যজ্ঞানে নিপুণতা অল্পাবধিতেই চলে আসে। কিন্তু সেই জ্ঞানের তো এটাই পরিচয় যে, স্ব-স্বরূপ প্রতিভাত হবে। তারই খেলা দেখ। বিশেষত্ব নিজে দেখ। অন্য কেউ দেখতে পাবে এমন কথা নয়।

সো সুখ জানই, মন অরু কানা।
নহিঁ রসনা পহিঁ জাই বখানা।। *(মানস, ৭/৮৭/৩)*

মহাত্মা কবীরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই সুখ কিরূপ? তখন তিনি বলেছিলেন-

কহেঁ কবীর গুঁগে কী শক্কর, খায় সোই পৈ জানৈ।

ব্যাখ্যা- যাঁর অন্তরে তিনি সঞ্চারিত হন, সেই খেলা তিনিই শুধু দেখবেন, কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। ক্রমশঃ চলে মহাপুরুষই প্রদান করেন, যেমন তাঁদের বিধান রয়েছে।

দোহা- আর-পার হমরো নহীঁ, নহিঁ দেশ কাল সে অন্ত।
ম্যায় হী অখণ্ডিত এক হুঁ, সব বস্তু কা তন্ত।।

এখন সেই খেলার রূপ দর্শন করাচ্ছেন যে, ব্রহ্ম-এর আদি অন্ত নেই। নিজেকে ব্রহ্ম হতে অভিন্ন দেখলেন যা প্রত্যেক দেশ-কাল থেকে অপ্রতিহত, সেইজন্য আমার অন্ত নেই। ব্রহ্ম অখণ্ডিত এবং সব বস্তুর সার। এই প্রকার অখণ্ডিত এবং সব বস্তুর তত্ত্ব হল আমারই চেতনা।

ম্যায় হী চেতন অবিনাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

ব্রহ্ম পরমচেতন এবং বিনাশরহিত সত্ত্বা। তাতেই বিলীন হয়ে গেছে, শুধু স্বরূপ বিদ্যমান। এখন সেই প্রযত্নের ফল লাভ হয়েছে।

সম্বন্ধ- যখন আর কোন সত্তা নেই, তখন লোক-পরলোক, রাম-কৃষ্ণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি, এদের স্বরূপ কি? এঁদের কি পৃথক সত্তা নেই? তখন বলছেন যে, পরমস্বরূপ সবকিছুর পরাকাষ্ঠা। পূর্বের স্থিতি কখন লাভ হয় এবং এর বিশেষত্ব কি? এরই চিত্রণ এই মাসে করা হয়েছে।

অগহন মে জ্ঞান অগিনি জাগী,
লোক সব দহন কহঁ লাগী।
ফূঁক দিয়ে ব্রহ্মা অরু বিষ্ণু,
ফূঁক দিয়ে রাম অরু কৃষ্ণু।।

অর্থ- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই জ্ঞান বলে। তাঁকে জানার পূর্বেই পাপ সমূলে নষ্ট হয়ে যায়।

অগহন=পাপের হননের স্থিতি। পাপ নির্মূল হওয়ার স্থিতিতে জ্ঞান-অগ্নির সঞ্চার হয়, যাতে লোক পরলোক সব ভস্ম হয়ে যায়। রাম, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু অভিন্নভাবে জানার অন্তর্গতই পড়ছে। সেই অভিন্ন স্থিতিতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, রাম এবং কৃষ্ণের স্থিতি সর্বথা বিলীন হয়ে যায়। কারণ এগুলি সেখান পর্যন্ত অবস্থার উঁচু-নীচু নামকরণ। ব্রহ্মা (যেমন সেই চেতন) যে প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান-এর প্রসার করতেন, বিষ্ণু যোগক্ষেমের রক্ষা করতেন। রাম যে প্রকার সর্বত্র রমণ করতে-করতে ব্যাপকতা অনুভব করাতেন এবং কৃষ্ণ যে প্রকার অন্তর থেকে যে কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হয় তার পূরক ছিলেন প্রভৃতি সেই স্থিতিতে বিলীন হয়ে গেছেন। অভিন্ন স্থিতিলাভের পর কে কাকে পোষণ করবে, কে কার প্রসার করবে, কে রমণ করবে এবং কার দ্বারা কতর্ব্যের পূর্তি হবে?

ব্যাখ্যা- ব্রহ্ম যে-যে যুক্তি দ্বারা যোগীর অনুভবে প্রসারিত হন, তারই স্বরূপ। যোগী এখন এই শক্তিগুলির মূল সহজ স্বরূপেই স্থিত হয়েছেন, তবে কার পথ-প্রদর্শন করবেন? যখন পৃথক ছিলেন তখন এই শাখাগুলিই প্রসারিত

হয়ে বুঝিয়ে দিত। মনে রাখবেন জগতে যাঁরা অবতার রূপে আছেন, তাঁরা এরই অপভ্রংশ মাত্র। এই অপভ্রংশ কালান্তরে হয়ই, কিন্তু এর দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রত্যক্ষ স্থিতি যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের জন্য এই স্থিতি লাভের পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ ইষ্টদেব বিশেষ কৃপা করে অন্তঃকরণ থেকে পথ-প্রদর্শন না করেন, ততক্ষণ যীশু, মূসা, মহম্মদ, রাম, রহীম ইত্যাদির ধারণা আছে। তাঁদের সাহায্যেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাধক এগিয়ে যায়। এরপরের অবস্থাতে ইষ্টদেব বহির্জগত থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্দেশে নিজের স্বরূপে যুক্ত করে দেন। এই স্তরের সাধক সাধারণ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে নাস্তিক প্রতীত হলেও সত্যিকারের কৃপালাভের অধিকারী।

দোহা- জলত জলত অইসি জলী, জাকো আর ন পার।
ঈশ্বর জীব ব্রহ্ম অরু মায়া, ফূঁক দিয়ো সংসার।।

ঈশ্বর এবং সাধকের স্থিতি এক, অভিন্ন। এইরূপ জানাকেই জ্ঞান বলে। এই স্থিতি এমনই বিচিত্র যে, এর আদি এবং অন্ত নেই। অর্থাৎ সর্বত্র তা বিদ্যমান। এই স্থিতিতে মায়া এবং সংসার সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের সংজ্ঞা মিটে যায় অর্থাৎ বিলীন হয়ে যায়। কারণ সাধক নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না যাকে বুঝতে হবে। যখন তার থেকে ভিন্ন কোন সত্তা নেই, তখন কাকে বলা আর কি বোঝা? মহাত্মা বুদ্ধ যখন এই স্থিতিতে পৌঁছেছিলেন, তখন লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মহারাজ ব্রহ্মের স্থিতি কিরূপ? তিনি চুপ করে বসেছিলেন কোন জবাব দেননি। তাৎপর্য এই ছিল যে, ব্রহ্ম শান্ত, সেইজন্য শান্তির দিকে সঙ্কেত করেছিলেন, অনির্বচনীয় সেইজন্য মৌন ধারণ করেছিলেন। মহারাজজীর স্পষ্ট অভিপ্রায় এটাই।

বিনা ইন্ধন কে পরকাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

এই আগুন জড় জগতের নয়, যে বস্তুর সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হবে। এটা দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক অগ্নি একেই বলা যেতে পারে। আগুনে দিলে যে প্রকার বস্তু সকল ভস্মীভূত হয়, ঠিক সেই প্রকার ইষ্ট লাভের অগ্নি (যোগাগ্নি) তে সম্পূর্ণ জগৎ সর্বদার জন্য শান্ত হয়ে যায়। তিনি কোন সম্বন্ধ ছাড়াই স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। নিরন্তর অভ্যাস দ্বারাই সেই অগ্নি লাভ করা সম্ভব। শিথিল প্রযত্নের কোথাও

অবকাশ নেই, সেইজন্য একে লাওনী বলে। এর অর্থ হল-নিরন্তর প্রযত্ন করা।

ব্যাখ্যা- এই প্রযত্নকে বোঝার জন্য **'রাম কাজু কীহেঁ বিনু, মোহি কহাঁ বিশ্রাম।'**-এর তাৎপর্য বুঝতে হবে। কিছু কাল ব্যতীত হলেই মনের ইচ্ছাগুলি প্রকট হতে শুরু করে। এই অবস্থাতেই বহু সাধক বিশ্রাম করতে শুরু করেন। হনুমান যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করছিলেন তখন মৈনাক পর্বত তাঁর সম্মুখে এসে বলেছিল যে, বিশ্রাম কর, একথা শুনে হনুমান, উত্তর দিয়েছিলেন-

'রাম কাজু কীহেঁ বিনু, মোহি কহাঁ বিশ্রাম।' *(মানস, ৫।১)*

সংসারই সমুদ্র। মনের ইচ্ছাগুলি মৈনাক পর্বত এবং মান হননকারী বৈরাগ্যকেই হনুমান বলে।

সম্বন্ধ- এখন শুধু মহাপুরুষগণের স্থিতির চিত্রণ বাকী। যা স্বয়ং প্রকাশিত এরূপ প্রকাশে স্থিতিলাভ হওয়ার পর কি মহাপুরুষগণ ভজনা করেন না? এই প্রসঙ্গে পূজ্য মহারাজজী বলেছেন যে,-

পূষ মে পূরন আপৈ আপ,
নহিঁ তহাঁ পুণ্য অরু পাপ।
কহো অব জপূঁ কৌন কা জাপ,
মিটা সব জনম-মরণ সন্তাপ।।

অর্থ- পূষ (পূর্ণতা) মাসে স্বয়ং সম্পূর্ণ। সে অবস্থাতে পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকে না। ভিন্ন কোন সত্তার বোধও বিলুপ্ত, তবে কার জপ করা হবে। অবশেষে জন্ম-মৃত্যুর সন্তাপ মিটে গেছে, যা জপ করার জন্য প্রেরিত করত।

দোহা- জ্ঞাতা জ্ঞান ন জ্ঞেয় কছু, ধ্যাতা ধ্যান ন ধ্যেয়।
মম নিজ শুদ্ধ স্বরূপ মে, উপাধ্যেয় নহিঁ হেয়।।

এই অবস্থাতে জ্ঞাতা বলে কেউ থাকে না এবং জানারও কোন যুক্তি নেই। জানার যোগ্যও কেউ নেই এই অবস্থাতে ধ্যাতা অর্থাৎ ধ্যানকারী, ধ্যানের ক্রম এবং ধ্যেয় বলে কেউ থাকে না। স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ যা পূর্ণ, এর উপাধিও নেই এবং এর নাশের বিধানও নেই।

করূঁ ফির কিসকী তল্লাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

যখন কোন পরমসত্তা অর্থাৎ পরমলক্ষ্য লাভ করা বাকী নেই, তখন এই অবস্থাতে কার খোঁজ করা হবে? এইরূপ প্রযত্নের বিষয়ে শুনুন, যা করলে এই স্থিতি লাভ হয় যার দ্বারা এই স্থিতিলাভ হয় এবং যাতে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকার বিধান রয়েছে।

সম্বন্ধ- পূষ-এ পূর্ণতা তো রয়েছে কিন্তু পূর্ণতা লাভ করলে যে আসক্তি জন্মে তা রয়েছে, আরও এগিয়ে গেলে মহাপুরুষদের এই আসক্তিও চলে যায়। কারণ যখন কোন ভিন্ন সত্তাই নেই তখন কার প্রতি আকর্ষণ এবং কারই বা হবে?

মানুষ যত্র-তত্র মগ্ন হয়ে থাকে, সেইজন্য এখানে স্থিতি প্রত্যক্ষ করে পরের পদে সতর্কবাণী এবং আদেশ দিচ্ছেন। মহাপুরুষ এই স্থিতিতে আদেশাত্মক বাক্য প্রয়োগ করেন। যদি এর পূর্বের স্থিতিতে বলতেন তবে সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকত। যেরূপ-

ভীতর তো হইয়ে নহীঁ, বাহর মে পরকাস।
কহ কবীর কব লৌঁ হরী, ছপরা পর কী ঘাস।। (কবীর)

মাঘ মে মিটী মিলন কী ভূখ,
তহাঁ পর নহিঁ আসিক মাশূক।।
ইশক ফির কিসকা হোওে,
বৃথা ওয়াক্ত তূঁ কিয়ুঁ খোওে।।

অর্থ- এই প্রসঙ্গে গীতার এই দৃষ্টান্ত বিচারণীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, হে অর্জুন! জগৎ-এ আমার জন্য লেশমাত্রও স্বার্থ সাধন বাকী নেই। প্রাপ্তযোগ্য কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নেই। সেই চিত্রণ এই মাসে করা হয়েছে। শ্রী পরমহংস মহারাজজীর বাণীতে তাই চরিতার্থ হয়েছে যে, আমার কোন বস্তুর প্রতি লেশমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নেই।

মাঘ=মহা অঘ, অঘালয়ম্ অশাশ্বতম্। এই সংসারে আমার লেশমাত্রও পাওয়ার ইচ্ছা নেই, যাঁকে লাভ করার ইচ্ছা ছিল, তিনি এখন অভিন্ন। এই অবস্থাতে অনুরাগী ভক্ত, প্রেমাস্পদ বলে কেউ থাকে না। এখন তবে কাকে ভক্তি করা হবে? এখন আদেশ দিচ্ছেন যে, বৃথা সময় কেন নষ্ট করছ, যখন এরূপ স্বরূপ লাভ করেছ? (এইরূপ স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব।)

ব্যাখ্যা- এইরূপ মহাপুরুষগণের মধ্যে উপদেশের প্রবৃত্তি থাকে। তাতেই কল্যাণ হয়। কারণ স্বচক্ষে সমস্তটা দেখেছেন। বাস্তবে এই স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষগণের অধিকার রয়েছে কিছু উপদেশ দেওয়ার। অন্য কারও এ অধিকার নেই, যেমন-

বিন দেখে উস দেশ কী, বাত কহৈ সো কূর।
আপৈ খারী খাত হ্যায়, বেচত ফিরৈ কপূর।। (কবীর)

বৌদ্ধিক স্তরে, তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে যারা উপদেশ দেন, তাঁরা বিভিন্ন মত-মতান্তরের রচয়িতা। কিন্তু যাঁরা স্থিতিলাভ করেছেন, তাঁরা মত মতান্তরের সৃষ্টি করেননি। কারণ যিনি একমাত্র সত্তাকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন না।

দোহা- ব্যাপক পরমানন্দ মে, নহিঁ আশিক মাশূক।
লক্ষ্য রূপ মে মার নিশানা, বৃথা বিলোওে থূক।।

তিনি ব্যাপক, পরমানন্দ স্বরূপ। এই স্থিতিতে ভজনাকারী, ভজনাকারী রূপে থাকে না। ভজনা করার জন্যও কেউ থাকে না। এটাই হল লক্ষ্য স্বরূপের স্থিতি। এতেই লক্ষ্যভেদ কর। ব্যর্থ বিবাদ কেন করছ, কারণ পরিণামে কিছুই লাভ হবে না।

করাবৈ কিয়ুঁ জগ মে হাঁসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

কেন জীব-জগৎ অর্থাৎ জীব যোনিতে ভ্রমণ করে হাসির পাত্র হচ্ছ? ঢোক গিলে ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করলেও পরিণামে নিরাশই হতে হবে। যা মুক্তি প্রদান করে, সেই প্রযত্নের বিষয়ে শোন অর্থাৎ যে নিষ্ঠার সাহায্যে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে, কিন্তু এটা তখনই সম্ভব, যখন নিরন্তর প্রযত্ন করা হবে।

সম্বন্ধ- অবশেষে কি ধরনের সাধকদের লক্ষ্য সাধন তৎকাল হয়, তাদের মহত্ব, জ্ঞান এবং পদের নির্লিপ্ত এবং বিশেষ স্থিতির চিত্রণ করে শেষ পদটি সমাপ্ত করেছেন। এই নিষ্ঠাতে সাধনের নিতান্ত আবশ্যকতার পুষ্টির জন্য শুধু অবিদ্যাকে ছেদন করা হয়েছে, এটা সাধকদের ক্ষেত্রের বিষয়।

বসন্ত ঋতু ফাল্গুন মে আওে,
খেল ইয়হ প্রারব্ধ রচবাওে।।

ইত্র গুলাল জ্ঞান রোরী,
খেলতে ভর-ভর কে ঝোরী।।

অর্থ- ফাল্গুন=বিশেষ ফলদায়ক গুণ, বসন্ত ঋতু=স্থায়ীভাবে আত্মহারা। জড়জগৎ-এ ঋতুগুলি বারবার আসে, চলে যায় কিন্তু যখন হৃদয়রাজ্যে তন্ময়তা চলে আসে, তখন সে অবস্থার আর পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ সর্বদার জন্য স্থির হয়ে থাকে। এই স্থিতি ফলপ্রদ গুণগুলি দ্বারাই লাভ হয়, পরন্তু সেই ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়ার পথে প্রারব্ধও সহায়করূপে কাজ করে। এই সাধনে প্রারব্ধের বিশেষ স্থান রয়েছে।

আতর জড়জগৎ-এর সুগন্ধি দ্রব্যকে বলে। এই স্থিতিতে আতর একটা প্রতীক মাত্র। যখন ঈশ্বরোপলব্ধিতে এই সম্পূর্ণ অবস্থা বিশেষের আচরণ সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন যোগীর ইন্দ্রিয়গুলিতে পরমাত্মার সুগন্ধির সঞ্চার হয়। আবীর, চূন এবং হলুদের গুঁড়া ইত্যাদি যা সর্বত্র ব্যবহার করা হয়, যোগের এই স্থিতিতে, এগুলি জ্ঞান সঞ্চারের প্রতীক, যা এই স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের কাছ থেকে প্রায় সর্বদা সকলে লাভ করেছে। এই স্থিতি লাভ হয় হৃদয়ে, সেইজন্যও হৃদয়রূপ ঝোলাতে সেই স্থিতি এবং জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে। যেমন-

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই বাকী থাকে। কম হয় না।

ব্যাখ্যা- মাঝে-মাঝে শ্রী মহারাজজীকে এই কথা বলতে শুনতাম যে, নামের প্রভাবে অসাধ্যকেও সাধ্য করা যেতে পারে। এই লাওনীতে প্রবেশ এবং পরাকাষ্ঠাযুক্ত যোগ্যতা তো তারা লাভ করে, যারা প্রবৃত্ত হয়। এটা স্বয়ং বিচার করে দেখতে হয় যে, যদি সর্বথা প্রবৃত্ত হতে পারছেন না, তবে অন্ততঃ নামের আশ্রয় নেওয়া উচিৎ।

'মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।।' (মানস, ১।৩১।৯) নামের প্রভাবে কঠিন কুঅঙ্কও মিটে যায়। নিষ্ঠা থাকলে সেটাই প্রারব্ধ হয়ে যায়। কোন মহাপুরুষ কৃপা করে তুলে নিলে দুর্গম পথও সুগম হয়ে যায়। সেবা দ্বারা, সমর্পণ দ্বারা অথবা সর্বস্ব অর্পণ করেও তাঁর হৃদয়ে জায়গা করে নিন। মহাপুরুষ যে কোন ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং ভোগ করে তাকে নিবৃত্তি প্রদান করেন।

দোহা- হোলী অবিদ্যা ফূঁকি কে, হো গয়ে গুপ্তানন্দ।
সমঝে কোই সুঘড় বিবেকী, কেয়া সমঝে মতিমন্দ।।

অবিদ্যারূপ হোলীকে ফুঁ দিয়ে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়ে যান। যা গুপ্ত, আনন্দ, অলখ সেই স্বরূপে লীন হয়ে যান। এটা বন্ধনমুক্ত, বিবেকীব্যক্তিই বুঝতে পারেন, বুদ্ধিহীন নয়।

ব্যাখ্যা- ভাষার জ্ঞান থাকলেই বিবেক-বুদ্ধি জাগে না। অনেক মহাপুরুষ ভাষার নামে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু পরম বিবেকী ছিলেন। মহা বিবেকের স্রোতস্বিনী তাদের দ্বারাই প্রবাহিত হয়েছিল। যেমন-কাকভুশুণ্ডিকেই দেখুন **'হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াই'**, কিন্তু তিনি পড়াশোনা করেননি। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতিও এই প্রকারের মহাপুরুষ ছিলেন।

জগত কী ধূল উড়ী খাসী।
লাওনী সুন বারহমাসী।।

জগৎ অর্থাৎ জীবগতির ধূলো সম্পূর্ণরূপে উড়ে গেছে। জীব গতির নশ্বরতা বিলীন হয়ে গেছে এবং পরম চেতনের গতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে নিষ্ঠা পরমচেতনের সমান স্থিতি প্রদান করে, তার প্রক্রিয়া শোন, এতে পূর্তি পর্যন্ত নিযুক্ত থাকতে হয়। তারপর আর প্রয়োজন হয় না। তারপর তো

'হরিজন ভজন ভেদ সে ন্যারা।'
আঁখ না মুঁদে কান না রুঁধে, কায়া কষ্ট না ধারে।
উঘরে নৈনা সাহব দেখে, সুন্দর বদন নিহারে।। (কবীর)

ভজনের প্রয়োজন থাকে না কিন্তু ভজন নিরন্তর চলতে থাকে।

নির্ণয়

এই অন্তিম পদে সবগুলির নির্ণয় দিয়ে শুধু অবিদ্যাকেই কেন ফুঁ দেওয়া হয়, পূর্ণতা লাভ হলে বিদ্যাও লোপ পায় যখন। বেশীরভাগ মানুষ সাধনাতে পরিশ্রম করতে চায় না কিন্তু যোগ্যতার খ্যাতি প্রাপ্ত করতে চায়, যদিও সেটা প্রত্যক্ষ স্থিতি, খ্যাতি নয়। অতএব নিষ্ঠা দ্বারা অবিদ্যা নাশ করুন। যখন ইষ্টের স্পর্শ লাভ হয় তখন বিদ্যা স্বতই লোপ পায়। বিদ্যা মুছে ফেলার জন্য কোন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় না। বিদ্যা সেই পথ যার সাহায্যে লক্ষ্য অর্থাৎ ইষ্ট পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করা হয়। দর্শনের পরেই পথ চলা শেষ হয়ে যায়। যদি অবিদ্যার সঙ্গে বিদ্যাকেও ত্যাগ করার কথা লিখে দেওয়া হয়। তবে অনভিজ্ঞ বেদান্তবাদীগণ বলার সুযোগ পাবেন। বলবেন যে বিদ্যা

মিথ্যা, ত্যাগ করা উচিৎ। আচরণ করার প্রয়োজন নেই। আমরা পূর্ণ, শুদ্ধ, অজর, অমর পরমাত্মা-ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করবেন। এতে কিছু লাভ হয় না, স্বয়ং তো ক্রিয়া এবং বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে যান এবং অন্যকেও বাধা দেন। যোগপূর্তির পর এর বাস্তব রূপ এটাই। মহারাজজী শুধু এটুকুই নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে সাধকের মনে ক্রিয়া সম্বন্ধে ভ্রম উৎপন্ন না হয়। এই প্রকার সাধককে ক্রিয়া দ্বারা শুধু অবিদ্যা নাশ করতে হবে। বিদ্যা স্পর্শ দর্শন ইত্যাদির সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কালান্তরে যে কুরীতিগুলি ছড়িয়ে পড়ে সেগুলি দূর করার জন্য, মুমুক্ষুদের কল্যাণের জন্য জীবনানুভূতির অমর স্রোত হয়ে মহাপুরুষদের শ্রীমুখ থেকে বাণী সময়ে সময়ে অনায়াসেই প্রস্ফুটিত হয়। পরমপূজ্য শ্রী মহারাজজীর অমরবাণীর দ্বারা বারোমাস্যার অতুলনীয়, পরমার্থবাদী কাব্য-লহরী এই কল্যাণ কামনা করে তরঙ্গিত হয়েছে। আপনার চিন্তনরত ভাব-লহরীতে এই প্রেরণা প্রাদুর্ভূত হয় যে, পরমার্থের পথিক মহাপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করে সাধনা পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত করার জন্য প্রযত্নশীল হবেন। এইরূপ স্থিতিতে সাধকদের যে-যে নির্দেশ সম্বল প্রদান করে, সেগুলি যদি কোন তত্ত্বদর্শীর কৃপাতে অন্তঃকরণে প্রকট হয়ে যায়, তবে প্রগতি সহজ হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যের পূর্তির জন্য বারোমাস্যার সঙ্গীতময় বেগ উন্মুক্ত ভাব-প্রবণতার সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে।

এই কৃতিতে লাওনীর প্রয়োগ সরল কিন্তু হৃদয়গ্রাহী ভাষাতে সরস এবং সহজবোধ্য ভাবে করা হয়েছে। প্রথমবার অধ্যয়ন করলেই হৃদয়ে প্রবল জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে। কিন্তু কল্যাণকর উপলব্ধি তখনই সম্ভব, যখন তা অনুশীলন করা হবে। বারোমাস্যাতে চৈত্রমাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ক্রমাগত বর্ষ-বিকাশের সামঞ্জস্য সাধনাত্মক ভঙ্গিতে করা হয়েছে। কি প্রকারে অনুরাগীর অন্তঃকরণে নিষ্ঠার জ্যোতি জ্বলে উঠবে। কোন্ অন্তপ্রেরণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে লাভান্বিত হয়। তদনন্তর সাধকের মধ্যে কিরূপে বিলক্ষণ অনুভবের প্রাদুর্ভাব হয় ইত্যাদি ক্রিয়াত্মক পদ্ধতিগুলির সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই কৃতি (বারোমাস্যা) তাদের জন্যই বেশী উপযোগী, যারা সাধনা-পথের পথিক। পূর্বকথিত জাগৃতি দ্বারা পথের বাধা, ব্যবধান এবং উপলব্ধিগুলির পূর্বাভাস পাওয়া যায়, যার ফলে সাধক এই অদৃশ্য পথে নির্বিঘ্নরূপে অগ্রসর হয়। এখন একথা বিস্মরণ যেন না হয় যে, এই জাগৃতি শুধু স্থিতি প্রাপ্ত মহাপুরুষ দ্বারাই লাভ হয়। হ্যাঁ অসুবিধা এখানে এই যে, তারা কোটিতে একজন, খুঁজে নিতে হবে, রয়েছেন অবশ্যই।

।। ওঁ ।।

ওঁ

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

সদুপদেশের ক্ষণিক দর্শন

সদুপদেশের ক্ষণিক দর্শন

সৎসঙ্গ-শৈলী

পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজজীর সৎসঙ্গ-মুদ্রা সাধারণ বার্তালাপের মাঝেই তৈরী হয়ে যেত। এ পর্যন্ত আপনি নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে, এই আশ্রম হিংস্র পশুতে পূর্ণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে স্থিত। বর্ষাকালে তখন চারমাস পর্যন্ত মানব-দর্শন দুর্লভ ছিল। কিন্তু মহারাজজী যখন থেকে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে ধীরে-ধীরে ভীড় বাড়তে থাকে। ট্যাক্সি ওয়ালাদের এবং তীর্থযাত্রীদের ভীড় লেগেই থাকত। পূজ্য মহারাজজীর কৃপার ফলস্বরূপ ভক্তদের কোন অসুবিধা হত না, সেইজন্য তারা নির্বিঘ্নে যাওয়া-আসা করত। প্রায়ই লোকে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মহারাজজীর সম্মুখে উপস্থিত হত, কিন্তু প্রণাম করার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়ত। তখন তিনি সাধারণ এবং মধুর স্বরে ভর্ৎসনা করতে শুরু করতেন, যার ফলে জীবনোপযোগী সৎসঙ্গের ভূমিকা তৈরী হয়ে যেত। সৎসঙ্গ আত্মসাৎ করার পর শ্রোতাগণ তদনুকূল ভাবে মুগ্ধ হয়ে মৌন ধারণ করে বসে থাকতেন এবং তাঁদের অন্তঃকরণে বারবার এই লালসা তরঙ্গিত হত যে, আমরাও পরমশান্তির পথে কেন অগ্রসর হব না। এইরূপ মৌন প্রশ্ন করে মহারাজজীর স্বীকৃতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। মহারাজজী তাদের ধৈর্য্য প্রদান করে বলতেন যে, বড় ভাগ্যে এই মানবদেহ লাভ হয়েছে। অধীর হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ি তো ফিরে যেতেই হবে। ফিরে না গেলে কল্যাণ কিছুতেই হবে না। যাও এই পৃথিবীতে যেখানেই থাকবে, মন থেকে আসা-যাওয়া করবে। এখানে যেভাবে তুমি আমাকে দেখছ, যেখানেই থাকবে ঠিক এইপ্রকার মনের ভিতর দেখার চেষ্টা করবে। ভগবান এবং সদ্‌গুরু সর্বত্র বিদ্যমান, তারা রক্ষা করেন। মনে কর, আজ তুমি এখানে থেকে গেলে আর তোমার মন ঘর-দ্বার ইত্যাদিতে পড়ে থাকল, তবে এখানে থাকলে কোন লাভ হবে না। বস্তুতঃ মানুষ সেখানেই থাকে যেখানে তার মন থাকে যদি তুমি কোন সময় হৃদয়ে আমার রূপ চিন্তন করতে সমর্থ হও, তবে তুমি ভজন করার ক্ষমতালাভ করবে।

একবার আশ্রমের সম্মুখে মন্দাকিনী নদীর তীরে কয়েকজন পূজা-অর্চনা করছিলেন। ঘণ্টাবাদ্য এবং শঙ্খনাদ সহযোগে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁদের এভাবে পুজো করতে দেখে আশ্রমের কয়েকজন ভক্ত হাসতে শুরু করেছিলেন। মহারাজজী

বলেছিলেন, এতে হাসির কি হল? তারা এখন সাধনার জন্য তৎপর। সকলকেই এই স্তর পার করতে হয়। সাধনার উঁচু-নীচু স্তর এটা, যা একটু আগে তোমরা সদুপদেশ চলাকালীন শুনলে, সে ক্ষমতা এই ক্রিয়াগুলি করার পরেই লাভ হয়। এইভাবে মহারাজজীর কাছ থেকে সাধনার ক্রমাগত বিকাশ-এর স্তরগুলির নিরাকরণ হওয়ার পর ভক্তগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

প্রশ্ন- মহারাজজী! ভগবৎ-পথ-এ এত সম্প্রদায় কেন? কিছু লোক সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের জন্য বিরোধিতা করে কেন?

উত্তর- তাদের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজজী বলেছিলেন, ভগবৎ পথ-এ কোন সম্প্রদায় নেই, কোথাও-কোথাও বুদ্ধির সাহায্যে সাধন করা হচ্ছে, আবার কোথাও যোগে স্থিতিলাভের প্রযত্ন করা হচ্ছে। অবস্থাভেদে আকৃতিগুলি ভিন্ন-ভিন্ন দেখা যায়। হ্যাঁ সাধককে নিজের শ্রেণী বুঝে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস করা উচিত। মহাপুরুষের কাছে জাতি-বিশেষ, রং বিশেষ এবং সম্প্রদায় বিশেষের মহত্ত্ব নেই কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির গুণ-দোষগুলির মূল্যাঙ্কণ করা হয়।

যেখানে প্রকৃতি সেখানেই বিভাজন হয়ে থাকে। পরমপুরুষ করেন না। মানব সমাজের কাছে যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি অজন্মা, অলখ এবং প্রতিটি কণাতে পরিব্যাপ্ত। তার স্ফূরণ ছাড়া কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারবে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়বে না, কিন্তু তিনি রং-রূপ বিহীন। খোদা এবং সর্বশক্তিমান গডের মধ্যেও এই বিশেষত্ব রয়েছে। শুধু ভাষা বিভেদের জন্য নাম পৃথক পৃথক। ভাষা-ভেদ অবিবেকী এবং সন্দিগ্ধ পুরুষদের জন্য কুরীতির জালে জড়িয়ে পড়েছে। যেমন-তৃষ্ণাবোধ হলে ইংরেজ 'ওয়াটার' চাইবে এবং পারস্যদেশবাসী 'আর' চাইবে, হিন্দুস্তানী 'পানী' চাইবে এবং সংস্কৃতজ্ঞাতা 'জল' চাইবে, কিন্তু পান করার জন্য সেই তরল পদার্থ জলই পাওয়া যাবে। আমরা যে ভাষাতেই ইষ্টের নাম নিই না কেন, তাঁকে সেই স্বরূপেই লাভ করব। নাম প্রবেশিকা মাত্র। প্রভুকে লাভ করার পথে যে স্তরগুলি আসে, সেই স্তরগুলি মহাপুরুষের আশ্রয়ে থেকে সাধনা করলেই উপলব্ধ হবে যে, ভজনা কাকে বলে এবং কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়?

প্রশ্ন- কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করেছিলেন যে, মহারাজজী! পরহিত কাকে বলে? লোক কল্যাণের জন্য আপনার বাণী জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছান উচিৎ।

উত্তর- শ্রী পরমহংস মহারাজজী তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে,

এটা অধিকারী ব্যক্তির জন্য। কি বলব, কেউ শুনবে না। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তাই বলছি আর তোমরা গ্রন্থগুলিতে যা পড়েছ, তা বলছ। তাহলেই বল, তোমাদের মন এবং আমার মন এক হবে কি করে? কাউকে খাওয়া, পরা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী দিলেই এ কাজগুলিকে পরহিত বলা যেতে পারে না। এটা পরহিতের অংশমাত্র, এই আত্মা প্রকৃতির পার-এ স্থিত, সেইজন্য একে পর বলা হয়। শুধুমাত্র এর হিত হলে তবেই একে পরহিত বলা যেতে পারে। যেমন-

পর হিত সরিস ধরম নহিঁ ভাই।
পর পীড়া সম নহিঁ অধমাই।। *(মানস, ৭/৪০/১)*

আত্মার হিতসাধন-এর থেকে বড় ধর্ম কিছু নেই। এটাকেই পরমধর্ম বলে। একে অধোগতিতে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আত্মাকে যদি দেহে বারবার আবদ্ধ করা হয়-তাহলে এর থেকে বেশী পাপ আর কিছু নেই। আত্মা অজর-অমর, শাশ্বত এবং সর্বত্র বিদ্যমান। আত্মাকে লাভ করে সকলকে স্ব-স্বরূপে স্থিত হতে হবে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! অজর, অমর এবং শাশ্বত আত্মার আবার কি হিত?

উত্তর- মহারাজজী পণ্ডিত সমাজকে সম্বোধিত করে বলেছিলেন যে, গীতাশাস্ত্রে আত্মাকে অজর, অমর এবং শাশ্বত বলা হয়েছে, সেই শাস্ত্রেই এই কর্তব্য নির্ধারণও আছে যে, আত্মাকে অধোগতিতে এবং নীচ যোনিতে নিয়ে যাবেন না নিজের আত্মাকে উদ্ধার করুন। এর পতন হতে দেবেন না।

আত্মা বস্তুতঃ অজর, অমর এবং শাশ্বত কিন্তু এটা মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে, প্রত্যক্ষ করে তবে নির্ণয় করা হয়েছে। গীতাশাস্ত্র আত্মার বৃথা প্রশংসা করে না পরন্তু স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করায়। সেইজন্য নির্ণয় করে বলছে যে, তত্ত্বদর্শীগণই এই আত্মাকে দেখেছেন।

যখন পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন পরমাত্মার বিভূতিগুলির দ্বারা যুক্ত এই আত্মা, এটাও প্রত্যক্ষ হয়। আমরা বলি কিন্তু দেখি কই। সংসার এবং শোক, সন্তাপই তো চোখে পড়ে।

এই প্রকার ভজনাকে মনন করার যুক্তি জেনে আচরণ করুন এইরূপ করলেই আত্মদর্শন সম্ভব। ভজনা ছাড়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার অন্য কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন- ভক্তগণ মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আমাদের

কল্যাণের কোন সরল উপায় বলার কৃপা করুন।

উত্তর- এই সম্বন্ধে পূজ্য মহারাজজী অতি মধুর বাণীতে তাদের বলেছিলেন, কি বলব, আর বলার প্রয়োজন নেই। সবকথা সবাই জানে। দু'পয়সাতে বেদান্ত বিক্রি করা হয়। অনেকেই পড়ে এবং লেখেও শুধুমাত্র সাধনা হল এমন একটা জিনিস, যা লেখা যায় না। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ দ্বারা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। লোককে দেখিয়ে এখানে-সেখানে ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর থেকে ভাল, কোন মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া। তাঁর সান্নিধ্য, সেবা এবং সৎসঙ্গ দ্বারা তোমার কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যেমন-

এক ঘড়ী আধী ঘড়ী, আধী মে পুনি আধ।
তুলসী সঙ্গতি সাধু কী, কটৈ কোটি অপরাধ।।

প্রশ্ন- মহারাজজী! ঘরে থেকে ভজনা করা যেতে পারে না?

উত্তর- ঘরে পুণ্য এবং পুরুষার্থ প্রবল করা যেতে পারে কিন্তু সেই ভজনা দ্বারা নিবৃত্তি হতে পারে না। যতক্ষণ এর নির্ধারিত সীমা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ একাগ্রচিত্তে ভজনা করে যেতে হয়। তারপর ভগবান স্বয়ং ঘর ছাড়িয়ে দেন। আজ ভাবছ যে, ঘর ছাড়া সম্ভব নয় কিন্তু ইষ্টদেব অনুকূল হলে সবকিছু সুলভ হয়ে যায়।

প্রশ্ন- যদি ঘরে নিবৃত্তি হবে না, তবে আমরা আপনার শরণে থেকেই ভজনা করি না কেন?

উত্তর- দেখ, কেউ গৃহত্যাগ করলেই বিকারগুলি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এক চোর ছিল, শাস্তি দেওয়ার জন্য যখন চারিদিকে তার খোঁজ করা হচ্ছিল, তখন সে সাধুবেশধারণ করেছিল। এবং সাধুদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। যখন অন্যান্য সাধুরা বিশ্রাম করতেন, তখন সে সাধুদের ঝোলা হাতড়ে বেড়াত। খুঁজে কিছু না পেয়ে সে করে কমন্ডলাচার, সারারাত সে সাধুদের কমণ্ডলু এদিক-ওদিকে করতে থাকত। কারো কমণ্ডলু বাইরে রেখে দিত। কারো ভিতরে। এটাই তার সারারাতের কাজ ছিল। এর এই কার্যকলাপে সাধুদের ভজনে ব্যবধান উৎপন্ন হচ্ছিল। সূক্ষ্ম ভাবে খোঁজ করার ফলে একদিন সে ধরা পড়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই বেশ ধরার আগে কি করতে? সে বলেছিল যে চুরি করত। যেহেতু সে

আগে চোর ছিল, সেইজন্য চুরির স্বভাব তার যায়নি। গৃহত্যাগ করলেই স্বভাব যায় না। এই মনই হল আসলে সংসারী, যে সংসারে অভিভূত হয়ে আছে। শুধু বাইরে ত্যাগ করলে মন থেকে সংসার দূর হয় না। যতক্ষণ ইষ্টদেব আজ্ঞা না দেন, ততক্ষণ গৃহত্যাগ করা পাপ এবং যখন আজ্ঞা দেন, তখন ঘরে থাকা মহাপাপ। সেইজন্য ঘরে থেকেই আজ্ঞা যাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা কর। হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে মনের চৈতন্য হয় না, পুরোনো গুণধর্ম সঙ্গেই থাকে।

'গুন সুভাব ত্যাগে বিনু দুরলভ পরমানন্দ।'

'বিনা বিচারে জো করে, সো পীছে পছতায়।
কাম বিগারে আপনো, জগ মে হোত হঁসায়।।'

যদি তাড়াহুড়ো করবেই তবে প্রার্থনা ইত্যাদিতে কর, বাইরে তাড়াতাড়ি করলে কাজ ভণ্ডুল হয়ে যায়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! কৃপা করুন যাতে ভজনা করতে পারি।

উত্তর- তুমি কি করে ভজনা করে নেবে? কি করে বুঝবে যে, ভজনা কিরূপে সম্পাদিত হয়? যা কিছু ক্রিয়াকলাপ করবে, তা ভজনের প্রবেশিকামাত্র, একে প্রাথমিক স্তর, এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আমার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করবে। ধীরে-ধীরে যখন ধারণ করতে সমর্থ হবে, তখন আত্মা রথী হয়ে অন্তর্দেশ থেকে পথ সঞ্চালন করতে শুরু করবেন। এইরূপ স্থিতিতে তুমি বুঝতে পারবে যে, কখন ভজনা হয়, কখন হয় না। চোখ বুজে প্রয়াস করা তো প্রবেশিকার জন্য প্রযত্ন মাত্র। যতক্ষণ ইষ্টদেব হৃদয় থেকে রথী হয়ে শুভাশুভ এবং উঁচু-নীচুর স্থিতি বোঝাতে শুরু না করে দেন, ততক্ষণ ভজনা হয় না। হ্যাঁ, প্রয়াস বিফলে যাবে না, কারণ প্রবেশ করার মাধ্যম এটাই। ভজনা কেউ নিজে-নিজেই করতে পারে না, পরন্তু সদ্‌গুরুই করিয়ে নেন।

প্রশ্ন- মহারাজজী! ভজনার পরাকাষ্ঠা কি?

উত্তর- 'যথা নাম তথা গুণ।' ভজনের অর্থ হল-ভজনা। তাৎপর্য এই যে, পালিয়ো না। চিন্তনে বৃত্তি অচল, স্থির হওয়াটাই হল ভজনের পরাকাষ্ঠা। চিত্তের চাঞ্চল্য স্থির হওয়াই হল ভজনের পরিপক্কাবস্থা। চিত্তের এই স্থিতি যখনই হয়, ভগবান স্বয়ং তুলে নেন। ভান করার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ং দেখা দিয়ে

নিজের মধ্যে সমাহিত করে স্থিতি প্রদান করেন, এইরূপ স্থিতিতে তোমার কাছে স্পষ্ট হবে যে, আমি কি এবং আমার স্বরূপ কি?

প্রশ্ন- মহারাজজী! ভগবান কি দেখা দেন?

উত্তর- হ্যাঁ, দেখা দেন। বাস্তবে যদি কেউ যোগ্য, তবে তাকে দেখা না দিলে সে প্রাণ ধারণে অসমর্থ হবে। আমাকে দেখা দিয়েই এই স্থিতি প্রদান করেছেন। আমরা বুদ্ধির সাহায্যে এটা নির্ণয় করতে পারব না। **'রিনিক ধিনিক ধুনি অপনে সে উঠে'**- নিশ্বাস প্রশ্বাসে যা ধ্বনিত হয়, যখন মন সেখানে টিকবার ক্ষমতা লাভ করবে অর্থাৎ যখন সাধক নিশ্বাস প্রশ্বাসে বিচরণ করতে শুরু করে, তখন ভগবান তেমনি ভাবেই কথা বলেন যেমন আমরা পরস্পর কথা বলি। যখন শব্দ এবং স্মৃতি একাকার হয়ে যায়, তখন আয়নাতে যেমন স্বরূপ দেখা যায়, ঠিক তেমনিই দেখতে পাবে। কিন্তু সেই অন্তর্দৃষ্টি অনুভবের মাধ্যমে দেখে। এটা তো তোমাদের বাক্যজ্ঞানের ঝগড়া যে, দেখা দেন না। যখন তিনি হৃদয়-দেশ থেকে পথ-প্রদর্শন করতে শুরু করেন, তখনই বুঝতে পারা যায়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! ব্রহ্ম তো শূন্য, যার মানে কিছুই নয়। এর ফলে ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, কি করব?

উত্তর- এটা কোন গর্বোদ্ধত অথবা নিশাপ্রধান ব্যক্তি বলেছে যে, ব্রহ্ম শূন্য। ব্রহ্মই একমাত্র এমন সত্তা যে, শূন্য নয়, পরন্তু পরম চেতন। সেই চেতনের অংশ মাত্রে এই জগৎ চেতন বলে মনে হচ্ছে। যেমন তাকে ছাড়া কেউ শ্বাস নিতে পারবে না, এমনকি তাঁর স্ফূরণ বিনা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়তে পারে না। এটা কোন মহাপুরুষ প্রাপ্তির স্থিতির চিত্রণ করেছেন যে, আমাদের মন এবং চিত্ত সতত চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়ে সূক্ষ্ম হতে-হতে স্ব-অস্তিত্ব মিটে যাওয়ার স্থিতিতে পৌঁছে গেলে, সেই লক্ষ্য প্রত্যক্ষ হয়। যতক্ষণ চিত্তের স্বরূপ সংস্কার মাত্র বাকী ততক্ষণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। চিত্তের সংস্কার এবং তরঙ্গ শেষ হয়ে গেলেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তা হল আমাদের মানসিক শূন্যাবস্থা। মনের শূন্যে টিকবার ক্ষমতা এটাই। যোগী অথবা লক্ষ্যে প্রবৃত্ত পুরুষ চিত্তের তরঙ্গরহিত এইরূপ শূন্য অবস্থার প্রবেশকালে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি হলেন পরম চেতন। ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য আমাদের মন এবং চিত্তকে শূন্য হতে হবে, না

কি ব্রহ্ম শূন্য। স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে চিন্তন-ক্রম বুঝে নাও এবং আচরণ কর। বস্তুতঃ আমরা চলতেই জানি না। তিনি পরম দয়ালু। আত্ম সমর্পণ করে চলতে শুরু করলেই, সেই স্রোতস্বিনী পেয়ে যাবে, যা দুঃখ থেকে মুক্ত করে দেয়।

প্রশ্ন- মহারাজ নিশাচরের স্বরূপ কি?

উত্তর- যে নিশা প্রিয়, যে আলোতে দেখতে পায় না, সেই নিশাচর। সূর্য উদয়-অস্ত হলে যে দিন-রাত হয়, তার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। এটা অদৃশ্য সত্তা দ্বারা প্রসারিত জীবধারীদের পালন-ক্রম মাত্র। যেমন-

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। *(গীতা, ২/৬৯)*

এই সম্পূর্ণ জগৎ রাত্রিস্বরূপ। সংযমী পুরুষ এতে জাগ্রত হন। পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত প্রত্যেক গ্রন্থে যেমন রামচরিতমানস ইত্যাদিতে এইরূপই কথিত হয়েছে।

এহিঁ জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী।
পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী।। *(মানস, ২/৯২/৩)*

জগৎরূপ নিশাতে যোগীগণ জেগে ওঠেন। পরমতত্ত্বের জন্য আর্ত এবং বিধাতার প্রপঞ্চ ত্যাগ করেন। এখানে বিধাতার প্রপঞ্চকেই নিশা বলা হয়েছে। এই নিশাতে কি প্রকারে জেগে ওঠেন?

নাম জীহঁ জপি জাগহিঁ জোগী।
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী।। *(মানস, ১/২১/১)*

নামের প্রভাবে যোগীপুরুষগণ জেগে ওঠেন। বাস্তবে রামনাম-এর মহত্ত্ব এটুকুই নয়,যতটা সহজে আমরা উচ্চারণ করি। যেমন-

রামনাম মে অন্তর হ্যায়। কহীঁ হীরা হ্যায়, কহীঁ পথ্থর হ্যায়।।

সেই রাত্রির প্রসার,যতদূর পর্যন্ত বিধাতার প্রপঞ্চ ব্যাপ্ত, তার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন। নাম চিন্তনের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা মানেই প্রকাশ লাভ করা। যারা এই মায়াময় প্রবৃত্তিগুলিকে সত্য ভেবে তাতেই ব্যস্ত, তারাই নিশাচর। যারা অন্যকে বধ করে জীবনধারণ করে, সৃষ্টির তুচ্ছ ঐশ্বর্যের প্রতি মদান্ধ, দুর্ব্যসনে রত এবং ভগবৎ বিস্মৃত স্বভাব ব্যক্তিরাই নিশাচর। কারণ

জগৎরূপ রাত্রিতেই বুদ্ধি খেলে, তারা পরমপ্রকাশময় সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত।

প্রশ্ন- প্রায়ই ভক্তরা মহারাজজীকে প্রশ্ন করত যে, "মহারাজজী! গাঁজা খেলে কি ধ্যানে সুবিধা হয়?"

উত্তর- জবাবে তিনি হেসে বলতেন, আমিও গাঁজা খাই কিন্তু ওষুধরূপে। ভজনের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। একবার আমাকে অসুস্থ দেখে উত্তরাখণ্ডের একজন স্বামীজী বলেছিলেন যে, পাহাড়ী জল ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি শরীর খারাপ হয়। মহারাজজী, আপনি দু'তিন ছিলিম করে গাঁজা খাবেন, যাতে কোন প্রভাব না পড়ে। তখন থেকে আমিও খেতে শুরু করি, কিন্তু ভজনের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই, যেমন-

গাঁজা পীকর ধরে ধ্যান, গৃহস্থ হোকর ছাঁটে জ্ঞান।
সাধু হোকে কূটে ভাঙ্গ, কহৈ কবীর তীনো ঠগ।।

গাঁজা, ভাং, চরস ইত্যাদি সেবনের সঙ্গে ভজনা, ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নেই। যদি এগুলি সেবন করলে ধ্যান প্রগাঢ় হতে শুরু করে, তবে সকলেই ওষুধ খেয়ে অচৈতন্য অবস্থাতে ধ্যানে রত হবে। সাধনার প্রশস্ত পথে পৌঁছালে আমাদের অভ্যাস এবং নিষ্ঠাই ধ্যানে পরিণত হয়।

'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।' *(গীতা, ৩/৩৪)* ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে আসক্ত, অসংখ্য দায়িত্বে জড়িত গৃহস্থ ব্যক্তিরা যদি বলে যে, আমি জ্ঞানী, তবে এটা মিথ্যা বলা হবে কারণ জ্ঞান জাগৃতির আরেক নাম। গীতাতে উল্লিখিত রয়েছে যে-**'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্ব জ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।'** *(গীতা, ১৩/১১)* আত্মার আধিপত্যে নিরন্তর চলা এবং চলে পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার এই সকলকে জ্ঞান বলে। এবং এর বিপরীত যা কিছু, সমস্তই অজ্ঞান। অন্তঃকরণে আত্মার জাগৃতি, প্রভুর রথী হওয়া-এ সমস্ত জ্ঞানের নিম্নতম সীমা এবং ক্রমশঃ তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন-এটা জ্ঞানের অধিকতম সীমা।

এই প্রকার সাধু যদি অসংযমী, বিষয়াসক্ত, সে সাধু নয়। চরিত্রের নাম সাধনা। লক্ষ্য থেকে সামান্য দূরে থাকলেও মায়া বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব গাঁজা সেবনকারী ধ্যানী, গৃহাসক্ত জ্ঞানী এবং অসংযমী সাধু এই তিন প্রকারের ব্যক্তিরাই প্রতারক।

প্রশ্ন- মহারাজজী! প্রবল পিপাসু হওয়া সত্ত্বেও বহু ভ্রান্তিতে জড়িয়ে আছি। বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম কি? এমন কোন নিয়ম বলুন, যা সকলেই পালন করতে সমর্থ হবে?

উত্তর- যেটাকে ভ্রান্তি বলছ, সেটাই ক্রমশঃ অন্তিম যোগ্যতা প্রদান করে। তীর্থের দেবী দেবতাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছ এতকাল, সেটাই তোমাকে এদিকে প্রেরিত করছে। উপরোক্ত আচরণ দ্বারাই আমরা সনাতন ধর্মের জন্য ব্যাকুল হই। অতএব এরা সকলেই সনাতন ধর্মের শৃঙ্খলার একক রূপে বিদ্যমান। হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং ভাবভক্তি জাগিয়ে তুলে পুরুষার্থ এবং পুণ্যের কোষ তৈরী করে, এই ক্ষমতাই বাস্তবিক লক্ষ্যের দিশা প্রদান করে। এখন আসুন যথার্থ সনাতনের দিশাতে। সনাতন ধর্ম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে ইষ্টের উপলব্ধি করিয়ে দেয়। ক্রিয়াত্মক দৃষ্টি-যা এই জীবাত্মাকে প্রবৃত্ত করে পরমাত্মাকে লাভ করার ক্রিয়াতে। সেটাই সনাতন। যোগ অথবা ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সময় এই দৃষ্টি প্রত্যক্ষ স্থিতি প্রদান করে। অন্যদিকে সনাতন বলে, যা সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, যাঁর নাম পরব্রহ্ম পরমাত্মা, যিনি অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে সাধনার পরিপক্ক অবস্থাতে স্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। লোকে যা-ই ভাবুক কিন্তু প্রত্যেক মহাপুরুষের রমণস্থলী এটাই ছিল এবং এখনও আছে। মহাবীর স্বামী যাঁকে জৈনধর্মের প্রবর্তক বলা হয় তিনি এই ধর্মের যথার্থ স্থিতিপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর বাণী হল 'সেই আত্মতত্ত্ব আমিই।' বুদ্ধও এই ধর্মের পুজারী ছিলেন, তাঁর বাণী হল যে, তথাগত আমি সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, আমা হতে তিনি ভিন্ন নন। শ্রী শঙ্করাচার্যও এই স্তরেরই ছিলেন, তাঁর বাণী ছিল ''আমার স্বরূপ সেটাই।'' এখন আপনিই বিচার করুন যে, তাহলে এই পার্থক্য কিরূপ? এটা তো তাদের কাজ, যারা মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়ে তাঁদেরকে নিজেদের প্রচারের মাধ্যম করে নিজেদের কাজ হাসিল করেছিল। এটা বললে সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, সনাতন ধর্মের ভিত্তি শঙ্করাচার্য দ্বারা স্থাপন করা হয়েছিল, তবে তো সেটার অবধি হাজার বছরেরই হল। শঙ্কর পর্যন্ত অবধি তো এটাই। যে গীতার ভাষ্য শঙ্করাচার্য দ্বারা

লেখা হয়েছে, তা বৌদ্ধ ইত্যাদি থেকেও হাজার-হাজার বছর পুরোনো এবং নিজের বিশেষ অবদান সনাতন ধর্মকেই বলে।

যদি কেউ এর জন্মদাতা ছিলই তবে সনাতন অথবা অনাদি কি করে হবে? সনাতন ধর্মের নামে যা ভাল ছিল তার পরিবর্তে কিছু কুরীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে, এই কুরীতিগুলি কৃষ্ণকালেও ছিল। হতে পারে যে, সেগুলির রূপ অন্য ধরণের ছিল। সনাতন ধর্মের নামে প্রচলিত একটি কুরীতি স্মরণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে, ধনুর্বাণ ত্যাগ করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, ভগবন্! আমি যুদ্ধস্থলে নিজের কুলকেই উপস্থিত দেখছি। পিণ্ডোদক ক্রিয়া, বর্ণসঙ্কর ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কুল-ধর্ম সনাতন। আমাদের উচিৎ সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা। এই যুদ্ধ হলে সনাতন-ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। তার কথা শুনে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, এই বিষম স্থলে কোত্থেকে তোমার অজ্ঞান উৎপন্ন হল? যেমন তুমি বলছ শ্রেষ্ঠ পুরুষ কখনও এর আচরণ করেননি এবং এই আচরণ দ্বারা পরম কল্যাণও হয় না। তখন অর্জুন বিনীতভাবে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, 'শিষ্যস্তেহহম্' আমি আপনার শিষ্য। আমি আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। অনুগ্রহ করে বলুন যে, সত্য এবং সনাতন কি? যা আচরণ করলে শ্রেয়লাভ করব। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, সত্য বস্তুর তিনকালে অভাব নেই। এবং অসত্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এখন প্রশ্ন হল-যার কোন কালে অভাব নেই, সেই সদৈব স্থির সত্যটা কি? তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, এই আত্মাই পরমসত্য, একে মুছে ফেলা যায় না। এই আত্মাই সনাতন, শাশ্বত, পুরাতন এবং অজর অমর। সেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই। এই আত্মা যখন সকলের ভিতরে বিদ্যমান, তখন কার অনুসন্ধান করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, হে অর্জুন! এই আত্মাকে এই বিভূতিগুলি দ্বারা যুক্ত তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। সেই তত্ত্বদর্শিতা কি? দৃশ্যমান জগৎ-এ যেমন সেই কুরীতিগুলি প্রচলিত-পাঁচটা তত্ত্ব, পঁচিশ রকমের প্রকৃতি, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ভূমিকা ইত্যাদি সতেরো, পাঁচ, পঁচিশের মধ্যে ধরাবাঁধা নিয়ম বলে যে, এটাই তত্ত্বদর্শন কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তত্ত্বের ইচ্ছুক পুরুষদের উচিৎ যে, তাঁরা যেন ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় থেকে আহরণ করে মনকে ধ্যানে নিযুক্ত করেন। ধ্যানের লক্ষ্য যথার্থ

হতে হবে, কারণ যোগের নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলস্বরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মায়িক প্রবৃত্তিগুলির নিরোধ হয়ে যায় এবং শান্তি, ক্ষমতা, একাগ্রতা ইত্যাদি সদ্-প্রবৃত্তিগুলির উদয় হয়। লক্ষ্য, একাগ্রতা ইত্যাদি ইষ্টকে লাভ করার পরমস্রোত যেগুলি, সেগুলি হৃদয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হলেই পরাভক্তি সাধক লাভ করেন। এই স্থিতিতে সাধক ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন। তত্ত্বকে জানেন কিন্তু সেই তত্ত্ব কিরূপ?

তত্ত্ব বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমি যেমন, যে স্থিতিযুক্ত, যে-যে লক্ষণ দ্বারা যুক্ত-তা জানতে পারেন এবং জানার পরেই বিলীন হয়ে যান। প্রমাণিত হল যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই তত্ত্বদর্শন বলা হয়। প্রাপ্তিকালে যিনি ভগবানকে লাভ করেছেন, তার পরক্ষণেই তিনি নিজের আত্মাকে সেই-সেই ভগবৎ গুণধর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ দেখেন। যার জন্য তাঁরা সঙ্কেত করেন যে, তিনি আমাতে স্থিত এবং তিনিই সনাতন, এখন তাহলে যে ক্রিয়ার আচরণ করলে আত্মতত্ত্ব লাভ হবে তা পালন করলেই সনাতন ধর্মের পালন হবে। ক্রিয়ার পূর্তিকালে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই আত্মাতে পরমাত্মার গুণধর্ম প্রবাহিত হতে শুরু করে। আত্মা এবং ব্রহ্ম একাকার হয়ে যায়। সেইজন্য এই আত্মা প্রাপ্তিকালে সনাতন, তার আগে নয়। বর্তমানে পূজার বহু এমনও বিধান দেখা যায় যে, লোকে মহাপুরুষদের বাণীকে আশ্রয় করে বলে-এই আত্মা সনাতন, শাশ্বত, আমার অন্তরে বিরাজিত, এটাই আমার স্বরূপ—এইরূপ জ্ঞানের কথা বলে, পরন্তু এটা সনাতন ধর্মের কোন পূজা নয়। যখন ক্রিয়ার পূর্তিকালেই তিনি প্রত্যক্ষ হন, তবে বলে লাভ কি?

এখন যদি আমরা বাস্তবে সনাতন ধর্ম কি, তা জানার ইচ্ছুক, তবে সর্বপ্রথম সেই ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়া দরকার, যার দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন, এই ক্রিয়া যে কোন স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ দ্বারা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। শুধু লিখে যাওয়া প্রেরণামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ তা এই প্রকারে বলেছেন যে, হে অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে একটা মাত্র ক্রিয়া। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যারা অনন্ত ক্রিয়ার আচরণ করে, তারা কি ভজনা করে না? তখন বলছেন, না তারা ভজনা করে না। অবিবেকীদের বুদ্ধি অনন্ত শাখাযুক্ত, সেইজন্য অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে কল্পিত বুদ্ধি দ্বারা অত্যন্ত মনোরম রূপ দিয়ে তা ব্যক্ত করে।

তাদের বাণীর প্রভাব যাদের চিত্তের উপর পড়ে, তাদের বুদ্ধিও নষ্ট হয় যায়। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন! আমি এই জ্ঞান কিরূপে লাভ করব? তখন তিনি বলছেন যে, হে অর্জুন! তত্ত্বদর্শী, যিনি সেই পরমতত্ত্ব আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা সেই তত্ত্বে স্থিত, তাঁর সমক্ষে শুদ্ধ অন্তঃকরণে কল্যাণ কামনা করে, নিষ্কপটভাবে সেবা এবং প্রশ্ন দ্বারা সেই বিধি লাভ কর, যাঁর ভিতরে ঈশ্বরের প্রাপ্তি এবং সাধনার পরাকাষ্ঠা নিহিত।

এখন এটা চিন্তনীয় যে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে কিরূপে স্থিত হবে? জীবাত্মা এবং পরমাত্মা পৃথক সত্তা নয়। শুধু কিছু-কিছু বাধার জন্য জীব-ঈশ্বর ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন পদের নাম এগুলি, যা সেই অজর-অমর সত্তার মাঝে পড়ে রয়েছে। যখন এই মানবের বিচরণের ক্ষেত্র অবিদ্যা এবং যখন অজ্ঞানই জ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা প্রেরিত হয়ে অজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে মনে করে, তখন এই পুরুষকেই জীবাত্মা বলা হয়। যে পুরুষের অন্তঃকরণ বিদ্যারই ক্ষেত্র এবং জ্ঞান অথবা বাস্তবিকতা যার জানা আছে অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বর অথবা পরমসত্য সম্বন্ধে অবগত, তাকে ঈশ্বরাত্মা বলা হয়। বিদ্যা-অবিদ্য-এর পার-এ যার ক্ষেত্র এবং স্থিতি এবং জ্ঞান অজ্ঞান-এর পার-এর যিনি জ্ঞাতা, তিনিই পরমাত্মার সংজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত হন।

ভেবে দেখুন আত্মা সেই সকলেরই এক। জীব বলে একটা বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। সেইজন্য জীবাত্মার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চিন্তন দ্বারা ইষ্ট প্রাপ্তির সময় সেই আত্মাতে একটা বিশেষণ ঈশ্বর প্রযুক্ত হলে, তাঁকে ঈশ্বরাত্মা বলা হয়। যখন সাধক তাতে স্থিতিলাভ করেন, তখন সেই আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয়। এরূপ সম্ভব তখনই, যখন ধীরে-ধীরে অভ্যাস করতে-করতে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সর্বথা নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপ স্থিতিতে ব্রহ্মকে জানার ক্ষমতা চলে আসে এবং ব্রহ্মের অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। এই স্থিতিকেই তত্ত্বদর্শন বলে। আপনি দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা বিদেশে, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ এই নির্দিষ্ট ক্রিয়ার সম্পর্ক সোজা পরমাত্মার সঙ্গে রয়েছে, যিনি সকলের নিয়ন্তা। দেশ-বিদেশ নাম তো জীবনের ছোট-ছোট খুনসুটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এসবই অস্থির কিন্তু লক্ষ্য প্রাপ্তির পূর্বে এই বিশ্বে কেউ সুখী হতে পারে না। লক্ষ্য

প্রাপ্তির জন্য মহাপুরুষের সান্নিধ্য পরমাবশ্যক, অন্যত্র তো মায়ারই প্রসার দেখা যায়।

প্রশ্ন- এক ভদ্রলোক নম্রভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে-''মহারাজজী! জীবনটা লক্ষ্য করলে পাপই সর্বাধিক দৃষ্টিগোচর হয়। এই কারণেই মৃত্যু পর্যন্ত আমি নিজের কল্যাণের জন্য অবধে বাস করব, নিশ্চয় করেছি। কারণ অবধে দেহ ত্যাগ করলে গমনাগমন শেষ হয়ে যায়।" যেমন-

চারি খানি জগ জীব অপারা।

অবধ তজেঁ তনু নহিঁ সংসারা।। ***(মানস, ১/৩৪/৪)***

উত্তর- আমারও তাই ধারণা, অবধে দেহত্যাগ করলে পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু এটা অন্য অবধ। যেমন, আমি বহুবার বলেছি যে, এটা মানস। মানসের তাৎপর্য হল মন। রামচরিত মানসে তাই অঙ্কিত রয়েছে, যা সামান্যতঃ সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত অবস্থাতে রয়েছে, খুব কম লোকের ভিতরে এটা জাগ্রত। রামচরিতমানসের রচয়িতা গোস্বামীজী গভীর বিষয়টিকে গুহ্য করে লিখেছেন, যা যোগ্য ব্যক্তি সহজেই জানতে পারেন এবং যিনি যোগ্যতা লাভ করেননি, তিনি জানার চেষ্টা করেন। মানসে চর্চিত অবধের তাৎপর্য এই প্রকার-বধ নাশবান্‌কে বলে, মরণ ধর্মাকে বলে এবং অবধ বলে তাকে, যাকে বধ করা যায় না, অর্থাৎ অবিনশ্বরকে।

ভগবান লাভের সঙ্গে এই ভগবৎ স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিতে কালও বাধা দিতে পারে না। সাধকের হৃদয়ে যখন ভগবৎ তত্ত্বের সঞ্চার হয়, তখন সেই সময়ও এর অবস্থিতি টের পাওয়া যায়। তারই প্রেরণাতে সকল বিকার শান্ত হয় এবং রামরাজ্যের স্থিতির অভ্যুদয় হয়। এই অবস্থাতে সেবকের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং প্রভুর স্থিতি মাত্র বাকী থাকে। পৃথিবীতে কেউ অজর-অমর রয়েছে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না, এটা সম্ভবও নয়। এখন দেখুন প্রশ্নের প্রবেশিকা যে, এই বাণী যে মহাপুরুষের, তিনি রামের সঙ্গে অবধকে গতিশীল ধাম বলেছেন।

অবধ তহাঁ জহঁ রাম নিবাসূ।

তহঁই দিবসু জহঁ ভানু প্রকাসূ।। ***(মানস, ২/৭৩/৩)***

যেখানে সূর্যের প্রকাশ, সেইখানেই দিন এবং যেখানে রাম, সেখানেই অবধ। যথার্থতঃ রাম সর্বত্র ব্যাপ্ত, কিন্তু অনুরাগপূরিত হৃদয়ে সাধনা করলে কারও-কারও হৃদয়ে প্রকট হন এবং তিনি প্রকট হলে তবেই অবধের স্থিতি লাভ হয়। সেই অবাধ্য স্থিতিতে, এই নশ্বর দেহটিকে যখন, যেখানে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দেওয়া যেতে পারে, এখানে মৃত্যুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। শুধু শারীরিক নিধনকে মৃত্যু বলা যেতে পারে না।

অবধ প্রভাব জান তব প্রানী।
জব উর বসহিঁ রাম ধনু পানী।। *(মানস, ৭/৯৬/৭)*

অবধের প্রভাব যেমন বলা হয়ে থাকে যে, এর মধ্যে অজর-অমর করে দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সেটা মানুষ তখনই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ পুরুষ তখনই জানতে পারে যখন ইষ্ট-(রাম) এর অনুরূপ স্থিতি ধ্যানের মাধ্যমে হৃদয়ে চলে আসে। কারণ যেখানে রামের বাস, সেখানেই অবধও। অতএব যতক্ষণ রামের অনুরূপ স্থিতি লাভ না হয়, ততক্ষণ অবধে প্রবেশ করা যেতে পারে না। মনে রাখবেন-ঈশ্বরের নিবাসস্থান হৃদয়। তিনি হৃদয়েই বিশ্রাম করেন। অন্যত্র নয়। সমস্ত বিকার শান্ত হওয়ার পর আকাশবৎ নির্বিকার স্থিতি দ্বারা হৃদয়-রাজ্যে রামের আবির্ভাব হওয়ার সময় হলে অর্থাৎ স্থিতি অতদূর পর্যন্ত গড়ালে, সেটা হবে রামের সাম্রাজ্যের স্থান। স্মরণ রাখবেন যে, ভগবানের নিবাস স্থান হৃদয়। সাধক-চিন্তনের দ্বারা যেমন-যেমন ইষ্টের নিকটবর্তী হবে, তেমন-তেমন ভয়শূন্য অবাধ্য স্থিতির সঞ্চার হৃদয়-রাজ্যে প্রসারিত হতে শুরু করবে কিন্তু যখন রামের পূর্ণ স্থিতি এই দেহের ভিতরে চলে আসে সেই সময় এটা সমস্ত শোভার খনি হয়ে দাঁড়ায়। এই জীবাত্মা তখন অবধ্য হয়ে যায়। সেইজন্য-

অবধপুরী প্রভু আওত জানী।
ভই সকল সোভা কৈ খানী।। *(মানস, ৭/২/৯)*

যেখানে রাম-এর নিবাস, সেখানে অবধ্য স্থিতি প্রসারিত হয়। যখন ভগবৎ প্রাপ্তির স্থিতিতে চলে আসে তখন এই দেহ স্বতঃ সমস্ত শোভার খনি হয়ে যায় এবং যার ফলে অবধ্য স্থিতির চিত্রণ হতে শুরু করে। স্থিতিলাভ হয়েছে তা

ইষ্টদেবই জানিয়ে দেন। এই স্থিতি সম্বন্ধে জানার অন্য কোন উপায় নেই। সেইজন্য রাম বুঝিয়ে বলেন যে,

সুনু কপীস অঙ্গদ লঙ্কেসা।
পাওন পুরী রুচির ইয়হ্ দেসা।। *(মানস, ৭।৩।২)*

এই প্রাপ্তির স্থিতি অত্যন্ত পুনীত, রমণীয় এবং অলৌকিক। যদ্যপি সর্বত্র বৈকুণ্ঠের ভূরি-ভূরি প্রশংসা করা হয়েছে পরন্তু অবধের সমান প্রিয় সেটাও নয়। এই গূঢ় বিষয় কোন বিরল ভক্তই উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। বৈকুণ্ঠ, কামধেনু, অমৃত ইত্যাদিগুলি যৌগিক শব্দ। এই শব্দগুলির মাধ্যমে মহাপুরুষগণ ইষ্টলাভের পথে যে উঁচু-নীচু অবস্থা, সেগুলি ব্যক্ত করেছেন। সেইজন্য অঙ্গদ বলেছেন যে, -শোন্ রে বুদ্ধিহীন রাবণ! বৈকুণ্ঠ বলে কোন নগর আছে না কি, যেখানে পৌঁছে আস্তানা স্থাপন করবে। কুণ্ঠ বলে প্রান্তকে অর্থাৎ যা মাপা যেতে পারে এবং বৈকুণ্ঠ বলে অনন্তকে যার সীমা পাওয়া যায় না। যতক্ষণ সাধকের চিন্তনের একটা সীমা থাকে (২ ঘণ্টা, ৪ ঘণ্টা অথবা ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত চিন্তনে যুক্ত) অতএব সময় সীমা নির্ধারিত হওয়ার জন্য কুণ্ঠিত অর্থাৎ সীমা নিশ্চিত থাকে। যখন সেই ভজনাই নিরন্তর চলে (যখন সময় নির্ধারিত থাকে না) তখন এই স্থিতিকেই অসীম অথবা বৈকুণ্ঠ বলা হয়।

ইয়হ্ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ। *(মানস, ৭।৩।৪)*

এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে খুবই কম ব্যক্তি জানতে পারেন। যাঁর অন্তরে এই স্থিতি চলে আসে তাঁর জন্যই জানার বিধান রয়েছে। আরও দেখুন-

অতি প্রিয় মোহি ইহাঁ কে বাসী।
মম ধামদা পুরী সুখ রাসী।। *(মানস, ৭।৩।৭)*

যে ক্রমশঃ সাধনা পথে চলে অবধ্য স্থিতি প্রাপ্ত করে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ প্রাণের সমান প্রিয়। ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ে প্রকট না হওয়া পর্যন্ত অবধের প্রভাব এবং স্বরূপ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অবধ্য স্থিতি এবং এর প্রকটীকরণ একে অন্যের পূরক। অর্থাৎ স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই অবধ্য স্থিতিও প্রাপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর দিসি বহ সরজূ পাওনি। *(মানস, ৭।৩।৫)*

যজনপূর্ণ স্বরই সরযু উত্তর দিশার তাৎপর্য হল ঊর্ধ্বরেতা অথবা নিবৃত্তি।

প্রাপ্তিকালে যজনপূর্ণ স্বর ঊর্ধ্বরেতা অথবা নিবৃত্ত হয়ে যায়। এইরূপ স্থিতি যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ করে যারা, তারা আমার সান্নিধ্য লাভ করে।

হরষে সব কপি সুনি প্রভু বানী।
ধন্য অবধ জো রাম বখানী।। *(মানস, ৭/৩/৮)*

এই কথা শুনে সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং অবধ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হয়ে বলেছিলেন যে, সেই অবধ ধন্য, যার প্রশংসা স্বয়ং রাম করেছেন। সেইজন্য একথা প্রমাণিত যে, অবধের সংখ্যা অনেক। মহাত্মা তুলসীদাস এই ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, সেইজন্য কল্যাণকর অবধ প্রসঙ্গে বারংবার ক্রিয়াত্মক যুক্তিগুলির দ্বারা বিশেষ জোর দিয়েছেন, যাতে মানুষ নিজের জীবনে অবধের পরিণাম-এর সঠিক ব্যবহার দ্বারা উপকৃত হয়। যখন রামরাজ্য অবধে স্থাপিত হয়, তখন সেই বিশেষ রামরাজ্যের স্থিতির চিত্রণ করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

গরুড়ের মনের সন্দেহ এত বেশী বেড়েছিল যে, কোথাও তা নিবারণ হয়নি। তিনি নারদ, শঙ্কর প্রভৃতির কাছে গিয়ে পরে কাকভুশুণ্ডির কাছেও গিয়েছিলেন। তাঁর মনের সন্দেহ আশ্রম এবং মহাপুরুষের দর্শন করার পরই প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেই মহাপুরুষ রামের অনন্যভক্ত এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেই প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষ যে অবধে রামের রাজ্য স্থিত, তার চিত্রণ করে বলছেন-

জব তে রাম প্রতাপ খগেসা। উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা।।
পূরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা। বহুতেহ্ন সুখ বহুতন মন সোকা।।
(মানস, ৭/৩০/১-২)

হে গরুড়! সেই রামরাজ্য কিরূপ ছিল, এক প্রকারের প্রচণ্ড সূর্য প্রকট হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ত্রিলোক পূর্ণপ্রকাশে ছেয়ে গিয়েছিল। সেই প্রকাশে বহু লোক সুখী হয়েছিল এবং বহুলোক দুঃখ পেয়েছিল।

জিহ্নহি সোক তে কহউঁ বখানী। প্রথম অবিদ্যা নিসা নসানী।।
অঘ উলূক জহঁ তহাঁ লুকানে। কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে।।
(মানস, ৭/৩০/৩-৪)

যারা শোক পেয়েছিল, তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। শুনুন-

সর্বপ্রথম অবিদ্যারূপ নিশার সদা-সর্বদার জন্য অন্ত হয়েছিল এবং অবিদ্যা

দ্বারা পোষিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি পেঁচক যেখানে-সেখানে লুকিয়ে পড়েছিল অর্থাৎ মায়িক প্রবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। যেগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের বর্ণনা করে বলছেন যে-

ধরম তড়াগ গ্যান বিগ্যানা।

এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা।। ***(মানস, ৭।৩০।৭)***

ধর্মরূপ জলাশয়ে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি ঈশ্বরোন্মুখ প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল অর্থাৎ ইষ্টোন্মুখ সমস্ত সদ্‌গুণের বিকাশ হয়েছিল কিন্তু এই রাম রাজ্যের স্থাপনা যে অবধে হয়েছিল, সেই স্থান কোথায়?

ইয়হ্ প্রতাপ রবি জাকেঁ, উর জব করই প্রকাস।

পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে, কহে তে পাওহিঁ নাস।। ***(মানস, ৭।৩১)***

রামরাজ্যের এই প্রকাশ যার হৃদয়ে যখনই ব্যাপ্ত হয়, তখন উপর্যুক্ত সকল ইষ্টোন্মুখ সদগুণগুলির পূর্ণবিকাশ হয় এবং যে মায়িক দুর্গুণগুলি অধোগতিতে নিয়ে যায়, সেগুলি সমূলে নষ্ট হয়ে যায়।

এখন স্পষ্ট হল যে, রামের সাক্ষাৎকার করার সঙ্গে-সঙ্গে যে অবধ্য স্থিতি লাভ হয়, সেটাই অবধ, যা হৃদয় দেশে লাভ হয়। যা প্রত্যেক প্রযত্নশীল সাধকের জন্য লাভ করা সম্ভব। এই স্থিতি হল ইষ্টের সমান-সমান স্থিতি, মহাপুরুষের অন্তর্দেশের স্থিতি। সাধক অবধের স্থিতি লাভ করেছেন স্বয়ং ইষ্ট সেটা জানিয়ে দেন। কারণ সেই পরমাত্মা মন-বুদ্ধির ক্ষেত্রের সর্বথা অতীত। এটা ক্রমশঃ চলার ক্রিয়াত্মক পথ, এখানে পরামর্শের অবকাশ নেই। যদি প্রাণ থাকতে-থাকতে এই স্থিতি লাভ হয় তবে সেখানে মৃত্যুর কোন প্রশ্নই উঠছে না।

চারি খানি জগ জীব অপারা।

অবধ তজেঁ তনু নহিঁ সংসারা।। ***(মানস, ১।৩৪।৪)***

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, ডিম্বজ এবং শরীরজ এই চার প্রকারের যে অসংখ্য জীব-শৃঙ্খলা রয়েছে, এদের মধ্যে যদি কেউ অবধ্যস্থিতি লাভ করে দেহত্যাগ করে, তবে তার প্রত্যাবর্তন হয় না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে আপনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। ভগবৎ-পথ-এ বৃদ্ধা এবং যুবাবস্থার কোন বিশেষ বন্ধন নেই। পুণ্যের ফলেই আপনার অন্তঃকরণে এইরূপ ভাব জাগ্রত হয়েছে। যদি ফলদায়ী

অবধের স্থিতিতে পৌঁছাতে চান, তবে পরিশ্রম করুন। ক্রিয়াত্মক পথে চলেই কল্যাণ লাভ সম্ভব, অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! অবধ প্রসঙ্গে আপনি বললেন যে, যজনপূর্ণ স্বরই সরযু। তাহলে কি করে উপলব্ধি করব, কৃপা করে একটা উপায় বলে দিন এবং সেই সঙ্গে এটাও বলে দিন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া-এর স্থিতি কাকে বলে?

উত্তর- প্রারম্ভিক অবস্থাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এর দ্বারা তুমি যজন করতে সমর্থ হবে না। নিরন্তর অভ্যাস করলে কিছুকাল পরে এটাই সহজ হয়ে যায়। যে প্রকারে সেটা আমাদের বোধগম্য হয় এবং জীবনে আয়ত্তাধীন হয়, সে প্রকারে লোকে আচরণ করতে নারাজ। যা শ্বাস-জপের চরমোৎকৃষ্ট স্থিতি লোকে আচরণ না করেই সোজা সেই যোগ্যতা লাভ করতে চায়।

উলটা-পালটা রীতিনীতিগুলিকে আধার বলে যেখানে-সেখানে বোঝাতেও শুরু করে দেয়। বহু ব্যক্তি তো পূরক করে পেট ঘড়ার মত বায়ুতে পূর্ণ করে নেয় এবং বলে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে। শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে মনের নিরোধের কোন সম্বন্ধই নেই। এইরূপ ঝঞ্ঝাটে পড়লে তো তাড়াতাড়ির জায়গায় দেরীই হয়ে যায়। একটা নামেরই উঁচু-নীচু শ্রেণী এটা, যা ক্রমশঃ চলেই সুলভ হতে পারে। যেমন কোন ছোট ছেলের সংরক্ষক তাকে উচ্চ শিক্ষিত করতে চাইছেন যদি তিনি ছেলেটিকে শুরুতেই উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি করতে চান তবে বল কি পরিণাম হবে? বাস্তবে যদি সংরক্ষক উচ্চশ্রেণীতে পড়াবার ইচ্ছুক, তবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সবরকম চেষ্টা করবেন। ঠিক এই প্রকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এর ক্রিয়া আয়ত্তাধীন করতে চাইলে ক্রমে ক্রমেই এগোতে হবে।

নাম একটাই কিন্তু যজনের শ্রেণী চারটি অতএব চারটি শ্রেণীই একটা নামের উঁচু-নীচু অবস্থা বিশেষ। যেগুলি হল-বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি এবং পরা। এই বিশেষ পথে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ জপ করার যোগ্যতা চলে আসে। জপ-এর নাম অথবা মন্ত্রের তাৎপর্য 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' নয়। এটা তো প্রার্থনা, যেমন ওঁ শব্দ দ্বারা উচ্চারিত পরাৎপর ব্রহ্ম, সকলের শ্বাসে বাস করেন যে ভগবান্! আমি তাঁকে নমস্কার করছি, 'ওঁ নমঃ

শিবায়’ ইত্যাদিগুলিও এইপ্রকারের প্রার্থনাগুলির রূপক।

আপনি যে কোন একটা ছোট নাম নির্বাচন করুন। যেমন তুলসীদাস নিজের চিন্তন ক্রমে দু’অক্ষরের নাম রাম রেখেছিলেন। কবীর এবং নানকও সেই একই নাম নির্বাচন করেছিলেন। পূর্বের মহর্ষিগণ ওঁ, সোহহম্ ইত্যাদি জপ করতেন এইপ্রকার দু’আড়াই অক্ষরের কোন একটা নাম নিয়মিত রূপে এমনভাবে উচ্চারণ করুন যাতে আশে-পাশের লোকেরা শুনতে পায়। ব্যক্ত হয় সেইজন্য একে **বৈখরী** বাণীর জপ বলে। নিয়মপূর্বক যতক্ষণ জপ করতে সমর্থ, ততক্ষণ জপ করা ছাড়াও অনবরত জপ করার বিধান রয়েছে।

মধ্যমা-সেই নামই এমনভাবে জপ করুন যাতে আপনি ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়। এই জপ কণ্ঠের সাহায্যে করা হয়। নাম জপ করলে শব্দ তো হয়, কিন্তু মৃদু স্বরে জপ করা হয় সেইজন্য মধ্যমা বলা হয়। ততক্ষণ নিরন্তর জপ করে যেতে হয়, যতক্ষণ না ধ্বনিতে মন তন্ময় হয়।

পশ্যন্তি-পশ্য-এর অর্থ হচ্ছে দেখা। এই বাণী দ্বারা নাম জপ করা হয় না, পরন্তু দেখা হয়। এর প্রবেশিকাতে নাম জপ শ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে করে যেতে হয়, যাতে নাম শ্বাসের সঙ্গে নিরন্তর চলতে থাকে। নাম জপের এই অবস্থাকে পশ্যন্তি বলা হয়। মনকে দ্রষ্টারূপে স্থির করে শ্বাসে যে ধ্বনি উঠছে, সেই ধ্বনিকে শুনুন। সঙ্গদোষের ফলে মন কখনও-কখনও এত বিকৃত হয়ে যায় যে, শোনার ক্ষমতাই থাকে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধক যখন জোর করে মনকে নিযুক্ত করেন তখন মাথাব্যথা করতে শুরু করে। সঙ্গ-দোষ এড়ানোর জন্য মনকে সতর্কতা পূর্বক নিযুক্ত করতে হয়। এই অবস্থাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এর ক্রিয়াতে প্রবেশ হয়। এই ক্রিয়াতে শ্বাস দীর্ঘ অথবা হস্র করার প্রয়োজন হয় না পরন্তু শারীরিক শক্তি অনুসারে শ্বাসের স্বাভাবিক গতিতে নাম উচ্চারণ করার প্রযত্ন করা উচিৎ। শ্বাসের গতির সঙ্গে-সঙ্গে নাম-জপ করুন। মহাপুরুষগণ তো বলেন যে, শ্বাস নাম ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করে না কিন্তু আপনারা যখন শোনার চেষ্টা করেন, তখন সন্ন-সোঁ, এই শব্দই শুনতে পান। কারণ শুদ্ধ অবস্থা থেকে দূরে সরে প্রকৃতির দ্বন্দ্বে পড়ে যাওয়ার ফলে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায় না কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে অভ্যাস করলে ক্রমশঃ শুনতে পাওয়া যাবে।

পরাবাণী-পশ্যন্তির চিন্তনে মনকে শোনার জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু পরাবাণীতে মন স্বাভাবিকরূপে নিযুক্ত হয়। সাধক জপ করবেন না, মনকেও জপ করার জন্য বাধ্য করবেন না, যদি তা সত্ত্বেও জপ নিরন্তর চলে, তবে একেই অজপার প্রবেশিকা বলা যেতে পারে। এর পূর্তিকালে শ্বাসে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, সেটা নাম মাত্রই বাকী থাকবে এবং জাপকের এই মনের স্থিতি তাতে বিলীন হয়ে যাবে তখন সেই ক্রম পরমাত্মা অথবা পরমচৈতন্য চিন্ময় ভগবানের স্থিতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থাতে প্রভু স্বয়ং বুঝিয়ে দেন যে, বৎস আমার রূপ এই এবং তোমার স্বরূপ এই। এইরূপ স্থিতিতে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন।

যজনপূর্ণ স্বরই সরযু-অজপা স্থিতিতে স্বর যজনে পরিপূর্ণ থাকে। এই জপ ইষ্টের সামীপ্যের বাণীর জপ।

এরপর জপ করার বিধান নেই। এই স্থিতিতে যজনপূর্ণ স্বরকেই সরযু বলে। এই সরযুর মহত্ব বলে বলছেন যে-

জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াসা।

মম সমীপ নর পাওহিঁ বাসা।। *(মানস, ৭।৩।৬)*

এর মধ্যে মজ্জন করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। অথবা আমার সমীপে নিবাস করে কিন্তু কার্যরূপে দেখলে সেই গুণ দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ পকেটমার চোর সকলের আগেই স্নান করে নেয়। ভক্ত যদি ভোর চারটেয় ডুব দেয়, তবে তারা রাত্রি দুটোর সময়ই স্নান করে সীতা রাম জপ করতে শুরু করে দেয়। ভক্তরা যখন স্নান করে তখন তারা ভক্তদের জিনিস নিয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তি তো দূরের কথা, অন্ততঃ এই দুষ্কর্ম তো তাদের বন্ধ হয়ে যেত। দেখুন-

বস্তু কহীঁ খোজে কহীঁ, কইসে পাওে তাহি।।

তীর্থ এবং তীর্থ করার ফল নিজের জায়গায় রয়েছে। সেই সামীপ্যমুক্তি এবং সাক্ষাৎকার যজনেপূর্ণ স্বররূপ সরযুতে মজ্জন করলে তবেই সম্ভব।

উত্তর দিসি বহ সরজূ পাওনি। *(মানস, ৭।৩।৫)*

এই স্থিতিতে শ্বাস প্রকৃতি থেকে নিবৃত্ত হয়। অধ্যাত্মের অনুসারে এটাই উত্তর দিশা, যাকে উর্ধ্বরেতা বলা হয়। চিন্তনের এই যোগ্যতাতে মনকে বাধ্য করার প্রয়োজন হয় না, পরন্তু স্বাভাবিকভাবে চিন্তন নিরন্তর চলতে থাকে।

এইরূপ যজনপূর্ণ স্বরে মজ্জন করেন যারা, তাঁরা নিঃসন্দেহে সামীপ্যমুক্তি লাভ করেন। বৈখরী, মধ্যমার চিন্তনে স্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। পশ্যন্তিকালে স্বরে টানাপোড়েন লেগে থাকে এবং পরাবাণীর চিন্তনকালে যজনে পরিপূর্ণ থাকে। এতে মজ্জন করেন যাঁরা, তাঁরা সামীপ্য মুক্তি লাভ করেন।

বহই সুহাওন ত্রিবিধ সমীরা।

ভই সরজূ অতি নির্মল নীরা।। *(মানস, ৭/২/১০)*

প্রায় সকলের শ্বাস সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিগুণের ওঠা-নামার সঙ্গে প্রবাহিত থাকে। যখন শ্বাস যজনের ক্রিয়া-তিনটিগুণ থেকেই নিবৃত্ত হয়। তখন শুভ ভাব-এ ওতপ্রোত থাকে। শুভের অর্থ হল সত্য, বলবার তাৎপর্য হচ্ছে যে, সাধক বিকার রহিত হয়ে যান। এই স্থিতিপ্রাপ্ত স্বরে মজ্জন করেন যিনি, তিনি সামীপ্য মুক্তির অধিকারী। জন্ম-জন্মান্তরের মনের আবিলতা দূর করার জন্য এটাই সরযু। মনের মধ্যে বিকার থাকতে ভগবৎ-স্থিতি লাভ করা সম্ভব নয়। দেহের ময়লা তো জল দিয়েই ধুয়ে ফেলা যায়, কিন্তু অন্তরের আবিলতা ভজন-চিন্তন দ্বারাই দূর হয়। দেখ, এই রামচরিতমানস ক্রিয়াত্মক সেইজন্য ক্লিষ্ট। এই যোগ্যতার উপলব্ধি ক্রিয়া দ্বারাই সম্ভব।

প্রশ্ন- **কবহুঁক করি করুনা নর দেহী।**

দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী।। *(মানস ৭/৪৩/৬)*

চুরাশী লক্ষ যোনিতে দণ্ড ভোগ করতে দেখে ভগবান করুণা করে নরদেহ প্রদান করেন, মনুষ্যদেহ গমনাগমন থেকে মুক্ত হওয়ার সাধন এরূপ বলা হয়েছে, তবে কি সেই নরের স্বরূপ এটাই, যারা দিবা-রাত্রি জন্মগ্রহণ করছে অথবা অন্য কেউ?

উত্তর- দেখ, এই মায়াই নারী। মায়ার উত্থান-পতন চিত্তে হয়ে থাকে, সেইজন্য চিত্তবৃত্তিই নারী। যখন কখনও প্রযত্নশীল পুরুষের হৃদয় চিত্তবৃত্তিরূপে কার্যরত মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন তিনি নরের স্থিতিতে স্থিত হন। যার সঞ্চালন মায়া দ্বারা হয়, সে হল নারী, নর নয়। দেখ, এই মানস মনের সূক্ষ্ম স্থিতিগুলির চিত্রণ। এই স্থিতিগুলির নির্ণয় ইষ্টদেবেরই বাণীতে হয়। সাধক এই স্থিতিগুলি তখন লাভ করেন, যখন ইষ্ট স্থিতিপ্রদান করেন। এই মানস রচনার সঙ্গে-সঙ্গে মানস-রোগ

সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। এই মানস-রোগগুলির মাধ্যমে সেই নর-স্বরূপ-এর নির্ণয় করা হয়েছে। ব্যাধিগুলি প্রসুপ্ত হলে নর স্বরূপ লাভের যোগ্যতা চলে আসে। সমস্ত ব্যাধির মূল হল মোহ এবং মোহই অনন্তরোগের বিস্তারের কারণ। কাম, বাত, ক্রোধ, পিত্ত এবং লোভ হল কফ। অহঙ্কার হল ডমরু এবং তৃষ্ণা উদররোগ। এই প্রকার পনেরো-পঁচিশটা রোগের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে নির্ণয় করে বলা হয়েছে যে, নরের উপর এদের কোন প্রভাব পড়ে না। অতএব যে এই বিকারগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয় না, সেই নর যেমন-

এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ, এ অসাধি বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সন্তত জীব কহুঁ, সো কিমি লহৈ সমাধি।। *(মানস, ৭/১২১ ক)*

এই ব্যাধিগুলির মধ্যে যদি একটা ব্যাধিও নরকে স্পর্শ করে, তবে নরের মৃত্যু হয়। তাহলে যার মধ্যে এই সব কটা রোগই রয়েছে সে তো নিরন্তর পীড়িত জীব। তবে সে সমত্বস্থিতি কিরূপে লাভ করবে? এখন আপনি বিচার করুন যে এগুলির মধ্যে কোন রোগ রয়েছে অথবা নেই। যদি রোগ আছে তবে সে নর নয়। নর তো এক এমন স্বরূপ যে প্রকৃতির সব মন্দ দিক্ কাম-ক্রোধাদি যেগুলির নাম মানস রোগ, জীবিত অবশ্য থাকে, কিন্তু তিনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না দৈববশতঃ যদি কোনও একটা দোষও কাজ করতে শুরু করে দেয় তবে নর-এর মৃত্যু হয়, আর যেখানে সব দোষই বিদ্যমান সেখানে তো নরের প্রশ্নই ওঠে না। গোস্বামীজির অনুসারে সে জড়জীব। যখন ভগবান রাম মনে-মনে এই নিশ্চয় করেছিলেন যে, আমি পৃথিবী নিশাচরবিহীন করে দেব, তখন সীতাকে সম্বোধিত করে বলেছিলেন-

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা। ম্যায় কছু করবি ললিত নরলীলা।।
তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা। জৌ লগি করৌঁ নিসাচর নাসা।।

(মানস, ৩/২৩/১-২)

নিশা বলে রাত্রিকে এবং নিশাচর বলে রাত্রিতে বিচরণকারীকে। মহাপুরুষের দৃষ্টিতে বাহ্যজগতে কোথাও রাত্রি বলে কিছু নেই। বহির্জগতের নিশা তো জীব-জগৎ এর জীবনী।

এহিঁ জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী।
পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী।। *(মানস, ২/৯২/৩)*

এই জগৎ রাত্রিস্বরূপ, **'মোহ নিশা সবু সোওনিহারা'** *(মানস, ২।৯২।৩)* মোহই নিশা। এই নিশাতে কাজ করে যে, কাম, ক্রোধ, মদ, মৎসর ইত্যাদির বিস্তারই নিশাচর। আত্মার রথী হয়ে সঞ্চালন করাই হল রাম। সেই আরাধ্যদেবের আদেশানুসারে মানুষ যখন এগুলি ছেদন করার কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাকে নর বলা হয়। এখানে মোহরূপ রাবণ এবং তার প্রসার আসুরী সম্পত্তি হওয়ার জন্য নিশাচর। কেউ ভজনের হাজার চেষ্টা করুক পরন্তু যতক্ষণ ইষ্টদেব রথী না হন, ততক্ষণ এই বিকারগুলি শান্ত হয় না। যিনিই এই বিকারগুলিকে জয় করেছেন, অনুভব দ্বারাই করেছেন। বিজয়ের পরিণাম প্রেরকের উপর আধারিত থাকে। শ্রম সাধক করেন কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব নিমিত্ত মাত্র। অতএব ইষ্টদেব দ্বারা প্রেরিত সাধক বিকারগুলি থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রযত্নশীল থাকেন। এটা নরস্থিতি লাভ করার প্রয়াস মাত্র।

যৌগিক দৃষ্টিতে নর মনের একটা শ্রেণী। স্থূলদেহধারী কোন জীব নয়। ক্রমাগত সাধনার ফলস্বরূপ সেই পরমপ্রভু (ইষ্ট)-এর কৃপা হলে নরের শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ হয়। যা মোক্ষদায়িনী এবং সাধনার ধাম। এই স্থিতিপ্রাপ্ত সাধকদের সতর্ক করে ভগবান স্বয়ং বলছেন-

নর তনু পাই বিষয়ঁ মন দেহীঁ।
পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহীঁ।। *(মানস, ৭।৪৩।২)*

বহুমূল্য নরদেহ লাভ করে যদি বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করে, তবে সে অমৃতের পরিবর্তে বিষগ্রহণ করে। উপরোক্ত নরের স্থিতি কোন মহাপুরুষের সেবা এবং সান্নিধ্য দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! কামধেনু এবং কল্পবৃক্ষ-এর অর্থ কি? এতদিন পর্যন্ত তো আমরা এদের পশু এবং বৃক্ষই মনে করতাম।

উত্তর- প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে 'গো' শব্দের মহিমা বিলক্ষণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গো লোক-পরলোক এবং সবকিছু প্রদান করে। কালান্তরে 'গো' শব্দ ধীরে-ধীরে একটা ভ্রান্তির রূপ গ্রহণ করেছে। কতিপয় লোকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, মহর্ষিদের নিকট কোন এমন ক্ষমতাশালী গাভী ছিল, যে তৎকাল ইচ্ছিত বস্তুগুলি প্রদান করত। উদাহরণস্বরূপ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিদের নিকট

নন্দিনী এবং কামধেনু ইত্যাদি ছিল এই বর্ণনা পাওয়া যায়। এইপ্রকার কল্পবৃক্ষ, শেষনাগ, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি এমন বহু শব্দ আছে, যাদের বিষয়ে প্রায় আট অথবা দশ শতাব্দী থেকে জনসাধারণের মনে এই শব্দগুলির বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এগুলি সব যৌগিক শব্দ। গোস্বামীজী এই ভ্রান্তিগুলির শমনহেতু যথার্থ স্বরূপের দিগ্‌দর্শন করিয়ে স্পষ্ট শব্দে বলেছেন যে-

রাম মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা।
ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা।। *(মানস। ৬।২৫।৫)*

অঙ্গদের মাধ্যমে রাবণের প্রতি এই প্রকার বলেছেন-রে বুদ্ধিহীন রাবণ! রাম কি কোন মনুষ্য, কামদেব কি কোন ধনুর্ধারীর নাম? ওটা তো একটা বিকারমাত্র।

কাম কুসুম ধনু সায়ক লীন্হে।
সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে।। *(মানস, ১।২৫৬।১)*

কুসুম বলে ফুলকে। লতা থেকে বিকশিত পুষ্প যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে তৎকাল ম্রিয়মাণ হয়, সেই প্রকার কামও ফুলের মতোই একটা কোমল বিকার, যা জাগার সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রভাব কমতে শুরু করে। কিন্তু এত বেশী প্রবল এবং বলবান যে, সমস্ত জগৎকে নিজের বশে করতে পারে। সেইজন্য মহাপুরুষগণ কামের ভয়ঙ্কর প্রবাহকে সশক্ত শূল বলে এক ধনুর্ধারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। আরও বলছেন-ওরে হতভাগা! গঙ্গা কি কোন নদীর নাম?

পসু সুরধেনু কল্পতরু রুখা।
অন্ন দান অরু রস পীযূষা।। *(মানস। ৬।২৫।৬)*

কামধেনু কি কোন পশুর নাম? কল্পবৃক্ষ কি কোন বৃক্ষের নাম? অন্নও কি দানের বস্তু? (নিজেকে সদ্‌গুরুর প্রতি সমর্পণ করাই দান) অমৃত কি কোন তরল পদার্থ?

সুনু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠা।
লাভ কি রঘুপতি ভগতি অকুণ্ঠা।। *(মানস, ৬।২৫।৮)*

রে মতিমন্দ! বৈকুণ্ঠ কি কোন নগর? ভগবানের অগাধ ভক্তি, এটা কি কোন লাভ? এটা তো সর্বোপরি স্থিতি, যখন আর লাভ-লোকসানের উত্থান-পতন হয় না। অমঙ্গল স্থিতি দেখে মঙ্গলের জ্ঞান হয় অর্থাৎ অনুত্তম চিহ্নগুলি দেখেই উত্তমের বোধ করা যেতে পারে কিন্তু ভক্তিতে লাভ লোকসানের কোন প্রশ্নই

নেই। ভগ ইতি স ভক্তি (ভগতি) ভগ বলে গুণ-দোষময় প্রবৃত্তিকে এবং এর অন্তকেই ভক্তি বলে। অতএব স্পষ্ট হল যে, এটা লাভ নয়, পরন্তু স্থিতি বিশেষ।

বৈনতেয় খগ অহি সহসানন।

চিন্তামণি পুনি উপল দসানন।। *(মানস, ৬/২৫/৭)*

যেরূপ ক্রমিক প্রসঙ্গে বলে আসছেন ঠিক সেইপ্রকার এখানেও বলছেন যে-রে মতিমন্দ! গরুড় কি কোন পক্ষী? শেষনাগ কি কোন সর্প, যে পৃথিবীর ভার বহন করে, আজকের যুগে প্রত্যেকদিনই রকেট পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলেছে, কিন্তু কোথাও শেষনাগের দেখা মেলে না। ওরে বিংশতি চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ দশানন! চিন্তামণি কি কোন পাথর? অঙ্গদ যখন দাবি করে বুদ্ধিহীন, নীচ, অন্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন, তখন বস্তুতঃ এগুলি কি? এগুলি সব বর্তমানে খারাপ শব্দ। আরে! এগুলি তো আধ্যাত্মিক শব্দকোষ, যোগ সাধনাতে যে বিশেষ পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হতে হয়, মহাপুরুষগণ এই শব্দগুলির মাধ্যমেই তা অবগত করিয়েছেন। এখন প্রশ্নের শুরুতে বিচার করুন যে, কামধেনু এবং কল্পবৃক্ষ কি? যখন সাধনার সঠিক পথে চালিত হয়ে আমাদের অযুক্ত মন প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে সর্বপ্রকারে নিরোধের স্থিতিতে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ অধোমুখী প্রকৃতিজাত সমস্ত বিকারের ক্রিয়াত্মক ক্রম পরিবর্তিত হয়ে ভগবৎ স্থিতি প্রদানকারী সদ্‌গুণগুলিতে প্রবাহিত হয়, যার ফলস্বরূপ চেতনকে লাভ করে সেইরূপেই সাধক পরিবর্তিত হয়ে যান, যাকে কায়াকল্প বলা হয়। এইপ্রকার কায়াকল্পের স্থিতিযুক্তদের জন্য ইচ্ছাই হল সবকিছু। অন্তর থেকে কারও কল্যাণের ইচ্ছা প্রকট করলে অথবা নিজের জন্য কোন ইচ্ছা জাগার সঙ্গে-সঙ্গে স্বতই পূরণ হতে শুরু করে। মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদান করাই কল্পবৃক্ষের গুণধর্ম এরূপ মনে করা হয়।

কামধেনু- ইন্দ্রিয়সমূহের নাম হল ‘গো’। মনসহিত এই ইন্দ্রিয়গুলি সাধনা দ্বারা নিরুদ্ধ অবস্থা লাভ করে, ব্রহ্ম পীযূষ রসাস্বাদন করিয়ে যায়। সেইসময় যোগীর মনে যে আনন্দানুভূতি হয় সেই নন্দিনী, মহর্ষি বশিষ্ঠ এই স্থিতি প্রাপ্ত ছিলেন। যোগী স্বরূপস্থ হলে এই গো কামধেনু হয়ে যায়। দেহ থাকতে সেই স্বরূপের স্থিতি লাভ হলে সাধকের সমস্ত কামনাপূর্ণ হয়। কারণ এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই যার কামনা করবে। সেই পরম কামনার পূর্তি স্থিতি প্রাপ্ত মহাপুরুষ

দ্বারাই সম্ভব। দেখতে ইন্দ্রিয়গুলির প্রকৃতি তাই যা অন্তরে পরমতত্ত্ব পূর্ণ হলে কামধেনুর বিশেষণ দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়োন্মুখ হলে পশুবৎ হয়ে যায়। যদি সাধনে প্রবৃত্ত হয় তবে ব্রহ্মরসের সঞ্চার করে সেইজন্য নন্দিনী বলা হয়। নন্দিনী অর্থাৎ আনন্দ প্রদানকারী স্থিতি। এটাই পরাকাষ্ঠা প্রদান করলে একেই কামধেনু বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি ব্রহ্মের সমান স্থিতিযুক্ত যেখানে সমস্ত কামনা পূরণ হয়।

তাহলে এখন প্রশ্ন উঠছে যে, গাভীর প্রতি তবে কি সম্মান প্রদর্শিত করার দরকার নেই? সম্মান যাকে ইচ্ছে হয় করুন, এতে কিছু যায় আসে না। এখন গাভীকে সম্মান করুন অথবা অশ্বত্থকে, কেউ মদীনার মাটিকে সম্মান করে, কেউ যীশুকে শূলী চড়ানোর দৃশ্যটিকে। এই প্রকার ইহুদী ইত্যাদি প্রত্যেক সমাজের ভিন্ন-ভিন্ন রীতি-নীতি হবে। দ্বন্দ্বে পড়ে আছে যারা, তাদের ঈশ্বরোন্মুখ করার উপায় এটা। এর ফলে হৃদয়ে শ্রদ্ধা আরও গভীর হয় এবং ধর্মে রুচি জাগে। ক্রমশঃ সংসার-ধর্মে বিতৃষ্ণা জাগে, সত্য প্রাপ্তির জিজ্ঞাসা প্রবল হয়, কিন্তু বাস্তবিক ক্রিয়া, যার দ্বারা পরমচেতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাতে স্থিতি লাভ হলে এদের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়। যতক্ষণ আমাদের যোগ্যতা সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে সক্ষম না হয়, ততক্ষণ এর পালন নিতান্ত আবশ্যক। ভগবৎ-পথ-এর প্রবেশিকা পর্যন্ত এইরূপই কিছু-কিছু মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, দেবতাদের স্থানে দেবতা নামের কোন বস্তু নেই। কিন্তু মানুষ যখন কোন স্থানে শ্রদ্ধায় নত হয়, তখন আমি স্বয়ং সে স্থানে দাঁড়িয়ে ফলপ্রদান করি, পরন্তু সেই ফল সীমিত। তারা আমার অব্যক্ত স্বরূপ লাভ করতে পারে না। অতএব আমাকে প্রাপ্ত করার জন্য তাদের এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হবে। যা আমার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যতক্ষণ ভগবৎ স্বরূপ প্রদানকারী ক্রিয়ার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ এই প্রয়াস করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন- মহারাজজী! আধ্যাত্মিক পথে যুদ্ধ কি অনিবার্য?

উত্তর- শুধু অধ্যাত্মই এমন বিষয়, যেখানে যুদ্ধ অনিবার্য, অন্য কোথাও অনিবার্য নয়। সংসারে বড়-বড় সংঘর্ষ হয়, কিন্তু এগুলির উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, পরমার্থ নয়। মোহাচ্ছন্ন হয়ে সাংসারিক শক্তির মদে মত্ত হয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বিশাল জনসমূহগুলি পরস্পর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। এগুলিকে যুদ্ধের সংজ্ঞা দেওয়া

হয়। এইরূপ যুদ্ধে অসংখ্য মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয় কিন্তু যুদ্ধের পর যারা জীবিত থেকে যায় জয়লাভ তাদেরও হয় না। এটা প্রবৃত্তি মার্গ। যে যাকে যতটা দমন করে কালান্তরে তাকেও ততটাই দমনের সম্মুখীন হতে হয়। আজ যে দেহাভিমানবশতঃ নিজেকে সিংহ তুল্য মনে করছে, ভবিষ্যতে তাকেও ভয় পেতে হয়, কারণ যাদের মধ্যে প্রতিশোধের ভাব থাকে, তাকে ভোগ করতেই হয়। এই মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং আরও একটা দিন থাকবে, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে এর উপভোগের জন্য যে সামগ্রী একত্র করা হয়, সেটাই কি করে সত্য হবে? অতএব এইরূপ প্রাপ্তিও অপ্রাপ্তিই। কিছুক্ষণের জন্য বিচার করুন, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যারা ইন্দ্রিয়সুখ কামনা করে, সেই পাপাচারীগণ ব্যর্থই জীবন ধারণ করে, অতএব তুমি এগুলির বশীভূত হয়ো না। পরের জন্মগুলিতে যে-যে যোনিতে জন্ম-হবে, সেগুলির প্রতিপাদন করে বলছেন যে, হে অর্জুন! মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যার চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ করে, প্রায় সেই ব্যক্তি সেই স্তরেরই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যিনি আমার চিন্তন করতে-করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমার স্বরূপই লাভ করেন। যদি এইরূপ সরল উপায় আছে তবে মৃত্যুকালে সকলেই ভগবানের চিন্তন করে নেবে, কিন্তু বলেছেন যে, হে অর্জুন! প্রয়াণকালে অনায়াসে সেই চিন্তনই চলে আসে, যেটা জীবনে বেশী অভ্যাস করা হয়। মৃত্যুকালে বুদ্ধি ভ্রমপূর্ণ হয়ে যায়, যার ফলে জীবনের ভাল-মন্দ কার্যগুলি অনায়াসেই স্মরণ হয়ে আসে। সেই-জন্য তুমি নিরন্তর আমারই চিন্তন কর, যাতে প্রয়াণকালে আমার চিন্তনই তোমার মধ্যে প্রসারিত হতে পারে। আজীবন যার মধ্যে মার-কাট, ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট এবং জীবদের কষ্ট দেবার মনোভাব থাকে প্রয়াণকালের পরেও সে জন্ম-মৃত্যুর পরিধিতে ঘুরতে থাকে। ঝগড়া করার প্রবৃত্তি জীব-শ্রেণীর স্বভাব। অতএব কাম-ক্রোধ, মোহ-লোভবশতঃ ঝগড়া অবশ্য হয়, যার পরিণাম অধোগতিতে গমন। যখন উপলব্ধি হয় তখন বিজয়ের তো প্রশ্নই উঠছে না। এখন একটু মানসের উপরও বিচার করুন। যখন রাবণ যুদ্ধস্থলে এসেছিল, বিভীষণ খুব চিন্তিত হয়েছিলেন এবং তার পরাক্রমের কথা স্মরণ করে বিচার করতে শুরু করেছিলেন যে, **'রাবণু রথী বিরথ রঘুবীরা।' (মানস, ৬।৭৯।১)**-রাবন রথে আরুঢ় ভগবান রাম বিরথ, পদযুগলে তাঁর পাদুকা পর্যন্ত নেই, তবে এই ভয়ঙ্কর শত্রুকে কি করে পরাজিত করবেন?

মনে রাখবেন, এখানে গোস্বামীজীর অনুসারে রাম এবং রথাদির চিত্রণ

প্রতীকরূপে প্রত্যক্ষ রয়েছে। এখানে মোহই রাবণ এবং তার রথই মোহের প্রসার। আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করব, তা সেখান থেকেই ক্রিয়াশীল হবে। এটা সেই রথ যা মোহকে আয়ত্তে এনে প্রকৃতিতে ভ্রমণ করাতে থাকে। এইরূপ বিচার করে বিভীষণ বললেন-

নাথ ন রথ নহিঁ তন পদ ত্রানা।

কেহি বিধি জিতব বীর বলওয়ানা।। *(মানস, ৬/৭৯/৩)*

ভগবন্! আপনার রথও নেই, পায়ে জুতোও নেই। এই মহা ভয়ঙ্কর শত্রুকে আপনি পরাজিত করবেন কি করে? রাবণের বল সম্পর্কে বিভীষণ অবগত ছিলেন। এই বিষয়ে ভগবান রাম তার প্রীতি দেখে বলছেন যে-

সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা।

জেহিঁ জয় হোই সো স্যন্দন আনা।। *(মানস, ৬/৭৯/৪)*

ভগবান রাম বললেন, "যে রথের সাহায্যে জয় লাভ হয়, সেটা অন্য রথ। তবে সেই রথের স্বরূপ কি?"

সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা।

সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা।। *(মানস, ৬/৭৯/৫)*

শৌর্য এবং ধৈর্যরূপ চাকা সেই রথটিকে চালিত করে। সত্য (যা ত্রিকালে অবাধিত) এবং শীল (সত্যের অনুসরণ)-এ দুটি ধ্বজ এবং পতাকা। মনে রাখবেন, ধ্বজ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের প্রতীক। তার বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারে না। যদি তার বিরুদ্ধে কোন কার্য হয়, তবে রাষ্ট্র সমাপ্ত হয়ে যায়। ঠিক এই প্রকার সত্যের বিপরীত কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে।

ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে।। *(মানস, ৬/৭৯/৬)*

শক্তি, বিবেক, ইন্দ্রিয়গুলির দমন এবং পরম বস্তুর কাছ থেকে হিত লাভই হল অশ্বসমূহ, যেগুলি দ্বারা সঠিক দিশা অর্থাৎ বাস্তবিক গতি লাভ হয়। ক্ষমা, কৃপা এবং সমত্বরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে এই অশ্বগুলি কাজ করে।

ঈস ভজনু সারথী সুজানা।

বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপানা।। *(মানস, ৬/৭৯/৭)*

ঈশ-এর ভজনা হল দক্ষ সারথী। বৈরাগ্যই ঢাল, যার উপর বিকারগুলির কোন প্রভাব পড়ে না। সন্তোষই হল কৃপাণ।

দান পরসু বুধি সক্তি প্রচণ্ডা।
বর বিগ্যান কঠিন কোদণ্ডা।। *(মানস, ৬/৭৯/৮)*

দানই পরশু এবং বুদ্ধিই প্রচণ্ড শক্তি। বিশেষ-বিশেষ অনুভূতির সঞ্চারই হল ধনুক, এর দ্বারা প্রকৃতির কোন একটা দিক্ একবারে যতটা নির্মূল হয়, পুনরায় তা ক্রিয়াশীল হয় না।

কবচ অভেদ বিপ্র গুর পূজা।
এহি সম বিজয় উপায় ন দূজা।। *(মানস, ৬/৭৯/১০)*

ব্রহ্মে-স্থিত মহাপুরুষ এবং তাঁদের মধ্যেও যাঁরা সদ্গুরু, কায়মনোবাক্যে তাঁদের পূজা করাই হল অভেদ্য কবচ। জয়লাভ করার জন্য এর সমান অন্য কোন উপায় নেই।

মহা অজয় সংসার রিপু, জীতি সকই সো বীর।
জাকেঁ অস রথ হোই দৃঢ়, সুনহু সখা মতিধীর।। *(মানস, ৬/৮০ক)*

অত্যন্ত দুর্জয় সংসাররূপ শত্রুকে সেই বীর জয় করতে সক্ষম, যিনি উপর্যুক্ত রথের স্থিতিতে দৃঢ়তা পূর্বক স্থিত। রাম রথের সাহায্যে জয়লাভ করেছিলেন এবং স্বয়ং বলেছেন যে, অন্য কোন রথের সাহায্যে জয়লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, তিনি কি কোন সোনা অথবা রূপোর রথে উপবেশন করে জয়লাভ করেছিলেন?

এটা মানস। স্থূল দৃষ্টি দ্বারা এর যথার্থ অর্থলাভ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ ভগবৎ-পথ-এর একটা নির্ধারিত সীমা পার করা যেতে পারে। একাগ্রতা লাভের পর মনের প্রভুত্বই হল ইন্দ্র। এইরূপ একাগ্রতা থাকলেই উপর্যুক্ত রথের বিদ্যমানতা সম্ভব। যেমন-শৌর্য, ধৈর্য, সত্য, শীল, ঈশ, ভজন, নিরন্তর চিন্তন, সদ্গুরুর পূজা ইত্যাদির সঞ্চার এবং এগুলিতে মনকে নিযুক্ত করে রাখার ক্ষমতা আসার পরই ইন্দ্র রথ প্রদান করেছিলেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি যখন নিরুদ্ধ হয়, তখনই সেই দৈবী সম্পত্তি, যেগুলির সাহায্যে পরমদেব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, উপযোগিতা ফুরিয়ে যায়। দৈবিক সম্পত্তির সাহায্যেই গমনাগমন থেকে মুক্তি এবং ইষ্টোপলব্ধি হয়। এখানে রাবণ হল মোহ। যেমন-

মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা।
তিহ্ন তে পুনি উপজহি বহু সূলা।। *(মানস, ৭/১২০/১৫)*

সকল ব্যাধির মূল মোহ (রাবণ)ই যখন, মিটে যায় তখন, '**রহা ন কোউ কুল রোওনিহারা।**' *(মানস, ৬/১০৩/১০)* আর কেউ বেঁচে নেই অর্থাৎ সংসাররূপ শত্রুকে পরাজিত করা হয়েছে। মনে রাখবেন, সংসাররূপ শত্রুকে যে রথের সাহায্যে জয় করা হয়, তার বর্ণনা করেছেন। যতক্ষণ উপর্যুক্ত রথের যোগ্যতা লাভ না হচ্ছে, ততক্ষণ বিজয়লাভ করা সম্ভব নয়। ভগবান রামের বাস্তবিক বিজয়লাভ থেকে এই কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে মহাপুরুষের অন্তঃকরণের লড়াই। যা প্রসুপ্তাবস্থাতে প্রায় সকলের অন্তঃকরণে বিদ্যমান। সেই লড়াই কোন-কোন প্রযত্নশীল পুরুষের অন্তঃকরণে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ জাগ্রত করে দেন।

প্রিয় পাঠকগণ! যদি আপনারা এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে কাজে পরিণত করতে পারেন, তবে এটা আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করব। দুটি প্রবৃত্তি অন্তঃকরণের, প্রথমটি সজাতীয় এবং দ্বিতীয়টি বিজাতীয়, দৈবী সম্পদ এবং আসুরী সম্পদ রাবণ অর্থাৎ আসুরী সম্পদকে নির্জীব করে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য কল্যাণের ক্ষেত্রে নেমে পড়। যদি অল্প আচরণও করতে সমর্থ হও, তবে সংস্কার প্রবল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! অমৃতের প্রভাব হল, যার উপরই পড়ে তাকেই জীবন প্রদান করে কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর অমৃত বর্ষার ফলস্বরূপ বাঁদর-ভালুক তো বেঁচে উঠেছিল কিন্তু নিশাচরদের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি, এর কারণ কি? যেমন-

সুধা বৃষ্টি ভৈ দুহু দল উপর।
জিএ ভালু কপি নহিঁ রজনীচর।। *(মানস, ৬/১১৩/৬)*

উত্তর- পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মানস হল অন্তঃকরণের লড়াই। অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তি দৈবী সম্পদ্ এবং আসুরী সম্পদ্ সকলের মধ্যে বিদ্যমান, পরন্তু একথা সকলে জানে না। কোন বিরল প্রযত্নশীল, পুণ্যাত্মার হৃদয়ে এই আত্মা প্রত্যক্ষ হয়ে কাজ করতে শুরু করে, তখন দুটি প্রবৃত্তির স্বরূপ স্পষ্ট হয়। এগুলিকে শুধু বাচিক নির্ণয় দ্বারা অনুধাবন করতে সমর্থ হব না। শব্দ-সঙ্কেত দ্বারা তো শুধু ভগবৎ-পথ-এর দিশারই সন্ধান মেলে। দৈবী সম্পদ-আসুরী সম্পদ,

বিদ্যা-অবিদ্যা, সজাতীয়-বিজাতীয় ইত্যাদি রূপে মহাপুরুষগণ এই দুটি প্রবৃত্তির নামকরণ করেছেন। যেমন-

'বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদায়া।' অর্থাৎ বিদ্যা তাকে বলে, যা ব্রহ্মগতি প্রদান করে। এই দুটি প্রবৃত্তির পারস্পরিক সংঘর্ষই হল রাম-রাবণ-এর যুদ্ধ, যাতে মোহরূপ রাবণ, ক্রোধরূপ কুম্ভকর্ণ, কামরূপ মেঘনাদ, লোভ রূপ নারান্তক, প্রকৃতিরূপ সূর্পনখা ইত্যাদি আসুরী বৃত্তিগুলি যখন কাজ করতে শুরু করে, তখন এদের সংখ্যা হয় অনন্ত। উদাহরণস্বরূপ সকলের মৃত্যুর পর রাবণ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তখন সে অনন্ত সৈন্য সৃষ্টি করেছিল। এর তাৎপর্য হল যদি অবিদ্যার একটা সদস্যও জীবিত, তবে তার থেকেই অনন্ত প্রসারিত হয়।

মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা। ***(মানস,৭।১২০।১৫)*** এই মোহরূপ রাবণ সকল ব্যাধির মূল, সেইজন্য রাজা। দশটি ইন্দ্রিয়রই মুখ স্ব-স্ব বিষয়াভিমুখে উন্মুক্ত, সেইজন্য দশানন বলা হয়। যখন বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলি নিবৃত্ত হবে, তখন মোহের স্বরূপ নষ্ট হবে, যা সম্পূর্ণ আসুরী সম্পত্তিকে পরিচালিত করে।

দশটি ইন্দ্রিয়ের দমনই হল দশরথ, যা দৈবী সম্পত্তিকে জন্ম দেয়। যখন ভক্তিরূপ কৌশল্যা, কর্মরূপ কৈকেয়ী, সুমতিরূপ সুমিত্রা এবং এদের সঙ্গে কুমতিরূপ মন্থরা (ভগবৎ-পথ-এ অর্ধেক দূরত্ব পর্যন্ত যে কুতর্ক চলতে থাকে) ইত্যাদি দৈবী প্রবৃত্তিগুলির জাগরণ আমাদের হৃদয়ে হয়ে গেলে, সেই সময়ই বিজ্ঞানরূপ রাম, বিবেকরূপ লক্ষণ, ভাবরূপ ভরত এবং সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন ইত্যাদি প্রকট হয়। বিশ্বাসরূপ বিশ্বামিত্র এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস-এ জপ হল শৃঙ্গী ঋষি। মোহ সম্পূর্ণরূপে মিটে গেলেই দৈবী সম্পত্তি বলবতী হয়।

অমৃত কোন তরল পদার্থ নয় যে, তুলে পান করে নিলাম। **'রস পীযূষা' (মানস ৬।২৫।৬)**-অঙ্গদ বলছেন যে, রে বুদ্ধিহীন রাবণ! অমৃত কি কোন রস বিশেষ, মৃত বলে নাশবান্ অথবা মরণধর্মাকে এবং অমৃত বলে অবিনাশীকে। মহাপুরুষগণের বাণীতে অমৃতের স্থিতি হল আত্মা এবং পরমাত্মার একতা-কাল। এই একতা কালে পরমাত্মার অজর-অমর, শাশ্বত, একরস ইত্যাদি গুণধর্ম আত্মাতে সঞ্চারিত হতে শুরু করে। অতএব মনীষীগণ আত্মার এই অবস্থাকালকে অমৃত অর্থাৎ মৃত্যু থেকে অতীত বলেছেন কিন্তু মোহজাত বিকারগুলি থাকলে আত্মা পরমাত্মাতে স্থিত হয় না। এই গুণযুক্ত এই অমৃত নিশাচরদের মূল-কারণ রাবণ মিটে গেলেই লাভ হয়। মোহ সঅস্তিত্ব

বিলীন হলে চিদাকাশ থেকে মায়িক স্ফূরণ এবং তরঙ্গ শান্ত হয়ে যায়। এইরূপ নির্দোষ চিত্তেই অমৃত-সঞ্চার হওয়া সম্ভব। এই কারণেই বিকারগুলি নির্লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমৃত তত্ত্বের সঞ্চার হয় পরিণামস্বরূপ অবিদ্যা আসুরী সম্পদ সর্বদার জন্য বিলীন হয়ে যায় এবং আত্মস্থিতি প্রদানকারী বিদ্যা (দৈবী সম্পদ্) অংশ সহিত বিকশিত হয়। যে প্রবৃত্তিগুলি অধোগতিতে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে একটাও ক্রিয়াশীল থাকলে কিরূপ অমৃত লাভ? বস্তুতঃ তত্ত্বের সঞ্চার হলে মৃত্যুর কারণ সর্বদার জন্য মিটে যায়। পুনরায় অমৃতের মহত্ব বলে গোস্বামীজী বলছেন-

তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা। মুএঁ করই কা সুধা তড়াগা।। *(মানস, ১/২৬০/২)*

যদি বারি ব্যতীত দেহত্যাগ হয়ে যায়, তবে মৃত্যুর পর অমৃতের কোন উপযোগিতা নেই।

রাম ভগতি জল মম মন মীনা।
কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা।। *(মানস, ৭/১১০/৯)*

রামের অভেদ্য ভক্তিই হল জল, যাতে হে মুনীশ্বর! আমার মন মৎস্য হয়ে গিয়েছে। তা কি করে পৃথক হতে পারে, ভক্তিরূপ জল দ্বারাই সেই অমৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। যদি জীবিতাবস্থাতেই ভক্তিরূপ রস লাভ হয়, তবে মৃত্যুর পশ্চাতে সেই অমৃতের কোন উপযোগিতা নেই। কোন তত্ত্বস্থিত সদ্‌গুরু রথী হলে তবেই ভবরোগের জন্য তিনি বৈদ্য এবং পার করে দেবার জন্য কর্ণধার হবেন। তাঁর অসীম কৃপা দ্বারাই অমৃত তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব।

প্রশ্ন- আশ্রম ঘোর জঙ্গলের মধ্যে স্থিত, এখানে আসার জন্য সড়ক পথও নেই। সেইজন্য সকাল দশটার পূর্বে কোন যাত্রীর পৌঁছানোটা অসম্ভব। একবার কিছু সশস্ত্র দর্শনার্থী খুব সকালে পৌঁছে প্রণাম ইত্যাদি করেছিল, তখন মহারাজজী বলেছিলেন যে, এত তাড়াতাড়ি কি করে এলে? তারা বলেছিল, মহারাজজী! আমরা শিকার করার জন্য এসেছিলাম। কিছু শিকার না পেয়ে ভাবলাম যে, মহারাজজীর দর্শন অন্ততঃ করে নিই। একথা শুনে তিনি বলে উঠেছিলেন-তুমি আহীর, তুমি ঠাকুর, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এ কি করছ? তখন সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলেছিল যে, ভগবন! এতে আমার কি দোষ?, 'উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন' (মানস, ৭।১১২।১) তাঁর প্রেরণা ব্যতীত পাতা পর্যন্ত নড়ে না, আমি তো তাঁরই হাতের যন্ত্রমাত্র।

উত্তর- দেখ, এই মানসে তো অনেক কথাই লেখা হয়েছে, সকল স্থানেই বিচার করা উচিৎ।

কোন স্থিতিতে ভগবান প্রেরণা দেন এবং কোন বিড়ম্বনাতে মায়া। সকলকেই কোথাও মোহ প্রেরণা দেয়, কোথাও কাম, কোথাও কাল প্রেরক আর কোথাও স্বভাব এবং গুণ। এইরূপ ধন্ধে ভগবৎ-প্রেরণার তো প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে শুধু বাসনার বাহুল্য, সেখানে তো-

ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা।

কাল কর্ম সুভাও গুন ঘেরা।। *(মানস, ৭/৪৩/৫)*

যতক্ষণ ভগবৎ-পথ-এর নির্ধারিত সীমা পার না করা হয়, ততক্ষণ মায়াই প্রেরকের কাজ করে কিন্তু সেই সীমা পার করে নিলে ভগবান প্রেরকের স্থান গ্রহণ করেন। অতএব সাধন, চিন্তনে নিযুক্ত থাকা উচিৎ, যাতে তিনি প্রেরক হয়ে যান। ভগবান প্রেরক হলে সাধকের মায়ার ভয় আর থাকে না। যেমন-

‘**করি না সকই কছু নিজ প্রভুতাঈ।**’ *(মানস, ৭/১১৫/৭)*

‘**মায়া খলু নর্তকী বিচারী।।**’ *(মানস, ৭/১১৫/৪)*

কাকভুশুণ্ডি বহু জন্ম ধরে পথিক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভক্তের শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সকলকর্ম ভগবৎ-প্রেরণাতে সম্পন্ন করতেন। তাঁর মধ্যে যে অপূর্ণতা ছিল সেটা মহামুনি লোমশের মনে প্রেরণা প্রদান করে ভগবান দূরীভূত করেছিলেন। ভরত খড়ম এবং চরণযুগলকে ধ্যানের মাধ্যম করে ভগবৎ প্রেরণা লাভ করে রাজ্যের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। লক্ষণের কার্যও প্রেরণার উপর আধারিত ছিল। অতএব কাকভুশুণ্ডি, ভরত, লক্ষণ এবং হনুমান ইত্যাদি কয়েকজন সদস্যই এমন ছিলেন, যাঁদের হৃদয়ে ভগবান প্রেরণা যোগাতেন। আকাশে ঢিল ছুঁড়লে সেটা পৃথিবীতেই এসে পড়ে, যদি মাধ্যাকর্ষণের পারে চলে যায়, তবেই সেটা পৃথিবীতে এসে পড়বে না। এইরূপ ভগবান এবং মায়ার মাঝে একটা আকর্ষণ রয়েছে সীমা পার করার পূর্বে মায়া প্রেরণা প্রদান করে এবং পরে ভগবান করেন। এই অবস্থাতে আমরা পতিত হতে চাইলেও হতে পারব না। নারদ যেরূপ পতিত হতে চাইছিলেন কিন্তু ভগবৎ প্রেরণার ফলস্বরূপ হতে পারেননি।

প্রশ্ন- মহারাজজী! আপনার বাণী শুনে এইরূপ মনে হচ্ছে যে, রামচরিতমানস সকলের ভিতরের বস্তু। এটা বোঝার একটা উপায় বলে দিন।

উত্তর- প্রত্যেকটা মানুষ বহির্মুখী এবং এই বহির্মুখী মনকে ধীরে-ধীরে নিয়ন্ত্রিত করে ভিতরের জ্ঞান লাভ করে। অতএব এরূপ ভাবতে নেই যে, যে ব্যক্তি বহির্মুখী সে ভুল। ভগবৎ-পথ-এর একটা সীমা অতিক্রম করলে ভজনার বাস্তবিক স্বরূপ-এর জ্ঞান তার হতে শুরু করে। এইরূপ স্থিতিলাভের পর মানসের একটাও চৌপাই-এর উপযোগিতা বহির্জগৎ-এর জন্য থাকে না। যেমন-

বালমীক নারদ ঘটজোনী।
নিজ-নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী।। *(মানস, ১/২/৩)*

মানসের প্রথম রচয়িতা এবং মানসের বিশেষজ্ঞ এই মহাপুরুষগণ নিজ নিজ মুখে তাঁদের সঙ্গে ঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে ব্যক্ত করেছেন কোন অন্য রাম এবং তাঁর কাহিনীকে করেননি। শীর্ষকের বিস্তার পুস্তকের ভিতরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি পুস্তকের নাম 'ঘরের ডাক্তার' তবে সেই পুস্তকের পাতাগুলিতে ঔষুধেরই বিবরণ থাকবে। সেই পুস্তকে যদি আমরা কর্মকাণ্ড অথবা দেশ-নীতি দেখতে চায়, তবে তা পাব না। গোস্বামীজীর এই রচনার নাম 'রামচরিতমানস' এর অর্থ হল-রামের সেই চরিত্র, যা অন্তঃকরণে সমাহিত। এখন আপনিই বলুন যে, রামের ঘর হৃদয়দেশ অথবা পুস্তক। ভগবানের ঘর হৃদয়ই বলা হয়েছে। যেমন-

জিহ্ন কে কপট দম্ভ নহিঁ মায়া।
তিহ্ন কে হৃদয় বসহু রঘুরায়া।। *(মানস, ২/১২৯/২)*
ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে।
তিহ্ন কে হিয় তুমহ্ কহুঁ গৃহ রুরে।। *(মানস, ২/১২৭/৫)*

এই প্রকার সম্পূর্ণ মানসে ভগবানের যতগুলি নিবাসস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেগুলি সবই হৃদয় অথবা বিশেষ অবস্থাযুক্ত অন্তর্মন। সম্পূর্ণ মানসে এইরূপই বর্ণিত। অতএব এটা হৃদয়ের বস্তু। কৃতিকারের ভাষায় এর শীর্ষক হল 'রামচরিতমানস' অর্থাৎ রামের সেই চরিত্র যা অন্তঃকরণে সমাহিত রয়েছে। মানসের অর্থ মান সরোবর নয়।

জিহ্ন এহিঁ বারি ন মানস ধোয়ে।
তে কায়র কলি কাল বিগোয়ে।। *(মানস, ১/৪২/৭)*

অর্থাৎ মানস এমনই তত্ত্ব, যা প্রক্ষালন করা যেতে পারে। কলিযুগের ভয়ঙ্কর বেগ দেখে ভগবান শঙ্কর বিচার করেছিলেন যে, মানুষের বুদ্ধি ব্যাকুল।

যদি তারা সাক্ষাৎ ভগবানেরও দেখা পায় তবে তাঁকে দিয়ে উদর পূর্তিই করাবে। বুদ্ধি কুণ্ঠিত থাকার জন্য পূর্বসাধনা ক্রম দ্বারা কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়, সেইজন্য করুণার্দ্র হয়ে কল্যাণকর সাবর মন্ত্রের রচনা করেছিলেন।

কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা।

সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরিজা।। ***(মানস, ১/১৪/৫)***

কলির ভয়ঙ্কর প্রবাহ দেখে শিব সাবর মন্ত্রের রচনা করেছিলেন, যা জগৎ-এর জন্য কল্যাণকর। সেই সাবর মন্ত্র কিরূপ? :-

অনমিল আখর অরথ ন জাপূ।

প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপূ।। ***(মানস, ১/১৪/৬)***

না অক্ষরগুলির মধ্যেই সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং না অর্থ জপেরই কোন শৃঙ্খলা আছে। তবে তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটা নিরর্থক কিন্তু শিবের প্রভাবে প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করার যদি ক্ষমতা আছে তবে সাবর মন্ত্রে আছে। কলিযুগে কল্যাণের অন্য কোন উপায় নেই। সেইজন্য তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন যে-

সো উমেস মোপর অনুকূলা।

করিহিঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা।। ***(মানস ১/১৪/৭)***

সেই শিবই আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন অতএব এই কাহিনী আমি কল্যাণের জন্য বলতে যাচ্ছি। এই কাহিনী সর্বত্র এবং সকলকে বলা উচিৎ নয়। যেমন-

ইয়হ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহি। জো মন লাই ন সুন হরি লিলহি।।

কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি। জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি।।

দ্বিজ দ্রোহিহি ন সুনাইঅ কবহুঁ। সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহুঁ।।

(মানস, ৭/১২৭/৩-৫)

এই কাহিনী হঠধর্মী, কামী এবং ক্রোধীর প্রতি বলা উচিৎ নয়। এখন আপনিই বলুন যে, এই দোষগুলি থেকে মুক্ত হৃদয় কটা পাওয়া যাবে? ইন্দ্রের সমান প্রতিভাশালী পুরুষ হয়ে যদি এই সকল দোষযুক্ত হয়, তবে তার প্রতিও বলা উচিৎ নয়। যদি ইন্দ্রের সমান প্রতিভাশালী হয় তবে হাজার-পাঁচশো বিদ্বান্‌কে ডেকে শুনে নেবে। রামচরিতমানস যখন ঘরে-ঘরে, তখন না বলার কি আছে। যদি এক-একটা চৌপাই-এর আমরা অনেক অর্থ বার করি, তাও বলার-শোনার কথা থেকে বঞ্চিত থাকব কারণ এটা সাবর মন্ত্র। যেমন-

রাম কথা কে তেই অধিকারী। জিহ্ন কেঁ সৎসঙ্গতি অতি প্যারী।।
গুর পদ প্রীতি নীতি রত জেঈ। দ্বিজ সেবক অধিকারী তেঈ।।

(মানস, ৭/১২৭/৬-৭)

রামকাহিনীর অধিকারী তাঁরাই, যাঁদের সৎসঙ্গ অতিব প্রিয় এবং গুরুর চরণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্, গুরুর দ্বারা নির্ধারিত নীতি অর্থাৎ সাধনা-পদ্ধতিতে যে রত সেই সঙ্গে দ্বিজ সেবক, সেই এর অধিকারী। এ বিষয় বোধগম্য হতে সময় লাগে কিন্তু অধিকারী হলে ক্রমশঃ বোধগম্য হয়।

ম্যায় পুনি নিজ গুর সন সুনী, কথা সো সূকর খেত।
সমুঝী নহিঁ তসি বালপন, তব অতি রহেউঁ অচেত।। *(মানস, ১/৩০ ক)*

প্রত্যেক শাস্ত্রের তিনটি অর্থ—রুচিকারক, ভয়ঙ্কর এবং যথার্থ। রুচিকারকের অর্থ- যা রুচি জাগায় যেমন- রামলীলা ইত্যাদি। ভয়ঙ্কর তাকে বলে, যা প্রকৃতি থেকে ভয় উৎপন্ন করে। যে অর্থে ভয় প্রকট এবং নিবারণ হেতু আমরা ভগবানের প্রয়োজন বুঝি এবং প্রাপ্তির উপায় খুঁজি। যথা-

নর তনু ভব বারিধি কহুঁ বেরো। সন্মুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো।
করনধার সদ্গুর দৃঢ় নাওয়া। দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাওয়া।।

(মানস, ৭/৪৩/৭-৮)

জো ন তরৈ ভব সাগর, নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি, আত্মাহন গতি জাই।।

(মানস, ৭/৪৪)

যে এইরূপ দেহ লাভ করে সুযোগ হারায়, সে নিজের আত্মার হত্যাকারী।

কাল রূপ তিহ্ন কহঁ ম্যায় ভ্রাতা। *(মানস, ৭/৪০/৫)*

তাদের জন্য আমিই কালরূপ হয়ে যায়। যার কাছ থেকে মোক্ষের আশা, তিনিই যখন কালরূপ হয়ে যান, তখন ভয়ের সঞ্চার হয় এবং কোন না কোন রূপে তাঁকে লাভ করার উপায় হয়ে যায়। যথার্থের স্বরূপ এই যা আমি শুনেছি, সেইরূপ নিজের অন্তরেও প্রত্যক্ষ করবে। উৎপত্তি থেকে পূর্তিপর্যন্ত যে লীলা তা দৃষ্টিগোচর হবে। মুখস্থ বলা অন্য জিনিষ। এটা তখনই সম্ভব যখন মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার হবে এদের মধ্যে কোন মহাপুরুষের রূপ চিন্তন দ্বারা পরমচেতনের জাগৃতি সম্ভব। সকলেই অধিকারীর যোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হবে, এটা সম্ভব নয়। নিরন্তর যাঁরা অধ্যয়ন

করছেন তাঁরাও ডিগ্রী লাভ করার অধিকার হারিয়ে ফেলেন। সেইজন্য মহাপুরুষগণ শাস্ত্রকে তিনভাগে রচনা করেছেন। যদি আপনি প্রবেশিকা শ্রেণীতে তবে মানস অধ্যয়ন করলে সঠিক দিশা পাবেন। যদি স্থিতি আরও সূক্ষ্ম তবে এই মানসই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়ে রামের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেবে। এখন একটা জিজ্ঞাসা বাকী রইল যে, মানসের যেটা অন্তিম ক্রিয়া সেটা আমরা বুঝব কি করে?

শ্রীগুর পদ নখ মনি গন জোতী।
সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ঁ হোতী।। *(মানস, ১। সোরঠা, ৫।৫)*

গুরু মহারাজজীর চরণযুগলের জ্যোতি মণি মাণিক্যের তুল্য। স্মরণ করলে হৃদয়ে দিব্য-দৃষ্টির সঞ্চার হয়।

বড়ে ভাগ উর আওই জাসূ।। *(মানস, ১। সোরঠা, ৫।৬)*

তাঁরা বড়ই ভাগ্যবান, যাঁরা ধ্যানে গুরুর চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম।

উঘরহিঁ বিমল বিলোচন হী কে।
মিটহিঁ দোষ দুখ ভব রজনী কে।। *(মানস, ১। সোরঠা, ৫।৭)*

এই প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারাই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় যার সাহায্যে রামচরিতমানস প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়। ধ্যানকালে সদ্গুরুর চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করতে সমর্থ হলে-

জথা সুঅঞ্জনি অঞ্জি দৃগ, সাধক সিদ্ধ সুজান। *(মানস, ১।১)*

মনে রাখবেন যে, গোস্বামীজী শ্রী গুরুদেবের চরণ-রজকে অঞ্জন বিশেষের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যা অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত করে, কিন্তু এটা তখনই সম্ভব, যখন ধ্যানকালে চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবেন। ভগবৎ-চিন্তন-এ নিযুক্ত সাধকদের পক্ষেই এটা সম্ভব, যাঁদের সংখ্যা খুবই কম। অতএব চিন্তন-এ প্রবৃত্ত সাধকই তাঁকে লাভ করেন এবং তারপর সিদ্ধ এবং জ্ঞানী হয়ে যান। সেই অঞ্জন স্পর্শ করলে, যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা করা সম্ভব হয়নি, সে সবই প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। কারণ মনোগত সমস্তভাব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। গোস্বামীজী শেষে এই নির্ণয় করে বলছেন যে, আমি এটুকুই লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি, আকাশে যেরূপ মাছি উড়ে বেড়ায় কিন্তু সীমা কোথায় আকাশের জানতে পারে না।

প্রশ্ন- একবার একজন ভক্ত এসে প্রণাম করেছিল এবং অতি বিনীত

স্বরে বলেছিল যে, মহারাজজী! আমি গঙ্গোত্রীর-জল দশবার রামেশ্বর নিয়ে গিয়েছি এবং এখন পুনরায় একাদশ বার দর্শন করার জন্য যাচ্ছি। রামেশ্বর-দর্শন-এর প্রভাব সম্বন্ধে গোস্বামীজী এটুকু তো বলেছেন যে-

মম কৃত সেতু জো দরসনু করিহী।

সো বিনু শ্রম ভবসাগর তরিহী।। (মানস, ৬।২।৪)

অর্থাৎ একবার রামেশ্বরম দর্শন করলে মানুষ ভব-সাগর পার করে যায়। তাকে সাধন-শ্রম করতে হয় না। যথা-

জো গঙ্গাজলু আনি চঢ়াইহি।

সো সাযুজ্য মুক্তি নর পাইহি।। (মানস, ৬।২।২)

ভগবন্! গঙ্গাজল দিয়ে পুজো করলে সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয় কিন্তু আমার চিত্ত তো এখনও শান্ত হয়নি।

উত্তর- মহারাজজী হেসে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন যে, তীর্থ মাহাত্ম্য দ্বারা কল্যাণ কামনা তো নিজের অন্তরের শ্রদ্ধার জন্য করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি পরমকল্যাণ এবং শান্তি লাভ করার জন্য প্রযত্নশীল, কিন্তু প্রত্যেকে সাধনার ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধনার শুরুর অবস্থাতে আমাদের তীর্থগুলিকে মান্য করতে হয়, কিন্তু সাধনার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এই তীর্থগুলির রূপও পরিবর্তিত হয়। যেমন আপনি রামেশ্বরের অর্থ বুঝছেন, সাধনা পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য এটাই উদীয়মান লক্ষণের অঙ্কুরণ, কিন্তু কল্যাণ লাভ করার জন্য এই প্রয়াস পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য যথার্থের পৃষ্ঠভূমিতে প্রয়োগাত্মক সাধনা শুরু করতে হয়। দ্রষ্টব্য যে-

নাথ নাম তব সেতু নর চঢ়ি ভবসাগর তরহিঁ। *(মানস, ৬। সোরঠা, ২)*

ভগবন! আপনার নামই সেই সেতু যার উপর আরোহণ করে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায়। এই নামের ওঠা-নামা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এর সঙ্গে চলতে থাকে। এখানে এই আশয়ই স্পষ্ট করা হয়েছে।

জে রামেস্বর দরসনু করিহহিঁ।

তে তনু তজি মম লোক সিধরিহহিঁ।। *(মানস, ৬।২।১)*

রামেশ্বরের অর্থ হল রাম এবং ঈশ্বর সকলের মানসের রমণকর্তা এবং সর্বব্যাপী সত্তাকে রাম বলে এবং এই স্বর সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হলে তবেই তাঁকে

প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। ঈশ্বরের আশয় হল এই স্বর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ অনবরত নামের ভজনা করলে স্বরের সর্বথা নিরোধকালে সেই ব্যাপক সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। বস্তুতঃ যে মহাপুরুষ স্বরের সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর জন্যই এই স্থিতি সুলভ।

জো গঙ্গাজলু আনি চঢ়াইহি।

সো সাযুজ্য মুক্তি নর পাইহি।। *(মানস, ৬/২/২)*

প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই জ্ঞান বলে এবং এই জ্ঞানই গঙ্গা। স্বরের মাধ্যমে জ্ঞানের স্পর্শ যখন সেই চেতন সত্তার সঙ্গে হয়। তারপর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্থাপন করার স্থিতি লাভ হয়, যাকে সাযুজ্য মুক্তি বলা হয়। সাযুজ্য মুক্তির অর্থ হল- প্রভুর সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করা। লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে জানার পরই প্রভুর সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের মধ্যে চলে আসে। যেমন-

জানত তুমহহি তুমহই হোই জাঈ। *(মানস, ২/১২৬/৩)*

উপর্যুক্ত পরম পবিত্র গঙ্গাই হল মুক্তিদাত্রী। চর্ম চক্ষুদ্বারা দৃশ্যমান গঙ্গা তো অল্প-বিস্তর মলই পরিষ্কার করে, গঙ্গা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, পরন্তু এই গঙ্গাতে অবগাহন করলে তা শাশ্বত শান্তি এনে দেয়। অতএব রামেশ্বর দর্শন করার জন্য কোন মহাপুরুষের শরণ এবং সান্নিধ্য পরম আবশ্যক, যাঁর কৃপা দ্বারা ধীরে-ধীরে সেই প্রয়োগাত্মক পথে চললে আমাদের জন্য সেই স্থিতিলাভ করা সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! সমুদ্রের জলচর সমুদ্রের থেকেও বড় এবং অসংখ্য ছিল, তবে সেগুলো ছিল কোথায়? শতযোজন সমুদ্রের সমান-সমান এক-একটা জলচরের শরীর ছিল এবং কিছু-কিছু তো এত বড় ছিল যে, সেগুলোকে ভক্ষণ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিল।

উত্তর- বিষয়রূপ জলে পরিপূর্ণ এই সংসারই সমুদ্র। যদি আমরা কোন অনুষ্ঠান না করি তবে এটা অত্যন্ত গভীর সমুদ্র কিন্তু-যেমন-যেমন চিন্তনে রত হব, এর আয়তনও হ্রাস পাবে।

শতযোজন দেহ- সত্যে আয়োজিত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নিলে সংসার অথবা ভব থেকে মুক্তি লাভ হবে। বৈরাগ্য এবং অনুভব কালে এটাই এই সমুদ্রের আয়তন। যখন একাগ্রতায় অঙ্কুর আসা বন্ধ হয়, তখন-

গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ।। *(মানস, ৫/৪/২)*

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির বিস্তার যতদূর পর্যন্ত সমুদ্রও ততদূর পর্যন্তই বিস্তৃত। মন একাগ্র হলে এই ইন্দ্রিয়গুলির এক-একটা ক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে, পূর্বে নয়। নাম যজন যখন পরাবাণীর পূর্তিকালে এসে পৌঁছায়, তখন এই সমুদ্র শুকিয়ে যায়। যেমন-

নাম লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ।। *(মানস, ১/২৪/৫)*

নাম জপের প্রক্রিয়া এটুকুই নয় যে আমরা নাম উচ্চারণ করে নিলাম হয়ে গেল নাম করা। এটা নাম জপের আরম্ভিক অবস্থা। পরে এই নামই সূক্ষ্ম হয়ে যায়, কিন্তু এই যে জানা, এটার পরিমাপ ইষ্ট প্রেরণার উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ তত্ত্বস্থিত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ না হয়, ততক্ষণ নামকে সূক্ষ্মভাবে জানা যায় না। এখন প্রমাণিত হল যে সংসারই সমুদ্র এবং যোগীর আত্মিক প্রবৃত্তিই জলচর। যখন আমরা ভজনা করি না, তখন আত্মার কাছ থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তা হৃদয়-দেশ-এ লুকিয়ে থাকে। এবং বিষয়রূপ জলের প্রবাহ উপরে ছেয়ে থাকে। দৃষ্টিগোচর না হওয়ার জন্য এটাই জলচর। যখন শ্বাস নিরুদ্ধ হয় তখন এই যৌগিক প্রবৃত্তিই উপরে উঠে পরিপক্ক হয়ে যায়, যার পরিণামস্বরূপ বিষয়ের বেগ কম হয়ে যায়। এক-একটা সাধন এত পরিপক্ক হয়ে যায় যে, তার অন্তরালে বিষয়রূপ তরঙ্গ আসতে পারে না। তাদের যৌগিক নাম নিম্ন প্রদত্ত-

মকর- করা আমার কর্তব্য এবং আমাকে করতে হবে।

নকর- করেও আমি কিছু করি না। আমি যন্ত্র মাত্র, কর্তা অন্য কেউ।

নানা ঝক ব্যালা- মানসিক ভজনময়ী প্রবৃত্তি এই প্রকারই।

তিহ্ন কী ওট ন দেখিঅ বারী।
মগন ভয়ে হরি রূপ নিহারী।। *(মানস, ৬/৩/৮)*

ধ্যানের আনন্দ এবং স্বরূপের আভাস তখনই হয় যখন বিষয়রূপ বারী ভজনময়ী প্রবৃত্তিগুলির প্রবল প্রবাহে পূর্ণরূপে আবৃত্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ একটা তরঙ্গও বাধা দেয়, ততক্ষণ ধ্যানে আনন্দ লাভ হয় না। এটা মানস। সকলের হৃদয়ে গোপন এই স্থিতিগুলি কোন মহাপুরুষের দ্বারাই জাগ্রত হয়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! তীর্থ করতে যাব কিন্তু আপনার বাণী শুনে জানতে পারলাম যে, তীর্থের যোগ্যতা ভিতরেই পাওয়া যায়। কৃপা করে বলুন যে,

স্থূল জগৎ-এর তীর্থগুলির কি কোন মহত্ত্ব আছেও?

উত্তর- দেখ ভগবৎ-পথ-এর প্রত্যেকটি ক্রিয়া বাইরে থেকে চলে ভিতর দিকে ঘুরে যায়। সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে সেইজন্য তীর্থগুলি ত্যাগ করার বিধান নেই। যখন ভগবানই কৃপা করে অন্তরঙ্গ তীর্থগুলির দিকে ঘুরিয়ে দেন, তখন এগুলির আবশ্যকতা ফুরিয়ে যায়। যেমন-

জেহি দিন রাম জনম শ্রুতি গাওহিঁ।

তীরথ সকল তহাঁ চলি আওহিঁ।। *(মানস, ১/৩৩/৬)*

যে সময় অন্তঃকরণে ভগবানের অবতার এবং অবতারের কার্য সঞ্চারিত হয়, সেই সময় সমস্ত তীর্থ অন্তরালে প্রকট হয়ে যায়। বাইরের থেকে বেশী বিশেষত্ব অথবা মহত্ত্ব অন্তরে হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় সেগুলির আবশ্যকতা থাকে না। যেমন-

তীরথ গয়ে এক ফল, সন্ত মিলে ফল চারি।

সৎগুরু মিলে অনন্ত ফল, কহেঁ কবীর বিচারি।।

তীর্থে গেলে একটা ফল লাভ হয় যে, পুণ্য এবং পুরুষার্থে বৃদ্ধি হয় (দর্শন, স্পর্শ, ইচ্ছা না হলেও দেখাদেখি দান ইত্যাদি করা প্রভৃতি পুরুষার্থ স্বাভাবিক রূপে হতে থাকে।) মহাপুরুষদের তপোভূমি হওয়ার জন্য সেখানের পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। যেহেতু মহাপুরুষগণ মনকে নিরুদ্ধ করে সাক্ষাৎকার করেছেন, সেইজন্য সেখানে নিরোধের পরমাণু বেশী থাকে এবং বিষয়ের কম। চিন্তনের সময় মন ঘরের তুলনাতে কম চঞ্চল হবে। সেখানে অর্থাৎ তীর্থে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে চারটি ফলই লাভ হয় অর্থ, ধর্ম, কাম এবং মোক্ষ এবং যদি সদ্‌গুরুর প্রাপ্তি ঘটে তবে অনন্ত ফললাভ হয়। যখন মহাপুরুষগণ প্রকৃতির অন্ত করে দেন, তখন অনন্ত যা পরমব্রহ্ম পরমাত্মার নাম, তিনি সুলভ হন।

প্রশ্ন- মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে যোগ্য জানতে পেরে কোন্ মন্ত্র প্রদান করেছিলেন, যার ফলে খিদে, পিপাসা লোপ পায়। এই প্রকারের মন্ত্র কি কলিযুগে পাওয়া যেতে পারে না?

উত্তর- তোমার দৃষ্টিতে বর্তমান যুগ কলিযুগ মানলাম, যা তখন ছিল না। এখন একটু বিচার কর যে, মন্ত্রে কি গুণ ছিল? মন্ত্রের শক্তি এত ছিল বলা হয়েছে যে, খিদে পিপাসা দুটো থেকেই রক্ষা করত। কিন্তু মহর্ষি বিশ্বামিত্রও তা পালন করেননি এবং

রামও করেননি। কথিত আছে যে, মন্ত্রপ্রদান করার কিছুকাল পরে যখন জনকের যজ্ঞস্থলীতে পৌঁছেছিলেন তখন-

করি ভোজনু মুনিবর বিগ্যানী।

লগে কহন কছু কথা পুরানী।। ***(মানস, ১/২৩৬/৫)***

মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগে ভোজন-প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন, তারপর পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন গল্পগুলিকে বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করেছিলেন। রামের প্রসঙ্গে জনকপুরের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, কারণ তিনি সেখানের প্রমুখ অতিথি ছিলেন। বনবাস কালেও দেখুন, কোথাও কোল-ভীলদের কন্দ-মূল ফল খেয়েছেন, কোথাও মহর্ষিদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ত্রেতার মত পবিত্র-যুগে যখন সেই মন্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষদের উপর সেই মন্ত্রের কোন প্রভাব পড়েনি, তখন কলিযুগ-সত্যযুগ ইত্যাদি যুগধর্মের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রে পুষ্টির অভাব ছিল, এমন কথাও নয়।

অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাসা। ***(মানস, ১/২০৮/৮)*** —সেই মন্ত্র এই দেহেই অতুলনীয় শক্তি প্রদান করত। এখন কথা হল বস্তুগুলির কল্পনা এবং দেহগুলির দুর্বল-সবল আকৃতিগুলির উপর দৃষ্টিপাত করলে এর অর্থ বোধগম্য হবে না। এ হল মানস, যা যোগীর অন্তঃকরণে ঘটিত সর্বব্যাপক রামের কমবেশী নিয়ন্ত্রণ। মানসের তাৎপর্য মন, যা সঠিক সাধনার পথে চলতে-চলতে লাভ হয় এটা একটা অবস্থা বিশেষ। বিজ্ঞানরূপ রাম অর্থাৎ যে পরমাত্মাকে আমরা লাভ করতে ইচ্ছুক, যখন তিনিই রথী হয়ে পথপ্রদর্শন করতে শুরু করেন এবং যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে, প্রেরক হয়ে সেই স্তর থেকেই উন্নত অবস্থাতে নিয়ে যান তখন সাধকের বিশ্বাস দৃঢ় হয়; একেই বিজ্ঞান বলে। বিশ্বাসরূপ বিশ্বামিত্র অর্থাৎ যখন বিশ্বাসপূর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ হয়, অমনি তর্কনা রূপ তাড়কা, স্বভাবরূপ সুবাহু এবং মনের ময়লারূপ মারীচ ইত্যাদির মৃত্যু ঘটে। ইষ্টের আদেশে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেই তর্কনারূপ তাড়কা সমাপ্ত হয় এবং তখন থেকেই নিশ্বাসপ্রশ্বাসের যজ্ঞ সুচারুরূপে হতে থাকে। যতক্ষণ ইষ্টদেব রথী হয়ে, এই আশ্বাস প্রদান না করেন যে, বাছা তুমি তো নিমিত্ত মাত্র, কর্তা তো আমি, ততক্ষণ যজন (যজ্ঞ) হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যজ্ঞের প্রক্রিয়া তর্কাভাস থেকে নিরস্ত হওয়ার পর অনন্ত বল প্রদান করেই শান্ত হয় অন্যথা হয় না। প্রকৃতির শক্তিও তো মহাপুরুষগণ দ্বারা মাপা হয়ে গিয়েছে।

অনন্ত অথবা অতুলীত বল পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে, যাতে শুভাশুভ জগৎ আহুতিরে সামগ্রী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। ভজন-ক্রম, জপ, যজ্ঞ অথবা ভজনের বিধি তর্কগুলি থেকে উপরে উঠে বিশ্বাস অথবা প্রেরকের শক্তির আশ্রয় লাভ করে। তখন সেই মন্ত্র এবং যজন (যজ্ঞ) পরমাত্মাকে সৃষ্টি করে। যাঁকে উপলব্ধি করার পর কোনরকম ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকে না। বহির্জগতে আমরা যেমন খুঁজে বেড়াই, সেসবের এখানে কোন উপযোগিতা নেই। কলিযুগের ব্যাকুলতা দেখে ভগবান শিব দ্রবীভূত হয়েছিলেন এবং উদ্ধার করার জন্য এই কাহিনীর রচনা করেছিলেন। যখন কলিযুগে উদ্ধারের বিশেষ সম্মতি রয়েছে তখন প্রভাব কেন পড়বে না?

দেখ, ভোজন দু'প্রকারের। যত খাদ্য সামগ্রী রয়েছে, সেগুলি কেবল স্থূল দেহকেই পুষ্ট করে, কিন্তু সে সবের আত্মার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আত্মাকে পূর্ণ পুষ্টি এবং তৃপ্তি প্রদান করে ভজন, সেটাই হল তার ভোজন বা (আহার)। ভজনের দ্বারাই বাস্তবিক অন্নের প্রাপ্তি হয়, যা লাভ করে এই আত্মা পরমাত্ম-স্বরূপ অমৃতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। তা শুধু এই মন্ত্র (ভজন) দ্বারা সম্ভব। সাধারণ ভজন অতুলনীয় সত্তা পরাৎপর ব্রহ্মের উপলব্ধি করাতে অক্ষম। সেইজন্য ব্রহ্ম হতে প্রেরিত পূর্ণ বিশ্বাসে যুক্ত এবং তর্কগুলি থেকে বিরত হলে সেই মন্ত্রে অতুলনীয় সত্তা পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবার শক্তি আছে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অবতারের বর্ণনা আছে। সেটাই কি অবতারের রূপ অথবা আরও কিছু আছে? উদাহরণের জন্য গীতার শ্লোকটি দেখুন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাৎমানং সৃজাম্যহম্।।

উত্তর- হ্যাঁ, অবতার সত্যই আবির্ভূত হন কিন্তু সেরূপ ভিন্ন জিনিষ। তার সমর্থন কে না করবে? কল্যাণের যথার্থ মার্গ সেটা; কিন্তু অবতার কোন-কোন যোগীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন বাইরে নয়। সব শাস্ত্রেই বর্ণিত অবতারের বাস্তবিক রূপ এটাই। কোন-কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ দ্বারা সেই বিশেষ প্রক্রিয়া জাগ্রত হয়। যা হল অবতারের হেতু। যেমন এখন আপনি গীতার শ্লোক সম্বন্ধে বললেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাৎমানং সৃজাম্যহম্।। *(গীতা, ৪/৭)*

যখন-যখন ধর্মের বিষয়ে গ্লানি উৎপন্ন হয় (পরমাত্মাই পরমধর্ম, সেই পরমাত্ম ধর্ম পালনের বিষয়ে গ্লানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।) তখন-তখন অধর্ম নষ্ট করার জন্য আমি স্ব-স্বরূপ রচনা করি। এই গ্লানি মনে উৎপন্ন হয় এবং প্রকটিত হয় হৃদয় রাজ্যে।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। *(গীতা, ৪।৮)*

সাধূনাম্-সাধ্য বস্তুতে একতা প্রদান করে যে বিবেক, বৈরাগ্য, নিরন্তর চিন্তন-প্রবৃত্তি এবং ভাব-শ্রদ্ধা ইত্যাদিগুলি নির্বিঘ্নভাবে সঞ্চালন করতে এবং দুষ্কৃতাম্-(দূষিত কৃত্যগুলির মাধ্যম) যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ অনন্ত আশা এবং তৃষ্ণা ইত্যাদিগুলির জন্য দূষিত ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হতে থাকে, সেগুলি সমাপ্ত করতে এবং ধর্মের স্থিতি প্রদান করতে প্রত্যেক যুগে প্রকট হই।

এই যুগ ধর্ম মনের স্থিতির উপর নির্ভর করে। এখন নিজের প্রকট হওয়ার উপায় বলছেন যে- আমি যোগের পূর্তিকালে প্রকট হই। আমি অজন্মা, ভূতগণের শ্বাসে স্থিত হলেও আত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ মায়াকে বশীভূত করে প্রকট হই। 'আত্মমায়য়া' আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে যে মায়া অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়া (যার পূর্তিতে ঈশ্বরের সেই স্বরূপ বিদ্যমান) দ্বারা প্রকট হই। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যখন এই প্রকারে প্রকট হন, তবে কিরূপে দর্শন করা সম্ভব হবে? শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তাঁরও এই একই নির্ণয়।

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নেতি মামেতি সোহর্জুন।। *(গীতা, ৪।৯)*

আমার সেই জন্ম এবং কর্ম দিব্য (অলৌকিক) যা তত্ত্বদর্শীই জানেন। এই জ্ঞানকেই তত্ত্বদর্শন বলে। যা জানার পর যোগীর জন্ম-মৃত্যুর চক্রের আবর্তন সমাপ্ত হয়ে যায়। তিনি আমাতে স্থিত হন।

'আত্ম-মায়য়া' ভজনের ক্রিয়া দ্বারা মায়াকে স্বাধীন করে সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সমানস্থিতি লাভ করাই হল প্রত্যেক যোগীর উদ্দেশ্য। তিনিই স্থিতিযুক্ত এবং তত্ত্বদর্শী। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে সেই অবতার তত্ত্বদর্শীর সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান, যাঁকে লাভ করে তিনিও তদ্রূপ হয়ে যান। এইরূপ স্থিতিযুক্ত মহাপুরুষ কল্যাণস্বরূপ হন। তাঁদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর।

প্রশ্ন- মহারাজজী! সগুণ এবং নির্গুণ উপাসনাতে কি প্রভেদ? এইরূপ উল্লিখিত

আছে যে, তুলসী, মীরা ইত্যাদি সগুণ উপাসক ছিলেন এবং কবীর এবং জায়সী ইত্যাদি নির্গুণ, কিন্তু এখন আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনলাম যে, কবীর চিন্তনকালে রামনাম আধাররূপে নির্বাচন করেছিলেন।

উত্তর- দেখ, এই প্রশ্ন বর্তমানে মানব-সমাজে এক বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু এই জগতে নির্গুণ উপাসনা বলে কোন উপাসনা পদ্ধতি নেই। নির্গুণ কোন উপাসনা নয় পরন্তু মহাপুরুষদের এক স্থিতি বিশেষ। লক্ষ্য প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁরা গুণাতীত হয়ে যান অর্থাৎ গুণগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তারপরের স্থিতি হল নির্গুণ। সন্ত কবীর বৈদিক তত্ত্বকে এত সূক্ষ্মভাবে এবং এত গোপনীয়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে তা জনসাধারণের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই কবীরকে প্রায়ই নির্গুণ উপাসকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যদি আমরা কবীরের প্রারম্ভিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করি তবে-

সাহব কা ঘর দূর হ্যায়, জইসে পেড় খজূর।
চঢ়ে তো চাখে রামরস, গিরৈ তো চকনাচূর।।

সাহেব দূরে কোথাও আছেন এবং স্বয়ং পৃথক আছেন। সেই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য উত্থান এবং পতন লেগেই আছে সগুণ আর কাকে বলে ? নির্গুণ স্থিতিতে নিজের থেকে পৃথক কোন সত্তা থাকেই না। পুনরায় বলছেন-

রাম না রমসি কওন দণ্ড লাগা।
মরি জইবে কা করিবে অভাগা।। (কবীর)

রামের ভজনা কেন করছ না, এতে কি তোমার কিছু খরচ হয়ে যাচ্ছে ? ওরে অভাগা! মরে যাবি তখন কি হবে?

রা অওর ম কে বীচ মে কবিরা রহা লুকায়।

'রা' এবং 'ম' দুই অক্ষরের অন্তরালে কবীর নিজের মনকে স্থির করেছিলেন। কবীর নামের প্রভাব উত্তমরূপে জানতেন। বৈখরী থেকে মধ্যমা, পশ্যন্তি এবং পরাবাণীর উত্থান-পতনের মর্ম তিনি উত্তমরূপে জানতেন। যেমন-

জপ মরে অজপা মরে, অনহদহূঁ মরি জায়।
সুরতি সমানী শব্দ মে, তাহি কাল না খায়।।

জপের প্রয়োজন কখন ফুরায়? যখন অজপাতে নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। অজপার প্রয়োজন কখন ফুরায়? যখন অনহদে নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। অনহদের প্রয়োজন

কখন ফুরায়? যখন স্মৃতি শব্দের সঙ্গে তদ্রূপ হয়ে যায় অর্থাৎ শব্দে লীন (প্রবেশ) হয়, তখন সেখানে কালের প্রবেশ নেই। সেইজন্য নামকে আধার করে পরের সোপান সম্বন্ধে বলছেন। সেই কবীর ক্রমশঃ পরে যখন সেই ইষ্টকে লাভ করেছিলেন তখন বলেছিলেন যে-

অবধূ বেগম দেশ হ্যায় মেরা।
জহাঁ না উপজে মরে না বিনসে, নাহিন কাল কা ফেরা।।
তহাঁ না ঈশ্বর জীব না মায়া, পূজক পূজ্য না চেরা।।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, নহিঁ তহঁ দ্বৈত বখেড়া।।

অর্থাৎ আমা হতে ভিন্ন কোন সত্তা নেই, এটাই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ। গোস্বামীজীও এই প্রকারই উপাসনা কালে কেঁদে-গেয়ে, চলা-ফেরার সময়ও প্রার্থনা করতে-করতে, পরিণামে যখন আরাধ্য দেবকে লাভ করেছিলেন তখন-

জব দ্রবৈ দীনদয়ালু রাঘব, সাধু-সঙ্গতি পাইয়ে।
সপনেহুঁ নহীঁ সুখ দ্বৈত-দরসন বাত কোটিক কো কহৈ।। *(বিনয়০, ১৩৬)*

ভগবৎ-কৃপা দ্বারা সাধু সমান স্থিতি লাভ, স্বপ্নেও দুঃখের আভাস নেই, বেশী কথা কে বলছে। এখন কবীরই বা কি নতুন কথা বলছেন, শুধু এটুকুই বলছেন যে, দ্বৈত-এর ঝামেলা নেই। গোস্বামীজী ভক্তির পূর্তিকালে এটাই নির্ণয় দিচ্ছেন যে,

রঘুপতি ভগতি করত কঠিনাই।
কহত সুগম করনী অপার জানৈ সোই জেহি বনি আই।।

ভগবানকে ভক্তি করি বলা সহজ কিন্তু ভক্তি করাটা অত্যন্ত কঠিন। তিনিই জানেন, যাঁর মন বসে যায়। পুনরায় বলছেন যে, ছোট মাছ গঙ্গার ধারার বিপরীতে চলে যায় কিন্তু বড় হাতী ভেসে যায়। এইরূপ ভক্তিও এক প্রকার কৌশল বিশেষ। ভক্তির পূর্তিকালে এর পরাকাষ্ঠার চিত্রণ করে বলছেন যে,-

সকল দৃশ্য নিজ উদর মেলি, সোৱৈ নিদ্রা তজি যোগী।
সোই হরিপদ অনুভবৈ পরম সুখ, অতিসয় দ্বৈত-বিয়োগী।। *(বিনয়০, ১৬৭)*

সমস্ত দৃশ্য একত্র করে হৃদয়ে কেন্দ্রিত করে নেন এবং নিদ্রা ত্যাগ করে সুপ্ত হয়ে যান। এই স্থিতি যিনিই লাভ করেন তিনিই ভগবানের দর্শন করেন। তাহলে তিনি কেমন? '**অতিসয় দ্বৈত বিয়োগী**', যেখানে দ্বৈতের কল্পনা নেই। যখন গোস্বামীজী লাভ করেছিলেন তখন কিরূপে করেছিলেন, এই যে আমা হতে ভিন্ন কোন সত্তা

নেই। সন্ত কবীরও এই স্থিতিযুক্তই ছিলেন। মীরা কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করতেন। পরন্তু উপলব্ধি করার পর কি প্রকার রাণাকে আহ্বান করে বলছেন-

রাণাজী ম্যায় তো গিরিধর রংগওয়া রাতী।

সবকে পিয়া পরদেশ বসত হ্যাঁয়, লিখি লিখি ভেজত পাতী।

মেরে পিয়া মেরে হিয়ে বসত হ্যাঁয়, নহি কহুঁ আওত জাতী।।

রাণাজী, আমার বর্ণ গিরিধারীর বর্ণের হয়ে গেছে। অন্যান্যদের প্রিয়তম বিদেশে বাস করে ও তারা চিঠি লিখে-লিখে পাঠায়। আমার প্রিয়তম আমার হৃদয়ে নিবাস করেন।

উপাসনার অঙ্গ তিনটি-ধ্যাতা (সাধক), ধ্যেয় (লক্ষ্য) এবং ধ্যান (লক্ষ্যে টিকে থাকার যুক্তি) এই তিনটির মধ্যে যদি একটিও খণ্ডিত হয় তবে উপাসনা সম্ভব হয় না। ধ্যাতা না থাকলে কে ভজনা করবে? ধ্যাতা আছে কিন্তু যার ভজনা করা হবে সেই ধ্যেয় (ঈশ্বর) নেই তবে কাকে ভজনা করবে? যদি ধ্যাতা ও ধ্যেয় দুজনই (বর্তমান) আছেন কিন্তু উপাসনা করার যুক্তি নেই, তবুও উপাসনা সম্ভব হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নির্গুণ বলে কোন উপাসনা নেই। কবীর সগুণ উপাসনা করতে করতে নির্গুণে পৌঁছেছিলেন যা মহাপুরুষদের এক স্থিতি বিশেষ। তুলসীও ঠিক এই প্রকারই সগুণ থেকে চলে নির্গুণে পৌঁছেছিলেন। নির্গুণ ব্রহ্মের চিত্রণ করে সন্ত কবীর আরও বলছেন-

সবহি সন্ত হ্যাঁয় রাম কে, সবহি রাম কে আস।

সরগুণ রাম প্রসাদ ভৈ, নির্গুণ পলটত দাস।।

সব মহাপুরুষই ভগবানের জন এবং সকলেরই আশা রাম। সরগুণ (সগুণ) যখন পরাবাণী সাধ্যের অবস্থাতে চলে আসে, তখন ভগবান যিনি, যে প্রভাব, যে-যে বিভূতি এবং গুণধর্মে যুক্ত, সেগুলি সমক্ষে দেখা যায়। যদি এই বাণীগুলির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জানা থাকে না, তবে সগুণ নামের কোন বস্তু নেই। এবং যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন- **জানত তুমহহি তুমহই হোই জাই।।** ***(মানস, ২/১২৬/৩)***

যিনি তাঁকে জানতে পারেন, তিনি তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যান। গোস্বামীজীর ভাষায় সেবক সর্বদার জন্য হারিয়ে যায় এবং শুধু প্রভুই থেকে যান। শেষে বলছেন-'**নির্গুণ পলটত দাস**'-সেই দাসের স্থিতি নির্গুণ, নির্গুণ কোন উপাসনা নয়।

।। ওঁ ।।

সন্ধ্যা বন্দনার পর সাধক এবং ভক্তদের প্রণামের মহত্ত্ব বলছেন শ্রী পরমহংসজী

পূজ্য মহারাজজী সাধকদের মনোগত ভাবগুলি পরখ করে সেই অনুসারে উপদেশ দিতেন এবং সামূহিক কার্যগুলিতে কোন না কোন ত্রুটির অছিলা নিয়ে চিন্তন পথ প্রশস্ত করে দিতেন। একদিন আরতি হচ্ছিল, সকলে পূর্ণ তন্ময় হয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন। আরতি শেষ হবার পর সকলেই প্রণাম করেছিল। যে সাধকগণ (মন থেকে) আন্তরিকতার সঙ্গে, হৃদয়ে স্বরূপ ধারণ করে প্রণাম করেছিলেন, তাঁদের কিছু দেরী হয়েছিল। কিন্তু কিছু নতুন সাধক শীঘ্রই প্রণাম করে এমনভাবে এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করেছিলেন যেন তাঁদের পূজা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সেই সোজা সরল পথিকদের এইরূপ অবস্থা দেখে তিনি সস্নেহে বলেছিলেন-বোস, দেখ যেমন এখন আরতি শেষ হবার পর সকলেই প্রণাম করল দু-একজন সাধককে ইঙ্গিত করে বললেন যে, এরা তো এমন খুশী হচ্ছে যেমন মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল। লজ্জা করে না তোমাদের? এটা তো তোমাদের অন্তঃকরণের উপস্থিতি। যদি এই ক্রমই তোমাদের বেশীদিন চলে, তবে সাধনায় অসফল হয়ে যাবে।

প্রার্থনা অথবা আরতি আমরা যা কিছু করি, নিজেদের ভাবগুলি সদ্‌গুরুকে সমর্পণ করি। তারপর প্রণাম করি, প্রণামের এই মানে নয় যে, আমাদের ডিউটি সম্পূর্ণ করে বেরিয়ে গেলাম। যেন কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়ে গেল। যখন প্রার্থনা দ্বারা চিত্ত শান্ত হয়ে যায়, মনের মধ্যে সঙ্কল্পগুলির তরঙ্গ কমে যায়, তখন কিছুক্ষণ চিন্তনও করে নেবে, তাহলে ভজনাতে সহায়তা পাবে। প্রণামই হল সবকিছু, কিন্তু যথার্থ প্রণাম যেটা, সেটা শুধু মাথা নোয়ানো নয় পরন্তু সদ্‌গুরুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরই স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করা উচিত, যেমন ধ্যান করার সময় ধারণ কর। পাঁচ মিনিট সময় লাগতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পূর্ণরূপে (মন থেকে) স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করে প্রণাম করা উচিত। প্রথমে অন্তরে তারপর বাইরে থেকে প্রণাম করে নেবে। যদি ক্রমাগত এইভাবে কর তবে ধীরে-ধীরে তোমরা ধ্যানে সাহায্য পাবে, কারণ দিনে চার-পাঁচবার প্রণাম করার (অবসর) সুযোগ পাওয়া যায়। স্নান করার পর, সকাল বিকেল এবং আরতির সময় ইত্যাদি সব নিয়ে দিনে কুড়ি পঁচিশ মিনিট হয়ে যায়। এটাই ধ্যানকালে সহায়তা প্রদান করে তোমাদের পরম কল্যাণের দিকে প্রেরিত করবে। যারা কেবল উপর-উপর প্রণাম করে ধীরে-ধীরে তাদের উপরের ভাব সমাপ্ত হতে থাকে আর প্রণাম শুধু 'যেনতেন প্রকারেণ' সম্পূর্ণ করা রূপেই শেষ থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ ভাব সেই কল্যাণ প্রদান করতে সমর্থ নয়, যে কল্যাণ আমরা কামনা করি। যদি লক্ষ্যপ্রাপ্ত করার জন্য গৃহত্যাগ করেছ, তবে হৃদয়ে স্বরূপ ধারণ করে প্রণাম করবে। এমনিতে

তো হাজার-হাজার লোক এসে প্রণাম করে কিন্তু ভগবানের কাছে শুধু ভাব ভক্তিরই মহত্ত্ব আছে, আর এই পৃথিবীতে কোনরকমে কর্তব্য পালন এবং অভিনয়ের। আমাদের প্রবল ভাব-ভক্তিই ঈশ্বরের দিক থেকে কৃপারূপে বর্ষিত হয়। যদি ভাবে সামান্যও সন্দিগ্ধতা থাকে, তবে সেটাই আমাদের জন্য ঘাতক হয়ে যাবে। যেমন হনুমান মৃত সঞ্জীবনী নিয়ে ফেরার সময় গর্ব করেছিলেন যে, যদি আজ আমি না থাকতাম, তবে রামের ভাই লক্ষ্ণকে কে পুনর্জীবন লাভে সাহায্য করত? অতএব এই লড়াই আমারই জোরে হচ্ছে। ইষ্টের প্রতি অভাব উৎপন্ন হয়েছিল, যার পরিণামস্বরূপ ভরতের তরফ থেকে একটা তৃণের বান এসে এমন আঘাত করেছিল যে, হনুমান ধরাশায়ী হয়েছিলেন। যার উপর বড়-বড় অস্ত্র এবং বজ্রেরও প্রভাব পড়েনি, তিনি একটা সাধারণ তৃণের আঘাতে ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।

বস্তুতঃ বৈরাগ্যই হনুমান এবং ভাবই ভরত। আমাদের ভাবগুলি দূষিত হওয়াই ভরতের বাণ। যখন আমাদের ভাব দূষিত হয়ে যায় তখন সেটাই আমাদের জন্য ঘাতক সিদ্ধ হয়। এইরূপ স্থিতিতে বৈরাগ্যবান পথিক পতিত হন। যদি দু'-একবার পতিত হওয়ার পর শুভবুদ্ধি উদয় হয় তবে প্রভু (সদ্‌গুরু) তিনি দয়ার সাগর, সামলে নেবেন কিন্তু আমাদের তাঁর পরম দয়ালুতার উপর অটল বিশ্বাস হওয়া উচিত। আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, কিন্তু নিয়ম যেন না ছাড়ি। জ্বর হোক, অথবা বজ্রপাত হোক, কিন্তু নিয়ম খণ্ডন যেন না হয়।

'দিন দিন বঢ়ত সওয়ায়ো'-আমাদের চিন্তন-ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা নিরাধার নির্জনে বসে আমাদের হিসেব করা উচিত যে, আজ আমি কতক্ষণ ভজনা করলাম, কালকে কতক্ষণ করেছিলাম। যদি কোনপ্রকার ত্রুটি থেকে যায়, তবে সেটা চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। এইপ্রকার পূর্তি পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা যে সেবা করি তার অনেক মূল্য। আজ আমি যদি নির্জনে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করি দশ দিন ঠিকই ভজনা করব, কিন্তু একাদশ দিনে অবশ্যই পালিয়ে আসব। ভজনা করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে নেই, সেটা কোন স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ দ্বারাই হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, অতএব তাঁর সেবা ও সান্নিধ্য পরম আবশ্যক। এইভাবে সেবা করতে করতে মনকে নিরোধ করার ধারা, যা সদ্‌গুরুর ভিতরে সতত প্রবাহিত থাকে, সেটাই সাধকের ভিতরেও আসতে থাকে, পরিণামস্বরূপ কিছুকাল পরে আমাদের মধ্যে সে ক্ষমতা চলে আসে, যখন পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করি।

।। ওঁ ।।

অবতরণ-বিধি

প্রশ্ন : মহারাজজী ! আপনি বলেছেন যে অবতার যোগীর হৃদয়ে অবতরিত হন কিন্তু মানসে পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিল তখন ভগবানের অবতার হয়েছিল। কৃপা করে মানসের আধারে বলুন যে অবতার কি প্রকার হন ?

উত্তর : দেখ, মানসেও তাই আছে, যা গীতায় আছে। এককালে পৃথিবীতে নিশাচরদের বৃদ্ধি হয়েছিল। খল, চোর, লম্পট, লোভী, জুয়ারী এত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছিল যে পৃথিবী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। "**পরম সভীত ধরা অকুলানী**" *(মানস, ১/১৮৩/৪)* -প্রচণ্ড ভয় পেয়ে পৃথিবী এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। প্রথমে সে গাভীর রূপ ধারণ করে দেবতাদের কাছে গিয়েছিল। দেবতা এবং মুনিগণ বলেছিলেন যে, আমরা সাহায্য অবশ্য করব, কিন্তু পূর্ণ কল্যাণ করার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে নেই। ব্রহ্মার কাছে সকলেই গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন, এরা কেন এসেছে ? এদের কত কষ্ট ? তিনি বলেছিলেন, 'দেখ ! আমি কোন সহজ উপায় করতে পারব না। তোমাদের যুক্তি বলে দিচ্ছি, তোমরা এই প্রকার ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব।' প্রার্থনা করা হয়েছিল তখন ভগবান আকাশবাণীর দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সব দেবতাই পৃথিবীতে অবতরণ করুন। পৃথিবী ! তুমি সেইপ্রকারই ধৈর্যপূর্বক আমার প্রতীক্ষা কর। আমি তোমার ভার দূর করব সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করব। ব্যস, অবতরণের প্রকরণ এটুকুই।

এই অবতরণ বিধি বিচার-সাপেক্ষ। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, সমুদ্র এবং পাহাড়ে ঘেরা এই পৃথিবীই কি গাভীর রূপ ধারণ করে গিয়েছিল ? না, এই দেহটাই পৃথিবী। কবীরদাসজী বলছেন-

ধড়-ধরতী কা একৈ লেখা। জো বাহর সো ভিতর দেখা।।

যা কিছু দেখা যায় সে সব হৃদয়ে বিদ্যমান। বিনয় পত্রিকাতে গোস্বামীজী বলেছেন-

অসন বসন পসু বস্তু বিবিধ বিধি সব মনি মহঁ রহ জইসে।
সরগ নরক চর অচর লোক বহু বসত মধ্য মন তইসে।। *(১২৪)*

বহুমূল্য মণির মূল্যে যে প্রকার ভোজন, বস্ত্র, পশু এবং অনেক প্রকার বস্তু ক্রয়ের ক্ষমতা নিহিত আছে। ঠিক সেইপ্রকার স্বর্গ-নরক, চর-অচর অনেকানেক

লোক মনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। বাইরে তো শুধু মৃত্যুলোক আছে, আমরা তার নাম ভারত অথবা আমেরিকা যা কিছুই রাখি না কেন, কিন্তু মনের মধ্যে বহু লোক বিদ্যমান, এমনকি পরমতত্ত্ব পরমাত্মার পরমধাম এরই অন্তরে নিহিত আছে। যে-যে মহর্ষিগণ মন নিরুদ্ধ করেছেন। তাঁরা একে নিরুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তরালে বিদ্যমান সেই পরমধামও লাভ করেছেন। এই প্রকার দেহটাই পৃথিবী। ছান্দোগ্য উপনিষদে, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে একথা বর্ণিত আছে যে এই ভৌতিক আকাশ যত বিশাল, ততটাই বিশাল আকাশ হৃদয়াভ্যন্তরেও বিদ্যমান। দ্যুলোক এবং পৃথিবী উভয় লোক সম্যক প্রকারে হৃদয়ের ভিতরেই স্থিত। এই প্রকারই অগ্নি এবং বায়ু, সূর্য এবং চন্দ্র, বিদ্যুৎ এবং নক্ষত্র এবং এই আত্মার যা কিছু এই লোকে আছে, এবং যা নেই; সেসবই সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে স্থিত।

এই দেহের অন্তরালে দুটি প্রবৃত্তি বিদ্যমান-একটি দৈবী সম্পদ্ এবং অন্যটি আসুরী সম্পদ্। একটি সজাতীয় এবং আরেকটি বিজাতীয়। আসুরী সম্পদ্ অধোগতি এবং নীচ যোনিগুলির সৃজন করে ও দৈবীসম্পদ্ পরমকল্যাণ করে এবং শাশ্বত স্বরূপ পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করায়। বিনয় পত্রিকাতে গোস্বামী তুলসীদাসজী বলেছেন-'**বপুষ ব্রহ্মাণ্ড সুপ্রবৃত্তি লঙ্কা**' *(৫৮)*-এই দেহই সুব্যবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড এর মধ্যে যে মায়িক প্রবৃত্তি পাওয়া যায়, সেটাই লঙ্কা। এতে মোহরূপ দশানন রাবণ বিদ্যমান। ক্রোধরূপ কুম্ভকর্ণ, লোভরূপ নারান্তক, অহঙ্কাররূপ অহিরাবণ, প্রকৃতিরূপ সূর্পনখা ইত্যাদি আসুরী সম্পদ এই লঙ্কাতে আছে। এই মোহরূপ প্রবৃত্তিগুলি অনন্ত। ক্রোধরূপ কুম্ভকর্ণ, কামরূপ মেঘনাদ, লোভরূপ নারান্তক ইত্যাদি দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সমাপ্তির পর রাবণ যখন দুর্গ থেকে বেরিয়েছিল, তখন সেও অপার সৈন্য নিয়ে বেরিয়েছিল। সকলেই তো মারা গিয়েছিল, তাহলে আবার অপার সৈন্য কোথা থেকে এসেছিল? বস্তুতঃ মোহই রাবণ এবং '**মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা। তিহ্ন তে পুনি উপজহিঁ বহুশূলা।।** *(৭/১২০/২৯)* সম্পূর্ণ ভবরোগের মূল কারণ মোহ। যদি মূল জীবিত আছে তবে তাতে শাখা, ডাল, গুঁড়ি, পাতা সবকিছুই থাকবে। যদি মোহ বিদ্যমান তবে সব বিকার এর থেকেই উৎপন্ন হবে। অতএব মোহ থাকতে-থাকতে সাধক অসাবধান হলে, এর বাড় সাধককে অনন্ত দিশাতে আবৃত্ত করে। সাধক শ্রেয় সাধন থেকে প্রত্যাবর্তন করে অথবা ফিরে আসে-**শৃঙ্গী কো ভৃঙ্গী করি ডারী, পরাশর কে উদর বিদার।** ভগবানের কাছ থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে থাকলেও মায়া সফল হয়ে যায়।

রাবণের যখন মৃত্যু ঘটে তখন **'রহা না কোউ কুল রোওনিহারা।'** *(মানস, ৭/১০৩/১০)* আসুরী সম্পত্তি সঅস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। **'মূলো নাস্তি কুতো শাখা'**-যদি মূলই কাটা গেল, তবে আর রইল কি? আর পাতা, ডালপালা ঝাড়া বা পরিষ্কার করার আবশ্যকতা নেই। সেসব তো স্বতঃ শুকিয়ে যাবে। মোহ নির্জীব হলেই অমৃততত্ত্বের প্রস্ফুটন হয়, সেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই। অমৃততত্ত্বের সঞ্চার হলে আসুরী প্রবৃত্তি সদা-সর্বদার জন্য শান্ত হয়ে যায় এবং দৈবী সম্পদ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়।

সুধা বৃষ্টি ভই দুহু দল উপর।
জিয়ে ভালু কপি নহিঁ রজনীচর।। *(মানস, ৬/১১৩/৬)*

আর এক দৃষ্টিতে এই দেহটাই অবধ, কারণ এতে অবধ্য স্থিতির সূত্রপাত হয়। এর অন্তরালে দশটি ইন্দ্রিয় নিরোধের প্রবৃত্তিই দশরথ।

রাম নাম সব কোই কহে, দশরথ কহে না কোয়।
এক বার দশরথ কহে, কোটি যজ্ঞ ফল হোয়।।

রাম-নাম সকলে উচ্চারণ করে। দশরথের নাম উচ্চারণ করে না। যদি একবার কেউ দশরথ বলে তবে কোটি-কোটি যজ্ঞের সমান ফললাভ হয়। ফল তো এত বেশী লাভ হয়, তা সত্ত্বেও দশরথ-দশরথ কেউ জপ করে না। সকলেই রাম-রামই জপ করে। করাও উচিত। বস্তুতঃ দশটি ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করার প্রবৃত্তিকেই দশরথ বলে। দশটি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে 'রাম' নাম উচ্চারণ করাই তো শুদ্ধ জপ। ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধ করে জপ করলে কোটি-কোটি যজ্ঞের সমান ফললাভ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়োন্মুখ সেই কারণে জিহ্বা রাম-রাম উচ্চারণ করলে তার ঠিক-ঠিক প্রভাব পড়ে না। পরম কল্যাণ তো হয় না; কিন্তু হ্যাঁ, পুণ্য-পুরুষার্থে অবশ্য বৃদ্ধি হয় যা কল্যাণ করে। অতএব দশটি ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দশরথ। শুরুতে তো এই মন ছুটেই বেড়ায় **'জহঁ-তহঁ ইন্দ্রিন তান্যো'** *(বিনয় ০, ৮৮/১)* কিন্তু যখন দশটি ইন্দ্রিয়েরই লাগাম রথীর হাতে চলে আসে; পুরুষ তখনই দশরথ হয়ে যায়।

এই প্রকার এই দেহেরই অন্তরালে দশটি ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করার প্রবৃত্তিকে দশরথ বলে। এইরূপ প্রবৃত্তির মধ্যেই ভক্তিরূপ কৌশল্যা আছে। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। এর ভাণ্ডারে অনুরাগ অর্থাৎ নিষ্ঠা কৌশল্যা প্রদান করে। কর্মরূপ কৈকেয়ী, সুমতিরূপ সুমিত্রা, কুমতিরূপ মন্থরা, বিজ্ঞানরূপ রাম, বিবেকরূপ লক্ষ্মণ; এই প্রকার এই দৈবী সম্পত্তিও অনন্ত। ব্রহ্মচর্য পালনকারী প্রবৃত্তিই বানরী সেনা

এর মধ্যে অনুরাগরূপ অঙ্গদ, বৈরাগ্যরূপ হনুমান, সুরতিরূপ সুগ্রীব, সাধনরূপ জামবন্ত ইত্যাদি অসংখ্য বানর রয়েছে।

বানর কটক উমা ম্যায় দেখা।

সো মূরুখ জো করন চহ লেখা।। ***(মানস, ৪।২১।১)***

ভগবান শিব বলেছেন-উমা! আমি বানর সেনা দেখেছি। সে ব্যক্তি মূর্খ যে, এদের গণনা করতে চায়। অর্থাৎ বানর সেনা অগণিত ছিল। এদিকে অগণিত বানর সেনা; ওদিকে রাবণের অগণিত নিশাচর সেনা। যুদ্ধ স্থান লঙ্কা। বর্তমানে সেখানের জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। ছ লক্ষ অথবা সাত লক্ষের জন্যও পর্যাপ্ত স্থান নেই। স্থানাভাবের জন্য ভারতীয়দের সেখানের নাগরিকতা দেওয়া হচ্ছে না। সেসময় কোটি, নীল, পদ্ম এবং মহাশঙ্খ থেকেও বেশী অসংখ্য নিশাচর এবং অসংখ্য বানর সেনা ছিল। কি করে কুলিয়েছিল সকলে? কোথায় যুদ্ধ করত? কোথায় ভোজন গ্রহণ করত? তবে কি ঘটনাগুলি ঘটিত হয়নি?

ঘটনাগুলি ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যথা ইতিহাসের রচনা হত না। দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না। বহির্জগতের ঘটনা সমূহের মাধ্যমে মহাপুরুষগণ অন্তঃকরণের ঘটনাগুলির দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। এই ঘটনাগুলির মাধ্যম দ্বারা মহাপুরুষগণ কুশলতাপূর্বক জীবনযাপন করার মর্যাদাপূর্ণ উদাহরণ প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু শুধু সদাচারীর জীবনযাপন করে গেলেই পরমকল্যাণের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য মনীষীগণ ঐতিহাসিক কাহিনীগুলির মাধ্যমে পরম কল্যাণের ক্রিয়াগুলির, অন্তঃকরণের সংঘর্ষের এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যুদ্ধেরও পথ প্রশস্ত করেছেন। বাস্তবে দেহটাই ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী-এর অন্তরালে চর-অচর অনন্ত লোক এবং অসংখ্য শরীর বিদ্যমান। অসংখ্য নিশাচরী এবং বানরী সেনা এবং নানা প্রকারের শরীর মনের মধ্যেই রয়েছে।

মন মহঁ তথা লীন নানা তনু, প্রগটত অবসর পায়ে। ***(বিনয়পত্রিকা, ১২৪।৪)***

এই প্রকার শরীরে দৈবী এবং আসুরি উভয় প্রকারের প্রবৃত্তিই বিদ্যমান। আসুরী প্রবৃত্তি এবং মোহের দ্বন্দ্বে আকুল হয়ে মানুষ তীর্থে গমন করে। দেবতা ও মুনিদের শরণাগত হয়। এইরূপ ব্যাকুল মনু হয়েছিলেন।

হৃদয়ঁ বহুত দুখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।। ***(মানস, ১/১৪২)***

হৃদয় গ্লানিতে ভরে গিয়েছিল এবং মনু দেবতা এবং মুনিদের সান্নিধ্য লাভের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যে পৌঁছেছিলেন। নিয়মকেই নৈমিষারণ্য

বলে। নিয়মপালন করার জন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। কেবল **'ধেনুমতি তীরা'** *(মানস, ১।১৪২।৫)* ইন্দ্রিয়সমূহকে বুদ্ধির অধীনে করে রাখতে হয়। এইপ্রকার এই দেহ-রূপ পৃথিবীও **"গঙ্গ তহাঁ জহঁ সুর মুনি ঝারী।"** *(রামচরিত মানস ১-১৮৩-৭)* দেবী-দেবতাদের শরণে যায়, তীর্থের আশ্রয় গ্রহণ করে। তীর্থে গমন করলে প্রেরণার সঞ্চার হয়। পুণ্য-পুরুষার্থে বৃদ্ধি হয়; সহযোগিতাও পাওয়া যায়। পরন্তু এত অল্পে পরমকল্যাণ সম্ভব নয়। মুনিদের কাছ থেকে উপদেশ পাওয়া যায়। পুণ্যে আরও বৃদ্ধি হয়। ভজনাতে সুবিধা বেশী পাওয়া যায় তা সত্ত্বেও এটুকুতেই পরমকল্যাণ হয় না। তীর্থ এবং মুনিগণ সহযোগিতা করেছিলেন এবং পৃথিবীর সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন।

"অহঙ্কার সিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান *(রামচরিত মানস, ৬।১৫ক)*। ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষ। যাঁর বুদ্ধি যন্ত্র মাত্র, এই বুদ্ধির মাধ্যমে পরমাত্মাই প্রসারিত হন। এইরূপ মহাপুরুষদের বাণীর সঙ্কলন বেদ। সেইজন্য বেদ অপৌরুষেয়; কারণ সেই মহাপুরুষদের বাণীর মাধ্যমে অব্যক্ত পুরুষ মুখরিত হন।

তীর্থ এবং মুনিদের উপদেশজনিত পুণ্যের প্রভাবে শরীর ব্রহ্মস্থিত সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। তিনি দেখেই জানতে পেরেছিলেন যে, সাধক কোন স্তরে দাঁড়িয়ে। এইরূপ মহাপুরুষদের কাছে যতদিন শুধু এই দেহটা যায়, কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্য তো মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। ব্রহ্মা বললেন, "আমার দ্বারাও কল্যাণ সম্ভব নয়। আমি বিধি বলব, তুমি চিন্তন কর, আমিও তোমার সঙ্গেই থাকব। নিশ্চিত তোমার কল্যাণ হবে।"

সদ্গুরু সাহায্য করতে শুরু করেছিলেন, যখনই চিন্তনে প্রবেশ করেছিলেন, আকাশবাণী হয়েছিল। ইষ্টের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলেন-'তোমার অবশ্যই কল্যাণ হবে। পৃথিবীতে (শরীরে) দেবতাদের অবতরণ করাও।' সাধক মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলির অন্তরালে দৈবী সম্পত্তি ধীরে-ধীরে অর্জন করতে থাকে। যখন দৈবী সম্পত্তি পূর্ণরূপে পরিপক্ক হয় তখন ভক্তিরূপ কৌশল্যা (ভগ ইতি সঃ ভগতি। ভগ অর্থাৎ প্রকৃতি হতে নিবৃত্তি প্রদান করে যে প্রক্রিয়া বিশেষ, তাকেই ভক্তি বলে। সেই ভক্তিরূপ কৌশল্যা)র কোলে বিজ্ঞানরূপ রামের আবির্ভাব হয়।

'রমন্তে যোগিনো যস্মিন্ স রামঃ'-যার মধ্যে যোগীগণ রমণ করেন, তারই নাম রাম। যোগীগণ দিবারাত্রি কার মধ্যে রমণ করেন?

জদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা।
অনুভব গম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা।। (মানস, ৩।১২।১২)

যোগী অনুভবে রমণ করেন, অনুভব হল ভব থেকে অতীত একপ্রকার জাগৃতি, বিজ্ঞান; এর দ্বারা পরমাত্মার নির্দেশ প্রাপ্ত হতে থাকে। তিনিই রাম, যিনি পূর্বে সঞ্চালন, পথ প্রদর্শন করেন। বিবেকরূপ লক্ষণ, ভাবরূপ ভরত, সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন সকলেই একে অন্যের পূরক, প্রারম্ভে সঙ্কেত, ইষ্টের নির্দেশ খুব সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট থাকে। রাম-এর সেসময় শৈশবাবস্থা। ক্রমশঃ উত্থান হতে-হতে তিনি যোগরূপ জনকপুরে উপস্থিত হন। জনক তিনি, যিনি জন্ম দেন। সৃষ্টিতে দেহগুলি মাতা-পিতার সংযোগে উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্বস্বরূপের দিগ্‌দর্শন এবং জন্ম যোগ দ্বারাই হয়। যোগের সাহায্যে স্বরূপের অনুভূতি হয় সেইজন্য যোগকে জনক বলা হয়। যোগরূপ জনকপুর। জনক এক বচন, কিন্তু এখানে জনকপুর বলা হয়েছে; কারণ শুধু যোগের মাধ্যমেই অনন্ত আত্মা স্বরূপ লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও লাভ করার মাধ্যম যোগই হবে। যোগের আশ্রয় গ্রহণ করে রাম শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হন। আসুরী প্রবৃত্তিগুলি শান্ত করে সর্বব্যাপক হয়ে যান এবং তারপর রামরাজ্যের স্থিতি চরাচর জগতকে ছেয়ে ফেলে। যোগে নিয়ন্ত্রণ আসার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব জাগ্রত হয়ে যায়। জাগৃতিরূপ জয়মাল্য পাওয়া যায় এবং অনুভবরূপ রাম শক্তিরূপ সীতার সঙ্গে সংযুক্ত হন। এটা যোগের প্রবেশিকা।

শনৈঃ শনৈঃ রাম শক্তির সঙ্গে অগ্রসর হন, ব্যবধান আসে এবং যখন সমূলে মোহ অন্ত হয়, তখন অমৃততত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, সুধাবৃষ্টি হয়। অমৃত তরল পদার্থ নয় যে জলের মত বর্ষিত হবে। অঙ্গদ রাবণকে বলেছিল-

রাম মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা। ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা।।
পশু সুরধেনু কল্পতরু রুখা। অন্ন দান অরু রস পীযূষা।।

(মানস, ৬।২৫।৫-৬)

বুদ্ধিহীন রাবণ! রাম কি মানুষ? গঙ্গা কি কোন নদীর নাম? কামধেনু কি কোন পশুর নাম? কাম নামের কি কোন ধনুর্ধর আছে? অমৃত কি কোন তরল পদার্থ যে পান করে নিলাম, অথবা ছিটিয়ে দিলাম? যদি অমৃত তরল পদার্থ নয় তবে অমৃত কি জিনিস? বস্তুতঃ মৃত নাশবান্‌কে বলে যে মরণধর্মা। অমৃত বলে অক্ষয়, অক্ষর, শাশ্বতকে। পরাৎপর ব্রহ্মই অমৃত, সেখানে পৌঁছে এই মরণধর্মা মনুষ্য পুনর্জন্মকে অতিক্রম করে।

সেই অমৃতত্ত্ব সঞ্চারের সঙ্গেই ক্রমশঃ উত্থান করতে-করতে ভক্ত হারিয়ে যায় এবং শুধু রামের অস্তিত্বই থেকে যায়-

রাম রাজ বৈঠেঁ ত্রৈলোকা।

হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।। ***(মানস, ৭/১৯/৭)***

সেই অন্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে রাম রাজ্যের স্থিতি চলে আসে, সেখানে ত্রিলোকে ভব-সম্বন্ধী শোক-সন্তাপ সদা সর্বদার জন্য মিটে যায়। ত্রিলোকের ভেতর গমনাগমনের স্থান থাকে না। তার জন্য সর্বত্র রামময় স্থিতি হয়ে যায়। সেই পরমাত্মাই ছেয়ে যান এবং আত্মা তাঁরই অন্তরালে লীন হয়ে যায়। দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হয়। রামের এটাই পরাকাষ্ঠা এবং যেখান থেকে সাধন প্রারম্ভ হয়, তিনি প্রকট হন, অবতরণের সেটাই নিম্নতম সীমা।

এই প্রকার অবতার কোন বিরল যোগীর হৃদয়ের বস্তু। বহির্জগতে অবতারের অবতরণ হয় না। যে পুরুষের মধ্যে অবতরিত হয়, সেই জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে '**জানত তুমহহি তুমহই হোই জাঈ।**' সেবক সদা-সর্বদার জন্য হারিয়ে যায় এবং শুধু প্রভুর অস্তিত্ব এটুকু থেকে যায়। শুধু রামময় স্থিতিই থাকে।

সরগু নরকু অপবরগু সমানা।

জহঁ তহঁ দেখ ধরেঁ ধনু বানা।। ***(মানস, ২/১৩০/৭)***

স্বর্গও স্বর্গরূপে থাকে না এবং নরকও নরক রূপে থাকে না যেখানেই দৃষ্টি পড়ে, আরাধ্যদেবের স্বরূপই দৃষ্টিগোচর হয়। বিলীন হওয়ার পর সেই সত্তা নিজের ভিতরেই দেখা যায়। '**সাইঁ সন্ত অতীত**'-নিজ থেকে ভিন্ন কোন সত্তা থাকে না। শাশ্বতই শেষ থাকে। দেহটা তো শুধু বাসস্থান রূপে থাকে। এরপর মহাপুরুষ যতদিন সংসারে থাকেন, লোক কল্যাণের জন্যই তাঁর উপযোগিতা থাকে। নিজের জন্য তাঁর কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না।

এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, অবতার কোন বিরল যোগীর হৃদয়ের বস্তু। গীতাতেও এই অবতরণ প্রক্রিয়ার নিরুপণ আছে। বহির্জগতে শিশুরূপে অবতারের অনুসন্ধান করছেন যাঁরা, তাঁরা ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন; কারণ অবতার দিব্য এবং অগোচর। যে বস্তু মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অথবা এই চর্মচক্ষু দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়, সেটা মায়া, অবতার নয়-

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ।

সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।। ***(মানস, ৩/১৪/৩)***

।। ওঁ।।

রামের বাস্তবিক স্বরূপ

প্রশ্ন- মহারাজজী! রামের বাস্তবিক স্বরূপ কি?

উত্তর- দেখ, সতীর জিজ্ঞাসাও এটাই ছিল। তাঁর একটা জন্ম তো সংশয়ে পড়ে পার হয়ে গিয়েছিল যে, নর-দেহ-ধারী রাম ভগবান কি করে হতে পারেন? দ্বিতীয় জন্মে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, ঘোর তপস্যা করেছিলেন, ভগবান শিবকে পুনরায় প্রাপ্ত করেছিলেন এবং তৎপশ্চাৎ সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল। পূর্বজন্মে প্রশ্ন যেখানে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, সৎসঙ্গ সেখান থেকেই প্রারম্ভ হয়েছিল। শৈলজা প্রশ্ন করেছিলেন যে, রাম ভূপ-সুত কি করে হয়েছিলেন? রামের স্বরূপ কি? নর কিরূপে ভগবান হতে পারে? শিব প্রথমে তো খুব তিরস্কার করেছিলেন তারপর বলেছিলেন-

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর, গ্রসে জে মোহ পিসাচ।
পাখণ্ডী হরি পদ বিমুখ, জানহিঁ ঝূঠ ন সাচ।। ***(মানস, ১/১১৪)***

যারা মোহরূপ পিশাচ দ্বারা আচ্ছন্ন তারাই এরূপ বলে। যাদের হৃদয় বিষয়রূপ শৈবালে আবৃত, তারাই এরূপ বলে। গিরিজা! তুমি বেদ-অসম্মত বাণী উচ্চারণ করেছ, তবুও তোমার মনোভাব ভাল তৎপশ্চাৎ তিনি উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন এবং রামের স্বরূপ বলেছিলেন-

বিষয় করন সুর জীব সমেতা। সকল এক তেঁ এক সচেতা।।
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ। রাম অনাদি অবধপতি সোঈ।।
(মানস, ১।১১৬।৫-৬)

অর্থাৎ বিষয়, বিষয়কর্মকে যে ইন্দ্রিয়গুলি সম্পাদিত করে ইন্দ্রিয়সমূহের দেবতা এবং জীবাত্মা উত্তরোত্তর একে অন্যের সহযোগে চৈতন্যলাভ করে, একে অপরের সাহায্যে জাগ্রত হয় এবং যে মূল সত্তা এদের সকলকে প্রকাশ প্রদান করেন, তিনিই রাম। এদের সকলের যিনি পরম প্রকাশক, তিনিই অবধপতি রাম। বাস্তবে ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন তো চরাচরে সর্বত্র ব্যাপ্ত, সেইজন্য **'জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ'** ***(মানস, ১/১১৬/৭)*** জগত প্রকাশ্য এবং রাম প্রকাশক। তিনি মায়াধীশ, জ্ঞান এবং গুণের ভাণ্ডার। রাম তো সর্বত্র এক জীবনীশক্তি রূপে বিদ্যমান, তবেই তো গাছপালা সবুজে আচ্ছাদিত। এটাই তো তাঁর প্রকাশ। গিরিজার মনে ভ্রম উৎপন্ন হয়েছিল যে, রাম ভগবান কি করে হতে পারেন? সেইজন্য ভগবান শিব বলছেন-

জাসু কৃপাঁ অস ভ্রম মিটি জাঈ।
গিরিজা সোঈ কৃপাল রঘুরাঈ।। *(মানস, ১/১১৭/৩)*

এই ভ্রম যাঁর কৃপাতে দূর হয়, তিনিই কৃপালু রঘুরাই সেই ভ্রম যখনই কারও দূর হয়, তা অনুভব দ্বারাই দূর হয়। যখনই কোন ঋষি মহর্ষি সেই ভ্রমের নিবারণ খুঁজে পেয়েছেন। অনুভব দ্বারাই পেয়েছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অনুভবে মহাপ্রলয়ের লীলা দেখেছিলেন। এবং শেষে প্রলয়ের পরেও সেই শাশ্বত সত্তাকে জীবিত দেখেছিলেন তাঁকে স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে মহর্ষির ভ্রম দূরীভূত হয়েছিল। কাক ভুশুণ্ডি হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বছর পর্যন্ত ভগবানের উদরে পর্যটন করেছিলেন। সেখানে রাম অবতারও দেখেছিলেন। স্বীয় আশ্রম দেখেছিলেন। বিবিধ রূপে ভরত আদি ভ্রাতাদের দেখেছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন ম্যায় দীখ সবু, অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ, প্রভু রাম না দেখেউঁ আন।। *(মানস, ৭/৮১ক)*

পথভ্রান্ত হয়ে অসংখ্য ভুবনে ঘুরে বেড়িয়েছি। সব শক্তিই তো ভিন্ন-ভিন্ন রূপে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রামকে অন্য রূপে দেখিনি। ভরতকে অন্য রূপে দেখেছিলাম। লক্ষ্মণ, কৌশল্যাকে অন্যরূপে দেখেছিলাম, কিন্তু রামের রূপ যথাবৎ ছিল-যেমন বাইরে দেখেছিলাম। তিনি এমন সত্তা যিনি সর্বদা একরস থাকেন। শুনলে তো এমন মনে হয় যেন মহর্ষি কাকভুশুণ্ডি ভগবানের উদরে প্রবেশ করে এসব দেখেছিলেন; কিন্তু তা নয়, এটাও একটা অনুভব ছিল-

উভয় ঘরী মহঁ ম্যায় সব দেখা।
ভয়উঁ ভ্রমিত মন মোহ বিসেষা।। *(মানস ৭/৮১/৮)*

তিনি অসংখ্য নগর, লোক-পরলোক দেখছিলেন, নিজের আশ্রমেও অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। একটার পর একটা যুগ পার হয়ে গিয়েছিল এবং শেষে মত প্রস্তুত করেছিলেন '**উভয় ঘরী**'-দু দণ্ডেই আমি সবকিছু দেখেছি। তবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সেটা একটা অনুভব ছিল। ইষ্ট হতে প্রসারিত এক 'রিল' ছিল, যা চিন্তন, ধ্যানের সময় প্রাপ্ত হত, সমাধিজন্য এক দৃশ্য ছিল। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অনুভূতি ছিল। যখন এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, রাম সগুণ অথবা নির্গুণ? কোথায় জন্ম নেন? কিরূপে অবস্থান করেন? এই প্রকার ভ্রম যে উপায়ে দূরীভূত হয়। ব্যস তিনিই রাম। '**জাসু কৃপাঁ অস ভ্রম**' -যেমন তোমার হয়েছিল '**মিটি জাঈ। গিরিজা সোঈ কৃপাল রঘুরাঈ।।**' -অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ রাম।

সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা।
অজ বিজ্ঞান রূপ বল ধামা।। *(মানস, ৭/ ৭১/৩)*

রাম কিরূপ? তাঁর স্বরূপ কি? বিজ্ঞানরূপ সেই রামের কার্যকলাপ কেমন? কিরূপে হাঁটেন? কিরূপে যুদ্ধ করেন? কিরূপে ভক্তের সঙ্গে থাকেন? ভগবান শিব বলছেন-

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা।।
আনন রহিত সকল রস ভোগী। বিনু বানী বকতা বড় জোগী।।
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা। গহই ঘ্রান বিনু বাস অসেষা।।
অস সব ভাঁতি অলৌকিক করনী। মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী।।
(মানস, ১/১১৭/৫-৮)

তিনি বিনা কানে শোনেন, চোখ বিনা দেখেন, বিনা পায়েই হাঁটেন, বিনা হাতেই সমস্ত কাজ করেন। এইপ্রকার রামের কর্ম সকলপ্রকারেই অলৌকিক। প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেটা অনুভবগম্য, অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ রাম-এইরূপ ভগবান শিবের অভিমত।

রামের জন্মও বিচারণীয়-

ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, নির্গুন বিগত বিনোদ।
সো অজ প্রেম ভগতি বস, কৌশল্যা কে গোদ।। *(মানস, ১/১৯৮)*

যিনি অব্যক্ত, বিনা পায়ে হাঁটেন, বিনা চোখে দেখেন, দেহ বিনাও দেহধারী, তিনিই অজন্মা, অব্যক্ত, শাশ্বত রাম প্রেমরূপ ভক্তি দ্বারা কৌশল্যার কোলে এসেছিলেন। বস্তুতঃ প্রেম মাখানো ভক্তিরই আরেক নাম 'কৌশল্যা'। অতএব 'ভক্তিরূপ কৌশল্যা'। সম্পত্তির কেন্দ্রকে কোশ বলে। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। সেই স্থির সম্পত্তির সংগ্রহ ভক্তির মধ্যেই নিহিত আছে, সেইজন্য এর নাম কৌশল্যা।

এই ক্রমেই রামের নামকরণের উপরেও বিচার করুন। যখন ভগবান রাম ইত্যাদির জন্ম হয়েছিল তখন দশরথ হর্ষোল্লাসপূর্বক গুরু বশিষ্ঠের কাছে এঁদের নামকরণের বিষয়ে কথা বলার জন্য গিয়েছিলেন, বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে এঁদের নাম অনেক এবং অনন্ত; গোনা অসম্ভব কিন্তু ব্যবহারে সম্বোধন করার জন্য তিনি চার পুত্রেরই ক্রমশঃ নাম দিয়েছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে এরা সাধারণ পুত্র নয়, পরন্তু এরা বেদ-এর তত্ত্ব-

ধরে নাম গুর হৃদয়ঁ বিচারী।

বেদ তত্ত্ব নৃপ তব সুত চারী। *(মানস ১/১৯৭/১)*

হৃদয়ে বিচার করে বশিষ্ঠ নাম রেখেছিলেন এবং শেষে অভিমত দিয়েছিলেন যে রাজন ! এরা সাধারণ পুরুষ নয়। চারজন সুতেই বেদ-এর তত্ত্বস্বরূপ। পরম তত্ত্বে, যা বিদিত নয়, তাও বেদ-এর সাহায্যে বিদিত হয়, তার তত্ত্বে। এখন চার ভাইয়ের নাম দেখুন-

বিস্ব ভরন পোষন কর জোঈ।

তাকর নাম ভরত অস হোঈ।। *(মানস ১/ ১৯৬/ ৭)*

যাঁর মধ্যে বিশ্বকে ভরণ পোষণ করার ক্ষমতা আছে, তাঁর নাম ভরত। চার ভাইয়ের মধ্যে ভরণ পোষণের ক্ষমতা যদি কারও মধ্যে ছিল তা ভরতের মধ্যে ছিল, সেইজন্য তাঁর নাম ভরত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেরূপ লক্ষণ দেখা যায় না, যেমন বশিষ্ঠ বলেছিলেন। যখন মাতা কৈকেয়ীর আদেশে রাম বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন কাঁদতে-কাঁদতে ভরত রামের পিছন-পিছন চিত্রকূট পৌঁছেছিলেন। লোকজন ভরতকে রাজ্য পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ভরত একথাতে রাজী হননি। রাম বলেছিলেন-ঠিক আছে, অন্তত চোদ্দো বছর পর্যন্তই প্রজাদের পালন পোষণ কর; কিন্তু ভরত খড়মের উপর সব ভার দিয়ে নন্দীগ্রামে একটি গিরিকন্দরে গিয়ে বসেছিলেন। চোদ্দো বছর পর্যন্ত বাইরেই বেরোননি। বিশ্বপোষণ তো জলে গিয়েছিল, শুধু অযোধ্যার ভরণ-পোষণের যখন কথা উঠেছিল, ভরত গিরিকন্দরে গিয়ে বসেছিলেন। ফিরেও তাকাননি। সৌভাগ্যবশতঃ মন্ত্রী ভাল এবং প্রভুভক্ত ছিলেন অতএব শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু যে বিশেষ গুণের আধারে নামকরণ হয়েছিল, কাজে সেরকম দেখা যায়নি। দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ দেখুন-

জাকে সুমিরন তেঁ রিপু নাসা।

নাম শত্রুহন বেদ প্রকাসা।। *(মানস, ১/১৯৬/৮)*

শত্রুদের নাশ করার ক্ষমতা যদি কারও মধ্যে ছিল তবে তা শুধু শত্রুঘ্নের মধ্যে ছিল। শুধু তাঁর স্মরণ করলেই শত্রুদের নাশ হয়ে যায়। সেইজন্য তাঁর নাম শত্রুঘ্ন রাখা হয়েছিল। কিন্তু 'মানস-এর অবলোকন করলে জানা যায় যে রাম যুদ্ধ করেছিলেন, লক্ষ্মণ যুদ্ধ করেছিলেন, প্রয়োজনে ভরতও একবার হনুমানকে বাণ দিয়ে মেরেছিলেন, কিন্তু শত্রুঘ্ন তো একটা ইঁদুরকেও মারেননি। যদিও নামকরণে, চার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুদমনের ক্ষমতা একমাত্র শত্রুঘ্নের মধ্যে ছিল। হ্যাঁ, কুবরীকে

শত্রুঘ্ন লাথি অবশ্য মেরেছিলেন কারণ সে বেচারী ঘুরে ঘুসিও চালাতে অসমর্থ ছিল। শত্রুঘ্ন দেখলেন যে, সে কিছু করতে পারবে না, তা সত্ত্বেও এক লাথি পিছন থেকে মেরেছিলেন, তবেই তো কুঁজে লেগেছিল, তাঁর পরাক্রম এতটাই ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় না। এইপ্রকার লক্ষণের নামকরণের আধার দেখুন-

লচ্ছন ধাম রাম প্রিয়, সকল জগত আধার।
গুরু বশিষ্ট তেহি রাখা, লছিমন নাম উদার।। *(মানস, ১/১৯৭)*

যিনি লক্ষণগুলির ধাম, জগতের আধার, রামের প্রিয়; গুরু বশিষ্ঠ তাঁর নাম লক্ষণ রেখেছিলেন; তিনি শুভ লক্ষণগুলির ধাম ছিলেন। তাঁর মধ্যে একটাও দুর্গুণ ছিল না, সেই জন্য তাঁকে লক্ষণ নামে ডাকা হত। কিন্তু লক্ষণ মহা ক্রোধী ছিলেন। ক্রোধ তো একটা দুর্গুণ। যদ্যপি ভরত সহৃদয়তা পূর্বক রামকে রাজী করাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু লক্ষণ তাঁকে আসতে দেখে ধনুক তুলে লাফাতে শুরু করেছিলেন। লক্ষণের ক্রোধী স্বভাব প্রসিদ্ধ আছে। ধনুভঙ্গ, বনবাস, কিষ্কিন্ধা, লঙ্কা সর্বত্র তাঁর এই স্বরূপ দেখা গেছে, তা সত্ত্বেও তাঁকে লক্ষণের ধাম বলা হয়। যখন সীতাকে চুরি করে রাবণ তখন **'লছিমনহুঁ ইয়হ মরমু না জানা।' (মানস ৩।২৩।৫)** কেবট মর্ম জেনে গিয়েছিলেন কিন্তু লচ্ছন ধাম জানতে পারেননি। যুদ্ধে যখন মেঘনাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, একথা জানা সত্ত্বেও যে, শত্রু দুর্বল নয় তার প্রবল শস্ত্র সম্মুখ দিয়ে আসছে, লক্ষণ বুক পেতে মুর্চ্ছিত হয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষণ অবশ্যই এঁড়ে, কিন্তু যতদূর প্রশ্ন লক্ষণ-এর তাঁকে আনাড়ীই দেখছি। লক্ষণ তো তবেই হত যদি তিনি শত্রুর অভিপ্রায়গুলি পূর্ব হতেই টের পেতেন। **'কহবি ন তাত লখন লরিকাঈ।' (মানস, ২।১৫১।৮)**-একই সঙ্গে জন্ম হয়েছিল কিন্তু রাম এবং তাঁর স্বভাবে কত পার্থক্য ছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে সমস্ত শুভগুণ লক্ষণের মধ্যে ছিল কিন্তু ব্যবহারে সেরকম দেখা যায় না। এখন রামের নামকরণের উপর দৃষ্টিপাত করুন-

জো আনন্দ সিন্ধু সুখরাসী।
সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী।। *(মানস, ১/১৯৬/৫)*

তিনি আনন্দের সমুদ্র, সুখের রাশি, নিজের একবিন্দু জলে ত্রৈলোক্যকে সুপাস প্রদান করেন-

সো সুখধাম রাম অস নামা।
অখিল লোকদায়ক বিশ্রামা।। *(মানস ১/১৯৬/৬)*

তিনি সুখের ধাম, সেইজন্য তাঁর নাম রাম তিনি সমস্ত লোককে বিশ্রাম

প্রদান করেন। রাম আনন্দের সমুদ্র, সুখের ধাম তো ছিলেন, যাঁকে দুঃখ স্পর্শই করত না কিন্তু রামের জীবনের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তিনি সুখে-শান্তিতে কখনও থাকেননি। বাল্যকালেই তাঁকে বিশ্বামিত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাড়কার সঙ্গে লড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বিবাহ হয়েছিল, কিছু সুখের মুখ দেখেছিলেন যখন রাজ্য ভোগ করার সময় হয়েছিল, মন্থরা বিষম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। রাম রাজ্যলাভ করার পরিবর্তে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যাওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন। বনবাসকালে কোনরকমে সময় অতিবাহিত করছিলেন তা করতে সীতাকে রাবণ চুরি করেছিল তারপর তো "হায় মৃগলোচনী! হায় গজগামিনী! হায় সীতে! আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেছ।" 'লতা তরু পাতী'কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং কেঁদে বেড়াতেন। তাঁর এইরূপ দশা দেখে নারদের মনে গভীর অনুশোচনা হচ্ছিল যে, আমার শাপের জন্য রাম দুঃখের বোঝা সহ্য করছেন। একথা আলাদা যে, তিনি হেসে দুঃখের সময় অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু ছিল তো সেসব দুঃখই।

রাম সৈন্য সংগঠন করেছিলেন, রাবণকে পরাজিত করেছিলেন। সীতা সহিত অবধের সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন, তা একজন ধোপা কটাক্ষ করেছিল দৈববশতঃ ধোপার স্ত্রী কারও বাড়িতে উৎসব উপলক্ষ্যে রাত্রিবাস করেছিল। ধোপা বলেছিল-আমি রাম নই যে, অন্যের বাড়িতে রাত কাটিয়ে আসা স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করব। রাম যখন একথা শুনেছিলেন তখন লোকরঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করে অসহ্য দুঃখ সহ্য করেছিলেন, যদ্যপি সীতা যে নির্দোষ একথা প্রমাণিত ছিল। বাল্মীকি এবং লবকুশের প্রয়াসের ফলস্বরূপ জনতা সীতাকে নির্দোষ স্বীকার করেছিল এবং রাম সীতাকে অযোধ্যা ফিরে যাবার জন্য আগ্রহ করেছিলেন তখন সীতা কলা দেখিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন। রামের দুঃখের কি কোন সীমা ছিল? শেষে একটা কথাতে লক্ষণ সরযুতে প্রবেশ করেছিলেন। রাম এত বেশী দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনিও সরযুতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যাঁর সারাটা জীবন দুঃখে কেটেছে বশিষ্ঠ তাঁকে বলেছেন-

'**সো সুখ ধাম**' যাঁকে দুঃখ স্পর্শও করে না, তাঁর '**রাম অস নামা। অখিল লোকদায়ক বিশ্রামা।**' -একমাত্র তিনি সমস্ত লোকের বিশ্রামদাতা।

এইপ্রকার যেমন নামকরণ করা হয়েছে, সেইরকম কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় না। তবে কি বশিষ্ঠ মুনি দক্ষিণার জন্য এইরূপ প্রশস্তি করেছেন অথবা তুলসীদাস

মিথ্যা কথা লিখেছেন? না, মানস অক্ষরশঃ সত্য, একটা চৌপাইও ভুল নয়। কিন্তু "**বস্তু কহীঁ ঢুঁড়ে কহীঁ, কইসে পাবৈ তাহি।**" সেই বস্তু স্থিতি কোথাও অন্যত্র আছে। দেখুন, প্রত্যেক শাস্ত্রের রচনা দুটি দৃষ্টিতে করা হয়-এক তো ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম জীবিত রাখা এবং দ্বিতীয় সেই ঘটিত ঘটনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরমতত্ত্ব পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করান। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আমরা মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করার প্রেরণা গ্রহণ করি। কিন্তু শুধু কুশলতাপূর্বক জীবনযাপন করলেই মানুষের কল্যাণ হয় না। অতএব সংসারে যতদিন বাস করবেন, ততদিন শিষ্টজন অনুমোদিত বিধি দ্বারা জীবন-যাপন করুন, এই দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে সেগুলিকে জীবিত রাখা হয়। সেই সঙ্গে এই প্রকার জীবন ধারণ করতে-করতে যখন বিবেক জেগেছিল তখন সেই পরম প্রভুর অঙ্কে প্রবেশ করার জন্য আধ্যাত্মিক বিদ্যার সৃজন মনীষীগণ করেছিলেন। ঘটনা ঘটিত না হলে দৃষ্টান্ত কোথা থেকে সুলভ হত। সেই ঘটনাকে মাধ্যম করে ঋষিগণ সেই আধ্যাত্মিক সংঘর্ষের বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করেছেন, যার পরিণাম পরমশান্তি ও পরমতত্ত্ব। রামচরিতমানসেও এই বস্তুগুলি সম্বন্ধে গোপনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রামচরিতমানসকে শুধুমাত্র ইতিহাস ভাবা ভয়ঙ্কর ভুল হবে।

'রামচরিত'-এর অর্থ রামের চরিত্র। তবে কি তুলসীদাস দেহধারী রামের চরিত্র সম্বন্ধে লিখতে যাচ্ছেন, যিনি এই ধরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গোস্বামীজী বলছেন না, অপিতু, 'মানস' সম্বন্ধে লিখছি। মানস মন, অন্তঃকরণকে বলে। অতএব রামচরিতমানস-এর তাৎপর্য রামের সেই চরিত্র, যা মনের অন্তরালে প্রসারিত আছে। তিনি সকলের অন্তরে আছেন, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। এখানে তো রাত-দিন কামের চরিত্র, লোভের চরিত্র, মোহ এবং ছল-ছদ্মেরই চরিত্র দেখা যায়। রামের চরিত্র তো মনের মধ্যে দেখতেই পাওয়া যায় না। আছেন সকলের মধ্যে। যে প্রকার তিনি মনে জাগ্রত হন, এবং জাগ্রত হয়ে রাম পর্যন্ত যে দূরত্ব তা অতিক্রম করান, ততদূর পর্যন্ত সাধন-ক্রম এই মানসে অঙ্কিত আছে।

মনে রাখবেন, গ্রন্থের শীর্ষকেরই পটপ্রসার, বিস্তার গ্রন্থের পংক্তিগুলিতে করা হয়। রামচরিতমানসের আশ্রয় হল রামের সেই চরিত্র যা মনের অন্তরালে প্রসারিত। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কিরূপে তা প্রসারিত? অন্তঃকরণে দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান। প্রথমটি আসুরী সম্পদ্, দ্বিতীয়টি দৈবী সম্পদ্। আসুরী সম্পত্তি অধোগতি এবং নীচ যোনিতে নিয়ে যায় এবং দৈবী সম্পদ্ পরম কল্যাণের সৃজন

করে। 'বিনয়পত্রিকা'-এতে তুলসীদাস বলেছেন **'বপুষ ব্রহ্মাণ্ড সুপ্রবৃত্তি লঙ্কা দুর্গ, রচিত মন দনুজ ময় রূপধারী।'** *(৫৮)*-এই দেহই সুব্যবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড, এর মধ্যে 'প্রবৃত্তি লঙ্কা'-মায়িক প্রবৃত্তি, শারীরিক অনুরক্তিই লঙ্কা। তুলসীদাসজী চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করতে-করতে কোথাও-কোথাও যথার্থেরও সঙ্কেত করেছেন। মনরূপ ময়দানব এই প্রবৃত্তিরূপ লঙ্কার নির্মাণ করেছে, এতে-

মোহ দশমৌলি, তদ্‌ভ্রাত অহঙ্কার, পাকারিজিত কাম বিশ্রামহারী।
লোভ অতিকায়, মৎসর মহোদরদুষ্ট, ক্রোধ পাপিষ্ঠ-বিবুধান্তকারী।।

(বিনয়পত্রিকা, ৫৮)

মোহকেই রাবণ বলে যা **'সকল ব্যাধিহ্নু কর মূলা'**, সেইজন্য রাজা। এই লঙ্কাতে ক্রোধরূপ কুম্ভকর্ণ, লোভরূপ নারান্তক, অহঙ্কাররূপ অহিরাবণ, প্রকৃতিরূপ সুর্পনখা এবং এদের মাঝেই জীবরূপ বিভীষণ আছে, যে আছে তো দুষ্টুদের মাঝে, মোহ-এর সহোদর, কিন্তু এর দৃষ্টি সদৈব রামের উপর থাকে। জীবাত্মা বাস্তবে মোহের জন্য আবদ্ধ, মোহসংযুক্ত হওয়ার জন্য একে জীব আখ্যা দেওয়া হয়েছে জীব স্বীয় পরিবার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদির চিন্তাতে দিনপাত করছে কিন্তু তার সঙ্গে এর দৃষ্টি পরমাত্ম তত্ত্বের উপরও থাকে। কিছু দিন পূর্বে আশ্রমে আমেরিকাবাসী এক সজ্জন ব্যক্তি এসেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এত ব্যস্ত আমেরিকাতেও কি লোকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে? একথা শুনে তিনি বলেছিলেন-''এটা তো স্বাভাবিক। না বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ এটা আলাদা ব্যাপার যে, আমরা এটা জানি না যে, কিভাবে অনুসন্ধান করলে তাঁকে লাভ করব? ভারতবর্ষে আগমনের হেতু এটাই।"

এই প্রকার আসুরী সম্পদ ক্রমশঃ চলে অসংখ্য অধোমুখী প্রবৃত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধে সকলের মৃত্যুর পর যখন রাবণ দুর্গ থেকে বেরিয়েছিল তখন তার সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য ছিল। সকলেরই তো মৃত্যু হয়েছিল অগণিত সৈন্য তবু বেঁচেছিল। কিন্তু হয়েছিল এমনিই। মোহরূপ রাবণ হল সব ব্যাধির মূল। যদি মূল জীবিত থাকে তবে শাখা ও পাতায় সবুজ হয়ে ওঠে। মূলে সবকিছু প্রসুপ্ত অবস্থাতে আছে, সময় হলে প্রকাশ পাবে, সেইজন্য সকলকে জীবিত ভাবা হয়।

অন্যদিকে এই দেহই অবধ। এতে অবধ্য স্থিতি সঞ্চারিত আছে। সেইজন্য অবধ বলা হয়। দেহমধ্যস্থ দশটি ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করে যে, তাকেই দশরথ বলা হয়। দেহ মধ্যে ভক্তিরূপ কৌশল্যা, কর্মরূপ কৈকেয়ী, সুমতিরূপ সুমিত্রা, মলিনমতি মন্থরা এবং জ্ঞানরূপ বশিষ্ঠ বিদ্যমান। খাওয়া, ওঠা-বসা সবকিছু জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হয়,

তবে কি এই জ্ঞানকেই বলা হচ্ছে? না, **'বশ ইষ্ট সঃ বশিষ্ঠ'** —ইষ্টকে অনুকূল করতে সক্ষম যে জ্ঞান, তাকে বশিষ্ঠ বলে। এই জানাকেই সত্যিকারের জ্ঞান বলে তবে তা কিরূপ যুক্তিবিশেষ, যার ফলে ইষ্ট বশীভূত হন? তা হল শ্বাসরূপ শৃঙ্গি ঋষি। শৃঙ্গি ঋষি যজ্ঞ করেছিলেন। **"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"** *(গীতা ১০।২৫)*-জপকেই যজ্ঞ বলে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের যজনকেই যজ্ঞ বলে, হৃদয়ের পবিত্রতাই হল হবি। যখনই এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তখনই ভক্তিরূপ কৌশল্যার কোলে বিজ্ঞানরূপ রাম প্রকট হন। জ্ঞান উদয় হয়। সঙ্গে বিবেকরূপ লক্ষ্মণ, ভাবরূপ ভরত, সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন-এর প্রাদুর্ভাব হয়। সাধকের হৃদয়ে যখন এই অলৌকিক ব্যাপার জেগে ওঠে, তখন তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেইজন্য বিশ্বাসরূপ বিশ্বামিত্রের আগমন হয়।

জানেँ বিনু না হোই পরতীতী।
বিনু পরতীতি হোই নহিँ প্রীতী।। *(মানস, ৭।৮৮।৭)*

যতক্ষণ তাঁকে জানা যায় না, ততক্ষণ বিশ্বাস হয় না এবং বিশ্বাস বিনা প্রীতি উৎপন্ন হয় না, হার্দ্দিক টান হয় না-

প্রীতি বিনা নহিँ ভগতি দিঢ়াঈ।
জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাঈ।। *(মানস, ৭।৮৮।৮)*

প্রীতি বিনা ভক্তি দৃঢ় হয় না। সকলেই তো নিজেকে ভক্ত বলে, কিন্তু সেই ভক্তি ঠিক জলের পানার মত। পূর্বদিকের হাওয়া বইলে পশ্চিম কোনায় গিয়ে পানা জমা হয়ে যায়, আবার দক্ষিণা বাতাস বইলে উত্তর কোনে গিয়ে পানা জমা হয়ে যায়। সঙ্গদোষরূপ বায়ু কখনো-কখনো না বইলে মনে হয় যেন পানা জলে ছেয়ে আছে, কিন্তু এটা ক্ষণিক। যেমনই কুসঙ্গ জোটে, তেমনি সব ভক্তি এককোণে চলে যায়। যখন সাধকের অন্তরে অনুভব, ভাব, বিবেক, সৎসঙ্গ-এর সূত্রপাত হয়, তখনই ইষ্টের সর্বব্যাপকতাতে বিশ্বাস হয়। লোকে বলে বিশ্বাস কর, কিন্তু কি করে করবে? চোখ বুজে বিশ্বাস করলে সেটা অন্ধবিশ্বাস হবে। যখন একটু-একটু করে জ্ঞান লাভ হয়, তখন 'বিশ্বাসরূপ বিশ্বামিত্র' বিশ্বাস জন্মানোটা স্বাভাবিক। তখন বিশ্বাসের সঙ্গে সেই যজ্ঞকে করেন। অন্য কোন যজ্ঞ নয়। সেই যজ্ঞকে করেন যা আগেও করতেন কিন্তু এখন বিশ্বাসের সঙ্গে করেন, বিশ্বামিত্র সঙ্গেই আছেন। এই অবস্থাতে তর্করূপ তাড়কা, স্বভাবরূপ সুবাহু, স্বভাবে (মলরূপ) মলিনতারূপ মারীচ বিঘ্ন উপস্থিত করে কিন্তু জ্ঞান দ্বারা, বিজ্ঞানরূপ রাম দ্বারা শান্ত হয়। অতঃপর 'অবধ হৃদয় লয় সঃ অহিল্যা'-এর গতি প্রাপ্ত হয়।

এই অবস্থা থেকে দৈবী সম্পত্তির সংগ্রহ শুরু হয় চলতে-চলতে ক্রমশ দৈবী গুণও অনন্ত হয়ে যায়। দৈবী সম্পদের তাৎপর্য ব্রহ্মাচরণের প্রবৃত্তি-

বানর কটক উমা ম্যায় দেখা।

সো মুরুখ জো করন চহ লেখা।। ***(মানস, ৪/২১/১)***

ভগবান শিব বলছেন-উমা, আমি বানরসেনা দেখলাম। যে ব্যক্তি তাদের গণনা করতে চায় সে একেবারে নির্বোধ। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা মাত্র চার আরব, তাসত্ত্বেও বিশ্বে খাদ্য-সমস্যা সমুপস্থিত। ভগবার শিবের বাণীতে সেই সময় অসংখ্য বানর ছিল। সে বুদ্ধিহীন যে গণনা করতে চায়। তাহলেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই সৈন্যও সদ্‌গুণগুলির, যা মনের অন্তরালে বিদ্যমান। ব্রহ্মাচরণময় প্রবৃত্তিই বানর সেনা, সেইজন্য যখন গুরু বশিষ্ঠ নামকরণ করেছিলেন, তখন স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে ভগবান রাম মানসের। তিনি বলেছেন-

বিস্ব ভরন পোষন কর জোঈ।

তাকর নাম ভরত অস হোঈ।। ***(মানস, ১/১৯৬/৭)***

ভাবই ভরত। **‘ভাবে বিদ্যতে দেবা’**-ভাব-এর মধ্যে এত শক্তি আছে যে, পরমদেব পরমাত্মা পর্যন্ত বিদিত হন। **‘ভাব বস্য ভগবান, সুখ নিধান করুনা ভবন।’** ***(মানস, ৭/৯২খ)***, ভগবান অন্য কোন উপায়ে বশে হন না। শুধুমাত্র ভাব দ্বারাই তিনি বশ হন। তিনি সুখের নিধান এবং করুণার ধাম। অতএব ভাবরূপ ভরত। বিশ্বে যদি কেউ কারও ভরণ-পোষণ করেছে, পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করেছে তো শুধু ভাব দ্বারা। যার-যার হৃদয়ে ভাব জাগ্রত হয়েছে; তৎক্ষণাৎ সে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মানুষ অপূর্ণ। ভৌতিক বস্তু দ্বারা, টাকা-পয়সায় মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আত্মদর্শন দ্বারাই পূর্ণতা লাভ সম্ভব, এবং সেই আত্মদর্শনের ক্ষমতা শুধু ভাব-এ নিহিত আছে। বিভিন্ন আত্মা যদি কখনও তৃপ্তিলাভ করেছে তো ঈশ্বর-দর্শন দ্বারাই করেছে এবং সেই ঈশ্বর ভাব-এর বশীভূত, সেইজন্য ভাবই ভরত। ভাব-এর মধ্যেই সেই ক্ষমতা আছে যা বিশ্বের সব আত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করতে সক্ষম, সেইজন্য তার নামকরণ করা হয়েছে ভরত। এমন নয় যে, আজকালকার নেতাদের মত ভরত জনসাধারণের উদর পূর্তির ব্যবস্থা করতেন। যাদের গরু ছিল, বর্তমানে তাদের কাছে ট্র্যাকটর আছে; কিন্তু তাতেও পেট ভরছে না। যদি তাকে দশটা বাসের মালিক করে দেওয়া হয়, তবুও তার পেট খালিই থাকবে। ‘বিড়লা’র কারখানাগুলি যদি পেয়ে যায়, কিন্তু তৃষ্ণা তবু কম হবে না। হ্যাঁ শোষণের মনোভাব অবশ্য বেড়ে

যায়। কখন কে তৃপ্ত হয়েছে? মহাবীর, বুদ্ধকে রাজ্যও তৃপ্তি দিতে পারেনি। যখনই কেউ তৃপ্তিলাভ করেছে পরমাত্মার অঙ্কেই করেছে, তিনিই যথার্থরূপে ভরণ এবং পূর্ণ পোষণ। সেই পোষণ কিরূপে লাভ হবে? ভাব দ্বারা হবে। অতএব ভাবই ভরত। এটা বেদের তত্ত্ব অর্থাৎ যে তত্ত্ব বিদিত নয়, অলখ-অদৃশ্য-অব্যক্ত, তাকে বিদিত করিয়ে দেয় যে তত্ত্ব সেই ভরত ; কোন হাড়, মাংস, চামড়ার ভরত ছিল না।

তদনন্তর শত্রুঘ্নের নামকরণ করেছেন-

জাকে সুমিরন তেঁ রিপু নাসা।
নাম শত্রুহন বেদ প্রকাসা।। *(মানস, ১/১৯৬/৮)*

যাঁর স্মরণ করলে শত্রুদের নাশ হয়, তাঁর নাম শত্রুঘ্ন, 'বেদপ্রকাসা'-এটাই বেদ-এর নির্ণয়। গুরু বশিষ্ঠ সেই নির্ণয়ের উপর বিশ্বাস করেছেন এবং স্বয়ংও সেই মত দিয়েছেন। বেদ এবং মহর্ষি উভয়ের মত এক যে, শত্রুঘ্নের স্মরণের বিধান আছে। তা সত্ত্বেও কেউ শত্রুঘ্নকে স্মরণ করে না। এই বেদাজ্ঞা এবং সদ্‌গুরুর আজ্ঞা অনুসারে কাউকে চলতে দেখা যায় না। সকলেই তো স্মরণ রামেরই করেন। 'শত্রুঘ্ন-শত্রুঘ্ন জপ করতে আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। আপনি কোথাও দেখেছেন? না, এটা হল মানসের সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন।

সৎসঙ্গ দুই প্রকারের। এক প্রকার সৎসঙ্গ হল, যা বাণী দ্বারা করা হয়, যা শোনা যায়, যা আপনি সৎপুরুষের সভায় শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় প্রকার সৎসঙ্গ ক্রিয়াত্মক। বস্তুতঃ সৎ-এর সঙ্গতিই হল সৎসঙ্গ, যথা-

সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগত পসার।
নিত্যানিত্য বিবেকিয়া, লীজে বাত বিচার।।

আত্মাই সত্য এবং শাশ্বত, এর সঙ্গ সৎসঙ্গ। এই সৎসঙ্গ ধ্যান, সমাধি, চিন্তন, ভজন দ্বারা হয়, এই অন্তরঙ্গ সৎসঙ্গ শুধু মন দ্বারা হয়, সেইজন্য স্মরণ-এর মাধ্যমেই সত্যের সঙ্গতি সম্ভব। মন যখন সকল প্রকার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হয়ে আত্মচিন্তনে রত হয়, শ্বাসের সঙ্গত করে, আত্মার সঙ্গ করে ব্যস সেইদিন থেকেই সত্যের সঙ্গতি-সৎসঙ্গ প্রারম্ভ হয়। চিন্তন যেমন-যেমন সূক্ষ্ম হবে মন সবদিক থেকে বিরত হয়ে ইষ্টে কেন্দ্রিত হবে, তেমন-তেমন শত্রুদের নাশ হতে থাকবে। মনের স্মরণ এবং ইষ্ট যখন তদ্রুপ হয়ে যায়, তখন মায়িক শত্রুদের উন্মূলন হয়। অজেয় শত্রু তো আমাদের ভিতরেই বিদ্যমান-'**মহা অজয় সংসার রিপু, জীতি সকই সো বীর।**' ***(মানস ৬/৮০ ক)*** -কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বাস্তবিক শত্রুদের মহাপুরুষগণ

খোঁজ করেছেন। বহির্জগতের লড়াই তো মোহের দ্বন্দ্ব মাত্র-

জলচর-বৃন্দ জাল অন্তরগত, হোত সিমিটি ইক পাসা।
একহি এক খাত লালচবস, নহিঁ দেখত নিজ নাসা।। (বিনয় ০, ৯২)

বাস্তবে সমস্ত পৃথিবীর শত্রুদের উন্মূলন; মোহরূপ রাবণ ইত্যাদি সমস্ত শত্রুদের সমূল নাশ সৎসঙ্গের মাধ্যমেই হয়েছে। অনুভব দ্বারা সূচিত করে যে যন্ত্র, রাম তো সেই যন্ত্রের নাম মাত্র। স্মরণ এবং চিন্তন দ্বারাই মায়িক শত্রুদের নাশের বিধান আছে। স্মরণ-চিন্তনের উপরেই সৎসঙ্গ-এর উত্থান-পতন নির্ভর করে, সেইজন্য সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন। '**জাকে সুমিরন তেঁ রিপু নাসা।**' যাঁর স্মরণ করলে কাম, ক্রোধ মোহাদি শত্রু শান্ত হয়ে যায়-'**নাম শত্রুহন বেদ প্রকাসা**'।' তার নাম শত্রুঘ্ন। রাজন্! এটা বেদ-এর তত্ত্ব, যে পরমাত্মা বিদিত নয়, তাঁকে জানতে সাহায্য করে যে তত্ত্ব, পঞ্চ ভৌতিক পিণ্ডধারী কোন শত্রুঘ্ন ছিলেন না এই প্রকার-

লচ্ছন ধাম রাম প্রিয়, সকল জগত আধার।
গুরু বশিষ্ট তেহি রাখা, লছিমন নাম উদার।। *(মানস, ১/১৯৭)*

যিনি সমস্ত লক্ষণের ধাম, রামের প্রিয়; '**সকল জগত আধার। গুরু বশিষ্ট তেহি রাখা, লছিমন নাম উদার।।**' বিবেকরূপ লক্ষণ! সত্য কি? অসত্য কি? এর জ্ঞান এবং জানার পর সত্যে আরূঢ় থাকার ক্ষমতাকে বিবেক বলে। সত্য এবং শাশ্বত তো একমাত্র ঈশ্বর; আত্মা। আত্মসমাহিত হওয়ার ক্ষমতা যিনি লাভ করেন, তিনিই লক্ষণ, তিনি লক্ষণের ধাম-

দচ্ছ সকল লচ্ছন জুত সোঈ।
জাকেঁ পদ সরোজ রতি হোঈ।। *(মানস, ৭/৪৮/৮)*

একথা উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরকাণ্ডের এই নির্ণয়ও বশিষ্ঠ মুনিরই। তিনিই লক্ষণের ধাম, রামের প্রিয়। সত্য বস্তু আত্মাতেই যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তি তিনিই ।

পুরুষ নপুংসক নারি বা, জীব চরাচর কোই।
সর্বভাব ভজ কপট তজি, মোহিঁ পরমপ্রিয় সোই।। *(মানস, ৭/৮৭/ক)*

পুরুষ, নপুংসক, নারী অথবা নর যে কেউ কপট ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে, সে আমার পরম প্রিয়। এই প্রকার পরমসত্য পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যাবার ক্ষমতাকেই 'লক্ষণ' বলে। 'বিবেক' বলে। যিনি সেই ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই রামের প্রিয় হতে পারবেন,রামই সকল জগতের আধার।

ইষ্ট অথবা লক্ষ্যের মননই হল লক্ষণ। মনন করতে-করতে মন ইষ্টের সদৃশ হয় ঈশ্বরময় স্থিতি প্রাপ্ত করে, যিনি সমস্ত জগতের আধার। রাজন! এই তত্ত্ব অবিদিত পরব্রহ্মকে বিদিত করতে সাহায্য করে, এই তত্ত্বই লক্ষণ; কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়।

জো আনন্দ সিন্ধু সুখরাসি।
সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী।। (মানস, ১।১৯৬।৫)

যিনি আনন্দের সমুদ্র, সুখের রাশি, একফোঁটায় ত্রৈলোক্যকে সুখপ্রদান করেন, তিনিই রাম। কখনও-কখনও সাধক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে ভগবান এক ফোঁটা প্রদান করে বলেন উদ্বিগ্ন হয়ো না, তোমাকে মুক্ত করব। ব্যস শুধু একবিন্দুই আনন্দ পায়, তবুও রামের কাছ থেকে এটুকু আশ্বাস পেয়ে, সাধক ত্রৈলোক্যে সুখ পায় যদ্যপি মুক্তি লাভে তখনও দেরী আছে। সাধক এই অবস্থাতে ভয়মুক্ত হয়। পুনরায় সাধনাতে প্রবৃত্ত হয়। পুনরায় ব্যাকুল হলে বলেন, ''সাধনাতে তোমার ত্রুটি নেই। ব্যস আর একটু স্বভাব পরিবর্তন করতে হবে।'' এক ফোঁটা দিয়ে সন্তোষ প্রদান করেন। এই প্রকার অলৌকিক অনুভূতি দ্বারা, অঙ্গ-স্পন্দন দ্বারা, ধ্যানজনিত দৃশ্য দ্বারা, স্বপ্ন দ্বারা, আকাশবাণী দ্বারা ঈশ্বরীয় সঙ্কেতের নাম 'রাম'। রামের অনুভূতির প্রারম্ভিক অবস্থা এটা। বিনা মুখে রাম কথা বলেন, 'ধ্যান কালে বলেন, হৃদয় এবং মস্তিষ্কে বলেন, মনের মধ্যে বলেন-এইরূপ বলাকেই রাম বলে। তিনি পা ছাড়াই হাঁটা-চলা করেন, সাধকের সঙ্গে-সঙ্গে চলেন, তাঁর নাম রাম। সেই বিজ্ঞান, বোধ উপলব্ধিকেই রাম বলে। 'ভব' বলে সংসারকে এবং 'অনু' অতীতকে বলে অর্থাৎ ভবাতীত করে যে জাগৃতি-বিশেষ (অনুভব), তারই নাম রাম। তা হল পরমাত্মার বাণীর হৃদয়ে প্রস্ফুটন। সেই নির্দেশ অন্তরে ধ্বনিত হয়, দেখা যায়। ইষ্টদেব এবং সাধকের আত্মা যখন অভিন্ন হয়ে যায়, ইষ্টদেব পথপ্রদর্শন করতে শুরু করেন, হৃদয়ে দর্শনলাভ হয়, তিনি রাম। তিনি স্বয়ং 'আনন্দ সিন্ধু' এবং 'সুখ রাশি' **'সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী'** এক বিন্দুও যে সাধককে প্রদান করেন তাকে ত্রৈলোক্যে সুখপ্রদান করে, ভয়মুক্ত করে দেন। **'সো সুখ ধাম রাম অস-নামা।'** তিনি সুখের ধাম, তাঁর নাম রাম। **'অখিল লোকদায়ক বিশ্রামা।'** সমস্ত লোককে বিশ্রাম প্রদান করার তিনিই একমাত্র আশ্রয়। এইভাবে অনুভব করতে-করতে সাধক যখন চলে ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন, এই অবস্থাতে অনুভবগম্য স্থিতিলাভ হয়। এই অনুভব সাধক ভক্তকে নিজের মধ্যে বিলীন করে নেয়। যজনপূর্ণ স্বরই সরযু। রাম সরযুতে বিলীন হয়ে যান। রাম কোথাও চলে যান না পরন্তু শ্বাসরূপ সরযুতে প্রবিষ্ট হন। প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গেই থাকেন। অবধবাসীও, সঙ্গে-সঙ্গে সরযুতে

বিলীন হয়ে যায় অর্থাৎ অবধ্যস্থিতি, অজর-অমর, শাশ্বত স্বরূপ সাধক লাভ করেন। এটাই রাম-এর পরাকাষ্ঠা।

প্রকৃতির মাঝে স্থিত জীবাত্মা প্রকৃতির অতীত পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই যোগের স্থিতি উৎপন্ন হয়। একের সঙ্গে মিলনের নাম 'যোগ'। দুধে জল মেশানো, দেহকে কাপড়ে আচ্ছাদন করা, হাতে টর্চ নেওয়া এটা যোগ নয়। এগুলি তো ম্যাটার ক্ষেত্রের বস্তু যা পরস্পর সংস্পর্শে আসছে। পদার্থ পদার্থের সংস্পর্শে আসছে। যোগ তো দুটি ভিন্ন-ভিন্ন তত্ত্বের লয়। প্রকৃতিতে স্থিত জীবাত্মা ক্রমশঃ উত্থান করতে-করতে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন পরমাত্মার সঙ্গে যখন যুক্ত হয়, সেটাকেই যোগ বলে। প্রকৃতি নশ্বর, পুরুষ শাশ্বত। উভয়ই ভিন্ন তত্ত্ব। এদের মিলন এবং বিলয়কে যোগ বলে। মিলনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি, যা দুর্বল, বিলীন হয়ে যায় এবং যা শাশ্বত তাই শেষ থাকে। এটাই 'যোগরূপ জনকপুর'।

যোগরূপ জনকপুরে ধ্যানরূপ ধনুক আছে। চিত্তচড়রূপ চাপ আছে। চিত্তের চাঞ্চল্য সমাপ্ত হওয়া ধনুকভঙ্গ হওয়া একই ব্যাপার। যে চিত্তের চঞ্চলতা দূর হয়, ধ্যান তার দ্বারাই হয়-

নাথ সম্ভু ধনু ভঞ্জনিহারা।
হোইহি কেউ এক দাস তুমহারা।। *(মানস, ১/২৭০/১)*

ভগবন্! সেই স্বয়ম্ভু ধনুক, ধ্যানের স্থিতি অর্জন, ধ্যানকালে যে চঞ্চলতা উৎপন্ন হয়, তা দূরীভূত করতে পারে বিরলই কোন আপনার দাস। কার দাস? কে জিজ্ঞাসা করেছিল? একজন মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কে ভঙ্গ করেছিল, তা '**হোইহি কেউ এক দাস তুম্হারা।**' চিত্ত চড়রূপ চাপ-যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের ক্রমভঙ্গ হয়, তখনই সেই স্থিতি ধ্যানকালে স্থির হয়। ধ্যানে টিকে থাকার যোগ্যতা চলে আসে। যখন চিত্তে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না, তখন ধ্যানই তো হবে। সঙ্গে-সঙ্গে শক্তিরূপ সীতা উপলব্ধ হয়। সীতা কে ছিল? রামের শক্তি। তো শক্তিরূপ সীতা! যা অনাদি শক্তি, তাই অনুভব (রাম)-এ সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞানরূপ রাম! বিজ্ঞান এবং অনুভব একে অন্যের পর্যায়ভুক্ত। প্রারম্ভিক অবস্থাতে অনুভব ক্ষীণ হয়। চার-ছ মাস কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে বাস করলেই কিছু না কিছু দেখা যায়। কিন্তু শুরুতে অনুভব অনিয়মিত হয়। জেনে শুনে ভুল করলে অনুভবের সঞ্চার বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু যখন চিত্তের চাঞ্চল্য নিরুদ্ধ হয়, তখন শক্তিরূপ সীতা লাভ হয়। অনুভবে শক্তির সঞ্চার হয়। তারপর অনুভবে যা কিছু ধরা পড়বে, তা অকাট্য

হবে। এইরূপ অনুভব ইষ্টের মৌলিক নির্ণয় হবে।

তারপর তো 'জাগৃতিরূপ জয়মালা।' সাধক যখন শুরুতে ভজনাতে বসেন, তখন নিদ্রা চলে আসে কিন্তু চিত্তের চঞ্চলতা দূর হলে, অনুভবে শক্তিরূপ সীতার সংযোগ হলে নিদ্রার বেগ কমে যায়। সে এই মোহ নিশা থেকে সচেতন হয়ে যায়, ঘুম আসে না কারণ লক্ষ্য সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়।

এই যোগরূপ জনকপুরে ভরত মাণ্ডবীকে লাভ করেছিলেন। ভাব শুরুতে খণ্ডিত হতে থাকে। আজকের ভাব কাল অভাবে পরিণত হবে কিন্তু চিত্তের চঞ্চলতা সমাপ্ত হলেই, অনুভবে গতি চলে আসলে পরে মাণ্ডবী প্রাপ্ত হয়। পূর্বাবস্থায় যে ভাব খণ্ডিত হত, সেই ভাবই পরে মণ্ডিত হয়ে যায়। আর কখনও খণ্ডিত হয় না।

বিবেকরূপ লক্ষণ তার শক্তিরূপ উর্মিলাকে লাভ করেছিলেন। শুরুতে বিবেক বৌদ্ধিক স্তরে থাকে। সত্য, অসত্য কি? বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। বিচার করে-করে বিবেকী হতে হয়। কিন্তু যখন চিত্তের চঞ্চলতা সমাপ্ত হয় এবং ধ্যান দৃঢ় হয়, তখন **'উরমিলা'** বিবেক হৃদয়ে জেগে ওঠে। বুদ্ধির সাহায্যে নির্ণয় করার প্রয়োজন শিথিল হয়ে যায়। সত্য ও অসত্যের নির্ণয় ইষ্টদেবই হৃদয়ে করে দেন।

সৎসঙ্গরূপ শত্রুঘ্ন তাঁর শক্তি 'শ্রুতকীর্তি'কে লাভ করলেন। সৎ-এর সঙ্গ স্মরণের সাহায্যে হয়। স্মরণ করেন তো সকলেই কিন্তু ইষ্টের চরণে শ্রদ্ধা স্থির হয় না। ভজনকালে দেহটা অবশ্যই বসে থাকে, কিন্তু মন অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়।

যতক্ষণ ইষ্টের চরণে শ্রদ্ধা স্থির না হয়, তাঁর রূপের হৃদয়ে নিরন্তর দর্শন না হয়, ততক্ষণ সৎসঙ্গ হয় না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অর্জুন! কায়া, গ্রীবা ও শির এক সরল রেখায় স্থির করে, দৃঢ়ভাবে নাসিকাগ্র দেখতে-দেখতে, অন্য কোনদিকে না দেখে আমাতে চিত্ত নিযুক্ত করবে, এবং আমাকে ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না। (গীতা, অধ্যায় ৬) প্রারম্ভে তো এমন হয় না, কিন্তু যখন চিত্তে চাঞ্চল্যের ক্রম ভঙ্গ হয়, তখন 'সুরত কৃত্য'-যে শ্রদ্ধা স্থির করার চেষ্টা করা হত, তাতে কৃতার্থতা চলে আসে, সফলতা লাভ হয়। সেইজন্য শ্রুতকীর্তি বিনা, শত্রুঘ্ন অপূর্ণ। সত্যের সঙ্গতি করতে-করতে যখন সত্য ও সুরত অর্থাৎ মনের দৃষ্টি পূর্ণত তদ্রূপ হয়ে যাবে, তখন মায়িক বিকারগুলি, চরাচরের শুভ-অশুভ সংস্কারগুলির সমুলোচ্ছেদ হবে। এই প্রকার ভাব, বিবেক, সৎসঙ্গ, বিজ্ঞান একে অন্যের পূরক, সহযোগী। সাধনার সমস্ত সোপান ক্রমশঃ পার করে সাধক অনুভবগম্য স্থিতি প্রাপ্ত করে। সর্বত্র রামময় স্থিতি হয়ে যায়। রামের বাস্তবিক স্বরূপ এটাই।

প্রশ্ন- মহারাজজী! রামচন্দ্র কি জন্মগ্রহণই করেননি?

উত্তর- অবশ্যই করেছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিত হয়েছিল। বাস্তবে রাম মহাপুরুষ ছিলেন, জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আদর্শ ব্যবস্থার স্থাপনা হয়েছিল, সেইজন্য তাঁকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হত। ঐতিহাসিক ঘটনা নিজের জায়গায় নির্ভুল আছে কিন্তু যতদূর প্রশ্ন 'রামচরিতমানসের' এটা বিলক্ষণ গ্রন্থ। এটা শুধু ইতিহাস নয়। এটা লৌকিক মর্যাদা এবং পারলৌকিক উপলব্ধির অদ্ভুত সমন্বয়। রামের জীবন ক্রম থেকে আমরা সাংসারিক জীবনের সুব্যবস্থিত মর্যাদা কাকে বলে জানতে পারি। 'মানস'-এর মধ্যেই সাধনা, অঙ্গ ও উপাঙ্গের সঙ্গে সুরক্ষিত আছে। 'মানস' সাধনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। অধ্যয়ন করার জন্য চর্মচক্ষু নয় **'মানস চখ চাহী'** *(মানস, ১/৩৮/৯)*-হৃদয়ের নেত্রের আবশ্যকতা আছে। এমনিতেও, রাম-এর ঐতিহাসিকতাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি জন্মগ্রহণ করেননি, তবে দৃষ্টান্ত কোত্থেকে পাওয়া যেত? আধার কোত্থেকে পাওয়া যেত?

প্রশ্ন- মহারাজজী! রাম যদি অনুভবগম্য তবে যারা রামের ছবির ধ্যান করেন, তাঁকে ইষ্ট ভেবে তাঁর মূর্তির পূজা করেন, সে সব কি নিরর্থক?

উত্তর- না, নিরর্থক নয়। যাঁরাই মহাপুরুষ হয়েছেন, তাঁরা সদৈব থাকেন। কারণ যিনিই স্বরূপের উপলব্ধি করেন। তিনি অজর-অমর হয়ে যান। আপনি অত্রির, কৃষ্ণের অথবা যে কোন মহাপুরুষের ধ্যান করুন তাঁকেই পাবেন এবং বর্তমানে যিনি মহাপুরুষ, তাঁর সেবা করার নির্দেশ তিনি দিয়ে দেবেন যে তিনি আমারই রূপ, তাঁতে-আমাতে কোন ভেদ নেই, তাঁর সেবা কর। সেই তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের অল্প-স্বল্প সেবায়, তাঁর সান্নিধ্য এবং সৎসঙ্গ দ্বারা আপনার অন্তরে সেই চেতনা জেগে উঠবে, যার ফলে আপনি নিজের অন্তঃকরণে পরম প্রকাশক রামের অনুভূতি করতে থাকবেন, স্বয়ং রাম হতে পারবেন, অনুভবগম্য স্থিতির হবেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।। *(গীতা, ৭/২১)*

যে-যে ভক্ত যে-যে দেবতার স্বরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করতে চায়, যার শ্রদ্ধা যেখানেই স্থির হয়, সেই দেবতার প্রতি তার শ্রদ্ধা আমি স্থির করি। আমার বিধান দ্বারাই, সেই দেবতা দ্বারা পুরুষ ইচ্ছিত ভোগগুলি নিঃসন্দেহে লাভ করে।

।। ওঁ ।।

‘মানস’-এ নারীর স্বরূপ

প্রশ্ন- মহারাজজী ! গোস্বামী তুলসীদাসজী ‘রামচরিত মানস’-এ স্ত্রী জাতিকে অত্যন্ত হেয় করা হয়েছে। প্রতীত হয় মানস-এ তিনি পুরুষজাতির পক্ষ নিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার কি মত ?

উত্তর- পূজ্য পরমহংস মহারাজ বলতেন-‘হো ! একবার আমি হরিদ্বার-এ হর কি পৌঁড়ীতে বসে চিন্তন করছিলাম। অনতিদূরেই মহিলাদের ধ্যান শিবিরে বহু মহিলা জড় হয়েছিল। সময়ে-সময়ে হাততালির গড়গড় শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। কৌতূহলবশতঃ আমিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। মঞ্চে এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন যে, তুলসীদাসের রামায়ণ ঘরে রাখাটা মহিলাদের জন্য অপমানজনক। কেমন লিখেছেন-‘**ঢোল গঁওার সূদ্র পসু নারী। সকল তাড়ন কে অধিকারী।।**’ আমরা সকলে লাঠি এবং জুতোর অধিকারী। এই রামায়ণ ঘরে রাখাও অপরাধ। লিখেছেন-‘**অবগুণ আঠ সদা উর রহহীঁ**’ দেখ না! পুরুষেরা ধোয়া তুলসীপাতা, এদের ভিতর একটাও অবগুণ নেই এবং আমাদের মধ্যে আটটি অবগুণ সদাই থাকে। এইরূপ রামায়ণ পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এইরূপ বলে যখন সে রামায়ণ হাতে তুলে টেবিলে আছড়ে ফেলছিল তখন খুব জোরে হাততালির শব্দ হচ্ছিল। ওই সভাতে স্কুলের ছাত্রীরাও ছিল। মহারাজজী আমাদের বলেছিলেন-“হো ! যখন সবকিছু তাদেরই গোল ছিল, তখন আমি কি বলতাম।” যদ্যপি মহারাজজী মহাপুরুষ ছিলেন, বাস্তবিকতা তাঁর বংশগত ছিল। তথাপি সেই সময় তিনি বিরক্ত স্বরূপে বিচরণ করছিলেন। কে কি বলছে তাতে তাঁর কি প্রয়োজন ?

এই চৌপাইগুলির জন্য রামায়ণের পাতা ছেঁড়ার ঘটনাও যত্র-তত্র শুনতে পাই। সংসদ এবং বিধানসভাতে চর্চা হয় যে রামায়ণ সমত্বে বাধাস্বরূপ।

যদিও লেখা তো বাস্তবে উপযুক্ত প্রকারেই রয়েছে; কিন্তু শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন বিরল মহাপুরুষই জানেন এবং তাঁর সংরক্ষণে কোন বিরল অধিকারীই পাঠ করেন। সকলে পাঠও করে না এবং জানেও না; কারণ সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থই একটা সাবর মন্ত্রস্বরূপ। কলিযুগের ভয়ঙ্কর প্রবাহ দেখে ভগবান শিব বিচার করেছিলেন যে, আর বেদ ইত্যাদি সংস্কৃত-গর্ভিত পুরাতন শাস্ত্র দ্বারা জীবের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি জগতের পরম কল্যাণের জন্য এক সাবর মন্ত্রের সৃজন করেছিলেন।

কলি বিলোকি জগহিত হর গিরিজা।

সাবর মন্ত্র জাল জিহ্ন সিরিজা।। (১।১৪।৫)

ভগবান শিব দেখলেন যে, কলিযুগে মানুষের স্মৃতি ভ্রমিত, বুদ্ধি বিকল, যথার্থকে সহসা গ্রহণ করতে পারবে না। এইরূপ বিকৃতি দেখে ভগবান শিব জগতের হিত কামনায় 'সাবর মন্ত্র'-এর রচনা করেছিলেন। এই মন্ত্রজাল কিরূপ?

অনমিল আখর অরথ ন জাপূ।

প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপূ। *(১।১৪।৬)*

'**অনমিল আখর**'-এতে অক্ষরগুলির সঙ্গতি নেই, অর্থেরও বিধান নেই এবং জপ করার ক্রমও নেই। মন্ত্রজাল এইরূপ। তবে তো নিরর্থক হওয়া উচিত। কিন্তু নিরর্থক নয়-'**প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপূ।**' -শিব ঠাকুরের কৃপা-প্রসাদ-এ যদি কোথাও প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, কল্যাণ করার ক্ষমতা আছে, তবে তা সাবর মন্ত্রেই আছে। যাতে অক্ষরগুলির মধ্যে সঙ্গতি নেই, অর্থেরও বিধান নেই এবং জপেরও ক্রম নেই। একথা প্রমাণিত যে ব্যাকরণের সঙ্গে সেই সাবর মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। ভাষায় ভুলবশতঃ যদি বড় মাত্রার পরিবর্তে ছোট মাত্রার প্রয়োগ হয়ে যায়, তবে পরীক্ষক লাল দাগ দেন। বিদ্যার্থী অনুতীর্ণ হয়ে যায়। এই সাবর মন্ত্রে তো '**অনমিল আখর**'-অক্ষরগুলির মধ্যে সঙ্গতিই নেই। অতএব অক্ষরগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবেন যিনি অথবা ভাষার জ্ঞাতা, হতে পারে তিনি দশটা ভাষায় জ্ঞাতা কিন্তু ভাষার জোরে এই 'মানস' সম্বন্ধে জানা যাবে না।

প্রশ্ন উঠছে যে, কলিযুগে যদি সাবর মন্ত্র দ্বারাই জগতের কল্যাণ হওয়া সম্ভব, তবে তুলসীদাস কোন গাথা বলতে যাচ্ছেন? তিনি কি এই সাবর মন্ত্র থেকে ভিন্ন কোন নতুন কাহিনী বলতে যাচ্ছেন? না-

সো উমেস মোহি পর অনুকূলা।

করিহিঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা। *(১।১৪।৭)*

সেই সাবর মন্ত্রের রচয়িতা ভগবান শিব আমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন। আমি সেই ''মঙ্গল মূল সাবর মন্ত্র''-এর রচনা করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ রামায়ণ এক সাবর মন্ত্র স্বরূপ, যা ভাষা জ্ঞানের জোরে জানা সম্ভব নয়। সেইজন্য যাঁরা সময়-সময় তর্ক-কুতর্ক করেন, সেটা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিছু না করার থেকে যাঁরা করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ, এই অছিলায় তাঁরা কিছু অধ্যয়ন তো করেন।

রামায়ণ সমাপনের সময় এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, এই সম্বন্ধে কাকে বলা হবে?

ইয়হ্ না কহিঅ সঠহী হঠসীলহি।
জো মন লাই ন সুন হরিলীলহি। *(৭/১২৭/৩)*

এটা শঠকে বলা উচিত নয়, হঠধর্মীকে বলা উচিত নয়। যে মনোযোগ সহকারে শুনবে না তাকেও বলা উচিত নয়।

কহিয় ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি।
জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি।। *(৭/১২৭/৪)*

এটা লোভী, ক্রোধী, কামী ব্যক্তিকে বলা উচিত নয়। এমনকি উপর্যুক্ত বিকারগুলি দ্বারা যুক্ত ইন্দ্রের সমান ঐশ্বর্যশালী নরেশ হলেও তাকে বলা উচিত নয়-

দ্বিজ দ্রোহিহি না সুনাইঅ কবহুঁ।
সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহুঁ।। *(৭/১২৭/৫)*

যে ইন্দ্রের সমান প্রতিভাশালী নরেশ হবে সে তো হাজার-হাজার পণ্ডিত ডেকে পাঠ-শ্রবণ করে নেবে কারণ গ্রন্থটি বাজারে সুলভ। তবে তাকে বলতে বারণ করার অভিপ্রায় কি? কিন্তু হতে পারে কেউ এইভাবে রামায়ণ পাঠ করে মুখস্থ করে, চুলচিরে বুঝেও নিল, তা সত্ত্বেও যা বোঝার এবং বোঝাবার বিষয়, তা থেকে সেই ব্যক্তি তফাতেই থাকবে। এটা মানস; সাবর মন্ত্ররূপে রয়েছে।

কামী, ক্রোধী, লোভী, মোহমুগ্ধকে এই রামায়ণ শোনানো উচিত নয়। ক-জন ব্যক্তির ভিতর এই বিকারগুলি নেই? আপনার ভিতর কি নেই? তবে বলুন কাকে বলা হবে? তবে কি আমাদের জন্য নয় রামায়ণগ্রন্থ? কিন্তু এটা আমার-আপনার জন্যই। হ্যাঁ যেমন-যেমন এই বিকারগুলির প্রকোপ হ্রাস পাবে, তেমন-তেমন রামায়ণ আপনি বুঝতে পারবেন। এর জন্য তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্যই বোঝার একমাত্র মাধ্যম এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যাঁর ভিতর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ-এর প্রাবল্য নেই, তিনিই এর বাস্তবিক জ্ঞাতা।

এই কারণেই অবুঝ ব্যক্তিদের মনে হয় 'মানস'-এ স্ত্রীজাতিকে নিন্দা করা হয়েছে। এরা 'মানস'-এর কতিপয় প্রসঙ্গের উল্লেখ করে থাকে, যেমন ভরত মাতুলালয় থেকে ফিরে, মায়ের কলাকৌশলের কথা বিচার করে বলেছিলেন—**ভূপঁ প্রতীতি তোরি কিমি কীহ্নী। মরন কাল বিধি মতি হরি লীহ্নী।।** ***(২/১৬১/৩)*** রাজা তোমাকে বিশ্বাস কি করে করলেন? না এতে রাজার দোষ নেই। ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি পর্যন্ত নারীজাতিকে বুঝতে পারেননি, আর রাজা তো ধর্মে রত

এবং সরল স্বভাবের ছিলেন। তিনি আর ত্রিয়া-চরিত্র কি করে বুঝতেন?

বিধিহুঁ ন নারি হৃদয় গতি জানী। সকল কপট অঘ অবগুন খানী।।

সরল সুসীল ধরম রত রাউ। সো কিমি জানৈ তীয় সুভাউ।।

(মানস, ২।১৬১।৪-৫)

আরও বলছেন-

কাহ ন পাবকু জারি সক, কা ন সমুদ্র সমাই।

কা না করৈ অবলা প্রবল, কেহি জগ কালু ন খাই।। *(২।৪৭)*

এমন কোন্ বস্তু আছে, যা সমুদ্রে ধরবে না? আগুন ভস্ম করতে পারে না? এমন কোন প্রাণী নেই যে কালের গ্রাস নয় এবং এমন কি কৃত্য আছে, যা অবলা করতে পারে না? অবলা কেন? সাক্ষাৎ কাল নারী, সমুদ্র, অগ্নি! এর চেয়ে বেশী নারী-নিন্দা কি হতে পারে? অতএব একথা বিচারযোগ্য যে সেই অবলা কে? 'মানস'-এ নারীর স্বরূপ কি?

নারীর জন্য অন্যত্র বলছেন-

বুধি বল সীল সত্য সব মীনা।

বনসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা।। (৩।৪৩।৮)

বুদ্ধি, বল, শীল এবং সত্য সবগুলিই মৎস্য তুল্য এবং ক্রিয়া সেই কাঁটার সমান, যাতে চারা লাগিয়ে শিশুরা জলে ফেলে দেয়। যেই মাছ চারা গিলতে চেষ্টা করে, অমনি তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে। এই প্রকার স্ত্রীজাতি বুদ্ধি, বল, শীল, সত্য ইত্যাদির জন্য সাক্ষাৎ কাল। 'মানস'-এ তো এতদূর লেখা হয়েছে যে, ভগবৎ পথে যদি কিছু বাধা রয়েছে, তবে সে হল নারী, অন্য কোন বাধাই নেই-

জপ তপ নেম জলাশ্রয় ঝারী।

হোই গ্রীষম সোষই সব নারী।। (৩।৪৩।২)

জপ, তপ, নিয়ম, ভজন এসবই জলপ্রপাতের মত এবং নারী প্রবল গ্রীষ্ম তুল্য, যে এই সমস্ত ঝরনাগুলিকে শুকিয়ে ফেলে। জপ-তপ, যম-নিয়ম, চিন্তন ইত্যাদিগুলি ভগবৎ পথেরই সহায়ক এতে যদি কিছু বাধা, শিথিলতার কোন প্রক্রিয়া থাকে, তবে সে নারী। ভগবৎ পথের একমাত্র বাধা হল নারী!

নারী যদি ভগবৎ পথে বাধাস্বরূপ, তবে নারীর জন্য ভজনের বিধান থাকা উচিত নয়? বাধা হলে সে নিজে কি ভজনা করবে? যে অন্যকে পতনের পথে নিয়ে যায়, সে নিজে কি করে উদ্ধার হবে? কিন্তু না, নারীর জন্যও পুরুষের সমানই

ভজনের অধিকার আছে-

পুরুষ নপুংসক নারী বা, জীব চরাচর কোই।
সর্বভাব ভজ কপট তজি, মোহি পরম প্রিয় সোই।। *(৭/৮৭ক)*

পুরুষ, নপুংসক, নারী অথবা নর যেই হোক, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান-এইরূপ বলেনি, কারণ-

অখিল বিস্ব ইয়হ্ মোর উপায়া।
সব পর মোহি বরাবরি দায়া।। *(মানস, ৭/৮৬/৭)*

সম্পূর্ণ সৃষ্টিরকর্তা ভগবান, সকলের প্রতি তাঁর সমান দয়াভাব। যে মদ-মায়া ত্যাগ করে ভগবানকে ভজনা করে, সেই তাঁর পরমপ্রিয়। সম্পূর্ণ বিশ্ব, এর অর্থ কি শুধু ভারত? না শুধু ইউরোপ? না, সারা জগৎ! জগতের যে কোন পুরুষ, নপুংসক, নারী অথবা নর যদি সর্বতোভাবে কপট ত্যাগ করে ভজনা করে; ভগবান বলছেন, সে আমার পরম প্রিয় শুধু প্রিয় নয়, পরমপ্রিয়। এই প্রকার মায়েদের জন্যও ভজনার ততটাই বিধান রয়েছে, যতটা আছে পুরুষদের জন্য। আগে তো নারীর জন্য ভজনার বিধান থাকা উচিত ছিল না, কারণ তারাই তো সাক্ষাৎ বাধা স্বরূপা কিন্তু সেই মহাপুরুষের অনুসারে বিধানও সমান তবে তো অন্ততঃ নারীদের জন্য ভজনে কোন বাধা থাকা উচিত নয় '**মোহ ন নারি নারি কেঁ রূপা।**' *(মানস,৭/১১৫/২)* কিন্তু বাধাও সমানই দেখা যায় কারণ জপ-তপ নিয়ম স্ত্রীলোক করুক অথবা পুরুষ, তা শুকিয়ে ফেলে নারীই। বাস্তবে দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের জন্য ভজনে বেশী বাধা। পুরুষ ভজনা করলে তার ভজনাপথে বাধা কিছু কম আসে, কারণ যদি স্ত্রীলোক পুরুষের ভজনাপথে বাধা সৃষ্টি করে তবে তা মাত্র হাব-ভাব দ্বারা সাধকের বুদ্ধি বিকৃত করে। সাধক স্বয়ং বিচলিত হলে তবেই নষ্ট হয় কিন্তু পুরুষদের মধ্যে বলাৎকারের একটা দোষ বেশী আছে, যা স্ত্রীলোকের মধ্যে নেই। বহু অটুট শ্রদ্ধাশীলা এইসব অভাগাদের জন্য নিজেদের ভজন-পথ থেকে চ্যুত হয়ে যায়। সেইজন্য পূর্ব মনীষীগণ মায়েদের জন্য ঘরে থেকেই ভজনা করার বিধান বলে গেছেন। তাদের পরিবারের সংরক্ষণে থেকে অনবরত চিন্তনে সময় দেওয়া উচিত। গৃহত্যাগ করেও তাদের জন্য ভজনের বিধান আছে কিন্তু যখন ক্ষমতা লাভ হবে তখনই। যখন তাঁরা আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা লাভ করবেন, তখনই তাঁদের গৃহত্যাগ করা উচিত। সীতা, নর্মদা, অনুসূইয়া, মীরা, শবরী ইত্যাদি মহিলারা ভগবানকে এত বেশী অনুকূল করে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের সম্মুখে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু ক্ষতি করতে পারেনি।

মীরা জীবনে বড়-বড় উপদ্রবের সম্মুখীন হয়েছিলেন রাণা সাঁপ পাঠিয়েছিল; বিষ পাঠিয়েছিল, কিন্তু এমন একটা সময় এসেছিল যখন মীরা রাণাকে আহ্বান করে বলে উঠেছিলেন-

রাণোজী! ম্যায় তো গিরিধর রঙ্গওয়া রাতী।
আউরোঁ কে পিয়া পরদেশ বসত হ্যাঁয়, লিখ লিখ ভেজত পাতী।
ম্হারে পিয়া ম্হারে হিয়ে বসত হ্যাঁয়, নহি কহুঁ আতী জাতী।।

এতদিন তো বাধা দিলে, কিন্তু ভগবান এরপর ক্ষমা করবেন না। রাণাজী দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন, তারপর আর তাঁকে কোন কষ্ট দেননি। অতএব যে নারীর কথা গোস্বামী বার-বার বলছেন, উপর্যুক্ত নারীরা সে নারী নন। তবে কোন্ নারীকে বলেছেন-

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ, প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিহ্ন মহঁ অতি দারুন দুখদ, মায়ারূপী নারি।। *(মানস, ৩/৪৩)*

কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদিগুলি মোহ-এর ধারা, যার মধ্যে অত্যন্ত দুখদায়ী মায়ারূপী নারী বিদ্যমান। মায়াই নারী। স্ত্রীলোক ভজনা করলেও মায়াই বাধকের কাজ করে। পুরুষ ভজনা করলে তখনও মায়াই বাধক। মায়া কি বস্তু? ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে পূর্ণ তরঙ্গ মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলির সংসার। না কি সংসার-সাগরে কোথাও জলপূর্ণ আছে যেখানে ডুবে যাবে। মায়ার ক্ষেত্র বিস্তৃত, যা কিছু দেখা-শোনা যায়, সব মায়া; কিন্তু আমার-আপনার উপর ততটাই প্রভাব ফেলতে পারে যতটা আমাদের চিত্তের প্রবৃত্তিগুলি বিকৃত অথবা উন্নত। কারণ মায়া যে মাধ্যম দ্বারা পুরুষের উপর আক্রমণ করে, সে মাধ্যম হল 'চিত্ত'। যে মহাপুরুষ এই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করেছেন, তাঁর উপর থেকে মায়ার প্রভাব সদা-সর্বদার জন্য সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুরুষ মায়ামুক্ত যখনই হন তখনই তিনি দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিত হন।

এই প্রকার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে 'চিত্তবৃত্তিই' নারী। ভজনা রত সাধকের 'চিত্তবৃত্তি' যখন বিষয়োন্মুখ হয়, সঙ্গদোষের ফলস্বরূপ সাধনা ছেড়ে কোন ইন্দ্রিয়ের পিছনে ধাবমান হয়, বিষয় চিন্তনে মগ্ন হয়, সেই সময়-

দীপ সিখা সম জুবতি তন, মন জনি হোসি পতঙ্গ।। *(মানস, ৩/৪৬খ)*

সেই সময় এই চিত্তবৃত্তি তরুণ, দীপ-শিখার ন্যায় এবং নিশ্চিত পুড়িয়ে ফেলে। আজ নয়, এখানে নয়, কিন্তু অবসর পেলেই অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে পতিত করে দেয়-'**শৃঙ্গী কী ভৃঙ্গী করি ডারী, পরাশর কে উদর বিদার।।**' যখন এই চিত্তবৃত্তি

কোন বিষয় নিয়ে তারই চিন্তনে বিভোর হয় এবং ভজনের নিরন্তরতা অবরুদ্ধ হয়, তখন '**দীপশিখা**' চিত্ত, পূর্ণ তেজ সবকিছু ভস্ম করে দেয়। সেই সময় বুদ্ধি, বল, ভজনা এবং যোগ-যুক্তি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। '**মন জনি হোসি পতঙ্গ**'-ওরে মন! তুই পতঙ্গ হোস না। কাম, ক্রোধ, মদ ইত্যাদি ত্যাগ করে '**করহি সদা সৎসঙ্গ**'-এই দীপশিখা থেকে চিত্তবৃত্তিকে যদি রক্ষা করতে চান তবে সর্বদা সৎসঙ্গ করুন।

সৎসঙ্গ দুই প্রকারের, এক সৎসঙ্গ তো তা যা আপনি মহাপুরুষের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেন। সৎসঙ্গের আরেক প্রকার সূক্ষ্ম এবং ক্রিয়াত্মক, যা চিন্তন-ধ্যান এবং সমাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়; কারণ '**সত্য বস্তু হ্যায় আত্মা, মিথ্যা জগত পসার**'-সত্য বস্তু তো আত্মা, এর সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ। চিত্তকে সবদিক থেকে গুটিয়ে আত্মার সঙ্গতি করা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা, সেই আত্মার সঙ্গে থাকাটাই বাস্তবিক সৎসঙ্গ। অতএব চিত্তকে সবদিক থেকে একত্র করে সেই চরণে নিযুক্ত করলেই ''দীপশিখা'' থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

'**দীপ সিখা সম জুবতি তন**' ***(মানস, ৩/৪৬খ)*** —যদি সাংসারিক যুবতীদের বিষয়ে বলা হত তবে পিতার নিকট প্রথম পুত্রী তো যুবতীরই সমান। ভাইয়ের কাছে বোন যুবতীই, সে তো কোথাও আঁচড়ে দেয় না? কত স্নেহ কত আন্তরিকতা থাকে প্রাণ থাকতে স্নেহ সম্বন্ধ সমাপ্ত হয় না। প্রথম পুত্রের জন্মের সময় মাতাও যুবতীই থাকে। কিন্তু সে পুত্রকে পুড়িয়ে মারে না? মাতৃস্নেহ আজীবন থাকে এবং মায়ের মৃত্যুর পরেও পুত্র তা ভুলতে পারে না। গত পরশুই এক বৃদ্ধলোককে বিছা কামড়েছিল। যন্ত্রণাতে কাতর হয়ে, 'মা গো! মা-গো!' বলে কোঁকাচ্ছিল। একদম বৃদ্ধ ছিল কিন্তু মাতৃ-স্নেহের স্বাদ আজও ভুলতে পারেনি। এই দৃষ্টিতে যুবতীদের দেহ 'দীপশিখা সম' কোথায়! বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তি যখন কোন বিষয়ের তরঙ্গ গ্রহণ করে তাতে ওতপ্রোত হয়, তখন সে যুবতীর ন্যায় পূর্ণ তেজে, বিকরাল রূপ ধারণ করে এবং দীপশিখা যেমন পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারে, তেমনি মানবকে (স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই) ভস্ম করে দেয়। এইরূপ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ। গোস্বামীজী যে নারী থেকে আত্মরক্ষা করার উপর জোর দিয়েছেন, তা আন্তরিক। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

যতদিন এই চিত্তবৃদ্ধি ক্রিয়াশীল ততদিন '**অবগুণ আঠ সদা উর রহহীঁ।**' ***(মানস, ৬/১৫/২)*** আজ কদাচিৎ মনে হচ্ছে যেন মন কেন্দ্রিত হয়েছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যজন সুচারু রূপে হচ্ছে কিন্তু প্রারম্ভে মনের উপরের স্তরগুলিই

কেন্দ্রিত থাকে, নীচের স্তরগুলিতে তো সংস্কার ভর্তি আছে। যখনই সংস্কার গুলির অভ্যুদয় হবে, চিত্তবৃত্তি যুবা হয়ে যাবে। সেই সময় দুঃসাহস, অসত্য, চঞ্চলতা, কপট, ভয়, ছল-ছদ্ম, অবিবেক, মলিনতা এবং কঠোরতা ইত্যাদি, বিকার চিত্তবৃত্তিতে বিদ্যমান থাকে।

এই সন্দর্ভেই এই বহুচর্চিত চৌপাঈ-এর উপর বিচার করুন।

ঢোল গঁওয়ার সূদ্র পসু নারী।
সকল তাড়না কে অধিকারী।। *(মানস, ৫।৫৮।৬)*

'তাড়না কে অধিকারী'-সাধারণ ব্যক্তিরা এর অর্থ এই মনে করে যে, সকলেই তাহলে লাঠি জুতো অথবা মার খাওয়ার অধিকারী। এটা একটা ভ্রান্তি। 'তাড়ন'-এর তাৎপর্য হল বুঝে চলা। প্রায়ই লোকে বলে থাকে যে, "ভাই আমি তো আগেই বুঝে গিয়েছিলাম যে, মেঘের ভরসা নেই, বীজ ছিটিয়ো না।" "আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে কি বলবে?" ইত্যাদি। ঢোল 'তাড়ন'-এর বস্তু।

'তাড়ন'-এর অর্থ পেটা যদি মনে করেন তবে দিন কাউকে ঢোল, পিটুক সে। আপনিই বলবেন, ভাই! থাকতে দাও, মাথা ধরে গেছে। রেখে দাও। প্রচলিত অর্থে যদিও সে তাড়নই করবে, কিন্তু ভাল কারও লাগবে না। কিন্তু বাস্তবে যদি কোন শিল্পী ঢোল বাদনে দক্ষ হয়, কীভাবে বাজাতে হয় জানে তবে 'কিটধিন, তাতা ধিন্না দ্রুতলয়ে বাজাতে বাজাতে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে, আসর জমে উঠবে।' এই প্রকার 'তাড়ন'-এর আশয় হল জ্ঞান, অথবা বিশেষজ্ঞ।

গেঁয়ো ব্যক্তিকে দিয়ে কাজে করানো তাকে সৎপথে চালানোও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে মারধর করেও বশে আনা যেতে পারে না। হঠাৎ কোন কাজ করার জন্য সে তৈরীই হতে চায় না। যদি আপনি তাকে বলেন যে, সভ্য লোকেদের মত কেন থাক না, অমনি বলবে, নিজের সভ্যতা নিজের কাছেই রাখুন। কিন্তু যিনি তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে অবহিত, মনোবিশেষজ্ঞ, তিনি ক্রমশঃ তাদের উত্থান করতে-করতে সুযোগ্য করে তুলবেন। গোঁয়ারদের তাড়ন, পরখ করাও অধিকারীর ক্ষেত্রের বিষয়। ডাকাত অঙ্গুলিমাল এত ক্রূর এবং অসভ্য ছিল যে, মানব আঙ্গুলের মালা ব্যবহার করত কিন্তু গৌতম বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর সে দানব থেকে মানবে পরিণত হয়েছিল। ক্রুর, গোঁয়ার ছিল কিন্তু ভদ্র হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধ লাঠি দিয়ে প্রহার করেননি তাকে, অপিতু সেই ক্ষেত্রের তাড়ক ছিলেন, বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেই কৌশল প্রয়োগ করে তিনি অঙ্গুলিমালকে সৎপথে চালিত করেছিলেন।

এই প্রকার শূদ্রও অধিকারীদের তাড়নের বিষয়। শূদ্রের তাৎপর্য চামার অথবা হরিজন নয়, যেমন বর্তমানে প্রচলিত আছে। আধ্যাত্মিক জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ এবং শূদ্র ক্রমশঃ অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম এবং অধম সাধকের চারটি ভেদ মাত্র। শূদ্রের অর্থ হল-খুব ছোট, তুচ্ছ। মনে করুন আমরা ছ-ঘণ্টা ভজনা করি কিন্তু সাংসারিক বিষয়গুলিতে অনুরক্ত মন হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় এবং দশ মিনিটও আমরা মনকে একাগ্র করতে পারি না। তাহলেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, চিন্তন-পথে আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধনের পথে আমরা তুচ্ছ, শূদ্র এবং অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞকে ক্রমশঃ উন্নত করে তাকে বিজ্ঞ করে তোলা তাড়ক এবং বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রের ব্যাপার। যিনি স্বয়ং বিজ্ঞ তিনিই অন্যকে বিজ্ঞ বানাতে পারেন কারণ তিনি সেই পথ দিয়ে পার হয়েছেন, সেই পথের উত্থান-পতনের তিনি তাড়ক, পরখ করে দেখেছেন। এই সন্দর্ভে একটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক রাজার চারটি কুমার শূদ্র প্রকৃতির ছিল। বিদ্বানগণ বহু চেষ্টা করেও শিক্ষার প্রতি রুচি তাদের জাগাতে পারেননি। রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে, রাত-দিন হেসে খেলে বেড়ায় যে গোঁয়ার ছেলেরা তাদের শিক্ষিত করে তুলতে কোন বিদ্বান পারবেন কি? বিদ্বান তো হাজার-হাজার ছিলেন কিন্তু এই চেষ্টা মাত্র একজন বিদ্বানই করতে রাজি হয়েছিলেন কারণ তিনি মূর্খ, গোঁয়ার, অল্পজ্ঞদের উন্নত করতে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি প্রথমে তাদের ছোট ছোট গল্প বলতে শুরু করেছিলেন। কুমারদের মন বসতে শুরু করেছিল। তাদের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল, তারা পরের ঘটনাগুলি শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। শুনতে-শুনতে একদিন তারা পূর্ণ বিদ্বানে পরিণত হয়েছিল। এইরূপ কাহিনীরই সঙ্কলন বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'-এ দেখা যায়। এর মধ্যে রীতি-নীতি, রাজনীতি, লোকনীতি, ভেদনীতি, ইত্যাদির অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। মারধোর করে এই ধরণের কুমারদের উন্নত করা সম্ভব ছিল না। অতএব গোঁয়ার এবং শূদ্রদের উদাত্তীকরণও বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রের বিষয়।

এই ক্রম অনুসারে পশুরাও তাড়নের অধিকারী, হাতী তো পশু। তাড়নের অর্থ যদি প্রহার হয়ে থাকে তবে দিন এক লাঠির বাড়ি সে ছাড়বে না। চিরে ফেলবে; আপনি কতও শক্তিশালী হোন না কেন। পরন্তু যদি কেউ কলা-কুশল হয় তবে সে "চৈধত, অগত, মল" বলে তাকে ওঠাবে, বসাবে, আগে পেছনে নিয়ে যাবে, ঘোরাবে, দু'পায়ে দাঁড় করাবে এবং তাকে দিয়ে মাটি থেকে সুঁচও তোলা করাবে। সাধারণ পালোয়ান এটা করতে পারে, আমি আপনি করতে পারব না। কেন? কারণ

সে তার ভাষা জানে। মহিষ দুধের পশু। যদি পশুরা তাড়নের অধিকারী তবে দিন লাঠির দু'ঘা। আজ যদি পাঁচ কিলো দুধ দিচ্ছে তবে কাল থেকে তিন কিলোই দেবে। কিন্তু গোয়ালা তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত, সেইজন্য খইল-ভূসি খাইয়ে, আদর করে স্নান করিয়ে পাঁচ কিলো থেকে বাড়িয়ে সাত কিলো করে নেবে। এই ধরনের গোওয়ালা এদের তাড়ক হয়। এই পশু তার ক্ষেত্রের বস্তু। সকলের ক্ষেত্রের বস্তু নয়। অনাধিকারীদের খুঁটিতে তো তারা দুর্বল হয়ে যায়।

ঠিক এই প্রকারই 'মায়া রূপী নারি'। পূর্বোক্ত প্রকরণ অনুসারে মায়ার ক্ষেত্র তো বিস্তৃত **'গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাই।।' (মানস, ৩।১৪।৩)** যা কিছু দেখা-শোনা যায়, সবই মায়া কিন্তু মানুষের উপর তার ততটাই প্রভাব পড়ে, যতটা চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রিত অথবা বিকৃত। জনসাধারণের উপর মায়ার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়ে কিন্তু যোগীদের উপর এর প্রভাব কম পড়ে, কারণ চিন্তনে কেন্দ্রিত থাকার জন্য তাঁদের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ার পথে এগিয়ে যায়। মায়া যে মাধ্যমের উপর অঙ্কিত হয়ে আক্রমণ করে তা হল চিত্তবৃত্তি। অতএব চিত্তবৃত্তিই নারী এখন এই বিকৃত চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, শনৈঃ-শনৈঃ একে উন্নত করে চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রিত করা এবং 'মায়া রূপী নারী'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত করা সদ্‌গুরুর ক্ষেত্রের বিষয়, কারণ তিনি ক্রমশঃ সেই পথে চলে মুক্ত হয়েছেন। আরম্ভিক অবস্থা থেকে ক্রমশঃ চলে তিনি সব স্তর পার করে সম্পূর্ণ নিরোধ করেছেন। সেইজন্য তিনি এই ক্ষেত্রের বিশেষ-জ্ঞাতা যিনিই এই চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করেছেন, সদ্‌গুরুর কৃপাতেই করেছেন।

গুর বিনু ভবনিধি তরই না কোঈ।
জৌঁ বিরঞ্চি সঙ্কর সম হোঈ।। *(মানস, ৭।৯২।৫)*
করনধার সদ্‌গুর দৃঢ় নাওয়া।
দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাওয়া।। *(মানস, ৭।৪৩।৮)*

তাঁর কৃপাতেই এই মায়ারূপ নারীর অন্ত হওয়া সম্ভব। সদ্‌গুরুই সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হন, সাধক তাঁর সংরক্ষণে চলে মায়ারূপ নারীর প্রভাব থেকে মুক্ত হন। ভজনা তো সাধকই করে কিন্তু সাধক যে মুক্ত হয়, তা সেই সদ্‌গুরুরই কৃপা। লাঙ্গলের ভার গরুর কাঁধের উপরই থাকে। কিন্তু বলদ চাষ করে না, কৃষক করে। লাঙ্গলের পিছনে থেকে সে বলদদের সঠিক দিশাতে সঞ্চালিত করে। এই প্রকারই সাধনার সব ভার সাধকের উপর থাকে, কিন্তু তার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয় তা সেই প্রেরকেরই কৃপা। অন্যথা সাধক বুঝবে কি করে যে, সে সঠিক পথে এগুচ্ছে অথবা ভুল পথে যাচ্ছে।

'করত করাওত আপ হ্যাঁয়, পলটূ-পলটূ শোর।' করেন-করান স্বয়ং সদ্‌গুরু কিন্তু নাম তার হয় যাকে দিয়ে করান। সাধক নিজের পরাক্রমে নয় পরন্তু, তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর কৃপাতে চিত্তবৃত্তিরূপ নারী অথবা মায়ারূপ নারীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়।

সূচনা- প্রেরকের রূপে সদ্‌গুরু এবং ভগবান একে অন্যের পূরক।

মহাশয়! এখন তো আপনি এই বিষয় বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। বলুন- ভগবৎ পথে বাধা কে?

শ্রোতাগণ-"মহারাজজী, ভজনাকালে পুরুষের জন্য নারী এবং নারীর জন্য পুরুষ বাধা।"

মহারাজজী-তবে তো আপনি যেখানে ছিলেন এখনও সেইখানেই আছেন। দেখুন দেহ তো একটা বাসস্থান মাত্র। আত্মা স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, স্ত্রী লিঙ্গ, পুংলিঙ্গ কিছুই নয়। আত্মা নির্লিপ্ত। স্ত্রী দেহে ভজনা করা হোক অথবা পুরুষ দেহে, বাধা দেয় চিত্তবৃত্তিই। চিত্ত বৃত্তিই নারী। চিত্তবৃত্তি এবং বিষয়ের সংযোগ দ্বারা ভাবগুলির চিত্রণ হয়। সঙ্গে-সঙ্গে তার ক্রিয়া দেহেও ফুটে ওঠে। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে শুধু কামের সৃজন হয়, কিন্তু ভগবৎ পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মায়ার শত-শত ধারা বিদ্যমান। একমাত্র কামই তো বাধা নয়, হ্যাঁ একটা অঙ্গ অবশ্যই। মোহ একটা পৃথক শত্রু, তৃষ্ণা একটা পৃথক শত্রু, এসবই মায়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সামান্য নারীর মধ্যে তো সবগুলির অভিব্যক্তি হয় না। অতএব শুধু স্ত্রী-ই মায়া কি করে হবে? স্ত্রীর পক্ষে পুরুষই সম্পূর্ণ মায়া কি করে হতে পারে? এদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক থেকে অনন্ত বিকারের মধ্যে শুধু একটা বিকার 'কাম'-এরই ভয় রয়েছে। অন্যান্য বিকার তো নিজের জায়গাতে রয়েছেই। অতএব চিত্তবৃত্তিই নারী, মায়া। পুরুষও মায়া নয়, এবং স্ত্রীও মায়া নয়। চিত্তের প্রবৃত্তিই মায়া।

এই প্রবৃত্তির নিরোধের প্রশ্ন যতদূর, এটা তাড়ন-এর ক্ষেত্রের ব্যাপার অর্থাৎ যে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ এর থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন, যাঁর চিত্তবৃত্তি বাধক নয় বিলীন হয়ে গেছে, এইরূপ তপোধনই এর তাড়ক, বিশেষজ্ঞ। নারীর উপর আধিপত্য আছে তাঁর এবং তিনিই এই নারী থেকে আপনাকে মুক্ত করতে সমর্থ। গীতা অনুসারে একে নিরুদ্ধ করার জন্য তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্য, নির্জনে বাস, যৌগিক ক্রিয়া এবং চিন্তন পরম আবশ্যক।

।।ওঁ।।

নারীদের সমান অধিকার

প্রশ্ন- মহারাজ জী ! বর্তমানে নারীদের সমান অধিকারের চর্চা খুব হচ্ছে। এটা কতটা ঠিক ?

উত্তর- হ্যাঁ, চর্চা তো খুব হচ্ছে। মহিলাদের একটা সভা হয়েছিল। অধ্যক্ষ ভাষণ দিচ্ছিলেন যে, মহিলাদের অধিকার পুরুষের সমান রয়েছে। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের চলা উচিত। শুনেই এক আধুনিকা প্রশ্ন করেছিল যে, আমার স্বামী তো আমার থেকে একটু বেশীই লম্বা। কাঁধে কাঁধ মেলাবো কী করে ? অধ্যক্ষ মহিলা উত্তর দিয়েছিলেন- দেখ বোন ! তুমি উঁচু গোড়ালি দেখে জুতো কিনবে এইভাবে সমান অধিকারের প্রয়াস তো খুব চলছে। শুধু সমান অধিকার কেন, কিছু-কিছু মহিলা তো পুরুষদের চাকর পর্যন্ত করে রাখতে চায়। কিছু দিন আগে একটা পত্রিকাতে 'কার্টুন' প্রকাশিত হয়েছিল-আধুনিক পরিবেশে পালিত একটি মেয়ে নিজের 'রিং লীডার'কে বলছে যে, আমার একজন এমন চাকরের প্রয়োজন আছে যে খাবার তৈরী, মালিশ, ঘরদোর পরিষ্কার করবে, কাপড় কাচবে, আমি রেগে গেলে আমার থাপ্পড়ও যাতে সহ্য করে নেয়। রিং লিডার জবাব দিয়েছিল- এমন চাকর তো বিবাহের পরই পাওয়া যাবে।

মহিলারাই এই পাগলামি করছেন, এমন কথাও নয়। পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত পুরুষদের একটা বর্গ এই দাবীকে নারীদের জন্য বলে নিজেদেরকে তাদের হিতৈষী প্রমাণিত করতে চাইছে। এক ভারতীয় যুবকের পাশ্চাত্য সভ্যতা এত বেশী পছন্দ হয়েছিল যে দেশ, পরিবারের সদস্যরা অসভ্য এবং গোঁয়ার মনে হচ্ছিল। স্ত্রীকে ঘোমটা খুলে নিজের সঙ্গে 'নাচতে' বলেছিল কিন্তু দেশীয় পরিবেশে পালিত সেই মহিলা তা করতে পারেননি। যুবকটি ভেবেছিল ভারতবর্ষে থাকলে জীবনটাকে পুরো উপভোগ করা সম্ভব নয়। অতএব সে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। কয়েক বছর সেখানে কাটিয়ে জীবন সফল করেছিল। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে নতুন সভ্যতার রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। পকেট হাল্কা হয়েছিল যখন তখন ভেবেছিল এবার দেশে ফেরা যাক দেখি সেখানে কত উন্নতি হয়েছে। বিদেশে ভারতীয় মহাত্মাদের খুব সুনাম শুনেছিল। তাঁদের দর্শন লাভেরও আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল।

ভারতের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে-সঙ্গে দেখেছিল যে, বহুলোক প্রয়াগে

কুম্ভমেলায় যাচ্ছে। যুবকটি চিন্তা করেছিল যে, মেলাতে মহাত্মাদের দর্শনও পাওয়া যাবে। অতএব সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মাঘ মেলাতে গিয়েছিল। ত্রিবেণীর তীর মহাত্মাদের ক্যাম্প ও ধুনিতে ভর্তি ছিল। যুবকটি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরতে-ঘুরতে এক মহাত্মার কাছে পৌঁছেছিল। দু'ইঞ্চি নুয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করে বলেছিল মহাত্মাজী! আমাকেও কিছু উপদেশ দিন। মহাত্মাজী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে চিন্তা করেছিলেন একে বলিই বা কি অল্প হেসে বলেছিলেন-রামায়ণ পাঠ কোরো। যুবকটি বলেছিল বাহ্ মহারাজ! আপনি তো বিচিত্র উপদেশ দিলেন। বিশ্বে এমন কোন শব্দ ভাণ্ডার নেই যা আমার মুখস্থ নেই। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যকারের পুঁথি আমার মুখস্থ করা আছে। রামায়ণ তো অতি তুচ্ছ জিনিষ। ব্যস হয়ে গেল কল্যাণ। আপনি তো ভাল উপদেশ দিলেন। পুনরায় দু'ইঞ্চি নুয়ে হাত জোড় করেছিল। মেলা দেখে ঘরে ফেরার জন্য ট্রেন ধরেছিল, স্টেশনে নেমে কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে দেখতে পায়নি।

তখন সে প্রত্যেক বগিতে 'পুষ্প-পুষ্প' ডেকে অস্থির হয়েছিল কিন্তু পুষ্প সেখানে থাকলে তবে তো জবাব দিত। তার সঙ্গে তো এলাহাবাদ স্টেশনেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মাঘ মেলায় ভীড় হয়ই এত বেশী যে, সেই ভীড়ে ধাক্কা খেয়ে ট্রেন পর্যন্ত পৌঁছানো সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যুবকটি তো বাঁদরের মত লাফিয়ে কোন রকমে বগিতে চেপেছিল। তার স্ত্রী চাপতে পারেনি। সেই ভীড়ে ধাক্কা খেতে সে ঢোকেনি। ওদিকে যুবকটি নিজের স্টেশনে 'পুষ্প পুষ্প' জপ করছিল। ভাবছিল স্ত্রী তো হাত ছাড়া হলো। আমেরিকা ইত্যাদি পশ্চিম দেশগুলিতে স্ত্রী হারানোর মানে অন্য কিছু হয়। স্ত্রী যদি হারিয়ে যায়, তবে ফিরে আসে না, অন্য আরেকজনকে বিবাহ করে, সেখানে ভাল না লাগলে তৃতীয় জায়গায় তাকে দেখা যায়। এবং ভূতপূর্ব পতি মহোদয় আপসোসই করতে থাকে। এই আশঙ্কাতে গ্রস্ত হয়ে সেই যুবকটি প্রত্যেক বগিতে স্ত্রীকে নাম ধরে ডেকেছিল তাকে খুঁজে না পেয়ে রেলওয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে SDE করেছিল (Station Diary Enquiry) সব কথা খুলে বলেছিল, তারপর সেই শীতেও গলদঘর্ম হয়ে সে পুনরায় এলাহাবাদগামী ট্রেন ধরার জন্য ছুটতে শুরু করেছিল। কারণ ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল।

ছুটতে-ছুটতে সে প্রয়াগের সেই মহাত্মাকে কমণ্ডলু হাতে দেখতে পেয়েছিল। তিনি ট্রেন থেকে নেমে ধীরে-ধীরে স্টেশনের দিকে এগুচ্ছিলেন। যুবকটি তাঁকে চিনতে পেরে প্রণাম করেছিল এবং বলেছিল- 'মহাত্মাজী, আমার ওয়াইফ হারিয়ে

গেছে।' মহাত্মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"বাছা! ওয়াইফ কাকে বলে?" যুবকটি বলেছিল "মহাত্মাজী! স্ত্রী হারিয়ে গেছে। কি করব?" মহাত্মা বলেছিলেন-"বৎস রামায়ণ পাঠ কর।" যুবকটি বিরক্ত হয়ে বলেছিল-"বাহ! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল আর আপনি রামায়ণ-রামায়ণ করছেন।" মহাত্মা তাকে বুঝিয়েছিলেন-"বাছা যদি তুমি রামায়ণ পাঠ করে থাকতে তবে আজ এই দুর্দশা হত না। রামায়ণে আছে-'**প্রিয়া চঢ়াই চঢ়ে রঘুরাঈ**'। *(মানস, ২।১৫০।৩)*-ভগবান রাম বনবাসকালে নৌকাতে চাপার সময় মাতা সীতার হাত ধরে আগে তাঁকে নৌকোতে বসিয়েছিলেন তারপর স্বয়ং চেপেছিলেন। স্ত্রীলোকের কর্তব্য ঘরের ভেতরে পুরুষদের সেবা করা এবং ঘরের বাইরে স্ত্রীলোকের সেবা, দেখাশুনা করা পুরুষদের কর্তব্য। তুমি তো বাঁদরের মত ট্রেনে চেপে গেলে। সে অবলা এত ভীড়ে কী করে চাপত। তুমি একা কেন চাপলে?" যুবকটি বলেছিল-"মহাত্মাজী! বিদেশে স্ত্রীদের অধিকার পুরুষদের সমান। আমি ভেবেছিলাম ট্রেনে যেভাবে আমি চেপে গেছি, সেইভাবে পুষ্পও চেপে যাবে। সেইজন্য আমি তার অপেক্ষা করিনি। ভেবেছিলাম সেও চেপে গেছে নিশ্চয়। মহারাজজী! আপনার রামায়ণ তো সত্যি-সত্যি পঠনীয়। আজ থেকে আমি অবশ্যই রামায়ণ পাঠ করব। কিন্তু মহারাজজী দয়া করুন। তাকে পাব কি না?" মহাত্মা বলেছিলেন-"আগে পাঠ তো কর সে আর গেছে কোথায়" যুবকটি সেইদিন থেকেই পাঠ করতে শুরু করেছিল তার স্ত্রী আর কোথায় যেত। দু'দিন পর যখন ভীড় কমেছিল তখন ট্রেনে জায়গা পেয়েই সেও চলে এসেছিল। তখন যুবকটির চোখ ফুটেছিল এবং সে রামায়ণের শিক্ষাগুলি মেনে চলতে শুরু করেছিল। এমনিতেও বিশ্বে রামায়ণ মান্যতা প্রাপ্ত পরম কল্যাণকারক গ্রন্থ। এখানে তো সমান অধিকারের সন্দর্ভে তার দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের আধুনিকা করার পিছনে পুরুষদেরও কম দোষ নেই।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের মধ্যে সমান অধিকারের প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে দেখা যায়। এক দম্পতি সংযোগবশতঃ বিএ পাশ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী, উভয়েই সমান শিক্ষিত। সমান পদ প্রাপ্ত করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে থাকা-খাওয়া চলত একদিন সকালবেলা স্ত্রী, 'বেড টী' দিয়েছিলেন স্বামীকে, তিনি সেদিন চায়ে চিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কর্তা চায়ে চুমুক দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন কাপটা তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে তৈরী করা চায়ের অপমান দেখে স্ত্রী রাগে লাল হয়ে ভিতরে গিয়েছিলেন এবং পুরো টী সেটটা তুলে

মাটিতে আছড়ে দিয়েছিলেন। তা দেখে কর্তার সব রাগ জল হয়ে গিয়েছিল বলেছিলেন-আরে, আরে! এ কি করছ? সব কাপ প্লেট ভেঙ্গে ফেললে কেন? স্ত্রী বলেছিলেন-তুমি কেন ভাঙ্গলে? কর্তা সাফাই গেয়েছিলেন যে, চায়ে চিনি ছিল না। স্ত্রী বলেছিলেন-তা হলে তুমি খেতে না। কাপ ছুঁড়ে ফেলার অধিকার যদি তোমার থাকে, তবে আমারও আছে, তুমিই একাই বি.এ. পাশ নও আমিও বি.এ. পাশ করেছি।

কথা কাটাকাটি বেড়েই গিয়েছিল। দু পক্ষেরই স্ত্রী-পুরুষ জমা হয়েছিল। বিবাদের সমাধান না দেখে একজন মহাত্মার কাছে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। সকলেই সেই মহাত্মার কাছে গিয়েছিল। নিজের নিজের মত জানিয়েছিল। মহাত্মাটি বলেছিলেন যে, সমান অধিকার অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু মা-বোনেরা এর জন্য তো তোমাদের এক পা আরও এগোতে হবে। দেখ, তোমরা ন'মাস ধরে পেটে শিশুর ভার বহন কর। বমিও কর। প্রসবকালে কখনও-কখনও মৃত্যুও হয়। মায়েদের অসহ্য কষ্ট পেতে হয়। **'জৌঁ জুবতী অনুভবতি প্রসব অতি দারুন দুখ উপজৈ।'** ***(বিনয় পত্রিকা, ৯৯)'*** দারুণ দুঃখ পায়। যদি সমান অধিকার আছে তবে এই দুঃখ একা একা কেন ভোগ কর? পতিদেবতাকে বলবে যে, সাড়ে চার মাস পর্যন্ত এই কষ্টে তার ভাগ তিনি স্বয়ং বহন করুন। কাপ তো তুমি একটার পরিবর্তে ছটা ভেঙ্গে ফেললে! কিন্তু এটা কি করে ভাগ করবে? ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে কেউ কি করে ফের বদল করবে?

হ্যাঁ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সমান অধিকারের প্রশ্ন যতদূর, ভারতবর্ষে সদৈব সমান অধিকার ছিল। মাতা পার্বতীকে শিবের অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। অর্ধাঙ্গিনীর তাৎপর্য হল সমান অধিকার। ভারতীয় দর্শনে মহিলাদের পুরুষের সমান অধিকার সদৈব ছিল এবং আছে। তফাৎ এতটাই রয়েছে ঘরের বাইরের কাজ পুরুষদের এবং ঘরের ভিতরের ব্যবস্থা মহিলাদের কর্তব্য নির্ধারিত করা হয়েছে। ধন সংগ্রহ, বস্তু সংগ্রহের ভার পুরুষদের উপর দেওয়া হয়েছে এবং সংগ্রহীত বস্তুর দেখা-শোনার দায়িত্ব, সুব্যবস্থা এবং সদুপযোগ করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য বলে নির্ধারিত করা হয়েছে কারণ ঘরের বাইরে থেকে ধনোপার্জন করা স্ত্রী-প্রকৃতির প্রতিকূল। মাসিক ধর্ম অথবা গর্ভাবস্থা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের সময় তাদের বাধা দেয়। স্ত্রীলোক বাইরে বেরিয়ে চাকরী করলে উক্ত সময়ে কাজ-বন্ধ করতে হবে। সৈনিক এবং প্রশাসনিক কার্যও তাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। পুরুষ দ্বারা ধর্ষণের ভয় তো রয়েছেই। এমনকি

মাতা সীতাকেও চুরি করা হয়েছিল। সেইজন্য স্ত্রী লোকদেরকে পুরুষের সংরক্ষণে ঘরের ভিতরের ব্যবস্থা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদ্যপি শুভ কার্যে তারা সদৈব সঙ্গে থেকেছেন। সীতা বনে কণ্টকাকীর্ণ পথে সঙ্গে গিয়েছিলেন। কৈকেয়ী যুদ্ধের সময় দশরথের সঙ্গে ছিলেন।

বস্তুত জীবনের দুটো দিক রয়েছে প্রথম ধনোপার্জন, বস্তু সংগ্রহ এবং দ্বিতীয় সংগ্রহীত বস্তুর সুচারুরূপে উপযোগ। দুটির মধ্যে থেকে প্রথমটি, সংগ্রহ করার দায়িত্ব পুরুষের উপর রয়েছে এবং সদুপযোগ, সুব্যবস্থা করা মহিলাদের উপর নির্ভর করে। এইভাবে ভারতবর্ষে স্ত্রী এবং পুরুষের সমান অধিকার সদৈব ছিল। এর বেশী কি সমানতা চান আপনারা? উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ করাতে চান? যে ক্ষেত্রে ঈশ্বরই অসমান করেছেন, সেখানে সমানতা হবে কি করে?

মহিলারা বলেন- আমরা চাকরী করব, গুলি চালাব, ফুটবল খেলব এবং প্রয়োজন হলে পুরুষদের চড়ও মারব। ভাল কথা, কিন্তু চড় মারার সাহস তাদের মধ্যে আসবে কোথেকে? জীব জগতে দৃষ্টিপাত করলে এটাই দেখা যায় যে, পঞ্চাশটা গরু মিলেও একটা ষাঁড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না। পঞ্চাশটা বাঁদরী একটা বাঁদরের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পশু সমাজে মাদীদের সম্মান এটুকুই রয়েছে। মনুষ্য সমাজও যাদের জীবন পশুতুল্য "খাওয়া-দাওয়া এবং ফূর্তি করা" পর্যন্তই সীমিত ছিল সেখানে নারীদের স্থান পশু-সমাজের মতই ছিল। মোহম্মদ সাহেবের সময় প্রত্যেক আরব নিবাসীদের কয়েকটা করে বৌ ছিল। মোহম্মদ সাহেব এই প্রথার কড়া বিরোধ করেছিলেন এবং ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি মাত্র চারজন মহিলাকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সমান অধিকারের পক্ষপাতী যারা, তাদের এই ব্যবস্থা খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আরব নিবাসীদের এই সংখ্যা এত কম প্রতীত হয়েছিল যে, তারা মোহম্মদের বিরুদ্ধে তুমুল ঝড় তুলেছিল। তারা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার পশুর মতই করত। পিতার মৃত্যু হলে পুত্র জননীর সঙ্গে স্ত্রীর মত ব্যবহার করত এবং তারও মৃত্যু হলে নাতি তার সঙ্গে স্ত্রীর মত ব্যবহার করত। পুত্র-বধূর সঙ্গে স্ত্রীর মত ব্যবহার করত। মোহম্মদ সাহেব ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যে, অন্ততঃ দুধের সম্বন্ধ বাদ দিয়ে বিবাহ করা উচিত। পশুবৎ সমাজগুলিতে সর্বত্র এইরূপ অব্যবস্থা ছিল এবং আজও সমান অধিকারের যে দেশগুলিতে উদাহরণ প্রস্তুত করা হয়, সেই দেশগুলিতে ধর্ষণ, তালাক, হত্যা, আত্মহত্যা, পাগলামি, মহিলা অপহরণের ঘটনা ভারতের চেয়ে হাজার-হাজার গুণ বেশী ঘটে। বিশ্বে আজও

ভারতই একমাত্র এমন দেশ যেখানে সতীত্বের মূল্য আছে এবং সতীত্ব আজও এখানে সুরক্ষিত। নারীজাতির প্রতি পুরুষদের মনে সম্মান এবং গৌরবের ধারণা দেখা যায়।

সত্যি কথা বলতে মহিলাদের পুরুষদের সমান অধিকার প্রদান করার কথা ভারতীয় মনীষীদের মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এই অর্থে নয়, যেমন বর্তমানে প্রচলনে রয়েছে। মহর্ষিগণ অভ্যাস করতে-করতে যখন সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দিগ্‌দর্শন করেছিলেন, সেই পথে সম্যক রূপে দৃষ্টিপাত করেছিলেন সেই পথে সকলকে চালিত করে দেখেছিলেন তখন দেখেছিলেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষ যাদের বলা হয় তারা উভয়েই সমান। ভগবৎ পথে চলার ক্ষমতা উভয়ের সমান, সেইজন্য ভজনা পথে তারা স্ত্রীজাতিকেও পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেছেন।

শুধু সমানতা নয়, মনীষীগণ মাতাকে পিতা এবং স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করেছেন। প্রাচীন ভারতে পুত্রকে মাতার নামে সম্বোধন করার প্রথা ছিল। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে অম্বিকানন্দন নামে ডাকা হত। চিত্রাঙ্গদ নন্দন নামে কেউ ডাকত না। চার-পাঁচ'শ বছরের বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ গাঙ্গেয় নামে ডাকলে গর্ববোধ করতেন। কুন্তীপুত্র অর্জুনকে কৌন্তেয় বলা হত। এইরূপ দেখা যাচ্ছে যে মাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব সদৈব ছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে আজও আছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিলাসিতায় মত্ত আজকাল কিছু মানুষ পশ্চিম দেশগুলির প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়াবার, পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী মহিলা পুরুষ অধিকারের সাম্যের জন্য আন্দোলন করছেন কিন্তু মা-বোনেদের এসব থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যথা হোঁচট খেলে নিজেদের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে তাদের পাশ্চাত্য পশুবৎ রীতি-নীতির শিকার হতে হবে। অতএব পূর্ব মহর্ষিগণ দ্বারা অনুমোদিত নিজেদের চিরসঞ্চিত মর্যাদার অনুরূপ মায়েদের আচরণ করা উচিত। তাদের কল্যাণ এতেই নিহিত।

ভৌতিক দৃষ্টিতে দেখলেও ভারতে মহিলাদের অধিকার সুখ-সুবিধা পুরুষ অপেক্ষা বেশীই রয়েছে। পুরুষের দেহে যদি একশ টাকা মূল্যের কাপড় দেখা যায় তবে মায়েদের কাপড়ের মূল্য হাজারের নীচে হয় না। পুরুষের হাতে হয়ত আংটিও নেই কিন্তু মায়েদের তোরঙ্গ, ছোট বাক্সগুলি বস্ত্র আভূষণে ভর্তি থাকে। আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলির তথাকথিত প্রগতিশীল মহিলাদের কাছে আভূষণের নামে কিছুই পাবেন না।

পূজ্য মহারাজজীর অনুসূইয়া স্থিত আশ্রমে এক ক্যানিডিয়ান দম্পতি গিয়েছিল। মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"কেন এসেছ?" তারা বলেছিল-"যোগ শিখতে। দর্শন শাস্ত্রগুলিতে ভারতীয় যোগের বিষয়ে অধ্যয়ন করে আমরা খুব প্রভাবিত হয়েছি। ভাবলাম ভারত গিয়ে দেখি বাস্তবিকতা কি?" মহারাজজী পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন-"আচ্ছা বল তো আমেরিকা ভাল অথবা ভারত?" উভয়েই একসঙ্গে বলে উঠেছিল "ভারত" মহারাজজী বলেছিলেন-"আমেরিকা তো খুব সমৃদ্ধ?" তারা উত্তর দিয়েছিল যে, "সমৃদ্ধ নিশ্চয়ই, কিন্তু সেখানে অশান্তি খুব। যদি আমরা পতি-পত্নী দুজনে গোটা আমেরিকা ভ্রমণ করতাম তবে দু'চারবার অন্ততঃ আমার স্ত্রীকে অপহরণ করা হত। অপহরণের তিন-চার দিনপরেই একে আমি ফিরে পেতাম। কিন্তু যখন থেকে আমরা ভারতের মাটিতে পা রেখেছি, তখন থেকে আমার স্ত্রীকে 'সিস্টার' ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে কেউ দেখেনি। সেই কারণেও মনে খুব শান্তি পেয়েছি। পাসপোর্ট সমাপ্ত হওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু সন্ত-মহাত্মাদের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য 'ডেট' পিছিয়ে দেব ভাবছি।"

দেখুন, পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষা প্রণালীকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্যই নারীদের মনে এই বিচার উদয় হয়েছে। বৈদিক এবং শাস্ত্রীয় আদর্শগুলি শিক্ষাতে স্থান না পাওয়ার ফলস্বরূপ চিন্তাধারা বিলাসিতায় বিকৃত হচ্ছে। সৎসঙ্গের অভাবে আপনার মন চঞ্চল। অতএব সৎসঙ্গ করুন। যদি সৎপুরুষের প্রাপ্তি হয়নি তবে রাম, শিব, ওঁ ইত্যাদি নাম জপ করলেও আপনি সৎপথের সন্ধান সঠিক নির্দেশ পাবেন এবং এগুলির মধ্যে থেকে কোন একটা নাম, রূপের সাধনাতে সামান্য করেও যদি সময় দিতে পারেন তবে পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই আপনার মনে হবে যে, কাম, ক্রোধ অথবা কোন এমন শত্রু নেই, যা আপনি জয় করতে পারবেন না। বস্তুতঃ বিকারগুলির উত্থান-পতন দেহে নয় পরন্তু মনের উপর আধারিত। মন যদি সঠিক সাধনা পথে চলে, তবে বিষয়গুলির চিন্তা কে করবে? মন স্বতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

সীতা, সাবিত্রী, মীরা, গার্গী, অনুসূইয়া, মদালসা এঁরা সকলেই আপনার পূর্বজা। সকলেই এই ক্রিয়াত্মক পথের অনুসরণ করেছিলেন। এবং তাঁদেরই পদচিহ্নে চলে আপনি শুধু ভারতই নয়, বিশ্বের সমক্ষে উজ্জ্বল উদাহরণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন।

।। ওঁ।।

নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ

প্রশ্ন- মহারাজজী! লঙ্কা যাওয়ার পথে হনুমান-সিংহীকার সম্মুখীন হয়েছিলেন-"নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ।" মাঝ সমুদ্রে কিভাবে বাস করত যে, তার উপর জলের প্রভাব পড়ত না। এবং সে ছায়া ধরে আকর্ষণ করত। এই ছায়া ধরা কাকে বলে?

উত্তর- দেখুন, এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আজও লক্ষ-লক্ষ মানুষ মাঝসমুদ্রে রাত-দিন নিবাস করে। ডুবো জাহাজের ভিতরের মানুষ, অদৃশ্যই তো থাকে। ডান-বাঁ যেদিক দিয়েই শত্রু যায়, তাকে সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলে। বর্তমানে এই বিজ্ঞান প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, এমন কথা নয়, এটা সদৈব ছিল। সংঘর্ষের পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছে প্রগতি মন্দ পড়ে যায়-কালান্তরে অন্যান্য মাধ্যম দ্বারা পুনরায় প্রগতি করে। সৌভাগ্যবশতঃ এইবার বিজ্ঞান পুনরায় প্রগতি করছে কিন্তু ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশগুলিতে। এমনিতে তো গোটা বিশ্বই একটা গ্রাম, একটা পরিবার। জলবায়ু অনুসারে গাত্রবর্ণ ফর্সা-কালো, লম্বা-চ্যাপটা নাক, উচ্চতা ইত্যাদিতে পরিবর্তন হতে থাকে। আপনি বর্তমানে এখানে বাস করছেন, কাশ্মীরে চার বছর থাকলেই কিছুটা ফর্সা হয়ে যাবেন। উত্তর পুরুষেরা সব ফর্সা জন্মগ্রহণ করবে।

যদিও এটা 'মানস'। মানস বলে-মন, অন্তঃকরণকে। 'রামচরিতমানস' অর্থাৎ রামের সেই চরিত্র, যা মনে প্রবাহিত রয়েছে। এতে সংসারই সমুদ্র, বৈরাগ্যবান্ পুরুষই এর থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন।

নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ। করি মায়া নভু কে খগ গহঈ।।
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ। জল বিলোকি তিন্হ-কৈ পরিছাহীঁ।।

(মানস, ৫।২।১-২)

সিন্ধু মাঝে এক নিশিচরী বাস করত। **'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'** *(গীতা, ২।৬৯)*-এই জগতরূপ নিশাতে গতিমান এবং গতিপ্রদান করে, সেইজন্য এর নাম নিশিচরী। এই নিশিচরী ভবসিন্ধুতে বাস করে এবং সমুদ্রে যার প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে তখন সে পতিত হয়।

গহই ছাঁহ সক সো ন উড়াঈ।
এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ।। *(মানস, ৫।২।৩)*

সে প্রতিবিম্ব ধরে ফেলত। যার ফলে জীবজন্তু উড়তে অক্ষম হত, তাদের

গতি কুণ্ঠিত হয়ে যেত। এই প্রকারই গগনচারীদের, আকাশচারীদের ভক্ষণ করত।

সোই ছল হনূমান কহঁ কীহ্না।

তাসু কপটু কপি তুরতহিঁ চীহ্না।। *(মানস, ৫।২।৪)*

সেই কপটতাই সে হনুমানের সঙ্গে করেছিল। তার কপটাচরণ সম্বন্ধে হনুমান তক্ষুণি জানতে পেরেছিলেন, তারপর তো

তাহি মারি মারুতসুত বীরা।

বারিধি পার গয়উ মতিধীরা।। *(মানস, ৫।২।৫)*

তাকে বধ করে হনুমান তক্ষুণি সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন। বৈরাগ্যকেই হনুমান বলে-মান ও সম্মানের হনন কর্তা, সেইজন্য বৈরাগ্যরূপ হনুমান। পক্ষী আকাশচারী হলেও পৃথিবীর মাটির সহায়তা নেয়। কেবল বৈরাগ্যবান পুরুষই এই সংসার-সিন্ধুর উপর উড়ে বেড়ান। ভবসিন্ধু থেকে উর্ধ্বে গমন করতে চান, উর্ধ্বে গমন করেনও এবং ক্রমশ উত্থান করতে-করতে পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে ভবাতীত সত্তাতে বিলীন হয়ে যান।

পথিক যখন চলতে শুরু করেন তখন '**নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ।**' -অন্যের ইচ্ছাশক্তিই নিশিচরী। কোন উত্তম সাধক সাধনাতে অগ্রসর হতে থাকে যখন তখন অন্য ব্যক্তির মায়িক বিচার তার চিন্তা তরঙ্গে ধাক্কা দেয়। মহিলার জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য মহিলা এই ধরণের চিন্তা করতে শুরু করে যে ''বাবাজী তো খুব ভাল, না জানি কতদিন থেকে ইনি কটিবদ্ধ, ব্রহ্মচর্য পালন করছেন, কত ভাল। আমার সঙ্গী হলে কত ভাল হত''-ব্যস বিষয়ের ভয়ঙ্কর বেদনা নিয়ে সে চিন্তন করবে। এদিকে তার চিন্তাধারা বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শান্ত চিত্তে ধাক্কা দেবে, কারণ চিত্ত তো সকলের একই। সাধক বুঝে উঠতে পারে না যে, এই ধরণের চিন্তা এল কোত্থেকে। তক্ষুণি সেই চিন্তা দ্বারা সে আক্রান্ত হয়, সেই ভাব কিছুকালের ভিতরেই পরিণত হয়ে সাধককে এই সংসাররূপ সমুদ্রে পতিত করে।

সংসারই সমুদ্র। এতে বিষয়রূপ জল পরিপূর্ণ; কিন্তু-

বার বার রঘুবীর সঁভারী।

তরকেউ পবনতনয় বল ভারী।। (মানস, ৫।মঙ্গলাচরণ, চৌ.৬)

যিনি নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করেন, যাঁর মধ্যে ইষ্টের শক্তি বিদ্যমান, যিনি ইষ্টের হাতের যন্ত্রস্বরূপ, সেই বৈরাগ্যবান্ পুরুষের মধ্যে এই ছল কে চেনার ক্ষমতা হবে তিনি বুঝবেন যে, আমার চিন্তাধারা তো নোংরা ছিলই না, তবে এইরূপ

চিন্তা আসছে কোথা থেকে? কোন্‌টা তাঁর, কোন্‌টা পরের চিন্তন, যিনি চিন্তনগুলি পৃথক করতে সক্ষম হন, তাঁর উপর এই সঙ্কল্পজনিত সঙ্গদোষের প্রভাব পড়ে না। সাধক জানতে পারেন যে, এইরূপ কুচিন্তা কে করছে? চিন্তন তাঁর নয় এটা অন্য কারও মনের ভাব। দুনিয়াতে তো সকলেই বিষয়ীই, তারা সবকিছু চিন্তা করতে পারে; কারণ তারা বিষয়েরই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে, সেই বায়ুমণ্ডলেই বাস করে সেইজন্য তারা আর করবেই বা কি? অতএব তাদের মা বলে, বোন বলে সম্বোধন করুন, তারপর তো সঙ্কল্পের তরঙ্গ, যা সাধকের মনে ধাক্কা দিচ্ছিল, শান্ত হয়ে যাবে। তাদের ভাব ভঙ্গিমাতে পরিবর্তন হবে।

সংসাররূপ সিন্ধুতে বিষয় রস-এ ওতপ্রোত বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি সাধকের চিত্তকে আক্রান্ত করে ফেলে। প্রতিবিম্ব ধরা একেই বলে। যখন সাধকের চিত্ত বিষয় চিন্তনে আচ্ছন্ন হতে শুরু করে, তখন সেটা সংস্কারে পরিবর্তিত হয়। পরিণাম স্বরূপ সাধক শ্রেয় সাধন থেকে পতিত হয়, কিন্তু যিনি ইষ্টের উপর নির্ভরশীল যাঁর মধ্যে ইষ্টের শক্তি কাজ করে, অনুভবের আধারে সঙ্কল্পগুলি পৃথক করার ক্ষমতা আছে, তিনি সহজেই এগুলির প্রভাব এড়িয়ে এগিয়ে যান। সাধক জানে যে সংসারী ব্যক্তি প্রায়ই সেটাই চিন্তন করবে যাতে সে লিপ্ত। যাকে সাপে কেটেছে, সে ছটফট তো করবেই। সাধকও তো সাধনা শুরু করার আগে সংসারে থেকে এই সবই চিন্তন করত। যখনই সঙ্কল্পগুলি পৃথক করার ক্ষমতা চলে আসে, সাংসারিক সঙ্কল্পগুলির তরঙ্গ সাধকের মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু যে সাধক ইষ্টকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন এই ক্ষমতা তিনি প্রভুর কৃপাতে লাভ করেন। ইষ্ট প্রদত্ত অনুভবের শক্তিতেই সাধক এইরূপ করতে সমর্থ হন।

তাহি মারি মারুতসুত বীরা। বারিধি পার গয়উ মতিধীরা।।

অতএব ভজনা করুন। তিনি দয়ার সাগর। আপনিও লাভ করবেন।

।। ওঁ।।

যুগ-ধর্ম

প্রশ্ন- এটা তো কলিযুগ মহারাজ! এখন কি করে ধর্ম-কর্ম হবে?

উত্তর- দেখুন কলিযুগ-মহিমা-গায়ন-এর প্রসঙ্গে রামচরিত মানস-এ যেখানে যেখানে বলা হয়েছে, তা যদি মনন করি তবে জানতে পারব যে, পূর্বে কখনও সত্যযুগ ছিল এবং বর্তমানের যুগ কলিযুগ, এটা যথার্থ নয়। কাকভুশুণ্ডী জী নিজের পূর্বজন্মগুলির বৃত্তান্ত প্রস্তুত করার সময় যে-যে শব্দ দ্বারা মল-মূল কলিযুগের বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেই শব্দাবলী এবং লক্ষণগুলির উল্লেখ গোস্বামীজী উত্তরকাণ্ডে অসাধুর লক্ষণ এবং বালকাণ্ডে রাবণের উৎপত্তি ও নিশাচরদের আতঙ্কের কালে করেছেন। কলিযুগে **'সব নর কাম লোভ রত ক্রোধী'** এবং অসাধু ব্যক্তি **'কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন'** হয়। একই কথা দুটি। কলিযুগে **'পর ত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে'** হয় মানুষ এবং অসাধু ব্যক্তি-**'পর দ্রোহী পর দার রত, পরধন পর অপবাদ'** হয়। এইপ্রকার নিশাচরদের উৎকর্ষকালে **'বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা। জে লম্পট পরধন পরদারা'** এর সাম্য দেখা যায় একটু-একটু করে উল্লেখ তো বহু জায়গায় করা হয়েছে। কিন্তু উপর্যুক্ত তিন-চারবার গোস্বামীজী কলির গুণ-ধর্মের উপর আলোকপাত করেছেন, কলিযুগের বহু লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন-

জো কহ ঝূঁঠ মসখরী জানা।
কলিজুগ সোই গুনবন্ত বখানা।। *(মানস, ৭/৯৭/৬)*
জাকেঁ নখ অরু জটা বিসালা।
সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা।। *(মানস, ৭/৯৭/৮)*

এই প্রকার-

দেব ন বরসহিঁ ধরনীঁ, বএ ন জামহিঁ ধান। *(মানস, ৭/১০১/খ)*

ইত্যাদি পঞ্চাশেরও অধিক লক্ষণ বললেন এবং শেষে মত প্রস্তুত করলেন-

অইসে অধম মনুজ খল, কৃতযুগ ত্রেতাঁ নাহিঁ।
দ্বাপর কছুক বৃন্দ বহু, হোইহহিঁ কলিযুগ মাহিঁ।। *(মানস, ৭/৪০)*

সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে এইরূপ অধম মানুষ হয় না, দ্বাপর যুগে কিছু কিছু হয় এবং কলিযুগে দলে-দলে হয়। প্রশ্ন উঠছে যে তবে কি সত্য এবং ত্রেতাযুগে অধম মানুষ ছিলই না?

ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি থেকে জানতে পারি যে, সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামক

এক রাজা হয়েছিলেন। নিজের মানমন্দিরে তিনি এমন উপায় করেছিলেন যে, দিবা-রাত্রি, অস্ত্র-শস্ত্র, পশু-পক্ষী মানুষ কেউ যাতে তাঁকে বধ করতে না পারে এরূপ আবিষ্কারের ফলস্বরূপ তাঁর মনে উঠেছিল যে, মৃত্যুই যখন হবে না, তবে ভগবানের কি প্রয়োজন? অতএব তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আমিই ভগবান। যে ব্যক্তিই আমাকে ছাড়া কোন দেবতার নাম নেবে, তাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল রাজা একমাত্র পুত্র প্রহ্লাদকেও ক্ষমা করতে পারেননি। প্রহ্লাদকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। হত্যা করার বহু চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা তো আরও কেউ ছিলেন। বস্তুতঃ যদি ভগবান কোন অবোধ শিশুকেই স্পর্শ করে দেন তবে সংসারের কোন শক্তিই তাকে বধ করতে পারবে না। ভগবানের কৃপা প্রহ্লাদের উপর ছিল এবং তার মাধ্যমে সেই যুগে ভক্তির লহরী প্রবাহিত হয়েছিল।

এই প্রকার সেই সত্যযুগেও এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে শুধু ধর্ম চর্চা করলেই মৃত্যু-দণ্ডের বিধান ছিল এবং তুলসীদাস বলছেন-'**অইসে অধম মনুজ খল**'-এইরূপ অধম মনুষ্য '**কৃতযুগ ত্রেতাঁ নাহিঁ**' সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগে জন্মগ্রহণই করে না। যদ্যপি সেই সত্যযুগেই এমন ভয়ঙ্কর মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল যে, ভগবানের নামমাত্র নিলেই ফাঁসি দেওয়া হত। বর্তমান যুগে অন্ততঃ ফাঁসি তো দেওয়া হয় না, কিছু লোক হয়ত ব্যঙ্গ করতে পারে কিন্তু তত জন প্রশংসকও পাবেন, যারা প্রশংসা করবে যে দাদামশাই মহাত্মাদের কাছে আসা-যাওয়া করেন, তীর্থ করেন। বার্ধক্যের শোভা এটাই; ইত্যাদি।

আসুন, সেই ত্রেতাযুগের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক, যে যুগের ইতিবৃত্ত 'মানস'-এ চিত্রিত আছে। ত্রেতাযুগেও অধম নর ছিল। রাবণ '**ধর্ম সুনিঅ নহিঁ কানা, আপুনু উঠি ধাবই, রহৈ না পাবই**' *(মানস, ১/১৮২/ছ০)* ধর্ম কথা কানে যাওয়া মাত্র পাগল হয়ে নিজেই ছুটে যেত, ধর্ম নষ্ট করার জন্য 'ফোর্স' পাঠিয়ে দিত। অধর্মীদের নষ্ট করার অনুমতি দেয়নি। শুধু ধর্মই নির্মূল করার পরিকল্পনা ছিল। চোর-ডাকাতদের নষ্ট করার আদেশ দেয়নি, রামনাম-এর উচ্চারণ করতেন যাঁরা, তাঁদের নাশ করার আদেশ দিয়েছিল। ঋষি-মহাত্মাদের কাছ থেকেও রক্ত রূপে খাজনা আদায় করা হত। অপরাধ শুধু এইটুকু ছিল যে তাঁরা ভগবানের নাম নিতেন। গুপ্তভাবে নিশাচরদের দল ভ্রমণ করত, তারা ধার্মিক ব্যক্তিকে একা দেখতে পেলেই বধ করে উদরস্থ করত। বনবাসী রাম যখন চিত্রকূট ত্যাগ করে হাঁটতে শুরু করেছিলেন

কিছুদূর গিয়েই সম্মুখে নরকঙ্কালের একটা পাহাড় দেখতে পেয়েছিলেন-

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া।

পূছী মুনিহ্ন লাগি অতি দায়া।। *(মানস, ৩।৮।৬)*

হাড়ের বিশাল স্তূপ দেখে ভগবান রাম মুনিদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এখানে এত নর কঙ্কাল কেন? মুনিরা শুনে বলেছিলেন, 'আপনি তো অন্তর্যামী সব জানেন তবু কেন জিজ্ঞাসা করছেন? কিন্তু যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করছেন সেই জন্য বলাটা আমাদের কর্তব্য-'**নিসিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।**' *(মানস, ৩।৮।৮)* নিশাচরদের দল সব মুনিদের ভক্ষণ করেছে। এই সব হাড় তাঁদেরই। বর্তমানে নাম নেবার জন্য তো স্বতন্ত্র। কেউ কর তো আদায় করে না? বেদ-পুরাণ-এর কথা বললে নির্বাসন দেওয়া তো হয় না? সেই সময় কোন যুগ ছিল? ত্রেতা! গোস্বামীজী বলছেন যে, এইরূপ অধম খল কৃতযুগ এবং ত্রেতাতে জন্মগ্রহণই করে না! কলির একটা অন্য লক্ষণ ত্রেতারই সন্দর্ভে দেখুন-

সৌভাগিনীঁ বিভূষন হীনা।

বিধবহ্ন কে সিংগার নবীনা।। *(মানস, ৭।৯৮।৫)*

সেই ত্রেতাতে সুর্পনখা বিধবাই তো ছিল। তার পতি বিদ্যুতজিহ্বা যুদ্ধে যখন রাবণ কর্তৃক নিহত হয়েছিল, তখন সে তাকে দোষারোপ করে বলেছিল-"তুমি আমার ভাই কি শত্রু? তুমি আমার পতিকে মেরে ফেললে? আজ থেকে লোকে আমাকে বিধবা বলবে।" রাবণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল-"বোন! ভুল তো আমি অবশ্যই করেছি কিন্তু আমাদের জাতিতেও কি কেউ বিধবা হয়? আমরা সহস্রাধিক স্ত্রীদের বিবাহ করি, তুমিও সহস্র-সহস্র পুরুষকে বিবাহ করার জন্য স্বতন্ত্র। ভাই খর-দূষণের সঙ্গে ঈপ্সিত লোকালয়ে বিচরণ করবে যাও।" এই ক্রমেই '**পঞ্চবটী সো গই এক বারা। দেখি বিকল ভই জুগল কুমারা।' (মানস, ৩।১৬।৪)** যখন সে রামের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তখন খুব সুন্দর রূপ ধরে হেসে বলেছিল-'**মনু মানা কছু তুমহ্হি নিহারী।' (মানস, ৩।১৬।১০)** তুমিও খুব সুন্দর এমন কথা নয়। হ্যাঁ মানিয়ে নেওয়া যাবে সেইজন্য তো এখনও পর্যন্ত আমি কুমারী-যদিও এমন একটাও কুকর্ম ছিল না যা সে করেনি। সূর্পনখার মতন অধঃপতন এখন তো দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও গোস্বামীজী বলেছেন যে, ত্রেতাতে এইরূপ অধম নর জন্মগ্রহণই করত না।

ত্রেতাযুগে যদি অধম নর জন্মগ্রহণই করত না তবে রাম কার সঙ্গে যুদ্ধ

করেছিলেন? তার চরিত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, ত্রেতাতেও অধম খলদের অস্তিত্ব ছিল এবং শুধু যে অস্তিত্বই ছিল তা নয় তাদের অত্যাচারে পৃথিবীও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

মহাত্মাদের নিশাচরেরা ভক্ষণ করত। একথা আলাদা যে, মহর্ষি অগস্ত্য, অত্রি, শবরী, সুতীক্ষ্ণ, বাল্মীকি ইত্যাদি কিছু এমন তপোধন ছিলেন, যাঁদের উপর এইসব নিশাচরদের কোন প্রভাব পড়ত না। সেইজন্য এঁরা যেখানেই ছিলেন, সুরক্ষিত ছিলেন। কিন্তু নিশাচরেরা এঁদেরও পরীক্ষা করে দেখেছিল। এঁদেরও অনুসরণ করেছিল, শুধু-শুধু ছেড়ে দেয়নি। আতাপী এবং বাতাপী নামে দু'জন নিশাচর ছিল। তাদের পদ্ধতি অনুসারে তারা প্রথমে মহাত্মাদের নিমন্ত্রণ করে আসত। নিমন্ত্রিত মহাত্মারা যখন তাদের কাছে যেতেন তখন বড়ভাই ছোটকে মেরে তার মাংস দিয়ে আহার প্রস্তুত করত। তাঁরা বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জনের স্বাদ নিতেন। মহাত্মাদের প্রস্থানের সময় হলে জ্যৈষ্ঠ নিশাচর তাঁদের প্রচুর দক্ষিণাও দিত কারণ সে জানত দক্ষিণার বস্তু সামগ্রী কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। সেই মহাত্মারা যখন কিছুদূর এগিয়ে যেতেন তখন বড়ভাই ছোটভাইকে নামধরে ডাকত এবং ছোট নিশাচর সকলের পেট চিরে বেরিয়ে আসত। তারপর দুজনে মহাত্মাদের গণনা করে নিত। কিছু মহাত্মাকে তাজাই ভক্ষণ করত, কিছুকে রান্না করে এবং বাকী মহাত্মাদের শুকিয়ে রেখে নিত। একবারের চেষ্টাতেই গোটা পরিবারের, কয়েক দিনের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

এই প্রকারেরই ছলনা তারা মহর্ষি অগস্ত্যের সঙ্গেও করেছিল। দু'ভাই যখন তাঁকে নিমন্ত্রণ করার জন্য যাচ্ছিল তখন ছোট ভাই বড়ভাইকে সাবধান করে বলেছিল-আমরা যে মহাত্মার কাছে যাচ্ছি তিনি খুব সাংঘাতিক, তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। বড়জন তাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল-তুমি তো খুব কাপুরুষ। কেমন তপোধন? তপস্যা আবার কি? অতএব, মহর্ষি অগস্ত্য সেই ভক্তের কাছে গিয়েছিলেন। আতিথ্য গ্রহণ করে যখন তিনি ফিরছিলেন তখন বড়ভাই ছোটভাইকে তার নাম ধরে ডেকেছিল। মহর্ষির উদরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তিনি ধ্যান যোগে জানতে পেরেছিলেন যে, রাক্ষস তাঁর উদরের ভিতরে রয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে পেটে হাত বুলিয়ে আতাপী-বাতাপী স্বাহা বলেছিলেন তৎক্ষণাৎ ভিতরের রাক্ষস ভিতরে এবং বাইরের রাক্ষস বাইরেই মারা গিয়েছিল। এই প্রকার মহর্ষি নিজের তপস্যার জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। যদিও

নিশাচরেরা কাউকেই পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। হিরণ্যকশিপুও ছাড়েনি। প্রহ্লাদ তো নিজের শক্তির জোরে বেঁচে গিয়েছিল অথবা প্রভুকে এত অনুকূল করে নিয়েছিল যে, প্রতিবার রক্ষা পেয়েছিল তা সত্ত্বেও গোস্বামীজী বলছেন, এইরূপ অধম খল সত্যযুগ এবং ত্রেতাতে উৎপন্নই হয় না। কিন্তু সত্য তো এই যে, এখনকার থেকেও অধম নরদের প্রমাণ সেই যুগে পাওয়া গেছে। তবে গোস্বামী তুলসীদাসজী কি বলতে চাইছেন? অবশেষে তিনি তাঁর অভিমত দিচ্ছেন-

নিত জুগ ধর্ম হোহিঁ সব কেরে।

হৃদয়ঁ রাম মায়া কে প্রেরে।। *(মানস, ৭/১০৩/১)*

প্রত্যেক যুগের ধর্ম সকলের হৃদয়ে নিত্য সূত্রপাত হচ্ছে। '**হৃদয়ঁ রাম মায়াকে প্রেরে**'-ভগবানের মায়ার প্রেরণাতে উৎপন্ন হয়। মায়ার দুটি রূপ। এক-অবিদ্যা মায়া, যা বিভিন্ন যোনিতে উৎপন্নের হেতু। দুই-রামমায়া, একে বিদ্যাও বলে। রামমায়া হরি প্রেরিত এবং সাধনা দ্বারাই এর জাগৃতি সম্ভব। অবিদ্যা মায়ার সীমা অতিক্রম করে নিলে রামমায়ার প্রেরণাতে সাধকের হৃদয়ে ক্রমশঃ চারটি যুগের গুণ-ধর্ম প্রকট হয়। বাস্তবে এও ভগবৎ পথের চারটি শ্রেণী ঠিক সেই প্রকার যেমন গীতোক্ত বর্ণ-ব্যবস্থা। এখন জানা কি করে যাবে যে, হৃদয়ে কোন্ যুগ কাজ করতে শুরু করেছে? গোস্বামীজী এর লক্ষণ বলছেন-

সুদ্ধ সত্ত্ব সমতা বিজ্ঞানা।

কৃত প্রভাব প্রসন্ন মন জানা।। *(মানস, ৭/১০৩/২)*

যাঁর মধ্যে শুধু সত্ত্বগুণ কার্যরত, যিনি সমদর্শী বিজ্ঞান অর্থাৎ বোধসম্পন্ন, প্রত্যেক সমস্যাতে ইষ্টের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ, অসীম প্রসন্নতা লাভ করেছেন এইরূপ পুরুষ সত্যযুগীয়। এই প্রকার-

সত্ত্ব বহুত রজ কছু রতি কর্মা।

সব বিধি সুখ ত্রেতা কর ধর্মা।। *(মানস, ৭/১০৩/৩)*

সত্ত্বগুণের বাহুল্য, কিছু রাজসিক গুণ, কর্ম অর্থাৎ আরাধনাতে পূর্ণ-অনুরাগ শান্ত ভাব এটা ত্রেতা যুগের বিশেষ লক্ষণ। যার হৃদয়ে উপর্যুক্ত গুণ কাজ করছে তাকে ত্রেতা শ্রেণীর সাধক বলা হয়। পুনরায়-

বহু রজ স্বল্প সত্ত্ব কছু তামস।

দ্বাপর ধর্ম হরষ ভয় মানস।। *(মানস, ৭/১০৩/৪)*

রাজসিক গুণের সঙ্গে-সঙ্গে সত্ত্ব এবং তামসিক গুণের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ থাকবে,

হৃদয়ে কখনও হর্ষ কখনও ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে, সেই সাধক দ্বাপরযুগীয়। দুবিধা থেকে দ্বাপর-এর উৎপত্তি হয়েছে। যদি সাধনাতে হর্ষ বিষাদের উত্থান-পতন হয়, মনে সংশয় জাগে তবে সাধক দ্বাপর যুগীয়। এবং শেষে-

তামস বহুত রজোগুন থোরা।
কলি প্রভাব বিরোধ চহুঁ ওরা।। *(মানস, ৭/১০৩/৫)*

যেখানে তামসিক বৃত্তির প্রাবল্য রয়েছে, খুব সামান্য রাজসিক গুণ কার্যরত, মনের মধ্যে বিরোধ ভর্তি এইরূপ হৃদয় কলিযুগের পরিচায়ক। যদি এই স্তরে সাধক জীবিত আছে তবে প্রমাণিত হচ্ছে যে সে কলিযুগীয়। এই স্তরে তার মধ্যে সেই সব লক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, যেগুলির গোস্বামীজী কলিপ্রসঙ্গে গণনা করেছেন।

যদি মন উচ্ছৃঙ্খল, বিরোধী, ব্যাকুল, তবে মনুষ্য দেহের সার্থকতা কোথায়? বড় ভাগ্যে মানব দেহ লাভ হয়েছে তবে কল্যাণ কিরূপে হবে? এইরূপ স্থিতিতে আমরা ভজনা আরম্ভ কোথা থেকে করব?

বড়েঁ ভাগ মানুষ তনু পাওয়া। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থহ্নি গাওয়া।।
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁওয়ারা।।
(মানস, ৭/৪২/৭-৮)

ভাগ্য বলে মানব দেহ লাভ হয়েছে। পশু পাখি সকলেই তো সুখে বেঁচে আছে। কাকও তো সুখী। কত গর্ব করে উড়ে যায়, গাছের ডালে বসে। তবে মানুষ কি করে বেশী ভাগ্যশালী? কারণ বাকী চুরাশী লক্ষ যোনি শুধু ভোগ উপভোগ করে কিন্তু শুধু মাত্র মানুষই নিজের কর্মগুলির রচয়িতা। খুব মন্দ সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার এর মধ্যে ক্ষমতা আছে, শর্ত একটাই, কর্মের ক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। নিজের লক্ষ্যকে মনে, হৃদয়ে-স্থান দেবে। এটা সাধনের ধাম, মুক্তির দুয়ার। এই দেহ লাভ করে যে নিজের পরলোকের সংস্কার করে না (কারও উপর কৃপা নয়, কারও ভাল নয়, শুধু নিজের উন্নতি তো করে নিন)-

সো পরত্র দুঃখ পাওই, সির ধুনি ধুনি পছিতাই।।
কালহি কর্মহি ঈস্বরহি, মিথ্যা দোষ লগাই।। *(মানস, ৭/৪৩)*

সে জন্মান্তরে দুঃখ পায়, মাথা কুটে পশ্চাতাপ করে এবং কাল-কর্ম-ঈশ্বরকে ব্যর্থ দোষ দেয়। যদি মানব-দেহ উপলব্ধ এবং নিজের পরলোকের সংস্কার করেনি তবে বস্তুতঃ সব দোষ তারই। প্রায়ই মানুষ দুতিনটে ওজর করে। কপালে নেই-কর্মকে দোষ, 'সময় অনুকূল নয়, কালকে দোষ, কর্তা ধর্তা তো ভগবান তিনি করাচ্ছেন

কই।' এই প্রকার ভগবানকে দোষ দেওয়া জীবের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখানে ভগবান রাম বলছেন যে, যদি মানব-দেহ উপলব্ধ এবং নিজের পরলোকের সংস্কার করে না তবে, কাল, কর্ম, ঈশ্বর কারও দোষ নয়, সব দোষ তার মানুষ কর্মের রচয়িতা-'**মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।**' *(মানস, ১।৩১।৭)* ললাটে যদি অসাধ্য কুঅঙ্ক, নরক এবং যাতনা লেখা আছে, আপনি তা খণ্ডাতে পারবেন (নামের) নাম উচ্চারণ করার বিধি যদি জানেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই মানব দেহ লাভ তো হয়েছে কিন্তু তামসিক গুণ কলিযুগের বাহুল্য রয়েছে এবং ভজনাতে মন বসেই না। তবে তো আমাদের মানুষ হওয়াটাই ব্যর্থ। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য ভজনার বিধান আছে কি নেই? কিন্তু ভজনার বিধান তো রয়েছে-

কৃতজুগ সব জোগী বিগ্যানী।
করি হরি ধ্যান তরহিঁ ভব প্রানী।। *(মানস, ৭।১০২।১)*

সত্যযুগে সকলেই যোগী এবং বিজ্ঞানী হন। ভগবানের ধ্যানে বসার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ধ্যানমগ্ন-হওয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ ভবপারে চলে যান। অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক গুণ ক্রিয়াশীল হবে, অনুভব, উপলব্ধি হবে সেইকালে সহজেই ধ্যানমগ্ন হওয়ার ক্ষমতা চলে আসে।

ত্রেতাঁ বিবিধ জগ্য নর করহীঁ।
প্রভুহি সমর্পি কর্ম ভব তরহীঁ।। *(মানস, ৭।১০২।২)*

যখন ত্রেতাযুগের যোগ্যতা অর্জন হবে তখন ভগবানকে সকল কর্ম সমর্পণ করার ক্ষমতা লাভ হবে। '**যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি**' *(গীতা, ১০।২৫)* নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যজ্ঞ সকল যজ্ঞে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যজ্ঞের অন্তর্গত যে জপ, তার উত্থান-পতন এই শ্বাসের উপর আধারিত। মালা অথবা মুখে উচ্চারণের উপর আধারিত নয়। ত্রেতাতে বিবিধ যজ্ঞ অর্থাৎ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করার ক্ষমতা চলে আসবে, ভগবানকে কর্ম সমর্পণ করার ক্ষমতা চলে আসবে, এইরূপ সমর্পণ করে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত থেকে ত্রেতাযুগীয় সাধক ভবসাগর পার করে যান।

দ্বাপর করি রঘুপতি পদ পূজা।
নর ভব তরহিঁ উপায় ন দূজা।। *(মানস, ৭।১০২।৩)*

যখন সাধক দ্বাপরের শ্রেণীভুক্ত থাকেন তখন ধ্যানে বসলেও ধ্যান হবে না, কারণ মন এই স্তরে দ্বিধাযুক্ত থাকে সেইজন্য 'পদ পূজা' —ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ, শ্রীচরণে মনকে স্থির করা (মনে রাখবেন এটা কেবল করার প্রয়াস মাত্র, মন

স্থির হয় না, ব্যস শুধু অভ্যাস করার ক্ষমতা থাকে) এইরূপ প্রয়াস করে দ্বাপরযুগীয় সাধক ভবসাগর পার করে যান।

কলিজুগ কেবল হরি গুন গাহা।
গাওত নর পাওহিঁ ভব থাহা।। *(মানস, ৭/১০২/৪)*

যদি স্তর কলিযুগের তবে শুধু **'হরি গুন গাহা'**- ভগবানের গুণগান, তাঁর লীলাসমূহের চিন্তন যেমন-রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ লীলা করেছেন, সেই মহাপুরুষদের চরিত্র এইরকম ছিল, ইত্যাদি গুণগান এবং নামজপ ছাড়া কলিযুগের স্তর পার করার অন্য দ্বিতীয় উপায় নেই। মন যখন ব্যাকুল, তামসিক গুণে পূর্ণ, বৈরভাব, বিরোধী মনোভাবে পূর্ণ, নিরন্তর রাগ দ্বেষ সঞ্চারিত হচ্ছে, মন হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে, সেই সময় আমরা যদি চোখ বুজে বসেও থাকি তবে দেহটা তো অবশ্যই বসে থাকবে কিন্তু যে মনকে স্থির হতে হবে সে তো হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে, সেইজন্য ধ্যান হবে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বসে থেকে সময় নষ্ট করে কি লাভ? এইরূপ পরিস্থিতিতে লীলা সমূহের শ্রবণ এবং নাম জপ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। এইরূপ কর্ম করলে মানুষ ভবসাগরের অতীত হয়।

প্রশ্ন উঠছে যে, ভবসাগর কি মাত্র চারটি? এর উত্তর হল, না, ভবসাগর তো মাত্র একটাই কিন্তু অতিক্রম করার জন্য চিন্তন পথের চারটি শ্রেণী রয়েছে। এই শ্রেণীগুলিকেই সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি বলে। যদি আমাদের শ্রেণী কলিযুগের, প্রবেশিকা স্তরের, তবে এই অর্থে ভবসাগর অতিক্রম করার জন্য সাধনা, গুণগান ও নাম-জপ থেকেই শুরু করতে হবে। তাহলে আমরা একদম ভবসাগরের পারে চলে যাব না, পরন্তু দ্বাপরে প্রবেশ করব, যখন অন্তরে পদ-পূজা করার ক্ষমতা লাভ হবে, তখন নিরন্তর অভ্যাস করতে-করতে ভবসাগরের সীমায় পৌঁছাব। শুধু এটুকু করে গেলেই মুক্ত হয়ে যাব না পরন্তু চরণের চিন্তন এবং হৃদয়ে চরণযুগল ধারণ করার সতত অভ্যাসের ফলস্বরূপ ত্রেতাতে প্রবেশ লাভ হবে। সেই সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যজন, কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে চলে আসবে এবং এইপ্রকারে করে গেলেই মানুষ ভবসাগর অতিক্রম করে। এমন নয় যে, ত্রেতাযুগ অতিক্রম করলেই মুক্ত হওয়া যায় পরন্তু এতটা করে গেলে সত্যযুগে প্রবেশ লাভ হয়। সেই সময় ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা লাভ হয়। যখনই ধ্যান করতে চাইবেন মন সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপে স্থির হবে। কেন্দ্রিত হয়ে যাবে। অনুভবে উপলব্ধি হবে। প্রত্যেক সমস্যার সমাধান বুদ্ধি দ্বারা না হয়ে

ঈশ্বরের নির্দেশে হবে। এইভাবে কর্ম করলেই মানুষ ভব-সাগর অতিক্রম করবে।

এই প্রকার এগুলি হল সাধন-পথের চারটি শ্রেণী। এইগুলিকেই মহাপুরুষগণ কলিযুগ, দ্বাপর, ত্রেতা এবং সত্যযুগ এই চারটি সোপানে বিভক্ত করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগদর্শন'-এ এগুলির উল্লেখ অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক রূপে করেছেন। গোস্বামীজী মানসে অরণ্য কাণ্ডে **'উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ।'** (৪।১২) -মায়েদের মাধ্যমে এই চারটি যুগধর্মের নিরুপণ করেছেন।

১- নিঃসন্দেহে আমরা কলিযুগীয় কিন্তু চিন্তন দ্বারা ক্রমশঃ দ্বাপর, ত্রেতা, সত্যযুগ এবং অবশেষে তাও অতিক্রম করে ব্রহ্মের দিগ্‌দর্শনের সময় তাঁর স্বরূপের যে স্থিতি, সেই স্থিতি লাভ করতে পারি। অতএব যুগধর্ম সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান রয়েছে এবং গুণে পরিবর্তন হলে যুগধর্মে পরিবর্তনও হতে পারে।

২- যুগধর্ম ততক্ষণই ক্রিয়ারত থাকে, যতক্ষণ ঈশ্বর পৃথক, আমরা পৃথক, যতক্ষণ পরমতত্ত্ব পরমাত্মার আবির্ভাব হয় না। আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সাধনা, যুগধর্ম এবং এর কেন্দ্রভূমি মনও শান্ত হয়ে যায় এবং মনের মধ্যে প্রবাহিত তিনটিগুণও বিলীন হয়ে যায়। সেটাই শাশ্বত রামময় স্থিতি-

কাল ধর্ম নহিঁ ব্যাপহিঁ তাহী।
রঘুপতি চরন প্রীতি অতি জাহী।। *(মানস, ৭।১০৩।৭)*

৩- বাস্তবে যুগধর্মের উত্থান-পতন মনের উপর আধারিত, সেইজন্য-

বুধ জুগ ধর্ম জানি মন মাহীঁ।
তজি অধর্ম রতি ধর্ম করাহীঁ।। *(মানস, ৭।১০৩।৬)*

যুগ-ধর্ম মনের অন্তরালে বিদ্যমান জেনে বিবেকী ব্যক্তিগণ অধর্ম থেকে ধর্মের দিকে, ছোট ধর্ম থেকে মহান ধর্মের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। স্পষ্ট হয়েছে যে, যুগধর্ম পরিবর্তন সম্ভব।

৪- এখন আমরা যদি সত্য সত্যই সমাজের কল্যাণ কামনা করি তবে সকলেই সত্য লাভের জন্য প্রয়াস করুন। যখন সত্য লোকেদের সংখ্যা বেশী হবে, তখন সত্যযুগ স্বাভাবিকভাবে স্বতঃই চলে আসবে। আপনাকে পরম কল্যাণের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হবে। লোক কল্যাণও হবে এবং স্বয়ং তো কল্যাণ ভাজন হবেনই।

৫- তত্ত্বস্থিত অন্তরঙ্গ মহাপুরুষের কৃপাতেই যুগধর্মগুলি অতিক্রম করা সম্ভব। এর সাহায্যে সাধারণ পাঠককুলের বহু ভ্রান্তির নিরাকরণ হবে এবং অনন্ত শাখার মধ্যে থেকে সঠিক মার্গ চয়ন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে যে, তাঁরা কোন স্থান

থেকে শুরু করবেন। তখনই তাঁরা জানতে পারবেন যে, কোন্ পথে চলে তারা যথার্থতঃ কল্যাণের পাত্র হতে পারবেন। অতএব কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্য-লাভের লালসা অন্তঃকরণে সদৈব রাখুন।

***প্রশ্ন**- মহারাজজী, গোস্বামীজী নারীজাতির মাধ্যমে যুগধর্মের চিত্রণ কেন করেছেন?*

উত্তর- আপনি স্ত্রী হোন অথবা পুরুষ এই দেহ ভজনা করে না। ইষ্টোন্মুখ প্রবৃত্তিই ভজনা করে এবং করিয়ে নেয় স্ত্রী সংজ্ঞা হওয়ার জন্য নারী দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

।। ওঁ ।।

স্বার্থ

প্রশ্ন- মহারাজজী! জগতটা স্বার্থপরে পূর্ণ। 'সুর-নর-মুনি'ও বাকী নেই। তবে স্বার্থ থাকতে পরমার্থ হবে কি করে?

উত্তর- দেখুন, এই যে দশ বছরের ছেলেটি বসে আছে, এও জানে স্বার্থপর ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশি রয়েছে। ষাট-সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্যক্তিও বলছেন যে, আমরা স্বার্থপর। স্বার্থপরে ভরে আছে জগৎ। কিন্তু এটা সত্য নয়, বস্তুত সংসারে স্বার্থপর কম আছে। স্বার্থের স্বরূপ দুটো। একপ্রকার স্বার্থ তো তা, যা আপনি এখন একটু আগেই বললেন। এই স্বার্থেরই বশীভূত হয়ে মানুষ রাত-দিন মিথ্যা-কপট এবং ছলনা করে। তাকে জিজ্ঞাসা করুন এরূপ আপনি কেন করছেন, অমনি বলবেন স্বার্থের জন্য! এটা একপ্রকার স্বার্থ, কিন্তু যৌগিক শাস্ত্রগুলিতে স্বার্থের যে পরিভাষা ছিল তাতে এবং এই স্বার্থে অনেক তফাৎ রয়েছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে জগতে স্বার্থপর কম আছে।

রামচরিতমানস অনুসারে ভরত স্বার্থপর ছিলেন। মাতা কৈকেয়ী ভরতের জন্য সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যও এমন যেখানে কোনরূপ অভাব ছিল না। এমনকি-

অবধ রাজু সুর রাজু সিহাঈ।
দসরথ ধনু সুনি ধনদু লজাঈ।। *(মানস ২।৩২৩।৬)*

অবধের কোষ এত সম্পন্ন ছিল যে, ধনপতি কুবেরও লজ্জিত হয়ে চিন্তা করতেন যে, অবধের তুলনায় আমার কাছে তো কিছুই নেই। সম্মান কত বেশি ছিল?

আগেঁ হোই জেহি সুরপতি লেঈ।
অরধ সিংঘাসন আসনু দেঈ।। *(মানস, ২।৯৭।৪)*

দেবরাজ ইন্দ্রও সিংহাসন থেকে উঠে অবধের রাজাদের আদর আপ্যায়ন করার জন্য এগিয়ে যেতেন, নিজের সিংহাসনের অর্ধেকটা তাঁদেরকে বসার জন্য দিতেন। সম্মানে ইন্দ্রের সমকক্ষ, ঐশ্বর্যে কুবেরের থেকেও উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা মাতা কৈকেয়ী ভরতের জন্য করে দিয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও ভরত ব্যাকুল ছিলেন। কোথাও কোন অভাব বোধে চিত্ত ব্যথিত ছিল। সেই অভাব দূর করার জন্য তিনি চিত্রকূটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। অশ্রুমোচন করতে-করতে যখন প্রয়াগ

পৌঁছেছিলেন, লোকের মুখে শুনেছিলেন যে, প্রয়াগরাজ সবকিছু প্রদান করতে সমর্থ, এই তীর্থরাজের মহত্ত্ব অগাধ, তখন প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন, ভিক্ষা চেয়েছিলেন-

মাগউঁ ভীখ ত্যাগি নিজ ধরমূ।
আরত কাহ ন করই কুকরমূ।। (মানস, ২।২০৩।৭)

এমন কোন কুকর্ম নেই যা আর্ত করে না। মানুষ কখন প্রার্থী হয়? যখন পেট খালি থাকে। মানুষ আর্ত কখন হয়? যখন অর্থের অভাব হয়। অর্থ তো কুবেরের চেয়েও বেশি ছিল, তবে কেন ভরত আর্ত ছিলেন? বস্তুতঃ একপ্রকার অর্থ তো টাকা পয়সা, যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয়, আত্মিক সম্পত্তিও একপ্রকারের সম্পত্তি, যা এই দেহের নয় পরন্তু আত্মার পোষণ করে এই আত্মিক সম্পত্তির জন্যই ভরত আর্ত ছিলেন। চিত্রকূটে সভামধ্যে ভরত একথা স্বীকারও করেছেন।

কহউঁ বচন সব স্বারথ হেতূ।
রহত ন আরত কে চিত চেতূ।। (মানস, ২।২৬৮।৪)

আমি যা কিছু বলছি, নিজ স্বার্থে বলছি। আর্তের হুঁশ থাকে না। স্বার্থের জন্য ভরত আর্ত, নিজধর্ম ত্যাগ করে অনুনয় বিনয় করেছেন, যাচনা করেছেন। কি যাচনা করেছেন?

সীতা রাম চরন রতি মোরেঁ।
অনুদিন বঢ়উ অনুগ্রহ তোরেঁ।। (মানস, ২।২০৪।২)

তিনি ভগবানের চরণ কমলের প্রতি স্নেহ লাভ করার জন্য যাচনা করেছিলেন। ভরতের দৃষ্টিতে একমাত্র স্বার্থ হল ভগবানের চরণ যুগলের অনুরাগ।

ভগবান রাম তো প্রত্যাবর্তন করেননি কিন্তু ভরত তাঁর খড়ম জোড়া লাভ করেছিলেন। ভরত খড়ম জোড়া মাথায় করে ফিরে এসেছিলেন। এবং রাজ্যের নিকটবর্তী নন্দীগ্রামে এসে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। চিন্তন করতে-করতে শ্রদ্ধা যখন দৃঢ় হয়েছিল, খড়ম পূজাতে মন স্থির হয়ে এসেছিল, তখন তিনি নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছিলেন। যদিও-

দেহ দিনহুঁ দিন দূবরি হোই। ঘটই তেজু বলু মুখ ছবি সোঈ।।
নিত নব রাম প্রেম পনু পীনা। বঢ়ই ধরম দলু মনু ন মলীনা।।
(মানস, ২।৩২৪।১-২)

দেহ উত্তরোত্তর কৃশ হয়ে যাচ্ছিল (আহার গ্রহণ করলে যে বল বৃদ্ধি হয় তা

দিন দিন কমে যাচ্ছিল।) কিন্তু **'মুখ ছবি সোঈ'** —মানসিক প্রসন্নতা আগের মতই ছিল কারণ রামের প্রতি প্রেমের প্রতিজ্ঞা নিত্য নতুন এবং দৃঢ় হচ্ছিল, সেইজন্য মানসিক প্রসন্নতা কম ছিল না, মন মলিন ছিল না। এখানে ভরত নিজ স্বার্থ খানিকটা-পূরণ হতে দেখেছিলেন। যেদিন রাম প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেদিন তিনি নিজেকে স্বার্থসম্পন্ন বোধ করেছিলেন।

কাকভুশুণ্ডি স্বার্থপর ছিলেন। এক সময় গরুড়ের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি নারদ, ব্রহ্মা ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। শিব বলেছিলেন যে, তোমার সংশয় এত শীঘ্র দূর হবার নয়-

তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা।
জব বহু কাল করিঅ সতসঙ্গা।। *(মানস, ৭।৬০।৪)*

দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ কর, তবেই তোমার সংশয় দূর হবে। সেই সৎসঙ্গ যেখানে হয়, আমি তোমাকে সেখানেই পাঠাচ্ছি। ভগবান শিব গরুড়কে কাকভুশুণ্ডি আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। আশ্রমে পৌঁছেই তাঁর সন্দেহ প্রায় মিটে গিয়েছিল, যখন সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল তখন সর্বথা নির্মূল হয়েছিল। গরুড় বলেছিলেন-এখন আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ভগবন! আপনি এত সমর্থ, মহাপ্রলয়ের সময়ও আপনার বিনাশ হয় না-একথা ভগবান শিব বলেছেন এবং ভগবান শিব কখনও মিথ্যা বলেন না- **মুধা বচন নহিঁ ঈস্বর কহঈ (৭।৯৩।৬)** যখন আপনি এত সমর্থ যে, মহাপ্রলয়ের সময়ও আপনার বিনাশ হয় না তবে আপনি এই নিকৃষ্ট কালো কাকের দেহ ধারণ করে কেন রয়েছেন? কাকভুশুণ্ডিজী এর একটাই উত্তর দিয়েছিলেন-

জেহি তেঁ কছু নিজ স্বারথ হোঈ।
তেহি পর মমতা কর সব কোঈ।। (মানস, ৭।৯৪।৮)

যে মাধ্যমে স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তার উপর সকলেরই দুর্বলতা থাকে। এই কাক দেহে আবার কোন স্বার্থ সিদ্ধ হল? মহর্ষি কাক সমাধান করে বলেছেন-

রাম ভগতি এহিঁ তন উর জামী।
তাতে মোহি পরম প্রিয় স্বামী।। (মানস, ৭।৯৫।৪)

এই নিকৃষ্ট দেহে আমি রামের ভক্তি লাভ করেছি, সেইজন্য এই দেহ আমার পরমপ্রিয়।

মহর্ষি এও বললেন যে, আমি সদৈব কাক দেহেই জন্মগ্রহণ করেছি, এমন

কথাও নয়। আমি সুন্দর দেহও ধারণ করেছিলাম-

কওন জোনি জনমেউঁ জহঁ নাহীঁ। ম্যায় খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহীঁ।।

দেখেউঁ করি সব করম গোসাঈঁ। সুখী ন ভয়উঁ অবহিঁ কী নাঈঁ।।

(মানস, ৭।৯৫।৮-৯)

দানব-দেব, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, উঁচু-নীচু এমন কোন যোনি নেই যে যোনিতে ভ্রমবশতঃ আমি বার-বার জন্ম গ্রহণ করিনি। সকল প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেও আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এবার কাকের দেহে, যে দেহকে আপনি নিকৃষ্ট বলছেন, আমি ভক্তিলাভ করেছি। এইবার আমি যত সুখী হয়েছি সেরকম কখনও হইনি। সেই দেব দেহেও কি লাভ যে দেহ রামভক্তি শূন্য। কাকভুশুণ্ডিজীর অভিমত হল যে, রামের ভক্তিই একমাত্র স্বার্থ-

স্বারথ সাঁচ জীব কহুঁ এহা।

মন ক্রম বচন রাম পদ নেহা।। *(মানস, ৭।৯৫।১)*

বস্তুতঃ কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণকমলের প্রতি অনুরাগ হওয়াই জীবমাত্রের সত্যিকারের স্বার্থ। 'স্ব'-এর অর্থই হল স্বার্থ যার দ্বারা স্বয়ং-এর সিদ্ধি লাভ হয়, 'স্ব' রূপের উপলব্ধি হয়। ধনদৌলত, বিশাল সাম্রাজ্য চিরকাল কার থাকে? দেহটাই যখন থাকবে না তবে এর সুখের জন্য সংগৃহীত বস্তুগুলি কি করে নিজের হবে? ঘর-দোকান, পদ-প্রতিষ্ঠা, রাজ্য-বৈভবের প্রাপ্তি হলেও বস্তুতঃ 'স্ব' কিছুই লাভ করে না কারণ আমরা দেহ তো নই। দ্বিতীয়তঃ এই নশ্বর ভোগগুলিতে 'স্ব'-এর বাস্তবিক কল্যাণ নিহিত নেই, তা তো রামভক্তি দ্বারাই হবে। অতএব জীবমাত্রের বাস্তবিক স্বার্থ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, ইষ্টের চরণ-কমলে অনুরাগ যাতে জন্মায়। তাহলে আপনি পরমাত্ম স্বরূপের দিগ্‌দর্শন করে সেই স্থিতি লাভ করবেন সেখান থেকে কখনও পতন হয় না। এটাই সত্যকারের স্বার্থ।

কালান্তরে এই শব্দ অপভ্রংশ হওয়ার ফলে মানুষ আন্তরিক আশয় বর্হিজগতের বস্তুগুলিতে খুঁজতে শুরু করেছে। এটা লক্ষ্য করেই গোস্বামীজী লিখেছেন-

করহিঁ মোহ বস নর অঘ নানা।

স্বারথ রত পরলোক নসানা।। (মানস, ৭।৪০।৪)

মোহমুগ্ধ মানুষ নানা প্রকারের কুকৃত্য করে। নিজের বুদ্ধি অনুসারে তো সে স্বার্থপূরণেই লিপ্ত কিন্তু **'পরলোক নসানা'** —এখানের ভোগ বিলাস তো এখানেই

থেকে যায়, পরলোক পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। কারণ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি জানতে পারে না যে, বাস্তবিক স্বার্থ তো কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণ কমলের প্রতি অনুরাগকেই বলে।

বলে তো সকলেই যে, আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ভজনা করি, তবে তো সকলেই সত্যিকারের স্বার্থপর? কিন্তু না, এরও একটা পরীক্ষা রয়েছে, ভজনা করার একটা বিধান রয়েছে। বিভীষণ যখন শরণাপন্ন হয়েছিলেন তখন রাম স্বয়ং সেই বিধির উপর আলোকপাত করেছিলেন-

জননী জনক বন্ধু সুত দারা। তনু ধনু ভবন সুহৃদ পরিবারা।।
সব কৈ মমতা তাগ বটোরী। মম পদ মনহি বাঁধ বরি ডোরী।।

(মানস, ৫।৪৭।৪-৫)

মাতা-পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, প্রিয় পরিবার, পরম-হিতৈষী অথবা যতদূর মনের সম্বন্ধ প্রসারিত, সেই-সেই স্থান থেকে মমত্বের সুতো একত্র করে একটা দড়ি তৈরী করুন এবং সমস্ত মমত্বের কেন্দ্র যেন আমার চরণ হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মনকে একত্র করে দড়ির ন্যায় আমার চরণযুগলের সঙ্গে বেঁধে ফেল। যে এইরূপ করতে সমর্থ হয় '**করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা**'। *(মানস, ৫।৪৭।৩)* -আমি তৎক্ষণাৎ তাকে সাধুর সমতুল্য স্থিতি প্রদান করি, সাধ্য বস্তু সম্ভব করিয়ে দিই।

এই প্রকার স্বার্থপর হওয়ার পরীক্ষা এত বেশী কঠিন যে, সকলেই এতে উত্তীর্ণ হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। মিত্র-পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কোন-কোন বিরল ব্যক্তিই এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। সেইজন্য গোস্বামীজী যথার্থ স্বার্থপরদের গণনা করেছেন।

শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে স্বার্থপূর্তির জন্য প্রযত্নশীল অত্যল্প (ভাব) শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিও এককালে সুর-নর-মুনিদের মত শুদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।

সুর নর মুনি সব কৈ ইয়হ্ রীতী।
স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতী।। *(মানস, ৪।১১।২)*

মনুষ্য-জগৎ-এ সাধকের তিনটি শ্রেণীই এমন আছে যা শুধু স্বার্থপূর্তির জন্য প্রীতি করে। সেইসব সাধক ঋদ্ধির জন্যও লালায়িত হন না, এবং সিদ্ধাই ও তাদের আকর্ষণ করতে পারে না, পরন্তু কায়মনোবাক্যে ইষ্টের চরণযুগলের প্রতিই শুধু তাঁদের অনুরাগ থাকে। যাঁদের হৃদয়ে দৈবী সম্পত্তি প্রবাহিত সেই সাধকদের 'সুর' বলে। দৈবী সম্পত্তি হৃদয়ে যখন সম্পূর্ণরূপে প্রবাহিত হয়, সেই সময় আসুরী

বৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাসে প্রবেশ করার ক্ষমতা চলে আসে। অতএব শ্বাসে বিচরণ করার ক্ষমতা যাঁরা লাভ করেন, তাঁদের সুর বলে। ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য সঙ্কল্প বিকল্প তাঁর চিন্তনে বাধক হয় না। এইপ্রকার নরও সাধনার একটা স্তর বিশেষ। লিঙ্গ-ভেদ--এর আধারে নারী ও নর-এর লৌকিক বিভাজন এখানে লক্ষ্য নয়। 'মানস'-এর সমাপনে গোস্বামীজী মানস রোগগুলির নিদান করেছেন এবং অবশেষে 'নর'-এর স্বরূপের উপর আলোকপাত করেছেন-

মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা। তিহ্ন তে পুনি উপজহিঁ বহুসূলা।।
কাম বাত কফ লোভ অপারা। ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা ।।

(মানস, ৭।১২০।২৯-৩০)

মোহ সমস্ত ব্যাধির মূল। কাম বাত। কফ লোভ। ক্রোধ পিত্ত যা নিরন্তর বুকের ভিতর জ্বালা সৃষ্টি করে-

প্রীতি করহিঁ জৌ তীনিউ ভাঈ।
উপজই সন্যপাত দুখদাঈ।। ***(মানস, ৭।১২০।৩১)***

কাম, ক্রোধ, লোভ তিনটিই যখন হৃদয়ে এক সঙ্গে সক্রিয় হয়, তখন দুঃখদায়ী সন্নিপাতে ব্যক্তি পীড়িত হয়। সে তখন শুধু বিলাপই করে, ভগবৎ চরণের চিন্তা করার সে অবকাশই পায় না। **'অহঙ্কার অতি দুখদ ডমরুআ'** ***(মানস, ৭।১২০।৩৫)*** -অহঙ্কার দুঃখদায়ক গেঁটে বাত। এই প্রকার-

তৃস্না উদরবৃদ্ধি অতি ভারী।
ত্রিবিধি ঈষনা তরুন তিজারী।। ***(মানস, ৭।১২০।৩৬)***

তৃষ্ণা উদর বৃদ্ধির ন্যায় বেড়েই চলে। এইপ্রকার বহুরোগ গণনার শেষে গোস্বামীজী নিজস্ব মত প্রস্তুত করেছেন-

এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ, এ অসাধি বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সন্তত জীব কহুঁ, সো কিমি লহৈ সমাধি।।

(মানস, ৭।১২১ক)

উপর্যুক্ত রোগগুলির মধ্যে থেকে যদি একটাও ব্যাধি নর কে স্পর্শ করে তবে **'নর মরহিঁ'**- নরের মৃত্যু ঘটে। তবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নর এমন স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলে যে লোভ, মোহ, কাম-ক্রোধ, মদ-মৎসর ইত্যাদি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না। দৈববশত এদের মধ্যে যদি একটাও ব্যাধি তাকে স্পর্শ করে তবে সেই ব্যক্তি নরত্ব থেকে চ্যুত হয় এবং যার ভিতর সব ব্যাধি বিদ্যমান সে **'পীড়হিঁ সন্তত**

জীব কহুঁ, সো কিমি লহৈ সমাধি।'-সে ব্যক্তি, জীব এবং জড়, তার সমাধিমগ্ন হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠছে না।

ভক্তদের মহারাজজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-বলুন, আপনাদের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ আছে কি নেই? সকলে বলে উঠেছিলেন-'সবগুলিই আছে মহারাজ।' মহারাজজী বলেছিলেন যে, তবেই দেখুন এগুলির মধ্যে একটাও রোগ যে নর কে স্পর্শ করে, সেই নরের মৃত্যু হয়। আপনি তো জীবিত আছেন। কেন আপনার মৃত্যু হচ্ছে না?

স্পষ্ট হচ্ছে যে নর কোন এমন স্বরূপকে বলা হয়েছে যে ব্যক্তির মনের মধ্যে একটাও মানসরোগ থাকে না। 'মায়া রূপী নারি'-এর প্রভাব থেকে যে ব্যক্তি মুক্ত সেই ব্যক্তিকে নর বলে। হতে পারে বিকার আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু তৈরী থাকলেও স্পর্শ করতে পারে না। কদাচিৎ সেই বিকার সফল হলে ব্যক্তি নরত্ব থেকে চ্যুত হয়। এই দেহকে গোস্বামীজী মানুষ দেহের সংজ্ঞা দিয়েছেন-

বড়েঁ ভাগ মানুষ তনু পাওয়া।
সুর দুর্লভ সব গ্রন্থহ্নি গাওয়া।। *(মানস, ৭/৪২/৭)*

বড় ভাগ্যে মানুষদেহ অর্থাৎ মনের অন্তরালে স্থিরতা লাভে সমর্থ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই দেহ দেবতাদের পক্ষেও লাভ করা দুর্লভ। এইরূপ গায়ন সদ্‌গ্রন্থগুলি করেছে। এইরূপ নর-দেহ লাভ করে যে ভবসাগর পার করার প্রচেষ্টা করে না; গোস্বামীজীর অনুসারে সেই আত্মহনন কর্তা।

অতএব সুর-নর-মুনিই শুধু স্বার্থলাভের জন্য প্রীতি করেন। ভগবানের চরণ কমলের স্নেহই যথার্থ স্বার্থ। এই স্তরের স্বার্থপর ভরত, কাকভুশুণ্ডি, হনুমান এবং লক্ষ্মণ ছিলেন। 'মহাভারত'-এর অর্জুনও এই স্তরের স্বার্থপর ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, ধন-ধান্য সম্পন্ন ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্যেরও আমাদের কি প্রয়োজন? প্রমাণিত হল যে, ভৌতিক উপলব্ধিগুলি দ্বারা সেই স্বার্থ-'স্বয়ং' এর হিত, স্বয়ং-এর উপলব্ধি সম্ভব নয়।

যে-যে মহাপুরুষগণ 'স্বয়ং'কে লাভ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের এই এক অভিমত। যোগদর্শনকার মহর্ষি পতঞ্জলি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সন্দর্ভে তাঁরও মান্যতা আছে-

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ।
পরার্থাৎস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।। *(পাতঞ্জল যোগ০, বিভূতিপাদ।। ৩৫)*

অর্থাৎ সত্ত্ব (বুদ্ধি) এবং পুরুষ (আত্মা) দুটিই সম্পূর্ণ পৃথক। এক কখনও করা যেতে পারে না। এ দুটিই প্রায় সংমিশ্রণের মত হয়ে গেছে, যা মানুষ-বিচার করে পৃথক করতে পারে না, সেটাই ভোগ, যার দুটি প্রবৃত্তি পরার্থ এবং স্বার্থ। যখন বহির্মুখী পরার্থকে দমন করে সংযম স্বার্থপরের অবস্থাতে চলে আসে তখন **'পুরুষজ্ঞানম্'**—পরম পুরুষ পরমাত্মার বোধ হয়। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যেটাকে স্বার্থ বলে, সেই স্বার্থের দ্বারা সম্পত্তি যত বেশীই লাভ হোক, কিন্তু এর দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। অতএব যার সাহায্যে এই আত্মা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হয়, সেটাই স্বার্থ।

সাক্ষাৎকার কার হবে? কোন রূপের? না, সেটা তো মনের একটা কল্পনা। **'গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।।' (মানস, ৩।১৪।৩)** আপনি দেহ তো নন, মনও নন। আপনি তো আত্মা। যা শাশ্বত, একরস, সেই আত্মার দিগ্‌দর্শন, পুনরায় বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ যাতে না করতে হয়, তবেই পুরুষের স্বার্থ সিদ্ধ হয়।

মহাভারতের প্রস্তুত আখ্যান এই তথ্যই প্রতিপাদন করে। একটা যক্ষ শাপবশতঃ অজগর হয়ে জলাশয়ে পড়েছিল। তার চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যে ব্যক্তিই জলাশয় থেকে জল নেওয়ার চেষ্টা করত, সেই নিশ্চেষ্ট হয়ে তার আহার হয়ে যেত। সঠিক উত্তর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অজগরটির শাপ থেকে মুক্তির বিধান ছিল। বনবাসকালে বিচরণ করতে-করতে একবার পঞ্চপাণ্ডব সেই জলাশয়ের নিকটে পৌঁছেছিলেন। যুধিষ্ঠির সহদেবকে জল নিয়ে আসতে বলেছিলেন। অজগর তাকে চারটি প্রশ্ন করেছিল। সহদেব জ্ঞানী তো ছিলেন; কিন্তু সেই গূঢ় প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। ধর্মরাজের আজ্ঞানুসারে জল নিয়ে ফেরাটাও আবশ্যক ছিল। সহদেব অজগরটিকে উপেক্ষা করে যেমনি জল স্পর্শ করেছিলেন, নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রমশঃ নকুল, অর্জুন এবং ভীমেরও এই দশাই হয়েছিল। অবশেষে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পৌঁছেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন-মহাভাগ অজগর! আপনি কে? আমার শূরবীর ভাইয়েরা সংজ্ঞাশূন্য কি করে হল? আমি তৃষ্ণার্ত, আমার জলের দরকার। অজগর তাঁকেও প্রশ্ন করেছিল-

'কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্যম্ কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে?'

অর্থাৎ বার্তা কাকে বলে? আশ্চর্য কাকে বলে? কোনটা পথ? এবং সুখী কে?

যুধিষ্ঠির সমাধান করেছিলেন যে, মোহরূপ কড়াইতে জীব সমুদায়কে

দিবা-রাত্রি কাল রন্ধন করছে। এর মধ্যে উপযোগী বার্তা সেটাই যা তত্ত্বের নির্ণয় প্রদান করে। মানুষ এক-এক করে কাল কবলিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও জীবিত ব্যক্তিরা নিজেদের অজর-অমর মনে করেন, কালের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করেন না; এর থেকে বেশী আশ্চর্যের কথা আর কি হবে?

'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা'-যে পথ দিয়ে মহাপুরুষ, ভগবানের মহান্ ভক্ত গমন করেছেন, সেটাই আমাদের অভীষ্ট পদ। এই প্রকার পরম তত্ত্বে স্থিত নিস্পৃহ মহাপুরুষই বস্তুতঃ সুখী, তারপর আর দুঃখ হয় না।

এই উদ্বোধন বক্তৃতা শুনে অজগরের জড়তা দূরীভূত হয়েছিল। সে পুনরায় যক্ষের স্বরূপে পরিণত হয়ে বলেছিল-রাজন! আপনার জ্ঞান যথার্থ। আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনার যে কোন একটা ভাইকে আমি জীবিত করতে পারি। যুধিষ্ঠির নকুল অথবা সহদেবের মধ্যে একজনকে বাঁচানোর কথা বলেছিলেন। যক্ষ বলেছিল যে, ভীম এবং অর্জুনের মত ভাই বনে নিশাচরদের থেকে আপনাকে রক্ষা করে, তাদের না বাঁচিয়ে এই ছোটদের বাঁচাতে চাইছেন এদের দ্বারা আপনার কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হবে?

যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে, দেহ তো নশ্বর। কোন না কোন দিন তো ছাড়তেই হবে। অতএব ধর্মের রক্ষা করাই জীবাত্মার একমাত্র স্বার্থ। নিজের রক্ষার ভয় আমার নেই, অপিতু ধর্মের ভয় আছে। কুন্তীর একটা পুত্র আমি জীবিত রয়েছি, নকুল অথবা সহদেব বেঁচে থাকলে মাদ্রীরও বংশ চলতে থাকবে। ধর্ম একথাই বলে। যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা দেখে যক্ষ সকলকে প্রাণদান দিয়েছিল।

অতএব প্রচলিত ভ্রম পরিত্যাগ করে আমাদের সকলকে বাস্তবিক অর্থে স্বার্থপর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

।। ওঁ ।।

শিক্ষা ও বিদ্যা

প্রশ্ন : মহারাজজী! বর্তমানে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার, তারা চাকরী পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যে বিদ্যা অনাবশ্যক। বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের সময়কে অকারণে নষ্ট করে কি লাভ?

উত্তর : দেখুন, শিক্ষার অর্থ চাকরী নয়। যখন আপনি এম.এ. অথবা কোন ক্ষেত্রে রিসার্চ করতে শুরু করবেন, তখন দেশকে যেন আপনার চিন্তা না করতে হয়। এইজন্যই যে আপনি তখন সক্ষম, নিজের জীবিকার স্রোত নিজেই খুঁজে বার করবেন। এরই নাম তো শিক্ষা। পূর্ণ শিক্ষিত হওয়ার পরেও যদি আপনি অন্য কারও কাছে কিছু আশা করছেন তবে আপনার শিক্ষিত হয়ে কি লাভ? আপনি কোন ব্যবসা, কোন কর্ম খুঁজে বার করবেন, এমন কর্ম যাতে অন্য কারও ক্ষতি না হয়। এমন নয় যে, ডাকাতি করতে শুরু করে দিলেন, না হলে কিছু দিনের মধ্যে প্রাণ হারাতে হবে। আজকাল এই ধরণের মূর্খদের আয়ু বড়জোর কুড়ি থেকে তিরিশ বছর পর্যন্তই হয় কারণ আঠেরো বছর বয়স পার হওয়ার পরই দুর্বুদ্ধি তাদের খেলাতে শুরু করে। প্রথম-প্রথম দু-চার বছর তো ছেলেমানুষ ভেবে লোকে বলে যে, যাক ছেলেমানুষ ভুল করে ফেলেছে, কিন্তু তারপরেও না শোধরালে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত যেতে-যেতে লোকে ভাবে বিপজ্জনক হয়ে গেছে, তারপর তো সে একা লুকিয়ে বেড়ায় এবং হাজার হাজার লোক পিছনে ধাওয়া করে; কতদিন ধরা পড়বে না? অতএব এটা মানবতা নয়।

এখন আপনি এই মেষপালকদের লক্ষ্য করুন, এরা শিক্ষিত নয় কিন্তু যথেষ্ট সুখী। সচ্ছল পরিবার আজকের বুদ্ধিজীবীদের থেকে বেশী সুখী কারণ এদের চিন্তা, আবশ্যকতাগুলি কম। ব্যায়াম চর্চা, মেষ চরানো, দুগ্ধপান, যা পেল পেট পুরে খেল, শুধু মটর জোগাড় হল তো তারই রুটি তৈরী করে খেল। এদের অজীর্ণ অরুচি কিছুই হয় না। ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু কখনও বৈদ্যের দরকার হয়নি। কিছুদিন আগে মেষপালকেরা আশ্রমের পাশেই তাদের মেষ নিয়ে মূষলধার বৃষ্টিতে সারারাত ধরে আটকে ছিল। সকালবেলা আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, রাত্রে তো তোমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। সারারাত জলে ভিজে থাকা, তখন তারা বলেছিল ‘‘না, মহারাজজী! শিয়ালদের জন্য শীত এবং আহির, মেষপালকদের পক্ষে বর্ষা হিতকর। আমাদের কোন কষ্ট হয়নি। রাত্রে ভেজা কাপড় সকালে শুকিয়ে

নিই। সারাদিনের ভেজা কাপড় বিকেলে শুকিয়ে রাত্রের ছাড়া কাপড় সকালে পরে নিই। এই ক্রমেই চলতে থাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-কাপড় কি শুকিয়ে যায়?, তারা বলেছিল 'জল ঝরা বন্ধ হলেই হল, বাকিটা শরীরে শুকোতে থাকবে।' তাদের শীতও লাগে না, গরমও লাগে না। এখানে কেউ ভেজা কাপড় পরে থাকলে অথবা দু'ঘণ্টা জলে ভিজলেই শরীর খারাপ হয়ে যাবে, ওষুধ খেতে হবে কিন্তু এদের স্বাস্থ্যের ওপর দুষ্প্রভাব পড়ে না। এদের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-তোমার মনে কোন চিন্তা তো নেই? শুনে বলেছিল-না মহারাজ! কোন চিন্তা নেই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন দুঃখ? তখন অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর একজন বলেছিল-আমি তো কোন দুঃখ আছে বলে বুঝতে পারি না মহারাজ! সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন এটাই ভাবি যে, মেষগুলোকে কোনদিকে চরাতে নিয়ে যাব, যখন এরা নিজেরাই একদিকে চলতে শুরু করে তখন চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আর কোন চিন্তা থাকে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম- স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের জন্য ভাবনা হয় না। ধরে নাও কারও শরীর খারাপ হল তখন? সে বলেছিল-বয়সে প্রবীণ যে ঘরে থাকবে সে দেখবে। আমরা মেষও চরাবো আর বাড়িও সামলাবো? বলুন! শরীর ও মন কত সুস্থ এদের। কোন চিন্তা, কোন দুঃখ নেই। এটুকু পাবার জন্যই তো জগৎ ব্যস্ত। এদিকে বুদ্ধিজীবীরা দিন-রাত চিন্তায় অস্থির হয় যে, আমাদের মান, মর্যাদা, স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে বজায় রাখব?

এখন দেখলে দেখবেন প্রকৃতি-পুত্র মেষপালক ইত্যাদিরা বেশী সুস্থ, চিন্তাবিহীন এবং সুখী; কিন্তু না, এইভাবে থাকলে জগৎ বাঁচতে দেবে না। অশান্ত প্রকৃতির লোকেরা শান্তিপ্রিয় লোকেদের বাঁচতে দেয় না। চীন তিব্বত দখল করেছে। ভারতবর্ষেও শস্ত্রবিদ্যা কোনকালে খুব উন্নত ছিল। ভারতবর্ষ সর্ববিদ্যাতে নিপুণ ছিল কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শস্ত্র-বিদ্যাতে ন্যূনতা চলে এসেছিল। স্বাভাবিকরূপে যে শস্ত্র হাতের কাছে পেত, তা দিয়েই মানুষ কাজ চালাত। যখন বাবর ইত্যাদিরা যুদ্ধ করেছিল, তখন বাবরের কাছে তোপখানা ছিল, যা ভারতীয়দের কাছে ছিল না। এদিকে শুধু বল্লম এবং তলোয়ার চালনে কুশল ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশী ছিল। সেইজন্য রাজপূতদের পরাজিত হতে হয়েছিল। এই তোপখানাও পার্থিব শিক্ষারই অবদান। ইংরেজরা শিক্ষায় এর থেকেও বেশী উন্নত ছিল। যার জোরে তারা একবার তো সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করেছিল। মেষপালকদের মত শান্ত প্রকৃতিজীবীদের তারা শান্তিতে বাঁচতে দেয়নি, যেমন ইংরেজরা অষ্ট্রেলিয়াতে

করেছিল। অথবা তাদের প্রকৃতি প্রিয় পশুদের মত গোলাম বানিয়ে অন্য দেশকে বিক্রি করে দিয়েছিল অথবা নিজেদের ফার্মে তাদের দিয়ে বেগার খাটাত। অশিক্ষার কুপরিণামে এসব ঘটেছিল। সংসারে যদি আমরা কুশলতাপূর্বক বাঁচতে চাই তবে শিক্ষা অপরিহার্য। এটুকুই নয়, শিক্ষার অভাবে আমরা নিজেদের অধ্যাত্মবিদ্যা সুরক্ষিত করে রাখতে পারব না। কেউ আচার্য হয়ে যা কিছু পরামর্শ দেবে আমরা শিক্ষার অভাবে তাই স্বীকার করে নেব। সেই জন্য বর্তমানে পানীয় পান, অন্নগ্রহণ, নদী-নালা পার করলে সনাতন-ধর্ম নষ্ট হচ্ছে, যা শুধুই ভ্রম। এই প্রকার ধর্মের জ্ঞান সুরক্ষিত রাখার জন্যও শিক্ষা পরম আবশ্যক।

শিক্ষা থেকে যতই লাভ হোক, সেটা কিন্তু বিদ্যা নয়। বিদ্যা অন্য বিষয়কে বলে। বর্তমানে ভ্রমবশতঃ এই জগতের জ্ঞানকে বিদ্যা এবং এর জ্ঞাতাকে বিদ্বান্ বলা হয় কিন্তু বস্তুতঃ বিদ্যা এবং শিক্ষাতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। জগতে জীবনের দুটি ধারা বিদ্যমান-প্রথমত জীবন যাপন এবং দ্বিতীয়ত পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রাপ্তি। কুশলতাপূর্বক জীবনযাপন করার জন্য শিক্ষা আবশ্যক কিন্তু এই আত্মা যাঁর অংশ সেই পরমাত্মা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম এবং সেই অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত করিয়ে দেয় যে যুক্তি বিশেষ, তাকেই বিদ্যা বলে। আজকালকার বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটা বিদ্যা নয়।

মুণ্ডকোপনিষদ (প্রথম মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড) এ কাহিনী আছে যে শৌনক নামের একজন প্রসিদ্ধ মুনি ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাণের অনুসারে তাঁর ঋষিকুলে অষ্টাশী হাজার ঋষি অধ্যয়ন করতেন; কিন্তু তাঁরাও বাস্তবিক বিদ্যার জ্ঞাতা ছিলেন না। অতএব একবার তাঁরা সেকালের পরম্পরা অনুসারে হাতে সমিধা নিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার শরণে গিয়েছিলেন। বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- **কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি?।। ৩।।**

ভগবন! কাকে জানলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়? কীভাবে তাঁকে জানার চেষ্টা করব কৃপা করে বলুন? মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছিলেন-

দ্বে বিদ্যেবেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।। ৪।। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা য়য়া তদক্ষরমধিগম্যতে।। ৫।।

বিদ্যা দুপ্রকারের-এই দুটির মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদিগুলি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত

পড়ে, কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে জানা যায় সেটা পরা বিদ্যা। অঙ্গিরার মান্যতা অনুসারে বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ বিদ্যার কেউ যত বড়ই জ্ঞাতা হোক, মুখস্থও যদি করে নেয়; তবু অবিনাশী পরামাত্মাকে জানতে পারবে না। যে বিদ্যার সাহায্যে পরমাত্মার, সাক্ষাৎকার হয়, সেটা অন্য বিদ্যা। সেই বিদ্যার জন্য অঙ্গিরা পরামর্শ দিচ্ছেন-

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

(মুণ্ডক ১, খণ্ড ২/১২)

সেই পরব্রহ্মকে যে বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায় সেই বিদ্যা লাভ করার জন্য হাতে সমিধা নিয়ে উত্তমরূপে বেদের জ্ঞাতা ব্রহ্মে স্থিত সদ্গুরুর শরণে যাওয়া উচিত, এই বিদ্যা লাভের আর কোন উপায় নেই।

এইরূপ আখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ (প্রথম অধ্যায় / প্রথম খণ্ড)–এ পাওয়া যায়। একবার নারদমুনি সনৎকুমারকে উপদেশ দান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। সনৎকুমার তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি যা কিছু জান তাই বল, তবেই আমি তোমাকে তারপরের বিষয় সম্বন্ধে বলব।" নারদ বলেছিলেন যে, ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ববেদের জ্ঞাতা। আমি ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করেছি, যাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। বেদগুলির ও বেদ ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধ, কল্প, গণিত, উৎপাত জ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতি, দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, নৃত্য এবং সঙ্গীত ইত্যাদিরও আমিও উত্তমরূপের জ্ঞাতা। ভগবন! এতবিদ্যা জানা সত্ত্বেও আমি উত্তমরূপে শুধু মন্ত্রের জ্ঞাতা। আত্মাকে জানতে পারিনি। আমি আপনার সমকক্ষ মুনিদের মুখে শুনেছি যে, আত্মবেত্তা পুরুষ শোকহীন হন, কিন্তু আমার মধ্যে শোক বিদ্যমান। অতএব ভগবন্! আমাকে শোক থেকে মুক্ত করুন। সনৎকুমার উপর্যুক্ত শিক্ষাকে বাণীর বিলাস বলেছিলেন এবং এর থেকে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াত্মক উপাসনার উপর জোর দিয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২১ তম বেদমন্ত্র)-এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বহু শব্দের অধ্যয়ন করবে না কারণ সেটা তো বাণীর পরিশ্রম মাত্র। বাণীর শ্রম দ্বারা সেই ব্রহ্মকে লাভ করা যেতেই পারে না। তৈতিরয়োপনিষদ-এর শ্রুতি হল- **যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।** (ব্রহ্মানন্দবল্লী, নবম অনুবাক্)।

মনসহিত বাণী ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি যাকে না জানতে পেরে ফিরে আসে-

মন সমেত জেহি জান ন বানী। *(মানস, ১।৩৪০।৭)*

পুস্তকীয় জ্ঞানকে তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে-

শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ।

ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ।। ১।।

আচার্যগণ বলেন যে এখন আমরা শিক্ষার বর্ণনা করব। যাতে বর্ণ, স্বর, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রাগুলি বর্ণের উচ্চারণে প্রযুক্ত জোর, সেগুলির গেয়তা এবং সন্ধি ইত্যাদি নিয়মগুলির সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হবে। তৎপশ্চাৎ লৌকিক বিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, প্রজনন বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, ব্যায়াম ইত্যাদি শারীরিক সংহিতাগুলির বর্ণনা, কিন্তু তার সঙ্গে 'অধিবিদ্যম্'-বিদ্যার বিষয়েও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

একথা উল্লেখযোগ্য যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের তিনটি ভাগ আছে- শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী এবং ভৃগুবল্লী। শিক্ষাবল্লীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে যে মনুষ্য নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় সে ইহলোক এবং পরলোকের সর্বোত্তম ভোগগুলি লাভ করতে সমর্থ হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করার যোগ্য হয়। এই বল্লীতে বিদ্বান্ মনীষীগণ শিক্ষা দ্বারা লৌকিক এবং পারলৌকিক ঐশ্বর্য প্রাপ্তির শাস্ত্রানুমোদিত মার্গ সম্বন্ধে তো বলেছেন কিন্তু এই ভোগগুলিকে নশ্বর বলে তাদের মুখ্য দৃষ্টি ব্রহ্মবিদ্যার উপরই আছে। দ্বিতীয় বল্লীতে তাঁরা ব্রহ্মানন্দের মহত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন এবং অন্তিম ভাগে তাঁরা সেই ক্রিয়াত্মক বিদ্যার বর্ণনা করেছেন, যে পথে চলার নির্দেশ বরুণ নিজ পুত্র ভৃগু ঋষিকে দিয়েছিলেন।

উপনিষদগুলির নির্ণয় হল- '**সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।**'-বিদ্যা সেটাই যা মুক্তি প্রদান করবে। এই ভাবকেই শঙ্করাচার্য প্রশ্নোত্তরীতে ব্যক্ত করেছেন। '**বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদায়া। বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।।**'

বোধ সেটাই, যা পূর্ণমুক্তির হেতু। এই নয় যে সবকিছু শুনে জ্ঞানী হয়ে গেলাম। সবকিছু শোনার পরেও চলা তো বাকী থাকে। সেই দূরত্ব মুখে বলে নয় চলেই সমাপ্ত করা যেতে পারে। সেইজন্য ভগবৎ পথে হাজার-হাজার শাস্ত্র অধ্যয়ন করার অপেক্ষা সেই পথে যে এক পাও অগ্রসর হয়েছে তার মহত্ত্ব অধিক। যে বিদ্যা ব্রহ্ম হতে এক ইঞ্চিও দূরে রাখে, তার অন্তরালে অবিদ্যাও কার্যরত আছে। বর্তমান স্কুল কলেজের পড়াশোনা দ্বারা কি ব্রহ্মগতি লাভ হয়? বড়জোর ভাল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অতএব লেখাপড়াকে যারা বিদ্যা মনে করে অথবা পুস্তকীয় জ্ঞান-এর ঢোল পেটে যারা, তারা বস্তুতঃ ভ্রান্ত। এইরূপ লোকেদেরই লক্ষ্য করে

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে-

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। *(১/২/৮)*

অবিদ্যার বশীভূত হয়েও নিজেকে বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত মনে করে যে মূর্খব্যক্তিরা, তারা বার-বার কষ্ট সহ্য করেও সেইরূপ ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করে, যেরূপ অন্ধের নির্দেশ অনুসারে চলে অন্ধব্যক্তি ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মহাত্মা কবীরও এই কথাই বলেছেন-

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুআ, পণ্ডিত ভয়া না কোয়।
ঢাই আখর প্রেম কা, পঢ়ে সো পণ্ডিত হোয়।।

এই পীড়া সম্বন্ধেই পূজ্য মহারাজজী প্রায়ই বলতেন-কি যে বলি, আর কি করে যে বলি, দু'পয়সায় বেদান্ত বিক্রি হয়। সকলেই পাঠও করে, লিপিবদ্ধও করে; কিন্তু সাধন সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে না।

সেই বিদ্যা সকলেই অধ্যয়নও তো করতে সমর্থ হবে না। কঠোপনিষদে এই বিষয়েই একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে যে, মহর্ষি উদ্দালকের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর পুত্র নচিকেতা যমরাজের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিল। যমরাজ নচিকেতাকে বর চাইতে বলেছিলেন। নচিকেতা তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য জানতে চেয়েছিল, তখন যমরাজ তাকে পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য ভোগ এবং স্বর্গের দিব্য ভোগগুলির প্রলোভন দিয়েছিলেন কিন্তু নচিকেতা সেসবই প্রত্যাখ্যান করেছিল। যমরাজ তার বৈরাগ্যের প্রশংসা করে তাকে বিদ্যা লাভের অধিকারী ঘোষিত করেছিলেন-

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিতং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ।।
(দ্বিতীয় বল্লী, ৪)

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ভিন্ন ফল প্রদান করে। নচিকেতা! আমি তোমাকে শুধু বিদ্যারই অভিলাষী মনে করছি; কারণ তোমাকে অনেক ভোগও আকর্ষণ করতে পারল না। একথা প্রমাণিত যে, বিদ্যার অধিকারী সেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই হতে পারে যে পুত্র-পৌত্র, সম্পত্তি-প্রতিষ্ঠা এবং স্বর্গীয় সুখালয়ের চিরকালের সুখ পর্যন্ত তিলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে। অনাধিকারীকে বিদ্যাদান করলে গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই পশ্চাত্তাপ করতে হয়। 'মানস'-এ কাকভুশুণ্ডিজীর অনুভূতি হয়েছিল।

অধম জাতি ম্যায় বিদ্যা পাএঁ।

ভয়উঁ জথা অহি দূধ পিয়াএঁ।। ***(মানস, ৭।১০৫।৬)***

যে ব্যক্তি সাপকে দুধ খাওয়ায়, দুধ পান করে পুষ্ট হয়ে সেই সাপ সবার আগে তাকেই দংশন করে। কাকভুশুণ্ডিজীর পূর্ব জীবনে এর পরিণতি গুরু অবমাননারূপে হয়েছিল।

উপনিষদগুলিতে বিদ্যার ফল পরমাত্মা, লাভ বলা হয়েছে। ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্র হল-'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।' -বিদ্যা থেকে অমৃত স্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতাশাস্ত্রের নবম অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন-

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।। (৯।১)

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।। (৯।২)

অর্জুন! এখন আমি তোমাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে বলব, যা জানার পর তুমি এই সংসার-বন্ধন থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, রাজবিদ্যা। স্পষ্ট হল বিদ্যা এমন বিষয়, যা জেনে মানুষ দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়। এই বিদ্যা অব্যক্ত, স্লেটে লেখা সম্ভব নয়। পরন্তু অব্যক্ত হতে প্রবাহিত একটি ধারা বিশেষ, যা পরমকল্যাণকর।

পরমগতি প্রদায়িনী বিদ্যা ষোলো বছর অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হয় না-

গুর গৃহঁ গয়ে পঢ়ন রঘুরাঈ।

অলপ কাল বিদ্যা সব আঈ।। ***(মানস, ১।২০৩।৪)***

কিছুকালের মধ্যেই '**বিদ্যা সব আঈ**'-সকল বিদ্যার জ্ঞাতা হয়েছিলেন। গুরুকুলের বিদ্যা খুব অল্পসময়ে শেখা যায়, এমন হয় না যে, সারাটা জীবন বেদ-শাস্ত্র মুখস্থ করতে হয়। এই বিদ্যা ইষ্ট দ্বারা প্রেরিত অনুভবগম্য যা তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

'মানস'-এ উল্লিখিত আছে যে, দশ হাজার জন্ম ধরে প্রায়শ্চিত্ত করে কাকভুশুণ্ডি মনুষ্য দেহ লাভ করেছিলেন দশ হাজার জন্ম আগেও তিনি সাধু ছিলেন। কিন্তু দম্ভী ছিলেন, মূর্খ ছিলেন না, উগ্র মেজাজের ছিলেন- '**উগ্র বুদ্ধি উর দম্ভ বিসালা।।**' ***(মানস, ৭।৯৬।৩)*** গুরু হিতকর উপদেশ দান, বিদ্যাই দান করতেন

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সেটা মুখস্থ করার পর তাঁর মনে এই কথা উদিত হয়েছিল যে, গুরু মহারাজের কাছে আর আছে কি? যা কিছু ছিল সবটাই আমি জেনে গেছি **'গুর নিত মোহি প্রবোধ দুখিত দেখি আচরন মম।'** *(মানস, ৭/১০৫খ)* -গুরুদেব নিত্যই বাস্তবিক প্রবোধ করতেন। আমার আচরণ দেখে দুঃখ পেতেন (এখানেও গুরুগৃহের শিক্ষা এবং বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্তমানে শিক্ষক ক্লাসে সকলকে একসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। ছাত্ররা যতটুকু বুঝতে পারে, গ্রহণ করে, শিক্ষক ছাত্রদের ভাগ্যের ভরসায় ছেড়ে দেন কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যকে ততক্ষণ বোঝান, যতক্ষণ না শিষ্য হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। শিষ্যকে ভাগ্যের ভরসায় ছেড়ে দেন না, তিনি যখন শিষ্যকে তৈরী করেন গুরুই বানিয়ে দেন। শিষ্যকেও সেই গুরুত্বে স্থিতি প্রদান করেন, যদি এর জন্য শিষ্যকে হাজারবার জন্ম নিতে হয়; তবুও কিন্তু গুরুদেবের বিদ্যা তার অন্তরে সদাই প্রবাহিত থাকে, বর্তমানের শিক্ষার মত 'আজকের পড়া কাল বিস্মৃত, হয় না-**'কবনেউঁ জন্ম মিটিহি নহিঁ গ্যানা।'**) অস্তু, গুরুদেব আমাকে বোঝাতেন আমার আচরণ দেখে দুঃখী ছিলেন, কিন্তু **'মোহি উপজই অতি ক্রোধ দম্ভিহি নীতি কি ভাবঈ।'** *(মানস, ৭/১০৫ খ)* আমার অত্যন্ত ক্রোধ হত, দাম্ভিকদের কি নীতি ভাল লাগতে পারে?

একবার আমি মন্দিরে বসে শিব-নাম জপ করছিলাম। সেই সময়ই মহারাজ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু অভিমানবশতঃ আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করিনি। গুরুদেব তো পরম দয়ালু ছিলেন, তিনি কিছু বলেননি; কিন্তু **'অতি অঘ গুর অপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেস।'** *(মানস ৭/১০৬ খ)* -গুরুদেবের অপমান-খুব বড় অপরাধ ছিল যা ভগবান শিবই সহ্য করতে পারেননি। যে শিবের আমি ভক্ত ছিলাম সেই ইষ্টই শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন। তক্ষুণি শাপ দিয়েছিলেন-ওরে অধম! অজগরের মত বসেই থাকলি? যা! আজ থেকে অজগর হয়ে যা এবং এক হাজার জন্ম পর্যন্ত এইভাবেই ভোগ কর। কিন্তু সদ্‌গুরু যদি কখনও রাগ করেনও, শিষ্যের কল্যাণের জন্য করেন। তার পতনের জন্য করেন না। কুম্ভকার মৃন্ময় পাত্রগুলিকে সঠিক আকার দেবার জন্যই সেগুলিকে পেটেন, ভেঙ্গে ফেলার জন্য নয়। ঠিক এইরূপ গুরুদেবেরও নিজস্ব পদ্ধতি থাকে তিনি যে তাড়না দেন, তা শিষ্যের কল্যাণের জন্য। গুরু মহারাজ হাহাকার করে উঠেছিলেন। ভগবান শিব তখন বলেছিলেন-এক হাজার জন্ম পর্যন্ত একে ভোগ তো অবশ্য করতে হবে, তারপর মানব-দেহ লাভ করবে কিন্তু আপনার দেওয়া উপদেশ কখনও ভুলবে না-

কবনেউঁ জন্ম মিটিহি নহিঁ গ্যানা।

সুনহি সূদ্র মম বচন প্রবানা।। *(মানস, ৭/১০৮/৯)*

যখন মানব-দেহ লাভ করেছিলেন, হাজার জন্ম পূর্বে গুরু যে বিদ্যার উপদেশ দান করেছিলেন, স্মৃতিতে তা জেগে উঠেছিল, তাতে অনুরাগ স্থির হয়েছিল এবং ভগবানের চরণের প্রতি মনে ভক্তি জেগেছিল। অতএব বিদ্যা একবার জাগ্রত হলে তা কখনও নষ্ট হয় না।

প্রৌঢ় ভএঁ মোহি পিতা পঢ়াওয়া।

সমঝউঁ সুনউঁ গুনউঁ নহিঁ ভাওয়া।। *(মানস, ৭/১০৯/৫)*

বয়স হলে পিতা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি মূর্খ ছিলাম না, বুঝতাম, শুনতাম, চিন্তন করতাম, কিন্তু-**'নহিঁ ভাওয়া'**-ইচ্ছা করত না। অবশেষে-**'হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ।'** *(মানস, ৭/১০৯/৮)* শেষ পর্যন্ত পিতা পড়াবার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তবুও আমি পড়িনি। সেইজন্য গরুড়ের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল যে, জ্ঞানের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তো কিছু নেই। আপনার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। আপনি শিখলেন না কেন? মহর্ষি কাক উত্তর দিয়েছিলেন-

কহু খগেস অস কবন অভাগী।

খরী সেব সুরধেনুহি ত্যাগী।। *(মানস, ৭/১০৯/৭)*

গরুড়জী! যখন ইচ্ছামত দুধের জন্য কামধেনু উপলব্ধ, তবেই বলুন এমন অভাগা কে আছে যে, এক ছটাক দুধের জন্য গর্ধভীর সেবা করবে? সেইজন্য গরুড়জী! আমি পড়িনি। প্রমাণিত হল যে, সেই শিক্ষা বিদ্যা নয়; বিদ্যা অন্য বিষয়। যদিও কাকভুশুণ্ডি নিরক্ষর ছিলেন তবু তিনি সেই যুগের সর্বোপরি বিদ্বান ছিলেন। এমনকি তাঁর কাছে শিক্ষা করার জন্য হংসদের অর্থাৎ অনুরাগীদের ভীড় লেগে থাকত।

বর তর কহ হরি কথা প্রসঙ্গা।

আওহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা।। *(মানস, ৭/৫৬/৭)*

সুনহিঁ সকল মতি বিমল মরালা।

বসহিঁ নিরন্তর জে তেহিঁ তালা।। *(মানস, ৭/৫৬/৯)*

ত্যাগের সরোবরে যাঁরা সাঁতার কাটতেন তাঁরাই সেখানে নিরন্তর কাহিনী শ্রবণ করতেন। এমনকি শিব, যাঁর ডমরু থেকে বিদ্যাসমূহ নিঃসৃত হয়েছে, তিনিও সেখানে সৎসঙ্গ শুনতে যেতেন। প্রমাণিত হচ্ছে যে ভগবৎ পথে ভৌতিক শিক্ষার

কোন উপযোগিতা নেই এবং এই শিক্ষা বিদ্যাও নয়।

তবে বিদ্যা কাকে বলে? একবার লক্ষণ পঞ্চবটীতে প্রশ্ন করেছিলেন যে, ভগবান! ঈশ্বর কে? জীব কাকে বলে? মায়া কাকে বলে? এইপ্রকার পাঁচ-সাতটি প্রশ্ন লক্ষণ করেছিলেন তখন ভগবান রাম বলেছিলেন-

থোরেহি মহঁ সব কহউঁ বুঝাঈ।
সুনহু তাত মতি মন চিত-লাঈ।। *(মানস, ৩/১৪/১)*

তাত! আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি তুমি বুদ্ধি, চিত্ত এবং মন দিয়ে শোন-

ম্যায় অরু মোর তোর ত্যাঁয় মায়া।
জেহিঁ বস কীন্হে জীব নিকায়া।। *(মানস, ৩/১৪/২)*

আমি, আমার, তুমি, তোমার-এটাই মায়া। এইরূপ মনোভাবই চরাচর জীবকে নিজের বশীভূত করে রেখেছে। জীবকে তার লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

তেহি কর ভেদ সুনহু তুমহ্ সোউ।
বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ।। *(মানস, ৩/১৪/৪)*

এই মায়ার দুটি ভেদ, একটি বিদ্যা এবং আরেকটি অবিদ্যা।

এক দুষ্ট অতিসয় দুখ রূপা।
জা বস জীব পরা ভবকূপা।। *(মানস, ৩/১৪/৫)*

এগুলির মধ্যে অবিদ্যা অত্যন্ত দুষ্ট, অবিদ্যার (অধীন) বশীভূত হয়ে এই জীবাত্মা ভবকূপে পতিত হয় এবং আরেকটি শাখা বিদ্যার সম্বন্ধে বলছেন-

এক রচই জগ গুন বস জাকেঁ।
প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ।। *(মানস, ৩/১৪/৬)*

গুণ যার অধীনে রয়েছে বিদ্যা তাকেই বলে। গুণ মায়াতে কোথাও নেই। যা নশ্বর '**অশাশ্বতং দুখালয়ম্**'-যা দুঃখের আলয় এবং নশ্বর সেখানে গুণ এবং সুখ কি করে লাভ হবে? কল্যাণকারক গুণ ধর্ম তো শুধু ঈশ্বরে বিদ্যমান। স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করলে মায়ার দ্বিতীয় ভেদ বিদ্যা, যার আশ্রিত গুণ তা লাভ হয় না। '**প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ।**' সেই বিদ্যা প্রভু-প্রেরিত। যখন প্রেরকরূপে স্বয়ং প্রভু অবতরণ করেন, অন্তরে জাগ্রত হয়ে পথ-প্রদর্শকের রূপে দাঁড়িয়ে যান, তাঁর প্রেরণাতেই সেই বিদ্যা আমাদের অন্তরে প্রকট হয়ে কাজ করতে শুরু করে।

অতএব আমাদের যদি বিদ্যা (যা ভবসাগর থেকে পার করে, পরম কল্যাণ কারক)-এর প্রয়োজন তবে উর প্রেরকের প্রাপ্তি নিতান্ত আবশ্যক। কোন তত্ত্বস্থিত

মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ, তাঁর সংরক্ষণে থেকে কিছু সেবা এবং তাঁর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে ছ'মাস, বছর খানেক অভ্যাস করলে আত্মা জাগ্রত হন এবং সেই ঈশ্বরীয় প্রেরণার স্রোত উপলব্ধ হয়, তাঁর কাছ থেকে যে উপদেশ অথবা আদেশ হয় সেটাই বিদ্যা। যেমন-যেমন সাধক উন্নত হবে, তেমন-তেমন এই আদেশ, ঈশ্বরীয় স্রোত, ঈশ্বরীয় গুণ-ধর্ম বৃদ্ধি পাবে। মায়িক দ্বন্দ্ব ক্ষীণ হতে থাকবে। যখন সর্বভাবে ঈশ্বরের নিকটে থাকার অবস্থা চলে আসবে, তখন হৃদয় ঈশ্বরীয় গুণ-ধর্মেরই কেন্দ্র হয়ে যাবে কিন্তু তাঁর প্রেরণাতেই এরূপ হওয়া সম্ভব অন্য কোন পথ নেই। সেইজন্য যিনি আত্মোপলব্ধি করেছেন তাঁর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করে আত্মার ধ্বনি প্রাপ্তির চেষ্টা করুন। যতক্ষণ আত্মার ধ্বনি প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ সেই বিদ্যা, বিদ্যা নয়। ততক্ষণ তাকে লাভ করার জন্য আমরা যা কিছু খেদ প্রকট করি, সেই দিশাতে অগ্রসর হই, সেটা শুধুমাত্র প্রয়াস, কখনও বিফল হবে না।

প্রশ্ন- মহারাজজী! বিদ্যালাভের পরেও কি বিবেকের আবশ্যকতা থাকে?

উত্তর- দেখুন, বিদ্যা যখন হরি-প্রেরিত তখন বিবেকের এটুকুই কাজ যে, হরি কি আদেশ দিচ্ছেন? -তা শিরোধার্য করুন এবং সেই অনুসারে চলুন। সেই আদেশ অনুসারে চলার ক্ষমতাকেই বিবেক বলে। যদি তা মেনে চলার ক্ষমতা নেই তবে বিদ্যা কাজ করবে না, ভগবানও রুষ্ট হয়ে যাবেন-

মোরেহু কহেঁ ন সংসয় জাহীঁ।
বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ ।। (মানস, ১।৫১।৬)

পূজ্য পরমহংস মহারাজজী এই বিবেক সম্বন্ধে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন যে, "হো! আজ্ঞা পালন করাই ভজনা। তোমার দেখার দরকার নেই আজ্ঞা ভুল কি ঠিক।" কিন্তু আমাকে তিনি একথা আট বছর পর বলেছিলেন। শুরুতে বলেননি। শুরুতে সাধকের মধ্যে আজ্ঞা পালনের ক্ষমতাও থাকে না এবং আজ্ঞাও পাওয়া যায় না। যখন হৃদয়ে ঈশ্বরীয় আদেশের সূত্রপাত হয়েছিল, তারপরেই মহারাজজী বলেছিলেন যে, আজ্ঞা পালনই ভজনা। সেই আজ্ঞা পালন করলে যে বস্তুলাভ হবে, সেটাই বিদ্যা। বিবেকের এটুকুই কাজ যে সেই আজ্ঞা দৃঢ়ভাবে পালন কর। ভগবান যদি আদেশ দিচ্ছেন যে, এই পথ দিয়ে এগিয়ে যাও তবে এটা ভেব না যে, সম্মুখে সাপ রয়েছে। সাপ থাকলেও সেটা মালাতে পরিণত হবে। মীরার জন্য মালা হয়ে গিয়েছিল। বিষ থাকলে অমৃত হয়ে যাবে, মীরার জন্য অমৃত হয়ে গিয়েছিল। কারণ উর প্রেরকের সঙ্কেতেই তিনি বিষপান করেছিলেন-

রাণা জী! ম্যায় তো গিরিধর রঙ্গওয়া রাতী।
কোঈ কে পিয়া পরদেশ বসত হ্যাঁয়, লিখ লিখ ভেজৈ পাতী।
মেরে পিয়া মেরে হিয় বসত হ্যাঁয়, না কহুঁ আতী জাতী।।

মীরার পরম প্রিয় পরমাত্মা তার হৃদয়ে জাগ্রত ছিলেন, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত ছিলেন, সেইজন্য তিনি নির্ভয় ছিলেন।

প্রশ্ন- মহারাজজী! তবে তো যে সঙ্কেত অন্তর থেকে পাওয়া যায়, সেটাই কি বিদ্যা?

উত্তর- হ্যাঁ, সেটাই বিদ্যা। '**প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ**।' -সেই বিদ্যা প্রভু দ্বারাই প্রেরিত। সেই কারণেই বিশ্বের বহু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ পার্থিব শিক্ষাতে নিরক্ষর ছিলেন। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার পাঁচ বছরের বালকই তো ছিলেন, পড়াশোনা কোথায় করেছিলেন? শুকদেব ছেলেবেলাতেই গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু অনেক জন্মের পথিক ছিলেন। বিদ্যা স্বাভাবিকরূপে জন্মের পর থেকেই তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত ছিল। তাঁর পিতা ব্যাস নিজের যুগের খুব বড় বিদ্বান্ ছিলেন। চারটি বেদ, ছটি শাস্ত্র, আঠারোটা পুরাণ মহাভারত এবং ভাগবত ইত্যাদির রচয়িতা ছিলেন, সঙ্কলন কর্তা ছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানে শুকদেব তাঁর থেকে এগিয়েছিলেন। যদি লেখাপড়াই বিদ্যা হত, তবে তো ব্যাসদেব খুব শিক্ষিত ছিলেন। নিরক্ষর ছিলেন কাকভুশুণ্ডি,'**হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ।**' জড়ভরত পড়াশোনা করেননি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টি ইষ্টে ছিল, লোকে তাঁকে পাগল ভাবত।

ঠিক এই প্রকার 'মহামানব বুদ্ধ'ও সাংসারিক শিক্ষা দীক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। রাজপুত্র ছিলেন, তাঁর শিক্ষারও উত্তম ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাঁর মন পড়াশোনাতে বসত না। যদ্যপি বৌদ্ধ গ্রন্থ, 'ললিত বিস্তার'-এর অনুসারে সিদ্ধার্থ ছেলেবেলাতে তৎকালীন কলা-কৌশলের শিক্ষা কপিলবস্তুতে থেকে অর্জন করেছিলেন এবং আর একটি গ্রন্থ 'মহাবস্তু'-এর অনুসারে যশোধরার স্বয়ম্বরে পাঁচশো শাক্য কুমারদের মাঝে আয়ুধ-কৌশল-প্রদর্শনে তাঁকে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করতে হয়েছিল কিন্তু যে বিদ্যার স্পর্শে সিদ্ধার্থ বুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; সেখানে সেই শিক্ষা তাঁর কোন কাজে লাগেনি। চিন্তনশীল হওয়ার ফলস্বরূপ বালক সিদ্ধার্থের মন এই সাংসারিক বিষয়গুলিতে অনুরক্ত হত না। সকলে তাঁকে মহল থেকে তফাতে এক জম্বু বৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থ অবস্থাতে দেখেছিল। সাধনাবস্থাতে সিদ্ধার্থের অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা, মল্ল-বিদ্যা এবং ধনুর্বেদের অতিশয় দক্ষতা কোন কাজে

লাগেনি। সিদ্ধার্থ এসব বিদ্যা উপেক্ষা করে এগুলি ত্যাগ করে বাস্তবিক বিদ্যা লাভ করার জন্য গুরুর খোঁজে রাজগৃহ গিয়েছিলেন, যেখানে আলার এবং উদ্রক নামের দু'জন ঋষির কাছ থেকে তিনি আর্য সাধনা-পদ্ধতির জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে ধ্যানের স্তরগুলি পার করে গয়াতে বটবৃক্ষের নীচে তিনি বিদ্যার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বিদ্বান্ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 'বুদ্ধ'-এর পদবী লাভ করেছিলেন। তথ্য অবগত হওয়ার জন্য তাঁকে 'তথাগত' বলা হয়।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে যাতায়াতের বাধা-বিঘ্ন সহ্য করে, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গগুলি নিজেদের ছোট ছোট নৌকা দ্বারা চিরে ভারতীয়রা চীন, জাপান, মিশ্র এবং গ্রীক দেশ পর্যন্ত পৌঁছে বুদ্ধের সেই বিদ্যারই বাণী সকলকে শুনিয়েছিল, সেই উপদেশ সেখানের জনতা শুধু আদরপূর্বক শ্রবণই করেনি পরন্তু গ্রহণও করেছিল, যা বর্তমানেও বিশ্বের অধিকাংশ জনতার কল্যাণের স্রোত। কলিঙ্গ ধ্বস্ত করার সময় রণোন্মত্ত অশোকের কর্ণ-কুহরে বুদ্ধের এই বিদ্যারই শব্দ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তলোয়ার সদা সর্বদার জন্য ত্যাগ করেছিলেন। যেখানে-যেখানে এই বিদ্যা পৌঁছেছিল, ভেরীঘোষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে ধর্মঘোষই শোনা যাচ্ছিল। এই বিদ্যারই প্রচার করার জন্য অশোক নিজপুত্র এবং কন্যাকে লঙ্কা পাঠিয়েছিলেন এবং নিজের বাকী জীবন এই বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে সমর্পিত করেছিলেন। ভারত আক্রমণকারী গ্রীক, শক, পহ্লব কুষাণ এবং হূণ জাতিদের এই বিদ্যা শুধু আকর্ষিতই করেনি পরন্তু তাদের আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, তারা ভারতবাসীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ঈশ্বর প্রেরিত বিদ্যা দ্বারা মহিমান্বিত এই মনীষী যেখানে মল-মূত্রও ত্যাগ করেছিলেন, সে জায়গা 'তীর্থ'-এ পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর লক্ষ-লক্ষ তীর্থযাত্রী লুম্বিনী, কপিলবস্তু, সারনাথ, শ্রাবস্তী, গয়া এবং কুশীনগর দর্শন করে অসীম শান্তি অনুভব করেন; ভবিষ্যতেও করবেন।

আরব দেশবাসী হজরত মহম্মদ কই লেখাপড়া করেননি তো? মহাত্মা কবীর তো '**মসি কাগদ ছুয়ো নহীঁ, কলম গহি নহীঁ হাথ**'-কাগজ, কলম স্পর্শও করেছিলেন না। গুরুনানককে হিন্দু অথবা মুসলমান কোন ধর্মেরই শিক্ষক পড়া লেখা শেখাতে পারেননি। পিতা তাঁকে চাষবাস দেখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাও করতে পারেননি। ব্যবসা করে ধন একত্র করার অপেক্ষা 'সত নাম' অর্জন করাই তিনি শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন। লোকনায়ক তুলসীও যদ্যপি কাশীতে শেষ সনাতনের নিকট অবস্থান করে বেদ-বেদাঙ্গ পনেরো বছর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছিলেন;

কিন্তু মানসের কথাবস্তুর আধার তিনি সেই বিদ্যাকেই করেছিলেন যা তিনি নিজ গুরু নরহর্যানন্দজীর কাছে শ্রবণ করেছিলেন-

ম্যায় পুনি নিজ গুর সন সুনী, কথা সো সূকর খেত। *(মানস, ১। ৩০ক)*

ভাষাবদ্ধ করবি ম্যায় সোঈ।

মোরেঁ মন প্রবোধ জেহিঁ হোঈ।। *(মানস, ১।৩০।২)*

গোস্বামী তুলসীদাসজী সেই হরির প্রেরিত বিদ্যার নিরুপণ 'মানস'-এ করেছেন যা প্রস্ফুটন হয় হৃদয়-দেশ-এ

তস কহিহউঁ হিয়ঁ হরি কে প্রেরেঁ। *(মানস, ১।৩০।খ।৩)*

বিভিন্ন জায়গায় গোস্বামীজী এই স্রোতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন-

জেহি পর কৃপা করহিঁ জনু জানী। কবি উর অজির নচাওহিঁ বানী।।

প্রনবউঁ সোই কৃপাল রঘুনাথা।। বরনউঁ বিসদ তাসু গুন গাথা।।

(মানস, ১।১০৪।৬-৭)

যদি লৌকিক শিক্ষা-দীক্ষার মহত্ত্ব বিদ্যার সমানই হত তবে তো তুলসীদাসের চেয়েও বেশী শিক্ষিত ব্যাকরণাচার্য কাশীতে ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে কেউ তাঁদের নাম পর্যন্ত জানে না, তাঁদের মধ্যে একজনও কি তুলসীর সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন? ব্রহ্ম-বিদ্যা হওয়ার ফলেই তুলসীসাহিত্য নিত্য নতুন কলেবর ধারণ করছে। এই বিদ্যারই খোঁজে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ জিজ্ঞাসু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার চিত্রকূটের রামায়ণ মেলাতে আসেন এবং গোটা পৃথিবীতে এই বাঙ্ময়েরই প্রচার প্রসার অবাধগতিতে হচ্ছে।

মীরা লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু সেই প্রেম যোগিনীর ভাব প্রকাশে ভাষা বাধক হয়নি। তাঁর আত্মনিবেদনে ললিত পদাবলীগুলির এমন স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়েছে যে রাজস্থানের মরুভূমি এবং সাহিত্য মহারথী উভয়েই একসমান আপ্লাবিত হয়ে উঠেছে। 'রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব' যোলো বছর বয়সে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলেন, তবে শিক্ষা আর কখন গ্রহণ করলেন? কাশীর হরিহর বাবাও এইরূপ ছিলেন। পার্থিব শিক্ষাতে নিষ্ণাত না হওয়া সত্ত্বেও এঁদের সকলকে এঁদের কালের সর্বোপরি বিদ্বান বলা হয়।

গোরখপুরের 'সৎসঙ্গী মহারাজ'কে, যিনি একশ পঁচিশ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন, তাঁকে আজীবন লোকে পাগলই ভাবত। কিন্তু পুণ্যাত্মাদের প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল যে, ইনি স্থিতজ্ঞ মহাপুরুষ, আমার স্বরূপে স্থিতিযুক্ত তাঁর শরণে যাও, তাঁর

কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর। পূজ্য পরমহংসজীর প্রতিও দৈববাণী হয়েছিল। মন্দিরে গিয়ে সেই পাগল বাবাকে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি নিত্যই সেখানে ইতস্ততঃ বিচরণ করতেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন, অল্পাবধিতেই সেই সাধনা পদ্ধতি অনুসারে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং চারমাস পরেই হরি প্রেরিত বিদ্যার স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। পূজ্য পরমহংসজী মহারাজও লেখা পড়া জানতেন না, মাত্র তিনদিন পাঠশালা গিয়েছিলেন। তৃতীয় দিন পণ্ডিতমশাই বেত দিয়ে প্রহার করেছিলেন। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরেছিলেন। মাতৃদেবী বলেছিলেন-চুলোয় যাক এমন শিক্ষা! পার্থিব শিক্ষার পাঠ সেই দিন থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একবার অনুসূইয়া আশ্রমে তাঁর সই-এর আবশ্যকতা হয়েছিল তখন এক সজ্জন ব্যক্তি মহারাজজীকে তিনদিন পর্যন্ত হস্তাক্ষরের অভ্যাস করিয়েছিলেন। প...র...মা..ন...ন্দ নামের প্রত্যেকটি অক্ষরকে মহারাজজী খুব মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। 'দ'-এর নীচে মহারাজজী এক ইঞ্চি লম্বা রেখা টেনে দিয়েছিলেন। সঙ্কোচ ও ভয়বশতঃ সেই সজ্জন ব্যক্তি কিছু বলেননি। যখন আমি দেখেছিলাম তখন বলেছিলাম মহারাজজী রেখাটা একটু ছোট করে দিলে হত। শুনে তিনি গোঁফে তা দিয়ে বলেছিলেন-হুঁ! তুই কি জানিস, আমি শিখে তবে লিখেছি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি ঠিক বলছি কিন্তু শুনলেন না।

অনুসুইয়া আশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রফেসার, বিদ্বান সর্বদা যাওয়া-আসা করতেন। আশ্রমের কোন পুরোনো ভক্ত সঙ্গে থাকতেন পরিচয় করিয়ে দিতেন যে, মহারাজ, ইনি ডাক্তার সাহেব। ইনি দর্শনশাস্ত্রে অথবা কয়েকটা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ কথা মহারাজজীকে জানানোর সঙ্গে-সঙ্গে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তো প্রফেসর সাহেবই নিজের বক্তব্য রাখতেন; তারপর মহারাজজীকে কিছু শোনাবার জন্য আগ্রহ করতেন। যখন মহারাজজী উপদেশ করতে শুরু করতেন তখন তাঁরা সকলে বিস্ময়ে বলে উঠতেন যে, ভগবন! সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অধ্যয়ন করা অন্য ব্যাপার, সাধনা করাটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এই প্রকার নিবেদন করে, আশীর্বাদ নিয়ে চলে যেতেন। বিদ্বান্দের শিক্ষার কোন উপযোগিতা পূজ্য মহারাজজীর প্রত্যক্ষদর্শিনী বাণীর সমক্ষে থাকত না।

অতএব এই ভগবৎপথে চলার জন্য আপনি শিক্ষিত হলেও ঠিক এবং অশিক্ষিত হলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ এই বিদ্যা শুধু হরি-প্রেরিত এবং সদ্‌গুরুর গৃহের বিদ্যা এবং পাঠশালাটাই ভিন্ন। পরমহংসজী বলতেন -"হো! আমাকে ভগবান পড়ান। সংসারের যে কোন ভাষায় কথা বল, ভগবান আমাকে সব বুঝিয়ে দেন।"

।। ওঁ ।।

সায়েন্সের ভাষানুবাদ 'বিজ্ঞান'

প্রশ্ন : মহারাজজী! প্রাচীনকালের অপেক্ষা আজ বিজ্ঞান বেশী প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উত্তর : বিদ্যার্থীগণ! আপনারা এম.এস. সী; ডবল এম.এম. সবকিছু পাস করেছেন। বলতে পারবেন সায়েন্সের নাম বিজ্ঞান কেন পড়েছে? কখন পড়ল? হিন্দীতে সায়েন্সকে বিজ্ঞান বলে। এটা কি উচিত? আপনি বলছেন বর্তমানে সায়েন্স খুব উন্নতি করছে আজ থেকে দু'-আড়াইশো বছর পূর্বে উড়ো জাহাজের ব্যবহার বোধহয় কল্পনাও করা হয় নি। কিন্তু আজ সেটা সর্বসুলভ হয়ে যাচ্ছে। রকেট, বোমা, পরমাণু, হাইড্রোজেন, মিসাইল এবং আরও না জানি কত কি আবিষ্কার হচ্ছে। এমন কি ঘরে বসে হাজার-হাজার মাইল দূরের স্থান ধ্বংস করা সম্ভব হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক বাতি আপনি দেখছেনই। চোখধাঁধানো টেলিভিশনও আপনি দেখছেনই, স্ক্রীনে হাজার-হাজার মাইল দূরের দৃশ্য ফুটে ওঠে। চাঁদের ছবি পর্যন্ত সংসার দেখেছে। মোটর, ট্রেন ইত্যাদি আবিষ্কার আপনি দেখছেন, এগুলিতেও মাঝে-মাঝে কিছু না কিছু পরিবর্তন করা হয়ই। ইংরাজীতে এসবকে সায়েন্স বলে।

এই সায়েন্স আজকেই উন্নতি করছে, এমন কথা নয়। আজ থেকে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বেও এই পৃথিবীতে শত-শতবার আবিষ্কার হয়েছে এবং আবিষ্কার পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছে সর্বনাশে পরিণত হয়েছিল। সহস্রাধিকবার এই সায়েন্স উন্নতি করেছে; ভৌতিক আবিষ্কার হয়েছে, শক্তি গুলির পরস্পর সংঘাতের পরিণাম ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ রূপে দেখা দিয়েছিল। দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনীতে শাস্ত্রগুলি পূর্ণ। আজ থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনা এটা। ইতিহাস সম্বন্ধে তো আপনি অবগত! পাশ্চাত্য বিদ্বানগণ বলেন যে, ভারতবাসীরা ইতিহাস সম্বন্ধে লিখতে জানত না, এটা ভুল। প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণগুলিতে অক্ষুণ্ণ আছে। সেগুলিতে প্রাচীনকালে ঘটিত ঘটনাগুলির বর্ণনা আছে। সেইজন্য সেই গ্রন্থগুলিকে পুরাণ বলে। কালান্তরে সেই গ্রন্থগুলিকেই ইতিহাস বলা শুরু হয়েছে। যেগুলিতে ইতির আভাস পাওয়া যায়।

লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামের একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি নিজের বেধশালাতে এত উন্নত আবিষ্কার করে নিয়েছিলেন যে, না দিনে, না রাতে, না অস্ত্রে-শস্ত্রে, না পশু-পাখির আক্রমণে, না মানুষই তাঁকে বধ

করতে সমর্থ হবে। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এবার তো আমার মৃত্যুই হবে না, তবে ভগবানের কি প্রয়োজন? তক্ষুণি ভগবানকে তিলাঞ্জলি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করিয়েছিলেন যে, আমাদের রাজ্যে যে ভগবানের নাম করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। সে এত বেশী গোঁড়া ছিল যে, নিজের একমাত্র পুত্র প্রহ্লাদকেও ক্ষমা করতে পারেনি তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল। হ্যাঁ, একথা আলাদা যে, ভগবান এক এমন সূক্ষ্ম সত্তা যে, নিষ্পাপ শিশুর স্পর্শ করে দিলে, কৃপা করলে বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যা তাকে নষ্ট করতে পারবে। প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, হস্তীপদ দ্বারা দলিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ বেঁচে গিয়েছিল এবং এমন এক সময় এসেছিল যে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুরও পথ বেরিয়ে এসেছিল। সেই সময়ের সায়েন্সের সঙ্গে পার্থক্য এতটাই রয়েছে যে, তখনকার মানুষ শরীর প্রধান ছিল। কোন আবিষ্কার করলে সেটা নিজের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। আজকের সায়েন্স যন্ত্র প্রধান, যদ্যপি যন্ত্র তখনও ছিল। প্রহ্লাদের মাধ্যমে ভগবৎ ভক্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিল এবং হিরণ্যকশিপু মারা গিয়েছিল।

এরপর ত্রেতাযুগে রাবণ নামে এক নরেশের জন্ম হয়। শুরুতে সে নাস্তিক ছিল না,ভক্ত ছিল। যেমন একটু আগেই আপনি অধ্যয়ন করলেন যে, সায়েন্স যখন প্রগতি করে তার পরিণাম সর্বনাশ হয়। কিন্তু এর পূর্বেই এক অন্য পরিণাম দেখা দেয়-নাস্তিকতার অভিবৃদ্ধি। রাবণও শুরুতে ভক্ত ছিল। ক্রমশঃ সে এতদূর আবিষ্কার করেছিল যে, শিরচ্ছেদ করে দিলেও তার মৃত্যু হবে না। এমন ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়, কিন্তু সে নিজে সকলকে দেখতে পাবে। তার পুত্র মেঘনাদ যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে যখন অগ্রসর হয়েছিল তখন অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিল। সে রথে আরুঢ় ছিল কিন্তু অদৃশ্য ছিল। সে সকলকে দেখছিল, লক্ষ্য করে-করে মারছিল কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। বর্তমানে কোন আবিষ্কার কি তার থেকেও বেশী উন্নত রয়েছে? প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেই সময়ের সায়েন্স আজকের অপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল। হনুমান লঙ্কাতে দাহ করেছিলেন তখন রাবণের সঙ্কেতে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টিতে রাবণের অধিকার ছিল। আজও বৈজ্ঞানিকরা কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এখনও সফলতা লাভ হয়নি।

একসময় রাবণ অমরকণ্টকে শিবপূজা করেছিল। সেইসময় একজন

শক্তিশালী নরেশ সহস্রার্জুন নর্মদা নদীর প্রবাহ রোধ করেছিলেন। রাবণ যেখানে পূজা করছিল সেখানে জলের স্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ফুলগুলি ভেসে যাচ্ছিল। এ খবর পেয়ে রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত আক্রমণ করেছিল। শত্রু সবল ছিল অতএব প্রহস্ত সবল যন্ত্র মূসল তুলেছিল। মূসল চালনার সময় তার অগ্রভাগ থেকে প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছিল। সেটা কি ধান ভানার সাধারণ মুষল ছিল। প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেটা যন্ত্র ছিল, হ্যাঁ সেই সময়ের ভাষানুযায়ী সেটার নাম মুষল অবশ্য ছিল। ধান ভানার মুষল থেকে কি প্রলয়ঙ্কারী অগ্নিশিখা নির্গত হয়? তখনও আবিষ্কার কত বেশী উন্নত ছিল।

এত উন্নত ছিল তবুও নতুন আবিষ্কার বন্ধ হয়নি। অনুসন্ধানকার্য চালু ছিল, রাবণ নির্ণয়-করেছিল যে, আমি স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করে দেব। কালের ভয় সংসার থেকে মুছে ফেলব। অগ্নি থেকে ধূম শেষ করে দেব ইত্যাদি। আবিষ্কার যখন পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছেছিল তখন সে মদান্ধ হয়ে গিয়েছিল। আগে তো সে ভগবানকে তিলাঞ্জলি দিয়েছিল, গালাগাল দিয়েছিল, অতঃপর প্রচারিত করেছিল-আমিই ঈশ্বর। সর্বত্র আক্রমণ, বিধ্বংস করতে শুরু করেছিল।

অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধর্ম সুনিঅ নহিঁ কানা।
তেহি বহুবিধি ত্রাসই দেশ নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা।।

(মানস, ১/১৮২/ছন্দ)

রাবণ 'ধর্ম' শব্দ কানে শোনা মাত্র পাগল হয়ে যেত স্বয়ং নষ্ট করার জন্য বেরিয়ে পড়ত, অথবা সৈন্য পাঠিয়ে দিত।

বর্তমানেও কিছু লোকেরা বলে যে, ভগবান নেই, পূজা-পাঠ করা ব্যর্থ। বস্তুতঃ মায়িক ক্ষেত্রে খাওয়া পরার সুখ-সুবিধা যখন-যখন পেয়েছে, তখন মানুষ ভগবানকে অনাবশ্যক এবং মিথ্যা কল্পনা ভেবেছে। কিন্তু ভগবান মানুষের সঙ্গে তখনও থেকেছেন। ভগবানের তখনও নাশ হয়নি কারণ ভগবানই তো একমাত্র এমন সত্তা, যা কখনও নষ্ট হয় না।

দ্বাপরযুগেও এই ধরনের আবিষ্কারের বাহুল্য ছিল। উগ্রসেন নিঃসন্তান ছিল। মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর স্ত্রী বনে বিচরণ করতে গিয়েছিল। সেই জঙ্গলে একটা অসুর বাস করত। সে শুনেছিল যে,মহারাজ উগ্রসেনের অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী প্রমোদ ভ্রমণে এসেছে। সে তখন বনে ঝড় সৃষ্টি করেছিল। তুমুল ঝড়ে বৃক্ষ উৎপাটিত হচ্ছিল, বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড গড়াতে শুরু করেছিল। চতুর্দিকে অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল।

ঘোড়াগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে সেই অসুর পৌঁছেছিল, উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করেছিল। যাবার সময় অসুর নিজ রূপ ধারণ করেছিল। উগ্রসেনের স্ত্রী শাপ দেওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিল তখন অসুর বলেছিল যে, এই সমাগমের ফলে আপনার গর্ভ থেকে অত্যন্ত পরাক্রমী পুত্র উৎপন্ন হবে। নিঃসন্তান স্ত্রীর মনে পুত্রের লোভ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। সে বেচারী দমিত মনে ফিরে এসেছিল। সময়ে তার গর্ভ থেকে কংস উৎপন্ন হয়েছিল। শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করেছেন যে, সেই অধম রাক্ষস আসুরী মায়ার প্রয়োগ করেছিল। ঝড় তোলা, আগ্নেয়াস্ত্রের সঞ্চালন , বৃষ্টি করানো ইত্যাদি আসুরী মায়ার সংজ্ঞা ছিল। দ্বাপরযুগেই বানাসুর নামের এক অন্য অসুর উৎপন্ন হয়েছিল। সেও নিজের বেধশালাতে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করেছিল। যখন বাণাসুরের কন্যা বিবাহযোগ্য হয়েছিল, তখন বাণাসুর তাকে একটা সুরক্ষিত মহলে রেখেছিল। মহলের চারদিকে তিন অক্ষৌহিনী সৈন্য পাহারা দিত, যাতে কোন রাজা-মহারাজা সেই অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যাকে অপহরণ করতে না পারে। সেই বালিকা দেখেছিল যে, তার বিবাহের জন্যই এত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, অতএব সে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। বার-বার চিন্তন করার ফলে সে স্বপ্নে পতির রূপ দেখতে পেয়েছিল। সে নিজের সখী চিত্রলেখাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, যে মেধাবী বৈজ্ঞানিক ছিল স্বপ্নের কথা তাকে বলে চিত্রলেখাকে খবর জোগাড় করতে বলেছিল যে, স্বপ্নে কে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। চিত্রলেখা তাকে অনেক মহারাজাদের ছবি এঁকে দেখিয়েছিল অবশেষে যখন সে শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকতে শুরু করেছিল তখন বাণাসুরের কন্যা ঊষা বলে উঠেছিল, ইনি তো নন কিন্তু এঁর সঙ্গে তার খুব মিল আছে দেখছি। যখন অনিরুদ্ধের ছবি এঁকেছিল তখন ঊষা বলেছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি। এবং যখন ইনিই আমার হবু পতিদেবতা তবে সঙ্কোচ কেন? এঁকে এখুনি কোন যুক্তি দ্বারা কেন আনব না। চিত্রলেখা গিয়েছিল এবং পালঙ্ক সহ অনিরুদ্ধকে তুলে নিয়ে এসেছিল। লক্ষ-লক্ষ পাহারাদার এদিকে ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকেও এইরূপই পাহারা ছিল। কিন্তু না এরা জানতে পেরেছিল না ওদিকেই কেউ জানতে পেরেছিল, আপনিই বলুন সেই সময় সায়েন্স কত বেশী উন্নত ছিল।

বনবাসকালে পাণ্ডবেরা নিজেদের সময় ব্যতীত করছিল। সেই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ স্ত্রী রত্নের খোঁজে বেরিয়েছিল। সেইকালে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। যখন সে ঘোর জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল তখন একটি কুটীরের পাশে অতিসুন্দরী

এক রমণীকে দেখতে পেয়েছিল। জয়দ্রথ বলেছিল যে, এত সুন্দরী স্ত্রী তো আমি কখনও দেখিনি। মন্ত্রীদের আদেশ দিয়েছিল-'খবর সংগ্রহ কর কে এই রমণী? কোন মানবী কি দেবী? মানুষের উপভোগের যোগ্য অথবা নয়? মন্ত্রিরা খবর সংগ্রহ করে জানিয়েছিল ইনি তো পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী। জয়দ্রথ মন্ত্রিদেরকে তার কাছে পাঠিয়েছিল। তারা তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিল এবং নিজেও গিয়েছিল। বলেছিল যে, দেখ, তুমি সুখভোগ করার যোগ্য। পাণ্ডব সুখ-সমৃদ্ধিহীন হয়ে গেছে। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। আমার কাছে রত্ন, সৈন্য আছে, তুমি আমারই যোগ্য। দ্রৌপদী তাকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু কামান্ধ জয়দ্রথ তাকে অপহরণ করেছিল। যখন সে তিন-চার মাইল দূর পাহাড়ের আড়ালে পৌঁছেছিল, তখন পাণ্ডবেরা এই খবর পেয়েছিল। পাণ্ডবেরা সেইসময় শিকারে বেরিয়েছিল। অর্জুন সেখান থেকেই দিব্য অস্ত্রের সন্ধান করেছিল। জয়দ্রথের অশ্ব ভূমিতে পতিত হয়েছিল। রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু জয়দ্রথ ও দ্রৌপদীকে আঁচড়ও লাগেনি এবং ভীম ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছিল। আজকে কি এমন অস্ত্র আছে যা পঁচিশজন ব্যক্তির মধ্যে যাকে চাইবে তাকে বধ করবে এবং যাকে চাইবে তাকে রক্ষা করবে, শত্রু অদৃশ্য থাকলেও বর্তমানে তো নেই। প্রমাণিত হচ্ছে যে সেইকালের সায়েন্স বর্তমানের অপেক্ষা বেশী উন্নত ছিল।

মহাভারতের যুদ্ধের সময় দুর্যোধন যখন ভীষ্মের কাছে খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিল তখন ভীষ্ম বলেছিলেন-চল আমি কালকেই যুদ্ধের পরিণাম ঘোষণা করে দিচ্ছি। একটামাত্র বাণেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যকে ধরাশায়ী করে দেব। পরের দিন ভীষ্ম নারায়ণ অস্ত্রের সন্ধান করেছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র যখন ধাবিত হয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন-''দেখ! এই অস্ত্রের একটাই নিবারণ আছে যে, পিছন ফিরে দাঁড়াও। এই অস্ত্র শূরবীরদেরই বধ করে। যে পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে দেয়, তাকে ক্ষমা করে দেয়। একথা শুনেই পাণ্ডব সৈন্য পৃষ্ঠদেশ দেখিয়েছিল কিন্তু ভীম পিছন ফিরে দাঁড়ায়নি। তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাবধানও করেছিলেন যে, এভাবে তুমি মারা যাবে পিছন ফিরে দাঁড়াও। ভীম বলেছিল নিজের উপদেশ অর্জুনকেই দাও। আমি ক্ষত্রিয়। একবার তো মৃত্যু হবেই। আমি পিছন ফিরে দাঁড়াতে পারব না। এদিকে সেই অস্ত্র সবদিক ঘুরে সম্পূর্ণ বেগে ভীমের দিকে ধাবিত হয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ ছুটে গিয়ে ভীমকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পিঠ, আর একদিকে ভীমের পিঠ তো ছিলই। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তকে রক্ষা

করেছিলেন। এমন সব অস্ত্র শস্ত্র ছিল যা চালনা করার পরেও যুদ্ধ স্থলে যদি কেউ তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিত-তবে তৎকাল তাদের ক্ষমা করে দিত। এই ধরণের বাণকেই আজ বোমা বলে। অন্যথা সেগুলো কি লোহার সাধারণ পেরেক ছিল? বর্তমানে কি এমন কোন আবিষ্কার আছে? বিশ্বে, বিশেষতঃ ভারতে এই সায়েন্স বর্তমান অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বেশি উন্নত ছিল।"

কিন্তু যখন-যখন সায়েন্স পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছেছে। তার পরিণাম আগে নাস্তিকতা দেখা দিয়েছে এবং তার পরে সর্বনাশই হয়েছে দেখা গেছে। রাম-রাবণ যুদ্ধ, মহাভারত যুদ্ধে অসংখ্য জনগণের মৃত্যু হয়েছিল। শক্তিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অহঙ্কার জেগে ওঠে। আজকাল যেমন রাশিয়া এবং আমেরিকা গর্ব করে। একদিন এমন আসে যখন তাদের নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হয় পরিণামে সর্বনাশই হয়। সর্বনাশের তাৎপর্য এই নয় যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই সমাপ্ত হয়ে যায়। অপিতু বহুসংখ্যক সমাপ্ত হয়ে যায়। অত্যল্প সংখ্যাতে বেঁচে থাকে। যেমন একটা পরিবার এই জেলাতে থাকল আর একটা পরিবার অন্য জেলাতে। একটা প্রদীপ মির্জাপুরে জ্বলছে তো আর একটা কাশীতে, তৃতীয়টা জৌনপুরে। এই প্রকার পঁচিশ-পঁচিশ, পঞ্চাশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে মানুষ বাস করছিল। জনসংখ্যা কম হয়ে গিয়েছিল। মানুষ মানুষকে দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। যেখানে ঘন বসতি এবং সবুজ খেত ছিল, সেই স্থান ঘনজঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। আজকে আপনি এখানে বসে আছেন, যদি কেউ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এখানে না আসে তবে এখানের সবুজ খেতগুলি ঘোর জঙ্গলে পরিণত হবে। বৃক্ষলতাদি এত শীঘ্র গজায় যে এই স্থান বন্য জীব-জন্তুদের একটা নিবাসস্থান হয়ে উঠবে। আপনাদের পার্শ্ববর্তী স্থান এখান থেকে দু'মাইল দূর 'মদর হাওয়া' দেখতে দেখতে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে কিন্তু ওখানে আগে চাষ করা হত।

এখন মানুষ সেই আবিষ্কারগুলিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। বিচার করে দেখেছে যে, আজ যে তাদের কেউ বেঁচে নেই সেটা তো ওই আবিষ্কারেরই জন্য। শুধু একটা অভাগা সেই ছিল যে বেঁচে গেছে। খোঁজাখুঁজি করলেও কোন সঙ্গীর দেখা মেলে না এবং যদিও বা মেলে পঞ্চাশ মাইল দূরে একজন পাওয়া যায়। অতএব সেই ব্যক্তি ওই সিদ্ধান্তগুলিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে যেগুলিকে সে সর্বোপরি উপলব্ধি বলে মনে করত।

ধীরে-ধীরে সেই আবিষ্কার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষ সাধারণভাবে দিন যাপন করতে শুরু করেছিল। বিনাশ এবং বিকাশ তো সৃষ্টির নিয়ম। যে স্থানের

মানুষ আগে বিকশিত হয়েছিল, তাদের সভ্য বলা হত এবং যে স্থানের মানুষ কিছুকাল পরে উন্নতি করেছিল তাদের আদিবাসী বলা হত। আদিবাসীর তাৎপর্য এই নয় যে, যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন অথবা আদম উৎপন্ন হয়েছিল, তখন থেকেই অসভ্য হয়ে পড়ে আছে। বস্তুতঃ তারা কয়েকবারই সভ্য হয়েছিল।

এইপ্রকার আবিষ্কার তো খুব উন্নত ছিল কিন্তু আবিষ্কর্তাদের কেউ বৈজ্ঞানিক বলেনি। তাদের অসুর বলা হত। সুর দেবতাদের বলে। পরমদেব পরমাত্মাতে বিশ্বাসী এবং তাঁকে লাভ করার পথে অগ্রসর পথিকদের সুর বলে। শুধু তাঁর অস্তিত্ব যারা স্বীকার করেছিল তাদের মানব বলা হত-যাদের হৃদয়ে আস্থা আছে কিন্তু ব্যস্ততার জন্য ঈশ্বর-চিন্তনে সময় দিতে পারে না। অসুর তাদের বলা হত, যারা দেবত্ব থেকে পৃথক ছিল। 'দেব' ভগবান অনাবশ্যক, আমিই ঈশ্বর, ঐশ্বর্যের ভোক্তা-এইরূপ বিচারধারা যাদের, তাদের অসুর বলা হত। কম্যুনিজমও তো এই কথাই বলে। এটাই হিরণ্যকশিপু করেছিল, আবিষ্কারের নেশায় এটাই রাবণ এবং তার পরিবার করেছিল। এই মদান্ধতাতে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, প্রায় অর্ধেক যোদ্ধা অসুর ছিল। অসুর-এর তাৎপর্য এই নয় যে দুটো শিং, বড়-বড় চোখ অথবা দাঁতের উপরে একহাত লম্বা দাঁত ছিল তাদের। শ্রীকৃষ্ণের পিসীমার পুত্র শিশুপাল অসুর ছিল। নিজের মামা কংস রাক্ষস ছিল, বেহাই বাণাসুর নিশাচর ছিল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা ছিলেন, বসুদেব-এর গণনা দেবশ্রেণীতে হত। এঁদেরই আত্মীয় পাণ্ডব শুদ্ধ নর ছিলেন এবং দুর্যোধন ইত্যাদি মধ্যম অবস্থাযুক্ত ছিলেন। তাদের পক্ষে অধিকাংশতঃ আসুরী প্রবৃত্তির ব্যক্তি একত্র হয়েছিল। এইপ্রকার একজন আত্মীয় মানব তো আর একজন আত্মীয় দানব এবং তারই আত্মী দেবশ্রেণীরও দেখা গেছে।

রাক্ষসদের একটা পর্যায় নিশাচরও। বস্তুতঃ **'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।' (গীতা, ২।৬৯)** গীতার অনুসারে জগতই রাত্রিস্বরূপ। এই জগতরূপ রাত্রিতে যে বিচরণ করে সেই নিশাচর। জগতকেই সত্য বলে মনে করে যারা, জগতকে বিশ্বাস করে যারা, 'খাও দাও ফূর্তি কর' এইরূপ মনোভাব যাদের, তাদের নিশাচর বলা হত। এইরূপ প্রাণী ভৌতিক আবিষ্কারগুলিকেই নিজেদের গৌরব বলে ভাবত যেখানে দেবত্ব নয়, পরন্তু মায়া প্রবাহিত। সেইজন্য তাদের দ্বারা যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে, সেই আসুরী মায়াকে আজকাল সাইন্স বলা হয়। এগুলির আবিষ্কর্তাদের পূর্বকালে অসুর বলা হত।

ইংরেজরা যখন ভারতে পদার্পণ করেছিল তখন ইংরাজী ভাষার শব্দগুলির

হিন্দীতে রূপান্তরণ শুরু হয়েছিল। ইংরাজী শব্দ সাইন্সের হিন্দী পর্যায়ের প্রশ্ন উঠেছিল। সাইকেল চলতে শুরু করেছিল তখন বলা হল যে, এটা সায়েন্সের অবদান। এরই মধ্যে 'পী' করে তার পিছনে মোটরগাড়ি হাজির হল। লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল যে, এই নির্জীব লোহা চলে কিভাবে। দেখতে-দেখতে গোটা দেশে রেললাইন বিছানো হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর আকৃতির রেল হাজার-হাজার মানুষকে বইতে শুরু করেছিল। অশ্ব যেখানে দশ ঘণ্টায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছাত, মোটরগাড়ি এক ঘণ্টায় নিয়ে যাচ্ছিল। সকলে বলেছিল যে, এটা সায়েন্স। দূর-দূরান্তের খবর রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে আসতে শুরু করেছিল। তখনও লোকে সায়েন্সের গুণ গেয়েছিল। ভারতীয়রা ভেবেছিল যে এইরূপ বিশেষ চমৎকারের বর্ণনা তো যোগ দর্শন-এ আছে। যেগুলিকে আমাদের মনীষীগণ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেইজন্য বাঙ্গলার এক ভাষাবিদ সায়েন্সের নাম ঝট করে বিজ্ঞান রেখে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এটা বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান তো তাকে বলা হয়।

বিজ্ঞান

বিনু বিজ্ঞান কি সমতা আব্ই। কোউ অবকাস কি নভ বিনু পাব্ই।। *(মানস, ৭/৮৯/৩)* বিজ্ঞান-এর জ্ঞান লাভ না হলে সমতা আসে না। যখনই বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ হয় তখনই বিষমতা সদা-সর্বদার জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। বিশ্বে তার শত্রু বলে কেউ থাকে না। তার সঙ্গে কেউ দ্বেষ করেই না। সর্বত্র একটা সমতার তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আজকে আমেরিকা, রাশিয়ার বিজ্ঞান সবচেয়ে উন্নত বলা হয়, কিন্তু তাদের অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। বৈষম্য এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ভারতকে কিভাবে গোলাম করবে তাই ভাবছে? চীনকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করবে সেটাই ভাবছে। এটাই কি বিজ্ঞানের গুন ধর্ম? সায়েন্স যে বিষয়কে ভ্রমবশতঃ বিজ্ঞান নাম দেওয়া হয়েছে, যেখানে-যেখানে উন্নতি করেছে, সেখানেই বিমষতার বন্যা বয়ে গেছে। রাগ দ্বেষ এবং শোষণ চরম সীমায় পৌঁছেছে। এটা বিজ্ঞান নয়। এটা তো আসুরী মায়ার লক্ষণ যে, আমি ছাড়া আর সকলে চুলোয় যাক।

বিজ্ঞান তো এমন বিষয় যা লাভ হলে একতা, সমত্বভাব চলে আসে এবং যাঁরা লাভ করেছেন তাদের সমর্থন মহাপুরুষগণ নিম্নলিখিত শব্দ দ্বারা করেছেন-

তুম্হ বিগ্যানরূপ নহিঁ মোহা।
নাথ কীহ্নি মো পর অতি ছোহা।। *(মানস, ৭/১২২/৪)*

কাকভুশুণ্ডিজী গরুড়ের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন যে তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ, মোহ

তো তোমাকে আচ্ছন্ন করতেই পারবে না। বিজ্ঞান এমন বিষয়, যার জ্ঞান লাভ হলে মোহ থাকে না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।। *(গীতা, ৬।৮)*

জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। প্রত্যক্ষ দর্শনকেই জ্ঞান বলে। তদনন্তর বিজ্ঞান-এর জ্ঞানলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! জ্ঞানলাভের পর যদি বিজ্ঞান-এর জ্ঞানলাভ হয় তবে এই আত্মা তৃপ্ত-পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আত্মা না তো ভৌতিক সম্পদ্ লাভ হলে তৃপ্ত হয়, না দশটা ভাষার জ্ঞানী হলে তৃপ্ত হয় এবং না খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসেই তৃপ্ত হতে পারে, সেই ব্রহ্ম পীযূষ প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেই আত্মা সন্তুষ্ট হয়। ব্রহ্ম পীযূষ লাভের পূর্বে আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারে এমন কোন সত্তাই নেই।

অতএব বিজ্ঞান এমন বিষয় যা এই আত্মাকে ব্রহ্ম-পীযূষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয় এবং পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে। তৃপ্ত আত্মা পুনরায় কখনও অতৃপ্ত হয় না। বিজ্ঞান একে কূটস্থ, অচল এবং স্থির করে দেয়। পুনরায় কখনও চলায়মান হয়ে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না, শাশ্বত স্থিতি লাভ করে।

এই প্রকার বিজ্ঞানের এত বেশী মহত্ত্ব আছে যে আত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে, অচল স্থিতি প্রদান করে। বিষমতা সমাপ্ত করে সমতা প্রদান করে এবং যেখানে বিজ্ঞানের বাস সেখানে মোহ থাকে না। কিন্তু এই তথাকথিত বিজ্ঞানের যুগে তো যার কাছে যত বেশী আবিষ্কার আছে, সে তত বেশী গর্ব, ঈর্ষা করে। সংসারকে গোলাম করে একা সেই সুখে বাঁচার কামনা করতে শুরু করে। যার কাছে আরও বেশী আবিষ্কার আছে, সে বলে যে ভগবান বলে কিছু নেই, বিষয়ই সব-''খাও দাও ফূর্তি কর" এটাই সব। যখন-যখন আবিষ্কার বৃদ্ধি পেয়েছে; হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, দুর্যোধন সকলেই একস্বরে একথাই বলেছে। দেবাসুর সংগ্রামের গাথায় পুরাণের পৃষ্ঠাগুলি ভর্তি হয়ে আছে; সেই পুরাণ যার মধ্যে আমাদের পুরাতন ইতিহাসের সঙ্কলন আছে। দেবাসুর সংগ্রাম বার বার হয়েছে কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে, দৈবী সম্পত্তির অধিকারীরা সমূলে কখনও নষ্ট হয়নি। কারণ তারা ভগবানের শরণাগত ছিল এবং শুধু ভগবানই এমন সত্তা যাঁকে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যেতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, বায়ু শুকাতে পারে না। জাগতিক কোন বস্তু তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। তিনি সর্বত্র সঞ্চালিত, অপরিবর্তনশীল এবং

একমাত্র শাশ্বত সত্তা। সেইজন্য দৈবী সম্পত্তির অনুযায়ী সদৈব ছিল, আজও রয়েছে এবং নাস্তিকতা যত বেশীই বৃদ্ধি পাক আস্তিকতা সঞ্চারিত থাকবেই।

আজকে আপনি বলছেন যে, "বিদেশে বিজ্ঞান খুব প্রগতি করছে। এই পৃথিবী থেকে বৈজ্ঞানিকেরা বহু জিনিস উৎপাদন করেছে।" পরন্তু যথার্থ তো এই যে এই পৃথিবীর একটা কণাও তারা তুলতে পারেনি। তাদের সব আবিষ্কার মায়িক পরিধি পর্যন্তই সীমিত। আর বিদেশ কি! গোটা জগতই একটা দেশ। হ্যাঁ ভারতের বাইরে আবিষ্কারের পিছনে ছোটাছুটি বেশী দেখা যাচ্ছে। ভারত এইবার পিছিয়ে আছে। কিন্তু অতীতে আবিষ্কার ভারতেই হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু, রাবণ এরা সকলে ভারতীয়ই ছিল। দেবাসুর সংগ্রাম ভারতীয়দের মধ্যেই হয়েছিল, পাণ্ডবেরা ভারতীয়ই ছিল। আজকের তুলনায় তাদের আবিষ্কার বেশী উন্নত ছিল। কিন্তু কি পরিণাম হয়েছিল? নিজেদের স্বজনদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি। অতএব প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে কল্যাণ দেখতে না পেয়ে ভারত শান্তি এবং ভগবৎচর্চার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই কারণেই এই দেশ মায়িক আবিষ্কারে এবার পিছিয়ে আছে।"

এটাই ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরা যার জন্য সদৈব জগদ্‌গুরু ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় নরেশ বিশ্বামিত্রের নাম খুব শ্রদ্ধা সহকারে নেওয়া হয়। তিনি নিজের যুগের বিখ্যাত আবিষ্কর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি রজ-বীর্যের সংযোগ ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করার সঙ্কল্প করেছিলেন। ভৌতিক বস্তুগুলি সংযুক্ত করে মনুষ্যাকৃতি তৈরী করেছিলেন। নারকেলের মত মুখাকৃতি, সীপের মত চক্ষু ইত্যাদি। যখন প্রাণ সঞ্চার করতে যাচ্ছিলেন তখন সম্ভাবিত পুরুষগণ তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেছিলেন যে, এ আপনি কি করছেন? বিশ্বামিত্র বলেছিলেন যে, নতুন সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। মহর্ষিগণ বলেছিলেন যে, আপনি সমর্থ, রচনা করে নেবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু একটু বিচার করুন যে, দুঃখভোগ করার জন্য তো গোটা পৃথিবীর লোক পড়ে আছেই। আপনি তাদেরই মত আরও মানুষ সৃষ্টি করতে চাইছেন। দুঃখ ভোগ করাবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা আপনার এমন কাজ শোভা পায় না। সংসারে এত মানুয় দিন-রাত হায়-হায় করছে। আপনার এমন কিছু করা উচিত যাতে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বেরিয়ে আসে। সংসার সৃষ্টি না করে সংসার থেকে মুক্ত করানোর কোন উপায় বার করুন। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র নিজের সেই মত পরিবর্তন করেছিলেন। তপস্যায় রত হয়েছিলেন এবং ক্রমশঃ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দিগ্‌দর্শন

করে সেই স্বরূপেই পরিপূরিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এই প্রকার মনীষিগণ মায়িক চমৎকারগুলিকে কখনও শ্রেষ্ঠ ভাবেননি।

বিদ্যার্থীগণ! এখন পর্যন্ত আপনি সায়েন্স সম্বন্ধে যা কিছু শুনলেন সেটা বস্তুতঃ আসুরী মায়া, বেশী বৃদ্ধি পেলে ভগবানকেও তিলাঞ্জলি দিয়ে দেয়। কিন্তু এখন আপনি বাস্তবিক বিজ্ঞান কি জানার চেষ্টা করুন, যা জানলে আর কিছু জানা বাকী থাকে না। যা লাভ করলে আর কিছু লাভ করা বাকী থাকে না। কেবল বিজ্ঞানই আপনাকে পূর্ণ আত্মিক তুষ্টি প্রদান করতে সক্ষম।

।। ওঁ ।।

গো-প্রকরণ

প্রশ্ন- মহারাজজী! আপনি বলছেন যে, অবতার যোগীর কল্যাণের জন্য অবতরিত হন, কিন্তু 'মানস'-এ তো গাভীর জন্য অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। গাভীর দেহে দেবতা নিবাস করে। গাভী আমাদের ধর্ম। গো-রক্ষার জন্য কি অবতার অবতরিত হয়নি?

উত্তর- হিন্দু-ধর্ম-এ গাভীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলে প্রায়ই আন্দোলন করা হয়। আজ সর্বত্র দাবী করা হচ্ছে যে, ভারতে গো বধ বন্ধ করা হোক। লক্ষ-লক্ষ ভাবুক ব্যক্তি এজন্য প্রাণের আহুতি দিয়েছেন। একসময় হিন্দু-ধর্ম-এর প্রচারক মুম্বাই পৌঁছেছিল। ভক্তরা সৎসঙ্গ-এ এই নিম্নপ্রদত্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছিল যে যখনই ধর্ম-পরিবর্তন হয়, হিন্দুদেরই ভাঙ্গানো হয়। হিন্দুরাই মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছে, খৃষ্টানও হিন্দুই হয়েছে। আমরা হিন্দুরাই তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কেন হিন্দু ধর্মে প্রবেশ দেব না। প্রচারকরা বলেছিল, ''মুসলমান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তাদের পেটে গো মাংস চলে গেছে, সেটা কি করা হবে?''

ভক্তরা বলেছিল ''মহারাজ! অনর্থ তো হয়েই গেছে। এখন তবে উপায় কি?'' ধর্ম-প্রচারক বলেছিলেন, ''একটা উপায় আছে। তারা সব তীর্থ যেন পদব্রজে ভ্রমণ করে। পুনরায় কাশীতে যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা তাদের শুদ্ধ করে হিন্দুদের একটা পৃথক জাতি নির্মাণ করে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত করে রাখা যেতে পারে। এখন কাকে খেপা কুকর কামড়েছে যে, গোটা ভারতের তীর্থ পায়ে হেঁটে সমাপ্ত করবে? অন্য ধর্মেও খাওয়া পরা জুটছেই এবং ঘরও আছে , ধর্মের নামেও কিছু না কিছু অনুষ্ঠান করা হয়ই। হিন্দুধর্মে কি বিশেষ আকর্ষণ আছে। জাতীয় সমতাও পাওয়া যাবে না। অন্য জাতি রূপে উপেক্ষিত হয়ে কে পড়ে থাকতে চাইবে।

হিন্দু ধর্মের যথার্থ স্বরূপ না জানার জন্যই এইরূপ মান্যতাগুলি প্রচলিত আছে। মনীষীদের ব্যবস্থা; মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ এবং আচরণ দ্বারাই এটা জানা সম্ভব যে, শাস্ত্রগুলির যথার্থ সনাতন স্বরূপ কি? মানস-এ উল্লেখ আছে যে, হনুমান যখন সীতার খোঁজে লঙ্কা গিয়েছিলেন তখন সর্বপ্রথম একটা উঁচু শিখরে চেপে শত্রুর গতিবিধি যাচাই করে দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, বিশালকায় নিশাচর নগরের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। কোথাও মল্ল-যুদ্ধ কৌশলের অভ্যাস করছে কোথাও **'কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর, অজ খল নিসাচর**

ভচ্ছহীঁ।' ***(মানস, ৫।৩৬ ছন্দ)*** মহিষ, মানুষ, গরু, গাধা এবং পাঁঠাগুলিকে অধম নিশাচরেরা ভক্ষণ করছিল। তারা গরু ভক্ষণ করত, তাদের পেটে গো-মাংসও ছিল। গরুর থেকেও অনেক বেশি মহান্ বিপ্রদের মাংসও তাদের আহার ছিল তা সত্ত্বেও রাবণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে যত নিশাচরই রামের শরণাগত হয়েছিল, তাদের রাম স্থান দিয়েছিলেন। বিভীষণ, তার মন্ত্রী, রাবণের বিশ্বস্ত গুপ্তচর-সকলকেই রাম আশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা বলেননি যে, তুমি আজ থেকে হিন্দু তো হলে, কিন্তু আজ থেকে শূদ্র তোমাদের জাতি। পরন্তু তাদের আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অযোধ্যার সভাতে **ভরতহু তে মোহি অধিক পিয়ারে।'** ***(মানস, ৭।৭।৮)*** ঘোষিত করেছিলেন। রামের হৃদয়ে যে স্থান ভরতের জন্য ছিল, ততটাই স্থান সেই নিশাচরদের জন্যও ছিল। যদ্যপি তারা গোমাংস ভক্ষণ করত। বিপ্রের মাংসও তাদের আহার ছিল। তা সত্ত্বেও রাম তাদের নিজের ভাইয়ের সমান ভেবেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের সেই স্থান দিয়েছিলেন, যেটা তাঁর হৃদয়ে নিজের ভাইয়ের জন্য ছিল। এই প্রকার তারাও শুদ্ধ সনাতন ধর্মী হয়েছিল। রাম তো ঘোষণা করেছেন যে, পুরুষ স্ত্রী অথবা নপুংসক, চরাচরের যে জীব কপট ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে, সে আমার পরম প্রিয়। চরাচরের অর্থ শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের যে কোন প্রাণী সনাতন ধর্মী হতে পারে। তুলসীদাসজীর মত হল যে **'স্বপচ সবর খস জমন জড় পাঁবর কোল কিরাত।'** ***(মানস, ২।১৯৪)*** ও নামের প্রভাবে পরম পবিত্র হয়ে যায়। এবং চোদ্দো ভুবনে অত্যন্ত সম্মান লাভ করে। অতএব সনাতন ধর্মে প্রবেশের সকলের অধিকার আছে। যারা অন্যথা বলে তারা সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে জানে না পরন্তু সনাতন ধর্মের নামে কোন কুরীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। জেনেশুনে কে জড়াতে চাইবে?

প্রশ্ন উঠছে যে, আমাদের ধর্মে গাভীর কখন থেকে প্রবেশ হয়েছে? ধর্ম পিপাসুদের একটা দলকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ধর্মের স্থানে গাভী কখন এসেছে? তারা বলেছিল-অনাদিকাল থেকে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে শাস্ত্রগুলিতে কোন উল্লেখ আছে। তারা বলেছিল-''শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাতেন।'' আমি বলেছিলাম যে, যাদব পরিবারে পালন-পোষণ হয়েছিল তবে গরু না চরালে হাতী, ঘোড়া কোত্থেকে পেতেন? পরিবারে যেমন ব্যবস্থা থাকে শিশু জন্মের পর সেই অনুসারেই নিজেকে মানিয়ে দেয়। রৈদাস চামড়া, মীরা সিংহাসন এবং রাম ধনুক বাণ পেয়েছিলেন তবে কি ধনুক ধর্ম? বড় হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাননি আমি প্রশ্ন

করেছিলাম যে, আরও কোন প্রমাণ আছে কি? এরপর তাদের আর কিছু বলার জন্য ছিলই না। হ্যাঁ হঠকারিতা অবশ্য ছিল। সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল, যে গরুর বিরুদ্ধে বলছে মুসলমান নয় তো?

গাভী কি সত্যই ধর্ম? উপনিষদের স্রষ্টা ঋষিগণ বলেছেন যে, সৃষ্টিতে ধর্ম বলে কিছু থাকলে সে হল মানুষ। তাঁদের অভিমত হল-'**গুহ্যং ব্রহ্মতদিদং ব্রবীমি। ন হি মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।**' খুব গোপন কথা বলছি যে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। মন সহিত ইন্দ্রিয়গুলির কপাট বন্ধ করলে ইন্দ্রিয়গুলির ত্রুটিগুলি দূর করলে মানুষরূপে পরমাত্মার দর্শন হবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও এটাই উপদেশ যে, আত্মাই শত্রু এবং আত্মাই মিত্র। যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা মিত্রের মত ব্যবহার করে, পরমকল্যাণ করে। এবং যিনি ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেননি, তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা শত্রু হয়ে শত্রুতা করে, অধোগতি এবং নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে। অতএব অর্জুন! তুমি এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সবদিক থেকে একত্র করে আমারই চিন্তন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি আমার স্বরূপ লাভ করবে। অর্থাৎ যেমন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের, সেই স্বরূপে অর্জুনও স্থিত হবে। স্পষ্ট হচ্ছে যে, শুধু মানুষই পরমধর্ম পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। দেবতা পর্যন্ত এই নরদেহ লাভের আশায় আছেন। পশু-পাখি, গাছ-পালা-আমাদের ধর্ম হতে পারে না। পরমধর্ম তো কেবলমাত্র পরমাত্মা।

তবে গাভীকে এত বেশী মহত্ত্ব দেওয়া হয় কেন? বৈদিক কাল থেকেই গাভীর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। মহিষের দুধ ব্যবহারের কথা দ্বাপরযুগ পর্যন্ত কল্পনাও করা হয়নি। মহাভারত কালে ভীষ্ম এবং দ্রোণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যাবার পর দুর্যোধনের ব্যূহ ব্যবস্থা ভঙ্গ হতে শুরু করেছিল তখন কর্ণকে মুখ্য সেনাপতির পদভার দেওয়া হয়েছিল। কর্ণ বলেছিল যে, আমি অর্জুনকে বধ করতে পারি কিন্তু সারথী শ্রীকৃষ্ণের মত চাই। বিচার-বিমর্ষ করার পর জানা গিয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের মত রথ সঞ্চালন তো শুধু শল্য করতে পারবে। শল্যকে আহ্বান করা হয়েছিল। দুর্যোধন তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল-''রাজন! আমাদের হিতের জন্য আপনি কর্ণের সারথি হওয়ার দায়িত্ব স্বীকার করুন।'' শল্য খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল-''আমাকে ভীতু আর কর্ণকে বাহাদুর ভেবেছ? আমার অংশ নির্ধারণ করে দাও, বিকেল পর্যন্ত সকলকে বধ করে স্বদেশে ফিরে যাব।'' মদ্র দেশ (মাদ্রাজ)-এর রাজা ছিল সে। সে বলেছিল-''আমি মূর্ধাভিষিক্ত রাজা। কর্ণ তোমার অন্নে জীবন ধারণ করে আছে। আমার পক্ষে এর সারথী হওয়া

সম্ভব নয়।" এইরূপ বলে শল্য উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তখন দুর্যোধন ক্ষমা চেয়ে বলেছিল-"রাজন! আমার বলার উদ্দেশ্য তা ছিল না। আপনার মত সারথী আর কেই নেই এটাই বলতে চাইছিলাম। এক হচ্ছেন আপনি এবং আরেকজন শ্রীকৃষ্ণ। যোদ্ধা তো আপনার মত কেউই নেই। আপনি শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও শক্তিশালী।" শল্য তার কথা শুনে বলেছিল- "এত রাজার মাঝে তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও বেশী শক্তিশালী বলেছ। অতএব আমি তোমার হিতের জন্য কর্ণের সারথী হতে রাজী কিন্তু আমি যা কটূ কথা বলব, কর্ণ সেগুলো সব সহ্য করবে; কারণ আমি রাজা, আর এই সূতপুত্র তোমার অন্নে জীবন ধারণ করে আছে।" কর্ণও দুর্যোধনের হিত কামনায় এই শর্ত স্বীকার করেছিল।

যুদ্ধভূমিতে যখন শল্য কর্ণকে কটূ কথা শোনাতে শুরু করেছিল তখন কর্ণ থাকতে না পেরে শল্যকে বলেছিল "তুমি সেই নীচু জাতের মানুষদের রাজা যারা রসুনের সঙ্গে দুধ পান করে। এখানে আমরা সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি। তোমাদের দেশে লোকেরা মেষী-ছাগল-গর্দভী এবং উষ্ট্রীর দুধপান করে।" স্পষ্ট হচ্ছে যে, ছাগল, মেষী, গাভী, গর্দভী এবং উষ্ট্রীর দুধ পান করার প্রচলন ছিল কিন্তু মহিষীর দুধ ব্যবহারের কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

মহিষী এবং মহিষ বন্য পশু অবশ্যই ছিল। আজও বন্য মহিষের শিকার করা হয়। বনবাসকালে একদিন ভীম মৃগয়ায় বেরিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির অঘটনের আভাস পেয়েছিল। যুধিষ্ঠিরের মনে হয়েছিল যে, ভীম বিপদে পড়েছে। ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। পথে ভীম দ্বারা আহত এবং মৃত শত-শত সিংহ, মহিষ, গণ্ডার, বন্য হস্তী দেখেছিল। এই চিহ্নগুলি অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছেছিল যেখানে অজগরের বেশে নহুষের সঙ্গে আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে ভীম নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিল। যুধিষ্ঠির নহুষের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে ভীমের প্রাণ রক্ষা করেছিল। এই প্রসঙ্গে ভীম দ্বারা নিহত মহিষগুলির উল্লেখ আছে। মহিষ, সিংহ এবং হস্তী বন্য জন্তু ছিল। দুগ্ধবতী পশুদের মধ্যে মহিষের উল্লেখ মহাভারতকাল পর্যন্ত মেলে না।

সেই কারণে গাভী পূজনীয় ছিল কারণ দুগ্ধবতী পশুদের মধ্যে-গাভীই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

গোধন গজধন বাজিধন অওর রতন ধন খান।
জব আবৈ সন্তোষ ধন, সব ধন ধূরি সমান।।

কৃষি-কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য গো-এর বিশেষ মহত্ত্ব ছিল। সেই সময় বিরাটের কাছে গোধন সবথেকে বেশী ছিল, দুর্যোধন ইত্যাদি নরেশ তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। বলদের সাহায্য নিয়ে কৃষিকার্য সম্পূর্ণ হত, আজকের মত ট্র্যাকটর ছিল না। দুধ, দই, ঘি, অন্ন সার ইত্যাদি অত্যন্ত উপযোগী বস্তুগুলির উৎপাদনের একমাত্র আধার গাভী ছিল। অতএব গাভী সর্বশেষ্ঠ ধন ছিল এবং ধনের পূজা তো হয়েই থাকে।

‘**গজধন**’- হস্তী একপ্রকার ধন ছিল। যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্কের পরিবর্তে হস্তী সমূহ এগিয়ে দেওয়া হত। দুর্গের বহির্দ্বার ভাঙ্গার জন্য এবং সৈন্যদের বিচলিত করার জন্য হস্তীই একমাত্র সাধন ছিল। পথ নির্মাণ, বৃক্ষ উৎপাটন, শোভাযাত্রা ও শৃঙ্গারের জন্যও হস্তীর মহত্ত্ব ছিল। সেইজন্য হস্তী পূজাও প্রচলিত ছিল। তার স্থান ট্যাঙ্ক এবং কামান নিয়ে নিয়েছে তবে হস্তীকে অকারণে চারা কেউ কেন খেতে দেবে? আগে এরই পূজা হত, আজও এদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে। কিছু মানুষ আছে ভিক্ষা করার সময় ‘গণেশ ঠাকুর’ বলে এদের পূজা করিয়ে নেয় অথবা বিবাহ এবং আরও কিছু-কিছু উৎসবের সময় গজশালা পূজা করে নেয়। গজ পূজার প্রচলন শেষ হয়ে আসছে কারণ গজ বর্তমানে ধনের স্থান থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

‘**বাজিধন**’- অশ্ব ধনের একটা প্রকার ছিল। শুরুতে যাওয়া-আসা করার দ্রুত গতির সাধনে এর গণনা করা হত। যে রাজা মহারাজাদের কাছে যত বেশী সংখ্যায় অশ্ব এবং রথ থাকত, তাকে তত বেশীই সম্পন্ন ভাবা হত। মোটরগাড়ি, উড়ো জাহাজ ইত্যাদি সুলভ দ্রুতগতির সাধনের কাছে অশ্ব মহত্ত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। প্রারম্ভে অশ্বকে পূজা করা হত কারণ ধন ছিল। এখন ধনের স্থান থেকে চ্যুত হওয়ার জন্য অশ্ব পূজার প্রচলনও কমে আসছে।

‘**রতনধন**’-রতনধনের পূজা আগেও হত এবং আজও হয়। সোনা, রত্নসমূহ আজও স্থানচ্যুত হয়নি। এগুলির স্থানে, অন্য কিছু আসেনি। এগুলির থেকেও বেশী মূল্যবান দ্রব্য এখনও আবিষ্কার হয়নি। সেইজন্য ধনের স্থানে যথাবৎ আছে। দীপদানের সময় লক্ষ্মী পূজার প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

এইপ্রকার প্রাচীনকালে গাভীর পূজা এই কারণেই করা হত যে, গাভী সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। বিরাট ইত্যাদি যে রাজাদের কাছে বেশী গোধন ছিল, তাদের বিশেষ মহত্ত্ব ছিল। অন্যান্য নরেশও গোধন লুট করে নিজের সম্পত্তি বাড়ানোর সুযোগে

থাকত। প্রাচীন শিক্ষাতে গোচারণও অনিবার্য বিষয় ছিল। রাজকুমাররাও গাভী চরাত, যাতে গোধনের গতিবিধি জেনে তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আজ গাভী অপেক্ষা মহিষী দুধের বেশী পূর্তি করে। ট্র্যাকটারের সাহায্যে কৃষিকার্যও সম্পন্ন হচ্ছে। বলদ উপেক্ষিত হচ্ছে। বিদেশে তো বলদের সাহায্যে কৃষিকাজ করার কল্পনাও করা হয় না। সার-এর সমস্যাও অন্যভাবে সমাধান হচ্ছে। রাসায়নিক-সার আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রকার গাভী এখন ধনের স্থান থেকে চ্যুত হয়েছে। কিন্তু সবথেকে পরে চ্যুত হওয়ার জন্য এখন ক্ষত তাজা আছে। প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। সহ্য হচ্ছে না যে, আমাদের ধর্ম তা নয়। বস্তুতঃ গো ধন ছিল সেইজন্য পূজা প্রচলিত ছিল, এমন নয় যে, গাভী ধর্ম অথবা ধর্মের অঙ্গ। ভারতবর্ষই নয় পরন্তু গোটা বিশ্বে গাভীকে পূজা করা হত কারণ ধন ছিল। বৈদিক বাঙ্ময়ে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসব সাহিত্যে মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে 'গো' বলা হয়েছে। 'মানস'-এও এই আশয় দ্বারা 'গো'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে।

গো গোচর জহঁ লগি মন জাই।
সো সব মায়া জানেহু ভাই।। *(মানস, ৩/১৪/৩)*

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং এগুলির স্ব-স্ব বিষয়ে মন যতদূর কল্পনা করতে পারে সে সবই মায়া জানবে। যে-যে মহাপুরুষগণ মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমিত করেছেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ পরমধর্ম পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি বিক্ষিপ্ত হয়, বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নষ্ট হয়ে যায়-এটাই হল ইন্দ্রিয়গুলির বধ, এটাই গো-বধ। বিবেক, বৈরাগ্য, নিয়ম, সংযম, ধ্যান এবং সমাধি দ্বারা মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলি কেন্দ্রিত হয়। এটাই গো-রক্ষা। অতএব 'গো বধ বন্ধ কর' 'গো রক্ষা কর' তবেই ধর্মের জয় হবে, পরমধর্ম পরমাত্মাকে জানতে পারবে। গো-রক্ষার উপরই ধর্ম নির্ভর করে রয়েছে। যদি আমরা পরমধর্ম লাভের ইচ্ছুক তবে গো রক্ষা করুন 'গো' সংযত করুন। যদি ইন্দ্রিয়গুলি বিক্ষিপ্ত তবে আপনি পরামাত্মার পূজা করতে পারবেন না। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধ করার পরেই সেই পূজার বিধান রয়েছে। সেই হেতু গো-রক্ষা সনাতন-ধর্মের সর্বোপরি অঙ্গ।

সঠিক সাধন পথে চলে মন যখন ইষ্টের চরণে স্থির হতে-হতে অতিসূক্ষ্ম হয়ে আসে, তখন ব্রহ্ম পীযূষের স্রোত যোগীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। এই আনন্দ

স্রোতই নন্দিনী। এই ইন্দ্রিয়গুলি যখন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তখন এগুলিই কামধেনুতে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ বিষয় অভিমুখে ধাবিত হয়, ইচ্ছিত বস্তুগুলি পাওয়ার আশায় মন ছুটতে থাকে লাভ হয় না; কিন্তু মনসহিত ইন্দ্রিয়গুলি যখন একত্র হয়ে ইষ্টে অচল স্থির হয়ে যায়, সেই সময় ইচ্ছাগুলি শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তারপরে তো '**জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ। হরিপ্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।**' ***(মানস, ৭/১১৩/৪)*** সেই সময় দুর্লভ বলে কিছু থাকে না এবং শেষে যখন এই দ্রষ্টা জীবাত্মা নিজের পরমাত্ম স্বরূপে স্থিত হয়, সেই সময় কোন কামনাই বাকী থাকে না। '**পাপ পুণ্য কী করে না আসা। সো পহুঁচে রঘুনায়ক পাসা**' এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তাই নেই তবে কামনা কার করবে, এইরূপ পুরুষ পূর্ণকাম হন।

এইপ্রকার যোগশাস্ত্রগুলিতে 'গো'-এর তাৎপর্য হল ইন্দ্রিয়। মন সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে বিক্ষিপ্ত করবেন না, সংযম করুন, গো রক্ষা করুন। যখন আপনি বাসনা থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন, পরমধর্ম পরামাত্মাকে জানতে পারবেন। সেইজন্য যদি ধর্মের প্রয়োজন বোধ করেন তবে গো রক্ষা করুন। কিন্তু কোন পশুকে আবার ধর্ম যেন না ভেবে বসেন। যদি পূর্বপুরুষগণ কোন পশুকে অনুসরণ করেছেন তবে আপনি করুন। কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলিতে এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পশুরূপে গাভী, বলদ, হস্তী এবং অশ্বকে পূজা করা 'ধর্ম' নয়। গাভীর মহত্ত্ব সামাজিক এবং আর্থিক প্রয়োজনীয়তার জন্য ছিল এবং ধনকে তো বর্তমানেও পূজা করা হয়।

আর্থিক মহত্ত্বের দৃষ্টিতে গাভীর প্রতি সংবর্ধনের প্রচলন বিদেশেও ছিল। মহম্মদ সাহেব কুরান শরীফে লিখেছেন যে, গাভী গৃহপালিত পশু, বধযোগ্য পশু নয়, এদের রক্ষা কর। 'কোরআন' শরীফের দ্বিতীয় প্রকরণ 'অলবকর'। গাভীকে আরবী ভাষায় বকর বলে। সেখানেও ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা অল্পজ্ঞ তারা এটাকে 'গোকুশী' মনে করে, সেখানে বিচিত্র গাভীর উল্লেখ আছে যা না তো চাষের কাজে লাগে, যাকে দ্যূতক্রীড়াতে বাজি রাখা হয়নি, যা শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহ করে না, এক বর্ণের হবে, অন্য কোন রং-এর মিশ্রণ হবে না সোনালি রং-এর হবে, এই ধরনের গাভীকে ঈশ্বরের নিমিত্ত বধ করা হবে। এখানেও ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয়-সেবন রোধ করে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়গুলিকে ঈশ্বরে নিযুক্ত করার নির্দেশমাত্র দেওয়া হয়েছে। মহম্মদ সাহেব গাভী দুগ্ধ এবং মাতৃদুগ্ধ দুটিকেই একসমান বলেছেন। এবং গাভীদের রক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।

বকরীদ-এর পর্বে গাভীদের বধ করার কথা কুরানে কোথাও লিখিত নেই। কিংবদন্তী আছে যে, ঈশ্বর রসূলের কাছ থেকে তার প্রিয় বস্তুটি চেয়েছিলেন। সে নিজের পুত্রের বলি দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল, তখন সেখানে একটা পাঁঠা দেখা গিয়েছিল পুত্র প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু কোরাণে বকরীদ-এর চর্চা পর্যন্ত নেই। খাওয়া-দাওয়ার একটা পদ্ধতি ধর্মের নামে প্রচলিত হয়েছে।

ভারতে আক্রমণ করার সময় মুসলমানেরা গাভীর প্রতি হিন্দুদের দুর্বলতা টের পেয়েছিল। মহমুদ গজনবী, মহম্মদ গোরী এবং বাবর ইত্যাদি সকলে কোন না কোনরূপে গাভীদের সম্মুখে রেখে আক্রমণ করেছিল। স্বস্তিবাচক পুজারীদের নির্দেশে ধর্মভীরু ক্ষত্রিয়েরা গোমাতার রক্ষার উদ্দেশ্যে শস্ত্র ত্যাগ করেছিল। একমুঠো মুসলমান গাভীর আড়াল থেকে পণ্ডিতদের ধরে-ধরে আগে সৈন্যদের বধ করেছিল, ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং গাভীর প্রতি হিন্দুদের কোমল ভাবকে উৎপীড়ন করার জন্য গরুদেরও বধ করে হজম করে নিয়েছিল, ইতিহাস সাক্ষী আছে। মুসলমানেরা যে এমন করেছিল এতে তাদের দোষ নেই। দোষ তো আমাদের, যে ধর্ম সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না এবং ধর্মের নামে কুরীতির পূজা করতে যাচ্ছি। অতএব পশু-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, নাগ-পূজার মত কুরীতি মেনে চলবেন না। ধর্মের বাস্তবিক রহস্য এবং ক্রিয়া জানার জন্য কোন তত্ত্বদর্শী মহাত্মার শরণাগত হোন।

যদি ভগবান ছাড়া আর কোন ধর্ম আছে তবে আপনি বলে দিন। গীতা, রামায়ণ, উপনিষদ, যোগ-দর্শন, সব গ্রন্থগুলিতে সাধনার উঁচুনীচু অবস্থা গুলি তো ধ্রুব অকাট্য। এই অবস্থাগুলির চিত্রণ তো অবশ্য পাওয়া যাবে কিন্তু সেটা পৃথক-পৃথক ধর্ম নয়।

।। ওঁ ।।

আর্য

প্রশ্ন : মহারাজজী! ইংরাজ ইতিহাস রচয়িতারা ভারতের ইতিহাসকে আর্যদের ইতিহাস বলে স্বীকার তো করেছেন, কিন্তু তাদের বক্তব্য হল যে, আর্যরা ভারতবাসী ছিল না পরন্তু বাইরে থেকে ইউরোপের দিক থেকে এসেছিল। আর্যরা গৌরবর্ণের ছিল, ইংরেজরাও গৌরবর্ণের; অতএব ইংরেজরাই শুদ্ধ আর্য, তারা ম্লেচ্ছ নয়। এই দেশকে সদৈব বিদেশীরা পরাজিত করেছে, অতএব তারা যে শাসন করতে এসেছিল, কি মন্দ করেছিল? ইংরেজরা এও বলে যে, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বে এখানে অসভ্য কালো লোকেদের বাস-ছিল! আর্যরা তাদের দক্ষিণে বিতাড়িত করেছিল। সিন্ধু নদীর তীরে সভ্য লোকেদের পুরাতন বস্তীগুলি খোদাই করা হয়েছিল তখন ইংরেজরা বলেছিল যে, অপবাদ রূপে কিছু কালো ব্যক্তি সভ্য হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য এই সভ্যতাকে আর্যদের সভ্যতা থেকে পৃথক মনে করা হয় এবং শুধু 'সিন্ধু নদীর তীরের সভ্যতা' বলা হয়। সিন্ধু নদীর তীরে কোন মন্দির পাওয়া যায়নি এবং যারা বলে যে লক্ষ-লক্ষ শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে, সেগুলি বাস্তবে মুষল, নোড়া, মশলা পিষবার শিল-এইরূপ আর্নেষ্ট ম্যায়কে লিখেছেন। আর্য এবং অনার্যের প্রশ্ন তুলে দক্ষিণ ভারতের রামের প্রতিমূর্তিকে দহন করা হয়েছিল। ইংরেজরা এও বলে যে, আগেকার ভারতীয়রা ইতিহাস কিভাবে লিখতে হয় এটাই জানত না। তাতে সন্-তারিখ লিখিত নেই, সেই হেতু পুরাণগুলিতে বর্ণিত ইতিহাস বাজে গল্প। যদিও ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বের ইতিহাস লিখিত আছে। 'বাইবেল' অনুসারে চার হাজার বছর পূর্বে মানব সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে মুসলমানেরা বলে চৌদ্দো শতাব্দী পরে এখানে প্রলয় হবে। এই বিচারগুলি কতটা সত্য?

উত্তর-ভারতীয় ইতিহাসের বিষয়ে বহু ভ্রান্তি আছে, এতে সন্দেহ নেই। ইতিহাস রচনার কথাই ধরুন। আমাদের ইতিহাস বেদ, পুরাণ-এ লিখিত আছে; সেসব ইতিহাস একথা ইংরাজরা স্বীকার করতে রাজী নয়। মহারাজ হর্ষের যুগে চীনের যাত্রী 'হিউয়েন সাঙ্গ' ভারত ভ্রমণে এসেছিল। সে লিখেছে যে, প্রত্যেক গ্রামে একটা করে কর্মচারী থাকত, যারা ভাল-মন্দ সব ঘটনা লিখে রাখত। ইতিহাস আর কেমন হয়? হর্ষেরও এক হাজার বছর পূর্বে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র

থেকে জানতে পারা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে প্রত্যেক গ্রামে 'অক্ষ পটল' নামে বিভাগ ছিল, সেই বিভাগের কর্মচারীরা গোটাগ্রামের ধর্ম, ব্যবহার, চরিত্র এবং ভাল মন্দ ঘটনাগুলি, রেজিস্টারে লিখে রাখত। সিকন্দরের জাহাজের ভেলার এডমিরল নিয়ার্কস লিখেছেন যে, ভারতীয়রা কাপড়েও লিখে রাখত। অতএব ভারতে লেখার পরম্পরা ছিল- এটা নির্বিবাদ।

প্রশ্ন উঠছে যে, আগের এত বেশী আমাদের লিখিত ইতিহাস গেল কোথায়? আপনারা জানেনই যে, শান্তি প্রিয় ভারতীয়দের সাহিত্য অনেকানেক আক্রমণের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয় তিন বছর পর্যন্ত অবিরাম দগ্ধ হয়েছিল। আগেকার দিনে গ্রন্থগুলি খুব পরিশ্রম করে লেখা হয়েছিল। এখনের মত প্রেস সাধন ছিল না। অতএব সেসব পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত রাখা হত। হূণ, মুসলমান আক্রমণকারীরা সব সাহিত্যই সমাপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি যে-কটি গ্রন্থ সুরক্ষিত আছে সেসব তো লোকে মনে রেখেছিল এবং ঘরে লিপি রাখা ছিল বলেই রক্ষা পেয়েছে। ভারতে শ্রুতিধর কখনও কম ছিল না এবং আজও এই শাস্ত্রগুলিকে মুখস্থ বলতে পারে এমন বিদ্বান্ ভারতে অনেক আছে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দিক থেকে এত বহুমূল্য ছিল যে, লোকে সেসব মুখস্থ করাই শ্রেয়স্কর মনে করেছিল এবং এরই মাধ্যমে প্রাচীন গৌরবশালী ইতিহাসেরও এক ঝলক আমরা পেয়ে থাকি। একথা আলাদা আমাদের সাহিত্যকে ইংরেজরা ইতিহাসের সংজ্ঞা দেয় না। তাদের মত হচ্ছে যতক্ষণ কোন ঘটনার সঙ্গে তারিখ এবং সন দেওয়া থাকছে না ততক্ষণ কিরকমের ইতিহাস? তারিখ লিখতে তো ইংরেজরা দু' হাজার বছর আগে শিখেছে, আমাদের এখানের ইতিহাস তো কোটি-কোটি বছরের। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এত তুচ্ছ স্তরে চিন্তা করতেন না।

যে প্রকার সূর্য অনন্ত, পৃথিবী অনন্ত, সেইপ্রকার সময়ও অনন্ত। লিটারের একক নির্ধারিত করা যে প্রকার সমুদ্রের জলরাশি মাপার জন্য হাস্যকর সেইপ্রকার এই অনন্ত সময়কে মাস এবং বছরে গণনা করাও হাস্যকর। সেই হেতু আমাদের পূর্বপুরুষেরা লক্ষ-লক্ষ বছরের কলিযুগ,দ্বাপর, ত্রেতা ইত্যাদি যুগের কল্পনা করেছিলেন, যা ব্রহ্মার একটা দিনও নয়। সেই কারণে তাঁরা সন্, সংবৎ, লিখনের তারিখ-এর মত ছোট পরিমাপের মাত্রার ব্যবহার ইতিহাস লিখনের সময়

করেননি। মনীষীদের সারগর্ভ দৃষ্টিতে ঘটনাগুলির মহত্ত্ব ছিল তারিখের নয়। কোন মহাপুরুষের জন্ম-মৃত্যুর কি তারিখ লেখা হবে আত্মার তো জন্ম মৃত্যু হয় না। এ তো বিরাট প্রভু পর্যন্ত যাত্রা পথের বিভিন্ন চটি। যাত্রীর দৃষ্টি লক্ষ্যের উপরই থাকে, পান্থশালাতে থাকে না। বর্তমানের ভৌতিকবাদী ব্যক্তিরা নিজের নাম প্রচার করার জন্য পথ, পার্ক, গার্ডেন, শহরের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করছেন পরন্তু মহর্ষিগণ নিজেদের স্মারক তারাতে করেছেন যা যুগ-যুগ পর্যন্ত মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে গান্ধী পার্ক-রাখলেও ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি মণ্ডল, অগস্ত্য তারা যুগযুগান্তর ধরে তাদের উপলব্ধি স্মরণ করাতে থাকবে। তুচ্ছ স্মারক অথবা (পরিমাপের মাত্রাতে) এককে পূর্বপুরুষদের কোন রুচি ছিল না, যে-যে মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত থেকে জীবের বাস্তবিক কল্যাণ হওয়া সম্ভব শুধু সেই আখ্যানগুলিকেই মনীষীগণ সঙ্কলিত করেছেন সেই সঙ্গে লোক শিক্ষার জন্য দুর্জনদের উদাহরণও সংগৃহিত করেছেন। চাণক্য অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ যে, ইতিহাসের অন্তর্গত পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র সবই পড়ে।। অর্থ. ১।৫।। পুরাণের অর্থই হল পুরোনো ঘটনা। অতএব ভারতীয় আর্য গ্রন্থগুলিতে নিহিত আমাদের ইতিহাস সর্বথা প্রামাণিক। মহাভারতের ঘটনা আজ থেকে প্রায় পাঁচহাজার বছর আগের-একথা শিলালিপি এবং পঞ্জিকা থেকে প্রমাণিত। মহাভারতে রামায়ণের ঘটনাবলীর সঙ্কেত দেওয়া আছে। রামায়ণ, পুরাণ, শাস্ত্র, উপনিষদ এবং বেদ এর সারাংশ উল্লিখিত আছে। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, উক্তগ্রন্থ আরও প্রাচীন। অতএব যদি আজ কেউ বিশ্বের সভ্যতাকে চার-ছয় হাজার বছর আগের পর্যন্ত সীমিত বলে তবে তার আশয় শুধু এই হচ্ছে যে, সে নিজের চার-ছ হাজার বছর পূর্ব থেকে সভ্য হওয়ার দাবী করছে। বাকী রইল প্রলয় এবং মহাপ্রলয়ের কথা। পূজ্য মহারাজজী বলেছিলেন যে, সৃষ্টি অনাদি ছিল এবং থাকবে। আগেও প্রলয় হয়নি, পরেও হবে না।

বস্তুতঃ 'প্রলয়', 'মহাপ্রলয়' যোগ-এর শব্দ। প্রলয়ের চারটি রূপ যেমন-নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রলয় এবং মহাপ্রলয়। নিত্য প্রলয় তখনই ঘটে যখন আপনি ঘুমান। আপনার কাছে সৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সৃষ্টির কাছে আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। নিয়মের অধীনে যখন নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে চলতে থাকে, মন সব কিছু ভুলে ইষ্টের চরণে স্থির থাকার ক্ষমতা

অর্জন করে, সেই সময় সংসার এবং সংসারের তরঙ্গ সাধকের অন্তরে থাকে না। এটাকেই নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। যখন সাধকের জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারগুলি লুপ্ত হয়ে যায় তখন সেটাই প্রলয়। মহাপ্রলয় তখন হয় যখন সংস্কারের ঊর্ধ্বে শাশ্বত সত্তার দিগদর্শন এবং তাতে স্থিতি লাভ হয়। প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়ে যায়, এটাই 'মহাপ্রলয়'। না সৃষ্টি আছে, না আমি আছি, না থাকব। সেবক হারিয়ে যায় এবং শুধু প্রভুর অস্তিত্ব থাকে। ঈশ্বরের সমান স্থিতি ও বিলয়ের স্তর যখন চলে আসে তখন **'ইশাবাস্যমিদং সর্বম্'**-সর্বত্র ঈশ্বরেরই দর্শন হয়। এই স্থিতি সম্বন্ধে মুখে বলা যাবে না। সেইজন্য বুদ্ধ এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ মূক প্রেরণা দ্বারা এটি ব্যক্ত করেছেন। শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ এই স্থিতিতে উপনীত হয়ে বলেছিলেন সৃষ্টি হয়ই নাই; যদিও তাঁরই হাজার-হাজার শিষ্য কল্যাণ কামনায় সাধনাই করছিলেন। হ্যাঁ, যিনি লাভ করেছেন তাঁর স্বরূপে সৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে গেছে। যে সাধকই ঈশ্বরের সমান স্থিতি লাভ করেন, তাতেই সমাহিত হন, অস্তিত্ব তাঁতে বিলীন হয়ে যায়, তার জন্য সৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অবস্থা সম্বন্ধেই কবীর নিজের ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন-

'অবধূ! বেগম দেশ হ্যায় মেরা।' সে হল সম্রাজ্ঞী, নাগালের বাহিরের বস্তু। সেখানে ঈশ্বর নেই, জীব নেই, মায়া বলে কিছু নেই। প্রলয় আর কেমন হয়? **'কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, নহিঁ তহঁ দ্বৈত বখেড়া।'** -সেখানে দ্বৈতের ঝঞ্ঝাট নেই। কালো-ফর্সা বলে সেখানে কিছু নেই, সেই স্থিতি অনির্বচনীয়। এটাই হল মহাপ্রলয়। বহির্জগতে না প্রলয় হয়েছে, না হবে। সৃষ্টি অনাদি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ইংরেজরা সৃষ্টি কবে থেকে শুরু হয়েছে সে তারিখ খুঁজে বার করেছে। এদিকে মুসলমানেরা প্রলয়ের তারিখ নির্ধারিত করে দিয়েছে। বাস্তবে মহাপুরুষদের অছিলায় আজকের মানুষদের তারিখ খোঁজার নেশায় পেয়েছে।

একজন ইংরেজ ভারতে ট্রেনে যাত্রা করছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করার জন্য ভারতে এসেছিলেন। সময় কাটানোর জন্য সহযাত্রীর কাছে তার পুস্তকটি চেয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। সংযোগবশতঃ সেই পুস্তক গীতা ছিল। দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি গোটা গীতা পড়ে শেষ করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আপনি রোজ গীতা পড়েন। আপনি কি বলতে পারবেন কোন্ তারিখে অর্জুনের জন্ম হয়েছিল? ভারতীয় ভদ্রলোক আশ্চর্যান্বিত

হয়েছিলেন। তিনি কখনও এই ধরণের প্রশ্নের কল্পনাও করেছিলেন না। অতএব বলেছিলেন-গীতাতে কোথায় এমন লেখা আছে? ইংরেজ যাত্রীটি বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন-‘এটাই তো ভারতীয় এবং ইংরেজের মধ্যে তফাৎ। আপনি রোজ পড়েন কিন্তু জানতে পারেননি। আমি এক ঘণ্টা উলট পালট করেই অর্জুনের জন্মের তারিখ খুঁজে বার করেছি। ভারতীয় ভদ্রলোক তাকে কোথায় লেখা আছে দেখাতে অনুরোধ করেছিলেন তখন ইংরেজ ভদ্রলোক চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক দেখিয়ে দিয়েছিলেন। **বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।**

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! আমার জন্ম বহু আগে হয়েছে। হ্যাঁ তোমার জন্ম চার জুনে হয়েছিল। ‘চার্জুন’ স্পষ্ট লেখা আছে। এইরূপ ইংরেজ বিদ্বান শিবলিঙ্গকে মূষল, নোড়া, মশলা পিষবার শিল বললেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা তো প্রতিকূল করার গর্হিত চাতুরী। ম্যায়কালের মত ছিল যে যদি কোন দেশকে নষ্ট করার মতলব আছে তবে সর্বাগ্রে সে দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতি নষ্ট করে দাও। সেইজন্য অনেক ইংরেজ সংস্কৃতকে দেবভাষা নয় গ্রাম্য (ডেড ল্যাঙগুয়েজ) ভাষা বলে। বেদকে মেষপালকদের গান মনে করে, বলে যে, এর থেকে বেশী সেসবের মহত্ত্ব নেই। তার মানে বেদ এবং লোকগীতিতে কোন পার্থক্য নেই। এটা শিব ঠাকুর নন, এটা নোড়া। তারা আমাদের কাছে আমাদের সংস্কৃতিকেই হেয় করতে চায়। তারা বলে যে শিবলিঙ্গ কোন মন্দিরে স্থাপিত নেই। বস্তুতঃ শিবলিঙ্গ সদৈব মন্দিরেই স্থাপিত হয় না। কিছুদিন আগে গণেশ চতুর্থীতে এই বরৈনী গ্রামে সওয়া লক্ষ মাটির শিবলিঙ্গ তৈরী করে তাঁদের পূজা করা হয়েছিল। নিজের সামর্থ্য অনুসারে কেউ মাটির, কেউ পাথরের, কেউ সোনা, কেউ রূপোর শিবলিঙ্গ গঠন করায়। যদি এই ধরনের পরম্পরা প্রাচীনকালে ঘরে-ঘরে ছিল তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হড়প্পাতেযেমন খোদাই করা হয়েছে, সেইপ্রকারের খোদাই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশেও করা হয়েছে। সেই প্রকারই জীবনযাত্রার রীতি গঙ্গার তীরে নর্মদার তীরেও পাওয়া গেছে। সিন্ধু নদীর তীরে বসতি থাকার ফলে যখন সিন্ধুতীরের সভ্যতা, নাম দেওয়া হয়েছে, তবে তো গঙ্গাতীরের সভ্যতা, নর্মদার সভ্যতা, লোথালের সভ্যতা এরকম আরও অনেকগুলি সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সেই সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা ছিল। আর্যদের সভ্যতাই ছিল। কোন একটা প্রদেশ অথবা কোন ভিন্ন

জাতির আকস্মিক সভ্যতা ছিল না।

এর সঙ্গেই ইংরেজদের হোয়াইট মেন্স বার্ডেন-এর দাবীর উপরও বিচার করা যাক, তিনি বলেছেন ভারতীয়দের তিনি সভ্য করেছেন আমি তাঁর দাবী স্বীকার করে নিতাম কিন্তু প্রাচীন খোদাইগুলিতে ইংরেজদের সভ্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একটাও মূর্তি কোর্ট, প্যান্ট, হ্যাট-টাই পরিহিত অবস্থাতে পাওয়া যায়নি। একটাও ক্রুস পাওয়া যায়নি। এর বিপরীত বিদেশে যেখানে-যেখানে খোদাই করা হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের সভ্যতার বস্তু চুড়ি পাওয়া গেছে, আমাদের দেবতাদের ছবি পাওয়া গেছে, আমাদের অনেক গাথা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। কোলম্বাসের থেকেও হাজার-হাজার বছর পূর্বে ভারতীয়রা আমেরিকা খুঁজে বার করেছিল। এই বছরই আমেরিকাতে যে খোদাই হয়েছে তা থেকে এই তথ্য উদ্ভাসিত হয়েছে। সেখানে খোদাই থেকে সেই বস্তু সেই সংস্কৃতিরই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, যা সিন্ধুতীরে পাওয়া গেছে। তামিলের সঙ্গে তাদের ভাষার মিল পাওয়া গেছে, তাই ভারতীয় ভাষাবিদ্‌দের সেখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে, যে-ভারত সেখান থেকে নিয়ে এখান পর্যন্ত এক ছিল। সর্বত্র ভারতীয় সভ্যতা ছিল। এখন আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, মিশর, চীন, জাপান ইত্যাদি যে যে দেশে গৌতম বুদ্ধের পরম্পরা প্রচারিত করা হয়েছে সকলেই আর্য। আমি তো এই বলব যে, বিশ্বকে ভারত সভ্যতা শিখিয়েছে। সিন্ধু তীরের খোদাই-এ কাঁসার নর্তকী পাওয়া গেছে যার, হাত চুড়িতে ভর্তি। আজও সিন্ধু প্রদেশের সমীপবর্তী রাজস্থানে স্ত্রীলোকেরা হাত ভর্তি চুড়ি পরে। সেইরূপ সাজ আজও আছে, যেমন সিন্ধুতীরে পাওয়া গেছে। অতএব সিন্ধু তীরের সভ্যতা বিশুদ্ধ আর্য সভ্যতা এবং এই সভ্যতাই বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছেছিল। ভারতীয় সভ্যতাই বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা। ইংরেজরা পর্যন্ত বেদকে বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছে।

ইতিহাস রচয়িতাদের এইরূপ বলাটাও ঠিক নয় যে, আর্যরা অন্য দেশ থেকে এসেছিল এবং শ্যামবর্ণের লোকেরা ভারতের আদিম নিবাসী। এটা বলাও তাদের ধূর্ততা যে, বর্তমানে ভারতীয়রা আর্যদের মত ফর্সাও নয় এবং দ্রাবিড়দের মত শ্যামও নয়, পরন্তু দেশী-বিদেশী লোকেদের সংযোগে উৎপন্ন হওয়ার ফলে নিজেদের রক্তের শুদ্ধতার দাবী করতে পারবে না। বস্তুতঃ রং-এর নির্ধারণ হয় জলবায়ু থেকে। অক্ষাংশ এবং দেশান্তর বিস্তৃত হওয়ার ফলে ভারতে তিনপ্রকারের

জলবায়ু পাওয়া যায়-শীত, উষ্ণ এবং সমশীতোষ্ণ। ঠাণ্ডা প্রদেশ কাশ্মীরের নিবাসীদের রং ফর্সা, দক্ষিণ ভারতে উষ্ণতা অধিক, সেইজন্য সেখানের নিবাসীরা কালো। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ যেখানে দুরকম জলবায়ুই পাওয়া যায় সেখানের লোকেরা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের। আর একটা কারণ আছে, ভারতবর্ষকে আগে সোনার পাখি বলা হত। গ্রীকের রাজদূত মেগাস্থানিস লিখেছেন যে, ভারতীয়রা সোনার থালাতে খাবার খেত। প্রসিদ্ধ একটা গান আছে সোনার থালায় ভোজন পরিবেশন। ঘরে সোনার থালা ছিল। আক্রমণকারীরা আক্রমণ করে সেই সোনা-রূপো লুট করে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিল। নিরীহ মানুষেরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তারপর জনসাধারণকে জীবন নির্বাহের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রোদে পরিশ্রম করলে রং প্রায় কালো হয়েই যায়। এই মাঝিদেরই ছেলেরা যতদিন লেখাপড়া করে ফর্সা থাকে; কিন্তু যেদিন থেকে রোদে নৌকো বাওয়া শুরু করে; রং কালো হয়ে যায়। এটা তো তাপের জন্য হয়। এমন কথা নয় যে, ফর্সারা বাইরে থেকে এসেছে। বস্তুতঃ সব রকম বর্ণই ভারতে পাওয়া যায় এবং তারা সকলেই আর্য।

আর্যদের বিদেশ থেকে আসার প্রশ্ন যতদূর, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে বিদেশী মেগাস্থানিস লিখেছেন, "সিকন্দরের আগে না তো কোন দেশ ভারতে আক্রমণ করেছিল আর না ভারতই কোন দেশকে গোলাম বানিয়েছিল। কোন দেশই ভারতে বসতি গড়ে তোলেনি। ভারতের সব নিবাসীই এখানেরই মূল বংশজ।" মেগাস্থানিসের সময় কেউ জানত না যে ভারতীয়রা বাইরে থেকে এসেছে এবং আড়াই হাজার বছর পরে ইংরেজরা আবিষ্কার করেছে যে, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে যদিও ইংরেজ জাতি আড়াই হাজার বছরেরও নয়।

যারা বলে যে, আর্যরা বাইরে থেকে এসে উত্তরভারত অধিকার করে কালো দ্রাবিড়দের দক্ষিণে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং নিজেদের প্রতিনিধি রাম-লক্ষণকে পাঠিয়ে দক্ষিণ ভারতের নেতা রাবণের বধ করিয়েছিল। তাদের এরূপ বলাটাও রাজনীতি দ্বারা প্রেরিত এবং দুরভিসন্ধিপূর্ণ। রামের আবির্ভাবেরও আগে সুগ্রীব, বালি প্রভৃতিদের পূর্বপুরুষেরা এবং কেরল, চেন্নাই পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের রাজ্যের নিবাসীরাও আর্যই ছিল। রাম-রাবণ-এর যুদ্ধ হচ্ছিল। রাবণের বহু সেনাপতি মারা গিয়েছিল, তখন কুম্ভকর্ণকে জাগানোর উপক্রম করা হয়েছিল।

বহু চেষ্টার পরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। খাওয়া সেরে একাই যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। ভয়ঙ্কর আকৃতির এই নিশাচরকে দেখামাত্র বানর সেনা পালাতে শুরু করেছিল। অনেকেই ছটফট করতে-করতে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। আরও অনেকের হৃদয়ের গতি রোধ হয়েছিল। অনেক ভালুক, বানর কাদায় লুকিয়ে পড়েছিল। একসঙ্গে পালাতে গিয়ে অনেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল। অনেক সৈনিক সেতু থেকে ফিরতে শুরু করেছিল। রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''যে আসছে কে সে? আমাদের সেনা আতঙ্কে যে বিচলিত হয়ে উঠেছে। এখন যুদ্ধ কি করে হবে?'' বিভীষণ বলেছিল-''ইনি আমার বড় ভাই এবং রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ। লঙ্কা নগরীতে এর থেকে শক্তিশালী, বলশালী কেউ নেই। আপনার সেনা সত্যিই এর সামনে টিকতে পারবে না। সৈনিকদের ধৈর্য্য ধারণ করতে বলুন, তাদের বলুন যে, সে জীবধারী মানুষ নয়, একটা যন্ত্র। যদি এরা টের পায় যে, সে জীবধারী তবে সেনা কিছুতেই যুদ্ধ করবে না।'' এই দায়িত্ব অঙ্গদকে দেওয়া হয়েছিল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ সেনার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উপদেশ দিতে শুরু করেছিল-''বন্ধুগণ! আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। আমরা আর্য। এখন পশ্চাৎপদ হলে সকলেই অনার্য বলবে।'' দেখুন, সুগ্রীব এবং বালির কুলের, সকলেই শুদ্ধ আর্য ছিল। সমুদ্র তটবাসী বানর সেনা আর্য ছিল। রাম তো পরে পৌঁছেছিলেন। আর্যের তাৎপর্য হল যে, সত্যে আরূঢ় থাকে, যে কর্তব্যে অটল থাকে। যখন রাম কনকমৃগের পিছনে গিয়েছিলেন এবং সে রামের তীরে আহত হয়েছিল তখন মায়া মৃগরূপ ধারী কপটী মারীচ রামের স্বরের নকল করে লক্ষণকে ডাকতে শুরু করেছিল। সীতা সে স্বর শুনেই ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন-''লক্ষণ শীঘ্র যাও। তোমার ভাই সঙ্কটে পড়েছেন। লক্ষণ শুনে বলেছিলেন-''না তিনি কখনও সঙ্কটে পড়তে পারেন না, আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন। এটা রামের গলার স্বর নয়, কোন কুটিল নিশাচরের কৌশল।'' সীতা রেগে বলেছিলেন-''কপটী লক্ষণ! তুমি ভাইয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত করে আমাকে পাওয়ার মতলব করছ। অযোদ্ধা থেকেই আমি তোমার স্বভাব লক্ষ্য করছি। কি ভাবছিলে, যে বনবাসকালে রামের মৃত্যু হলে সীতাকে আমি প্রাপ্ত করব। কপটী লক্ষণ! তোমাকে ধিক্। অনার্য লক্ষণ! তোমাকে ধিক্।'' স্পষ্ট হচ্ছে যে, যে সত্যে স্থির থাকতে পারে না সে অনার্য। যিনি সত্যে অটল থাকেন, তাকেই আর্য বলে। যেখানে-যেখানে

সত্যচ্যুত হওয়ার আভাস পাওয়া গেছে, সেখানেই অনার্য শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

লক্ষ্য করুন বাল্মিকী রামায়ণেরই প্রসঙ্গ একবার রাবণ নিজের বেধশালাতে রামের কৃত্রিম মস্তক গঠন করিয়েছিল। সেটাকে সে সীতার সম্মুখে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল-"নাও অজয় রাম!" মর্যাদা রাম! এই নাও নিজের রামকে দেখ, আমার সেনাপতি প্রহস্ত গিয়েছিল এবং কেটে নিয়ে এসেছে। এখন তো স্বীকার করছ আমি শূরবীর? সীতা রামের রক্তাক্ত মাথা দেখে বিলাপ করতে শুরু করেছিলেন, অনার্যা আমাকে ধিক্ আপনাকে লাভ করতে পারলাম না। আমার সত্যতায় কোন ত্রুটি ছিল। একথাতে বোধহয় প্রমাণিত হচ্ছে যে, আর্য তিনিই, যিনি সত্যে অটল থাকেন। আর্য হল একপ্রকার নিষ্ঠা, গুণবাচক পরখ। প্রত্যেক মানুষ এই অবস্থা লাভ করতে সমর্থ।

মহাভারতের প্রসঙ্গেই দেখুন যখন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছিল তখন ভীম আক্ষেপ করে তার মাথায় পা রেখেছিলেন তাকে এরূপ করতে দেখে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন-"ভীম! একে আর মেরো না। এতো আগেই মরে গেছে। অক্ষক্রীড়ার ছলে যখন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বনবাসে পাঠিয়েছিল তখন থেকেই তো মৃত, একে আর কিছু বোলো না।"

অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দুর্যোধন বলেছিল-"এই যে কংস-এর দাসের পুত্র! ছলনাকারী কৃষ্ণ! তোমায় ধিক্। তুমিই কপটতা করে দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ, অন্যথা পাণ্ডব তো দূরের কথা, বিশ্বের কোন শক্তিই আমাকে পরাজিত করতে পারত না। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তুমি ভীষ্মকে বধ করলে আমি কি জানি না ভাবছ? তাল ঠুকে ভীমকে আমার উরুতে প্রহার করার সঙ্কেত তুমি দিয়েছিলে-এটাই কি আর আমার অজানা? অনার্য কৃষ্ণ! তোমাকে ধিক্।"

এখানে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে অনার্য শব্দের প্রয়োগ করেছে এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, সত্য ত্যাগ করে অসত্যকে যে আশ্রয় করে সেই অনার্য। আর্যত্ব গুণবিশেষকে বলে এটা কোন জাতি নয়। আর্য শব্দের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ। এই শব্দ সংস্কৃতের 'ঋ' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এর থেকেই ঋৎ শব্দ রচিত হয়েছে, 'ঋ'-এর অর্থ তীক্ষ্ণ এবং ছেদনকারক ও 'অর' হঠপূর্বক ছেদন করাকে বলে। যে চিন্তন পথে বাধাগুলিকে দৃঢ়তাপূর্বক ছেদন করে তাকে আর্য বলে। 'অরঃ যম' অর যমকেও বলে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়,

ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পাঁচটি যম রয়েছে। এই যম পালনের সময় যে বাধাগুলি আসে সেগুলি যে ছেদন করতে সক্ষম সেই আর্য। সেই সত্যানুসন্ধানকারী হয়। যে এই যমগুলি পালন করে না, তারজন্য এই যমগুলিই দণ্ডধর যমরাজ-এ পরিণত হয়। এগুলির পালনকর্তা হল আর্য, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, ভারত অথবা বিশ্বের যে কোন স্থানের বাসিন্দা হতে পারে সে, তাতে কিছু যায় আসে না।

এই প্রকার আর্য শব্দটি গুণবাচক, জাতিবাচক নয়। বর্ণ-ভেদ-এর উপর আধারিত নয়। যারা এরূপ বলে যে "উত্তরভারতের নিবাসী আর্যগণ বাইরে থেকে এসেছে, দক্ষিণের কালো দ্রাবিড়গণ ভারতের মূল নিবাসী" -তারা সমাজে বৈষম্য, বিরোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলে।

বাস্তবিকতা তো এই যে, দক্ষিণ ভারতের নিবাসীগণ রাবণের বংশধর নয়। তারা অঙ্গদ এবং সুগ্রীব প্রভৃতিরই সন্তান এবং তারা আর্যই ছিল স্বয়ং রাবণের পিতা, পিতামহ সকলেই আর্য ছিলেন কিন্তু আর্য-এর গুণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে রাবণ অসুরে পরিণত হয়েছিল। এইপ্রকার দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ ভারতের নিবাসীগণ রাবণকে বধ করেছিল। উত্তর ভারতের তো একটা ইঁদুর পর্যন্ত মারা যায়নি। একটা সৈনিকও উত্তর ভারতের ছিল না। সীতার খোঁজে রামের যাওয়া নিশ্চিত ছিলই। দক্ষিণের নিবাসীরা রাবণের অত্যাচারে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। রাম শুধু তাদের সংগঠিত করেছিলেন। বস্তুতঃ উত্তর-দক্ষিণ ভারতের নিবাসীগণ আর্য-এরই বংশধর। শুধু তাই নয় পরন্তু জাপান, চীন, মধ্য-এশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি যে-যে দেশে গৌতম বুদ্ধের বাণী, গুরু নানকের উপদেশ, আর্য-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার হয়েছে, সেখানের সকলেই আর্য, কারণ তারা সত্যানুসন্ধানকারী। সর্বত্র সকলেই আর্য তা অবশ্যই নয় আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষদেরও অস্তিত্ব সদৈব ছিল।

প্রায় প্রত্যেক দেশে, সমাজে আর্য-অনার্য, দৈবী আসুরী প্রবৃত্তির ব্যক্তিরা একত্রে বাস করে আসছে। একথা আলাদা যে, কখনও দৈবী প্রবৃত্তির ব্যক্তিরা সংখ্যা বেশী হয় আবার কখনও আসুরী প্রবৃত্তির ব্যক্তিদের বাহুল্য ঘটে। শাস্ত্র খুলে দেখুন, পুরাণের পাতা ওলটান, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, সময়ে সময়ে দেবতারা পর্যন্ত পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকতেন এবং সর্বত্র অসুরদের আতঙ্ক ছেয়ে যেত। হিরণ্যকশিপু, রাবণ এবং দানবেরা সময়ে-সময়ে এইরূপ আতঙ্কিতই করেছিল পরমদেব পরমাত্মা হতে পৃথক প্রকৃতিকে বিশ্বাস করে যারা, তাদের অসুর বলে

এবং পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য প্রযত্নশীল পুরুষদের দেবতা এবং আর্য বলে। উভয়েরই মধ্যে পার্থক্য এটুকুই। 'ছান্দোগ্যউপনিষদ-এর আখ্যান দ্বারা এই পার্থক্যের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। এককালে ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে আত্মার বিষয়ে জানার জন্য গিয়েছিলেন। প্রজাপতি বলেছিলেন ''আত্মাকে দেহের ভিতর সন্ধান কর।'' দুজনেই ফিরে এসেছিলেন। প্রজাপতি উভয়কে ফিরে যেতে দেখে বলেছিলেন-''দুজনেই আত্মার সাক্ষাৎকার না করে ফিরে যাচ্ছে। এই দেহই আত্মা।'' এইপ্রকার চিন্তা যে করবে, সে দেবতা হোক অথবা অসুর তার পতন হবে। অসুর বিরোচন দেহটাকেই আত্মা ভেবে এটাকে অলঙ্কৃত করে এর সুখ ভোগের যোগাড়ে ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্র বারংবার বিচার, সকলেন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য-এর পালন করে শেষে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেছিল। 'খাও, দাও ফূর্তি কর।'-এটাই অসুরদের মত। বর্তমানেও এইরূপ প্রচার সংসারে ন্যূনাধিক হচ্ছেই। এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে বর্তমানে দৈবী প্রকৃতির পুরুষদের গুহাতে গিয়ে লুকোতে হয় না। ভারতের আর্য সংস্কৃতি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যূনাধিক মাত্রাতে আর্যরা বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে। কিছু ব্যক্তি বিরোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলে যে, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছিল। বহু ভারতীয় বিদ্বানও এই মতে সায় দিচ্ছেন কারণ তাদেরও ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যথার্থ লিখলে হয়ত তারা ডিগ্রীই পাবে না, চাকরী অথবা পদও লাভ করতে অসুবিধা হবে, ভারত ও এদেশের সভ্যতাকে নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তারাও ইংরেজদের সমর্থন করে চোখ বুজে নেয়। কিছু-কিছু ইংরেজ বাস্তবিকতা প্রতিপাদনের সাহসও করেছিল কিন্তু বিরোধীদের অরণ্যরোদন কে শুনছে?

বরৈনী নিবাসী শ্রী ওঁকারনাথ সিংহ প্রশ্ন করেছিলেন যে, মহারাজজী! যদি গোটা সংসারের নিবাসীরা আর্য তবে এ কথা স্বীকার করতে আপত্তি কোথায় যে, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছিল, মহারাজজী বলেছিলেন-''দুটো কথা! যদি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরাও আর্য, তবে তারা নিজেদের আর্য বলে কেন স্বীকার করে না? 'আর্য' শব্দটি খ্রীষ্টপূর্ব-এর অতএব এদের আর্য বলানোতে দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়। আপনার কথা স্বীকার করতে আর একটা আপত্তি এই যে, ভারতবর্ষে চিরকাল ধর্মের অনুষ্ঠান এবং মহাপুরুষদের অবতরণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বেশী হয়ে এসেছে। আজকের বিশ্বকেই দেখুন। সংসারের বহু দেশে জীবনের সুবিধা ভারতের থেকে বেশী রয়েছে। মোটরগাড়ি, ঘর বাড়ি এবং বিলাসিতাতে অনেক

দেশ ভারতের থেকে এগিয়ে আছে, কিন্তু অশান্তি, কলহ, পাগলামি এবং আত্মহত্যার ঘটনা সেখানে ভারতের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দেখা গেছে। জনসংখ্যা ভারতে বেশী রয়েছে, কিন্তু দুর্ঘটনা সেই দেশগুলিতে বেশী ঘটে। ভারতীয়রা গরীব হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু সন্তোষ রয়েছে মনে কোন অশান্তি নেই। বিবাহে স্থিরতা ভারতেই আছে। বিদেশে সাত-আটবার ডিভোর্স হওয়াটা সামান্য ব্যাপার। স্ত্রীজাতির সতীত্ব ভারতবর্ষেই মর্যাদার বিষয়। কম্যুনিস্ট অথবা পুঁজিবাদী তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে এটা শারীরিক ক্ষুধা মাত্র। এতটা সদাচার তো ভারতে আজও সর্বত্র রয়েছে।”

প্রাচীনকালে ভারতের সদাচরণ কত উন্নত ছিল? এই বিষয়ে এক বিদেশীর মুখ থেকেই শুনুন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরোশ বছর আগে চীনের পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। পনেরো বছর ধরে তিনি সম্পূর্ণ ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। ফিরে তিনি যাত্রার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন-“ভারতবাসীগণ অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান্ এবং সত্যবাদী। তারা পাপ পুণ্যের সদৈব খেয়াল রাখে। তাদের ব্যবহার মধুর ও নম্র। এত বেশী পবিত্র যে, দেশের লোক মাংস, মদিরা, রসুন এবং পিঁয়াজ ভক্ষণ করে না। কেবল চণ্ডাল ব্যক্তিই এসবের প্রয়োগ করে। তারা নগরের বাইরেই বসবাস করে। কথিত আছে যে এই দেশের ভাষা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। সম্ভবতঃ সেইজন্য ভারতীয়দের ভাষা অতি শুদ্ধ, উচ্চারণ বড়ই মধুর। তাদের ভাষা দেবতাদের ভাষা বলে মনে হয়, পরন্তু ভারতের বাইরে বসবাসকারীদের ভাষা এবং উচ্চারণ অশুদ্ধ। এই দেশকে হিন্দুস্তান বলা হয়। কিছু-কিছু বিদ্বানের মতানুসারে ‘হিন্দু’ শব্দ সিন্ধু নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আবার কিছু ব্যক্তির অনুসারে এটা ইন্দু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ এখানে চন্দ্রমা কিন্তু আমার মতে এই দেশের বাস্তবিক নাম দেবভূমি হওয়া উচিত কারণ এখানে মানুষ নয়, দেবতারা বাস করেন।”

বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃতি দৈবী ছিল। অন্যান্য সংস্কৃতিকে, অন্যান্য দেশকে এই গৌরব কখনও কেউ দেয়নি। অতএব একথা স্বীকার করার প্রশ্নই উঠছে না যে, আমরা বাইরে থেকে এসেছি। আর্য সংস্কৃতির গড় তো ভারতবর্ষ। বিশ্ব যা কিছু শিখেছে, সেটা ভারতেরই অবদান। সাধনারম্ভে যীশুও যোগ সাধনা শিখতে ভারতে এসেছিলেন। তিব্বতের পুস্তকালয়ের প্রাচীন পুস্তকগুলি থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে। বাইবেল-এ “চড়া রোদে নেংটো বাচ্চাদের খেলা করা,” ‘জল সংগ্রহ করতে আসা মেয়েদের দল’। ‘আমগাছের বাগান’-এর বর্ণনা আছে, যা ইংল্যাণ্ড অথবা জেরুসলম-এ বড় হয়ে ওঠা মানুষেরাও স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। ঈশা শব্দটিই

ভারতীয় শব্দ ঈশ, ঈশ্বরের নকল। ঈশকে মসীহা বলা হয়। মসীহা বৈদ্যকে বলে গুরুই সব থেকে বড় বৈদ্য, যিনি ভবরোগ থেকে রক্ষা করেন। সেই কারণেই খ্রীষ্টান মিশনারীগুলিতে গাওয়া হয় 'ঈস মসীহ মেরে প্রাণ বচৈয়া।' বস্তুতঃ এ-সমস্তই ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং বলা তো এতদূর হয় যে বিশ্বে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা আর্যভূমি ভারতেরই অবদান। আত্মোপলব্ধির জন্য ভারত জগতগুরু ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। একথা আলাদা যে, ভারতীয়রা শান্তি প্রিয় ছিল সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করত। পরন্তু বিদেশী আক্রমণকারীরা নিষ্ঠুর এবং হিংসাপরায়ণ ছিল। সেইজন্য সময়ে-সময়ে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে তাদের তারা গোলাম বানিয়েছিল, এমন কথা নয় যে, তাদের শক্তি বেশী ছিল। এই কারণেই ভারত এবং ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি কখনও সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়নি। যখনই শৌর্যের স্মরণ এসেছে, ভারতবাসী পুনরায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বস্থানে বিরাজিত হয়েছে। সেইজন্য ভারত আজ স্বতন্ত্র। বিদেশীদের বহু কৌশলের পরেও ভারতীয় সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রয়েছে। আর্যগুণধারী মানুষদের সংখ্যা বেশী এখানে সেইজন্য সমগ্র ভারতই মূল আর্যভূমি। যদিও আর্যগুণধারী মনুষ্য সর্বত্রই রয়েছে। এই আর্যত্বের উপলব্ধির জন্য মহর্ষিদের সান্নিধ্য আবশ্যক।

।। ওঁ ।।

---

১. ভগবান গৌতমবুদ্ধের অনুসারে মানুষের দুটি বিভাগ রয়েছে। যিনি সন্মার্গে দৃঢ়তাপূর্বক আরূঢ়, তাঁকে আর্য বলা যেতে পারে এবং যে সন্মার্গে আরূঢ় নয়, তাকে পৃথকজন বলে। সেও জনই, কারণ আর্য হওয়ার ক্ষমতা তার ভিতর প্রসুপ্ত রয়েছে।

'মজ্ঝিম নিকায়'-এর পাসরাসি সুত্ত (১-৩-৬)-এ একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে যে, একবার ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথ পিণ্ডিকের আরাম জেতবন-এ বিহার করছিলেন। পূর্বাহ্নের সময় পাত্র-চীবর ধারণ করে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করতে-করতে তিনি রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে পৌঁছেছিলেন, সেখানে ধর্ম-কথা হচ্ছিল। তথাগত সম্বোধিত করেছিলেন-''তোমরা কি চর্চা করছিলে?'' তাঁরা বলেছিলেন-''আমরা ভগবৎ চর্চা করছিলাম এরই মধ্যে সেখানে ভগবান পৌঁছেছিলেন।''

সাধুবাদ দিয়ে শাস্তা বলেছিলেন-''শ্রদ্ধাপূর্বক ঘর থেকে প্রব্রজিত কুল-পুত্র তোমাদের পক্ষে এটাই শোভনীয়। ভিক্ষুগণ! তোমাদের কর্তব্য মাত্র দুটি-(১) ভগবানের চিন্তন, (২) আর্যত্বের গুণগুলির মনন অর্থাৎ সেই গুণগুলির চিন্তন যেগুলি অনুসরণ করে জাতিধর্মা, ব্যাধিধর্মা, শোকধর্মা, সংক্লেশধর্মা এবং মরণধর্মা পুরুষ অজাত, ব্যাধিরহিত, অশোক অসংক্লিষ্ট এবং অমৃত হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! যিনি পূর্ণত্ব লাভ করেছেন, তিনিই আর্য।''

অবতার

প্রশ্ন- মহারাজজী! 'বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত, লীহ্ন মনুজ অবতার।' ***(মানস, ১/১৯২)*** **কদাচিৎ কেউ সাধু হয়। সামান্য মানুষদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণের জন্য অবতারের আবির্ভাব হয়। আর কারও ডাকে কি ভগবান সাড়া দেন না?**

উত্তর- ঠিক বলছ! শোন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলিতে চব্বিশজন অবতারের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও চব্বিশজনই পয়গম্বর এবং জৈন সমাজেও গুরুর সংখ্যা চব্বিশজনই। তেইশজনও নেই অথবা পঁচিশজনও নেই বিলক্ষণ সমানতা। তা তো এই যে, প্রায় সব অবতারই মহাত্মা, এঁরা আমার আপনার মতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেউ পরিস্থিতির চাপে, কেউ পূর্ব পুণ্য পুরুষার্থ দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই সেই তত্ত্বের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন, চিন্তন দ্বারা চিন্ময় অবিনাশী স্থিতি লাভ করেছিলেন এবং অবতার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করেছিলেন। সনাতনী মনীষাতে অবতারের সম্বন্ধে প্রায়ই এই চিন্তাধারা দেখা গেছে যে, অবতার প্রজ্ঞাতে চমৎকার কিছু, যে ভক্তদের কাতর ডাকে হঠাৎ কোথাও প্রকট হবেন, খলদের বিনাশ এবং আমাদের রক্ষা করবেন, কিন্তু মূলশাস্ত্রগুলিতে এইরূপ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে চব্বিশজন অবতারের মধ্যে আঠারোজন মহাত্মা হয়েছেন এবং কচ্ছপ, মৎস্য, শূকর, নৃসিংহ, হংস ইত্যাদি পশু-পক্ষী অবতারও রূপক এর মধ্যে প্রভুর অবতরণের একই প্রকার বিধি-বিশেষের চিত্রণমাত্র রয়েছে। বাকী রইলেন ভগবান রাম এবং কৃষ্ণ, তা এঁদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তিনি যোগেশ্বর।

রামচরিতমানসের কিছু-কিছু পঙ্‌ক্তি থেকে বোধ হয় যে, মানুষদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য অবতার আবির্ভূত হন। অবতারের উপর আলোকপাত করে গোস্বামী তুলসীদাসজী বলেছেন।

জব জব হোই ধরম কৈ হানী। বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী।
করহিঁ অনীতি জাই নহিঁ বরনী। সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরনী।।
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা। হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন পীরা।।

(মানস, ১/১২০/৬-৮)

বিপ্র, সুর ও পৃথিবী এরা যখন কষ্ট পায়, তখন-তখন বিবিধ শরীরে প্রভু প্রকট হন। প্রথমে পৃথিবীকে দেখুন। উত্তর ধ্রুব থেকে দক্ষিণ ধ্রুব পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবী! ভগবানের আবির্ভাব থেকে যা কিছু সুখ-দুঃখ পাবে, তা তো সেই জানে।

দেবতাদের সুখ-দুঃখও সেই জানে। বাকী রইল পশু শ্রেণীর গাভী, তা আমরা গাভী তো নই যে, আমরাও ভগবানের কিছু অংশ পেতাম। মানুষদের মধ্যে যদি কারও জন্য অবতার আবির্ভূত হন তবে তা কেবল ব্রাহ্মণের জন্য হন। **'সীদহিঁ বিপ্র'** -যখন বিপ্র কষ্ট পায় তখন নিবারণের জন্য হয়, অন্য কারও জন্য নয়।

বিশ্বের প্রায় পৌনে চার'শ দেশের মধ্যে একটি দেশ ভারত। বিশ্বের অংসখ্য জাতি। তাদের মধ্যেও প্রচলিত চার বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ বর্গের জন্য ভগবান প্রকট হন। তবে তো এই ভগবান একটা দলের হলেন, বিশ্বব্যাপী কিরূপে? আবির্ভূত হয়ে ভগবান কি করেন? **'অসুর মারি থাপহিঁ সুরহ্ন, রাখহিঁ নিজ শ্রুতি সেতু।'** -***(মানস, ১/১২১)*** অসুরদের বধ করেন। যারা বিপ্র এবং ধেনুদের কষ্ট দেয়। তারাই অসুর। বিপ্র তো আর বিপ্রকে কষ্ট দেবে না। যখনই কেউ কষ্ট দেবে বিজাতীয় প্রবৃত্তিরই কেউ দেবে। ভগবান তাদের বধ করার জন্যই আবির্ভূত হন। তবে এই প্রকারের ভগবানকে কেউ কেন ভজনা করবে? যাদের তিনি রক্ষা করেন তারা ভজনা করুক বিশ্বের বাকী মানুষ যদি ভজনা করেও তবু তিনি তাদের গর্দানই তো নেবেন। এইরূপ ঘুমন্ত বাঘকে কে জাগাবে? শেষে বলছেন-'**রাখহিঁ নিজ শ্রুতি সেতু**'-নিজের বৈদিক মর্যাদার রক্ষা করেন। বাস্তবে এটাই বেদোক্ত পার হওয়ার কৌশল।'

সম্পূর্ণ রামচরিতমানস-এ **'নিজ ইচ্ছাঁ প্রভু অবতরই সুর মহি গো দ্বিজ লাগি।'** ***(মানস, ৪/২৬)*** এবং পরে ভগবান শুধু **'গো দ্বিজ হিতকারী জয় অসুরারী'** ***(মানস, ১/১৮৫ ছন্দ)*** -শুধু গো এবং দ্বিজেরই হিত করেন। মানুষদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রার্থনা শোনেন, যারা শুধু ভারতবর্ষেই বাস করে। বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানুষদের এইরূপ ভগবানের সঙ্গে কি সম্পর্ক? অন্য শ্রেণী এবং ধর্ম তার জন্য কেন হাপিত্যেশ করবে? তাহলে ভারত কিরকম বিশ্বগুরু? অতএব একথা বিচারযোগ্য যে, দ্বিজ কে, যার কল্যাণ করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন?

বাস্তবে শাস্ত্রগুলির এই কথন সত্য যে, ভগবান 'গো দ্বিজ হিতকারী' কিন্তু যে বিপ্রের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন তা সংসারে প্রচলিত কোন জাতি নয় অপিতু একটা স্থিতি বিশেষ, মানসেরই উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিতে আপনি তা অধ্যয়ন করলেন। যত্র-তত্র সর্বত্র রয়েছে। রাজর্ষি জনকের মত উচ্চবংশজাতের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং বিশ্ববিশ্রুত সীতার মত পুত্রবধূর প্রাপ্তিতে মহারাজ দশরথ-এর প্রসন্নতার সীমা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ গুরু বশিষ্ঠ-এর কাছে নিবেদন করেছিলেন **'অব সব বিপ্র**

বোলাই গোসাইঁ। দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাঈ।।' ***(মানস, ১।৩২৯।৭)*** বিপ্রগণকে আমন্ত্রণ করুন, তাঁদের গাভী দান করুন। গুরুদেব রাজার প্রশংসা করেছিলেন। এবং মুনিগণকে আমন্ত্রিত করেছিলেন- **'পুনি পঠএ মুনি বৃন্দ বোলাঈ।'** এসেছিলেন কারা? **'বামদেব অরু দেবরিষি বালমীকি জাবালি । আএ মুনিবর নিকর তব কৌসিকাদি তপসালি।'** ***(মানস, ১।৩৩০)*** একজন স্বয়ং বামদেব (যথা নামো তথা গুণঃ), দেবর্ষি নারদ (দাসী পুত্র), বাল্মীকি (কোল-কিরাত), কৌশিক (বিশ্বরথ নামক নরেশ) ইত্যাদি। রাজা চার লক্ষ গাভীকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং **'মুদিত মহিপ মহিদেবহ্ন দীহ্নীঁ'**। প্রসন্নতাপূর্বক মহিদেবদের দান করেছিলেন।

একথা উল্লেখযোগ্য যে, রাজা অনুরোধ করেছিলেন, ''বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করুন, '' মুনিগণকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। মুনিদের মধ্যে কেউ দাসী পুত্র, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ কোল কিরাত, বিভিন্ন বংশের জাত এবং যখন দান করেছিলেন তখন তাদের মহিদেব বলে সম্বোধিত করেছিলেন। অতএব মুনি, বিপ্র মহিদেব এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদি মানস-এর অনুসারে সমার্থক শব্দ। ব্রহ্মনিষ্ঠার ক্রমোন্নত অবস্থা। আর্যগ্রন্থগুলিতে যত্র-তত্র সর্বত্র এরই উল্লেখ রয়েছে। প্রমাণের জন্য মহারাজ অত্রির বাণী, গীতা অধ্যয়ন করুন-প্রত্যেক গ্রন্থে আপনি এইরূপ উল্লেখ পাবেন। মহর্ষি অত্রি বলেছেন-

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাধ্যায়ী ভবেদ্ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।।

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতক শূদ্র, অল্পজ্ঞ। সংস্কার হতে (সঃ অংশ আকার) সঃ মানে সেই পরমাত্মা সেই পরমাত্মার আংশিক সঞ্চার। আকার যখন থেকে প্রাপ্ত হয় তখন জাতক দ্বিজ, দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে যা গর্ভবাসের যাতনাগ্রস্ত জন্ম থেকে ভিন্ন অজর, অমর, নির্দোষ, আত্মস্থিতি, এটা শাশ্বত সত্যের প্রবেশ। সাধনা যখন আরও তীব্র হয় তখন **'বেদাধ্যায়ী ভবেদ্ বিপ্র'**-যে তত্ত্ব অবিদিত ছিল, সেই পরমাত্মা নিজের অনুভূতি প্রদান করতে শুরু করেন। সেই অনুভূতির অধ্যয়ন করে সেই নির্দেশগুলির অনুসারে যিনি চলেন, তিনি বাস্তবিক বেদাধ্যায়ী, বিপ্র। যদি বেদ নামক গ্রন্থ পাঠ করলেই বিপ্রের স্থিতি লাভ হত, তবে তো বর্তমানে বহু পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় অধ্যেতা বিপ্র হয়ে যেতেন কারণ আগে সকলের পাঠ করার অধিকার ছিল না, আজ আছে; কিন্তু এটা যথার্থ নয়। বস্তুতঃ যিনি উত্তমরূপে ব্রহ্ম-এ পরায়ণ, তিনিই বিপ্র। সাধনার যখন আরও উন্নতি হয়, তখন **'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'**-যে স্থান হতে সেই ব্রহ্ম অনুভূতি প্রদান করেন, সেই মূলের যিনি স্পর্শ করেছেন,

তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ একটি স্থিতি বিশেষ।

ভগবান বাস্তবে গো-দ্বিজ হিতকারী কারণ যিনিই তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করেছেন, সমর্পণ করেছেন, তাঁর গোসংযম করে আত্ম সচেতনতা সুরক্ষিত করে রাখেন, সাহায্য করেন; সেইজন্য শুভানুধ্যায়ী এবং যে তাঁর শরণাগত নয়, তার কাছে ভগবানের সেই মহিমা প্রকাশ পায় না, যে কারণে অবতার অবতরিত হন। **'কৃপাসিন্ধু জন হিত তন ধরহী।'** ***(মানস, ১ /১২১/১),*** **'সো কেবল ভগতন হিত লাগী।।'** ***(মানস, ১/১২/৫)*** তিনি কেবল ভক্তদের হিতচিন্তক।

বাস্তবে ব্রাহ্মণ চিন্তন পথ-এর যোগ্যতাকে বলে। যিনি শাশ্বত ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল, তিনিই বিপ্র। আসুন দেখি বেদ, উপনিষদ এবং শাস্ত্রগুলির সারাংশ গীতাতে অবতারের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে? অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল-ভগবন্! আপনার জন্ম তো এখন হয়েছে। এবং সূর্যের জন্ম তো বহু আগে হয়েছে। আপনি এই অবিনাশী যোগ সম্বন্ধে কল্পের আদিতে সূর্যকে বলেছিলেন, এটা আমি কিরূপে বিশ্বাস করব? একথা শুনে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন-

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।। ***(গীতা, ৪/৬)***

অর্জুন! আমি অজন্মা, অব্যক্তাত্মা এবং সকল ভূত প্রাণীর স্বরে সঞ্চারিত (ঈশ্বর) হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে **'আত্মমায়য়া'**-আত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারা স্বাধীন করে প্রকট হই। আত্মমায়া, যোগমায়া সমার্থক। আত্মা পর্যন্ত স্থিতি যা আত্মস্থিতি লাভ করতে সাহায্য করে তা আত্মমায়া। যা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন করিয়ে দেয় তা যোগমায়া। একেই মানস-এ রামমায়া অথবা বিদ্যামায়া বলা হয়েছে, যা হরি দ্বারা প্রেরিত যদিও প্রকৃতিরই একটা দিক্। এই আত্মিক মায়া দ্বারা তিনটি গুণ সংযত হলেই ভগবান প্রকট হন। তিনি বলেছেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাৎমানং সৃজাম্যহম্।। ***(গীতা, ৪/৭)***

'ধর্মস্য গ্লানিঃ'-একমাত্র ধর্ম পরমাত্মা। ধর্ম শ্বাশত, সনাতন এবং এদিকে **'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'** -ব্রহ্ম সনাতন। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা একই পরমপুরুষের সমার্থক সেই সনাতন পরমপুরুষ পরমাত্মাই ধর্ম। আমি কে? সনাতনধর্মী! সেই সনাতনের পিপাসু! যখন সেই ধর্মের জন্য হৃদয় গ্লানিতে ভরে ওঠে, অধর্মের বৃদ্ধি দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠি তখন আমি স্বরূপ রচনা করি। যিনি তার জন্য ব্যাকুল,

তিনিই ব্রাহ্মণ,তাঁর জন্যই অবতার অবতরিত হন।

সেই অবিনাশী তত্ত্ব লাভ করার জন্য বিরহ জ্বালা যে কোন ব্যক্তির মধ্যে শুরু হতে পারে, গ্লানিতে যে কোন ব্যক্তির হৃদয় ভরে উঠতে পারে, ব্রহ্মপরায়ণ যে কেউ হতে পারে, ব্যস তারই জন্য প্রকট হবেন। এইরূপ গ্লানিই মনু মহারাজের হয়েছিল।

হোই না বিষয় বিরাগ ভবন বসত ভা চৌথপন।
হৃদয়ঁ বহুত দুঃখ লাগ জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।।

(মানস, ১।১৪২)

বিষয় থেকে বৈরাগ্য আর হচ্ছে না। ভজন ছাড়াই জীবন পেরিয়ে যেতে চাইছে। গ্লানিতে হৃদয় ভরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবান নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন এবং মনু লাভ করেছিলেন।

যোগেশ্বর বলছেন যে, '**জন্মকর্ম চ মে দিব্যম**'-আমার সেই জন্ম এবং জন্মগ্রহণ করে যে কর্ম করি দুটোই দিব্য। '**এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ**।' *(গীতা, ৪।৯)* -আমার এই প্রকারের স্বরূপ যিনি দেখেন, তিনি তত্ত্বদর্শী। শুধু তত্ত্বদর্শীই জানতে পারেন। কেন তবে লোকেরা দলে-দলে ছুটে যায় অবতার দর্শন করার জন্য।

বস্তুতঃ সেই অবতারের ব্যবস্থা সকলের অন্তরে বিদ্যমান। অতএব প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আপনাকে রক্ষা করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত। আপনার জন্ম যেখানেই হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। ব্রহ্মকে লাভ করার জন্য যিনিই তৎপর, চিন্তন রত, আত্ম-সংযম-এর জন্য সময় দিয়েছেন, অবস্থাভেদ-এ তাঁকেই দ্বিজ এবং ব্রাহ্মণ বলে। অতএব বিপ্রের পবিত্র স্বরূপকে ধূমিল করে যারা, তারা অন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করে বিপ্র-এর উদ্‌গমের খোঁজ করুন, চিন্তন করুন এবং বিপ্র-স্থিতি লাভ করুন।

।। ওঁ ।।

ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধুসঙ্গ অনিবার্য

পূজ্য মহারাজজী বলতেন, "হো! আমি ভগবানের দূত। আমাকে দর্শন না করে কেউ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না।"

অসি হরি ভগতি সুগম সুখদাঈ। *(মানস, ৭।১১৮।১০)*
সো বিনু সন্ত ন কাহুঁ পাঈ।। *(মানস, ৭।১১৯।১৮)*

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! তুমি কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হও এবং সেই জ্ঞান লাভ কর, যা লাভ করার পর কিছু জানা বাকী থাকবে না। তাঁর কাছ থেকে জানার পর জীবনে আর কখনও সন্দেহ উৎপন্ন হবে না। *(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৪।৩৪)*

সাধকের আচরণ

প্রশ্ন- মহারাজজী! সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর- দেখুন, সাধককে ততটাই করা উচিত, যতটা সুতীক্ষ্ণ করেছিলেন। সুতীক্ষ্ণ মহর্ষি অগস্ত্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যখনই শুনেছিলেন যে, বনবাসে পর্যটন করতে-করতে ভগবান এই জঙ্গলেই কোথাও এসেছেন। তেমনি প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন-

হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া।
মো সে সঠ পর করিহহিঁ দায়া।। *(মানস, ৩/৯/৪)*

হে বিধাতা! দীনজনের প্রভু! আমার মত শঠের উপরও কি দয়া করবেন? আমার মত মূর্খের উপরও দয়া করবেন? তিনি কি মূর্খ ছিলেন? কয়েক ঘণ্টা পরেই তো ভগবানের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি ভাবছিলেন-

মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় নাহীঁ। ভগতি বিরতি ন গ্যান মন মাহীঁ।।
নহিঁ সৎসঙ্গ জোগ জপ জাগা। নহিঁ দৃঢ় চরন কমল অনুরাগা।।
(মানস, ৩/৯/৬-৭)

আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নেই। ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান কিছুই নেই। আমি সৎসঙ্গ, যোগ, জপ এবং যজ্ঞশূণ্য এবং চরণ কমলে দৃঢ় অনুরাগও নেই। সত্যিই কি তাঁর মধ্যে এইগুণগুলির অভাব ছিল? কদাপি নয়! তিনি এই সবই গুণে সম্পন্ন ছিলেন, **'মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক।'** *(মানস, ৩/৯/২)* ছিলেন; স্বপ্নেও ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কোন দেবতাকে বিশ্বাস করতেন না, অনন্য শ্রদ্ধা ছিল তাঁর! কিন্তু তাঁর উদ্‌গারে কত বিনম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। কত বেশী বিনম্র তিনি।

আজকালকার মহাত্মারা গৃহত্যাগের চার-ছ'বছরের ভিতরেই নিজেদের সাধু মহাত্মা ভেবে গর্ব করতে শুরু করেন। বেশে তো আগেই চলে আসেন। তাঁদের সম্মানের বিরুদ্ধে কিছু ঘটলেই রেগে যান। কিন্তু যাঁরা সত্যিই সাধু, তাঁদের এই প্রকার দশা হয় না। বিরহী হন তাঁরা। তাঁদের সাধু, রাজপূত, অবধূত অথবা তাঁতীই যদি কেউ বলে, তাঁদের চিত্তে কোন প্রভাব পড়ে না। তাঁদের চিত্ত ইষ্ট-সম্বন্ধীয় তথ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণই করে না। বাস্তবে অনুরাগীর জন্যই এই পথের বিধান রয়েছে। সাধকের আচরণ ভরতের মত হওয়া উচিত। রাম

বনবাসে গিয়েছিলেন তখন ভরত ব্যাকুল হয়ে তাঁর পিছনে চিত্রকূট গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাম ফেরেননি কিন্তু তাঁর চরণ পাদুকা প্রাপ্ত করেছিলেন। চরণ পাদুকা মস্তকে ধারণ করে ভরত অবধে ফিরে এসেছিলেন। রাজ্য শাসন দূরে থাক। নন্দীগ্রামে একটি কন্দর নির্মাণ করিয়ে তার ভিতরে গিয়ে বসেছিলেন। সেই খড়ম-জোড়ার ধ্যানে রাত-দিন পার হচ্ছিল।

হনুমান মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে সেই পথ দিয়েই ফিরছিলেন তখনও ভরতকে তিনি ব্যাকুল দেখেছিলেন। হনুমান গোটা পথ প্রভুচরণের প্রতি তাঁর অপার অনুরাগের প্রশংসা করে করেই এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, চোদ্দ বছর পরে প্রভু আগমনের সূচনা দিতে যখন হনুমান গিয়েছিলেন তখনও ভরতকে সেই দশাতেই দেখেছিলেন। রাম বলেছিলেন-“যাও, অযোধ্যাতে গিয়ে ভরতকে সূচনা দেবে যে, আমি আসছি, অন্যথা সে দেহত্যাগ না করে বসে।” পূজ্য মহারাজজীকে যখন লোকে জিজ্ঞাসা করত যে, মহারাজজী! ভগবান কি দেখা দেন? তখন তিনি বলতেন-“হ্যাঁ কেন দেখা দেবেন না? যদি অনুরাগীকে ভগবান দেখা না দেন তবে সে মরে যাবে না। সে প্রাণ দিয়ে দেবে। আমাকে দেখা দিয়েই তো স্থিতি প্রদান করেছেন।” সাধকের বিরহ এতটাই তীব্র হওয়া উচিত। হনুমান ভরতের দশা দেখেছিলেন-

বৈঠে দেখি কুসাসন, জটা মুকুট কৃস গাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত, স্রবত নয়ন জলজাত।। ***(মানস, ৭/১/খ)***

চৌদ্দ বছর পূর্বে ভরতের যে দশা ছিল, তার চেয়েও প্রেমার্দ্র দশাতে হনুমান তাঁকে দেখেছিলেন। কুশাসনে বসেছিলেন। জটার মুকুট, কৃশকায়। ‘রাম-রাম রঘুপতি’ এই জপই করছিলেন। হৃদয়ে স্বরূপ, চোখে অশ্রুধারা।

তাঁর এই অবস্থা দেখে হনুমান খুব হর্ষিত, রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল; মনে খুব সুখ পেয়েছিলেন। অনুরাগী ভক্ত নিজের থেকেও উত্তম অনুরাগীকে দেখে প্রসন্ন হয়, ঈর্ষাবোধ করে না। হনুমান অমৃতের সমান বচন বলেছিলেন, “যাঁর বিরহে বিরহী তুমি, দিবারাত্রি যাঁর কথা চিন্তা কর, নিরন্তর যাঁর গুনগান কর সেই রামই আসছেন।” এতটা শুনেই ভরতের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়েছিল, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেন অমৃত লাভ করেছিল। ভরত বলেছিলেন “এই সংবাদ-এর সমান সংসারে কিছুই নেই।” ইষ্টকে উপলব্ধি করাটাই সাধকের কাছে সর্বস্ব। সে কখনও ভোলে না যে, এইজন্য তো সে সাধক

হয়েছে। অতএব পূর্তি পর্যন্ত সাধকের বিরহ-বৈরাগ্য ব্যাকুলতাতে ন্যূনতা অথবা শিথিলতা আসা উচিত নয়। ভরত এবং সুতীক্ষ্ণ এর মত নিজের চরিত্র নির্মাণ করা উচিত। তাঁদের চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের আচরণ তাঁদের মতই করা উচিত। ইষ্ট হতে লেশমাত্র তফাতে থাকলেও নিজেকে সাধকই ভাবা উচিত। অনুনয়-বিনয় এবং ব্যাকুলতাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া উচিৎ। ইষ্ট হতে একচুল তফাতে থাকলেও সাধক যদি সেই দূরত্ব সম্পূর্ণ করার প্রযত্নতে ঢিলেমি করে, তবে মায়া সফল হতে পারে।। এই সামান্য তফাতের জন্য জড়ভরতকে তিনটে জন্ম নিতে হয়েছিল। লেশমাত্র হলেও দূরত্ব তো দূরত্বই। গঙ্গাজল পানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে কোন ব্যক্তি যদি হতাশ হয়ে গঙ্গার কাছে গিয়ে দু'হাত দূরে বসে পড়ে, তবু গঙ্গাজল কাছে থাকলেও তার কোন কাজে তো লাগছে না। দু'হাত দূরে থাকলেও তো সে তেষ্টায় ছটফট করছে। সেই দূরত্বই তার জন্য যোজনের সমান। সামান্য অবরোধও পাহাড়েরই মত পরন্তু এইরূপ চিন্তা করে সাধকদের হতাশ হওয়া উচিত নয় যে, ভগবৎ পথ বিঘ্নময়। কেন এত কষ্ট করব? বস্তুতঃ ভক্তি পথে মুস্কিল কিছু নেই; পার তো নিশ্চিত হবেই। হ্যাঁ উত্তম সাধককে বিরহ-বৈরাগ্যে ঢিলেমি করা উচিত নয়।

'সাচ্চা লিঙ্গ ফকীর কা ঘুমে বাজার বাজার।'-সত্যিকারের সাধুর জন্য সকল স্থানই মঙ্গলময়। কপট সাধু হওয়া উচিত নয়। ভগবানই যদি বানিয়ে দেন তবে সে কথা আলাদা। নিরন্তর চিন্তনে যেন ছেদ না পড়ে এবং অহঙ্কার যেন না হয়, তাহলে সব ঠিক হয়ে যায়। একজন বিচরণশীল মহাত্মা নিজের শিষ্যকে এই প্রকার উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন-"বৎস! নিজে থেকে কিছু হতে যেয়ো না।" শিষ্যটি উপদেশ শিরোধার্য করেছিল। কিছু দূর চলার পর পথের ধারে সুরম্য উদ্যান দেখে শিষ্যটি গুরুদেবকে সেই উদ্যানের ভিতরে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করেছিল। গুরুদেব সেই উদ্যানে গিয়েছিলেন। উপবনে জনশূন্য ভবনে একটা তক্তাপোষ পাতা ছিল, গুরুদেব গিয়ে সেই তক্তাপোষে বসেছিলেন। শিষ্যও পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছিল।

এক রাজার ছিল সেই উদ্যানটি। মাঝে-মাঝে তিনি সেখানে বিশ্রাম করার জন্য যেতেন। দৈববশতঃ রাজাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সিপাহীরা গিয়ে শিষ্যকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল-"কে তুমি? জানো না যে এটা মহারাজাধিরাজের বিশ্রাম কক্ষ?" শিষ্যটি উত্তরে বলেছিল "আমি সাধু"

একজন সিপাহী তাকে কষে এক চড় মেরে বাইরে ধাক্কা দিয়েছিল। ততক্ষণে রাজাও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সিপাহীরা ছুটে গিয়ে তাঁর কক্ষের দরজা খুলেছিল, ভেতরে একজন সাধুকে দেখে তারা রেগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল-"কে তুমি?" মহারাজের তক্তাপোশের উপর ঘুমানোর দুঃসাহস করলে কি করে?" মহাত্মা চুপচাপ উঠে বসেছিলেন। অঙ্গরক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করেছিল "কে তুমি? এখানে কি করে এলে?" ততক্ষণে স্বয়ং রাজা বলেছিলেন মনে হচ্ছে ইনি কোন মহাত্মা তবেই তো এত শান্ত। এঁকে সাদরে অন্য কামরায় নিয়ে যাও। কিন্তু বিচরণ প্রিয় মহাত্মা সেস্থান ত্যাগ করেছিলেন। পথে দেখা হতেই শিষ্য তাঁকে বলেছিল, "মহারাজ! আমাকে তো খুব মারধোর করেছে।" মহাত্মা বলেছিলেন-'কিছু হতে গিয়েছিল নিশ্চয়।' শিষ্যটি বলেছিল-"মহারাজ! তারা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কে তুমি? আমি উত্তরে বলেছিলাম আমি সাধু।" মহাত্মা তাকে বলেছিলেন "সাধু কেন হতে গেলে" সেইজন্য তো মার খেতে হল। সাধু হওয়া যায় না পরন্তু সাধনার সঠিক পথে চলে ক্রমশঃ উন্নতি করতে করতে যখন যোগ-এ অবিচল থাকার স্থিতি লাভ হয়, তখন মনের নিরোধকালে লক্ষ্য বস্তু স্বতই প্রাপ্ত হবে, সাধককে উন্নত করে সাধু বানিয়ে দেবে। যিনি নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তন করেন, তিনিই সাধু। কপট সাধু হওয়া উচিত নয়। সাধনাকালে ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে কিন্তু সাধককে দৃঢ়ভাবে চিন্তনে নিযুক্ত থাকা উচিৎ। উৎসাহী ব্যক্তিই এই পথে চলতে সক্ষম হয়। প্রতিজ্ঞাতে অটল থেকে সাধনারত থাকলে বিপত্তিও সম্পত্তি হয়ে যায়। যেমন অর্জুন অথবা মহর্ষি কাকভুশুণ্ডির জীবনেই দেখা গেছে। অর্জুন উর্বশীকে মাতৃবৎই দেখেছিলেন যদিও তাকে একবছরের জন্য নপুংসক হতে হয়েছিল সেই শাপও অজ্ঞাতবাসের অবধিতে সহায়ক সিদ্ধ হয়েছিল, অর্জুনের জন্য সেটা বরদান স্বরূপ হয়েছিল। কাকভুশুণ্ডি যে দৃঢ়তার জন্য শাপিত হয়েছিলেন তারপর আশীর্বাদের ধুম পড়ে গিয়েছিল। অতএব সাধককে নিজের ধর্মে প্রাণপণে স্থির থাকা উচিৎ। এক্ষেত্রে দত্তাত্রেয়-এর কাছ থেকে সাধককে প্রেরণা নেওয়া উচিত। খুব দুষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও একটা দুটো গুণ অবশ্যই থাকে। সাধকের দৃষ্টি শুধু গুণের উপরই থাকা উচিত।

মহাত্মা দত্তাত্রেয় বিচরণ করতে-করতে একটা কুকুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। একজন লাঠি তোলার সঙ্গেসঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, আবার সেই আদর করে ডেকেছিল অমনি তার কাছে চলে গিয়েছিল; কুকুরের স্বভাব হল

খেতে দিলে খেল না দিলে চুপ করে বসে থাকল। দত্তাত্রেয় বিচার করেছিলেন যে, এ তো দেখছি গুরুরও গুরু। সদ্‌গুরু যে-যে শিক্ষা দেন তার একটা এর মধ্যে পাওয়া গেল যে, অবধূতকে সদৈব মান-সম্মান রহিত এবং সন্তোষী থাকা উচিত। যদিও কুকুরের মধ্যে দুর্গুণ ঠাসা কিন্তু দত্তাত্রেয়-এর সেসবে কি প্রয়োজন? অনন্ত দুর্গুণের মধ্যেও একটা গুণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি সেই গুণের উপরই নিজের বিচার কেন্দ্রিত করে রেখেছিলেন।

দত্তাত্রেয় এইরূপ চিন্তা করতে-করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পথে একটা অজগরকে দেখেছিলেন। এত বেশী স্থূল ছিল যে, নড়তেও অক্ষম ছিল। গোটা দিনে এক ফুটও এদিক-ওদিক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাত্মার কৌতূহল হয়েছিল যে, তাহলে বেঁচে আছে কি করে? কি আহার করে? অতএব কিছুদূরেই আসন পেতে বসেছিলেন। দেখেছিলেন, প্রতিদিন কোন না কোন খগ-মৃগ ঠিক তার মুখের কাছে হাজির হয়েই যেত, তাদের সে উদরস্থ করত। অজগরের হিংসক স্বভাব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি, দত্তাত্রেয় তার মধ্যেও একটা গুণ দেখতে পেয়েছিলেন যে, অবধূতকে উদরপূর্তির জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করা উচিত নয়। অজগরের প্রশংসা করে দত্তাত্রেয় আবার চলতে শুরু করেছিলেন। যে, তোমার মধ্যেও সদ্‌গুরুর একটা গুণ রয়েছে। সেই অজগর দত্তাত্রেয়-এর গুরু ছিল না; গুরুর বিদ্যা তো আলাদা বিষয়; তা সত্ত্বেও সদ্‌গুরুর স্থিতির একটা গুণ অজগরের মধ্যেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সমস্ত ভূত-প্রাণীর গুণের মধ্যে তিনি নিজের গুরু অথবা ইষ্টকেই দেখার প্রয়াস করেছিলেন।

সমিটি সমিটি জল ভরহিঁ তলাওয়া।
জিমি সদ্‌গুন সজ্জন পহিঁ আওয়া।। ***(মানস, ৪/১৩/৭)***

এক-এক ফোঁটা জলে পুকুর পূর্ণ হয়। ঠিক সেই প্রকার অধিকারী সাধক একটা-একটা করে গুণের সঞ্চয় করেন। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করলে সাধকও সেই দুর্গুণগুলি দ্বারা আক্রান্ত হন। অতএব সাধককে সর্বদা সজাগ থাকা উচিত। কোন মহাত্মা অথবা সাংসারিক জীবেরও নিন্দা করা উচিত নয়। পরনিন্দা সাধকের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। **'পর নিন্দা সম অঘ ন গরীসা।'**

সাধককে সচ্চরিত্র হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি দুরাচারী নির্জন স্থান যার অপছন্দ, জাগতিক বস্তুগুলি ত্যাগ করার চিন্তা করাও যার পক্ষে অসম্ভব, সে অক্ষয়পদ লাভ করতে সমর্থ হবে না। যেসব বস্তুর আধিক্যে মূঢ়গণের অনুরাগ

উৎপন্ন হয় সেগুলি লাভ করলে প্রাজ্ঞ পুরুষের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বিষয় ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা দুর্লভ এবং সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত সহজাবস্থার প্রাপ্তি দুর্লভ। অতএব বন্ধুগণ! তত্ত্বস্থিত সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করুন। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হওয়ার বিধান রয়েছে। যখন সেই মহাপুরুষের কৃপার ফলস্বরূপ অন্তঃপ্রেরণারূপ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়, সাধকের অন্তরে জাগ্রত হয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করেন, তখন বুঝতে হবে সাধনা শুরু হয়েছে। সেই অন্তর্প্রবেশ নিবৃত্তির নিশ্চিত স্রোত। সেটা জানার জন্য গুরুর কাছে যেতেই হবে '**তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।**' ***(মুণ্ডক০, ১/২/১২)*** -এটাই উপনিষদের নির্দেশ। সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যম হল আপনার পুণ্য। সন্ত এবং সদ্‌গুরুকে যে দৃষ্টির সাহায্যে চেনা যায়, সেই দৃষ্টিই পুণ্যময়ী।

।। ওঁ।।

গীতা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার কালে পরমার্থের পথিকদের মাঝে

শ্রী পরমহংসজী

মহাভারতের প্রাণ হল গীতা এবং এর ক্ষেত্র

মহাভারতের যুদ্ধ অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং জনসমূহের জন্য আদর্শ কিন্তু তার রূপই ভিন্ন। এই সংসারে মানুষ সময়ে-সময়ে বিশাল সমূহে বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংঘর্ষ করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ দেবাসুর-মায়িক সংগ্রাম ইত্যাদি। এই সংসারে মানুষ মায়িক স্তরে যখন-যখন কিছু আবিষ্কার করেছে, তখন-তখন শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে পরস্পর যুদ্ধ করে নিজেদের সর্বনাশ করেছে। সেই সর্বনাশের পর অল্প সংখ্যায় যারা বেঁচে থাকে, তাদের শান্তি প্রিয় বলুন, অথবা তাদের বিবশতা অস্ত্রশস্ত্রের প্রাপ্তিকালে মনে সন্তুষ্টি অবশ্য হয়; কিন্তু যখনই সেসবের প্রয়োগ করা হয় তখন মানুষের কল্যাণ নয় সর্বনাশই হয়।

এই প্রকার কিছু বিশেষ-বিশেষ আবিষ্কার-এর প্রয়োগ করে মহাভারতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমক্ষে সেই মহাভারতের চিত্রণ গ্রন্থরূপে রয়েছে, যা মহর্ষি ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন। মহাপুরুষদের রচনা সুব্যবস্থিত ভাবে খাওয়া পরা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয় না পরন্তু এই জীবাত্মার পূর্ণ কল্যাণ করে। যা লাভ করে মানুষ কখনও ঈশ্বর-এর কাছ থেকে দূরে সরে যায় না, একেই পূর্ণকল্যাণ বলে। ভরত, মহাবীর, ঋষভ এবং বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণ উত্তম সম্রাট ছিলেন, জীবন ধারণের সামগ্রী তাঁদের কাছে প্রচুর ছিল। এরূপ বহু ব্যক্তি পরবর্তীকালে মহাপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁরা পূর্বজীবনে সমৃদ্ধ ছিলেন কিন্তু এক অলক্ষিত অলৌকিক বস্তুর অভাবে তাঁরা সাম্রাজ্য ত্যাগ করে ফকির হয়েছিলেন। পরমার্থ-চিন্তা দু'একজনই করেন, বিষয়কর্মে লক্ষ-লক্ষ মানুষ ব্যস্ত। পরমার্থী পুরুষদের সংখ্যা লাখ-এ-একটা, তাঁরা যে কোন স্তর-এর মানুষকে উপদেশ দ্বারা তার সাংসারিক প্রবৃত্তিগুলি নিবৃত্ত করে ক্রমশঃ পরমার্থ-চিন্তনের প্রশস্ত পথে চালিত করেন। কারণ তাঁরা চলে দেখেছেন যে, অন্যত্র কল্যাণ সম্ভব নয়।

এখন আপনি এই স্তরের মহাপুরুষ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী ভগবদ্‌গীতা একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। কর্মের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, হে অর্জুন! কাম-ক্রোধ লোভ এই তিনটি নরকের প্রমুখ দ্বার। আসুরী সম্পদ এই তিনটির উপরই আধারিত। এই তিনটি ত্যাগ করে দিলেই সেই ক্রিয়া প্রারম্ভ হয়। এর পরিণাম মোক্ষ, পরমাত্ম প্রাপ্তি এই স্থিতিতে মানুষের সুখ-দুঃখ সমাপ্ত হয় অর্থাৎ এমন সুখের প্রাপ্তি হয়, যার পিছনে দুঃখ নেই। সকলেই অধ্যয়ন করে এবং এই শব্দগুলির উপর বিচারও করে, কিন্তু এই বিকারগুলি ত্যাগ করতে চায় না। বহু ব্যক্তি এমনও রয়েছে, যারা বিকারসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযত্ন করে এবং ব্যাকুলও কিন্তু বিকার থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেইজন্য মহাপুরুষগণ এগুলিকে দুর্জয় শত্রুর সংজ্ঞা দিয়েছেন। হে অর্জুন! রজোগুণজাত কাম এবং ক্রোধ এই পথের প্রধান শত্রু। অসঙ্গতারূপ শস্ত্র, জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা এগুলি ছেদন কর! কাম-এ পূর্ণ শত্রু ভোগ দ্বারা কখনও সন্তুষ্ট হয় না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান এই দুটি-এর নাশক, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং দুর্জয়। এই দুটি শত্রু জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিরকালের শত্রু, সেইজন্য যুদ্ধার্থ 'উত্তিষ্ঠ'- উঠে দাঁড়াও! এখন আপনিই বলুন শত্রু যখন ভিতরে রয়েছে তবে বাইরে কলহ করে কি লাভ? এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে পরে চর্চা করা হবে। মহাপুরুষদের বাণী অনুসারে এই ক্রিয়া তখনই ফল প্রদান করে যখন বিকারগুলি শান্ত হয়। আসক্তি থাকলে কল্যাণ কি করে হবে? তা নির্ণয় করার জন্য মহাপুরুষগণ শাস্ত্রগুলি এইরূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রচনা করেছেন যাতে সংসারী মানুষ কল্যাণের পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেমন ক্রোধের পরিপূরক যুদ্ধ, লোভের পূরক হল উপার্জন এবং মোহ-এর পূরক হল সম্বন্ধ ইত্যাদি মনকে আবদ্ধ করার যত সাধন রয়েছে, সবই উপযুক্ত আপনি ভোগ উপভোগ করুন কিন্তু দৃষ্টি ইষ্টে স্থির থাকবে। সংযমপূর্বক ভোগ করুন। মানুষের জন্য সংযম হল বিশেষ প্রশিক্ষণ তাহলে সাংসারিক প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে এবং ইষ্টোপলব্ধির সঠিক পরিধি প্রাপ্ত হয়, যেখান থেকে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এসবই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার বাস্তবিক স্বরূপ এটুকুই যে, সকাল-সন্ধ্যা পাঁচ-দশ মিনিট অবশ্য নিজের ইষ্টের সমক্ষে হাজির হওয়া উচিত। ইষ্টের রূপ স্মরণ করে বিনীতভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিন এবং আগাম কাজের জন্য নিবেদন করুন যে, ভগবন্! দিবসের ন্যায় আমিও নিরন্তর সাংসারিক সমস্যাতে বয়ে চলেছি, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক। এই প্রকার নিদ্রা যাবার আগেও কল্যাণ বিষয়ক তাঁর দর্শনের কামনা করা উচিত এবং তার সঙ্গে যে কোন একটা নাম নিন যেমন রাম, ওম, শিব ইত্যাদি যেটা আপনার পছন্দ ক্রমশঃ এই নামই ওঠা-বসা, হাঁটা-চলা

করার সময় নিরন্তর জপ করার প্রয়াস করুন। এই নাম-জপ যে কোন স্থানে করা যেতে পারে। মনে রাখবেন এই প্রকার আমাদের মনের অন্তরালে এতটা যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে, সব সময় নাম যজন এবং সমর্পণের-ভাব যাতে থাকে। ব্যস তারপর ভগবান কোন না কোনরূপে পথ নির্দেশ দিতে থাকেন। যখন থেকে একটুও আভাস পাওয়া যায় তখন থেকে সময়ের ক্রম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে-পেতে নির্দোষ সাধনের অবস্থা লাভ হয়। এইরূপ স্থিতিতে বাহ্য ক্রিয়াগুলির রূপ লোপ পায়। লোভ, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি দ্বারা প্রেরিত উপার্জন, সম্বন্ধ এবং যুদ্ধের আবশ্যকতাগুলি সম্পূর্ণরূপে মিটে যায় এবং আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করানোর এবং পুরুষ ও প্রকৃতির সংঘর্ষের বিচ্ছেদ করানোর বাস্তবিক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই ঈশ্বরই সত্যিকারের আত্মীয়। তিনি পরম হিতৈষী যা নিজেরই অপরিবর্তনশীল স্বরূপ। তাঁরই কৃপাতে সাংসারিক প্রবৃত্তিগুলি এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্নকারক যুদ্ধের প্রবেশ দ্বার লাভ হয়। গীতা এই স্তরের যুদ্ধের প্রবেশিকা, গীতাতে একটা শ্লোকও এমন নেই যা মার-কাট অথবা ভৌতিক যুদ্ধের সমর্থন করে। গীতাতে মহাভারতের বিরোধ নেই কিন্তু মানব-উত্থানের এই পবিত্র শাস্ত্রের অন্তরঙ্গ ও সূক্ষ্ম অংশ। গমনাগমনের বন্ধন ছিন্নকারী যুদ্ধ তখনই শুরু হবে যখন আপনি চিন্তন-কার্য কি বুঝে আচরণ করবেন। চিন্তনকালে এই যুদ্ধ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জগতে মানুষ দু-প্রকারের-প্রথম দেবতাদের মত, দ্বিতীয় অসুরদের মত। অন্তঃকরণে দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান, এক হল দৈবী সম্পদ্ এবং দুই আসুরী সম্পদ্। যখন অন্তঃকরণে আসুরী সম্পত্তিকে দমন করে দৈবী সম্পত্তি কাজ করে তখন মানুষ দেবতাদের মত হয়ে যায়। এবং যখন দৈবী সম্পত্তিকে দমন করে আসুরী সম্পত্তি কাজ করে তখন মানুষ নিশাচরদের মত হয়ে যায়। আসুরী সম্পত্তি অধম যোনির দিকে প্রেরিত করে এবং দৈবী সম্পত্তি পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দিকে "তুমি দৈবী সম্পত্তি লাভ করেছ; কল্যাণ হবে তোমার, অতএব শোক কোরো না।"

তদনন্তর দুটি সম্পত্তিরই লক্ষণ, গণনা করে বলেছেন যে, জ্ঞান এবং যোগের প্রক্রিয়া দান, দয়া, ধর্ম, অভয় এবং অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হলেও আসক্তির অভাব, মনের নিরোধ, চিত্তের স্থিরতা ইত্যাদি দৈবী সম্পত্তি, যা যৌগিক প্রক্রিয়াতে প্রবেশিকা থেকে শুরু করে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত যে সব ভূমি আসে তাই। যার প্রধান চব্বিশটি লক্ষণ বলা হয়েছে, এবং যার বিস্তার সম্পূর্ণ

দৈবী প্রবৃত্তি। তাদের বাসস্থান হল মন। ঠিক এই প্রকার আসুরী সম্পত্তি মনেরই একটি প্রবৃত্তি, যা নীচ যোনির দিকে প্রবাহিত করে এবং মানুষকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ লক্ষ্য থেকে বিমুখ করে রাখে। এতে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, দম্ভ, ভণ্ডামি, শত্রুতা, অনন্ত আশা এবং ব্যর্থ তৃষ্ণার সঞ্চার ইত্যাদি অধোমুখী প্রবাহই আসুরী সম্পত্তি। এগুলিরও বাসস্থান মনই। যখন আমরা তত্ত্বের খোঁজে দৈবী সম্পত্তির সংগ্রহ ও পালন শুরু করি, তখন আসুরী সম্পত্তি বাধারূপে প্রকট হয়। শৃঙ্গী ইত্যাদি যাঁরা উন্নত স্থিতির ছিলেন, এইরূপ বহু মহাত্মাদের আসুরী সম্পত্তি সবলে নিরস্ত করেছিল। গীতার প্রতিপাদিত বাস্তবিক যুদ্ধ এখান থেকে শুরু হয়। মহাপুরুষগণ একেই বিভিন্ন নামে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু গীতা এই দুটি পক্ষকেই ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের নাম থেকে প্রারম্ভ করে সজাতীয়-বিজাতীয়, বিদ্যা-অবিদ্যা, দেব-অসুর ইত্যাদি কয়েকটা নামে পুষ্ট করে লক্ষ্য পরমাত্মার পরম আবশ্যকতা নির্দেশ করে। তাঁকে প্রাপ্ত করার পর গীতার অনুসারে পুনর্জন্ম হয় না।

।।ওঁ ।।

দেবতা

প্রশ্ন-মহারাজজী! যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কোথাও বাহ্য দেবতাদের কটাক্ষ করেছেন আবার কোথাও দেবতাদের উন্নত করতে বলেছেন, এইরূপ কেন?

উত্তর-গীতাতে দেবতাদের দুটো রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তো অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি (দৈবী সম্প্)। এই দৈবী সম্পত্তি পরমদেব পরমাত্মার স্বরূপের দিকে প্রেরিত করে। এই প্রবৃত্তিই পরমদেব-এর দেবত্ব অর্জিত করায়। এটাই পরমতত্ত্বে প্রবেশ প্রদান করে, দেবতাতে পরিণত করে; সেইজন্য একে ইষ্ট প্রসারিনী 'দৈবী সম্পত্তি' বলা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই সম্পত্তিকেই উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, একাগ্রতা, ধারাবাহিক চিন্তনের প্রবৃত্তি, বাস্তবিক জ্ঞান এবং উপলব্ধি ইত্যাদি দৈবী সম্পত্তির চব্বিশটি লক্ষণের সবিস্তার নিরুপণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতার যোড়শ অধ্যায়ে করেছেন। এই দেবতাদের দ্বারা পরমদেব পরমাত্মা শনৈঃ-শনৈঃ সুলভ হন। ক্রমশঃ উত্থান করতে-করতে যখন দৈবী সম্পত্তি পরিপক্ক হয় তখন অব্যক্ত পরমাত্মাও বিদিত হন।

আরেক হল সংসারে যাঁদের পূজা করার প্রচলন আছে। বহু আগের গণনা অনুসারে তাঁদের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি এবং এখন তো না জানি আরও কত হয়ে গেছেন। ভূত, ভবানী, ধাত্রী, সাবিত্রী, ভৈরব, ব্রহ্মবাবা, গ্রামদেবী, চৌরস ইত্যাদি অসংখ্য দেবতা নিত্য সৃষ্ট হচ্ছে এবং কিছু কালে প্রসুপ্ত হয়ে যায়। এদের দিকেই ইঙ্গিত করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, বহু ব্যক্তি আমাকে ছেড়ে কামনা দ্বারা অভিভূত হয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করে, সেই পূজা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয় (গীতা, ৭।২০, ৯।২৩)। তাদের চিন্তনের বিধি ভুল, সেইজন্য তারা ফললাভ তো করে কিন্তু আমাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। সেই ফল নাশবান্, সেইজন্য তাতে কল্যাণ হতে পারে না (গীতা, ৭।২৩)। দেবতাদের পূজারীগণ দেবতাদের লাভ করেন, ভূতগণের পূজারীগণ ভূতগণকে লাভ করেন এবং আমার ভক্ত আমাকেই লাভ করে। (গীতা, ৯।২৫)। ব্রহ্মলোক থেকে নিয়ে সমস্ত লোক প্রত্যাবর্তন স্বভাবযুক্ত। পরন্তু কৌন্তেয়! যে ভক্ত আমাকে লাভ করেছে তার পুনর্জন্ম হয় না (গীতা, ৮।১৬)।

বস্তুতঃ পরমদেব পরমাত্মা হতে পৃথক দেবতাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং পৃথক-পৃথক তাদের কোন সত্ত্বাও নেই। কেনোপনিষদে একটি কাহিনীর উল্লেখ

আছে যে, সেই পরমেশ্বরের শক্তি বিনা অগ্নি খড়কুটো পর্যন্ত দগ্ধ করতে পারবে না, বায়ু সেই তৃণকে উড়াতে পারবে না। এই রহস্যের উপরই আলোকপাত করে সামবেদীয় জাবাল দর্শনোপনিষদের চতুর্থ খণ্ডে ভগবান দত্তাত্রেয় সাংকৃতি মুনিকে বলেছেন-''মহামুনে! বাহ্য তীর্থ থেকে আন্তরিক তীর্থই শ্রেষ্ঠ। দেহাভ্যন্তর স্থিত দূষিত চিত্ত বাহ্যতীর্থগুলিতে অবগাহন মাত্র করলে শুদ্ধ হয় না, যেমন-মদিরাপূর্ণ ঘড়া উপরে-উপরে হাজার বার ধুলেও যেমনের তেমনি থাকবে। আত্মতীর্থই মহাতীর্থ। আত্মতীর্থ প্রাপ্ত পুরুষের কাছে অন্য তীর্থ নিরর্থক। মস্তকই শ্রী শৈল। ললাট কেদার তীর্থ, নাসিকা এবং ভ্রূমধ্যে কাশীপুরী দুই বক্ষোরুহ স্থানে কুরুক্ষেত্র এবং হৃদয়ে তীর্থরাজ প্রয়াগ বিদ্যমান। মূলাধারে কমলালয় তীর্থ বিদ্যমান। যে দেহের ভিতরে স্থিত এই তীর্থগুলি পরিত্যাগ করে বাইরের তীর্থগুলিতে তীর্থ করে বেড়ায়, সে বহুমূল্য মণি ত্যাগ করে কাঁচ খুঁজে বেড়ায়। ভাবময় তীর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ সেইজন্য যোগী জলেপূর্ণ তীর্থ এবং কাঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত দেব প্রতিমার শরণে যান না। যোগী নিজের আত্মাতেই শিবের দর্শন করেন প্রতিমাতে নয়। অজ্ঞানী মানুষের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করার জন্যই প্রতিমাগুলির কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ! অজ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের চরণোদক সর্বোত্তম তীর্থ।"

এই পরমপথের প্রবেশিকাতে সামান্য এবং সরল মানুষের সমক্ষে সর্বপ্রথম দেবী-দেবতা, মন্দির-মূর্তিগুলি, তীর্থ ব্রতেরই আবশ্যকতা হয় যার দ্বারা সংস্কার তৈরী হয়, পুণ্য বৃদ্ধি হয় কিন্তু মানুষ সেই দেবতাদের পরমদেব পরমাত্মা হতে পৃথক এবং প্রত্যেক দেবতাকে অন্যের থেকে ভিন্ন উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট মনে করে; ঋগ্বেদ-এর ঋচা বিস্মৃত হয় '**একং সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।**'-একমাত্র পরমেশ্বর সত্য, বিপ্রগণ তাঁকে অসংখ্য নামে সম্বোধিত করেন কারণ একটামাত্র নামে সেই বিরাট প্রভুর প্রভুতার বোধ হয় না। সামান্য মানুষ দেবতাদের অনেকত্বে নিহিত একত্বকে পরখ করার প্রয়াস করে না, দেবতার পৃথক সত্তাকেই গন্তব্য বলে মনে করে; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-তারা আমাকে লাভ করে না সাধনারম্ভে আমিও এক দেবতাকেই পূজা করতাম কিন্তু তত্ত্বস্বরূপ মহাপুরুষ (পরমহংসজী)-এর অনুভবে প্রবেশের সঙ্গেই তা শান্ত হয়ে গেছে।

বস্তুতঃ দেবগণও মরণধর্মা। পুণ্য-পুরুষার্থ দ্বারা স্বর্গলোকের অধিকারী তথাকথিত 'অমর' বিশাল স্বর্গের ভোগগুলি উপভোগ করার পর '**ক্ষীণে পুণ্যে**

মর্ত্যলোকং বিশন্তি।' *(গীতা, ৯/২১)*-পুণ্য ক্ষীণ হলে সেই মৃত্যুলোকে পতিত হন। সেই স্থানেই হাজির হন, যেখান থেকে সাধনা শুরু করেছিলেন। এর থেকে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? সেই দেব দেহ-এ কি লাভ, যাতে সঞ্চিত পুণ্যই সমাপ্ত হয়ে যায়?

দেবতাগণও মানবদেহ লাভের আশায় আছেন কারণ মুক্ত হওয়ার জন্য তাদেরও মানব দেহ লাভ করার প্রয়োজন হয়। দেব, পশু ইত্যাদিগুলি ভোগ-যোনি। শুধু মানুষই কর্মের রচয়িতা; যার মাধ্যমে সে পরমধাম লাভ করতে সমর্থ, যেখান থেকে পুনরাবর্তন হয় না।

মরণধর্মা দেবতা আমাদের লক্ষ্য কখনও হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য তো পরমদেব পরমাত্মাই হতে পারেন, তাঁকে লাভ করার পর মানুষ সেই স্বরূপ থেকে কখনও পৃথক হয় না। এটাই সেই পরাকাষ্ঠা যেখানে পৌঁছে মানুষ দেবতাদেরও দেবতা হয়ে যায়। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে দেবত্ব জাগিয়ে তোলে, সদ্গুরুতে পরিণত হয়।

অতএব আপনারা সকলেই পরমদেব পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে দৈবী সম্পদ্ অর্জন করুন। দৈবী প্রবৃত্তিকে উন্নত করুন।

।।ওঁ।।

শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন

প্রশ্ন- মহারাজজী! কিছু ব্যক্তির মতানুসারে রাস-এর রচয়িতা অথবা স্রষ্টা শ্রী কৃষ্ণ এবং গীতার উপদেশক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন-ভিন্ন পুরুষ। দুজনেই এক ব্যক্তি হতে পারে না। কিছু ব্যক্তির অনুসারে তিনি মানুষ ছিলেন না পরন্তু ষোলো কলা পূর্ণ অবতার, সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

উত্তর- শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদব ব্যক্তি তাঁকে নিজের আত্মীয় বলে মনে করে। নৃত্য-সঙ্গীত বিশারদ ব্যক্তি তাঁকে নিজের প্রণেতা বলে। ইংরেজরা তাঁকে কুশল রাজনীতিজ্ঞ বলে থাকে। ভারতের অধিকাংশ জনতা তাঁকে ভগবৎজ্ঞানে পূজা করে অতএব আপনার জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে, শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন। যোগই সেই ক্রিয়া, যা করে গেলে সাধক, পরমাত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হবে। **'ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মৈব ভবতি', 'জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ।' (মানস, ২।১২৬।৩)** -ভগবানকে জেনে যোগীও ভগবান হয়ে যায়। তার সেবক এবং জীব-ভাব তিরোহিত হয়ে যায় এবং শুধু প্রভুর অস্তিত্বই বাকী থাকে। 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসী', 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি পদ্যময় বেদমন্ত্রগুলিতে এই রহস্যেরই অভিব্যক্তি হয়েছে।

১- গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণও এই তথ্যেরই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বহু জন্মের পর অন্তিম জন্মে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত জ্ঞানী আমার সাক্ষাৎ স্বরূপ-

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাৎমৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।। *(৭/১৮)*

জ্ঞানী তো সাক্ষাৎ আমারই স্বরূপ, ভগবৎময়। কারণ সে আমাতেই উত্তমরূপে স্থিত। এইরূপ জ্ঞানী ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের স্থিতিতে কোন পার্থক্য (শ্রীকৃষ্ণের মত অনুসারে) নেই, বলার অপেক্ষা রাখে না, শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগীই ছিলেন, মহাত্মাই ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাই ভগবান হন। ভক্তি দ্বারাই যে কোন মানুষ ভগবান হতে পারে।

২- মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে যত্র-তত্র সর্বত্র নিজের পরিচয় দিয়েছেন। (টীকা) টিপ্পনীর সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের

মূলবাণীতে মনোযোগ দিন তাহলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নিয়ে যা ভ্রান্তি প্রচলিত রয়েছে, তা থাকবে না। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্থিতি প্রাপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ বলেছেন এবং তারপর নিজেকে এই স্তরের মহাত্মাদের সমকক্ষ ঘোষিত করেছেন। তিনি বলেছেন, যে পুরুষ আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম করে না (একথা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে শুধু আরাধনাই কর্ম-**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ** ***(গীতা, ৩।৯)*** সেই পাপী ব্যক্তি ব্যর্থই জীবন ধারণ করে কিন্তু যে আত্মরত, তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট, তার জন্য কর্মের অর্থাৎ আরাধনার আবশ্যকতা নেই। সেই পুরুষ এই কর্মগুলি করলেও কোন লাভ নেই এবং ত্যাগ করলেও কোন লোকসান নেই। কর্ম না করে কেউ এই স্থিতি লাভ করতে পারে না। জনক ইত্যাদিও এই কর্ম (আরাধনা) করেই পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইরূপ পুরুষ শুধু লোকশিক্ষা অথবা লোক-কল্যাণের নিমিত্তই স্বয়ং কর্ম করেন।

এ পর্যন্ত বলে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মহাত্মাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন-কৌন্তেয়! আমার জন্য এখন কোন বস্তু দুষ্প্রাপ্য নেই অর্থাৎ আমি এখন আত্মতৃপ্ত। মহাত্মাদের মত আমারও এখন কর্ম করার প্রয়োজন নেই তা-সত্ত্বেও অনুগামীদের হিতকামনায় আমি উত্তমরূপে কর্ম করি। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সঙ্কেত দিয়েছিলেন যে, আমিও একজন যোগী।

৩- দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই আত্মা অপরিবর্তনশীল, অদাহ্য, অক্লেদ্য, নিত্য, ব্যাপক, অচল এবং সনাতন। এই আত্মাকে সাক্ষাৎ জানাকেই সনাতন ধর্ম বলে। কিন্তু এইরূপ আত্মা সকলের ভিতর ব্যাপ্ত, তবে খোঁজ কার করা হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আত্মাকে এই সমস্ত বিভূতি দ্বারা যুক্ত তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। সাধারণ ব্যক্তিরা আত্মার এই সমস্ত গুণ দেখতে পায় না। প্রায়ই শোক, সন্তাপ এবং মৃত্যুর কারণ মায়াই দেখা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে এই সমস্ত বিভূতি দ্বারা যুক্ত জানেন অতএব তিনি তত্ত্বদর্শী মহা পুরুষ যোগী।

৪- চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম এবং তার পরিণামস্বরূপ জ্ঞানের প্রক্রিয়া অবগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন-অর্জুন! তত্ত্বদর্শী মহাত্মার শরণে যাও। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে, তাঁর সেবা করবে, তিনি তোমার অন্তরে জ্ঞান এবং সাধন জাগ্রত করবেন। বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তর পুরুষ, যোগ-পরম্পরা এবং ভাবী সাধকদের খেয়াল নিজের শাস্ত্রে রেখেছেন। তিনি জানতেন যে, আজকে তো এই অনুরাগী আমার শরণাগত কিন্তু হাজার-হাজার বছর পর যে সব অনুরাগী ভক্তরা জন্মগ্রহণ

করবে, তারা কার শরণে যাবে? অতএব অনুরাগীদের তিনি তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের শরণে যেতে বলেছেন। আগে তো অর্জুনকে তত্ত্বদর্শীদের কাছে যেতে বলেছিলেন। যখন স্বয়ং ভগবানই সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, তবে তত্ত্বদর্শীদের শরণে কেন যেতে বলেছিলেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একজন যোগী ছিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন সকলের হৃদয়কে ঈশ্বরের নিবাস স্থান বলে সেই হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের শরণে যেতে বলেছেন এবং শেষে '**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।**' *(গীতা ১৮।৬৫)* বলে নিজের শরণে আসতে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তত্ত্বদর্শী মহাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের স্তর এক।

৫- চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, আমার দিব্য জন্ম-কর্ম সম্বন্ধে যে তত্ত্বসহিত অবগত সে আমাকেই লাভ করে এবং এইরূপ বহু পুরুষ আমার স্বরূপ লাভ করেছেন। '**বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।**' *(গীতা, ৪।১০)* -অনেক তত্ত্বদর্শী মহাত্মার স্থিতি শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ। একেই আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণ একজন তত্ত্বদর্শী মহাত্মাই ছিলেন।

৬- চতুর্থ অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন '**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**'-চারবর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। তবে কি মানুষের চারটি বিভাগ? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**' *(গীতা, ৪।১৩)* গুণগুলির মাধ্যমে কর্মকে চারটি শ্রেণীতে বিভাজিত করেছেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে আরাধনাই কর্ম, যার দ্বারা পরমতত্ত্ব পরমাত্মা পর্যন্ত যে দূরত্ব তা অতিক্রম করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তন-ক্রমকেই গুণগুলির আধারে চারটি সোপানে বিভাজিত করে বলেছেন যে এসবের কর্তা অব্যক্ত স্বরূপ আমাকে অকর্তাই জানবে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল যে, আপনি করেন তা সত্ত্বেও অকর্তা কি করে? কর্ম দ্বারা আপনি লিপ্ত কেন হবেন না? শ্রীকৃষ্ণ সমাধান করে বলছেন যে, এর ফলে আমার স্পৃহাও নেই। কর্ম অর্থাৎ আরাধনার ফল শাশ্বত পরমাত্মাতে বিলয়। পরমাত্মা পৃথক হলে কদাচিৎ স্পৃহাও হত কিন্তু সেই পরমাত্মাও আমা হতে পৃথক নয় অতএব কর্মের প্রতি আমার স্পৃহাও নেই।আপনি যে ধরনের ভোজন করেন তার থেকে উত্তম খাবার দেখলে অবশ্যই খেতে মন চাইবে কিন্তু পরমাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ, কোন সত্তাই নেই, তাঁকে লাভ করেছি যখন তবে আর খুঁজব কাকে? সেইজন্য আমার স্পৃহা নেই।

শুধু তাই নয়, উপর্যুক্ত যোগ্যতার সঙ্গে যে কেউ আমাকে জানে, তাকেও কর্ম আবদ্ধ করে না। '**এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।**' (গীতা, ৪।১৫)

আগের মুমুক্ষু পুরুষগণ এই আশাতেই কর্মের আচরণ করেছেন। অর্জুন! তুমিও এই প্রকার কর, তা হলে কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হবে না। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপই অর্জুন অথবা যে কোন সাধক হতে পারে। অতএব শ্রীকৃষ্ণও যোগীই ছিলেন।

৭- নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমি সেই পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত কিন্তু আমার স্থিতি, সম্বন্ধে যে জানে না সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে তুচ্ছ বলে, 'কিছু না' বলে ডাকে, কিন্তু দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত বিবেকীগণ আমাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজনা করে। **'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' (গীতা, ৯।২৬)** যা কিছু তারা অর্পণ করে, তা আমি গ্রহণ করি এবং তাদের পরমকল্যাণ করি।

মহাপুরুষ আর কেমন হন? তাঁরাও সাধারণ মানুষের স্তর থেকে শনৈঃ-শনৈঃ উত্থান করতে-করতে পরম-এর স্পর্শ করে পরমভাব-এ স্থিত হন। আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁকে তুচ্ছ বলে সম্বোধিত করে কিন্তু দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তিগণ অনন্য ভাবে তাঁর শরণাগত হয়।

৮- ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র- ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! এই দেহটাই ক্ষেত্র, এতে ভাল-মন্দ যেরূপ সংস্কারের বীজ বপন করা হয় তা জন্মান্তর পর্যন্ত ফল দেয়। এই দেহের তিনটে ভাগ রয়েছে-স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ, এর সঙ্গে পরম পুরুষকে সাক্ষাৎ করে যে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ -এইরূপ বলেছেন সেই মনীষীগণ,যাঁরা ক্ষেত্রের তত্ত্বজ্ঞ। অর্জুন! তুমিও আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আগে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাজন করেছেন, অতঃপর যাঁরা একে জানেন সেই মহাত্মাদের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে নিজেকেও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে প্রকাশিত করেছেন। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণও যোগী, মহাত্মা ছিলেন।

৯- অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহাবাহো! সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথকভাবে জানতে চাই। তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! বহু পন্ডিত কাম্য কর্মগুলির ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন (কর্মের তাৎপর্য হল আরাধনা) অর্থাৎ যে আরাধনার পরিবর্তে লৌকিক আশা লুকিয়ে থাকে; সেই কামনাগুলির ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। অনেক বিচার-কুশল পুরুষ কর্ম-ফল-এর ত্যাগকেই ত্যাগ বলে। কিছু - কিছু মনীষীদের মত অনুসারে সমস্ত কর্ম দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য এবং অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম কোন কালে ত্যাগ করা উচিত নয়। হে অর্জুন! সেই ত্যাগ বিষয়ে তুমি আমার সিদ্ধান্তও শোন! ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে যজ্ঞ, দান

এবং তপরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এই তিনটি বিবেকী পুরুষদেরও পরম পবিত্র করে।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম এবং সাধনার নামে প্রচলিত বিচার ধারাগুলির সমীক্ষা করেছেন এবং নিজের মতও প্রতিপাদিত করেছেন। প্রচলিত সমস্ত বিচারধারা দোষে পূর্ণ ছিল না সেগুলির মধ্যে একটা ধারা যথার্থও ছিল যেমন, বহু মনীষীর অভিমত হল যে, যজ্ঞ, দান এবং তপরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সমস্ত মনীষীদের, নির্ণয়কে পুষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণও নিজের মত প্রকাশ করেছেন যে, যজ্ঞ,দান এবং তপস্যারূপ কর্ম কোন কালে ত্যাগ করা উচিত নয়। অর্থাৎ যেমন সেই মনীষীগণ ঠিক তেমনি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরই নির্ণয় স্বীকার করেছেন। অতএব স্পষ্ট হল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরই একজন, যোগী।

১০- গীতা সমাপনের পর একাগ্রচিত্ত সঞ্জয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় যোগেশ্বর বলে দিয়েছেন-

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।। *(গীতা, ১৮/৭৮)*

যোগেশ্বর তাকে বলে যিনি যোগী এবং অন্যকেও যোগ প্রদান করার ক্ষমতা যার মধ্যে থাকে, যোগে যাঁর প্রভুত্ব হবে। এটাই পূর্ণতা এবং পূর্ণযোগীর লক্ষণ। স্পষ্ট হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণও তাঁদেরই একজন, একজন যোগী।

বস্তুতঃ মানব-মন- এর একটা মস্ত দুর্বলতা হল যে, সে ভাল পথে চলতে চায় না, নানা রকমের ওজর করে। শ্রীকৃষ্ণের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করার অপেক্ষা এই বলে সন্তোষ করতে চায় যে, শ্রীকৃষ্ণ তো অপৌরুষেয়, অলৌকিক ছিলেন। যে কাজগুলি তিনি করেছেন, তা আমি কি করে করতে পারব? তিনি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, ভগবান, অবতার ছিলেন। মানুষ ভগবানকে জানে না পরন্তু তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আহ্বান করছেন, প্রোৎসাহিত করছেন যে, বহু সাধক আমার স্বরূপ লাভ করেছে। আপনিও সেই পথই অনুসরণ করুন এবং কল্যাণের অংশীদার হোন।

প্রশ্ন- মহারাজজী! ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে জানতে চাই।

উত্তর- দেখুন, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।। *(গীতা ১৩/১)*

অর্জুন! এই দেহটাই ক্ষেত্র। এতে ভাল বা মন্দ যেরূপ বীজ বপন করা হয়, তা সংস্কাররূপে অঙ্কুরিত হয় এবং জন্মান্তর পর্যন্ত ফল প্রদান করে। যিনি একে প্রত্যক্ষরূপে জানেন, তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে; এইরূপ তাঁর স্বরূপের জ্ঞাতা মহর্ষিগণ বলেছেন। হে অর্জুন! আমাকেও সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষেত্রজ্ঞই জানবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাজন এবং তত্ত্বতঃ তা জানাকেই জ্ঞান বলে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কোন বিষয় মুখস্থ করে নেওয়াকে জ্ঞান বলে না পরন্তু স্থূল,সূক্ষ্ম, কারণ তিনটি দেহকে নিরুদ্ধ করার সঙ্গেই সেই পরমপুরুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে জ্ঞান বলে। পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, জল, গগন, পাবক, সমীর)দ্বারা নির্মিত স্থূল দেহ, মন,বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম শরীর এবং চেতনা দ্বারা নির্মিত কারণ শরীর এই সমস্তই ক্ষেত্র। এগুলি যতদিন বিলীন না হয়, ততদিন কোন না কোন রূপে দেহের অস্তিত্ব থাকবেই। এই ক্ষেত্র অতিক্রম করে সেই শাশ্বত পুরুষ, পরমতত্ত্বের অনুভূতি এবং তাতে স্থিত হওয়াকে জ্ঞান বলে। প্রকৃতি এবং পুরুষের বিভাজন জানাকেই জ্ঞান বলে।

শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই পরিভাষা সেই মহাপুরুষগণ দিয়েছেন, যাঁরা এর জ্ঞাতা ছিলেন। যে-ই একে জানে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই সব মহাপুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ ছিলেন। এবং অর্জুন! আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ জানবে।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও মহাত্মা, যোগী ছিলেন। যিনি ক্ষেত্র-এ আবদ্ধ হন না পরন্তু এর সঞ্চালক।

প্রশ্ন- মহারাজজী! প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক-পৃথক ক্ষেত্রজ্ঞরূপে স্থিত হন। অথবা ক্ষেত্রজ্ঞ হলে সমস্ত জীবের দেহকে জানতে পারেন তাঁরা?

উত্তর- ক্ষেত্রজ্ঞের পৃথক সত্ত্বা হয় না। বিকার সহিত প্রকৃতি এবং পুরুষত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি যিনিই করে নেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ-এ পরিণত হন। এইরূপ মহাপুরুষ পরমাত্মাতে একীভূত হয়ে রয়েছেন, যিনি সমস্ত জীবাত্মার কেন্দ্র, মূল উদ্‌গম । সেইজন্য যে কোন আত্মা যে স্থান থেকেই চিন্তন করে, উন্নতি করে তৎক্ষনাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মাধ্যমে তার মনের মধ্যে ভাবের সঞ্চরণ ঘটে, তিনি দিশা- নির্দেশ করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ একসঙ্গে হাজার-হাজার ব্যক্তির মনের খবর রাখেন, তাদের মনোগত ভাবের অনুসারে তাদের নির্দেশ দেন। একসঙ্গে তাদের ভাবগুলি পরখ করেন। ফল প্রদান করার সঙ্গে তাদের উত্থান করতে- করতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে স্থিতি লাভ না করা পর্যন্ত

তাদের পরিচালনা করেন। এটাই হল সেই ক্ষেত্রজ্ঞের সর্বজ্ঞতা। হাজার-হাজার ব্যক্তি স্মরণ্ করুক অথবা অনন্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ একসঙ্গে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হন। তাঁকে কোন উদ্যোগ করতে হয় না। কারণ তিনি সকলের মূল কেন্দ্রে স্থিত। মহাপুরুষের এটাই বিশেষত্ব যে, যে সাধক তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে, তৎক্ষনাৎ তার অন্তরে জাগ্রত হয়ে, অভিন্ন হয়ে তার পথ-সঞ্চালন করতে শুরু করেন এবং ক্রমশঃ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে বার করে উত্থান করিয়ে দেন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-এর বিভাজন এবং তত্ত্বের অনুভূতি সাধককে করিয়ে দেন। সাধকও তখন ক্ষেত্রজ্ঞে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- শুধু আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ- একথা নয়; অপিতু যে-ই জানতে পারে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আপনিও হতে পারেন। মানব অথবা জড়-চরচরাই অষ্টধা মূল প্রকৃতি,পঞ্চমহাভূত-মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং চেতনার বিকার। ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যেকটাকে জানে, এগুলির সঞ্চালক।

প্রশ্ন- মহারাজজী! জড়ে চেতনের অনুভূতি কি করে হবে?

উত্তর- জড় পদার্থ আমাদের দৃষ্টিতে জড় কিন্তু স্বয়ং চেতন প্রস্তর খন্ড আপনার দৃষ্টিতে জড় কিন্তু স্বয়ং চৈতন্য দ্বারা ওতপ্রোত। এখন তো আপনার বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করেছে, বস্তুতঃ সকলের মূল ব্রহ্ম-এ স্থিত মহাপুরুষ যেদিকেই দৃষ্টিপাত করেন'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' ই দৃষ্টিগোচর হয়। '**সরগু নরকু অপবরগু সমানা। জহঁ তহঁ দেখ ধরে ধনু বানা।।' (মানস, ২।১৩০।৭)**- তার দৃষ্টিতে স্বর্গও স্বর্গরূপে থাকে না এবং নরকও নরকরূপে থাকে না। যেখানেই দৃষ্টি পড়ে, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রসারই দৃষ্টিগোচর হয়। এটাই ক্ষেত্রজ্ঞের স্থিতি। গীতাতেও এই স্থিতির চিত্রণ রয়েছে-

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ***(গীতা, ৫।১৮)***

যিনি বিপ্র অর্থাৎ পরব্রহ্ম দ্বারা আপ্লাবিত, বিদ্যা বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ , চন্ডাল, কুকুর, হাতী এবং গাভী সকলের প্রতি তিনি সমদর্শী হন। তাঁর দৃষ্টিতে গাভী ধর্ম নয় এবং কুকুরও অধর্ম নয়। বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নয়, চন্ডাল হীন নয়, দেহ, চামড়া, রং এবং মস্তিষ্ককে তিনি গুরুত্বই দেন না। তাঁর দৃষ্টি সোজা তাদের আত্মার উপর পড়ে, যা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত।

প্রশ্ন - কিন্তু মহারাজজী! কুকুরী বারোটা স্তনে দুধ দিলেও-কি আর গাভী যদি দুধ নাও দেয় তবুও গাভী তো গাভী এবং কুকুরী তো কুকুরীই থাকবে। সমান কি করে হবে?

উত্তর- দেখুন, বাল্মীকি আগে চন্ডাল ছিলেন, লোকে এইরূপই বলে কিন্তু মহাপুরুষগণ তাকে চন্ডাল এবং দস্যুরূপে দেখেননি। তাঁকে দিশা প্রদান করেছিলেন এবং **‘বালমীকি ভয়ে ব্রহ্ম সমানা।’ (মানস, ২।১৯৩।৮)**- ব্রহ্মর্ষিরূপে পরিণত হয়েছিলেন। এই প্রকার সেই মহাপুরুষদের দৃষ্টি আত্মার উপরই থাকে এবং আত্মা যখনই তাঁদের দিকে আকর্ষিত হয় তাঁরা তক্ষুণি তাকে পরিচালিত করে তার স্থূল-সূক্ষ্ম -কারণ পর্যন্ত দেহগুলিতে নিড়ানো শুরু করে দেন। ‘শনৈঃ-শনৈঃ অভিন্ন হয়ে রথী হয়ে যান তারপর তো; **‘জাকে রথ পর কেসো। তা কহঁ কৌন অন্দেসো।’** উত্থান করতে- করতে সেই শাশ্বত পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করান। সেই সাধকও ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণও এই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ, যোগী ছিলেন।

তুমি অন্তরে সেই যোগ্যতা অর্জন কর এবং এইরূপ মহাপুরুদের কায়মনোবাক্যে শরণাগত হও, তুমিও প্রেরণা স্রোত সেই শাশ্বত স্বরূপ ক্রমশঃ লাভ করবে;এবং এই কুকুরী এবং গাভী তো ভিন্ন শ্রেণীর জীব। কিন্তু শূদ্র, যাদের মনের মধ্যে শূদ্র ভাব জোর করে ঢোকানো হয়েছে তারা এবং ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান সকলেই একই মানুষ। এই প্রসঙ্গটাই ভুল।

।।ওঁ।।

যজ্ঞ

প্রশ্ন- মহারাজজী! শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে,"যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ" -যজ্ঞ ভিন্ন আর যা কিছু করা হয় তা এই লোকেরই বন্ধন। কৃপা করে বলুন যে, যজ্ঞ কি? কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞের পূর্তিকালে ঈশ্বর লাভ হয় কিন্তু সংসারে এত -যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তবুও ভগবান কাউকে দেখা দিয়েছেন দেখা যায় না। কৃপা করে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করুন।

উত্তর - আপনার মনে শঙ্কা উৎপন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। তৃতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। *(গীতা, ৩/৯)*

অর্জুন! যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। কর্ম তা, যা দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হয়। এই যজ্ঞ ব্যতীত যা কিছু কর্ম সম্পাদিত হয়, যাতে সারা জগৎ রাত-দিন ব্যস্ত, তা এই লোকেরই বন্ধন। কর্ম তো '**মোক্ষসেহশুভাৎ**' *(গীতা, ৪/১৬)* -অশুভ অর্থাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আবদ্ধ করে না। '**তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।**' সেইজন্য কৌন্তেয়। সেই যজ্ঞের পূর্তির জন্য, সঙ্গ-দোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে, উত্তমরূপে কর্মের আচরণ কর। এই প্রকার যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। সেই প্রক্রিয়া বিশেষই কর্ম, যার দ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় একথা প্রমাণিত যে, যজ্ঞ নির্ধারিত দিশা- বিশেষ। অতএব আপনার প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, সেই যজ্ঞ কি প্রকারের?

শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের গীতাতে সবিস্তারে নিরুপণ করেছেন। তিনি শুধু এটুকুই বলেননি যে, যজ্ঞ কি? পরন্তু প্রকরণের মহত্ত্ব বুঝিয়ে এও বলেছেন যে, যজ্ঞ এল কোথা থেকে এবং কি ফল প্রদান করে?

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।। *(গীতা, ৩/১০)*

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পাদিতে যজ্ঞসহিত প্রজাদের রচনা করে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উন্নতি কর। এখানে বুদ্ধিই ব্রহ্মা। '**অহঙ্কার সিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান।।**' *(মানস, ৬/১৫)* বুদ্ধির চার প্রকার- **ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদুর্যান এবং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ।**

ব্রহ্মবিদ্ সেই বুদ্ধি যা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ওতপ্রোত কিন্তু এটা শুধু মুখস্থ করা বিদ্যা, কারণ যার বুদ্ধি এই স্তরের সে পথ চলা সম্পূর্ণ করতে পারে না ব্রহ্মবিদ্বর তিনি, যিনি ব্রহ্ম বিদ্যাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। ক্রিয়াত্মক জ্ঞান হলে সাধনা ক্রমশঃ এতটা উন্নত হয় যে, সে স্বয়ং তো ব্রহ্মজ্ঞাতা হয়ই, অন্যকেও সেই পথে চালিত করার ক্ষমতা রাখে, সেই বুদ্ধিকে ব্রহ্মবিদুর্যান বলে। ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞাতার সেই স্থিতি যাতে ইষ্ট সমাহিত এইরূপ বুদ্ধি মাত্র যন্ত্র হয় এবং এর মাধ্যমে আরাধ্যই নিজের বাণী প্রসারিত করেন। এই প্রকার মহাপুরুষদের বাণীর সঙ্কলন বেদ। বেদকে অপৌরুষেয় এই কারণেই বলা হয়, যদ্যপি সেগুলি শ'দু'শ মহর্ষিদের বাণীর সঙ্কলন। বেদের ব্যাখ্যাতা এক'শ - সোওয়া'শ মহাত্মাই আছেন। তা সত্ত্বেও এতে মহাত্মাদের কোন কৃতিত্ব নেই পরন্তু সেই অব্যক্ত পরমাত্মার শ্রীমুখের বাণী। এইরূপ মহাপুরুষগণই কল্পের আদিতে প্রজাকে যজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

কল্পের আদির আশয় হল ভজনারম্ভ। ভবরোগ দ্বারা ত্রস্ত মরণধর্মা জীবাত্মার কল্প হল ভজন। এর দ্বারাই সে পূর্ণ নিরোগ হয়, তার কায়াকল্প হয়। ভজনের অবস্থা দুটো- আরম্ভ এবং পরাকাষ্ঠা। কল্পের আদি ভজনের আরম্ভিক ক্রিয়া; এবং পরাকাষ্ঠা হল সেই স্থিতি যেখানে আত্মা শাশ্বত ব্রহ্মের দিগ্‌দর্শন পেয়ে পূর্ণ নিরোগ, অচল, স্থির হয়ে যায়। পুনরায় যোনিতে ভ্রমণ করতে হয় না, একেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে। এই প্রকার প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থাৎ যাঁর বুদ্ধি যন্ত্রস্বরূপ, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ কল্পের আদিতে অর্থাৎ ভজনারম্ভে প্রজাদের যজ্ঞে সংযুক্ত করেছিলেন অর্থাৎ সাধকের অন্তঃকরণে যজ্ঞের বীজ বপন করে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উন্নতি কর।

যজ্ঞ দ্বারা কি উন্নতি হবে? দুটো পুত্র বর্তমানে আছে তবে কি ভবিষ্যতে আরও দুটো হবে? একটা ঘর এখন আছে ভবিষ্যতে কি আর একটা হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- না, এই যজ্ঞ **'ইষ্টকামধুক্'**-এই যজ্ঞ ইষ্ট-সম্বন্ধীয় কামনার পূর্তি করবে। তিনি ইষ্ট যাঁর থেকে কখনও অনিষ্ট হয় না। এই প্রকার তো একজনই রয়েছেন সাক্ষাৎ পরমাত্মা, যাঁকে লাভ করার পর কখনও পতন হয় না। দেবতারা পর্যন্ত **'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** *(গীতা, ৯/২১)*-পুণ্য ক্ষীণ হলে মৃত্যুলোকে সেখানেই ফিরে আসেন, যেখান থেকে চলা শুরু করেছিলেন। এর চেয়ে বেশী অনিষ্ট কি হবে? অতএব একমাত্র পরমাত্মাই পরম কল্যাণকর। তিনিই আমাদের ইষ্ট হওয়ার উপযুক্ত এবং যজ্ঞ এই ইষ্ট সম্বন্ধীয় কামনা পূর্তি করে।

এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যজ্ঞ দ্বারা কিরূপে ইষ্টের উপলব্ধি হবে? ইষ্ট কি হঠাৎ কল্যাণ করে দেবেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- না পরন্তু-

দেবান্‌ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্‌স্যথ।। *(গীতা, ৩/১১)*

এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উন্নত কর। অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তি পুরাতন- দৈবী সম্পদ্ এবং আসুরী সম্পদ্। আসুরী সম্পদ্ কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মায়াজালে জীব তো আগে থেকেই জড়িত। অতএব এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উন্নত কর; হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্‌কে শক্তিসম্পন্ন করে তোল। বিবেক, বৈরাগ্য, মনের শমন, ইন্দ্রিয়গুলির দমন ইত্যাদি দৈবীসম্পদ্- এর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ষোড়শ অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই সম্পত্তি আংশিকরূপে সকলের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু তা দুর্বলভাবে রয়েছে; তাকেই সবল করতে হবে। এই হল আপনার নিজ বল। এগুলির উন্নতিতেই আপনার উন্নতি নিহিত রয়েছে। দৈবী সম্পদ্ যেমন-যেমন শক্তিসম্পন্ন হবে, মন অন্তর্মুখী হবে, ধ্যানে শক্তি অর্জন হবে। এই প্রকার পরস্পর উত্থান করতে করতে পরমশ্রেয় পরমাত্মাকে লাভ করবে। যে কর্ম দৈবী সম্পত্তিকে উত্তরোত্তর উন্নত করে তাই হল যজ্ঞ, পরম কল্যাণকর।

দৈবী সম্পত্তিকে বিকশিত না করে অর্থাৎ সাধন না করে যদি কেউ নিজের কল্যাণ সম্পাদিত মনে করে, শ্রীকৃষ্ণ তার নিন্দা করছেন-

ইষ্টান্‌ভোগাহ্নি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।। *(গীতা, ৩/১২)*

যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবতা তোমার জন্য ইষ্ট সম্বন্ধীয় ভোগ প্রদান করবে এবং 'তৈর্দত্তান্'-তারা দাতা। তাদের কাছ থেকে না গ্রহণ করেই যে নিজেকে পূর্ণ মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের শব্দে সে চোর।

প্রশ্ন- মহারাজজী! 'ইষ্টানভোগান্' - এর অর্থ ইচ্ছিত ভোগ কি হবে না?

উত্তর- না, কারণ সাংসারিক ইচ্ছাগুলি ধন, স্ত্রী পুত্রাদির হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা পরম কল্যাণ সম্ভব নয় কিন্তু যজ্ঞ তো এমন অনুষ্ঠান যার দ্বারা **'শ্রেয়ঃ পরম্‌বাপ্স্যথ'**-পরমকল্যাণ হয়। অতএব ইষ্ট- সম্বন্ধীয় ভোগ, ধ্যানের আনন্দ, ঈশ্বরীয় পরিবেশের উপলব্ধি থেকে সম্বন্ধীত। এই প্রকার দেবতা তোমাকে ইষ্ট-সম্বন্ধীয় ভোগ প্রদান করবেন (চিন্তন- ক্রম-যজ্ঞ- ক্রিয়া) এবং তিনিই একমাত্র দাতা। অর্থাৎ না করে কেউ লাভ করে না। এই দৈবী প্রবৃত্তি গুলির সংবর্ধন না করেই যে সেই

অব্যক্ত সত্তার স্থিতি উপভোগ করে, বিনা চলেই যে লক্ষ্যে উপনীত হয়েছি এই গর্ব করে, সে নিশ্চয় চোর, মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। অতএব যজ্ঞ করা নিতান্ত আবশ্যক। যজ্ঞ হতে কি লাভ হবে? যজ্ঞ করলে যে উপলব্ধি হবে সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।*(গীতা, ৩/১৩)*

যজ্ঞাবশেষ অর্থাৎ যজ্ঞের পূর্তিকালে শেষ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে এই আত্মা সদা-সর্বদার জন্য তৃপ্ত হয়ে যায়। সেই ব্রহ্মপিযুষ যাঁরা পান করেন, সেই সন্তগণ সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন কিন্তু যে পাপী শুধু দেহ- পোষণ এর জন্য পরিশ্রম করে তারা আরও বেশী পাপ সংগ্রহ করে। তারা যজ্ঞ তো করে কিন্তু পরিবর্তে দেহ এবং তৎসম্বন্ধীয় সুখ সুবিধাগুলি লাভ করার আশা করে, যদিও দেবতাদের দেহ পর্যন্ত পুনরাবর্তনশীল। অতএব যজ্ঞ নিষ্কামভাবেই করা উচিত।

এই প্রকার ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত প্রজাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তবে অবশেষে সেই সমস্ত ভূত যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত কেন হল? কি প্রলোভন তারা দেখেছিল? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।। *(গীতা, ৩/১৪)*

ভূত প্রাণী অন্নাদ্ অর্থাৎ অন্ন গ্রহণ করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে অন্নাদ্ শব্দের প্রয়োগ অন্নভোগীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ভূতগণের উৎপত্তি সঙ্কল্প দ্বারা হয়। এই অন্নকেই উদ্দেশ্য করে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত ভূত (সঙ্কল্প) যজ্ঞ-এর সহিত সংযুক্ত হয়েছে। অন্ন ব্রহ্ম -**অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। (তৈত্তি০। ভৃগু০ দ্বিতীয় অনুবাক্)**। সেটাই তো আত্মিক আহার, যা লাভ করে আত্মা তৃপ্ত হয়ে যায়, পুনরায় অতৃপ্ত হয় না। সেই ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত সঙ্কল্প যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত হয়েছে।

সঙ্কল্পগুলির উৎপত্তি তো ব্রহ্মকে, অন্নকে লাভ করার জন্য হয়েছে; কিন্তু সেই অন্নের উৎপত্তি কিরূপে হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-বৃষ্টি থেকে। পূর্বজন্মে কিছু করা থাকলে অথবা এই জন্মে কোন মহাপুরুষের কৃপারূপ বৃষ্টি বর্ষিত হলে, যদিও এসমস্ত আমাদেরই কৃত যজ্ঞের সঞ্চার, যা বর্তমানে লাভ হয়, তবেই ব্রহ্মানন্দের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব । এই কৃপাবৃষ্টি কিরূপে হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যজ্ঞ দ্বারা , কোন মহাপুরুষের কৃপা প্রসাদ থেকে হবে অথবা **'অনেক জন্মসংসিদ্ধঃ'** ***(গীতা,***

৬/৪৫) -পূর্বজন্মে কৃত যজ্ঞের ফলস্বরূপ মুক্ত হবে। বৃষ্টি যজ্ঞ থেকে হয় এবং যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন-যেমন আপনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন, যজ্ঞ উন্নত হতে থাকবে।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎসর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।। ***(গীতা, ৩/১৫)***

কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন জানবে। যে মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ববিদিত, বুদ্ধি মাত্র যন্ত্র; তাঁরই বাণী বেদ। এইরূপ মহাপুরুষদের বাণী দ্বারা এই কর্মের সৃষ্টি হয়েছে, তবে কি মহাপুরুষগণ নিজবুদ্ধি প্রয়োগ করে রচনা করেছেন ? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- না, এইরূপ মহাপুরুষদের মাধ্যমে স্বয়ং ব্রহ্মই নিজের বাণী প্রচার করেন। সেইজন্য বেদ তুমি অক্ষয় ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন জানবে। সেইজন্য বেদ অপৌরুষেয়। যদ্যপি বেদ শত-শত মহাপুরুষদের বাণীর সঙ্কলন, তাঁরা উত্তমরূপে ব্রহ্মে স্থিত ছিলেন তবুও তা কোন পুরুষের বাণী নয় পরন্তু মহাপুরুষদের মূলে অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান যিনি, তাঁর শ্রীমুখের বাণী শ্রুতিতে আছে- **'ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মৈব ভবতি।', 'জানত তুমহহি তুমহই হোই জাঈ"।** *(মানস, ২/১২৬/৩)* স্বরূপে স্থিত হওয়ার পর মহাপুরুষের মুখ থেকে যা কিছু নিঃসৃত হয় সে সবই বেদবাক্য কারণ তাঁর বুদ্ধি যন্ত্র মাত্র, দেহ বাসস্থান মাত্র। অব্যক্ত ব্রহ্মই তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হন। সেইজন্য বেদ অক্ষয় ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে জানবে। সেই কারণে সেই সর্বব্যাপক অক্ষর পরমাত্মা সদৈব যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ য়ঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।*(গীতা, ৩/১৬)*

শ্রীকৃষ্ণ মত ব্যক্ত করছেন যে, হে পার্থ ! যে পুরুষ এই লোকে এই প্রকার প্রচলিত সাধনক্রম অনুসারে কর্ম করে না, ইন্দ্রিয়গুলির সুখাকাঙ্খী সেই পাপী ব্যক্তি ব্যর্থই জীবন ধারণ করে। কোন্ সাধন ক্রম ? উপর্যুক্ত সাধন- ক্রমের উপর শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করলেন যে ক্রমশঃ দেবতাদের উন্নত কর, দৈবী সম্পদ্‌কে শক্তিসম্পন্ন কর। যেমন-যেমন দৈবীসম্পদ্ সংগ্রহ হবে, ইষ্টে চিত্ত কেন্দ্রিত হতে শুরু করবে, সেটাতেই তোমার প্রগতি হবে। পরস্পরের উন্নতি করে পরমকল্যাণের অধিকারী হও। তিনিই একমাত্র দাতা। কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে পূর্ণ মনে করে অথচ ঈশ্বর তাকে পূর্ণত্ব প্রদান করেননি, তবে সেই ব্যক্তি চোর, মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। সেই পাপী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ কামনা করে। দেবতারাও মরণধর্মা। দেবদেহ লাভ হলেও

কি লাভ? তা দিয়েও পরমকল্যাণ সম্ভব নয়। যজ্ঞাবশেষ ব্রহ্মানন্দই এই আত্মার অশন। সেই অশন পানকর্তা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয় এবং যে দেহ-এর জন্যই পরিশ্রম করে, তারা পাপই ভোগ করে। এই-ব্রহ্মানন্দরূপ অন্নকে উদ্দেশ্য করেই প্রাণী যজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি কৃপাবৃষ্টি দ্বারা হয়। পূর্বজন্মের যজ্ঞাচরণ অথবা যজ্ঞস্বরূপ মহাপুরুষ-এর দ্বারা এই বৃষ্টি হয় । বেদ-অবিনাশী থেকে উৎপন্ন হয়; ফলস্বরূপ সর্বব্যাপক পরমাত্মা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যদি আপনি পরমাত্মাকে লাভ করতে ইচ্ছুক, তবে যজ্ঞের আচরণ করুন। এই সাধন-পদ্ধতি অনুসারে ক্রমশঃ পরস্পর উত্থান করতে-করতে যে পরমকল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে না যায়,শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসারে ইন্দ্রিয় সুখ আকাঙ্খী এই প্রকার পাপী পুরুষ ব্যর্থই জীবন ধারণ করে। একথা প্রমাণিত যে, এই চিন্তন -পথ-এ ইন্দ্রিয়গুলির সুখের কোন বিধান নেই। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির দমনের সঙ্গে-সঙ্গে ভোগ থেকে দূরে থেকেই এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণের অভিমত হল যে, যজ্ঞ না করে সেই পরমতত্ত্বকে কেউ-লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। জনক ইত্যাদি মহর্ষিগণ এই কর্ম করেই পরমনৈষ্কর্ম্য স্থিতি লাভ করেছিলেন কিন্তু যে মহাপুরুষ আত্মতৃপ্ত এবং আত্মস্থিত, তিনি কর্ম করলেও কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলেও কোন লোকসান হয় না। এই বিষয়েই চতুর্থ অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।। *(গীতা, ৪/২৩)*

আসক্তি এবং সঙ্গ দোষের প্রভাব থেকে সর্বথা মুক্ত এবং সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানে স্থিত চিত্ত, উত্তমরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মুক্ত পুরুষের সমস্ত কর্ম নষ্টপ্রায় হয়ে যায়। যজ্ঞের আচরণই তো কর্ম। কর্মে প্রবৃত্ত থাকা সত্ত্বেও সেই মহাপুরুষ লিপ্ত হন না। কেন? যখন তিনি কর্তা, তবে কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।। *(গীতা, ৪/২৪)*

এইরূপ মহাপুরুষ যা কিছু সমর্পণ করেন তাও ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্মই কর্তা এবং যা কিছু আহুতি দেওয়া হয় তাও ব্রহ্মই । তার দ্বারা যা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য, তাও ব্রহ্ম, কারণ কর্ম দ্বারা তিনি ব্রহ্মে সমাধিস্থ। তাঁর জন্য তো

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' -সবর্ত্রই ব্রহ্ম বিদ্যমান। সারাংশতঃ এইরূপ মহাপুরুষ বস্তুতঃ কোন উদ্যম করেন না পরন্তু অনুগামীদের পথ-প্রদর্শন করার জন্য অভিনয় মাত্র করেন। যজ্ঞ করলে তাঁর মধ্যে শুভ অথবা অশুভ কোন সংস্কারের সৃজন হয় না।

যজ্ঞ - বিধি

এই আচরণ স্থিতি প্রাপ্ত পুরুষের; কিন্তু যজ্ঞ বিধি কি প্রকার? আমরা শুরু কোথা থেকে করব? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীতে দেখুন-

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।। (গীতা, ৪।২৫)

মুক্ত পুরুষের যজ্ঞ করার কোন প্রয়োজনই নেই; কিন্তু অন্যান্য যোগী, যাঁরা উপলব্ধি করেননি, দেবযজ্ঞ উত্তম রূপে করেন, দৈবী সম্পত্তিগুলিকে সবল করেন। বৈরাগ্য,শম, দম,ইত্যাদি গুণ যেগুলিতে পরমদেব- এর দেবত্ব নিহিত রয়েছে, অর্জন করেন। পরাৎপর ব্রহ্ম বাস্তবে অগ্নি, তাতেই বিলীন হওয়ার জন্য যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ আহুতি দেন।

যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া কাকে বলে? অর্জুন যখন প্রশ্ন করলেন যে, ভগবন! কর্ম কাকে বলে? অধ্যাত্ম কাকে বলে? অধিভূত, অধিদেব এবং অধিযজ্ঞ কাকে বলে? এবং এই দেহে সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে স্থিত? তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন-অর্জুন! এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞরূপে স্থিত, আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। যে মহাপুরুষ যজ্ঞ পূর্ণ করেন-এবং যজ্ঞের প্রাপ্তব্য সেই ব্রহ্মের অনুরূপ স্থিতি লাভ করেন। একেই অধিযজ্ঞ বলে (অধ্যায় ৮।১-৪) **'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্'***(গীতা, ৫।২৯)* -অর্জুন! যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তাও আমাকেই জানবে! অতএব মহাপুরুষই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। এইরূপ যজ্ঞস্বরূপ কোন মহাপুরুষকে উদ্দেশ্য করে যিনি যজন করেন, মানসিক প্রবৃত্তিগুলি আহুতি দেন, তাঁরা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞের আহুতি দেন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।। *(গীতা, ৪।২৬)*

অন্য যোগীগণ শ্রোত্রাদিক সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ইত্যাদি) কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে সংযমিত করেন। আগুন স্বয়ং ভস্মীভূত হয় না পরন্তু অগ্নিতে যেমন ভাল-মন্দ সব বস্তু ভস্ম হয়ে যায় ঠিক এই প্রকার সংযম এমন অগ্নি, যাতে

ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখী প্রবাহ সর্বথা শান্ত হয়ে যায়। সেই হেতু সংযমকে অগ্নির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

বহু যোগীপুরুষ শব্দাদিক বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন। শব্দ ইত্যাদির তাৎপর্য-হল পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। উদাহরণস্বরূপ সাধক শান্তচিত্তে চিন্তনে প্রবৃত্ত, মনের অন্তরালে বিজাতীয় সঙ্কল্প নেই; ঠিক তখনই অন্য কারও দ্বারা উচ্চারিত কোন শব্দ (বলপূর্বক) না চাইলেও শোনা যায়। সাধক এই ধরনের শব্দ একদম শুনতে চায় না, তা সত্ত্বেও সমাজে থেকে মনন করলে কানে আসাটা স্বাভাবিক, কোন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হওয়াটা স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গুলিকে মাধ্যম করে যে বিষয়গুলি হানা দেয় সেগুলিকে সাধক **'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি'**- ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির অন্তরালে বিষয়জনিত আশয় পরিবর্তিত করে। সাধক বিষয়কে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে গ্রহণ করে না অন্যথা পতিত হয়ে যাবে। সঙ্কল্প -দৃষ্টি এলেই বিকার উৎপাদক ভাব-ই পরিবর্তিত করে দেয়।

আমার জীবনের এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অষ্টগ্রহী - যোগ- এর চর্চা ছিল। যে বছর আমি গাজীপুরে ছিলাম সে বছর বিবাহের তিনটিই শুভমুহূর্ত ছিল। শহরের ব্যাপার ! শত-শত লাউডস্পীকার একসঙ্গে বেজে উঠেছিল ''সমধিন চলী বাজার, চার ইয়ার সঙ্গে চলে।'' ''অকেলী ডর লাগে রাত মোরী আম্মা'' ইত্যাদি গীত বাতাবরণে ভেসে বেড়াচ্ছিল। এক দু'দিন তো একটা শব্দও আমার কানে আসেনি, কারণ চিত্ত সেদিকে ছিলই না; কিন্তু শব্দগুলি বার-বার তরঙ্গিত হওয়ার ফলে কিছু-কিছু কানে আসছিল। তৃতীয় দিন একটা লাউডস্পীকার আমি যেখানে থাকতাম সেই ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে বেজে উঠেছিল। এক-একটা শব্দ বিষয় - উদ্দীপক ছিল। শব্দ-গুলির মত প্রভাব ফেলছিল। আমার মনে হয়েছিল এখানে থাকলে পতিত হয়ে যাব। এইরূপ চিন্তা আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম এবং শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু যে জিনিষকে আমরা বেশী ভয় পাই, এই মন শীঘ্রই সেটা ধরে। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেও মন সঙ্গে-সঙ্গে সেই গীতগুলো চিনতে পারত। আমি তো খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত চারদিকে সেই শব্দগুলিই ধ্বনিত হচ্ছিল।

আমি মহারাজজীর স্মরণ করেছিলাম, প্রার্থনা করেছিলাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। 'কবীর'-এর ভজন শোনানোর সময় মহারাজজীও প্রায় এইরূপই বলতেন-

সাঙ্গঁ কে সঙ্গ সাসুর আঙ্গ।

সঙ্গ না সূতী স্বাদ ন-মানী, গয়ো জোবন সপনে কী নাঙ্গঁ।।

ইত্যাদি কবীর-এর ভজনের সঙ্গে এই গীতগুলোর সাদৃশ্যতা দেখা যায়। এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই কেন এই গানগুলোরও আশয় পরিবর্তিত করব না। ব্যস, তক্ষুণি ফিরে এসেছিলাম। লিপ্সাযুক্ত সেই গানগুলো সাধন ক্ষেত্রেও এত-বেশী উপযোগী মনে হয়েছিল যে, বেশ কয়েক বছর আমি সেই ভজনাগুলো গেয়েছিলাম, ভক্তদেরও শোনাতাম। যখন-যখন মনের একাগ্রতা কমে যেত, সেই গানগুলো গেয়ে নিতাম তখন বিরহানল, বৈরাগ্যদয় সব শুরু হত এবং সঙ্গে-সঙ্গে অশ্রুপাতও হত। যেমন-'**সমধীন চলী বাজার, চার ইয়ার সঙ্গে চলে।**' চিন্তন করতে- করতে সাধনা সমাধি স্তরে পৌঁছে গেছে শুধু পরমাত্মাতে বিলীন হওয়া যদি বাকী, এইরূপ অবস্থাতে যদি সাধক চিন্তন ভুলে '**মায়া গঢ় খূব বজার**'-এই মায়িক বাজারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে '**চার ইয়ার সঙ্গে লগে**'-কাম,ক্রোধ,লোভ এবং মোহ - চারটিই অন্তঃকরণে পুনরায় গজিয়ে ওঠে অর্থাৎ একচুলও ইষ্ট থেকে দূরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এইপ্রকার শব্দগুলির মাধ্যমে যে বিষয় এসেছিল তার আশয় পরিবর্তিত করেছিলাম। এই প্রকারেরই সুযোগ অর্জুনের সমক্ষে দেব সভাতে সেই সময় উপস্থিত হয়েছিল যখন তিনি উর্বশীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। দেবতাদের জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন যে, আমি দেখতে-দেখতে চিন্তা করছিলাম যে মাতা কুন্তী স্বর্গে কেন এলেন? অনেক দিন থেকে মাকে দেখিনি, সেই জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখছিলাম। উর্বশী অর্জুনকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অর্জুন অবিচল ছিলেন। উর্বশী শাপও দিয়েছিলেন কিন্তু যিনি সত্যে আরূঢ় তাঁর কি করে অহিত হবে? অজ্ঞাতবাসকালে সেই শাপও আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল, সহায়ক সিদ্ধ হয়েছিল। এইপ্রকার রূপ তো দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য অর্জুন আশয় পরিবর্তিত করেছিলেন, মাতৃরূপ দেখেছিলেন। এই প্রকার বহু যোগী শব্দ, রূপ, স্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে যে বিষয়গুলি আক্রমণ করে সেগুলিকে '**ইন্দ্রিয়াগ্নিষুজুহ্বতি**'- ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন, আশয় পরিবর্তিত করেন; যা বৈরাগ্য এবং পরমকল্যাণে সাহায্য করে। এই ইন্দ্রিয়াগ্নি বাসনা নিরুদ্ধ করে।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। *(গীতা, ৪।২৭)*

অন্য যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির চেষ্টা এবং প্রাণের ব্যাপারকে অর্থাৎ মন,

বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কারের কার্যকলাপ উত্তমরূপে নিরুদ্ধ করে সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযম রূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন, পরমাত্মাতে স্থিতরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। যিনি পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছেছেন, এ যজ্ঞ তাঁর।

প্রশ্ন- মহারাজজী! উপর্যুক্ত শ্লোকগুলিতে 'অপরে' 'অন্যে' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এমন তো নয় যে এগুলি কয়েক প্রকারের যোগী অথবা যজ্ঞের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। দেব যজ্ঞ যাঁরা করেন তাঁরা এক প্রকারের, ইন্দ্রিয় -সংযম যাঁরা করেন তাঁরা আর এক প্রকারের এবং বিষয়ের আশয় যাঁরা পরিবর্তিত করেন তাঁরা তৃতীয় প্রকারের যোগী?

উত্তর- না, তা নয় । 'অন্যে' অথবা 'অপরে' শব্দ মহাপুরুষ এবং সাধক তুল্য নয় এই বোধ করায় । সবগুলিই একজন সাধকের উঁচু- নীচু অবস্থা। আগে শুরুর অবস্থা তারপর মধ্যের অবস্থা এবং শেষে পরাকাষ্ঠার অবস্থার চিত্রণ উপর্যুক্ত ২৭ শ শ্লোকে করা হয়েছে। প্রারম্ভিক স্তর থেকে পুনরায় প্রারম্ভ করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতা।। *(গীতা, ৪/২৮)*

বহু যোগী '**দ্রব্যযজ্ঞা**'-ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দ্বারা দ্রব্য দান করেন । সৎ পুরুষ , সদগুরুর সেবা, তীর্থে ধনদান এবং ভৌতিক বস্তুর আহুতি ইত্যাদি এরই পর্যায়ে পড়ে। '**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি**' ***(গীতা, ৯/২৬)*** তারা দ্রব্যই তো দান করছে, মহাপুরুষের সেবাই তো করছে। এটাও যজ্ঞ কিন্তু আরও বলছেন- এই যজ্ঞ সবচেয়ে অল্প, কোটি টাকার হলেও। বহু যোগী তপ-যজ্ঞ করেন। যে ইষ্টের চিন্তন করেন, তাঁর সেবায় ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করাকে 'তপ' বলে। ইন্দ্রিয়গুলি সদৈব সুখ কামনা করে, সেগুলিকে ভোগ থেকে সরিয়ে চিন্তন- পথে নিযুক্ত করাই 'তপ-যজ্ঞ'। ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধই তপ-যজ্ঞ। এতে শীত- বাত সহ্য এবং শারীরিক চেষ্টাগুলি শান্ত করার প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য সাধক 'যোগ যজ্ঞ' উত্তমরূপে পালন করেন। 'যোগ' মিলনকে বলে। দুটি বস্তুর মিলনকে যোগ বলে। ঘটি- থালা একসঙ্গে রাখা থাকলে অথবা হাত দেওয়ালকে স্পর্শ করলে যোগ হয়ে যাবে? না, এসব তো জড় পদার্থ মাত্র, দুটো কই? প্রকৃতিতে স্থিত জীবাত্মা, প্রকৃতির অতীত পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করলে সেই দিগ্‌দর্শন এবং একীভাবকে 'যোগ' বলা যেতে পারে। যোগের সঙ্গেই জীবাত্মা এবং অংশের সংজ্ঞা মিটে যায়। শাশ্বত পুরুষ অব্যক্ত মাত্র থাকে। প্রকৃতি পরমপুরুষের

অঙ্কে বিলীন হয়ে যায়, শুধু 'পুরুষ'-এর অস্তিত্ব থাকে। বহু সাধক এই মিলনের জন্য পরিশ্রম করেন। যোগ-এর সমস্ত অঙ্গ এরই অন্তর্গত পড়ে। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এর সাধনের উপর আলোকপাত করেছেন- যেমন নির্জনে বাস, স্থির আসন, সঙ্গ দোষ থেকে আসক্তির অভাব, ইন্দ্রিয়গুলির দমন এবং ব্রহ্মচর্য ব্রতে স্থিতি সম্বন্ধে যৎসামান্য দেওয়া হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বতন্ত্র রূপেও ''অষ্টাঙ্গ যোগ'' এর উপর আলোকপাত করেছেন। বস্তুতঃ যোগ-এর উক্ত নিয়ম সাধনার আধারশিলা, যার উপর চিন্তন এবং নাম-জপরূপ মুখ্য ভবনের নির্মাণ হয়।

অন্যান্য অহিংসাদি তীক্ষ্ণ ব্রতগুলি দ্বারা যুক্ত যত্নশীল পুরুষ 'স্বাধ্যায়' অর্থাৎ নিজের অধ্যয়নের জন্য জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। জ্ঞানযোগীগণ নিজের উপর ভরসা করে কর্ম করেন। জ্ঞান যোগী কে? জ্ঞান যোগীও সেই কর্মই করেন, যার দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।। *(গীতা, ৪/২৯)*

বহুব্যক্তি অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন। আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি তাই প্রাণ, 'অপান' ত্যাজ্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রাণের মাধ্যমে চিন্তনের বিধানের উপর আলোকপাত করেছেন। কিছু-কিছু যোগী শ্বাসগ্রহণ করার সময় 'ওঁ,ওঁ' জপ করেন, শ্বাস গ্রহণ করার সময় অন্য কোন সঙ্কল্প উঠতে দেন না। আবার অনেক যোগী শ্বাস ত্যাগ করার সময় ওঁ জপ-করেন। এবং সাধনা যখন এত তীব্র হয়ে যায় যে, না বাইরে থেকে কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং না অন্তরে সঙ্কল্প উঠতে দেয় তখন '**প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।**' -প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। প্রাণের য়াম অর্থাৎ সর্বথা স্থির হয়ে যায়। এটাই মনের নিরুদ্ধ অবস্থা। এটাই যজ্ঞের পরিণাম এবং তার পূর্ণত্বের স্থান। এখন শুধু লাভ করা বাকী থাকছে।

প্রশ্ন উঠছে যে, সাধক কি যজ্ঞ করতেই থাকবে অথবা কখনও তার যজ্ঞ পূর্ণও হবে ? যজ্ঞের পূর্তিকালে কি লাভ হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে,যখন প্রাণ এবং অপানের গতি রোধ হবে? প্রাণ-এর য়াম হবে, না বাহ্য বায়ুমন্ডলের সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশ করবে এবং না তো সাধকের ভিতরেই সঙ্কল্প উৎপন্ন হবে, চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়ে যাবে- সেটাই যজ্ঞের পূর্তিকাল । মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই জগতের প্রসার, প্রকৃতির আদান-প্রদান ,এর প্রবাহ শান্ত হয়ে যায়। অতঃপর যজ্ঞের পরিণাম দেখা দেয়।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।। *(গীতা, ৪।৩১)*

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যজ্ঞের পরিণাম জ্ঞানামৃত যে যোগী ভোগ করেন **'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্'** সনাতন শাশ্বত পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যান। শাশ্বত ব্রহ্ম যজ্ঞের পরিণাম এটাই। যেখানে পৌঁছে যজ্ঞও শান্ত হয়ে যায়। এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তাই নেই তবে কার অনুসন্ধান করা হবে? আত্মা, যিনি অজর-অমর এবং অমৃতস্বরূপ , বিদিত হন। প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই জ্ঞান বলে। যখন ইষ্টের সাক্ষাৎকার হয় তখন সাক্ষাৎকারের সঙ্গেই যে অমৃতত্ব লাভ হয় তা পান করে যোগী সনাতন শাশ্বত পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

কিন্তু মনে করুন, আমরা যজ্ঞই করলাম না, কি দরকার এত ঝামেলার। মুক্ত যদি না হতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞ রহিত পুরুষের পুনরায় এই মনুষ্য লোকের প্রাপ্তি হয় না, তবে পরলোকের কিরূপে হবে? মানব দেহ লাভ করতে সমর্থ হবে না। সেইজন্য পরলোক প্রাপ্তির তো প্রশ্নই উঠছে না।অতএব এই যজ্ঞ করার অধিকার মনুষ্য দেহধারীর আছে। মানুষ মাত্রের রয়েছে।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্ম জান্‌বিদ্ধি তান্‌সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।(গীতা, ৪। ৩২)

ছোট-ছোট বিধিতে বিভক্ত এইরূপ অনেক প্রকারের যজ্ঞ সম্বন্ধে **'বিততা ব্রহ্মণো মুখে'**- বেদজ্ঞ পুরুষগণ বলেছেন, এই সমস্ত যজ্ঞ তুমি **'কর্মজান্‌বিদ্ধি'**- কর্ম থেকে উৎপন্ন জানবে, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন জানবে। এতে কোন জাগতিক বস্তুর প্রয়োজন হয় না। এখন যদি ইন্দ্রিয়গুলির সংযম, প্রাণে অপানের এবং অপানে প্রাণের আহুতি অথবা প্রাণায়াম পরায়ণ হওয়া কুঠার প্রয়োগ, কাপড়, তেল বিক্রি করলে হয় তবে করুন! নেতা গিরি করলে হয় তবে করুন! কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- কর্ম মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে। এতে ভৌতিক দ্রব্যগুলির কোন উপযোগিতা নেই। তবে কি ভৌতিক দ্রব্যগুলি দ্বারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা ব্যর্থ যায়? কোন-কোন জায়গাতে লক্ষ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হোম করা হচ্ছে? সেসব কি যজ্ঞ নয়? শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কোন কৃত্যকে যজ্ঞের সংজ্ঞা দিচ্ছেন না। সমাজের সামূহিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা -স্থল, মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ, অসহায়দের সহায়তা, দান ইত্যাদি সর্বোপরি যজ্ঞ। সাধু , সন্ন্যাসী তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষদের সেবাতে শ্রদ্ধা অনুসারে বস্তু অর্পণ দ্রব্য যজ্ঞের

পর্যায়ে পড়ে। **'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম'**-ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি যে কিছু নিবেদিত হয়, তা আমি গ্রহণ করি, এটাও যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। (গীতা, ৪।৩৩)

অর্জুন! সাংসারিক দ্রব্যগুলি দ্বারা যে যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, তার থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেয়স্কর কারণ এর পরিণাম প্রত্যক্ষ দর্শন। যজ্ঞের পূর্তিকালে যে অমৃত তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, তা দিগ্‌দর্শন এবং তাতে বিলীন হওয়াকেই জ্ঞান বলে। হে পার্থ! যাবন্মাত্র কর্ম জ্ঞানেই শেষ হয়। এই জ্ঞানলাভ হলে কিছু জানা বাকী থাকে না।

সারাংশতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞ একটি নির্ধারিত ক্রিয়া বিশেষ। যারা শাস্ত্র-বিধি দ্বারা নির্ধারিত অর্থাৎ গীতার নিয়ত বিধি ত্যাগ করে নাম মাত্রের যজ্ঞ দ্বারা দম্ভপূর্বক যজন করে, যজ্ঞ নয় কিন্তু নাম দিয়ে দিয়েছে যে, এটাই যজ্ঞ, এই ধরনের মানুষ নিজের এবং অন্যের দেহে স্থিত আমাকে, পরমাত্মাকে দ্বেষ করে। এইরূপ ক্রুর কর্মা পাপিষ্ঠ নরাধমদের আমি বারংবার ঘোর নরকে অর্থাৎ নিম্ন যোনিতে নিক্ষেপ করি। অতএব গীতার বিধি ত্যাগ করে অন্য কোন বিধি দ্বারা যজ্ঞের নামে কেউ যথেচ্ছাচার করলে ভগবানকে প্রসন্ন করার পরিবর্তে নিজের জন্য অধম যোনিতে জন্ম রক্ষিত করে রাখে। *(গীতা, ১৬।১৫-২০)*

প্রশ্ন - সরকার ! শ্রীকৃষ্ণ তো এটা বললেন না যে, যজ্ঞ কাকে বলে?

উত্তর- বললেন তো! চরাচর জগতই তো আহুতির সামগ্রী। নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসে আহুতি করা যজ্ঞ। যজ্ঞস্বরূপ কোন মহাপুরুষের ধ্যান করা যজ্ঞ। ইন্দ্রিয় সমূহের দমন যজ্ঞ। মনের শমন যজ্ঞ। একাগ্রতা যজ্ঞ । দৈবী - সম্পদ্ শক্তিসম্পন্ন করা যজ্ঞ। শব্দ-রূপ ইত্যাদি বিষয়ের আশয় পরিবর্তিত করে সাধনায় নিরন্তর নজর রাখা যজ্ঞ। চিত্তবৃত্তি চঞ্চল হতে না দেওয়া যজ্ঞ। এই যজ্ঞে আগুন জ্বলে না কিন্তু বস্তু যেরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, ঠিক সেই প্রকার সংযম, প্রাণ অপানের নিরোধ এমন যজ্ঞ যে প্রবৃত্তিগুলি এবং মন তাতে বিলীন হয়ে নিরস্ত হয় এবং মনে স্থিত চরাচর জগতের হোমের সামগ্রী দগ্ধ হয়ে যায়। অমৃত তত্ত্ব প্রকট হয়ে যায়। এর আস্বাদন করে যোগী অমৃত স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মে একীভূত হন- **'যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।'** *(গীতা, ৪।৩১)* সমস্ত যজ্ঞ কর্ম, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হয়। জগতে ভৌতিক দ্রব্যগুলি দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সামান্য ফল প্রদান করে কিন্তু এর প্রয়োজন আছে; কারণ পুরুষার্থ-এর জন্য পুণ্য সঞ্চয় এইসব অনুষ্ঠান দ্বারাই শুরু হয়।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরণাগত হলে, তাঁর একটু আধটু সেবা করলে, তাঁর দ্বারা নির্দেশিত ক্রিয়া নিয়মিত ভাবে করে গেলে যোগ-রত থাকার ক্ষমতা লাভ হয়। সেইজন্য যজ্ঞ-প্রকরণের সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। *(গীতা, ৪।৩৪)*

অর্জুন! সেই যজ্ঞ সম্বন্ধে জানার জন্য কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যাও। উত্তমরূপে প্রণত হয়ে, সেবা কর এবং নিষ্কপটভাবে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞান লাভ কর। সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই পথ ক্রিয়াত্মক। শুধু অধ্যয়ন করলে নয়, পরন্তু অনুষ্ঠান করলেই লাভ হয়। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের মাধ্যমেই আত্মা জেগে ওঠে। তিনিই অন্তরে রথী হয়ে সাধককে সঞ্চালন করে এই সমস্ত যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞান দান করেন।

প্রশ্ন-মহারাজজী! মুক্ত পুরুষদের জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন থাকে না তবে তাঁরা কোন ব্যক্তিকে যজ্ঞ সম্বন্ধে কেন উপদেশ করবেন?

উত্তর- না, তারা করবেন! লোক-শিক্ষা তাঁদের কর্তব্য । যদি তাঁরা পথ প্রদর্শন না করেন তবে লোকই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং তাঁরা বর্ণসঙ্করের কর্তা হবেন। এর অতিরিক্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত বিচার ধারাগুলির সমীক্ষা করে নিজের মত প্রকাশ করছেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। এই কর্ম বিবেকী পুরুষদেরও পরম পবিত্র করে; মহাপুরুষদের জন্যও উপযোগী -পরহিত এর জন্য।

অতএব যজ্ঞের ক্রিয়াত্মক জ্ঞানের জন্য তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের শরণ, তাঁদের সেবা, সান্নিধ্য, সৎসঙ্গ, দর্শন, স্পর্শ নিতান্ত আবশ্যক।

।।ওঁ।।

কর্ম

প্রশ্ন-মহারাজজী! শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বিভিন্ন জায়গায় কর্ম করার উপর খুব জোর দিয়েছেন। সেই কর্ম কি?

উত্তর- দেখুন, প্রত্যেক মহাপুরুষের দৃষ্টিতে কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল আরাধনা-

করম এক আরাধনা, জেহি বিধি রিঝৈ রাম।
সো করতা করনী করৈ, পল পল পলটত নাম।।

একমাত্র আরাধনাই কর্ম। সেই প্রক্রিয়াই কর্ম যার দ্বারা রাম এর প্রসন্নতা অর্জন হয়, তিনি অনুকূল হন। তিনিই সেই কর্ম বিশেষের কর্তা, যিনি ক্ষণে-ক্ষণে নাম উচ্চারণ এবং তাঁর স্মরণ করেন। আদি শঙ্করাচার্যের মান্যতা হল- **'ক্বা কর্ম যৎপ্রীতি করং মুরারে।'**-কর্ম কাকে বলে? যার দ্বারা ভগবানের চরণ কমলে অটুট প্রীতির সঞ্চার হয়। ''গোস্বামী তুলসীদাসজীর অনুসারে-

সো সুখু করমু ধরমু জরি জাউ।
জহঁ না রাম পদ পঙ্কজ ভাউ।। ***(মানস, ২/২৯০/১)***

সেই সুখ, কর্ম, ধর্ম চুলোয় যাক, যেগুলিতে লিপ্ত হলে ভগবান রামের চরণ কমল এর প্রতি স্নেহ থাকে না। তাৎপর্য এই যে, একমাত্র ভগবানের চরণ কমলের প্রতি অনুরাগ। যে ক্রিয়া দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি হয়, সেটাই কর্ম। ঠিক এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে কর্মের শুদ্ধ অর্থ হল- আরাধনা।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন সমুদায়কে দেখে অর্জুন অধীর হয়ে উঠেছিল। আঠারো অক্ষৌহিনী জনসমূহে অর্জুন শুধু-নিজের পরিবার, মামার পরিবার এবং শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের দেখতে পেয়েছিল। সকলেই কি অর্জুনের আত্মীয়ই ছিলেন। বাস্তবে অনুরাগই অর্জুন। প্রত্যেক অনুরাগীর সমক্ষে এই সমস্যাই উৎপন্ন হয়। চিন্তন পথে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তো প্রবল অনুরাগ দেখা যায় কিন্তু যখন লৌকিক সম্বন্ধগুলি ত্যাগ করার স্তরে সাধক পৌঁছান, তখন অধীর হয়ে ওঠেন। সেই সময় পরিবার, মাতুলালয়, বন্ধু এবং গুরুজনদের প্রতি মোহ তাকে ঘিরে ধরে । যখন অনুরাগী গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর জন্য ঘরের লোক বলে আর কেউ থাকে না। এবং ঘরের লোকের দৃষ্টিতে সাধকও বেঁচে থাকেন না। সেই সময় প্রবল মোহে সাধক বিচলিত হয়ে ওঠেন। অর্জুনও নিজের পরিজনদের মৃত্যুর মুখে উপস্থিত দেখে বলেছিল - আমি যুদ্ধ করব না। নিজের আত্মীয়দের বধ করে আমি সুখী কিরূপে হব? এইভাবে

তো কুল- ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কুল-ধর্ম শাশ্বত ধর্ম, সনাতন, পুরাতন। এই প্রকার যুদ্ধ হলে পিন্ড-পরম্পরা লুপ্ত হবে, কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হবেন; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। বর্ণসঙ্কর কুল এবং কুল ঘাতকদের নরকে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছে। এই প্রকার নিজেকেই নয় অপিতু শ্রীকৃষ্ণকেও লাঞ্ছিত করল যে, আপনিও পাপ করতে যাচ্ছেন। অবশেষে স্পষ্ট করে বলেছিল যে-"গোবিন্দ! আমি কদাপি যুদ্ধ করব না।" বলে রথের পশ্চাৎভাগে বসে পড়েছিল।

অর্জুন যদি যুদ্ধ না করে তবে যুদ্ধের প্রশ্নই উঠছে না, কারণ তার উপরেই গোটা মহাভারত আধারিত। পান্ডব পক্ষে অর্জুন ছাড়া কোন এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নেই, যার উপর যুধিষ্ঠির নির্ভর করতে পারবেন- **'পল লাগত অর্জুন হতেঁ ছুএ না দূজো বান।।'** সেইই তো একমাত্র বিশিষ্ট যোদ্ধা ছিল। সেই অধীর অর্জুনকে শুধু কর্মের শিক্ষা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই কর্ম নির্ধারিতই শুধু করলেন না পরন্তু সেই পথে অর্জুনকে চালিতও করেছিলেন। অতএব একথা বিচারণীয় যে, সেই কর্মটা কি? অর্জুন আগেই বলে দিয়েছিল যে, পৃথিবী এবং স্বর্গের নিষ্কন্টক ধনধান্য সম্পন্ন সাম্রাজ্যের প্রভু হলেও আমি সেই উপায় দেখছি না, যা আমার ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করতে পারে। যদি এইটুকুই মাত্র লাভ হবে, তবে ক্ষমা করুন। হ্যাঁ যদি এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্য আছে তবে আপনি সে সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্যের উপর আলোকপাত করলেন যে, আত্মাই সত্য, আত্মা পরম সত্য। শাশ্বত এবং সনাতন। অজর-অমর এবং সর্বব্যাপক; কিন্তু অজর-অমর কোন সত্তাকে তো দেখা যায় না। প্রায়ই শোক, মোহ, সন্তাপ ইত্যাদিই দেখা যায়। তারপর যে আত্মা সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত, তাহলে অনুসন্ধান কার করা হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! আত্মাকে এই রূপে শুধু তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন, সকলে দেখেননি। এই আত্মা অচিন্ত্য যতদিন চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, জানা সম্ভব হয় না। কোন বিরল মহাপুরুষই একে জানেন। কোন বিরল ব্যক্তিই আশ্চর্যের মত শ্রবণ করে। সকলে শোনেও না, জানেও না কারণ ক্রিয়া কি তা'ই জানে না। সেইজন্য অর্জুন! তুমি একে লাভ করার জন্য যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয়ের জন্য এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন কর্তব্য নেই।

প্রশ্ন- মহারাজজী ! অর্জুন যদি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সাধক ছিল, তবে তার পরিজনদের প্রতি মোহ হওয়া উচিত ছিল না?

উত্তর - দেখুন, শাস্ত্রের রচনা উত্তরপুরুষদের পথ- প্রদর্শনের জন্যই করা

হয়। যে সম্মুখে দাঁড়িয়ে, সে তো ভব পার হয়েই যাবে। লিপিবদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল? গীতার সমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণ এর প্রচার-প্রসারের নির্দেশও দিয়েছেন। বস্তুতঃ অর্জুনকে নিমিত্ত বানিয়ে তিনি প্রত্যেক সাধকের সমস্যার সমাধান প্রস্তুতঃ করেছেন। অর্জুন আজ ক্ষত্রিয়, কিন্তু কখনও তো আরম্ভিক স্তরের ছিল। আরম্ভিক স্তরে অনুরাগীর সমক্ষে পরিবারের সমস্যা উপস্থিত হয়। স্বজনদের ত্যাগ খুব কষ্টকর, অতএব সেখান থেকেই গীতার প্রারম্ভ শ্রীকৃষ্ণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছিলেন যে, পার্থ! এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের জন্য উন্মুক্ত স্বর্গ দ্বার । এর থেকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের জন্য অন্য কোন ধর্ম নেই। যদি যুদ্ধ না কর তবে শত্রু মনে করবে যে তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছ। যারা সম্মান করে তাদের নজরেও ছোট হয়ে যাবে। পরাজয় হলে স্বর্গ লাভ করবে এবং বিজয়ী হলে '**ভোক্ষ্যসে মহীম্**'- মহামহীম্ স্থিতি লাভ করবে।

প্রশ্ন - কিন্তু মহারাজজী ! 'মহীম্'- এর মানে তো পৃথিবী?

উত্তর- *ঠি*কই, পৃথিবীকেও মহী বলে। সকলের উদর - পোষণ করে, মহিমা অনেক, সেই জন্য এর এক নাম মহীও; কিন্তু সবচেয়ে বেশী মহিমা তো সেই মহান মহিমাময় - এর, যেখান থেকে মহিমা প্রসারিত হয়- '**মহিম্নঃ পারান্তে**'- যার মহিমা অপার, শ্রীকৃষ্ণ সেই মহীম্ স্থিতির প্রলোভন দিয়েছেন। অর্জুন আগেই ত্রৈলোক্যের রাজ্য অস্বীকার করেছে। সে এর থেকেও শ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করতে চায় অতএব শুধু পৃথিবীর ভোগ গুলির প্রলোভন শ্রীকৃষ্ণ কেন দিতেন এবং অর্জুন কেন এটুকু পাবার জন্য রাজীই হয়ে যেত? প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটা এমন যুদ্ধ যা মহামহীম্ স্থিতি প্রদান করে।

অতএব জয়ী হলে সর্বস্ব লাভ করবে এবং পরাজয় হলে দেবত্ব লাভ করবে। সারা জীবন দৈবী সম্পত্তিই অর্জন করেছ, দেবত্বই লাভ করবে। এই ভাবে লোকসান এবং লাভ, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধ কর।

অর্জুন! এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞান যোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন বুদ্ধি? এই যে 'যুদ্ধ কর'। নিজের লোকসান -লাভ বিবেচনা করে যুদ্ধ করাটাই 'জ্ঞানযোগ'।

প্রশ্ন- কিন্তু মহারাজজী! কয়েকজন টীকাকার লিপিবদ্ধ করেছেন যে "আমি জ্ঞানী? আমি পূর্ণ, আত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত, ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব বিষয়ে লিপ্ত।"এইরূপ চিন্তা করা জ্ঞানযোগ ।

উত্তর- এইরূপ কি করে হবে? গতকালের গৃহত্যাগী আজ পূর্ণ তা কি করে হবে? হৃদয়ে তো কাম, ক্রোধ ভর্তি; চেয়ে দেখলেই সচ্চিদানন্দঘনকে দেখতে পাবে? টীকাকার যাই লিখুন, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলছেন না। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে আত্মাকে অজর, অমর, অবিকারী, অচল এবং সনাতন বলেছেন সেখানে একথা বলেননি যে, এটা জ্ঞান যোগ। শ্রীকৃষ্ণ তো সেখানে বলেছেন যে, আত্মাকে এই বিভূতিগুলি দ্বারা যুক্ত শুধু তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন যে,“ অর্জুন! যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা বন্ধু হয়ে যায় এবং যে পুরুষ মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করেননি তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা শত্রু হয়ে যায়; অধোগতি এবং নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে। অর্জুন! মানুষের নিজের আত্মাকে উদ্ধার করা উচিত,তাকে অধোগতিতে যেন না নিয়ে যায়।” কে বলে যে, আত্মা অজর- অমর এবং শাশ্বত? এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আত্মা অধোগতিতে যায়। আত্মার উদ্ধার হয়। জ্ঞানযোগীগণ একথা তো মুখস্থ করে নিয়েছেন যে, আমি পূর্ণ কিন্তু তাদের এটা কেন মনে নেই যে, আত্মা অধোগতিতে যায়। বস্তুতঃ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করলেই আত্মদর্শন সম্ভব। সেজন্য কর্ম তো করতেই হবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকা জ্ঞানযোগ নয়।

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। *(গীতা, ২।৩৯)*

অর্জুন! এ পর্যন্ত এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞান যোগের বিষয়ে বলা হয়েছে, একেই এখন তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম-বন্ধন থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। দুটিতেই ক্রিয়া একটাই। শুধু কার্য প্রণালীর, বুদ্ধির পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞান যোগে নিজের লাভ- লোকসান নিজে বিচার করতে-করতে যুদ্ধ করা হয় পরন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে সাধক ইষ্টের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করে। তার লাভ লোকসানের বিচার ইষ্ট করেন। অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভ অর্থাৎ বীজের নাশ হয় না। এর অল্পও সাধন করা থাকলে, এই ক্রিয়া শুধু শুরু করে দিলেই হল, মায়ার কাছে এমন কোন যন্ত্র নেই, যা সেই সাধন নষ্ট করতে পারে। মায়া আবরণ চড়াতে পারে, দেরী করতে পারে, এর বেশী কিছু না। কাকভুশুণ্ডির দশ হাজার জন্ম বিলম্ব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ দশ জন্ম ধরে যোগী ছিলেন। মহারাজজী অনুভবে দেখেছিলেন যে তিনি সাত জন্ম ধরে সাধু ছিলেন। অতএব এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্প মাত্র আচরণও জন্ম- মৃত্যুর মহাভয় থেকে

উদ্ধার করেই ছাড়ে। "**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্**"। *(গীতা, ৬।৪৫)* শিথিল প্রযত্নশীল সাধকও অনেক জন্মের পর সে স্থানেই পৌঁছায় যাকে পরমগতি অথবা পরমধাম বলে। এই সাধন সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও করা যেতে পারে, উচ্চ সোপানে পৌঁছালে তো ভগবান স্বয়ং বলবেন যে, এখন ত্যাগ কর। সেই সময় ত্যাগ করার ক্ষমতাও হবে। আজ আমরা যে জিনিষ ত্যাগ করতে চাইছি না, সেই স্তরে পৌঁছালে এসব স্পর্শও করতে চাইব না। এই নিষ্কাম কর্মযোগে সীমিত ফলরূপ দোষও নেই যে, ঋদ্ধি- সিদ্ধি অথবা স্বর্গ পযর্ন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে। এর অল্প আচরণও জন্ম -মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করেই শান্ত হয়।

কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একটাই। ক্রিয়া এক, দিশা এক, তবে যাঁরা বহু ক্রিয়া সম্বন্ধে বলেন, তাঁরা কি ভজনা করেন না ? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- তারা ভজনা করে না। অজ্ঞানীদের বুদ্ধি অনন্ত শাখাযুক্ত, সেই জন্য ভজনের আড়ালে বহু ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। এইরূপ ব্যক্তিদের প্রভাব যাদের উপর পড়ে, তাদেরও বুদ্ধি নাশ হয়। এইরূপ ব্যক্তি স্বর্গকেই পরমশ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং আপাত মধুর বাণীতে বেদের সেই বাক্যগুলিতে অনুরক্ত থাকেন যাতে ভোগবিলাসে বৃদ্ধি হয়। প্রমাণিত হচ্ছে যে, কর্মের নামে প্রচলিত কর্মকান্ড কর্ম নয়। ফলাকাঙ্ক্ষা করে যে কর্ম করা হয়, তা কর্ম নয়।

অর্জুন ! তুমি ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ো না। কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্মের প্রতি তোমার মনে যাতে অশ্রদ্ধাও উৎপন্ন না হয় । নিরন্তর করার জন্য তৎপর হও। এই কর্মে বুদ্ধি ইষ্টের অধীন করে রাখা উচিত। সেইজন্য নিষ্কাম কর্ম যোগকে বুদ্ধি যোগও বলে। এতে কামনা লেশমাত্র থাকে না, সেইজন্য একে নিষ্কাম কর্মযোগ বলে। ক্রমশঃ এই কর্ম ইষ্টের সমান স্থিতি প্রদান করে, সেইজন্য সমত্ব যোগ বলে। অর্জুন ! এই নিষ্কাম কর্মযোগে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনের নিরোধের খুব মহত্ত্ব আছে। কারণ বিষয়ে বিচরণশীল যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন ধাবিত হয় সেই একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ই এই অযুক্ত মনকে অপহরণ করে এবং ঠিক সেই ভাবেই আছড়ে ফেলে যেভাবে বায়ু নৌকা অপহরণ করে। সেইজন্য মহাবাহো ! ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে কর্ম কর।

অর্জুনের কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ সরল মনে হয়েছিল। জ্ঞানমার্গে লাভ- লোকসান এর স্বয়ং বিচার করে অনুরাগী নির্ণয় গ্রহণ করে। সাধনা সম্পূর্ণ হলে মহামহিম্ স্থিতি লাভ হয় এবং তার আগে দেহের সময় ফুরিয়ে গেলে দেবত্ব লাভ

হয় কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে শুধু কর্ম করার অধিকার আছে, ফলে নেই। এটা তো নিশ্চিত যে, কখনও না কখনও আমরা বন্ধনমুক্ত হব; কিন্তু কখন হব, এখন তা নিশ্চিত নেই। শুধু কর্ম কর! এইরূপ ভাবো যে, ফলই নেই কিছু লাভ হবে না। এবং কর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাও যাতে না হয় কে বৃথা পরিশ্রম করবে! হ্যাঁ অবশেষে কখনও কল্যাণ হবে। এর থেকে ভাল তো জ্ঞানযোগ যাতে সাধক নিজের গতি-প্রগতি দেখে এগিয়ে চলে। সেইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছে-

জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।। ***(গীতা, ৩/১)***

''ভগবন! যদি নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত তবে আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? কর্ম অর্জুনের ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। আপনি মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি কেন মুগ্ধ করছেন? কৃপা করে উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমি পরম কল্যাণের অধিকারী হই।'' অর্জুন পরম কল্যাণের ইচ্ছুক ছিল।

ভগবান বলছেন- অর্জুন! দুইপ্রকারের নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। আগের তাৎপর্য সত্য অথবা ত্রেতাযুগ নয় পরন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলেছি। তা শুনেই তো অর্জুনের মনে প্রশ্ন উঠেছিল। অর্জুন! আমি দুই প্রকারের নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছি-জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবৎ যোগীদের নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা; কিন্তু কোন মার্গেই কর্ম ত্যাগ করার বিধান নেই। কর্ম তো যে কোন দশাতে করতেই হবে। কর্ম না করে যদি কেউ ভাবে যে, নৈষ্কর্ম্যের পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেবে, তা হবে না। নিষ্কর্মের আশয় অকর্মণ্য নয়। অল্পও কর্ম করল না আর নিষ্কর্মী হয়ে গেল কেউ এইরূপ ওজর না করে সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করছেন যে, অর্জুন! কর্ম না করলে না কেউ নিষ্কর্মতা প্রাপ্ত হয় এবং আরম্ভ করা ক্রিয়া ত্যাগ করলে না কেউ সন্ন্যাসের পরম সিদ্ধি লাভ করে। বহু ব্যক্তি বলে- আমরা তো জ্ঞানী, আগুন স্পর্শ করি না, আমাদের জন্য ভজনের বিধান নেই। শ্রেষ্ঠ কোন পরমাত্মা নেই তবে, কাকে ভজনা করব? 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি । প্রাপ্তির পর এইরূপ ভাব ঠিক, কিন্তু কর্ম না করে কেউ লাভ করে না। শ্রীকৃষ্ণ জোর দিচ্ছেন যে, ক্রিয়া ত্যাগ করে না কেউ নিষ্কর্মী হতে পারে এবং না সন্ন্যাসের পরম সিদ্ধিই লাভ করে। এখন আপনার জ্ঞানযোগ অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ যা ভাল লাগে, কর্ম তো যে কোন দশাতে করতেই হবে কারণ কোন পুরুষ ক্ষণমাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন- মহারাজজী! চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যজ্ঞের পূর্তিকালে যে যোগী জ্ঞানামৃত পান করেন, তিনি সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হন। সমস্ত কর্মের জ্ঞান পরাকাষ্ঠা। জ্ঞানে সমস্ত কর্ম বিলীন হয়। এইপ্রকারের পুরুষ কর্ম করতে পারেন না এবং এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, জ্ঞানযোগ অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ যা ভাল লাগে; কর্ম তো করতেই হবে। এই প্রকার বিরোধাভাস কেন?

উত্তর- শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-"**কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।** *(গীতা, ৩।৫)* -প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ পরবশ জীব যে কোন অবস্থাতে ক্রিয়াশীল থাকে। যতক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, ততক্ষণ কোন না কোনরূপে কর্ম তো করতেই হবে। প্রকৃতির আশ্রিত পুরুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না কিন্তু যখন '**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্**' *(গীতা, ৪।১৯)*- জ্ঞানে কর্ম বিলীন হয় তখন প্রকৃতি বিলীন হয়ে যায়; সেইজন্য সেই পুরুষ দ্বারা কর্ম হয় না।

অতএব যতক্ষণ পুরুষ প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, কর্ম করে যেতেই হয়। তা সত্ত্বেও যে বলপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া বন্ধ করে মনে বিষয় চিন্তন করে এবং বলে বেড়ায়- আমি জ্ঞানী, পূর্ণ, পরম তত্ত্বে স্থিত, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- সে দম্ভাচারী, বঞ্চক। অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর!

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।। *(গীতা, ৩।৮)*

একথা প্রমাণিত যে, কর্মের সংখ্যা অনেক, সেগুলির মধ্যে থেকে একটা কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে বলছেন-যে পুরুষ শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে যথেচ্ছাচার করে সে সিদ্ধি লাভ, পরম গতি, সুখ কিছুই লাভ করতে পারে না, সেইজন্য কার্য এবং অকার্যের ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর। কোন্ শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত? অন্য শাস্ত্র সম্বন্ধে এখানে বলা হয়নি; গীতাশাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর! '**গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।**' ***(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩।১)*** কর্ম না করা অপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর, কারণ করলে কিছু দূরত্ব অতিক্রম তো হয়ে থাকবে। কর্ম না করলে দেহযাত্রাও সফল হবে না।

প্রশ্ন- মহারাজজী ! দেহ- যাত্রা-এর অর্থ কি? দেহ- নির্বাহ কি হবে না?

উত্তর - না, আপনি দেহ তো নন! এই জীবাত্মা যুগ-যুগান্তর ধরে দেহ যাত্রা করে আসছে। কীট-পতঙ্গ , দেব - দানব- মানব ইত্যাদি যোনিগুলি এই জীবাত্মা পরিবর্তন করতে থাকে। এই যাত্রা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন শাশ্বত ব্রহ্মে সমাহিত

হয়। যদি অতিরিক্ত একটা জন্মও নিতে হয় তবে যাত্রা তো পূর্ণ হয়নি।

প্রমাণিত হচ্ছে যে, কর্ম আত্মার দেহ-যাত্রা সম্পূর্ণ করে। আত্মাকে অচল স্থিতি প্রদান করে, তারপর দেহ- যাত্রা করার প্রয়োজন হয় না।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নির্ধারিত কর্ম কোনটা ? শ্রীকৃষ্ণ সেই নির্ধারিত কর্মের উপর আলোকপাত করছেন-

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। *(গীতা, ৩।৯)*

যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম । সেই ক্রিয়া কর্ম, যার দ্বারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। '**অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।**' এই যজ্ঞের প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য যা কিছু করা হয়, তা এই লোকেরই বন্ধন । তো কর্ম '**মোক্ষসেহশুভাৎ**' *(গীতা, ৪।১৬)* সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। কর্ম দ্বারাই দেহ- যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। সেইজন্য অর্জুন ! সেই যজ্ঞের পূর্তির জন্য সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে কর্ম কর। সঙ্গ দোষ থাকতে কর্মের আচরণ সম্ভব নয়। সেইজন্য সঙ্গ-দোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে যজ্ঞের পূর্তির জন্য উত্তমরূপে আচরণ কর। এখন একটা নতুন প্রশ্নের উদয় হচ্ছে যে, যজ্ঞ কাকে বলে যার প্রক্রিয়াই কর্ম ? কর্ম তা যার দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তবে কোন্ ক্রিয়া সেই যজ্ঞ ? যজ্ঞ কাকে বলে ? সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপ ? যজ্ঞের উৎপত্তি এবং বিশেষত্বগুলির সবিস্তারে নিরুপণ করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- এই যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব বৃদ্ধি কর। দৈবী সম্পদ্ যেমন-যেমন শক্তিসম্পন্ন হবে, তেমন-তেমন তোমার উন্নতি হবে। এই প্রকার ক্রমশঃ পরস্পর উত্থান করতে-করতে পরম কল্যাণের অধিকারী হও। এই যজ্ঞ পরমকল্যাণের কম কিছু প্রদানই করে না। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, বহু ব্যক্তি দেবযজ্ঞ করে, দৈবী সম্পত্তি শক্তিসম্পন্ন করে তোলে। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম,একাগ্রতা, ধ্যান, সমাধি, চিন্তনের প্রবৃত্তি-এগুলিই দৈবী সম্পত্তি (ষোড়শ অধ্যায়ে যে সম্বন্ধে বিশদ বিবেচনা করা হয়েছে।) এই গুণগুলির চিরকালের অধিকারী হওয়ার জন্য সাধনা করা হয়। অন্যান্য যোগী ইন্দ্রিয়গুলির বহির্মুখী প্রবাহকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন বহু সাধক শব্দাদি বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়গুলিতে আহুতি দেন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি নিজের যে মনোভাব তা পরিবর্তন করেন। বহু যোগী যোগ-যজ্ঞ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা এই যজ্ঞই করেন আবার অনেকে স্বাধ্যায় জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা নিজের ভাল-মন্দ, লাভ লোকসান স্বয়ং নির্ণয় করে এই যজ্ঞের আচরণ করেন। জ্ঞানযোগী আত্মনির্ভর করে থাকেন পরন্তু নিষ্কাম কর্মযোগী ইষ্টের

উপর নির্ভর করে সেই ক্রিয়াই করেন। যজ্ঞ একটাই; কর্তা দুই প্রকারের। বহু যোগী প্রাণকে অপানে এবং অনেকে অপানে প্রাণের আহুতি দেন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের চিন্তন করেন। বহু যোগী প্রাণ- অপানের গতি রুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। প্রাণের গতি স্থির হয়ে যায়, সর্বথা নিরোধের অবস্থা চলে আসে। না অন্তরে সঙ্কল্প জাগে না বাহ্য বায়ুমন্ডলের সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এই যজ্ঞের প্রক্রিয়াতে চরাচর জগতই আহুতি সামগ্রী । বিশ্ব তো অনেক বিশাল কিন্তু মানুষের জন্য ততটাই বিস্তৃত যতটা তার মনে অঙ্কিত। মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে- সঙ্গে জগৎ জয় করা সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, **'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ**।' যাঁদের মনে সাম্যভাব চলে এসেছে, সেই পুরুষগণ জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন। কেন? মনের স্থিতির সঙ্গে সংসার জয়ের কি সম্বন্ধ? তা হল **'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ''**।*(গীতা, ৫।১৯)* ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, এদিকে মনও সমভাব-এ স্থিত সেই জন্য ব্রহ্মে স্থিত হয়ে যায়। তার মন থেকে সংসার মুছে যায়। এই প্রকার যখন প্রাণ অপানের গতি নিরুদ্ধ হয়, সঙ্কল্প শান্ত হয়ে যায়; অর্থাৎ সেটা মনের নিরুদ্ধ অবস্থা । নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই যজ্ঞের পরিণাম বেরিয়ে আসে। '' **যজ্ঞশিষ্টামৃত ভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**।।*(গীতা ৪।৩১)*। যজ্ঞের পরিণাম স্বরূপ যে জ্ঞানামৃত উৎপন্ন হয়, তা পান করে যোগী সনাতন ব্রহ্মে একীভূত হন। এই যজ্ঞের পূর্তিকালে মনের সম্পূর্ণ নিরোধ এবং নিরোধের সঙ্গেই সেই পরমাত্মা যে- যে বিভূতি এবং যে- যে গুণ ধর্মে যুক্ত; বিদিত হন। সাক্ষাৎকারকেই জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞানামৃত পান করে যোগী সনাতন, শাশ্বত ব্রহ্মে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যান। অর্জুন! এই সমস্ত যজ্ঞ মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হয়। তবে কি এই যজ্ঞে চাল, তিল, ঘী এর প্রয়োজন হয় না? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -না! ভৌতিক বস্তু দ্বারা সিদ্ধ যজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম রয়েছে। সেটাও যজ্ঞ, উপযোগিতাও রয়েছে কারণ শুরু হয় সেখান থেকেই কিন্তু এই যজ্ঞগুলির তুলনাতে খুবই কম আছে। যে যজ্ঞগুলির উপর শ্রীকৃষ্ণ জোর দিয়েছেন, সে সবই তাঁরই বাণী অনুসারে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। *(গীতা, ৪।৩২)*

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হোম যদি কুঠার প্রয়োগ করলে সিদ্ধ হয়, তবে করুন । প্রাণ-অপান-এর গতি রুদ্ধ কাপড় বিক্রি করলে হয় তবে করুন। চাকরী অথবা নেতাগিরি করলে হয় তবে করুন। একথা প্রমাণিত যে, জগতে যা কিছু করা এবং করানো হয়, যাতে মানুষ দিবা -রাত্রি ব্যস্ত থাকে; কর্ম নয়। তা এই লোকেরই

বন্ধন। যজ্ঞের ক্রিয়াই কর্ম অর্থাৎ কর্মের তাৎপর্য হল আরাধনা। এই আরাধনাতে বহু যোগী দেবযজ্ঞ করেন। অনেকে জ্ঞানযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ করেন আবার কেউ প্রাণ-এর অপান-এ এবং অপান-এর প্রাণ-এ আহুতি দেন। মনে হয় এঁরা বিভিন্ন ধরনের যোগী; কিন্তু না, এ সবই একটা সাধনারই উঁচু-নীচুঁ অবস্থা। প্রত্যেক সাধককে এই সমস্ত ভূমিকা গুলি পার করতে হয়। শুরুতে প্রত্যেক সাধক দৈবী গুণগুলি শক্তিসম্পন্ন করে তোলে। ক্রমে সাধক সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। অতঃপর শব্দাদি সঙ্গ-দোষগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার যুক্তি লাভ করে। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ প্রবেশ করে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হলেই মন বিলয়ের স্থিতিতে যজ্ঞের পরিণামে পৌঁছায়। এসমস্ত একজন সাধকেরই উঁচু-নীচু অবস্থা । এই প্রকার যিনি বিদিত, তিনি যজ্ঞের রহস্যের জ্ঞাতা। এই সমস্ত যজ্ঞ মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তঃ ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ হয়, ভৌতিক দ্রব্যগুলির উপযোগিতা নেই। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মতে আরাধনাই কর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন ! কর্ম কাকে বলে ? অকর্ম কোন্‌টা ? বিকর্ম কোন্‌টা ? এবিষয়ে বড়-বড় বিদ্বান্‌ও ভ্রমিত সেই জন্য কর্মের সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব, যা জেনে তুমি সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে (গীতা ৪।১৬)। কর্ম এমন প্রক্রিয়া যা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে। কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম তিনটিরই স্বরূপ জানা উচিত। কর্মের গতি গহন। কর্মে অকর্ম দেখা উচিত অর্থাৎ আরাধনা অবশ্যই করুন কিন্তু এটা চিন্তা করবেন না যে, আমি আরাধনা করি। যিনি করান তিনি তো পৃথক সত্তা। বলদ চাষ করে না যদিও লাঙ্গলের সমস্ত ভার বলদ দুটির কাঁধের উপরেই থাকে। চাষ তো কৃষক করে যে বলদের পিছনে থেকে দিশা নির্দেশ দেয়, বলদ কী জানে কিভাবে চাষ করতে হয়। এই প্রকার সাধনা শুরু থেকে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সাধককেই করতে হয়। কিন্তু সে যতটুকু করতে সমর্থ হয়, তা সেই প্রেরকেরই কৃপা; সঞ্চালকেরই কৃপা। ভজনা তো স্বয়ং হরি করেন। সাধক তো যন্ত্র মাত্র। তিনি যেদিকে সঙ্কেত করবেন সেদিকে গেলেই হল; এটাই ভজনা এই প্রকার কর্মে অকর্ম দেখার ক্ষমতা লাভ হলে সেটাকেই তুমি কর্ম জানবে। কর্মে অকর্ম দেখবে এবং অকর্মকে (ইষ্টের আদেশগুলিকেই) কর্ম জানবে। এই প্রকার যিনি করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই সমস্ত কর্মের কর্তা। যিনি শুধু ইষ্টের আদেশ অনুসারে চলেন, তিনিই সমস্ত কর্ম করেন, যার দ্বারা সামান্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। কর্ম এবং অকর্ম থেকে উন্নত স্থিতি বিকর্মের। বিকর্ম

অর্থাৎ বিশেষ কর্ম অর্থাৎ যা তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষগণ দ্বারা লোকহিতের জন্য সম্পাদিত হয়। 'বি' উপসর্গ এখানে বিশিষ্টতার দ্যোতক, যেমন - জিতেন্দ্রিয় - এতে 'বি' উপসর্গ প্রয়োগ করা হলে বিজিতেন্দ্রিয় শব্দ রচিত হয়েছে, যার অর্থ হল বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয়। এই প্রকার বিকর্ম অর্থাৎ বিশেষ কর্ম। প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ দ্বারা সম্পাদিত বিশিষ্ট কর্মই বিকর্ম।

প্রশ্ন উঠছে যে, সাধক সদৈব কর্ম করতে থাকবে অথবা কখনও মুক্তও হবে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পন্ডিতং বুধা ঃ।। *(গীতা, ৪/১৯)*

যে ক্রিয়া সর্বতোভাবে শুরু করা হয়, লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না, ক্রমশঃ উত্থান হতে-হতে এত সূক্ষ হয়ে যায়, যেখানে কাম এবং সঙ্কল্প থাকে না। কাম এবং সঙ্কল্পগুলির নিরোধ হওয়াই মনের বিজিতাবস্থা। মনের প্রসারই তো জগৎ ছিল। যখন মন নিরুদ্ধ হয় তখন, সেই অব্যক্ত, শাশ্বত, পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। প্রত্যক্ষভাবে জানাকেই জ্ঞান বলে। '**জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্**" - জানার সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম সদা সর্বদার জন্য দগ্ধ হয়। এই প্রকার স্থিতি প্রাপ্তদের বোধস্বরূপ মহাপুরুষগণ পন্ডিত এবং জ্ঞাতা বলে সম্বোধিত করেছেন। একথা প্রমাণিত যে কর্ম মনকে কামনা এবং সঙ্কল্প-এর -উর্ধ্বে নিয়ে যায়। সাংসারিক ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হলে কামনা বৃদ্ধি পায়। অতএব আরাধনাই বাস্তবিক কর্ম যেখানে সাক্ষাৎ জানার পর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না। সেইজন্য কামনাগুলিও থাকে না।

যোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- অর্জুন ! সংসারে মানুষ দুইপ্রকারের - এক দেবতাদের মত; দুই অসুরদের মত। কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- অন্তঃকরণে দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান দৈবী সম্পদ্ এবং আসুরী সম্পদ্। আসুরী সম্পদ্ অধোগতি এবং নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে, পরন্তু দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণ করে। ইন্দ্রিয়গুলির দমন, মনের শমন, একাগ্রতা,সরলতা, সঠিক জ্ঞান নিরন্তর চিন্তন, ধ্যান, সমাধি এই প্রকার দৈবী সম্পদের চব্বিশটি লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন যে সমস্ত-গুণ ঈশ্বরের সমীপস্থ মহাপুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব। আংশিকরূপে আপনার মধ্যেও রয়েছে। অর্জুন! তুমি দৈবী সম্পদ্ লাভ করেছ। শোক কোরো না! তুমি আমাতে নিবাস করবে। তদনন্তর,শ্রীকৃষ্ণ আসুরী সম্পদ -এর সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। কাম, ক্রোধ, মোহমদ, মৎসর ইত্যাদি আসুরী সম্পদ্। আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষ

ভাবে যে আমার কাছে এত সম্পত্তি আছে, ভবিষ্যতে আরও এত হবে। আমিই ঈশ্বর এবং ঐশ্বর্যের ভোক্তা। ঈশ্বর নামের আর কোন সত্তা নেই। স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই যা কিছু উৎপন্ন হয়, এটাই সত্য। আমি যজ্ঞ করব, দান করব আমার দ্বারা সেই শত্রু নিহত হয়েছে, ভবিষ্যতে আমি অমুককে হত্যা করব- অর্জুন! এই প্রকার যারা চিন্তা করে তারা অন্যের দেহে স্থিত আমাকে কৃশ করে। তারা শত্রুদের বধ করে না পরন্তু আমাকে দ্বেষ করে ।অর্জুন! এই ধরনের মানুষদের আমি বারংবার অধম যোনিতে নিক্ষেপ করি। তারা আমাকে লাভ না করে, যা লাভ করেছে অর্থাৎ মনুষ্যদেহ, এর থেকে অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তবে কি অর্জুন যুদ্ধ করেছিল? যদি সে প্রতিজ্ঞা করে কাউকে বধ করত, সাংসারিক কার্যে অনুরক্ত থাকত তবে শ্রীকৃষ্ণ-এর হৃদয়ে কখনও নিবাস করত না। কর্ম তো সংসার -বন্ধন থেকে মুক্ত করে। অধম যোনিতে নিক্ষেপ করে না।

দৈবী সম্পদ্ পরমদেব পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে গঠিত হয় কিন্তু আসুরী সম্পত্তির আধার কি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-''অর্জুন! কাম, ক্রোধ এবং লোভই নরকের তিনটি দ্বার এগুলির উপরই আসুরী সম্পত্তি টিকে আছে। এই তিনটি ত্যাগ করলে তবেই কর্ম শুরু হয় যার দ্বারা পরমগতি, পরম কল্যাণ হয় (গীতা ১৬।২২)। কর্ম সেই প্রক্রিয়া, কাম-ক্রোধ -লোভ ত্যাগ করলেই এতে প্রবেশ হয়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! যখন কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ করলে তবেই কর্ম আরম্ভ হয়, তবে তো সাধারণ মানুষের জন্য কর্মের বিধান থাকা উচিত নয়, কারণ শুরুতে এগুলি আমরা ত্যাগ করতে পারি না, শুধু স্বীকার করে নিলে ত্যাগ করা তো হয় না?

উত্তর- হ্যাঁ! শুরুতে ত্যাগ করতে তো পারি না কিন্তু এটাই তো যুদ্ধ। ত্যাগ করার জন্যই তো সাধনা করা হয়। সংসার এতেই অনুরক্ত এবং আপনি তাই ত্যাগ করতে চাইছেন, এ কি কম কথা? যেমন- যেমন এই বিকারগুলি কমতে থাকবে, তেমন-তেমন কর্মে প্রবেশ হবে। বিচার যোগ্য তো এই যে, যা কিছু কার্য করা হয়, জগৎ যাতে মোহিত, দিবা রাত্রি ব্যস্ত , সেসব কি কর্ম? জগতে যে যত সফল, কাম-ক্রোধ এবং লোভ তার ভিতর সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এই তিনটি ত্যাগ করলে তবেই সেই কর্ম শুরু হয়। স্পষ্ট হচ্ছে যে, সাংসারিক ক্রিয়া কলাপ কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে শুধু আরাধনাই কর্ম। ত্যাগ বিনা তা শুরুই হয় না।

প্রশ্ন- **মহারাজজী! গৃহত্যাগ করলে কি কর্ম শুরু হয়? কাম, ক্রোধ লোভ কি দূর হয়?**

উত্তর- দূরীভূত তো হয় না; কিন্তু প্রবল বিরহ বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে, ভগবান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করলে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে যে প্রবৃত্তি , তা শান্ত তো হয়ই। প্রত্যেক বিষয়েরই সীমা দুটি রয়েছে। এক তো নিম্নতম সীমা, যেখান থেকে আপনি তাতে প্রবেশ করেন এবং দুই অধিকতম সীমা, যাকে পরাকাষ্ঠা বলে। উদাহরণস্বরূপ ভক্তির নিম্নতম সীমা সেটা, যেখান থেকে সমর্পণের সঙ্গে আপনি ভজন করা শুরু করেন। কিন্তু অধিকতম সীমা তো সেটা যেখানে -'**ভগ ইতি সঃ ভক্তি।**' যেখানে প্রকৃতির শেষ। প্রকৃতির পার পুরুষত্বে স্থিতি প্রদান করে যে অবস্থা সেটা ভক্তির চরম সীমা। এই প্রকার প্রত্যেক বস্তুর দুটি করে সীমা থাকে। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বিষয় গ্রহণ করা বন্ধ করে কর্ম অর্থাৎ আরাধনাতে প্রবৃত্ত হওয়া, কাম-ক্রোধ-লোভ এর ত্যাগের প্রবেশিকা এবং যেমন- যেমন মন নিরুদ্ধ হতে থাকবে, তেমন- তেমন বিকারগুলিও নিরুদ্ধ হবে শেষে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যাবে। কর্ম করার যোগ্যতা অর্জন হবে। অতএব কর্ম করার যোগ্যতা কাম, ক্রোধ এবং লোভ ত্যাগ করলেই লাভ হয়।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! যিনি আমাকে আশ্রয় করে জন্ম এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযত্ন করেন, তিনি সেই ব্রহ্মকে, সম্পূর্ণ অধ্যাত্মকে এবং সম্পূর্ণ কর্মকে জানেন। তখন অর্জুন প্রশ্ন করল- ''ভগবন্! সেই ব্রহ্ম কিরূপ? সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম কাকে বলে? কর্ম কখন সম্পূর্ণ হয়?'' ইত্যাদি সাতটি প্রশ্ন অর্জুন করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটাই উত্তর দিয়েছিলেন-

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।। *(গীতা, ৮/৩)*

অক্ষর-যাঁর কখনও বিনাশ হয় না, তিনিই পরব্রহ্ম। যাঁকে লাভ করলে ভক্তের কখনও ক্ষয় হয় না। লোভের ভাব, পুত্রের ভাব ইত্যাদি সংসারের ভাব দূর হয়ে 'স্ব' তে স্থির হলে এটাকেই অধ্যাত্মের পরাকাষ্ঠা বলা যেতে পারে। 'অধি আত্ম' অর্থাৎ আত্মার আধিপত্য। জীবের উপর মায়ার আধিপত্য রয়েছে, মায়া থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার আধিপত্য, আত্ম স্থিতি লাভ হলে একেই অধ্যাত্ম বলা যেতে পারে। '**স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে।**' স্বরূপে স্থির ভাবকেই অধ্যাত্ম বলে। ''**ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ-কর্মসংজ্ঞিতঃ।**' -ভূতগণের সেই সমস্ত ভাব, যে সব দ্বারা কোন না কোন

কামনা উৎপন্ন হতে থাকে সেগুলির ত্যাগ , সর্বথা নিরুদ্ধ হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। ভূত সমস্ত প্রকারের প্রাণীদের বলে। এই প্রাণীদের উৎপত্তি সঙ্কল্পের উপর আধারিত- **'মন মহঁ তথা লীন নানা তনু প্রগটত অবসর পায়ে।'** ***(বিনয়পত্রিকা, ১২৪/৪)*** অতএব ভূতের তাৎপর্য হল সঙ্কল্প। সঙ্কল্প গুলিতে উৎপন্ন সেই সব ভাব যেগুলি দ্বারা শুভ অথবা অশুভ কিছু না কিছু কামনা উৎপন্ন হয়, যেটাকে সংসার বলে, সেই সংসার ত্যাগ- সর্বথা নিরুদ্ধ হওয়া, বিরাম-রুদ্ধ হওয়াই কর্মের সংজ্ঞা, পূর্ণতা হচ্ছে। এই অবস্থাতে পৌঁছানোর পর কর্ম করার আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম সঙ্কল্পগুলি ত্যাগ করায়। অন্য শব্দে, কর্মের তাৎপর্য হল আরাধনা।

এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে সম্পূর্ণ গীতাতে কর্মের উপর উত্তমরূপে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর শুদ্ধ অর্থ হল-'আরাধনা ' যা শাশ্বত তত্ত্ব পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়ে দেয়। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। নির্ধারিত কর্মকেই কর, অন্যথা দেহ- যাত্রা সফল হবে না। কর্ম করে তুমি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। যজ্ঞের প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যত্র যা কিছু করা হয়, এই লোকেরই বন্ধন । এটা নিশ্বাস প্রশ্বাসের চিন্তন। ইন্দ্রিয়গুলির সংযম হল যজ্ঞ। কর্ম মনকে কাম এবং সঙ্কল্পগুলি থেকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করে। কাম - ক্রোধ-লোভ ত্যাগ করলেই কর্ম শুরু হয়। ভূতদের সেই সমস্ত ভাব, যেগুলি দ্বারা কিছু না কিছু সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়ই, সেগুলি রুদ্ধ হওয়াই কর্মের পরাকাষ্ঠা। অতএব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে কর্মের শুদ্ধ অর্থ আরাধনাই, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। যার দ্বারা সেই আরাধ্যদেব সন্তুষ্ট হন, সেই বিশেষ প্রক্রিয়ার নাম কর্ম।

গীতার উপর শত- শত টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, পঞ্চাশেরও বেশী টীকা শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত আছে। পঁচিশেরও বেশী মত যেগুলির আধারশিলা গীতা, একে অন্যের বিরোধী। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তো একটা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, তবে এত বৈমনস্য কেন? রাজনীতিজ্ঞদের হাতে গীতা পৌঁছালে তারা বলে দেশ ভক্তিই কর্ম। ব্যবসায়ীরা বলে- গীতাতে লিখিত আছে **'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'** ***(গীতা, ২/৪১)*** ব্যবসাই কর্ম। কাপড় বিক্রি কর, কিছু ধর্ম-কর্ম কর , সকালবেলা শিবের মাথায় জল ঢাল, কর্ম সম্পাদন হয়ে গেল। চাকরীজীবীরা বলে আমরা তো নিজের কর্তব্য পালন করি, কর্তব্যে কোন ফাঁকি দিই না এটাই নিষ্কাম কর্ম। একজন সহায়ক গোমস্তা বলতেন- বড় সাহেব যা বলেন, আমি সেই অনুসারেই কর্ম করি। গীতার উপদেশ অনুসারেই দিনযাপন করি মনে কোন কামনা নেই। আমি নিষ্কাম কর্মযোগী।

বাহ রে যোগী ! অতএব আপনি কোন টীকাতেই মনোযোগ দেবেন না। যোগেশ্বরের মূল বাণী অনুসারে চলুন, তবে আর কোন সন্দেহই থাকবে না।

প্রত্যক্ষ দর্শন প্রাপ্ত বহু মহাপুরুষ শিক্ষিত ছিলেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস শিক্ষিত ছিলেন না। আমাদের মহারাজও একটুও পড়াশোনা করেননি। ঠিক করে রামও লিখতে পারতেন না। দেখে-দেখে কোন রকমে লিখতেন। জড়ভরত শিক্ষিত ছিলেন না। কাকভুশুন্ডি অশিক্ষিত ছিলেন-'**হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ**' পিতা হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তবুও পড়াশোনা করেন নি। ঠিক এই প্রকার বহু মহাত্মা এমন ছিলেন, যাঁরা পার্থিব শিক্ষা দীক্ষাতে শূন্য ছিলেন কিন্তু নিজের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ছিলেন। কাকভুশুন্ডি আশ্রমে ভগবান শিবও যেতেন। অতএব আপনি যদি শিক্ষিত তবু ঠিক এবং যদি অশিক্ষিত তবুও কোন ক্ষতি নেই। কারণ ইষ্টের সমান স্থিতি প্রদান করিয়ে দেয় যে ক্রিয়া, তার নাম কর্ম অথবা আরাধনা, বিরহ-বৈরাগ্য থেকে এই ক্ষমতা অর্জন করা যায়। লৌকিক শিক্ষা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে । পরন্তু ইষ্ট-সম্বন্ধীয় কর্মের জন্য বুদ্ধি-মন নিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অতএব কোন তত্ত্বস্থিত পুরুষের সান্নিধ্যে বাস করে সাধনা করা উচিত। বাণীর দ্বারা ব্যক্ত বিষয় এবং লিপিবদ্ধ বিষয় এক হলেও তাদের অর্থ ভিন্নই হয়। কিন্তু ক্রিয়াত্মক আচরণ দ্বারা, মহাপুরুষদের কৃপাতে আত্মার প্রেরণায়; সাধনা করার ক্ষমতা লাভ হয় সেটা আরও বিলক্ষণ। শুরু হলে তা সঞ্চিত হতে থাকে, সাধনা কখনও নষ্ট হয় না । নিশ্চিত কল্যাণ করে। যোগে শুরুর নাশ নেই অল্পও সাধনা করুন, শুরু তো করুন।

।।ওঁ।।

গীতোক্ত বর্ণ ব্যবস্থা

প্রশ্ন- মহারাজজী ! গীতাতে বর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ কি?

উত্তর - গীতার অনুসারে বর্ণ ব্যবস্থার যা স্বরূপ , তা বোঝার জন্য গীতোক্ত কর্ম কোন্‌টা এটা জানা আবশ্যক। গীতার অনুসারে আরাধনাই কর্ম। যজ্ঞ এবং কর্ম একে অন্যের পূরক। আরাধ্য দেবকে যে পথে চলে লাভ করা হয় সেই পথকেই যজ্ঞ বলে, যাতে চিদ্‌বিলাস জগতই আহুতির সামগ্রী। এই যজ্ঞের অন্তিম আহুতিতে সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ , বৃত্তি সহ চিত্তের অস্তিত্ব প্রকৃতির প্রবাহরূপ ত্রিগুণই সমাহিত করে বুদ্ধিও যজ্ঞরূপ হয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ যজ্ঞের পরিণামস্বরূপ প্রাপ্ত পরমাত্মা অসম্ভব থেকে সম্ভব হন।

যজ্ঞকে ক্রিয়ারূপ দেওয়াকেই কর্ম বলে। অন্য শব্দে, যজ্ঞের আচরণকে কর্ম বলে।

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। *(গীতা, ৩।৯)*

বস্তুতঃ যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এ ছাড়া যাবতীয় ক্রিয়া , যাতে জগৎ দিবা -রাত্রি ব্যস্ত এবং মোহিত হয়ে রয়েছে, কর্ম নয় । তা তো এই লোকেরই বন্ধন, জীবের বন্ধনের হেতু। গীতার অনুসারে যেটা কর্ম তা তো অমরত্ব উপলব্ধি করিয়ে দেয়। গীতাতে যত্র-তত্র সর্বত্র কর্মের এই পক্ষেরই উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এই কর্মই পূর্ণ কল্যাণ করে। পরমপদ এবং পরমধাম এই কর্ম সম্পূর্ণ হলেই লাভ হয়। গীতোক্ত কর্ম আরাধনা অথবা ভজনার সমার্থবোধক শব্দ। স্পষ্ট ভাবে বোঝানোর জন্য এই কর্মকেই ক্রমান্বয়ে চারটি সোপানে বিভাজিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ একেই কর্ম বলেছেন। 'বর্ণ' নামকরণ গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ণের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে রূপ, রং, আকৃতি। অধ্যয়ন কর্তা যে শ্রেণীর হয় তার হাব-ভাব, আকৃতি সেই স্তরের অনুরূপ হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শত-শত বিঘ্নের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে ভাসে। এই মানসিক বিক্ষোভ তাকে এক প্রকারের আকৃতি প্রদান করে। এর বিপরীত 'শাস্ত্র বিশারদ' ইত্যাদি উপাধি বিশেষ দ্বারা অলঙ্কৃত, উপযুক্ত বিদ্বান্ নিজেকে যোগ্য- অধিকারীরূপে দেখতে পাবে। তার বিচারধারার বেগ ভিন্ন হবে। নিজের বিষয়ে প্রভুভাব থাকবে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র অপেক্ষা তার আনন্দ ভিন্ন প্রকৃতির হবে, বর্ণ অথবা মুখমন্ডলের অবস্থাতে আকাশ- পাতালের প্রভেদ হবে।

নিকৃষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট যোনিগুলিতে প্রগতিও মানসিক স্তর থেকে নির্ধারিত হয়। মৃত্যুর সময় মন উচ্চ বিচার দ্বারা ওতপ্রোত থাকলে উচ্চ যোনিতে জন্ম হয়। এইপ্রকার সেইসময় সংকীর্ণ বিচার থাকলে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়। অতএব মনঃ স্থিতিই আকৃতির নির্ধারক এবং স্পষ্ট করে বললে মনের স্থিতিই আকৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণের মধ্যে পার্থক্য অনুসারে কর্মকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যহ দেখা যায় যে, মানুষ ভজনা করতে বসে কিন্তু মনের ভাল লাগে না। বিচারের বন্যা বয়ে যায়। বিস্মৃত বিষয়ও ভজনার সময় মনে পড়ে যায়। ভজনাতে কে বাধকের কাজ করে? মূল অবরোধ কোথা থেকে আসে? ধ্যান দ্বারা জানা যায় যে, ত্রিগুণই এই কর্ম (ভজন)-এ অবরোধ সৃষ্টি করে। এই ত্রিগুণের মাধ্যমেই কর্ম (আরাধনা)-এর উত্থান এবং পতন হয়। ত্রিগুণ দ্বারা কর্ম এর বিচার এবং পরিমাপ করা হয়। গুণই বর্ণ পরিবর্তনের মাপদন্ড। ত্রিগুণের বশীভূত থাকার জন্যই মন কখনও কেন্দ্রিত অথবা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়। পরন্তু কর্ম (ভজন) এমনই যন্ত্র যা ত্রিগুণের সমস্ত কার্য উৎকৃষ্টও করে আবার নিকৃষ্টও করে এবং গুণকে সমূলে বিনষ্টও করে। কর্মের প্রভাবে গুণ প্রভাবিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে '**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**'- চারটি বর্ণের রচনা আমি করেছি। মানুষকে নয় পরন্তু কর্মকে চার ভাগে ভাগ করেছি। কিসের আধারে? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- '**গুণকর্ম-বিভাগশঃ।**' ***(গীতা, ৪।১৩)***-গুণের উত্থান পতন দ্বারা কর্মকে বর্ণগুলি (শ্রেণিগুলি) তে বিভাজিত করা হয়েছে। অতএব মানুষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নয় পরন্তু ভজনাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য এবং শূদ্র। এই বিভাজন গুণের উপর আধারিত। তিনটি গুণেরই পৃথক- পৃথক প্রভাব রয়েছে। এগুলির বাসস্থান মন। গুণ তিনটি রয়েছে কিন্তু বর্ণ চারটি কারণ একটা গুণ যে পরিমাণে দূর হয় অন্য আর একটা গুণ সেই পরিমাণেই তার স্থানে চলে আসে। প্রত্যেক গুণের স্বভাব হল যে, একটার প্রভাব বেশী হলে সেই গুণটি শেষ দুটির প্রভাব শেষ করে দেয়। অতএব সমান অনুপাতে দুটি গুণের মিশ্রণে অতিরিক্ত একটা বর্ণের সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে হয়। ব্যবহারিক জীবনে যে ব্যক্তির মধ্যে শুধু সাত্ত্বিকগুণ বিদ্যমান তাকে ব্রাহ্মণ, অর্ধেক সাত্ত্বিক এবং অর্ধেক রাজসিক গুণযুক্তকে ক্ষত্রিয়, অর্ধেক রাজসিক এবং অর্ধেক তামসিক গুণযুক্তকে বৈশ্য শুধু তামসিক গুণযুক্তকে শূদ্র বলা হয়।

ব্রাহ্মণ-যাঁর মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের প্রভাব রয়েছে, যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর মন স্বভাবতঃ শান্ত থাকবে। অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, সংযত বাহ্যান্তর শুদ্ধ, ক্ষমা, তপস্যা,

জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আনন্দ ইত্যাদি তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে থাকবে। যাঁর অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকগুণে পূর্ণ , লেশমাত্রও রাজসিক অথবা তামসিক গুণ নেই, সেই পুরুষের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের কার্য-জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধ্যান ইত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে থাকবে। ব্রাহ্মণ অথবা উচ্চকোটির সাধকের বিধেয় এটাই, এইরূপ করলেই তার কল্যাণ হবে।

ক্ষত্রিয়-যাঁর অন্তঃকরণে লেশমাত্রও তামসিক গুণের প্রভাব নেই, অর্ধেক রাজসিক গুণও শান্ত হয়ে গেছে পরন্তু সাত্ত্বিক গুণেরও বাহুল্য নেই; তিনি অতি উত্তম তো হন না; উত্তম হন। উত্তম সাধকের বর্ণ ক্ষত্রিয়। এইরূপ সাধককে শূরবীর বলে মায়ার প্রাবল্যে এঁরা ভয়ভীত হন না। আসুরী বৃত্তির সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করেন, কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। তাঁর মধ্যে ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ প্রভুভাব থাকে, কারণ ভজনপথের বাধাগুলিকে দূর করতে সমর্থ হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তার মধ্যে থাকে। আত্মপ্রকাশ-এর তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা,দান ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ । অর্ধেক রাজসিক এবং অর্ধেক সাত্ত্বিক গুণ যখন কার্যরত হয় তখন এই লক্ষণ স্বতই দেখা যায়। এই উপর্যুক্ত দুটি গুণ না থাকলে হঠাৎ কেউ ক্ষত্রিয় হতে পারবে না কারণ এই লক্ষণগুলির হেতু তো স্বভাব, যা গুণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ '**ক্ষাত্রকর্ম স্বভাবজম্**' *(গীতা, ১৮/৪৩)* বলেছেন, অর্থাৎ উপর্যুক্ত লক্ষণ স্বভাবে দেখা যায়, অভ্যাসে দাঁড়ায়। সেই জন্য ক্ষত্রিয়ের কর্মও স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

বৈশ্য- যাঁর অন্তঃকরণে অর্ধেক তামসিক এবং অর্ধেক রাজসিক গুণ কাজ করে, তিনি বৈশ্য । এইরূপ ব্যক্তির ভজন-পথ থেকে অর্ধেক অন্ধকার অপসারিত হয়েছে, অর্ধ রাজসিক গুণে পথ আলোকিত। অতএব কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য এই প্রকারের সাধকের স্বাভাবিক কর্ম। '**রাম নাম ধন খেতী**'-অর্থাৎ আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। এর উপার্জন করাই কৃষিকার্য। 'গো' ইন্দ্রিয়গুলিকে বলে। অতএব গোরক্ষার তাৎপর্য ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষা। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিচরণ করার অর্থই হল এগুলির নাশ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা এগুলির সুরক্ষা হয়। আত্মিক শক্তির অপব্যয় হয় না। আত্মিক সম্পত্তিকে বিষয়াসক্ত না হতে দিয়ে এগুলিকে সংগ্রহ করাই ধনোপার্জন । মায়া এই সংগ্রহে বাধকের কাজ করে । আত্মিক সম্পত্তি ক্ষীণ করতে থাকে। লোকসানই করে। সেইজন্য ভজনাও এক প্রকারের ব্যবসা, যার সাহায্যে আত্মিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করা বৈশ্যের স্বভাব উক্ত হয়েছে। আত্মিক সম্পত্তির বর্ধনই হল পুঁজির সংগ্রহ। এটাই সত্যিকারের

ব্যবসা, যা নিজধন প্রাপ্তি করায়। এইরূপ পুরুষের মন সাধনাতে বসতে শুরু করে।

শূদ্র- ভজনার সবচেয়ে ক্ষুদ্র সোপান শূদ্র। যাদের অন্তঃকরণে তামসিক গুণ কার্যরত, রাজসিক গুণ অত্যল্প থাকে তারা শুদ্র। প্রমাদ এবং আলস্য এই প্রকারের ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষভাবে থাকে। প্রযত্ন করলেও তার মন স্থির হবে না। সত্য বস্তু কি তা বোঝার ক্ষমতাও তার মধ্যে হয় না। তাঁর মন পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন থাকার জন্য নিজের লক্ষ্য দেখতে সমর্থ হয় না। আরাধনাতে মন বসতে চায় না। কর্মক্ষেত্রে তার স্থান তুচ্ছ। অতএব শূদ্র স্বভাব যুক্ত ব্যক্তিদের নিজেদের উত্থানের জন্য মহাপুরুষদের সেবা করা উচিত- "**পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্**" **(গীতা, ১৮।৪৪)**

যে মহাপুরুষের মন বহু ঊর্ধ্বে স্থিত, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাঁর শরণাগত হয়ে কায়মনোবাক্যে সেবা করার বিধান রয়েছে। সেবা-ধর্ম খুবই গহন। সেবকের কাছে কোন সেবাই তুচ্ছ নয়। সে কখনও তর্ক করে না যে, বিছানা পাতা, ঝাঁট দেওয়া, পায়খানা পরিস্কার করা আমার দ্বারা হবে না। বস্তুতঃ যিনি মহাপুরুষ পবিত্র হয়ে গেছেন, তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করলে তবেই শূদ্র স্তরের সাধকের আবিলতা দূর হবে। সেবা করলে তবেই সে বৈশ্য শ্রেণী প্রাপ্ত করতে পারবে, বৈশ্য -গুণধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। তার মধ্যে যে যোগ্যতা ছিল না, তাও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এই প্রকার গুণগুলির উত্থান-পতন বিবেচনা করে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে সাধক অনুভব করেছেন যে, তিনি ব্রহ্মের নিকটবর্তী শুধু বিলীন হওয়া বাকী রয়েছে, যে অবস্থা লাভের পর কর্মের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যায়। এই প্রকার সত্ত্বগুণ দ্বারা সঞ্চালিত, জ্ঞান, বিজ্ঞান ধ্যান এবং সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে রয়েছে, তিনি ব্রাহ্মণ। 'ক্ষ' ছেদন করাকে বলে এবং 'ত্রী' তিনকে বলে। যাঁর মধ্যে ত্রিগুণকে ছেদন করার ক্ষমতা বিদ্যমান, তিনি ক্ষত্রিয়। ভজনা পথের বিঘ্নগুলির সম্মুখীন হওয়ার শূরবীরতা, আত্মতেজ, প্রভুভাব ইত্যাদি কর্ম তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দেখা যাবে। যা ব্রাহ্মণ শ্রেণী প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন। ভজনাতে মন একটু, একটু বসা, সদ্‌গুণগুলি এক- এক করে সঞ্চয় করা, ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়োন্মুখী প্রবাহ রুদ্ধ করা বৈশ্যের সহজ কর্ম যা ক্ষত্রিয় বর্ণে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন। এই প্রকার যে সাধক সামান্যও কর্ম করতে পারে না, নিদ্রা-প্রমাদ এবং অধিক অলসতার জন্য ভজনা করতে পারে না, এই প্রকার শূদ্রস্থিতিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কর্ম (ভজন)-এর প্রথম চরণ হল সেবা। সেবার প্রভাবে সে বৈশ্য বর্ণের দিকে এগিয়ে যাবে।

চরাচর জগতই তিনটি গুণের বিকার । দেবতা, মনুষ্য, রাক্ষস সকলেই এই তিনটি গুণের অন্তর্গত রয়েছে (গীতা -১৮।৪০)। যাঁরা বলেন যে, বর্ণ শুধু ভারতবর্ষে রয়েছে তাদের এই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ হিন্দু, মুসলমান ,শিখ, খ্রীষ্টান, পারসী, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী অথবা বিশ্বের যে কোনো প্রাণী যখন পরমাত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হবে, তখন চারটি বর্ণের মধ্যে সে তার গুণের অনুরূপ কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত পড়বেই। আপনি হিন্দু হলেও তাতে কিছু যায় আসে না, ভজনে প্রবেশ শূদ্র স্তর থেকেই হবে।

ভগবৎ- পথ (কর্ম)-এ বেশধারী ঠগ অনেক আছে। যোগ্যতা তো তাদের শূদ্রের । তমোগুণের বাহুল্যে তাদের মন তো হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় কিন্তু ঢং এমন করে যেন তপোধন। এইরূপ বঞ্চক কর্ম ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, স্বাভাবিক গুণ ত্যাগ করে যে উচ্চ শ্রেণীর নকল করে সে বস্তুতঃ নিজের ক্ষতিই করে-

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।' *(গীতা, ৩।৩৫)*

ক্রমশঃ চলে তো অনেক বেশী যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ছাত্র যদি উচ্চ শ্রেণীতে গিয়ে বসে তবে সেই শ্রেণীর জ্ঞান তো দূর অস্ত, প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা লাভ থেকেও বঞ্চিত হবে। লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রকারও বোঝা যেতে পারে। শূদ্র, যে এখন প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকও অধ্যয়ন করেনি, যদি মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষা দেয়, তবে সে প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানও অর্জন করতে পারবে না। এই প্রকার যার যোগ্যতা মাধ্যমিকের, বি. এ. পরিক্ষা দিলে মাধ্যমিকের যোগ্যতা থেকে সে বঞ্চিত হবে। এই প্রকার বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ক্ষত্রিয়, সে যদি এম. এ অথবা গবেষণা করতে চায় তবে সে বি.এ-এর যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবে না। এটা তো একটা দৃষ্টান্তমাত্র। বস্তুতঃ একের পর এক শ্রেণীগুলি পাশ করেই যে প্রকার বিদ্বান্ হওয়া সম্ভব হয় সেই প্রকার একটার পর আর একটা বর্ণ পার করেই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়।

গীতার এই নির্ণয় অকাট্য যে, স্বাভাবিক কর্ম (ভজনা) দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে মনুষ্য পরমসিদ্ধি লাভ করে। স্বধর্মের আচরণ করে অর্থাৎ গুণের অনুরূপ কর্ম করে মরে যাওয়াও কল্যাণকর, পরন্তু অন্যের ধর্ম ভয়াবহ । অন্যের নকল যে করে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। নকল করার চেষ্টাতে তার অর্জিত ক্ষমতাও সমাপ্ত হয়ে যায়। অতএব গীতার অনুসারে **'কর্মাণি প্রবিভক্তানি**

স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।' *(গীতা, ১৮/৪১)* স্বভাবজাত গুণের অনুসারে কর্মকে ভাগ করা হয়েছে। স্পষ্ট হচ্ছে যে বিভাজন কর্মের করা হয়েছে মানুষের নয়। অতএব যাদের বিচার ধারা এই প্রকার যে, মানুষের বর্ণ জন্ম থেকে নির্ধারিত অথবা যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করেছি সেটাই আমার বর্ণ , এরপর তো গোটা জীবন এই বর্ণে থেকেই ভগবানের বাণী পালন করতে হবে, এই প্রকার যারা চিন্তা করে তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। এইরূপ যারা প্রচার করে তারা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ থেকে তফাতে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলছেন-'**কর্মাণি প্রবিভক্তানি**' —যে, কর্মকে ভাগ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো কৃপা করে আরাধনা পথকে চারটি সোপানে বিভক্ত করেছেন, যাতে দূর্বল থেকে দূর্বল মনের ব্যক্তিও ক্রমশঃ চলে ভগবানকে লাভ করতে পারে। যে ক্রিয়া দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় সেই ক্রিয়ার বিভিন্ন সোপান পার করে আত্মা রাক্ষস থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকেও শ্রেষ্ঠ প্রভুর সাক্ষাৎ করে স্বয়ং প্রভু হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে বহু জন্ম ধরে চলে সাধক আমার স্বরূপ লাভ করে। এই কর্ম (আরাধনা) উচ্চ থেকে উচ্চতর যোনিতে জন্ম দেয়, স্বরূপ রচনা করে। সেইজন্য এর 'বর্ণ' নামকরণ যথার্থ এবং সার্থক।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের অতিশয় প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে আরাধনা- পথের বিভিন্ন বর্ণগুলি পার করার পরম গুহ্য কিন্তু সবচেয়ে সুগম উপায় গীতার উপসংহারের সময় বলেছেন। তিনি বলেছেন যে কর্মী স্বয়ং যেন চিন্তা না করে যে, আমি কোন্ বর্ণের ? সে নিজেকে যাচাই করতে গিয়ে যেন সময় নষ্ট না করে । সেইজন্য অর্জুন ! তুমি কোন বর্ণ ধর্ম-এর সেটা বিচার না করে আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। একথা উল্লেখযোগ্য যে, যোগেশ্বর, পরমাত্মা, পরমতত্ত্ব, পরমপুরুষ, সদ্গুরু সাধন কালে একে অন্যের পর্যায়রূপে কার্য করেন। সাধককে নিজের বর্ণের চিন্তা ত্যাগ করে তাঁর শরণেই যাওয়া উচিৎ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, '**চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।।**'*(গীতা, ১৮/৫৭)* চিত্ত থেকে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হও এইরূপ করলে বর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে না পরন্তু শরণাগত হলে বর্ণগুলি থেকে উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ভগবানের হয়ে যায়। বর্ণগুলি তো অতিক্রম করতেই হবে কিন্তু প্রভুর উপর দায়িত্ব দিয়ে সেবক নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। যখন বর্ণ ভগবান দ্বারা সৃজিত তবেই তাঁর মত সাধকের মধ্যে গুণগুলির সমাবেশ করানো ভগবান সদ্গুরুর জন্য নিতান্ত সরল। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছেন

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।*(গীতা, ১৮/৬২)*

অর্জুন! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর কৃপাতেই তুমি পরমশান্তি এবং শাশ্বতস্থান প্রাপ্ত করতে সমর্থ হবে। কোন মহাপুরুষের আশ্রয়ে থেকে বর্ণগুলি পার করা সহজ।

গীতোক্ত বর্ণ-ব্যবস্থার এই বিবেচন থেকে কয়েকটি মহত্ত্বপূর্ণ নিষ্কর্ষ বার হচ্ছে-

১- ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়গুলির নাম যজ্ঞ এবং সেই যথার্থ ক্রিয়ার নাম কর্ম। যজ্ঞ যে প্রকারে করা হয়, সেটা কর্ম।

'**কর্মাণি প্রবিভক্তানি**'- কর্মকে চারটি বর্ণে বিভাজিত করা হয়েছে মানুষকে নয়। গীতোক্ত কর্মের অর্থ হল আরাধনা। এই আরাধনারই সোপান চারটি। একবার জাগ্রত হলে এই কর্ম তখনই অব্যাহতি দেয় যখন এই চারটি বর্ণ সাধক পার করে।

২- যে ভগবৎ পথে চলে না, সে কোন বর্ণের অন্তর্গতই পড়ে না।

সে না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র। বর্ণ-এর অন্তর্গত সে, যে কর্ম, আরাধনা করে। পরমাত্মার প্রাপ্তির অতিরিক্ত সাংসারিক কার্যগুলিতে ব্যস্ত ব্যক্তি না তো কোন বর্ণের ক্রিয়া করে এবং না তো গীতোক্ত বর্ণের অন্তর্গত পড়ে। যদি আস্তিক তবে প্রত্যাশী অবশ্যই । যা ইচ্ছা করে সেটাই তো লাভ করে, যা করে না তা কখনও লাভ করে না, শুধু হতাশ হয়।

৩- গীতোক্ত বর্ণ- ব্যবস্থা মানসিক স্থিতির উপর নির্ভর করে। পরন্তু হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বর্ণ-ব্যবস্থা ভৌতিক শরীরের সামাজিক বিভাজন মাত্র। সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণ দেহের। এগুলির ততটাই সীমা । এই বর্ণগুলি দ্বারা দেহের নির্বাহ হয় এবং জীবন যাপনের দৃষ্টিতে এই বিভাজন নিজের জায়গাতে উচিৎ। সামাজিক , রাজনৈতিক এবং আর্থিক কারকগুলিতে পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বর্ণ ব্যবস্থাতে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। শুরুতে জাতি এবং বর্ণ শ্রেণীগুলির কোন রূপ-রেখা ছিল না। কালান্তরে সমাজ সুর ও অসুর এই দুটি বর্ণে বিভাজিত হয়েছিল। তারপর তো গন্ধর্ব,পিশাচ,যক্ষ, বানর ইত্যাদি বর্গ-এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং নিশ্চিহ্নও হয়েছিল। জীবিকার সাধনগুলির উৎকৃষ্টতা অথবা নিকৃষ্টতার আধারে সমাজ অনন্ত চক্রে বিভাজিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা যে নামই দেওয়া হোক না কেন, উদর-পোষণের জন্য সমাজে বর্গের সৃষ্টি হতেই

থাকবে। কিন্তু বাস্তবিক কল্যাণের জন্য গীতোক্ত বর্ণ-ব্যবস্থাই যথার্থ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ নিজেকে নষ্ট করে। বস্তুতঃ না তো কোন মুসলমান ঘাতক , না কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আধ্যাত্মিক প্রগতিতে বাধক হতে পারে। কর্মই ব্যক্তিকে উন্নত করে এবং কর্মরহিত হয়ে মানুষ নিজেই নিজেকে নষ্ট করে, গীতার এটা দৃঢ় নিশ্চয়।

৪- তিনটি গুণ দ্বারা কর্ম (ভজন) কে চারটি বর্ণে বিভাজিত করা হয়েছে এবং গোটা সংসার এই তিনটি গুণের অন্তর্গত। তবেই স্পষ্ট হচ্ছে যে গোটা সংসার চারটি বর্ণের অন্তর্গত। একথা উল্লেখযোগ্য যে, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণ বিভাগের বর্ণনা এখান থেকেই শুরু করেছেন যে, দেবলোক , মৃত্যুলোক যাবন্মাত্র গোটা জগৎ তিনগুণ থেকে উৎপন্ন হয়ে সেই অনুসারে কাজ করে । উঁচু নীচু স্বভাবের কারণ হল গুণ এবং সেই স্বভাব থেকে বর্ণের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার গোটা সংসার বর্ণ-ধর্ম-এর বাইরে নয়। এই বিষয়ের উপর পুনরায় জোর দেওয়া সমীচীন হবে যে, সংসারের অর্থ শুধু ভারতবর্ষ নয়।

৫- তিনগুণ থেকে স্বভাব তৈরী হয়, স্বভাব থেকেই বর্ণের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। ছোটগুণ থেকে ক্ষুদ্র স্বভাব তৈরী হয় পরন্তু বড় গুণ থেকে ব্রাহ্মণের মত বড় স্বভাব তৈরী হয়। গীতারই অনুসারে যে কোন গুণকে বর্ধিত করা যেতে পারে। চতুর্দশ অধ্যায়ের দশম শ্লোক অনুসারে যে কোন গুণ শেষ দুটি গুণকে নিয়ন্ত্রণে এনে বাড়ানো যেতে পারে। বৃদ্ধি-হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রকার যদি গুণের পরিবর্তন সম্ভব তবে শূদ্র থেকে বৈশ্য, বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত সম্ভব। এরই অনুসরণ করে আজও আপনি জগৎগুরু।

৬- অত্যন্ত চঞ্চল মনের ব্যক্তিও সঠিক সাধনা পথে চলে সঙ্কল্প রহিত সমাধির ক্ষমতা অর্জন করেছেন দেখা গেছে। বাল্মিকী, সূরদাস, তুলসীদাস ইত্যাদি মহাপুরুষদের প্রারম্ভিক জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করলে এই তথ্য উদ্ভাসিত হয় যে, স্বভাবে পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। উপরোক্ত মহাপুরুষদের জীবনের পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ এর স্বভাবের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের পার্থক্য দেখা যায় কাম- ক্রোধ, লোভে বিক্ষিপ্ত মন সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল এবং সরল মনে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এই প্রকার যদি স্বভাবে পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তবে বর্ণের পরিবর্তনেও সন্দেহ নেই।

৭- শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বর্ণ পরিবর্তনের জন্য প্রোৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন যে, অর্জুন! বেদ ত্রিগুণ পর্যন্তই প্রকাশিত করে অথবা তিনটি গুণ পর্যন্তই

সীমিত , সেইজন্য তুমি বেদের ক্ষেত্র থেকে উর্ধ্বে ওঠ। এরই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উর্ধ্বে ওঠার উপায়ও বলেছেন যে, নির্দ্বন্দ্ব, একরস, সত্ত্বে স্থিত হও এবং যোগক্ষেমের চিন্তা কোরো না,আত্মপরায়ণ হও! শ্রীকৃষ্ণের শব্দে-

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। *(গীতা, ২।৪৫)*

এখানে প্রশ্ন উঠছে যে, কেউ কি বেদের উর্ধ্বে স্থিত? (বেদের, গুণের উর্ধ্বে স্থিত হওয়া একই ব্যাপার) এবং যদি কেউ কখনও স্থিত হয়েছেন তবে তাঁর কি গতি হয়েছে? এই জিজ্ঞাসার সমাধান করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যে প্রকার বড় জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুষের ছোট জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন থেকে যায়, ঠিক ততটাই প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের বেদের জন্য থেকে যায়। সারাংশতঃ বেদ তিনটি গুণ পর্যন্তই প্রকাশিত করে, সেইজন্য বেদের উর্ধ্বে উঠলে যে স্থিতি লাভ হয় তার নাম ব্রাহ্মণ। এখানে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হন। অর্থাৎ তুমি উর্ধ্বে ওঠ এবং ব্রাহ্মণ হও-

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সবের্ষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। *(গীতা, ২।৪৬)*

কর্মের গতি বস্তুতঃ গূঢ়। কর্ম, অকর্ম কাকে বলে? এ বিষয়ে বড়- বড় বিদ্বান্ও সংশয়যুক্ত। বস্তুতঃ কর্মের তাৎপর্য হল আরাধনা এবং অকর্মের আশয় শুধু এটুকু বিশ্বাস যে, করাচ্ছেন তিনি, আমি তো নিমিত্তমাত্র- এই প্রকার জেনে কর্মে মগ্ন হওয়াই মোক্ষপ্রদ। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। কর্মের অন্তিম স্থিতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বলা হয়।

৮- কেউ কখন ব্রাহ্মণ হয়? এই প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পন্ডিতং বুধাঃ।। *(গীতা, ৪।১৯)*

যখন সর্বতোভাবে প্রারম্ভ কর্ম (যাতে কোন রূপ ত্রুটি থাকবে না) ক্রমশঃ সেই শ্রেণীতে পৌঁছে যাবে, যখন কাম এবং সঙ্কল্পের সর্বথা অভাব দেখা দেবে (প্রমাণিত হচ্ছে যে, কর্ম এমন ক্রিয়া যা মনের সঙ্কল্পগুলি শান্ত করে) তখন জ্ঞান অগ্নিতে কর্ম ভস্মীভূত এবং কর্ম ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রাণীকে মহর্ষিগণ বোধস্বরূপ ব্রাহ্মণ বলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে কোন পুরুষ ব্রাহ্মণ অথবা পন্ডিত হতে পারেন। হিন্দু, তাঁতী, চামার, বৈশ্য, শূদ্র, খ্রীষ্টান, মুসলমান

ইহুদী সকলেই কর্ম কাকে বলে বুঝে, কর্ম করে ব্রাহ্মণ হতে পারে।

৯- যথার্থ তো এই যে , শুধু ব্রাহ্মণ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য নয়। এই বর্ণও দোষেপূর্ণ। অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা এই বর্ণ কম জটিল অবশ্যই কিন্তু সরল কর্মের কর্তাকেও মুক্ত বলা যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রাপ্ত করে নিলেও আন্তরিক প্রসন্নতা কিরূপে হবে সংসার যে এখনও চিত্ত থেকে মুছে যায়নি। যতক্ষণ জীব কর্ম ও বর্ণের গন্ডির ভিতর রয়েছে, সংসারের অস্তিত্বও সঙ্গেই রয়েছে। সেই জন্য বর্ণগুলি থেকে কোনরূপ আশা করা উচিত নয়। বর্ণ নীচু হোক অথবা উঁচু, সেটা আমাদের লক্ষ্য নয়। হ্যাঁ লক্ষ্য পর্যন্ত সহযোগিতা অবশ্য করে। বর্ণগুলি পার না করে লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও তো সম্ভব নয়। সেইজন্য এই বর্ণধর্মগুলির পালন আবশ্যক। প্রত্যেক বর্ণের নির্ধারিত লক্ষণগুলিকে যে আয়ত্ত্বাধীন করে, সে উঁচু বর্ণে প্রবেশের অধিকারী হয়, ক্রমশঃ চতুর্থ বর্ণের ধর্ম-এর যখন পূর্তি হয় তখনই পরমপ্রভু নিজের দীন সেবককে গ্রহণ করেন। নিজের সমান স্থিতি প্রদান করেন।

১০- পরমপ্রভু পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য। যেখানে বর্ণ, কর্ম, ধর্ম-অধর্ম সব কিছু বিলয় হয়। শ্রী শঙ্করাচার্য এই স্তরে পৌঁছে বলে উঠেছিলেন :- **'ন ব্রাহ্মণঃ ন ক্ষত্রিয়ো ন বৈশ্যো ন শূদ্রঃ চিদানন্দরূপঃ শিবো হহং শিবোহহম্।'** জীবাত্মা এবং পরমাত্মার দ্বৈত এই বিন্দুতেই সদা সর্বদার জন্য তিরোহিত হয়। এই অদ্বৈত স্থিতিরই সঙ্কেত গোস্বামীজীও **'জানত তুমহহি তুমহই হোই জাঈ'** বলে করেছেন। এটাই নানকের 'বাহে গুরু' এবং কবীরের 'প্রত্যক্ষ স্বরূপ'। যাঁর অখন্ড -অভেদ স্বরূপে বর্ণ-ভেদ- এর কোন স্থান নেই।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে। শেষের জন্মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত জ্ঞানী আমারই স্বরূপ, আমাতে এবং সেই জ্ঞানীতে সামান্যও পার্থক্য নেই। ***(গীতা,৭/১৯)*** এখন প্রশ্ন উঠছে সেই ভজনের স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- আমার শরণাগত হও। অর্থাৎ কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের আশ্রয়ে থেকে নিষ্কপটভাবে সেবা ও জিজ্ঞাসা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। **'সদগুরু মারে উলট নিহারে, সোব্‌ত মে উঠ জাগে।'**

প্রশ্ন- সরকার! বর্ণ-ব্যবস্থার সম্বন্ধে ঋগ্বেদ-এর অনুসারে ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য পেট থেকে এবং শূদ্র চরণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার ফলে মনে হয় যে, বর্ণ - ব্যবস্থা জন্ম থেকে নির্ধারিত?

উত্তর- দেখুন, গীতাতে সবই রয়েছে, কারণ বেদের প্রাণ উপনিষ্‌দ এবং

'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্র'- এর অনুসারে গীতা উপনিষদ্‌গুলিরও সার, যা বেদ সম্মত । মহাভারতে মহর্ষি ব্যাসের বচন রয়েছে-

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

অতএব গীতা স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্তু আপনি যখন বেদের কিঞ্চিৎ চর্চা করলেন তখন সেই দৃষ্টিকোণ দিয়েও বিচার করে নিই; যদিও গীতা বেদ থেকে ভিন্ন নয়, শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

প্রশ্ন হল ব্রহ্ম কখন উৎপন্ন হন? যদি ব্রহ্ম প্রতিটি কণায় ব্যাপ্ত তবে তাঁর চরণ কোথায় স্থিত এবং শীর্ষ স্থান কোথায়?

বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি যোগ- দর্শন , যেরূপ গীতাতেও উল্লিখিত রয়েছে। গীতা-দর্শন পরমাত্মাতে বিলীন হতে সাহায্য করে। সেই ব্যাপক চেতনের প্রকটীকরণ সমাজে বিবাদের একটা বিষয় কিন্তু যোগীদের পক্ষে সেটাই সর্বসম্মত তথ্য।

কঠোপনিষদের বচন হল-

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্।। *(১/২/২২)*

এই আত্মাকে না তো প্রবচন , না বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং না তো বেশী উপদেশ শ্রবন-উপদেশ দান করলে লাভ করা যেতে পারে। পরন্তু হাজার-হাজার ব্যক্তির মধ্যে সেই পরমাত্মা যাকে চয়ন করে নেন, সেই তাঁকে লাভ করে। সহস্র-সহস্র পথিকের মধ্যে যাকে তিনি বরণ করে নেন, সেই এই আত্মতত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়। যে সাধকের কায়মনোবাক্যের সেবা প্রার্থনা তিনি স্বীকার করে নেন, তার অন্তরে পরমাত্মা রথী হয়ে যান এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিরূপ লাগামের সাহায্যে সঠিক মার্গ দর্শন করে সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মা এবং স্বয়ং-এ স্থিতি প্রদান করে।

ব্যস এটাই, সাধকের হৃদয়ে প্রসারণের সঙ্গেই সাধনার প্রথম চরণে সেই পরমাত্মা সাধককে শূদ্র শ্রেণীতে প্রবৃত্তি প্রদান করেন, তার সেই প্রকারই স্বভাব হয়ে যায়। দ্বিতীয় সোপানে তিনি ভরণপোষণ এবং আত্মতৃপ্তির বস্তুগুলি সংগ্রহ করেন। তৃতীয় অবস্থাতে তিনি বিরাট প্রকৃতির সঙ্গে যে-সংঘর্ষ শুরু হয় তা করে

যাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন। শীর্ষস্থান অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে ব্রহ্ম স্বীয় ব্রহ্মময়ী আত্মা থেকে আর্জব, মনের শমন, সরলতা, ধারাবাহিক চিন্তন ইত্যাদি গুণগুলি প্রকাশিত করে স্বয়ং রথীরূপে আরূঢ় থেকে পূর্ণ তত্ত্বের দিশাতে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে বিভূষিত করে এবং এই স্থিতি থেকে সঞ্চালিত করে ক্রমশঃ অপরিবর্তনশীল স্থিতি পার করিয়ে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেন। এই প্রকার বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থাও জীবের পরমকল্যাণের ধারণার নির্দেশমাত্র; এমন নয় যে, কোন পুরুষ দন্ডায়মান যার মস্তক আকাশ এবং চরণ রসাতলে স্থিত। অতএব এই ক্রিয়াত্মক পথ এবং তাতে চালিত করার ক্ষমতা আজও সিদ্ধ মহাপুরুষেদের মধ্যে রয়েছে এবং সেই মহাপুরুষদের কাছ থেকে তাঁদের অনুভূতিগুলির জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে, যেমন বিরাট স্বরূপ গুলির বিস্তার দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গতি করুন এবং এটাও কৃপা দ্বারা লাভ হয়।

সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরি তেহী। চিতবহিঁ রাম- কৃপা করি জেহী।। ***(মানস, ৭/৬৮/৭)***

মানসের এটা নির্ণয় কারণ মানসও তো 'নানাপুরাননিগমাগম'-এর সার।

বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গ গুলিতে গীতা ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রে অনুসন্ধান করার প্রশ্নই উঠছে না কারণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-এর বাণী সকল দিক থেকে পূর্ণ এবং উপনিষদের সারাংশ। এখানে উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা যাক বর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ জেনে অভিশপ্ত অজগরের দেহ ত্যাগ করে মহারাজ নহুষ পরমধাম লাভ করেছিলেন।

স্ত্রী এবং ভাইদের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠির বনবাস কালে দিন অতিবাহিত করছিলেন। ভীম মৃগয়া করতে ভালবাসত। একদিন ভীম মৃগয়া থেকে ফেরেনি। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছিলেন। বাম অঙ্গ স্ফুরিত হচ্ছিল। তিনি মহর্ষি ধৌম্যকে গিয়ে বলেছিলেন- ''ঋষিপ্রবর ! আমার মনে হয় যে, ভীম কোন বিপদে পড়েছে। আমি অশুভ সঙ্কেত পাচ্ছি। চলুন , গিয়ে দেখি,'' মহর্ষিকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল । ভীম দ্বারা নিহত শত- শত বাঘ, হাতী, বন্যমহীষ পথে পড়েছিল তার সঙ্গে উৎপাটিত গাছপালাও ছিল। এই চিহ্নগুলি অনুসরণ করে যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পৌঁছেছিলেন যেখানে ভীম অজগরের বেষ্টনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ''ভীম ! তুমি মহাবলশালী। সৃষ্টিতে এমন কোন জীবধারী নেই যে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ; তবে তুমি একটা অজগর দ্বারা বেষ্টিত হলে কি করে? এই মহাভাগ অজগর কে?

ভীম বলেছিল-''ইনি আমাদের পূর্বপুরুষ-ধর্মাত্মা মহারাজ নহুষ। ব্রাহ্মণদের দ্বারা শাপিত হয়ে এখানে পড়ে আছেন। দিনের তৃতীয় প্রহরে যে জীবই এঁর অধিকৃত ভূমিতে এসে পড়ে, সে যত শক্তিশালীই হোক, সহজেই এঁর কাছে পরাজিত হয়ে এঁর আহার হয়। এটাও ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের প্রভাব।" তখন যুধিষ্ঠির নহুষকে বলেছিলেন- ''রাজন! আপনি তো মহা ধর্মজ্ঞ ছিলেন। আপনি বড়-বড় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন যার প্রভাবে ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তারপর আপনি ব্রাহ্মণদের অপমান করেছিলেন। আপনি এরূপ ভুল করলেন কি-করে? আপনি বিপ্রদের প্রভাব কি জানতেন না? নহুষ একথা শুনে জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন যে, আপনিই বলুন যে, বিপ্রের কি মহত্ত্ব? তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির দমন , মনের শমন, নির্জনে বাস, নিরন্তর চিন্তন, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, আর্জব,ক্ষমা, তপস্যা ইত্যাদি লক্ষণ যাঁর মধ্যে বিদ্যমান তিনি বিপ্র। তখন অজগর বেষধারী নহুষ বলেছিলেন যে, এই লক্ষণ গুলি তো শুদ্রের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন- তাহলে সেই শূদ্রও বিপ্র । অজগর পুনরায় বলেছিল, '' এই সমস্ত লক্ষণ বিহীন বিপ্রও হয়ে থাকে।" (নহুষের ভ্রান্তির কারণ এটাই ছিল। সেইজন্য তিনি মহর্ষিদের দিয়ে পালকী তুলিয়েছিলেন এবং তাঁরা জন্মজাত কুলীন নন জানতে পেরে পদাঘাত করেছিলেন।) যুধিষ্ঠির নির্ণয় দিয়েছিলেন যে,'' এই সমস্ত লক্ষণ বিহীন ব্যক্তি স্বভাবতঃ শূদ্র বিপ্র নয় " একথা শুনেই মহারাজ নহুষ তৎক্ষনাৎ স্বরূপ ধারণ করেছিলেন ভীমকে মুক্ত করে যুধিষ্ঠিরকে বিজয়ী হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

ইন্দ্রপদ এবং বিলাসিতার সামগ্রী পেয়ে নহুষ মদান্ধ হয়ে শচীকে পর্যন্ত লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন। অত্রি, অগস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি বিপ্রগণদের দিয়ে পালকী বহন করিয়েছিলেন কারণ তাঁদের জন্মজাত কুলীন ভাবা হত না। বিলম্ব অসহ্য মনে হলে শীঘ্র চলার জন্য মহর্ষিদের সর্প -সর্প বলে উৎসাহিত করেছিলেন । দয়ালু বিপ্রগণ প্রথমে তো সহ্য করেছিলেন কিন্তু অগস্ত্যকে যখন পদাঘাত করেছিলেন তখন তিনি বলে উঠেছিলেন- ''যাও, সর্প হয়ে যাও।"

নহুষ যখন দেখলেন যে তিনি পালকী থেকে পতিত হয়ে অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করার জন্য পৃথিবীতে যাচ্ছেন তখন ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, বলেছিলেন -''আমি কি করে উদ্ধার হব?" মহর্ষিগণ আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন- '' ভবিষ্যতে পরম ধর্মজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করবে, তাঁর

কাছে বিপ্রের যথার্থ মহিমা শ্রবণ করলে তুমি এই অধম যোনি থেকে মুক্ত হবে।" মহিমা শ্রবণ করেই নহুষ পরম ধামে গমন করেছিলেন। অতএব বিপ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের এই নির্ণয় নির্বিবাদ, যার যথার্থতার প্রভাবে নহুষের সদ্‌গতি তৎক্ষণাৎ হয়ে গিয়েছিল। বর্ণব্যবস্থার সম্বন্ধে এর থেকে সত্য আখ্যান্ কি হবে, যার প্রভাবে নহুষ অধম যোনি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই আখ্যান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, বর্ণ ব্যবস্থার সম্বন্ধে ভ্রান্তি প্রত্যেক যুগে ছিল। সত্যযুগে উৎপন্ন নহুষের ভ্রান্তির নিরাকরণ দ্বাপরযুগেই হয়েছিল। এর মাঝে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ উৎপন্ন হয়নি যে নহুষের ভ্রান্তির নিরাকরণ করত এবং সেটাও বিপ্রের আশীর্বাদের ফল ছিল। তা না হলে যুধিষ্ঠিরের সেই বুদ্ধি আসত কোত্থেকে? অতএব বন্ধুগণ! বিপ্রদের উচিত নিজেদের স্বরূপের রক্ষা উপযুক্ত সদ্‌গুণ গুলির সৃজন করে করবেন। অন্যান্য বর্ণ, বর্গ সম্প্রদায়ের যে- যে- প্রত্যাশী এই অবস্থা অতিক্রম করেন, তাঁরা মহান্। এই ক্রিয়া, বিধার উপলব্ধির একটাই মাধ্যম ছিল এবং থাকবে যে, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করুন চিরন্তন সত্য এটা। সেই প্রকার কার্যই করুন যাতে তিনি প্রসন্ন হবেন, যাঁর কৃপায় আপনি সত্য লাভ করতে সক্ষম হবেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ইঙ্গিত করেছেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। *(গীতা, ৪।৩৪)*

'অর্জুন! তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণের কাছে যাও। দন্ডবৎ প্রণাম করে তাঁর সেবা কর এবং নিষ্কপটভাবে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞান লাভ কর।' হৃদয়ে ঈশ্বরের জাগৃতি এবং নিজের মন থেকে বৌদ্ধিক স্তরের কার্য করা দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল-এর প্রভেদ রয়েছে। বৌদ্ধিক নির্ণয় নাস্তিকতা এবং পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অতএব কোন-তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবা অনিবার্য। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই মাধ্যম। "জিন খোজা তিন পাইয়াঁ।" এই প্রকারের মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও দর্শন লাভ পুণ্য-পুরুষার্থ দ্বারাই সম্ভব হয়।

প্রশ্ন- মহারাজজী! মহাপুরুষের প্রাপ্তি কোথাও তো আপনি কৃপা বলেছেন এবং কোথাও পুরুষার্থের ফল বলেছেন, এই প্রকার কেন?

উত্তর- দেখুন, সাধকের ভাবই এদিক থেকে কৃপারূপে বর্ষিত হয়। ভাবই পুণ্য বৃদ্ধি করে এবং 'ভাববস্য ভগবান'। 'ভাবে বিদ্যতে দেবা।'

।।ওঁ।।

বর্ণসঙ্কর

প্রশ্ন- মহারাজজী ! অর্জুন শঙ্কিত ছিলেন যে, যুদ্ধ করলে এত বেশী লোক মারা যাবে যে স্ত্রীগণ কলুষিত হবে। বর্ণসঙ্কর দেখা দেবে যার ফলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথাও এই আশঙ্কার সমাধান করেননি যে বর্ণসঙ্কর কাকে বলে ? কি প্রকারে হয় ?

উত্তর- শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রত্যেকটি শঙ্কার সমাধান করেছিলেন। শস্ত্র সঞ্চালনের জন্য যখন সকলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল যে, হে অচ্যুত ! আমার রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন, যাতে আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত এঁদের উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতে পারি যে, আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ? শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করেছিলেন তখন অর্জুন সেই আঠারো অক্ষৌহিনী জনসমূহের মধ্যে নিজের আত্মীয় স্বজনদের দেখতে পেয়েছিল। অর্জুন সেখানে পিতৃব্যগণকে, পিতামহগণকে, আচার্যগণকে, মাতুলগণকে, ভ্রাতাগণকে, পুত্রগণকে, পৌত্রগণকে, মিত্রগণকে, শ্বশুরগণকে ও সুহৃদগণকে অবস্থিত দেখেছিল। এই গণনাতে মোট দশটি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে নিজের মামা বাড়ির, শ্বশুরবাড়ির লোকজন, সুহৃদ এবং গুরুজনই ছিলেন। আঠারো অক্ষৌহিনী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় আরব-এর কাছাকাছি হবে। মহাভারতকালের গণনা অনুসারে আঠারো অক্ষৌহিনী অর্থাৎ আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ্যের সমান হবে। এত জনসমূহে অর্জুন শুধু নিজের সুহৃদ, আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে পেয়েছিল; অন্য কাউকে নয় ? এত বেশী আত্মীয় স্বজন কি কারও হয় ? কখনই না। বস্তুতঃ মহাভারত অন্তঃকরণের যুদ্ধ।

বন্ধুগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অর্জুনের শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। সে বলেছিল- ভগবন্ ! আমি আত্মীয়দের হত্যা করে কি সুখী হব ? কুলধর্ম সনাতন। এই যুদ্ধে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে। কুলধর্ম শাশ্বত, যুদ্ধ করলে। শাশ্বত ধর্ম নষ্ট হবে। পুরুষগণ সংহার হলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হবেন এবং পিন্ডক্রিয়া লুপ্ত হবে। কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে এবং তাদের জন্ম কুল ও কুলনাশকদের নরকে পতিত করার জন্যই হয়ে থাকে। আমরা বুদ্ধিমান্ হয়েও মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। অর্জুন এটা বলছে না যে শুধু আমিই ভূল করছি, পরন্তু সে শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করছে যে, আপনিও ভুল করছেন। অর্জুন

বলছে যে, যাঁদের জন্য ভোগ আমার অভিলষিত, তাঁরাই প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তবে আমার সাম্রাজ্যের কি প্রয়োজন? অতএব আমি যুদ্ধ করব না। এখানে অর্জুন দুটি প্রশ্ন মুখ্যরূপে উত্থাপন করেছে। প্রথমতঃ এই যে সনাতন ধর্ম লুপ্ত হবে। সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণ এর একটাই উত্তর দিয়েছিলেন যে, অর্জুন! এই বিষমস্থলে, বিশ্বে যার সমতার কোন স্থান নেই, তোমার অজ্ঞান কোথা থেকে উৎপন্ন হল? যে ক্ষমতার যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি বলছি, সেই ক্ষমতার সংঘর্ষ নিঃসন্দেহে আর কিছু নেই।

তবে কি শাশ্বত ধর্মের সুরক্ষার জন্য ব্যগ্র হওয়া অজ্ঞানতার লক্ষণ? বর্ণসঙ্করের জঘন্য দোষ থেকে রক্ষা করার প্রয়াসও কি অজ্ঞান? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- হ্যাঁ অর্জুন! তুমি যেটাকে সনাতন ধর্ম বলছ, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনও এর আচরণ করেননি এবং এটা পরমকল্যাণও করে না, কীর্তিদায়কও নয়। প্রমাণিত হচ্ছে যে, অর্জুন যেটাকে সনাতন ধর্ম বলে মনে করত, সেটা সনাতন ধর্ম ছিল না এবং তার বর্ণের সঠিক জ্ঞানই ছিল না । সেটা অর্জুনের ভ্রম মাত্র ছিল। তবেই তো সে বলেছিল-

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।(গীতা, ২।৭)

“ধর্ম বিষয়ে আমার চিত্ত বিমূঢ়, আমি আপনার শিষ্য,আপনার শরণাগত, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আমার পক্ষে যা কল্যাণকর তা নিশ্চয়পূর্বক বলুন।” অর্জুন পরমকল্যাণের অধিকারী হতে চেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ আগে সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যা করেছিলেন, তদনন্তর বর্ণসঙ্করের উপর আলোকপাত করেছিলেন। এখন বর্ণসঙ্করের বিষয়ে কিছু বিচার করা যাক। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন এই কর্ম না করে, না তো কেউ সেই পরম নৈষ্কর্ম্যস্থিতি লাভ করতে পারে এবং না ভবিষ্যতে কেউ লাভ করতে পারবে। কর্ম দ্বারাই এই মানুষ জীবন সফল হতে পারে, কিন্তু যিনি আত্মরত , আত্মতৃপ্ত এবং আত্মসন্তুষ্ট তিনি কর্ম করলেও কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলেও কোন লোকসান হয় না। প্রমাণিত হচ্ছে যে, কর্ম সেই আত্মা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করায় তারপর কর্ম করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এই কর্ম না করে পূর্বেও কেউ লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ লাভ করতে পারবে না। তাঁকে লাভ করার একমাত্র মাধ্যম কর্ম। মানব- দেহের সার্থকতা এটাই।

"পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোন কর্তব্য বাকী নেই এবং প্রাপ্ত যোগ্য বস্তু কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রাপ্ত নেই, তা সত্ত্বেও আমি কর্ম করি। যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তবে এই সব লোক ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা হব।"

গীতার অনুসারে কর্মের তাৎপর্য আরাধনাই , যার দ্বারা আরাধ্যদেব প্রসন্ন হন, আত্মার সাক্ষাৎকার হয় এবং যা সংসার বন্ধন থেকে সদা-সর্বদার জন্য মুক্তি প্রদান করে।

স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর হয় এতো শোনা গেছে কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটা নতুন কথা বলছেন যে, স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষ যদি নিরন্তর চিন্তন না করেন তবে সকলে বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে। বস্তুতঃ এই জীবাত্মার শুদ্ধ বর্ণ পরমাত্মা-

হংসা তূঁ সুবরন বরন, হলকী তেরী চাল।
এক তলা কে বীছুরে , বিকল ফিরে বেহাল।।

এই হংস (জীবাত্মা)বস্তুতঃ 'সুবরন' শুদ্ধ বর্ণের । শুধু স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আত্মার পরমাত্মা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করায় যে প্রক্রিয়া-বিশেষ, তারই নাম কর্ম। এই কর্ম করে পূর্বে জনক ইত্যাদি মহর্ষিগণ নৈষ্কর্ম্য স্থিতি লাভ করেছিলেন, এই স্থিতি লাভের পর কর্ম করলে লাভও হয় না এবং ত্যাগ করলে লোকসানও হয় না। তা সত্ত্বেও এইরূপ মহাপুরুষ কর্ম করেন, কারণ যদি এইরূপ মহাপুরুষ সতর্ক হয়ে কর্ম না করেন তবে সাধারণ মানুষ তাঁদের নকল করবে যে, মহারাজজী তো প্রায়ই বসে থাকেন, ভজনা তো করেনই না। এইরূপ অন্ধ অনুকরণ করার ফলস্বরূপ তারা শ্রেয় পথ থেকে চ্যুত হয়। যে ব্যক্তিই চিন্তন পথে নিযুক্ত, সে নিজ বর্ণ, শুদ্ধ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যদি সে আরাধনা থেকে চ্যুত হয় তবে সে প্রকৃতির বশ হচ্ছে। একেই বর্ণসঙ্কর বলে। পরমাত্মাই আমাদের শুদ্ধ বর্ণ। তাঁকে লাভ করার চেষ্টা না করে জড় প্রকৃতিতে ভ্রান্ত হয়ে ঘোরার নামই বর্ণসঙ্কর।

সারাংশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বলার আশয় এই যে, এই কর্ম না করে সেই পরম নৈষ্কর্ম্যের স্থিতি কেউ লাভ করতে পারেনি, এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। কর্ম অর্থাৎ আরাধনা অনিবার্য। কিন্তু যিনি কর্ম করে আত্মরত, আত্মতৃপ্ত ও আত্ম সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলে লোকসানও হয় না তা সত্ত্বেও সেই মহাপুরুষ অনুগামীদের পথপ্রদর্শন করার জন্য কর্ম করেন। কদাচিৎ সেই মহাপুরুষ কর্ম না করলে সেই মহাপুরুষের তো কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু তাঁর

অনুগামী সমাজ বর্ণসঙ্করে পরিণত হবে। সমাজ মহাপুরুষগণের অনুকরণ করেই, কারণ তাঁরা সকল জীবাত্মার মূল কেন্দ্রে স্থিত রয়েছেন। যে প্রকার সমস্ত নদীই সমুদ্রাভিমুখী সেই প্রকার সমস্ত জীবাত্মার কেন্দ্র পরমাত্মা। তিনিই সকলকে সঞ্চালিত করছেন। সেই স্তরে মহাপুরুষও স্থিত হন। সেইজন্য সমস্ত জীবাত্মা মহাপুরুষদের অনুসরণ করেই। শুধু উপদেশে সাধন পদ্ধতি বোঝাও সম্ভব নয়। মহাপুরুষগণ সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং লোক-শিক্ষার জন্য আদর্শ প্রস্তুত করেন। কিন্তু যদি মহাপুরুষ কর্মরত না থাকেন তবে কতিপয় সাধক সাধনা স্থগিত করে মহাপুরুষের অনুকরণ করে নিজেকে সিদ্ধ বলে পরিচয় দেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ না হয়ে স্বরূপ লাভের পথ থেকে সরে যান এবং বর্ণসঙ্কর হয়ে যান।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জ্ঞানী পুরুষের লক্ষ্য রাখা উচিৎ যাতে কর্মরত অজ্ঞানীগণের বুদ্ধিভ্রম না হয় পরন্তু তাদের উচিৎ স্বয়ং উত্তমরূপে নির্ধারিত কর্ম করে তাদেরও সেই কর্ম করার জন্য প্রেরণা দেন। যদি মহাপুরুষগণ এরূপ না করেন তবে তাঁরা বর্ণসঙ্করের কর্তা হবেন কারণ সাধক তাঁদের অনুকরণ করে সাধনা থেকে বিরত হবেন,আত্মিক পথ থেকে চ্যুত হবেন। অন্য শব্দে বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবেন। ঠিক এই প্রকার যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই মণীষীদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন যে, যদি সেই মহাপুরুষগণ সাবধান হয়ে ক্রিয়ারত না থাকেন অথবা আমি কর্মরত না থাকি তবে বর্ণসঙ্করের কর্তা হব।

যতদূর প্রশ্ন স্ত্রীগণ কলূষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় তা মহাপুরুষগণের দৃষ্টিতে সেটা দোষ নয়। কিন্তু সামাজিক সংগঠনের জন্য রক্তের শুদ্ধতা অপরিহার্য। এটা জীবনের মর্যাদা কল্যাণপথ-অন্বেষণ-এর প্রথম সোপান। দাম্পত্য সত্যের জন্য সমাজে নিতান্ত আবশ্যক। এর ফলে মাধুর্য থাকে, আমেরিকার মত নষ্ট হয় না। প্রশ্নকর্তা অর্জুন, সমস্ত পান্ডব, স্বয়ং পান্ডু, ব্যাস এঁরা সকলে বর্ণসঙ্করই ছিলেন। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ মহাপুরুষ লৌকিক দৃষ্টিতে বর্ণসঙ্করই ছিলেন। তবে তো তাঁদের মুক্তি আটকে যাওয়া উচিত ছিল। ‘নরকেহনিয়তং বাস’- এর বিধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বর্ণসঙ্কর তাঁদের পথে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাতা- পিতার ক্রটির কোন মন্দ প্রভাব কর্তব্য-পরায়ণ পথিকের উপর পড়ে না।

যীশুখ্রীষ্ট বর্ণসঙ্কর ছিলেন। তাঁর মাতা ঠাকুরানীর যখন বিবাহ স্থির হয় তখন তাঁর গর্ভে সাত মাসের বালক ছিল। সমাজ ‘মারিয়াম’ কে কুলক্ষণা বলে তাঁকে

সমাজ এবং নগর থেকে নির্বাসন দেওয়ার বিষয়ে বিচার করেছিল। (মনে হয় পাতিব্রত ধর্ম সে সময় জেরুজালেমে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তো কাউকে নির্বাসন দেওয়া হয় না) অতঃপর স্বপ্ন দেখেছিল কিছু ব্যক্তি যে, এঁর গর্ভের বালক পবিত্রাত্মা। পরে সকলে যোগ করছিল যে,তিনি পবিত্রাত্মার সংসর্গ এর ফলস্বরূপ গর্ভবতী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ কোন পুণ্যাত্মাই গর্ভে ছিল, ভগবান মেরীর সঙ্গে গন্ধর্ব বিবাহ করেননি। পরবর্তীকালে যীশু খুব উচ্চ স্তরের মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। বিশ্বের জনসংখ্যার বড় একটা ভাগ তাঁর অনুগামী। ভারতীয় বিচারধারা, ভারতীয় দর্শনই তাঁর উপদেশেও পাওয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ সকল মহাপুরুষের উপদেশ এক ধরণের, কারণ একটি মাত্র সত্তাকেই সকলে প্রত্যক্ষ করেছেন তাহলে অন্য কিছু বলবেনই বা কি করে? স্থিত প্রজ্ঞ মহাপুরুষ সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতেই পারেন না। তাঁরা কখনও বলবেন না যে, আপনি হিন্দু, সে খ্রীষ্টান, তুমি বৌদ্ধ, জৈন, পারসী অথবা শিখ ধর্মাবলম্বী। মহাপুরুষদের নাম নিয়ে তাদের অনুগামীরা পরবর্তীকালে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহাপুরুষের নামে তারা বহু ভ্রান্তি, কুরীতি, সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষের শিষ্যগণ এরূপ করে থাকেন। বুদ্ধ,যীশু, মোহম্মদ, কবীর সকলের উপদেশ-এর মধ্যে ভ্রান্তি কুরীতি দেখা যায়। যদি কেউ সেই সত্তাকে স্পর্শ করেছে, যিনি সকলের আত্মায় সঞ্চারিত, তবে তিনি মানুষের মধ্যে বিভেদ কি করে সৃষ্টি করবেন? যদি বিভেদ সৃষ্টি করেন তবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি লক্ষ্য থেকে এখনও দূরে রয়েছেন।

কবীরকে 'লহরতারা'- এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। অনুগামীগণ বানিয়ে বলেছে যে, প্রকাশপুঞ্জ আকাশ থেকে নেমেছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পদ্মফুলের চারিদিকে ঘুরে তারপর প্রকাশপুঞ্জ বালকে রূপান্তরিত হয়ে ফুলের উপর স্থির হয়েছিল। তাঁতীর স্ত্রী দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে এসেছিল। এই প্রকার স্বয়ং পরম চেতন পরমাত্মাই কবীররূপে প্রকট হয়েছিলেন। মাতা-পিতার সংযোগে তিনি উৎপন্ন হননি। কিন্তু কবীর নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে, আমিই কবীর এমন কথা নয়; আপনিও কবীর হতে পারেন-

কবিরা- কবিরা ক্যা করৈ, সোধো সকল শরীর।
আশা তৃষ্ণা বস করে, সোঈ দাস কবীর।।

কবীর শ্রেষ্ঠপুরুষ, কবীর মহাত্মা - কি কবীর- কবীর উচ্চারণ করছ? **'সোধো সকল শরীর'** স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটি দেহই খুঁজে নাও। কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা

থাকতে সেই অনুসন্ধান সম্ভব নয়। অতএব '**আশা, তৃষ্ণা বস করে**' -যিনিই বশ করেছেন '**সোঙ্গ দাস কবীর।**' যতটুকু আমি করেছি, আপনিও করে নিন তাহলে আপনিও কবীর হয়ে যাবেন। '**কায়া কা বীর সোঙ্গ কবীর**।'

ঠিক এই প্রকার বশিষ্ঠ উর্বশীর গর্ভ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বাল্মীকি কোল জাতির ছিলেন। কোলদের মাঝেই ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে মহর্ষিতে পরিণত হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র শেষে মহর্ষি হয়েছিলেন। ধীবর কন্যার পুত্র ব্যাসদেব বর্ণসঙ্কর ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মর্ষিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মাতা-পিতার ভুলের কোন প্রভাব জাতকের উপর পড়ে না। '**অপনী করনী পার উতরনী**।' -সকলেই নিজ কর্ম অনুসারে তৈরী ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মাতা-পিতা, স্ত্রী -পুরুষ, সন্তান সকলেই জন্ম জন্মান্তরের ঋণ শোধ করছে; কেউ পিতা হয়ে, আবার কেউ পুত্র হয়ে। 'ঋণ শোধ' বর্ণ সঙ্কর এক নয়। বস্তুতঃ বর্ণসঙ্করের তাৎপর্য হল এই যে যদি আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ কর্ম না করেন তবে তাঁকে অনুকরণ করে কর্ম ত্যাগ করেছে যারা, তারা বর্ণসঙ্করে পরিণত হয়।

।। ওঁ।।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ

প্রশ্ন -মহারাজজী ! জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগে কি পার্থক্য? উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি?

উত্তর- রণভূমিতে উপস্থিত স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সে বলেছিল যে, স্বজনদের বধ করে আমি কিরূপে সুখী হব? পৃথিবীতে নিষ্কন্টক ধনধান্য সম্পন্ন রাজ্য এবং ত্রিলোকের সাম্রাজ্য লাভ হলেও আমার ইন্দ্রিয় বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করতে পারে এমন কোন উপায় দেখছি না । অতএব যদি এই মাত্র লাভ হবে, তবে আমি যুদ্ধ করব না। এর থেকে ভিক্ষান্ন শ্রেয়স্কর । হ্যাঁ, এর থেকে উত্তম যদি কোন সত্য থাকে তবে আমাকে তা বলুন, যাতে আমি পরম কল্যাণের অধিকারী হতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়েছিলেন- অর্জুন! এই যুদ্ধে পরাজয় হলে দেবত্ব, জয়লাভ করলে মহামহিম স্থিতি লাভ হবে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এই সংঘর্ষে দৈবী সম্পত্তি অর্জিত করতে- করতে যদি দেহের সময় ফুরিয়ে যায় তবে দেবত্ব তো লাভ হবেই, সাধনা সম্পূর্ণ করতে পারলে সেই মহামহিম পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ হবে , যেখান থেকে মহিমা প্রসারিত হয়। অতএব জয়-পরাজয়, লাভ লোকসান, সিদ্ধি -অসিদ্ধিকে সমান বুঝে যুদ্ধ কর।

অর্জুন! এই বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞান যোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন বুদ্ধির কথা? এই যে নিজের লাভ-লোকসান স্বয়ং বিচার করে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ তো করতেই হবে। লাভ-লোকসান স্বয়ং বিচার করে সাধনা সম্পূর্ণ তো করতেই হবে। হাত গুটিয়ে বসে যাওয়ার নাম জ্ঞানযোগ নয়। বহু ব্যক্তি সাধনা না করেই বলে বেড়ায়,''আমি আত্মা,পূর্ণ। আত্মাই অজর- অমর এবং শাশ্বত-" এইপ্রকার চিন্তন করা জ্ঞান যোগ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেখানে আত্মাকে অজর, অমর অপরিবর্তনশীল ইত্যাদি বললেন, সেখানে একথা বললেন না যে, এটা জ্ঞানযোগ। সেখানে তো শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, আত্মাকে এই সমস্ত বিভূতি দ্বারা যুক্ত শুধু তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। সেটা তো মহাপুরুষগণের স্থিতি, সাধনা নয়। সেটা তত্ত্বদর্শন, জ্ঞানযোগ নয়। বস্তুতঃ নিজের ভরসায় কর্ম করার নাম জ্ঞানযোগ। ''আমি বর্তমানে এই স্তরে রয়েছি, ভবিষ্যতে সেই স্তর পার করব। যদি পারে যেতে সমর্থ হই তবে মহামহিম স্থিতি লাভ করব অন্যথা দেবত্ব লাভ তো নিশ্চয় করব"- এই প্রকার নিজের ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দিয়ে স্বয়ং নির্ণয় করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই

জ্ঞানযোগ।

অর্জুন ! এই বুদ্ধির কথা তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। এখন একেই তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন! জ্ঞানযোগ-এর সাহায্যে তুমি যে স্থিতি লাভ করবে সেই স্থিতিই কর্মযোগের আচরণ দ্বারাও লাভ করতে সক্ষম হবে। উভয়ের লক্ষ্য এবং ক্রিয়া এক। হ্যাঁ করার পদ্ধতি দুটি। তবে সেই কর্মযোগে কি করতে হবে? অর্জুন! শুধু কর্মেই তোমার অধিকার রয়েছে ফলে নেই। এইরূপ চিন্তা কর যে, ফলই নেই, কর্ম করার সময় তোমার মনে অশ্রদ্ধাও যেন উৎপন্ন না হয়- এটাই কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগে সাধকের মনে কোন কামনা থাকে না। ইষ্টের উপর নির্ভর করে তিনি এই পথে চলেন সেইজন্য একে নিষ্কাম কর্মযোগও বলা হয়। এখানে অনুরাগী নিজের আরাধ্যের আশ্রিত হয়ে তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যান। অনুরাগী এটা তো জানেন যে, কখনও পার অবশ্যই হবেন কিন্তু কখন এবং কতকাল পরে, তা জানেন না। তিনি যা কিছু করতে সমর্থ হন, তা কর্তার উপলব্ধি নয়, আরাধ্যের কৃপা সেটা।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছে যে, ভগবন্! নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তবে আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? কর্মযোগ অর্জুনের ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। জ্ঞানযোগ সরল মনে হয়েছিল কারণ জ্ঞানযোগে পরাজয় হলে দেবত্ব লাভ হবে। সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে দেহের সময় ফুরিয়ে গেলে দেবত্ব লাভ হবে, লাভই হবে এবং যদি জয়লাভ হয়, দেহ থাকতে থাকতেই মন সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, তবে সর্বস্ব লাভ হবে। মহামহিম স্থিতি লাভ হবে। দুদিক থেকেই লাভ হবে। স্বতন্ত্র ভাবে নিজের লাভ-লোকসান বুঝে চলতে হবে, অতএব অর্জুনের সরল মনে হয়েছিল। নিষ্কাম কর্মযোগে কর্মে রত থাকার অধিকার রয়েছে,ফলের বাসনা যেন না থাকে । এই প্রকার চিন্তা করবে যে, ফলই নেই। কর্মের প্রতি যেন অশ্রদ্ধাও উৎপন্ন না হয়। নিরন্তর কর্ম করার জন্য তৎপর হও।

হ্যাঁ অল্প একটু প্রলোভন অবশ্যই রয়েছে যে, কখনও না কখনও কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত অবশ্যই হবে কিন্তু যা কিছু বোঝানো হয়েছে তাতে বর্তমানে তো কিছু লাভ হবে না, তবে এমন কে আছে যে ব্যর্থ পরিশ্রম করবে। যদ্যপি পরে এই নিষ্কাম কর্মযোগ মহান্ বিভূতিগুলির জ্যোতি উদ্ভাসিত করে কিন্তু ক্ষণ প্রতিক্ষণের উপলব্ধি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সাধকের গোড়ার দিকে এটা নিরস প্রতীত হয়। সেই জন্য

অর্জুন বলেছিল যে, আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর নিষ্কাম কর্মযোগে কেন নিযুক্ত করছেন? নিষ্কাম কর্মযোগ অর্জুনের ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছিল।

তখন তাঁকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! পূর্বে আমি দুই প্রকারের নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছি। পূর্বের আশয় সত্যযুগ অথবা ত্রেতা নয় পরন্তু যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলে এসেছি- জ্ঞানীগণের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং কর্মযোগীগণের নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা; কিন্তু কোন মার্গ অনুসারে কর্ম ত্যাগ করার কোন বিধান নেই।

এমন কথাও নয় যে, কর্ম শুরু না করে কেউ নিষ্কর্মতার পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারবে। এবং যে ক্রিয়া শুরু করা হয়েছে তা ত্যাগ করলেও কেউজ্ঞানী হতে পারবে না। সেইজন্য জ্ঞানযোগ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, কর্ম তো করতেই হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলেছেন যে, কর্ম এবং অগ্নি ত্যাগী জ্ঞানী হতে পারে না। এখানে তিনি শুধু ক্রিয়া সম্বন্ধেই বলেছেন। কর্ম শুরুই করা হয়নি তবে কি প্রকার নিষ্কর্মী?

শ্রীকৃষ্ণকালেও এইরূপ ভ্রান্তি প্রচলিত ছিল সেইজন্য তিনি নিরাকরণ করলেন যে, অকর্মণ্যতা কখনই নিষ্কর্মতা নয়। কারণ কোন ব্যক্তিই ক্ষণমাত্রও কর্ম না করে থাকতে পারে না। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ দ্বারা বশীভূত হয়ে কর্ম করে। যতক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে, ততক্ষণ সেই অনুসারে কার্যও সম্পন্ন হবে। হ্যাঁ যখন যজ্ঞের পূর্তিকালে জ্ঞানামৃত পানকারী পুরুষ শাশ্বত সনাতন ব্রহ্মে প্রবেশ করে, তখন প্রকৃতি বিলীন হয়ে যায়, সেইজন্য তাঁদের কর্ম আবদ্ধ করে না। সেই জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম দগ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ লাভ না হয়, ততক্ষণ কর্ম নিতান্ত আবশ্যক। তা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি হঠপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করে মনে-মনে বিষয় চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- তারা দম্ভাচারী ধূর্ত, ভন্ড। অতএব জ্ঞানযোগ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, কর্ম তো যে কোন দশাতে করতেই হবে। উভয়ের ক্রিয়া এক, সাধনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি এক, উপাধি এক। পার্থক্য এটুকুই যে, নিষ্কাম কর্মযোগী ইষ্টের উপর নির্ভর করে, নিজেকে সমর্পিত করে কর্ম করেন এবং জ্ঞানযোগী নিজের বলাবল বিচার করে পূর্তিপর্যন্ত সেই কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন যতক্ষণ সেই শাশ্বতকে লাভ না করতে পারছেন, কর্মে প্রবৃত্ত থাকার ইচ্ছা দরকার।

যখন কর্ম করতেই হবে তখন '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**' *(গীতা, ৩/৮)* - অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। সেই নির্ধারিত কর্ম কোন্‌টি? '**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকো**

হয়ং কর্মবন্ধনঃ।' *(গীতা, ৩।৯)* -একমাত্র কর্ম হল যজ্ঞের প্রক্রিয়া এছাড়া জগতে যা কিছু করা হয় তা কি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- না, তা তো এই লোকের একটা বন্ধন। এই যজ্ঞের প্রক্রিয়ায় জ্ঞানযোগে রত থাকতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াই নিষ্কাম কর্মযোগেও রত থাকতে হবে, দুটিতেই এই যজ্ঞ করা হয়। যজ্ঞ ছাড়া দুনিয়াতে যা কিছু করা হয় তা এই লোকেরই বন্ধন; কর্ম নয় কারণ কর্ম তো '**মোক্ষ্যসেহশুভাৎ'** *(গীতা, ৪।১৬)*-অশুভ অর্থাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে, আবদ্ধ করে না।

এখন অর্জুন উত্তমরূপে অবগত হয়েছে যে, জ্ঞানমার্গ হোক অথবা কর্মমার্গ, উভয় প্রণালীতে কর্ম তো করতেই হবে। ক্রিয়া দুটিতেই এক। সে জানতে চেয়েছিল যে, উভয়ের মধ্যে উত্তম কোন্‌টি? কোন্ মার্গ সুবিধাজনক। সে প্রশ্ন করেছিল-

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।*(গীতা, ৫।১)*

ভগবন! কখনও আপনি নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশংসা করছেন এবং কখনও জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মের প্রশংসা করছেন। উভয়ের মধ্যে আপনি যেটি উত্তমরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, যেটি পরমকল্যাণকর তা আমাকে বলুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অর্জুন! দুটিই পরমকল্যাণকর । সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে, কর্ম করা হয় সেই কর্ম এবং নিষ্কাম কর্মযোগ দুটিই পরমকল্যাণকর কিন্তু জ্ঞানযোগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অর্জুন! যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না; কিছুই আকাঙ্খা করেন না- এই প্রকার নিষ্কাম কর্মযোগীকে সর্বদা সন্ন্যাসী বলে জানবে। সন্ন্যাস, সাংখ্য অথবা জ্ঞানযোগ দ্বারা যে পরমতত্ত্ব লাভ করা হয়, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও তাই লাভ করা হয়। দুটি একই স্থানে পৌঁছায়। মূঢ়গণই দুটিকে পৃথক্- পৃথক্ বলে, বিবেকীগণ এইরূপ বলেন না। যিনি উভয়কেই ফলের দৃষ্টিতে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। কিন্তু অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ ব্যতীত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। জ্ঞানযোগে নিষ্কাম কর্মযোগেরই আচরণ করতে হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ না করে কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। কর্ম তো সেই একটাই, করতেই হবে। যিনি ভগবৎস্বরূপ মনন করেন, সেই যোগ -যুক্ত পুরুষ তৎক্ষনাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হন। সেই যোগযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত পুরুষ, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ বিশেষরূপে জয় করেছেন, কর্মে নিযুক্ত থেকেও লিপ্ত হন না।

যুক্ত পুরুষ কর্ম করলেও কেন লিপ্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- **'যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ' (গীতা, ৫।৮)** তিনি সেই তত্ত্বে স্থিত হয়ে গেছেন। সেইজন্য শ্রবণে, স্পর্শনে,

আঘ্রাণে, ভোজনে, নিদ্রায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষেও ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব-স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত, এইরূপ ধারণা যুক্ত হন। এটা যুক্ত পুরুষের লক্ষণ। প্রাপ্তির পর যুক্ত পুরুষের স্থিতির চিত্রণ এটা। যে প্রকার পদ্মপাতা জলে থাকা সত্ত্বেও জল একে সিক্ত করতে পারে না, ঠিক সেই প্রকার যুক্ত পুরুষ সংসারে থাকা সত্ত্বেও সংসারে লিপ্ত হন না। এটা যোগযুক্ত পুরুষের লক্ষণ, জ্ঞানমার্গের সাধনার চিত্রণ নয়। বর্তমানে প্রায়ই লোকে বলে যে, আমি তো জ্ঞানী, ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব- স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত, আমার কর্ম করার প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি । এইরূপ ভ্রান্তি শ্রীকৃষ্ণকালেও ছিল। সেই সমস্তের উপর কটাক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করেছিলেন যে, এই লক্ষণ যোগযুক্ত পুরুষের এবং যুক্ত এক স্থিতি বিশেষ। যুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যে বাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। *(গীতা, ৬/১৮)*

বিশেষরূপে সংযতচিত্ত যেকালে পরমাত্মাতে উত্তমরূপে স্থিত হন; সেই কালে সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয়। এইরূপ পুরুষ কর্মে লিপ্ত হন না। যতক্ষণ এই স্থিতি লাভ না হয়, কর্ম তো করতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ের উপর বার- বার জোর দিচ্ছেন যে, জ্ঞানমার্গেও কর্ম ত্যাগ করার বিধান নেই।

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।। *(গীতা, ৬/১)*

কর্মফলের আশ্রয় না করে যিনি **'কার্যম্ কর্ম'** করণীয় প্রক্রিয়া বিশেষের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি শুধু অগ্নি এবং ক্রিয়া ত্যাগ করেছেন, কর্মত্যাগী সেই ব্যক্তি সন্ন্যাসীও নয়, যোগীও নয়।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পান্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।। *(গীতা, ৬/২)*

অর্জুন! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে; কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কোন পুরুষ সন্ন্যাসী অথবা যোগী হয় না। সঙ্কল্প উৎপন্ন এবং বিলীন মনের মধ্যে হয়। মন নিরুদ্ধ হলেই সঙ্কল্পগুলির নিবারণ সম্ভব। সঙ্কল্পগুলি নিরুদ্ধ হবে কিরূপে? শুধু মুখে বললে সঙ্কল্পের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ উপায় বলছেন-

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।(গীতা, ৬।৩)

যোগে আরোহন করতে ইচ্ছুক পুরুষকে কর্মে-রত থাকা উচিত। কোন্ কর্ম? 'কার্যম্ কর্ম,' 'নিয়ত কর্ম' যা যজ্ঞের প্রক্রিয়া। কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ করলে তবেই এতে অধিকার জন্মায়। কর্ম করতে-করতে যোগের পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছানোর পর '**শমঃকারণমুচ্যতে**'-সর্ব সঙ্কল্পের অভাব দেখা দেয়। যে কালে পুরুষ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্ম করার প্রয়োজন থাকে না, সেই সময় '**সর্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী**'-সর্ব সঙ্কল্পের অভাব দেখা যায়। এরই নাম সন্ন্যাস, যোগ। সাধনার মাঝে সন্ন্যাস, যোগ বলে কিছু নেই। অতএব মানুষের কর্তব্য এই যে, নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যাবে না। প্রমাণিত হচ্ছে যে, আত্মার উদ্ধার হয় এবং পতনও হয়। কর্ম দ্বারা যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তমরূপে জয় করেছেন তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা বন্ধু, পরমকল্যাণ করে। যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেননি, তাঁর জন্য তাঁর আত্মাই শত্রুর মত ব্যবহার করে, অধোগতি এবং নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে। অতএব সন্ন্যাস ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, '**কার্যম্ কর্ম**'-করণীয় প্রক্রিয়া বিশেষ তো করতেই হবে। এই প্রকার বিভিন্ন জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ উভয় মার্গে কর্মের অনিবার্যতার উপর বার-বার জোর দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভক্তির উপর জোর দিয়ে বলেছেন-'**মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।**' *(গীতা, ১১।৫৫)* অর্জুন! '**মৎ কর্মকৃৎ**' আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম আমাকে লাভ করার জন্যেই কর। '**মৎপরম্**'- মৎপরায়ণ হয়ে কর। '**মদভক্তঃ**' আমার অনন্য ভক্ত হও কিন্তু-'**সঙ্গবর্জিতঃ**'- কিন্তু সঙ্গদোষ থাকলে এই কর্ম হয় না। অতএব সঙ্গদোষমুক্ত এবং সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগ অনুসারে আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তখন অর্জুন দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রশ্ন করেছে যে, ভগবন! এই প্রকার যিনি নিরন্তর আপনার উপাসনা করেন এবং অন্যান্য যারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? অর্জুন এখনও এই ভাবছে যে, শ্রেষ্ঠ পথেই চলবেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, আমাতে মনকে একাগ্র করে ভজনা -ধ্যান- এ '**নিত্যযুক্ত**'-নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যাঁরা আমার (সগুণ সদেহ পরমেশ্বরের, যিনি সমক্ষে দাঁড়িয়ে) ভজনা করেন, তাঁরাই আমার মতে উত্তম যোগী। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। সাধকদের তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, পরমাত্মার

চিন্তন অপেক্ষা পরমাত্মায় স্থিত এরূপ মহাপুরুষের ভজনা শ্রেয়স্কর, যিনি সাধকের সমকালীন। এইরূপ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মত দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি করে থাকেন। তাঁর জন্য দেহ-তো বাসস্থান মাত্র। এই প্রকার মহাপুরুষদের নির্দেশ অনুসারে ভজনে অগ্রসর হওয়াই নিষ্কাম কর্মযোগ। শ্রীকৃষ্ণের মতে এটাই শ্রেষ্ঠ।

অন্যদিকে জ্ঞানমার্গীগণ, যারা ইন্দ্রিয়সমূহকে উত্তমরূপে সংযত করে মন-বুদ্ধির অতীত সর্বব্যাপী, অনির্বচনীয়, একরস, নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী, পরমাত্মাকে লক্ষ্য বানিয়ে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন; **'সর্বভূতহিতেরতাঃ'** *(গীতা, ১২/৪)* -'এইরূপ মহাপুরুষ আমাকেই লাভ করেন, কিন্তু **ক্লেশোঽধিকতরঃ তেষাম্ ব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"** *(গীতা ১২/৫)* সেই পুরুষগণকে সাধন পথে অধিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়, অধিক ক্লেশ কি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-**'দেহবদ্ভিঃ'**-দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ক গতিলাভ করা কষ্টকর। জ্ঞানমার্গী এই ভেবে এগিয়ে চলে যে, বর্তমানে আমি এই স্তরে রয়েছি, এত দূরত্ব আছে, আমি নিজেকে জানব। এই প্রকার 'আমি আমি' করতে-করতে তিনি লক্ষ্য থেকে দূরেই অবস্থান করেন এবং তিনি 'আমি' রূপ আবরণে ঢাকা পড়েন। জ্ঞানমার্গী নিজের ভরসায় সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং প্রায়ই তাঁর ভরসা দেহাভিমানে পরিণত হয়। জ্ঞানমার্গে এটাই বিঘ্ন বিশেষ।

কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে যিনি আমার আশ্রিত হয়ে সমস্ত কর্মফল আমাকে সমর্পণ করে অনন্যভাবে নিরন্তর **'ধ্যায়ন্তঃ'**- ধ্যান করেন, **'উপাসতে'**- আমার উপাসনা করেন, **'তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।'** *(গীতা, ১২/৭)* তাঁকে আমি সংসাররূপ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি। এই প্রকারের ভক্তদের **'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** *(গীতা, ৯/২২)* -তাদের যোগের রক্ষা স্বয়ং আমি করি। এই প্রকার নিষ্কাম কর্মযোগে বিশেষ সুবিধা রয়েছে কারণ অনুরাগীর জয়-পরাজয়-এর দায়িত্ব আরাধ্যের উপর থাকে। অনুরাগী কায়মনোবাক্যে নির্ভর হয়ে গেলে তখন সমস্ত দায়িত্ব আরাধ্যদেব- এর, সেই মহাপুরুষের হয়ে যায়।

করউঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী।
জিমি বালক রাখই মহতারী।। *(মানস, ৩/৪২/৫)*

অতএব বন্ধুগণ! চিন্তন-ক্রমে প্রবৃত্ত হলে নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জ্ঞানপথ দুটোই আপনার হাতে, আপনার জন্য রয়েছে। কোন মহাপুরুষের সংরক্ষণে, শ্রদ্ধা

আপ্লাবিত নেত্রে চিন্তনে নিযুক্ত থাকলে আপনি নিষ্কাম কর্মযোগীর সংজ্ঞা পাবেন। অথবা প্রণ-প্রধান বুদ্ধির দ্বারা সাহস সঞ্চয় করে স্বয়ং নির্ণয় নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত থাকলে জ্ঞানমার্গী নামে অভিহিত হবেন। কর্ম তো যে কোন অবস্থাতে করতেই হবে। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। সেই কর্ম পালন করার দুটি দৃষ্টিকোণের (জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মযোগ) শ্রীকৃষ্ণ সবিস্তারে শুধু বর্ণনা করেছেন। জাগৃতির জন্য তো তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের প্রতি অনন্য শ্রদ্ধা এবং সেই ক্রিয়া আচরণে পরিণত করার চিরন্তন বিধান রয়েছে।

।। ওঁ।।

গীতোক্ত যুদ্ধস্থল

প্রশ্ন-মহারাজজী! কুরুক্ষেত্রের স্থিতি সম্বন্ধে বর্তমানে মত-মতান্তর, খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে। গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

উত্তর- দেখুন, গীতা যৌগিক শাস্ত্র। বহুব্যক্তি গীতা পাঠ করে, পাঠ করা উচিতও। একথা আলাদা যে, শুরুতে অপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু অপূর্ণ জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য প্রেরণা প্রদান করে, সেইজন্য অধ্যয়ন করা আবশ্যক। গীতাশাস্ত্রের সম্বন্ধে কোন বিরল মহাপুরুষই অবগত এবং তাঁর সংরক্ষণে কোন বিরল অধিকারী সাধকই অধ্যয়ন করে। সকলে পাঠও করে না, এবং জানেও না। বর্তমানে গীতাশাস্ত্রের উপর শত-শত টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বহুমত প্রচলিত আছে, যেগুলির আধারশিলা গীতা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তো যে কোন একটা মতই প্রস্তুত করেছেন। তবে একটা শাস্ত্র নিয়ে ভিন্ন- ভিন্ন এত বিচার কেন দেখা যায়? বস্তুতঃ মানুষ যে পরিবেশে বড় হয়, সেই পরিবেশ তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। নিজ বুদ্ধি অনুসারেই লোকে শাস্ত্রের অর্থও গ্রহণ করে। রাজনীতিজ্ঞগণ গীতাশাস্ত্র সম্বন্ধে বলেন, "স্বদেশী কাপড় বিক্রি করাই নিষ্কাম কর্ম। বিদেশী কাপড় বিক্রি করা সকাম কর্ম।" কুরীতির শিকার ব্যক্তিদের অনুসারে "যেটা যার পৈতৃক পেশা, সেটাই তার কর্ম।" গীতা তাই বলে। নেতাগণ বলেন "আমাদের হাতে যে কাজ রয়েছে, তাই করা উচিত। যদি কাজ করে ঘুস নিই, তবে আমরা সকাম কর্মযোগী, না নিলে নিষ্কাম কর্মযোগী।" ব্যবসায়ীগণ বলেন যে, "গীতাশাস্ত্রে ব্যবসাকে কর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে।" এই কারণেই শাস্ত্র তো একটা উপদেশই করে, পরন্তু মানুষ নিজবুদ্ধি অনুসারে, যে পরিবেশে বাস করে তার অনুকূল অর্থ গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষেত্রে যুদ্ধের চিত্রণ করেছেন, তা শুধু সেই জানতে পারে, যে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতির সমীপে অবস্থিত অথবা তাঁরই স্থিতিযুক্ত। সাধনের ক্রমিক উৎকর্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তরে যিনি পৌঁছেছেন, তিনিই হুবহু বলতে সমর্থ হবেন যে, যখন গীতা শাস্ত্রের উপদেশ দান করা হচ্ছিল, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণের মনোগতভাব কি ছিল? ঘরে বসে লেখকের লেখা পড়ে হিমালয়ের দৃশ্যের শুধু কল্পনা করা যেতে পারে। বাস্তবিক আনন্দলাভের জন্য তো হিমালয়ে আরোহণ করতে হবে, সেখানে উপনীত হলে আপনার সমক্ষেও সেই দৃশ্যই হবে যেরূপ আপনি অধ্যয়ন করেছিলেন। এইরূপ গীতাশাস্ত্র যোগদর্শন , ক্রিয়াত্মক পথ। শুধু অধ্যয়ন করে অথবা মুখস্থ করে গীতার রহস্য অবগত হয়েছি

এ দাবি কেউ করতে পারবে না।

আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়েছিল সেটা কোথায় অবস্থিত? কিছু ব্যক্তি বলে যে, কাশী এবং প্রয়াগের মাঝে কুরুক্ষেত্র রয়েছে, আবার কিছু ব্যক্তি বলে যে, কুরুক্ষেত্র হরিয়াণাতে স্থিত। কিন্তু গীতাশাস্ত্রে এমন কিছু লিখিত নেই? প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছেন-

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।। *(গীতা, ১/১)*

টীকাকারগণ এর অর্থ বলেছেন যে, সঞ্জয় ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ উপস্থিত আমার এবং পান্ডুর পুত্রগণ কি করল? টীকাকার ক্ষেত্রের অর্থ ভূমি বলেছেন পরন্তু শাস্ত্রকারের আশয় অন্য ছিল। যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্রের বর্ণনা করেছেন, তিনি একথাও বলেছেন যে, সেই ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত? **'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে'** ***(গীতা, ১৩/১)*** অর্জুন ! এই দেহটাই ক্ষেত্র এইরূপ বলা হয়। যিনি একে জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, এর সঞ্চালক।

এই প্রকার দেহই সেই ক্ষেত্র, যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। এখানে ধর্ম একটা ক্ষেত্র। কুরু একটা ক্ষেত্র। অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র। মানুষের মধ্যে যখন ধৃষ্টতা দেখা যায়, সে চোখ থাকতেও দেখতে চায় না এবং যার হৃদয় ধৃষ্টতারই রাষ্ট্র সে যে দেখবে এ প্রশ্নই উঠছে না। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। অজ্ঞান থেকে মোহ উৎপন্ন হয়। মোহরূপ দুর্যোধন, দুর্বুদ্ধিরূপ দুঃশাসন, কর্মরূপ কর্ণ, বিকল্প রূপ বিকর্ণ, ভ্রমরূপ ভীষ্ম , দ্বৈতের আচরণরূপ দ্রোণাচার্য এবং আসক্তিরূপ অশ্বত্থামা এবং সংশয়রূপ শকুনি ইত্যাদি সবগুলিই আসুরী সম্পদ্। কুরুক্ষেত্র কুরু অর্থাৎ করো। আজ করছ এবং অনন্ত সৃষ্টিতে করতে থাকবে। এর মাঝেই জীবরূপ বিদুর জড়িয়ে আছে। কৌরব পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি সোজা পান্ডবদের উপর রয়েছে।

অন্যদিকে রয়েছে ধর্মক্ষেত্র, যেখানে পুণ্য-রূপ পান্ডু , কর্তব্যরূপ কুন্তী রয়েছে। যতক্ষণ পুণ্য ফলপ্রসূ হয় না, ততক্ষণ মানুষ কর্তব্য ভেবে যা কিছু করে, তা তার বন্ধনের কারণ হয়, কারণ পুণ্য না জাগলে কর্তব্য- অকর্তব্যের নির্ণয় হয় না। সেইজন্য পান্ডুর সাহচর্য লাভের পূর্বে কুন্তী যা উৎপন্ন করেছিল, তা ছিল কর্ণ। আজীবন কুন্তীর পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। পান্ডব অথবা দৈবী সম্পদের জন্য সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠুর যদি কেউ ছিল, তবে সে ছিল কর্ণ। পুণ্য জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির, ভাবরূপ ভীম, অনুরাগরূপ অর্জুন, নিয়মরূপ নকুল,

সৎসঙ্গরূপ সহদেবের আবির্ভাব হয়। যেখানে সদ্‌গুরুরূপ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে জাগ্রত হয়ে দেহরূপ রথের সারথী হয়ে সাধকের পথ-প্রদর্শন করেন। তিনি হাজার-হাজার মাইল দূরে থাকলেও জাগৃতির পর সাধকের এত কাছে থাকেন যত কাছে হাত, পা, নাক ইত্যাদি রয়েছে পরন্তু এর থেকেও সমীপে, কারণ তিনি তো আত্মাতেই সঞ্চারিত হন।

এটাই ধর্মের ক্ষেত্র এবং তা হল পরমধর্ম পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-"এই আত্মাই পরমসত্য, সনাতন এবং শাশ্বত।" ব্রহ্মেরও তো এই এক পরিভাষা। আত্মা অশোচ্য এবং অকাট্য এদিকে ব্রহ্মেরও ঐ এক উপাধি। তাৎপর্য এই যে দর্শনের পর আত্মাই পরমাত্মা হতে অভিন্ন হয়ে যায় কিন্তু আত্মাকে এই স্বরূপে শুধু তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন। অতএব সেই পরমধর্ম পরমাত্মাতে একীভূত হতে সাহায্যে করে যে প্রবৃত্তি, তারই নাম ধর্মক্ষেত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- অর্জুন! এই দেহটাই ক্ষেত্র। যিনি এর পার-এ চলে যান, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি দেহে আবদ্ধ হন না পরন্তু এর সঞ্চালক হন। তিনি আপনার ভিতরেও সঞ্চালন-ক্রিয়া উৎপন্ন করতে সমর্থ এবং নিজে তো পূর্ণ আছেনই।

এই প্রকার এই দেহরূপ ক্ষেত্রে দুটি অনাদি প্রবৃত্তি বিদ্যমান্- একটি দৈবী সম্পদ্, আর একটি আসুরী সম্পদ্। একেই ক্রমশঃ বিদ্যা ও অবিদ্যা , কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ দূষিত-ক্ষেত্র এবং ধর্মক্ষেত্র অর্থাৎ পরমধর্ম পরমাত্মাতে স্থিতি লাভে সহায়ক ক্ষেত্র সম্বোধিত করেছেন। বস্তুতঃ দেহটাই একটা ক্ষেত্র ।যখন এতে বহির্মুখী প্রবৃত্তি প্রবল হয় তখন একেই কুরুক্ষেত্র বলে। পরমধর্ম পরমাত্মাতে একীভূত হতে সাহায্য করে যে প্রবৃত্তি, তা সবল হয় যখন তখন এই দেহরূপ ক্ষেত্র সেই ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন একেই ধর্মক্ষেত্র বলে। উদাহরণস্বরূপ বাল্মীকির প্রারম্ভিক জীবন। ব্যক্তি একজনই কিন্তু সৎপুরুষের সঙ্গ লাভের ফলে '**বালমীকি ভয়ে ব্রহ্ম সমানা।**' *(মানস, ২।১৯৩।৮)* ব্রহ্ম সম স্থিতি লাভ করেছিলেন।

এই মন তো অন্ধ! অজ্ঞানে আচ্ছন্ন (অজ্ঞানও মনের একটা স্তর) অতএব অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র! ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ যদিও কিন্তু "সংযম রূপ সঞ্জয় "সংযমের মাধ্যমে দেখে এবং উপলব্ধি করে। এর অজ্ঞান থাকাটা স্বাভাবিক । সেইজন্য পূর্তিপর্যন্ত মনে সংস্কার মাত্রও জীবিত থাকলে, এর দৃষ্টি সদৈব কুরুক্ষেত্রের দিকে থাকবে। অযুক্ত মনকে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ই বলপূর্বক পতিত করে দেয়। '**মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।**' *(পঞ্চদশী, ৬।৬৮)* অতএব পূর্তি পর্যন্ত বিপদ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে-

হাম জানে মন মর গয়া, মরা হো গয়া ভূত।
মরতে হী পুনি উঠি লগা, অইসা মনা কপূত।।

'মুএহু মন মনসিজ জাগা'- এর উক্তি চরিতার্থ হয়েছে, এইরূপ শত্রু। সেইজন্য সেই অন্ধ শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিল। যদিও উত্তমরূপে অবগত ছিল যে, পান্ডবগণ সত্যে আরূঢ়।

সৈন্য নিরীক্ষণ-সৈন্য নিরীক্ষণও যুদ্ধ ক্ষেত্রের আধ্যাত্মিক স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত করে। কৌরব গণের সেনা এগারো অক্ষৌহিনী এবং পান্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সেনা ছিল। দুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা যোগ করলে সংখ্যায় প্রায় সাড়ে ছয় আরব হবে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা যত, প্রায় ততটা। এত জনসংখ্যা কুরুক্ষেত্রের সীমিত মাঠে নিহত হয়েছিল, জেনে আশ্চর্য লাগে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ঠিক এইরূপই হয়। কৌরব পক্ষে দশটি ইন্দ্রিয় এবং একটা মন, এরাই হল এগারো অক্ষৌহিনী সৈন্য। অক্ষ দৃষ্টিকে বলা হয়। মন সহিত ইন্দ্রিয়ময়ী দৃষ্টি দ্বারা যার সঞ্চালন হয়, সেটাই হল কুরুক্ষেত্র, অবিদ্যারসমূহ মন এবং ইন্দ্রিয় যদি স্ব-স্ব বিষয়ে ধাবিত তবে মোহরূপ দুর্যোধন, দুর্বুদ্ধিরূপ দুঃশাসন, কাম, ক্রোধ, মদ, লোভাদি আসুরী প্রবৃত্তিগুলি থাকবেই এটাই সেই কুরুক্ষেত্র, একেই আসুরী সম্পত্তি বলে। অন্যদিকে যোগের সাতটি ভূমিকাময় দৃষ্টিতে যার গঠন হয়েছে, তা হল ধর্মক্ষেত্র যাতে অনুরাগরূপ অর্জুন কর্তব্যরূপ কুন্তী ,ভাবরূপ ভীম, ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির, সৎসঙ্গ, নিয়ম ইত্যাদি রয়েছে। এবং সবার মূলে রয়েছেন সদ্‌গুরুরূপ শ্রীকৃষ্ণ যিনি অন্তরে জাগ্রত হয়ে রথীরূপে পথ সঞ্চালিত করেন। এই প্রকার এই দৈবী সম্পত্তিও অনন্ত । শাস্ত্রকার দুটি দৃষ্টিকোণে সৈন্যদের মূল্যাঙ্কন করেছেন- সেনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল না।

বীরপুরুষদের স্বরূপ- এই ক্ষেত্রে স্থিত শূরবীরগণের স্বরূপও আধ্যাত্মিক। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে দুর্যোধন দ্রোণকে বলেছিলেন যে, নিজ শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহাকার স্থিত সেনাকে দেখুন! এদের এই সেনা জয়-করা সকল প্রকারে সুগম পরন্তু আমাদের সেনা সকল প্রকারে অজেয়, এর মধ্যে সমিতিঞ্জয় ,কৃপাচার্য ইত্যাদিগণ আছেন, যাঁরা একা- একা যুদ্ধ করলেও সমস্ত পান্ডবদের পরাজিত করতে সমর্থ । বস্তুতঃ কৃপার আচরণই কৃপাচার্য। ইষ্ট এবং সাধকের মাঝে যদি একচুল দূরত্বও থাকে তবে সাধককে কৃপার একবার আচরণই পরাভব করবে। ''দয়া বিনু সন্ত কসাই । দয়া করী তো আফত আঈ।।" মাতা-সীতা দয়া না দেখালে তাঁকে লঙ্কায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হত না।

লক্ষ্য প্রাপ্তির পূর্বে সাধক কৃপার আচরণে জড়িয়ে গেলে কৃপাচার্য সমিতিঞ্জয়ে পরিণত হবেন, সম্পূর্ণ দৈবী সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করবেন। কিন্তু প্রাপ্তির পর কৃপা তো যোগীর স্বরূপ। কিন্তু অপূর্ণ অবস্থাতে কৃপাও বিপদ ডেকে আনে।

উৎসাহবর্ধন করে দুর্যোধন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয় অতএব আমরা সব দুর্গ পরিখাতে উত্তমরূপে স্থিত হয়ে ভীষ্ম পিতামহকেই সবদিক দিয়ে রক্ষা করি। দুর্যোধন সঙ্কেত করেছে যে,ভীষ্ম চলে গেলে আমরা উপায় হারা হয়ে যাব । অতএব ভীষ্ম কোন্ শক্তি, যার উপর সমস্ত কৌরব নির্ভরশীল। আপনারা যুদ্ধ করবেন না, পরন্তু ভীষ্মকে রক্ষা করুন। বস্তুতঃ ভ্রমই ভীষ্ম। যতক্ষণ আপনার ভিতর ভ্রম বিদ্যমান, বিকার অজেয় থাকবে। যখনই ভ্রম-এর নিদান হবে, তখনই বন্ধনকারক কর্মও সমাপ্ত হয়ে যাবে, মোহও সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে।

ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের বিশেষত্ব ছিল । “**ইচ্ছা কায়া ইচ্ছা মায়া ইচ্ছা জগ উপজায়া। কহ কবীর জে ইচ্ছা বিবর্জিত ভ্রম নাহীঁ তহঁ ভরমায়া।।**’ ইচ্ছাই কায়া এবং ইচ্ছাই মায়া, জগতের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ইচ্ছা । যতক্ষণ ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ ভ্রম তো থাকবেই। ইচ্ছার শেষ দেখা যায় না কিন্তু একটা বিন্দু এমনও আছে, যখন ইচ্ছার বিলুপ্তি ঘটে এবং সেই বিন্দুটি হল ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা ভগবান থেকে দূরে রয়েছি এই ভাব জাগলে তাঁকে লাভ করার ইচ্ছা জাগে, এটা স্বাভাবিক । কিন্তু তাঁকে লাভ করতে পারলে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু লাভ করা বাকী থাকে না। এইরূপ অবস্থাতে সেই ইচ্ছা, সেই ভ্রম নির্মূল হয়ে যায়। এটা ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর রহস্য ছিল। প্রাপ্তির সঙ্গেই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায়।

ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করতেন। সুরা-এর উর্ধ্বরেতা স্থিতিই উত্তরায়ণ। ইঙ্গলা- পিঙ্গলা যাতে ক্রমশঃ চন্দ্রমা ও সূর্যের নিবাস, এইরূপ শ্বাসের গতি সুরা সেটাই যখন প্রকৃতি হতে নিবৃত্ত হয়ে ঊর্ধ্বে গমন করে, ঈশ্বরে প্রবাহিত হয়, সেই স্থিতিতে ভীষ্মের সদা- সর্বদার জন্য মৃত্যু হয় কারণ ভগবানে ভ্রম তো হয়ই না।

অন্যদিকে দুর্যোধন বলছেন যে, ভীম দ্বারা রক্ষিত এদের সেনা জয় করা সহজ । ভাবরূপ ভীম। ভীম ছিল তো সকলের থেকে বেশী বলশালী, কিন্তু সে ‘বৃকোদর’ ছিল। তার স্থান ছিল উদর । আজ পূর্ণ আছে কাল রিক্ত হয়ে যাবে। ভাব- এর নিবাসও তো হৃদয়েই ‘ভাব সবচেয়ে শক্তিশালী।’ ‘**ভাবে বিদ্যতে দেবা।**’ যদি ভাব বিদ্যমান তবে সেই পরমদেব পরমাত্মাও বিদিত হন। ‘**ভাব বস্য ভগবান,**

সুখ নিধান করুনা ভবন' *(মানস, ৭/৯২)*/ ভাব এ সেই মহাশক্তি রয়েছে যা ভগবানকেও বশে করে এর চেয়ে বড়শক্তি আর কি হবে? কিন্তু এটা এত কোমল যে আজকের ভাব কাল অভাবে পরিণত হতে দেরী লাগে না। সেইজন্য দুর্যোধন বলছে যে,ভীম দ্বারা রক্ষিত এই সেনা জয় করা সহজ। সাধারণ বিঘ্নের ধাক্কাতেই ভাব শেষ হয়ে যায়।

দুপক্ষের শঙ্খধ্বনি-অতঃপর দু'পক্ষ থেকেই শঙ্খধ্বনি করা হয়েছিল যার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের অলৌকিকতার পুষ্টি হয়। শঙ্খধ্বনির তাৎপর্য হল নিজের লক্ষ্য উদ্‌ঘোষ করা যে, যদি আমরা জয়লাভ করি তবে কি করব কোন সুখ সুবিধা প্রদান করব? কৌরবপক্ষ থেকে একটি মাত্র শঙ্খধ্বনিত হয়েছিল। পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদ তুল্য গর্জন করে শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পার হওয়ার সময় সিংহের গর্জন কানে গেলে শরীরের রোম খাড়া হয়ে যাবে। সিংহ ভয়ের প্রতীক। ভয় প্রকৃতিজাত ভগবান অভয় সত্তা। অতএব ভ্রমরূপ ভীষ্ম যদি সফল হয়, তবে ভয়ের স্তর আরও ঘন হয়ে উঠবে। সংসারে তো আপনি আগে থেকে রয়েছেনই, সেখানে ভয় ছাড়া কিছু নেই। ভ্রম প্রবল হলে আপনি ভীতুতে পরিণত হবেন। এর থেকে চরমগতি কৌরবদের নেই। মায়ার সহস্র বন্ধন লক্ষ বন্ধনে পরিণত হবে, অনন্ত হয়ে যাবে। ভয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোন ঘোষণা নেই। অতঃপর কৌরব পক্ষ থেকে দামামা ইত্যাদি কয়েকটি বাদ্য বেজে উঠল; কিন্তু শঙ্খধ্বনি হয়নি।

তদনন্তর পান্ডবপক্ষ থেকে শঙ্খধ্বনি করা হয়েছিল। অলৌকিক রথ (চারচক্র অথবা চার অশ্বযুক্ত লৌকিক রথ ছিলও না সেটা।) এর উপর উপবিষ্ট যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ বাজিয়েছিলেন ।ইন্দ্রিয় সমূহের তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যেগুলি শুরুতে বিকৃত ছিল) কে 'জন' এর শ্রেণীতে নিযুক্ত করা অন্তর্যামী সদ্‌গুরুর উপর নির্ভর করে । সদগুরু অন্তরে জাগ্রত হয়ে এই পাঁচটি বহির্মুখী প্রবাহ সংযত করে জন-এ রূপান্তরিত করে, তাদের সেবকে পরিণত করেন, ইন্দ্রিয়গণ বাধক নয়, সহযোগিনীর কাজ করে। এই স্থিতি সদ্‌গুরুর কৃপার ফল। শ্রীকৃষ্ণও যোগী, সদগুরু ছিলেন। অর্জুন প্রণত হয়েছিল। **'শিষ্যস্তেহহং-শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'** *(গীতা, ২/৭)* ভগবন! আমি আপনার শিষ্য ধর্ম বিষয়ে মুগ্ধচিত্ত আমি আপনার শরণাগত। সেই উপদেশ দান করুন, যাতে আমি কল্যাণের অধিকারী হতে পারি। নিঃসন্দেহে অর্জুন শিষ্য ছিলেন এবং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদ্‌গুরুর স্থানে

স্থিত রয়েছেন।

'পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।' -অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজিয়েছিল। **'অনুরাগরূপী অর্জুন।'** তীব্র অনুরাগ থাকলে সাধক দৈবী সম্পত্তি লাভ করেন যার সাহায্যে সাধক পরমদেব পরামাত্মাতে বিলীন হন। সেইজন্য অর্জুনের আর এক নাম ধনঞ্জয়। **'পৌন্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।'** *(গীতা, ১/১৫)*-বৃকোদর ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজিয়েছিল ভাব সফল হলে ইষ্টের প্রতি প্রীতি এবং প্রবৃত্তি জন্মায় এরই নাম পৌন্ড্র।

নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ বাজিয়েছিল। নিয়মরূপ নকুল। যেমন- যেমন আপনি নিয়মে প্রবৃত্ত হবেন, অশুভ দমিত শুভ প্রকাশ পাবে। এই প্রকার সহদেব 'মণিপুষ্পক' শঙ্খ বাজিয়েছিল। সৎসঙ্গরূপ সহদেব! মহর্ষিগণ প্রত্যেক শ্বাসকে মনির সংজ্ঞা দিয়েছেন- **'তেরী হীরা জৈসী শ্বাঁস, বাতোঁ মে বীতী জায় রে।'** প্রস্তরের মণি তো কঠোর হয়, কিন্তু এই শ্বাসরূপ মণি কুসুম সদৃশ কোমল হয়। আজ আছে কিন্তু আগামীকাল থাকবেই একথা স্থির করে বলা যাবে না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সর্বদার জন্য বন্ধ হয়ে যায় সেইজন্য বহুমূল্য । অতএব একটা শ্বাসও ইষ্ট সংযুক্ত নাম ছাড়া যেন গ্রহণ না করি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বিচরণ করার ক্ষমতা লাভ হলে, স্বতই রিনকধিনক ঝঙ্কৃত হলে, এক একটা নিশ্বাস মণিতুল্য হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের এই ক্রিয়া সৎসঙ্গ করলে তবে জাগ্রত হয় এবং একটা শ্বাসও ব্যর্থ না যাওয়াটা সৎসঙ্গের উপর নির্ভর করে। যদি সৎসঙ্গ সফল হয় তবে সেই মণির উপর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অধিকার জন্মায়।

'অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির।' *(গীতা, ১/১৬)* -যুদ্ধে স্থির 'সঃ-যুধিষ্ঠিরঃ।' এই আত্মিক সংঘর্ষে তিনিই স্থির থাকতে সমর্থ যাঁর অন্তঃকরণে ধর্ম সঞ্চারিত রয়েছে। ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির । পরমধর্ম পরমাত্মাই রয়েছেন। ধৈর্যপূর্বক অভ্যাস করতে- করতে সাধক যখন পরম ধর্ম-এর গন্ডিতে চলে আসেন অর্থাৎ ধর্ম যখন হৃদয়ে সফল হয় তখন অনন্ত বিজয়ং সেই অনন্ত, অখন্ড, ব্যাপক ব্রহ্ম বশীভূত হন। তিনি অসম্ভব থেকে সম্ভব হন।

বিচার করুন! কোথাও 'অনন্ত বিজয়', কোথাও 'দেবদত্ত', কোথাও 'পৌন্ড্র', কোথাও 'পাঞ্চজন্য'-এর ন্যায় শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছে এবং স্বয়ং সূত্রকার বলছেন যে, সব শঙ্খ, সমস্ত ঘোষনা দিব্য, অলৌকিক, লৌকিক নয়। সংসারের প্রতি এদের দৃষ্টি ছিলই না। এখন আপনিই বলুন যে, এটা কেমন যুদ্ধক্ষেত্র?

অর্জুন বিষাদ -যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন বলেছিল -ভগবন্ ! আমার রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। আমি দেখে তো নিই যে, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ? শ্রীকৃষ্ণ সেনা মধ্যে রথ স্থাপন করেছিলেন। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃব্যগণকে, পিতামহগণকে আচার্যগণকে, মাতুলগণকে, ভ্রাতাগণকে, পুত্রগণকে, পৌত্রগণকে, মিত্রগণকে, শ্বশুরগণকে, সুহৃদগণকে দেখতে পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। আঠারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে অর্জুন পিতৃবৎগণকে, মাতুলগণকে এবং শ্বশুরগণকে দেখেছিল। সকলেই কি অর্জুনের আত্মীয় ছিল ? না, বস্তুতঃ ভগবৎ পথে চরাচর জগতই যুদ্ধরূপে উপস্থিত। অতএব একথা বলা সম্ভব নয় যে, সংখ্যা প্রমাণ কি? দুটি দৃষ্টিকোণে সেনার বিভাজন শুধু। এদের মাঝে অর্জুন আত্মীয়-স্বজন এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই দেখতে পেয়েছিল। সবার আগে অর্জুন দেখার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। দেখুন, অনুরাগরূপ অর্জুন। অনুরাগী যখন ভগবৎপথে অগ্রসর হয়, তখন পারিবারিক আসক্তি তার সমক্ষে ভয়ঙ্কর রূপে উপস্থিত হয়। পূজ্য পরমহংসজী বলতেন-'মৃত্যু ঘটা এবং সাধু হওয়া একই ব্যাপার।' সংসারে আর কেউ জীবিত থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু গৃহ সম্বন্ধীয় কেউই থাকবে না। যদি একটুও আসক্তি থাকে তবে কল্যাণ হয় না জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেইজন্য এতবেশী বাধা। বিস্মৃত হওয়া এবং মৃত্যু হওয়া একই কথা। সাংসারিক বন্ধন মনের কল্পনামাত্র। এই সমস্ত সম্বন্ধের বিষয়ে ভুলে যাওয়াও মৃত্যুর সমান। চেতনা লুপ্ত হলে সমস্ত সম্বন্ধ লুপ্ত হয়। অতএব সাধকের জন্য লৌকিক স্নেহ-সম্বন্ধগুলি ভুলে যাওয়াই শ্রেয়স্কর ।

এইপ্রকার সাধকের সমক্ষে সর্বপ্রথম এই সমস্যাই দেখা দেয় যে, অবোধ শিশু, মামা, কাকা, জ্যাঠা, আত্মীয়-স্বজনদের কি করে ত্যাগ করব ? এদের প্রতি ও তো কিছু কর্তব্য আছে। সন্তানদের মানুষ করাটাও তো কর্তব্য । এটাই তো সনাতন কুলধর্ম। ধর্মের নামে প্রায়ই এইপ্রকার কুরীতি প্রচলিত হয়। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে এবং অদ্যাবধি এইরূপ ভ্রান্তি প্রচলিত রয়েছে যে, স্পর্শ করলে, অথবা তাদের দেওয়া একগ্রাস অন্ন, একঢোক জলপান করলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। একটা কুরীতির শিকার অর্জুনও ছিল। সেও এই কুরীতি গুলির অজুহাত দেখিয়েছিল যে, নিজেরই আত্মীয় স্বজনদের নাশ করলে সে কুলনাশক দোষে দোষী হবে। এবং এই প্রকার সনাতন ধর্মও নষ্ট হয়ে যাবে। সে একথা বলছে না যে, আমি ভুল করছি পরন্তু বলছে যে, আমরা মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করেছিল যে, আপনিও পাপ করতে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন - অর্জুন! এই বিষম স্থলে তোমার কোথা থেকে অজ্ঞান উৎপন্ন হল ?বিষম অর্থাৎ যার সমতার কোন স্থানই নেই। যে যুদ্ধের বিষয়ে আমি বলছি তার সমানান্তর কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রই নেই। কুলধর্ম নষ্ট হবে, এই অজ্ঞানের কথা কি করে এবং কেন বলছ? অর্জুন সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিল। সনাতন ধর্ম রক্ষা করার কথা বলা কি অজ্ঞান? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-হ্যাঁ অজ্ঞানই। না শ্রেষ্ঠপুরুষগণ কখনও এর আচরণ করেছেন, না সংসারে কীর্তিবৃদ্ধি করে এবং না পরমকল্যাণই করে। সম্ভাবিত পুরুষগণ যার আচরণ করেননি, তবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তা অজ্ঞান।

অর্জুন সমর্পণ করেছিল যে,ভগবন! ধর্মবিষয়ে আমার চিত্ত বিমুগ্ধ। আমি এটাই ধর্ম বলে জেনেছি। সত্য কি জানি না। যা সত্য তা আপনি আমাকে বলুন, যাতে আমি পরম কল্যাণের অধিকারী হতে পারি। পৃথিবী অথবা ত্রিলোকের ধন ধান্য সম্পন্ন সাম্রাজ্য লাভ হলেও আমি যুদ্ধ করব না। কারণ দেবতাগণের প্রভুপদ লাভ হলেও আমি সেই উপায় দেখছি না, যা আমার ইন্দ্রিয় বর্গের সন্তাপক শোক দূর করতে পারে ।এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ যদি কোন-বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে, তবে আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে বলুন। বিলক্ষণ ছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যা ভৌতিক উপলব্ধির জন্য নয় পরন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ স্থিতি লাভ করার জন্য আপনাকে আহ্বান করছে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সত্য বস্তুর তিনকালে অভাব নেই এবং অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই। অর্জুন! এই আত্মাই পরমসত্য এবং সনাতন, অগ্নি দাহ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না। দেহের মৃত্যু হলেও এর মৃত্যু হয় না। আত্মা অজর, অমর, অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল এবং সনাতন । ভৌতিক জগতের কোন পদার্থ যার স্পর্শ করতে পারে না, তার নাম সনাতন । তবে শুধু অন্নদান গ্রহণ করলে এক ঢোক জল পান করলে সেই সনাতন নষ্ট কি করে হবে? আমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হতে পারে কিন্তু তিনি ভ্রষ্ট হতে পারেন না। এই প্রকারের শঙ্কার নিরাকরণ শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত কুরুক্ষেত্রে করেছিলেন এবং এইরূপই ছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে বিকারগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে সনাতন এবং অব্যক্ত স্থিতি প্রাপ্তির মার্গ সদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগী অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন; এবং সেই পথে চালিতও করেছিলেন।

প্রশ্ন- মহারাজজী! আপনি কুরুক্ষেত্রকে বিজাতীয় দল বলেন কিন্তু সেই কুরুক্ষেত্রে তো কৌরব এবং পান্ডব দুপক্ষেরই সেনা একত্র হয়েছিল।

উত্তর- কে বলেছে যে, আধ্যাত্মিক কুরুক্ষেত্রে দুপক্ষেরই সেনা একত্র হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ধর্মক্ষেত্রে এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ইচ্ছুক শূরবীরগণ একত্র হয়েছিলেন; এটা মনে রাখ না কেন? ধর্ম একটি ক্ষেত্র এবং কুরু একটা আলাদা ক্ষেত্র।

প্রশ্ন- মহাভারত যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা কি সন্দিগ্ধ?

উত্তর- মহাভারতের যুদ্ধ হয়নি এমন কথা নয়। যুদ্ধ অবশ্যই হয়েছিল, মহাপুরুষগণ সেই সংঘর্ষকে দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করেছেন, এই দৃষ্টান্তেরই মাধ্যমে তাঁরা হৃদয়-দেশ-এ প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যেকার সংঘর্ষের চিত্রণ করেছেন। ঘটনা ঘটিত না হলে উদাহরণ কোথা থেকে দিতেন? কিন্তু মহাভারত গীতা ইত্যাদি শুধু ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়। শ্লিষ্ট এবং যৌগিক শব্দ-এ লিখিত এই গ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিক রহস্য অনুস্যূত রয়েছে, সেই অনুসারে চলে বিশ্বের যে কোন মানুষ পরমকল্যাণের অনুভূতি করতে পারে। এটাই মানবদেহের চরম উপলব্ধিও।

বস্তুতঃ প্রত্যেক শাস্ত্রের রচনা দুটো দৃষ্টিকোণ দ্বারা করা হয়। তত্ত্বজ্ঞ মনীষীদের এটাই হল চিরন্তন বিধান দুটো উদ্দেশ্যে শাস্ত্র রচনা করেছেন, এক ইতিহাস সুরক্ষিত রাখা, যার থেকে উত্তমপুরুষগণ সংসারে জীবন-যাপনের মর্যাদাপূর্ণ আচরণ কি তা জানতে পারে। পিতা-পুত্র ভাই বোন মাতা- পিতা, সুহৃদ মিত্র এবং পূজ্য গুরুজনদের প্রতি আদর্শ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এই শাস্ত্রগুলির মাধ্যমে প্রদান করা মনীষীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কিন্তু কুশলতা পুর্বক দিন যাপন করে গেলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। এতে কল্যাণের ভূমিকা অবশ্য তৈরী হয় কিন্তু এটুকুর সাহায্যে পরমকল্যাণ সম্ভব নয় যা পরমতত্ত্বের উপলব্ধি থেকে হয়। আত্মিক-পথ প্রশস্ত করা, যৌগিক-প্রক্রিয়ার সম্যক্ জাগরণ ঘটানো এবং সেই পথে মানুষ মাত্রকে চালিত করা শাস্ত্র রচনার মূল হেতু ।এই দিকের নিরূপণে সেই ঘটিত ঘটনাকে মহাপুরুষগণ উদাহরণ হিসাবে প্রস্তুত করেন যা সাধক সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ আকর্ষক ভয়ানক কাহিনীর মাঝে-মাঝে যথার্থের সঙ্কেত দিয়েছেন যাতে অধিকারী সেটা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় এবং সেই অনুসারে চলে জন্ম-মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে পরমশ্রেয় লাভ করতে পারেন।

।। ওঁ।।

ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রে গীতোক্ত যুদ্ধ

প্রশ্ন -মহারাজজী ! গীতার অনুসারে যুদ্ধের স্বরূপ কি?

উত্তর - দেখুন, দেশ-বিদেশ যে যেখানেই গীতার নামটুকুও শুনেছে সে একথা অবশ্যই চিন্তা করে নেয় যে, গীতা মহাভারত যুদ্ধের প্রবেশিকা মাত্র। এটুকুই নয়, গীতা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মন যুদ্ধের দিকে চলে যায় কিন্তু শাস্ত্রকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করলে এই অকাট্য নির্ণয় নজর এড়িয়ে যাবে না যে, বাহ্যযুদ্ধ নয় পরন্তু অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তির সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি বলেছেন। সেই জন্য গীতা যোগশাস্ত্র। সম্পূর্ণ গীতাতে ভৌতিক সংঘর্ষ অথবা হত্যাকান্ডের একটা সূত্রও নেই।

১- অর্জুন যুদ্ধ করার পক্ষে ছিল না। আঠারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে নিজেরই আত্মীয় স্বজন এবং গুরুজনদের দেখে সে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সনাতন ধর্ম এবং কূলধর্মের দোহাই দিতে শুরু করেছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন ! যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ অথচ পণ্ডিতের মত কথা বলছ কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্ন পন্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না কারণ এই আত্মা কাউকে হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহত হন না। কৌন্তেয় ! শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ- দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয়সমূহও বিষয়গুলির সংযোগ তো ক্ষণভঙ্গুর । সেইজন্য অর্জুন ! তুমি এদের সহ্য কর।

কেন, সেই যুদ্ধ স্থল কি হিমালয়ের ঠান্ডা প্রদেশ ছিল, যার জন্য অর্জুনকে ঠান্ডা সহ্য করতে হবে? অথবা মরুভূমির গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ছিল যে গরম সহ্য করতে হবে? কুরুক্ষেত্র তো সমশীতোষ্ণ অঞ্চল। মাত্র আঠারো দিন যুদ্ধ হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? বস্তুতঃ এটা অন্তঃকরণের যুদ্ধের বর্ণনা। সুখ- দুঃখ, মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা যোগীর উপর নির্ভর করে অতএব যোগের প্রবেশিকা স্তরের ব্যক্তিদের জন্যই এর বিধান রয়েছে।

২- তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন ! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সত্যের তিনকালে অভাব নেই। এই আত্মাই পরমসত্য এবং দেহ বিনাশশীল সেই জন্য তুমি যুদ্ধ কর। তবে কি পান্ডব পক্ষে যে সমস্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের দেহ অবিনাশী ছিল? তাঁরাও তো দেহধারী ছিলেন। এতে একথা তো প্রমাণিত হচ্ছে না যে, অর্জুন কৌরবদের বধ করবে পান্ডবদের নয়। দেহধারী দৃষ্টিগোচর হলেই তাদের

সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিৎ। তবে দেহ যখন নশ্বর এর কোন অস্তিত্বই নেই,তবে শ্রীকৃষ্ণ কাকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন? অর্জুন কে ছিল? সে কি পিণ্ডধারী ছিল? শ্রীকৃষ্ণেরই মান্যতা হচ্ছে যে, নশ্বর দেহকে সুখ দেবার জন্য যারা পরিশ্রম করে তারা যথার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ইন্দ্রিয়গণের সুখাকাঙ্ক্ষী পাপী ব্যক্তিগণ বৃথাই জীবনধারণ করে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যদি কারও দেহের সুরক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তবে তো প্রমাণিত হবে তিনিও অবিবেকী, পাপী এবং বৃথা জীবন ধারণ করছেন কারণ বলপূর্বক দেহধারণ সম্ভব নয়। অতএব স্পষ্ট হচ্ছে যে জাগতিক যুদ্ধের সঙ্গে গীতার সম্পর্ক নেই।

শরীর বধ করলে কি শরীরান্ত হবে? শাখাপ্রশাখা ছেদন করলে বৃক্ষ কি শুকাবে? কখনই না। বস্তুতঃ যে যাকে যতবেশী দমন করে, পরিবর্তে তাকেও ততই নত হতে হয়। এই দেহ ধারণও জন্ম-জন্মান্তরের দেনা-পাওনার জন্য হয়ে থাকে। শস্ত্র দ্বারা ছেদন করলেই শরীরান্ত হবে না। কারণ দেহ সংস্কারের উপর আধারিত। অতএব দেহ-ধারণ সমাপ্ত তখনই হবে, যখন জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের সূত্র ছিন্ন হবে। তখনই এই দেহ এবং আত্মার সদা-সর্বদার জন্য বিচ্ছেদ হয়। সংস্কারের মধ্যে যা-যা আছে, তা কামনা রূপে প্রকট হয়। অতএব যে-যে মহাপুরুষ সঙ্কল্প-বিকল্পের গতি নিরুদ্ধ করেছেন, মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা অন্তঃকরণে পরমসত্য, শাশ্বত, সনাতন, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব দর্শন করেছেন। **'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।'** যাঁদের মন সমভাব-এ স্থিত, তাঁরা চরাচর জগৎ এখানেই জয় করতে সক্ষম। কেন? সংসার জয়ের সঙ্গে মনের সমভাব-এর কি সম্বন্ধ? যিনি সংসার জয় করেছেন, তিনি কোথায় স্থিরতা লাভ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন **'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'**- ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, সাধকের মনও উন্নত হয়ে এতটা নিরুদ্ধ হয় যে নির্দোষ এবং সমস্থিতি যুক্ত হয়ে যায় অতএব **'তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।' (৫।১৮)** সেইজন্য তিনি ব্রহ্মে স্থিত হন। এই অবস্থা লাভ হলে দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ সদা সর্বদার জন্য ছিন্ন হয়। এর পূর্বে নয়। অতএব দেহের নাশ চিন্তন-ভজনার উপর নির্ভর করে, তরবারির আঘাতে ছেদন করলে হয় না।

৩- দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রমুখ বিভূতিগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে, অর্জুন! সপ্তর্ষি এবং এঁদেরও পূর্বকালীন সনকাদি চারজন ঋষি আমিই। আমি সূর্যের প্রকাশ। অগ্নির তেজ। শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম। ইন্দ্রিয়গণের

মধ্যে মন আমি। এই প্রকার বিভূতিগুলির বর্ণনা করে বললেন যে, অর্জুন বিভূতির অন্ত নেই। বস্তুতঃ সে সকল অনন্ত। এত বেশী জানবার তোমার প্রয়োজন কি? যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত বস্তু রয়েছে সে সকলই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে। জুয়াতে, কপটাচার করে যারা বিজয়ী হয়, তাদের এইরূপ বিজয় আমি সাধারণ জুয়া হলে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়গুলির মধ্যে এরও উল্লেখ করা হত। কারণ জয়লাভ করলে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু অনেক সম্পত্তির মালিক হলেও অথবা জুয়াতে বিজয়ী হয়ে কেউ ঈশ্বরদর্শন করেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি। বাস্তবে প্রকৃতিই জুয়া, প্রতারণার একটা আবরণ। বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা সতত নিষ্ঠাপূর্বক সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের সংরক্ষণে যিনিই প্রকৃতির বাঁধন থেকে মুক্ত হন, সত্যিকার বিজয়ী তিনিই। এই বিজয়ের পরই ভগবৎ দর্শন হয়, ইহ জগতের জুয়াতে বিজয়ী হলে নয়। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে একাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুন বলল, ভগবন্! আপনি যা' বললেন, তা' সত্য, স্বীকার করছি। আপনার বাণী শ্রবণ করে আমার অজ্ঞান, মোহ নাশ হয়েছে বস্তুতঃ অর্জুনের মোহ কি নাশ হয়েছিল? কারণ ঠিক এরপরই ভগবানের বিরাট রূপ দর্শন করে অর্জুন কাতরভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল। জ্ঞানী কি কখনও ভয়ে ভীত হন? অর্জুন এখনও পর্যন্ত শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই জ্ঞাত আছেন। অর্জুনও একথা জানত যে, সে উপলব্ধি করেনি। অতএব সে প্রার্থনা করেছিল যে, ভগবন্! যেমন আপনি বললেন, বল, ঐশ্বর্য এবং বিভূতি দ্বারা যুক্ত আপনার সেই স্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় ভক্ত, অনন্য সখা অর্জুনকে বললেন-পার্থ! তুমি আমার দিব্যস্বরূপ দর্শন কর। সর্বত্র সূক্ষ্ম রূপে ব্যাপ্ত আমার দিব্যস্বরূপ দর্শন কর! অদিতির দ্বাদশপুত্র, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণকে দর্শন কর এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত, তা দর্শন কর! এই প্রকার তিনটি শ্লোকে ভগবান্ একনাগাড়ে দর্শন করিয়ে গেছেন কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পাননি। তখন এইরূপ দেখাতে-দেখাতে ভগবান হঠাৎ থেমে গেলেন এবং বললেন-অর্জুন! তুমি তোমার নিজের চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ বৌদ্ধিক দৃষ্টি দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না। (কারণ ভগবান তো অগোচর, মন-বুদ্ধির অতীত)। সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি দর্শন করতে সমর্থ হবে।

ভগবান তো সম্মুখেই দণ্ডায়মান ছিলেন। অর্জুন দর্শন করেছিল। সহস্র সূর্য

উদয় হলে যত প্রকাশ হবে, সেই প্রকাশও ঐ মহাত্মার প্রকাশের সদৃশ কদাচিৎ হতে পারে। সর্বত্র প্রকাশে প্রকাশিত দেখেছিল। অর্জুনের দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল (কারণ সূর্যের উদয়-অস্তের দিক্ দেখেই তো দিক্ নির্ণয় করা হয়) সে বলেছিল-ভগবন্! আপনার এই অসহ্য তেজ দর্শন করে দিগ্‌ভ্রমিত হয়ে পড়েছি। 'দিশো ন জানে'। হে পুরুষোত্তম! আপনি স্বয়ং নিজেকে জানেন। আপনি জানালে তবেই আপনাকে জানা যেতে পারে। বস্তুতঃ ভগবান যে ভক্তকে জানাতে চান, তার অন্তরে দৃষ্টি রূপে দাঁড়িয়ে যান এবং সম্মুখে স্বয়ং দণ্ডায়মান হয়ে যান শুধু সেই ব্যক্তি দর্শন করতে সমর্থ হয়, অন্য কেউ নয়।

অর্জুন বলেছিল-আমি আপনার ভিতর চরাচর জগতকে দেখছি। রুদ্র, বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুদ্‌গণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সিদ্ধগণের সমুদায় সকলে আপনার মধ্যে স্থিত। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র কর্ণ সকলেই দ্রুতবেগে আপনার ভয়ানক মুখগহ্বরগুলিতে চূর্ণ হচ্ছে। আপনার আদিঅন্ত কিছুই দেখছি না এবং মধ্যেরও নির্ণয় করতে অসমর্থ। সে রোমাঞ্চিত হয়েছিল, ধনুক ভূমিতে পতিত হয়েছিল। সে প্রার্থনা করেছিল-''ভগবন্! ভোজনকালে অথবা শয়নকালে, নির্জনে অথবা সখাদের মাঝে আমি আপনাকে কখনও 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা!'-এই সব বলে ডেকেছি। সেই সমস্ত ত্রুটির জন্য আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।''

ছোট-ছোট ত্রুটির জন্য অর্জুন ক্ষমা-যাচনা করতে শুরু করেছিল। কখনও 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ কালো বলেছিল। কৃষ্ণ বলাই কি অপরাধ? কৃষ্ণ শ্যামবর্ণের ছিলেনই, গোরা নামে কি করেই বা ডাকত? যাদব বলাতেও অপরাধ হয়নি কারণ যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণই করেছিলেন, তবে কেউ আর কিছু কি করে বলত? সখা বলাও অপরাধের কিছু নয়। কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে সখা বলে সম্বোধিত করতেন কিন্তু অর্জুন যখন তাঁর প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল তখন এই ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমা যাচনা করতে শুরু করেছিল। সে দেখেছিল কৃষ্ণ কালো ও নন, ফর্সাও নন, যাদবও নন এবং সখাও নন পরন্তু ইনি তো পরাৎপর ব্রহ্ম অব্যক্ত সত্তা। যার উপর কৃপা বর্ষণ করেন, সেই দেখতে সমর্থ হয়। দৃষ্টিরূপে দাঁড়িয়ে যান এবং সম্মুখে স্বয়ং দণ্ডায়মান হয়ে যান। এইপ্রকার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ দেখেছিল।

ভগবান বলেছিলেন-''অর্জুন! আমার স্বরূপ যেমন তুমি দর্শন করেছ তেমন তো শুধু '**ন দৃষ্টপূর্বম্**'-না তো কেউ পূর্বে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছে এবং না কেউ

ভবিষ্যতে দেখতে সমর্থ হবে।" তবে তো গীতার মূল্য আমাদের কাছে কিছু হওয়া উচিৎ নয়, কারণ ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা শুধু অর্জুন পর্যন্ত সীমিত রয়েছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আগে বলেছেন যে, এই কর্ম করেই বহু মনীষী আমার স্বরূপ লাভ করেছেন-**বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।** *(গীতা, ৪/১০)*।। এখানে একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আমার স্বরূপ পূর্বে তুমি ব্যতীত কেউ দর্শন করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলতে কি চাইছেন? অর্জুন-কে ছিল? 'অনুরাগরূপ অর্জুন'! অর্জুন অনুরাগের প্রতীক। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভগবানকে অনুরাগীই লাভ করে-

মিলহি ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা। কিয়েঁ যোগ তপ জ্ঞান বিরাগা।।

(মানস, ৭/৬১/১)

ইষ্টের জন্য যে-রাগ তাকেই অনুরাগ বলে এবং অনুরাগী ব্যক্তিই অর্জুন। পূর্বেও অনুরাগবিহীন কোন ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। ভগবান '**অনুরাগিন কে উর বসৈঁ, উদাসীন কে শীশ।**'

৪- শুধু এটুকুই নয় পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রাপ্তির উপায়ও বলেছেন-

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। *(গীতা, ১১/৫৫)*

অর্জুন! যে পুরুষ আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম করেন, মৎপরায়ণ কর্মকারী '**সঙ্গবর্জিতঃ**'-কিন্তু সঙ্গদোষ থাকলে সেই কর্ম হয় না। অতএব সঙ্গদোষ মুক্ত এবং সর্বভূতের প্রতি বৈরভাববিহীন যিনি, তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ করেন, যেরূপ তুমি প্রত্যক্ষ করলে। সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে নির্জনে অর্জুন কার সঙ্গে যুদ্ধ করত? যদি অর্জুন যুদ্ধ করে থাকত, তাহলে ভগবানের দর্শন পেত না। প্রতিজ্ঞা করে সে যদি জয়দ্রথ অথবা কর্ণকে বধ করে থাকত, তবে 'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'-এর ভগবৎ আজ্ঞা অবজ্ঞা করা হত। কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ করেছিল। বৈরভাব না থাকলে যুদ্ধ কিরূপে ঘটবে? এইপ্রকার গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে না। বস্তুতঃ এটা অন্তঃকরণের যুদ্ধ।

৫- ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-অর্জুন! এই লোকে ভূতগণের স্বভাব দুই প্রকারের-দেব স্বভাব ও অসুর স্বভাব। ভয়শূন্য, অন্তঃকরণের শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, সরলতা, ক্ষমা, দয়া, বৈরভাব শূন্য, নিরন্তর চিন্তন, বাস্তবিক জ্ঞান ইত্যাদি ছাব্বিশটি দৈবী সম্পদের লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন, যে সদ্গুণগুলি

ইষ্টের নিকটবর্তী যে কোন সাধকের মধ্যেই থাকা সম্ভব। আংশিকরূপে সকলের মধ্যেই আছে। এই প্রকার দম্ভ, দর্প, মৎসর, কাম, ক্রোধ এবং মোহ আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ। আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত মানুষ অনন্ত আশা, অনন্ত তৃষ্ণা এবং অপরিমেয় চিন্তায় যুক্ত থাকে। সে ব্যক্তি চিন্তা করে যে, বর্তমানে আমার কাছে এত পরিমাণ সম্পত্তি আছে, ভবিষ্যতে এত হবে। আমিই ঐশ্বর্যের ভোক্তা। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে যা কিছু উৎপন্ন হয়, এটুকুই সত্য, এর বেশী কিছু নেই, ঈশ্বর নামের কোন বস্তু নেই। ‘‘আসুরী সম্পদ্ অধোগতি এবং নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণের মূল কারণ পরন্তু দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণ এবং শাশ্বত স্থিতি প্রদান করে। পাণ্ডব! তুমি শোক কোরো না কারণ দৈবী সম্পদ্ লাভ করেছ। তুমি আমাতে নিবাস করবে।’’ পণ্ডিতগণকে একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, দৈবী সম্পদের সমস্ত যোগ্যতা ঈশ্বরোন্মুখ সাধকের মধ্যে বিদ্যমান, কোন সাংসারিক যোদ্ধার মধ্যে তা নেই।

এই প্রসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আসুরী সম্পদ্‌যুক্ত পুরুষ বিচার করে, ‘‘এই শত্রুকে আমি নাশ করেছি, পরে অমুক শত্রুর নাশ করব’’-‘‘সেই ব্যক্তিগণ স্বীয় দেহে ও অপর দেহে অবস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে। তার আত্মা এবং আমার (পরমাত্মার) মাঝে প্রকৃতির আবরণ চলে আসে, সে আমার (পরমাত্মার) কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এইরূপ ক্রূরকর্মা নরাধমদের আমি বারংবার নীচ-অধম যোনিতে নিক্ষেপ করি।’’ এত স্পষ্ট সাবধানবাণী শুনেও কি অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হত? প্রতিজ্ঞা করে অর্জুন যদি জয়দ্রথাদিকে যুদ্ধে বধ করে থাকত, তবে সেও অধম ও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণের পাত্র হত, অধম যোনিতে জন্ম হওয়া উচিৎ ছিল, পরন্তু ভগবান স্বয়ং বলছেন যে, ‘‘অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে।’’ অর্জুন যদি যুদ্ধ করত তবে পরমকল্যাণের অধিকারী হতে পারত না, ভগবানকে লাভ করতে পারত না। উন্মুক্ত নরকের দ্বার দর্শন করেও কি কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে? কখনও না। মূর্খ মানুষ হতে পারে যুদ্ধ করেও নেবে কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য তো কখনও যুদ্ধ করবে না। অতএব গীতাশাস্ত্রের একটা শ্লোকও বাহ্য হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে না। সংসারে লড়াই তো হতেই থাকে কিন্তু যে জয়লাভ করে, সেও সর্বদার জন্য বিজয়ী হতে পারে না। এই দেহটাই যখন নশ্বর, তখন দেহের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি কতদিন পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে? সংসারে যেসব যুদ্ধ ঘটিত হয়েছে, সেসবের মধ্যে তো প্রতিহিংসা ছিল, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার পরিশোধ করা হয়েছে। বাস্তবিক যুদ্ধ বলে অন্তঃকরণের লড়াইকে, এতে জয়লাভ করলে,

পরাজয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

৬- অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-"অর্জুন! প্রয়াণকালে মানুষ যে প্রাণীর স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, প্রায় সেই দেহই লাভ করে এবং যে পুরুষ শেষ সময়ে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে আমার স্বরূপ লাভ করে।" তবে তো খুব সহজ কাজ এটা। গোটা জীবন ফুর্তি করে মৃত্যুর সময় ভগবানের স্মরণ করলেই হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এমন হওয়া সম্ভব নয়। সেসময় স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, বুদ্ধি লোপ পায়। নতুন বিচার উদয় হতেই পারে না। আজীবন যেরকম মনোভাব থাকে, শেষকালেও সেই চিন্তন অনায়াসে মনকে আচ্ছন্ন করে। অতএব অর্জুন! তুমি আজ থেকেই আমার চিন্তন কর। কাল তো কখনও আসে না। যদি করতে চাও, তবে আজ থেকেই কর এবং যুদ্ধও কর।

এখন কথা হচ্ছে নিরন্তর চিন্তন ও যুদ্ধ একসঙ্গে কি করে সম্ভব? কদাচিৎ এরূপ হবে যে, 'জয় কানাই লাল, জয় ভগবান' বলে লাঠি চালনা ও তীর নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু এমন কথা নয়; এই প্রকারের অনুধ্যানে কাজ হবে না। সেই চিন্তনের বিধানও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট করেছেন-'**অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।**' *(গীতা, ৮/৮)* অর্জুন! 'সেই চিন্তনের বিধান হল যে, পরম বৈরাগ্যে স্থির হয়ে, সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে, নির্জনে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে উত্তমরূপে আকর্ষণ করে, চিত্তকে গুটিয়ে আমাতে নিযুক্ত কর। অন্য বিষয়বস্তুর চিন্তা না করে নিরন্তর শুধু আমার চিন্তন কর।" এইপ্রকার ভগবান ছাড়া অন্য কোন বস্তুর চিন্তা যেন মনে না আসে, যদি আসে তবে তা ভজনা নয়। নির্জনে যেখানে সাধক ছাড়া আর কেউ নেই, সেখানে তিনি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? চিন্তনের বিধি এত সূক্ষ্ম যে, ইষ্টের অতিরিক্ত কোন বস্তুর স্মরণ পর্যন্ত হবে না। মনে করুন আপনার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণই দাঁড়িয়ে, এখন তাঁকে ছাড়া পৃথিবী, গেলাস, পুস্তক, অথবা যে কোন বস্তুর চিন্তা এলে জানবেন তা অনুধ্যান নয়। যখন চিন্তন এত গভীর, তবে চিন্তনে নিযুক্ত ব্যক্তি যুদ্ধ কিরূপে করবে? যাঁর চোখ বন্ধ, মন স্থির, চিত্তকে সবদিক্ থেকে গুটিয়ে ইষ্টে নিযুক্ত করেছেন, তিনি যুদ্ধ কি করে করবেন? ইহজগতের লড়াইয়ে তো শত্রুর গতিবিধি প্রতিক্ষণে পরখ করা হয়। ধ্যানস্থ ব্যক্তি যুদ্ধ কি প্রকারে করবে? অতএব গীতা সাধারণ যুদ্ধের উদ্‌বোধন নয়।

বস্তুতঃ যখন সাধক চিন্তনে প্রবৃত্ত হন, চিত্তকে সবদিক থেকে গুটিয়ে ইষ্টে স্থির করার প্রযত্ন করেন, তখন মায়িক প্রবৃত্তি বাধারূপে আক্রমণ করে। মন উড়তে

শুরু করে। এই মায়িক প্রবৃত্তিগুলির পারে যাওয়ার চেষ্টা করাই যুদ্ধ। এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতেই বাস্তবিক যুদ্ধ ঘটে, সেইজন্য অর্জুন প্রশ্ন করছে, যে ভগবন্! এই মন বায়ুর চেয়েও তীব্র গতিতে ধাবিত হয়। মন স্থির হওয়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করে বলেছেন-'**অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।**' অর্জুন! এতে সংশয় নেই যে মন খুব দুর্জয় এবং চঞ্চল। একে বশ করা খুব কঠিন; কিন্তু '**অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।**' *(গীতা, ৬।৩৫)*-অভ্যাস অবং বৈরাগ্য দ্বারা অযুক্ত মনকেও নিরুদ্ধ করা যেতে পারে। চারিদিক থেকে মনকে গুটিয়ে একটা স্থানে স্থির করার প্রযত্নকে অভ্যাস বলে এবং বৈরাগ্যের আশয় হল দৃশ্য-শ্রব্য বিষয়-বস্তুগুলির প্রতি রাগের সর্বথা ত্যাগ। চিত্ত যেখানেই যাক সেখান থেকে আকর্ষণ করে ইষ্টে নিযুক্ত করার নামই অভ্যাস। দীর্ঘকাল পর্যন্ত অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা এই মন ধীরে-ধীরে নিরুদ্ধ হতে-হতে একদিন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে যায়। অতএব অর্জুন! তুমি অভ্যাস কর। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ চিন্তনের যে স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন তার জন্য বৈরাগ্য এবং অভ্যাসই একমাত্র মাধ্যম, যাতে চিত্তকে সবদিক থেকে গুটিয়ে শুধু ইষ্টে নিযুক্ত করতে হবে।

এই রহস্যের দিকেই সঙ্কেত করে শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, অর্জুন! '**অধ্যাত্ম চেতসা**'-ধ্যানস্থ চিত্তে '**যুদ্ধস্ব**'-যুদ্ধ কর। যদি চিত্ত গভীর ধ্যানে মগ্ন, চোখ বন্ধ,মন স্থির তবে যুদ্ধ কার সঙ্গে হবে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-যুদ্ধ কর। বস্তুতঃ মন স্থির করার সময় জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার প্রকাশিত হয়। সঙ্গদোষজাত বর্তমানের দোষ, এমনকি কিছুক্ষণ পূর্বের সঙ্ঘর্ষও দৃশ্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই বিজাতীয় সঙ্কল্পগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ, অন্যথা যাঁর চিত্ত ধ্যানে কেন্দ্রিত, তিনি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?

৭- এই সন্দর্ভে এই শত্রুদের উপরও বিচার করে নেওয়া যাক যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল-ভগবন্! যা কিছু আপনি বলছেন, তা যদি সত্য, তবে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন '**কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ**' *(গীতা, ৩।৩৭)*-অর্জুন! রজোগুণজাত কাম এবং ক্রোধই এই পথের দুর্ধর্ষ শত্রু। এরাই জ্ঞানবিজ্ঞান নাশক এবং জ্ঞানীদের চিরকালের শত্রু। ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন এদের নিবাস-স্থান। সেইজন্য ভরতর্ষভ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে কামরূপ এই দুর্জয় শত্রুকে বধ কর। শত্রু যখন ভিতরে, তবে বাইরে কেউ কারও সঙ্গে কেন

যুদ্ধ করবে? অতএব এটা অন্তঃকরণের লড়াই, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ। অন্তঃকরণের দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান-দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদ্। একটি পরমকল্যাণকর এবং আর একটি অধোগতিতে নিয়ে যায়। সাধক যখন চিন্তন দ্বারা দৈবী সম্পদ অর্জিত করেন, তখন আসুরী সম্পদ্ বাধারূপে উপস্থিত হয়। এই বাধাগুলি অতিক্রম করে যাওয়াই যুদ্ধ।

৮- শত্রুদের স্বরূপ স্পষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, সংসারই শত্রু। **ঊর্ধ্বমূল মধঃ শাখম শ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।** *(গীতা, ১৫/১)* -সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ। ঊর্ধ্বে পরমাত্মাই এর মূল, নিম্নদিকে প্রকৃতিই এর শাখাসমূহ। যিনি এই অবিনাশী সংসাররূপ বৃক্ষকে জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।। *(গীতা, ১৫/২)*

অর্জুন! এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ ত্রিগুণরূপ জল দ্বারা বর্ধিত ও বিষয় ভোগরূপ পল্লব বিশিষ্ট এবং দেব, মনুষ্য ও তির্যক যোনি পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত। অন্য সমস্ত যোনি ভোগ উপভোগ করে। শুধু মানুষই কর্মের রচয়িতা। সেইজন্য দেবগণও মানুষ দেহের আশা করেন। অতএব মানব-দেহ খুবই দুর্লভ। এই মানব যোনিতে কর্ম অনুসারে বন্ধন সৃষ্টি করে যে অহম্ এবং মমতারূপ মূল ও নিম্নে ও ঊর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত। অতএব এই সংসাররূপ শত্রুকে অসঙ্গতারূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন কর। এখানে সংসারই শত্রু।

৯- ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, হে অর্জুন! এই আত্মাই নিজের শত্রু এবং মিত্র, বিশ্বে আর কেউ শত্রু অথবা মিত্র নয়। যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন, তাঁর জন্য তাঁরই আত্মা মিত্রবৎ ব্যবহার করে, পরমকল্যাণ করে এবং যিনি মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেননি, তাঁর আত্মা তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করে; অধোগতি এবং অধম যোনিতে নিক্ষেপ করে। অতএব অর্জুন! তুমি নিজেই নিজের আত্মাকে উদ্ধার কর। এখানে কাম শত্রু, ক্রোধ শত্রু, সঙ্গদোষ শত্রু, সংসার শত্রু এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অধীনস্থ আত্মাকেও শত্রু বলা হয়েছে। হিন্দু শত্রু, মুসলমান শত্রু, খৃষ্টান শত্রু অথবা রাজ্য আত্মসাৎ করেছে যে, সে শত্রু এমন কিছু বলা হয়নি। শত্রুদের যখন এটাই স্বরূপ তাহলে জগতে কেউ কারও সঙ্গে কেন যুদ্ধ করবে? যখন শত্রু ঘরের ভিতর, তখন বাইরের লোকের সঙ্গে লড়াই করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ কি?

জগতে লড়াই হতেই থাকে। আজকে জয়ী হলে ভবিষ্যতে পরাজয়ও হবে। গ্রীক নৃপতি আলেকজাণ্ডার বিশ্ব বিজয় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, বাস্তবে পরিণত হয়নি, এই সংসার নশ্বর। যদি এটুকুই পাবার জন্য কেউ হাপিত্যেশ করে, তবেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, সে অবিবেক দ্বারা আচ্ছন্ন। নশ্বর বস্তুতে আমরা কি খুঁজে বেড়াচ্ছি? সেসব বস্তুমাত্র লাভ করলে কি করে বিজয়ী হওয়া সম্ভব? বাস্তবিক যুদ্ধ এই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে, এতে একবার জয়লাভ করলে পুনরায় কখনও পরাজয় হয় না। এই প্রক্রিয়াতে মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সংসার বিলুপ্ত হয়, সংস্কারের সূত্র ছিন্ন হয়। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মা অনুকূল হন এবং তাঁকে জানা যায়। তাঁকে অবগত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবাত্মা সেই পরমতত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়, সেখান থেকে পুনরাবর্তন হয় না। এটা একটা এমন বিজয়, যারপর কখনও পরাজয় হয় না।

ক্রমশঃ সঠিক সাধনাপথে অগ্রসর সাধকের হৃদয়ে যখন মহাপুরুষের সান্নিধ্য এবং কৃপাপ্রসাদে যৌগিক ক্রিয়াবিধি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে তখন সেই প্রেরক অভিন্ন হয়ে অন্তরে রথীরূপে দাঁড়িয়ে যান এবং দেহরূপ রথ সঞ্চালন করেন ও ক্রমশঃ চালিত করতে-করতে প্রকৃতির ভ্রমজাল থেকে মুক্ত করে সাধককে নিজের সমকক্ষ স্থিতি প্রদান করবেন, যেখান থেকে পুনরাবর্তন হয় না, এই জীবাত্মার আবর্তন হয় না। এটা একটা এমন বিজয়, যারপর কাল, কর্ম ও প্রকৃতির প্রভু হওয়া সম্ভব হয়। সাধক যে কালে পুরুষত্বে চেতনের প্রতিবিম্ব দেখে। সেকালে, কাল, কর্ম ও প্রকৃতি সেই পুরুষত্বে বিলীন হয়ে যায়। এই স্তরে পৌঁছে সাধক স্বয়ং কল্যাণস্বরূপ, একরস, অবিনাশী, অব্যক্ত ও স্রষ্টার প্রতিবিম্ব দর্শন করে। আধ্যাত্মিক যুদ্ধের এটাই পরিণাম। প্রাপ্তির পর মহাপুরুষগণ, এই নির্ণয়ে পৌঁছেছেন যে **'ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'** ***(ঈশা. উপ. মন্ত্র ১)*** -সর্বত্র ঈশ্বরের বাস। কিঞ্চিৎ মাত্রও জগৎ নেই, তবে কেউ নষ্ট কোথায় হবে। গর্তই নেই তবে কেউ পড়বে কোথায়? অতএব পূর্ণতা লাভ করে নিলে পুনরাবর্তনের বিধান নেই। এটাই শাশ্বত বিজয়। বাস্তবে গীতাতে অন্তঃকরণের লড়াইয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। অন্তঃকরণে দুটি পুরানো প্রবৃত্তি বিদ্যমান-দৈবী সম্পদ্ ও আসুরী সম্পদ্। দৈবী সম্পদ কল্যাণ করে আসুরী সম্পদ্ নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করে। সাধক যখন পরমতত্ত্ব, বিদ্যা লাভের জন্য অগ্রসর হয়, তখন আসুরী সম্পদ্ বাধারূপে আক্রমণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলির পারে যাওয়ার প্রযত্ন করাই যুদ্ধ। বহির্জগতে কোনরকম হত্যাকাণ্ড গীতার অভীষ্ট নয়।

।। ওঁ ।।

সনাতন ধর্ম (হিন্দু-ধর্ম)

প্রশ্ন- মহারাজজী! বর্তমানে হিন্দু ধর্মে বহু কুপ্রথা, বহু সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। সকলেই নিজেকে সনাতনধর্মী বলে। কৃপা করে বলুন যে, সনাতন ধর্ম কাকে বলে?

উত্তর-ধর্মের নামে মাঝে-মাঝেই বহু ভ্রান্তি প্রচলিত হয়। সনাতন ধর্মের নামেও বহু ভ্রান্তি প্রচলিত আছে কিন্তু সে যুগেও এরূপ মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা সেই পাঁক থেকে সমাজকে টেনে তুলে সাধনার সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। ভগবান রাম, শ্রীকৃষ্ণ এটাই করেছিলেন। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, কবীর, নানক, তুলসী সকলেই এটাই করেছিলেন। আজও কিছু ভ্রান্তি প্রচলিত আছে, স্বরূপ ভিন্ন হতে পারে।

আজও অধিকাংশ তথাকথিত সনাতনধর্মী জানে না যে, বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম কাকে বলে? দেখা গেছে অশ্বত্থের পুজা করে বলে-এটা সনাতন ধর্ম। ভূতগণের পূজা, সনাতন ধর্ম, দেব-দেবীর পূজাও সনাতন ধর্ম, তীর্থস্থানে গিয়ে পূজা করাও সনাতন ধর্ম বলেই ভাবা হয়। এমনকি তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর গণনা কোন কালে করা হয়েছিল এবং পুনরায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুইয়াঁ রানী, সন্তোষী মাতার মত দেবীদের সৃজন হচ্ছে। চিত্রকূটে শিয়ালের পূজা করা হয়। বিশেষ পর্বে কোল-ভীল জাতির লোকেরা গর্তের পূজা করে। করতাল নিয়ে গর্তের চারিধারে ঘুরে-ঘুরে গান গায়, নৃত্য করে-'**লোহখরী কে বিল সে নিকলী ভবানী লপ-লপ টেবরী খাইয়ো মা!**' অর্থাৎ শিয়ালের গর্ত থেকে ভবানী বেরিয়ে আমাদের অর্পিত নৈবেদ্য সিদ্ধ মহুয়া) লপ-লপ করে সেবন করবে এবং আমাদের কল্যাণ করবে।

এইপ্রকার নাগ-পূজা, বলদ-পূজা, হাতী পূজা এবং কুকরকে পর্যন্ত পূজা করা হয়। তুকারাম নামের একজন মহাপুরুষ ছিলেন। একবার তিনি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করার জন্য ভোজন প্রস্তুত করেছিলেন। এরই মাঝে একটা কুকুর একটা রুটি নিয়ে পালাচ্ছিল। তুকারাম ভেবেছিলেন যে, ভগবানের ভোগ কুকুর খেতে পারে না, নিশ্চয় ভগবান কুকুরের রূপ ধারণ করে এসেছেন। ব্যস এই চিন্তা আসা মাত্র তিনি ঘি-এর বাটি হাতে তুলে কুকুরের পিছনে এই বলে-বলে ছুটতে শুরু করেছিলেন যে, মহারাজ রুটিটা শুকনো। আপনি খাবেন কি করে? ঘি তো মাখাতে দিন। ভাবাবেশে ছুটছিলেন। সেই তুকারাম খুব উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ছিলেন।

তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল-মহারাজ! রুটি নিয়ে কে পালিয়েছিল? তুকারাম বলেছিলেন-বিঠ্ঠল ভগবান নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিন থেকেই সে অঞ্চলে কুকুর পূজা আরম্ভ হয়েছিল। তিনি কুকুরপূজা শুরু করেননি, তিনি তো ভাবাবেশে এ কাজ করেছিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ পরিস্থিতির চাপে পড়ে একটা বাজপাখি পুষেছিলেন, যা প্রতীক ছিল বাহাদুরীর, যেমন একটা বাজ পাখিদের সমূহে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি প্রত্যেক বাহাদুরকে হওয়া উচিত। শুধু এই প্রেরণার জন্য তিনি বাজকে মাধ্যম বানিয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি যখনই কোন বাজপাখি দেখে, তার প্রতি সম্মানের ভাব তাদের মনে জাগে। এই প্রকার মহাপুরুষদের অনুকরণ করতে-করতেও বহু কুপ্রথা প্রচলিত হয়।

শুরুতে যাঁরা শাস্ত্র আলোচনা করতেন এবং দিগ্বিজয়ী ছিলেন তাঁদের বিদ্বান্ বলে মনে করা হত। শাস্ত্রের সংখ্যা সীমিত, সে সব নিয়ে আর কত বিবাদ হতে পারে? শাস্ত্রের শ্লোক কম মনে হওয়াতে নতুন শ্লোক রচনা করা হয়েছিল। কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এই শ্লোক কোন্ শাস্ত্রে রয়েছে তখন উত্তরে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ বিদ্বান্গণই তো স্বয়ং রচয়িতা, আমি রচনা করেছি। সেই বিদ্বান ব্যক্তি দিগ্‌বিজয়ী হয়েছিলেন। নতুন-নতুন শ্লোক রচনা করার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। পরে ধারা পরিবর্তন হয়েছিল। জনসাধারণ বলতে শুরু করেছিল যে, শুধু বাণীর বিবাদে কি ফল হবে? আচরণও উত্তম হওয়া উচিৎ। শাস্ত্রীয় আলোচনার পাশাপাশি কেউ সূর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস করতে শুরু করেছিল, কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করছিল, কেউ কণ্টক শয্যায় শয়ন করার অভ্যাস করছিল, তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছিল। তপস্যার বাস্তবিক স্বরূপ ভুলতে বসেছিল সকলে। চমৎকার-দেখে জনসাধারণ চমৎকৃত হচ্ছিল, যার ফলে কুরীতিগুলির প্রতি বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছিল।

জনসাধারণ শিক্ষার অভাবেও ভ্রান্তির শিকার হচ্ছিল। সে সময় মহিলা এবং শূদ্রদের শিক্ষাগ্রহণ করার অধিকার ছিল না। বৈশ্যজাতির শিক্ষাগ্রহণ করার অধিকার তো ছিল, কিন্তু চারটি-বর্ণেরই উদরপূর্তির ব্যবস্থা থেকে অবকাশ কোথায়? চারণগণ ক্ষত্রিয়দের মিথ্যা প্রশংসা করে তাদের অকর্মণ্য করে দিয়েছিল। সম্মান এমনিতেই পাচ্ছিল তবে শিক্ষার কি প্রয়োজন? শিক্ষা-দীক্ষা ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া বস্তু হয়ে রয়ে গিয়েছিল। সেকালে আজকের মত তাদের বিদ্যাচর্চায় পটুতা নির্ণয় করার জন্য

কোন পরীক্ষক ছিল না। মনুস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের বাসী খাদ্যবস্তু খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু খোয়া দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য অথবা ঘি দ্বারা নির্মিত খাদ্য ঘি মিশ্রিত করে, ঘিয়ে বা তেলে ভেজে খাওয়া যেতে পারে। বাহ! আমরা মালপোয়া খাবো আর আমাদের হাজার-হাজার সন্তান-সন্ততি মালপোয়া ছাঁকবে। সেসময় তারা নিজেদের ভাবী বিনাশ দেখতে পায়নি; আজকে সকলেই নিজের গর্ব বিস্মৃত হয়েছে। দোষ তাদেরও ছিল না। স্বেচ্ছাচারী হলে এরূপ ভুল হতেই থাকে। ব্রাহ্মণদের স্থানে অন্যজাতি থাকলে তাঁরাও এরকমই ভুল করত।

আরবীরা যখন ভারতে আক্রমণ করেছিল এই ঘটনাটি সেই সময়ের। । ভারতের সীমান্তপ্রদেশের লোকেরা ভোজন গ্রহণ করছিল, ঠিক সেই সময় একজন মুসলমান তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল সকলে কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে, রন্ধন স্থানে যবনের পা পড়েছে। পণ্ডিতমশাইকে যখন এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। যবন-দশফুট দূর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের অনুসারে ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য রামকৃষ্ণ সর্বদার জন্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু ব্যক্তি আল্লা-আল্লা করতে শুরু করেছিল, কিছু ব্যক্তি আত্মহত্যা করে নিয়েছিল। ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে জানত, কিন্তু ধর্ম কি, তা তাদের জানা ছিল না। ধর্ম তো নয় যেন এটা লজ্জাবতী লতা। আমাদের তো বিষপান করলে, শস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয়, কিন্তু ধর্ম পায়ের স্পর্শে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লজ্জাবতী লতার পাতা তো স্পর্শ করলে সঙ্কুচিত হয় কিন্তু হাত সরালেই পুনরায় বিকশিত হয় কিন্তু ধর্ম স্পর্শ না করা সত্ত্বেও নষ্ট হয়েছিল এবং এমন নষ্ট হয়েছে যে, আরও কখনও এর বিকাশ হবে না।

হিন্দুদের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে মুসলমানেরা অবগত ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, হিন্দুদের হত্যা করার প্রয়োজন নেই। শুধু এদের দুর্বলতাগুলি জেনে সেইসব স্থান স্পর্শ করে দিলেই কাজ হবে, এরা অমনি চিৎকার জুড়ে দেবে, এবার কি হবে? ধর্ম তো নষ্ট হয়ে গেল! তারা মুসলমান হতে বাধ্য হবে কারণ হিন্দু সমাজ তাদের আর নিজ ধর্মে স্থান দেবে না। হামীরপুর জেলাতে এইরূপ পঁয়ষট্টিটা পরিবার মুসলমান হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, প্রত্যেক জাতির লোকেদের সেখানে বাস ছিল। তিন-চারজন মুসলমান ব্যক্তি পরিকল্পনা করে এক রাত্রে গ্রামের একমাত্র কুয়োর পাশে লুকিয়ে ছিল। তাদের জানা ছিল যে কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম এখানেই স্নান করতে আসবে। যেমনি তিনি এসেছিলেন, অমনি তাঁকে

ধরে মৌলবীরা তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর সামনেই তারা কুয়ো থেকে জল তুলে সামান্য জল পান করেছিল এবং বাকী জলটুকুর সঙ্গে একটুকরো রুটিও কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপর তারা পণ্ডিতমশাইকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা কুঠুরীতে আটকে রেখেছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কিছু খাবেন?" একথা শুনে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, "এ কি বলছ। আমি ব্রাহ্মণ, তোমরা যবন। তোমাদের স্পর্শ করা ভোজন আমি কি করে গ্রহণ করব?" মুসলমানেরা এরপর আর তাঁকে আটকে রাখেনি মুক্ত করেছিল তিনি ব্যস্ত হয়ে গ্রামে পৌঁছে সকলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"কুয়োর জল কেউ ব্যবহার করেনি তো?" তাঁর কথা শুনে গ্রামবাসীরা বলেছিল-"আমাদের গ্রামে তো একটাই কুয়ো, রোজই তো এর জল ব্যবহার করি। আজ আবার কি হল?" তাদের কথা শুনে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন-"এই কুয়োর পাড়ে যবনরা চড়েছিল। এর জল কিছুটা পান করেছে এবং উচ্ছিষ্ট জলের সঙ্গে রুটির একটা টুকরোও এর মধ্যে ফেলেছে। এখন তোমরা সকলেই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছ। সনাতন ধর্মে এমন কোন উপায় নেই যার দ্বারা তোমাদের শুদ্ধ করা যেতে পারে।" এই অপ্রিয় ব্যবস্থার কথা শুনে বহু লোক আত্মহত্যা করে নিয়েছিল কিন্তু সকলেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি কিছু লোক এই অপ্রিয় ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল কিন্তু তাদের সন্তানরা যখন বয়স্ক হয়েছিল তখন কেউই তাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপিত করেনি যার ফলে বাধ্য হয়ে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে ছিল। আজও তারা বাঁশ পুঁতে পেষণ দণ্ড রেখে হিন্দুদের মতই বিবাহ করে, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, অনুষ্ঠানের শেষে একজন মৌলবী এসে নিকাহ পড়িয়ে চলে যায়।

এইরূপ বাংলাদেশের একজন যুবক তৎকালীন প্রথা অনুসারে আচার্যের গৃহ থেকে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে বাড়ি ফিরছিল, পথের ধারেই এক নবাবের মহল ছিল। নবাব ও তার কন্যা অলিন্দে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। কন্যা যুবকটিকে দেখে বলেছিল, "আব্বাজান! ঐ যে যুবকটি আসছে, তার সঙ্গে আমার বিবাহ করিয়ে দিন।" নবাব কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার কি একে পছন্দ হয়েছে? সে উত্তরে "হ্যাঁ" বলেছিল স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক। নবাব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং হাজির হলে পরে বলেছিল, "আমার কন্যাকে বিবাহ করতে হবে।" যুবকটি বলেছিল, "এ কি করে সম্ভব? আমি ব্রাহ্মণ, তুমি ম্লেচ্ছ।" যুবকটি একা ছিল। তাকে তক্ষুণি বন্দী করা হয়েছিল। যুবক জল পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল। জলপান করলে

ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। অনশনের নবম দিনে সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল? সেই অবস্থাতে নবাব কন্যা তাকে কিছুটা ফলের রস খাইয়েছিল। যার ফলে তার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। সে কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''তুমি আমাকে কিছু খাওয়াওনি তো?'' সে বলেছিল, ''শুধু ফলের রস খাইয়েছি।'' যুবকটি সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে নিকাহ করেছিল এবং অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ধর্মাচার্যদের সঙ্গে দেখা করে নিজের সমস্যা সম্বন্ধে তাদের জানিয়েছিল। তিথি নির্ধারিত করে কাশীতে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। হাজার-হাজার বিদ্বান্ সেই সভাতে সম্মিলিত হয়েছিল।

যুবকটি সকলকে সম্বোধিত করে প্রার্থনা করেছিল যে, ''আমি অজ্ঞান ছিলাম সেই অবস্থাতে নবাব কন্যা আমাকে ফলের রস খাইয়েছে, কিন্তু আমার হৃদয়, আমার বুদ্ধি স্বভাবচরিত্র এবং আস্থা সবকিছুই পূর্ব্ববৎ রয়েছে। আমি শুদ্ধ সনাতনী। আপনারা আমার গুরুজন। আমি আজ্ঞাকারী শিষ্য ছিলাম। কোন বিদ্যাই বিস্মৃত হয়নি, সমস্তই মনে আছে। আমাকে এই কলঙ্ক দেবেন না যে, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।'' বেদশাস্ত্র উলটে নির্ণয় প্রস্তুত করা হয়েছিল। যে, সনাতন ধর্মে তোমার শুদ্ধির কোন উপায় নেই। যুবকটি কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিল যে, ''আপনারা আর একবার বিচার করে দেখুন, আমার আস্থা আগের মতই রয়েছে। আমার কিছুই নষ্ট হয়নি। অজান্তে ফলের রস পান করেছি। আমার কোন দোষই নেই।'' তিন দিন পর্যন্ত পুনরায় শাস্ত্র চর্চা করে বিদ্বান্‌গণ এই নির্ণয়ে পৌঁছেছিলেন যে, সনাতন ধর্মে তোমার জন্য কোন স্থান নেই। অতঃপর যুবকটি প্রতিশোধের ভাব নিয়ে নবাব কন্যার কাছে ফিরে গিয়েছিল। তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিল। নবাব নিজের পদ তাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই বিদ্বান্ যুবক হিন্দুদের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবগত ছিলই, সে আদেশ করেছিল যে, মুসলমানদের উচ্ছিষ্টান্ন-জল হিন্দুদের গ্রহণ করতে বাধ্য কর। মন্দির ও মূর্তিগুলি ধ্বংস কর। ভারতের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভঞ্জক সেই ছিল। ঔরঙ্গজেবের থেকেও বেশী গোঁড়া নিজেকে সে প্রমাণিত করে দেখিয়েছিল। সেইজন্য লোকে তার নামকরণ করেছিল কালো পাহাড়। সকলে বলে যে, হিন্দুদের উপর সে খুব অত্যাচার করেছিল। অত্যাচার সে করেছিল অথবা হিন্দুরা তার উপর অত্যাচার করেছিল?

বিচার করুন, ধর্মের শরণে আমরা যাই কেন? এইজন্য যে আমরা দুর্বল, ধর্ম

সবল। আমরা মরণধর্মা কিন্তু ধর্ম শাশ্বত। আমরা ধর্মের শরণে যাই এই কারণে যে ধর্ম আমাদের রক্ষা করবে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করে শাশ্বত ব্রহ্মে স্থিতি-প্রদান করবে। আমাদের মৃত্যু তো ছেদন করলে, বিষপান করলে তবে হবে কিন্তু ধর্ম তো এতই খেলো হয়ে গেছে যে, এক ঢোক জল পানে, একগ্রাস অন্নে, এক টুকরো রুটিতে নষ্ট হয়ে যায়। যে ধর্ম ফলের রস পান করলে নষ্ট হয়, সেই ধর্ম আমাদের কি করে রক্ষা করবে? এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেটা ধর্ম ছিল না, ধর্মের নামে কুরীতি প্রচলিত ছিল, যেটাকে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

ইংরেজরা এসেও এই একই কাজ করেছিল যে, হিন্দুদেরকে একত্রে আহার গ্রহণ করতে বাধ্য করত। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা এই কাজে বেশী সক্রিয় ছিল। বাঁদা জেলার মানিকপুরের নিকট এইপ্রকার মিশন রয়েছে। তারা কোল-ভীলদের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তাদের মধ্যে ওষুধ-কাপড় বিতরিত করে। তারপর খাবার খাইয়ে ছেড়ে দেয় এবং সুবিধা প্রদান করা বন্ধ করে দেয়। প্রচারিত করে যে, এই ভীল খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই ভীল ব্যক্তি যখন নিজের সমাজে যায় তখন লোকে তাকে এই কথা বলে যে, ‘‘তৈঁ ক্রিস্তান হোই গা। দেখ মোর ভড়বা না ছুইহে।’’ অর্থাৎ আমার বাসন স্পর্শ করো না। সাদাসিধে সরল মনের জনসাধারণ ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে। সবাই অন্ধের মত পুরানো প্রথার অনুসরণ করে চলেছে। এই ধারণা ব্যাপক হয়েছিল। এমন কি শহর থেকে নিয়ে জঙ্গলেও, উচ্চ থেকে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত, মাদ্রাজ থেকে মরুস্থল পর্যন্ত-যেখানে কয়েক মাইল ছেড়ে-ছেড়ে ঘর দেখা যায়। সর্বত্র একই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়েছিল যে, পাত্র স্পর্শ করো না। তুমি খৃষ্টান হয়ে গেছ।

ভারতীয়রা নিজেকে বিশ্ব গুরু, জগৎগুরু বলবে কিন্তু ভারতের বাইরে সমুদ্র পাড়ি দিলেই ধর্ম নষ্ট হয়। যদি পাড়িই না দেন, তবে বিশ্বগুরু কি করে হবেন? বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম এত অগাধ এবং উদার যে, এর জোরেই ভারতকে বিশ্বগুরু বলা হয়। বিশ্বের মানুষ ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যার কাছে ঋণী। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ইত্যাদি মহর্ষিগণ বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ রয়েছে। আজ ধর্মবুদ্ধি অভিভূত হয়েছে যে, সমুদ্র পার করো না, অন্যথা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে? কোলোম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের হাজার-হাজার বছর আগে ভারতীয় সভ্যতা আমেরিকাতে প্রচারিত হয়েছিল। সেখানের প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিগুলি দেখে একথা জ্ঞাত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বী এশিয়া তো প্রতিটি পদক্ষেপে ভারতীয় সভ্যতার

সঙ্গে অনুস্যূত। বর্তমানে সমুদ্র যাত্রা করলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক এই প্রকারের কিছু-কিছু কুরীতি শ্রীকৃষ্ণকালেও প্রচলিত ছিল। অর্জুনও এক-দুটো কুরীতির শিকার ছিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন উভয় সেনার মাঝে রথ স্থাপন করেছিলেন, তখন অর্জুন সেখানে নিজের স্বজন, মামাবাড়ির লোকজন, শ্বশুরবাড়ির লোকজন, সুহৃদ এবং গুরুজনদেরই দেখতে পেয়েছিল। অর্জুন শুধু আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে পেয়েছিল, আর কিছু দেখতে পাননি। সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, অশ্রুপাত হচ্ছিল। সে বলেছিল-নিজের আত্মীয়-স্বজনদের বধ করে আমি কিরূপে সুখী হব? কুলধর্ম সনাতন। যুদ্ধ করলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কুলধর্ম শাশ্বত-এইরূপ যুদ্ধে শাশ্বত ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কুলধর্ম পুরাতন, পুরাতনধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হবে, স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, যাদের জন্ম কুল এবং কুলঘাতকদের নরকে নিয়ে যাবার জন্য হয়। অতএব ধর্ম রক্ষা করার জন্য আমাদের এক্ষুণি কিছু উপায় করা উচিৎ। আমরা বুদ্ধিমান হয়েও মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। শুধু আমি ভুল করছি এমন কথা নয়, আপনিও ভুল করছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করেছিল। এইরূপ বলে অশ্রুমোচন করতে-করতে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়েছিল। বলেছিল গোবিন্দ! আমি কদাপি যুদ্ধ করব না।

তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন; "অর্জুন! এই বিষমস্থলে তোমার কোথা থেকে অজ্ঞান উৎপন্ন হল? যে স্তরের যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছি, তার সমতার কোন স্থান পৃথিবীতেই নেই। তুমি এই তর্ক করছ কি করে? এই অজ্ঞান কোথা থেকে উৎপন্ন হল? কেন? অজ্ঞান কিরূপ? অর্জুন তো সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য উদ্যত ছিল। সনাতন ধর্মের রক্ষা করা কি অজ্ঞান? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনও এর আচরণ করেননি, স্বর্গ,কীর্তি কিছুই প্রদান করতে সমর্থ নয়।" অর্জুন যেজন্য হাপিত্যেশ করছিল মহাপুরুষগণ কখনও তার আচরণই করেননি। সেটা সনাতন ধর্ম হলে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তার আচরণ অবশ্যই করতেন। তবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সেটা সনাতন ধর্ম ছিল না, অর্জুনের অজ্ঞান ছিল।

অর্জুন প্রশ্ন করেছিল, "ভগবন্! আমি এইরূপ শুনেছি যে, কুলধর্মই সনাতন। এর পালনকর্তাই বাস্তবিক সনাতনধর্মী। শুধু শুনেছি দেখিনি। এখন ধর্ম বিষয়ে আমার চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমার পক্ষে যা কল্যাণকর তা-ই নিশ্চয়পূর্বক বলুন। কিন্তু ভগবন্! স্বর্গের সাম্রাজ্য ও দেবগণের

অধিপতি পদ লাভ এবং ধনধান্যসম্পন্ন পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ হলে আমার ইন্দ্রিয় বর্গের সন্তাপক শোক নিবারণ করতে পারে এমন কোন উপায় দেখছি না। যদি এই মাত্র লাভ হবে, তবে আমাকে ক্ষমা করুন। পরন্তু এরাই রাজ্য পরিচালনা করুক, আমরা ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করব। (ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি গুরুজনদের আমি বাণ দ্বারা কিরূপে বধ করব? বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক পথ এমন যার শেষে 'গুরু না চেলা পুরুষ অকেলা' থেকে যায়। গুরুর গুরুত্ব, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব শিষ্যের অন্তরে প্রবাহিত হয়। না গুরু পৃথক থাকেন, না প্রভুই পৃথক থাকেন। পৃথক অস্তিত্ব বোধ শেষে লোপ পায় এটাই তাঁদের মৃত্যু।) অতএব এর থেকেও শ্রেষ্ঠ সত্য যদি থাকে, তবে তা আমাকে বলুন।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন-অর্জুন! যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাদের জন্য তুমি শোক করছ; অথচ পণ্ডিতের মত কথা বলছ, তুমি বস্তুতঃ জ্ঞাতা নও। বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ মৃতদের জন্য শোক করেন না, এবং জীবিত ব্যক্তিদের জন্য হর্ষ প্রকট করেন না, কারণ আত্মার জন্ম-মৃত্যু হয় না। আত্মা শুধু বস্ত্র পরিবর্তন করে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিল-এর থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন সত্য থাকলে তা আমার প্রতি বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, আত্মাই সত্য। এই আত্মা পরমসত্য, সনাতন। আমরা কে? সনাতনধর্মী। আত্মা শাশ্বত। আমরা কে? শাশ্বত ধর্মের অনুগামী। যিনি এই আত্মাকে লাভ করার ক্রিয়া সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তিনি সনাতনধর্মের প্রত্যাশী হতে পারেন, কিন্তু সনাতনধর্মী নন। সেই প্রক্রিয়া বিশেষকে সনাতন ধর্মের ক্রিয়া বলা হয়, যার দ্বারা আত্মার প্রাপ্তি সম্ভব। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই ক্রিয়াকে কর্ম, নিষ্কাম কর্মযোগ নামে সম্বোধিত করেছেন, যা যজ্ঞের প্রক্রিয়া বিশেষ। এটাই হল আত্মাকে লাভ করার একমাত্র উপায়। মনের নিরুদ্ধ অবস্থাতেই সেই আত্মতত্ত্বের দর্শন সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, এই আত্মা অকাট্য, অশোষ্য। জল একে আর্দ্র করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, আকাশ নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে এই আত্মা অজর, অমর, শাশ্বত এবং অমৃতস্বরূপ। যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নেই। প্রকৃতিজাত কোন বস্তু সেই সনাতনকে স্পর্শ করতে পারে না, তবে এক ঢোক জলপান এবং এক টুকরো রুটি খেলে সেই সনাতন কিরূপে নষ্ট হবে? সেই অজর, অমর, সনাতনের মৃত্যু কি করে হতে পারে? এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধর্মের নামে কিছু-কিছু কুরীতি প্রচলিত হয়েছিল। সেইসব কুরীতির শিকার হওয়ার ফলে সনাতন ধর্মের অনুগামীগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতঃ সেটা

সনাতন ধর্ম ছিল না। সনাতন ধর্ম নামে কুরীতি প্রচলিত হয়েছিল।

যখন সনাতন শাশ্বত আত্মা সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত, তবে কাকে অনুসন্ধান করা হবে? দেহের ভিতর অজর-অমর-শাশ্বত কোন সত্তা তো দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত-দিন, শোক, সন্তাপ এবং মৃত্যুই নজরে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-অর্জুন! এই আত্মা অচিন্ত্য। যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তের তরঙ্গ বিদ্যমান, ততক্ষণ এই আত্মাকে দেখা যায় না। ততক্ষণ উপভোগের জন্য আত্মা নামের কোন বস্তু নেই। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিষয়ভোগ বাসনা রয়েছে ততক্ষণ আমাদের দর্শনের জন্য আত্মা নামের কোন বস্তু নেই। অর্জুন! বস্তুতঃ আত্মাই অজর, অমর ও শাশ্বত। প্রশ্ন উঠছে যে, আপনি বলছেন সেইজন্য স্বীকার করে নিই। শ্রীকৃষ্ণ সমাধান করে বলছেন-অর্জুন! আত্মাকে এই বিভূতিগুলির সঙ্গে যুক্ত কেবল তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন যে, আত্মা সত্য, পরমসত্য, শাশ্বত ও সনাতন। কে দেখেছেন? তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছে! প্রফেসার, দশটি ভাষার জ্ঞাতা, সমৃদ্ধশালী কোন ব্যক্তি দেখেনি। এই বিভূতিগুলি দ্বারা যুক্ত আত্মাকে শুধু তত্ত্বদর্শীগণ দেখেছেন।

এখন একটা নতুন প্রশ্ন উঠছে যে, তত্ত্বদর্শন কাকে বলে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তত্ত্ব লাভে ইচ্ছুক পুরুষগণকে কর্ম করা উচিৎ। সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ভোগ থেকে আকর্ষণ করে, পরম বৈরাগ্যে স্থিত থেকে, নির্জনে চিত্তকে ধ্যানে নিযুক্ত করা উচিৎ। যে কোন কাজ করে সেটাকেই কর্মের সংজ্ঞা দেওয়াটা ভুল। এই যোগে ক্রিয়া একটাই রয়েছে। সেই নিয়ত বিধি বিশেষের জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। লক্ষ্য বাস্তবিক হওয়া উচিৎ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সতত অভ্যাসের ফলস্বরূপ মন যখন এতটা সূক্ষ্ম হয়, যে, কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মৎসর ইত্যাদি বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায় এবং বিবেক, বৈরাগ্য, ধ্যান এবং সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতা চলে আসে, সাধনা পূর্ণরূপে পরিপক্ক হয় সেইকালে সাধক ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা লাভ করে। তত্ত্ব কি তা জানার আবশ্যকতা ছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-ব্রহ্মকে জানার যোগ্য হয়, কারণ তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম একে অপরের পর্যায়ভুক্ত। এই যোগ্যতার নাম হল পরাভক্তি, এখানে ভক্তি পরাকাষ্ঠাতে, পরিণাম দেওয়ার স্থিতিতে রয়েছে। এই পরাভক্তি লাভ করেই সাধক সেই পরম তত্ত্বকে জানতে পারেন।

সেইকালে পরমতত্ত্বকে জানা যায় ঠিকই কিন্তু সেই তত্ত্ব কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-অর্জুন! আমি যেরূপ, যে-যে বিভূতি দ্বারা যুক্ত, অজর-অমর-শাশ্বত-অব্যক্ত

যে-যে অলৌকিক, গুণধর্মে সংযুক্ত সেসব জানতে পারেন, এবং আমাকে জেনে অর্জুন! তৎক্ষণাৎ আমাতে একাকার হন। আগে ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় এবং পরক্ষণেই নিজের আত্মাকে ঈশ্বরীয় গুণধর্মে যুক্ত দেখেন। গোস্বামী তুলসীদাসজী এই স্থানের জন্যই সঙ্কেত করেছেন-'**তুম্হরী কৃপাঁ পাব কোই কোঈ।**' -ভগবন্! আপনার কৃপার ফলস্বরূপই কিছু-কিছু মানুষ আপনাকে লাভ করে। লাভ করার পর তার স্বরূপ কিরূপ হবে? '**জানত তুমহহি তুমহই হোই জাঈ।**' ***(মানস, ২/১২৬/৩)*** -আপনাকে জেনে তিনি সাক্ষাৎ আপনার স্বরূপ হয়ে যান। শ্রুতি আছে যে, '**ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মৈব ভবতি।**' যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মে পরিণত হন। সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর সেই পরমতত্ত্ব পরামাত্মার যিনি সাক্ষাৎ এবং স্পর্শ করেন তখন সেই ক্ষণে তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজ আত্মাকেই ঈশ্বরীয় গুণধর্মে পরিপূর্ণ, অব্যক্ত ও শাশ্বত-এর শ্রেণীতে দেখতে পান। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে পরমাত্মাই পরমতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঁচিশটি প্রকৃতিকে বলছেন না।

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ যাঁরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, আত্মাই পরমসত্য, শাশ্বত, সর্বত্র ব্যাপক সনাতন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সত্য নেই। অতএব যদি আমরা তত্ত্বলাভের, সনাতন ধর্মের অনুগামী হতে ইচ্ছুক, তবে আমাদের যে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যেতে পারে, সেই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে, এবং সেই অনুসারে চলতে হবে। আত্মানুভূতিই সনাতন ধর্ম।

এই আত্মা দেশ, বিদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা, রহস্যময় সৌরমণ্ডল এবং যে দ্বীপ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়নি, সেখানেও সর্বত্র একইরকম, ব্যাপক। সকলের আত্মা সেই এক শাশ্বত সত্তাকেই বিশ্বাস করে। একথা আলাদা যে, বিপদে পড়লে তা শিথিল হয়ে যায়। আরববাসীরা তাঁকে খোদা বলে ইংরেজরা 'সুপ্রীম গড' বলে। সংস্কৃতে যাকে ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা বলে। আত্মা সকলের অন্তরে সমানভাবে বিদ্যমান। যদি কেউ সেই আত্মতত্ত্ব লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন, তবে তিনি সনাতনধর্মী, ইউরোপ অথবা বিশ্বের যেস্থানই তার জন্মভূমি হোক তাতে কিছু যায় আসে না। ইংরাজীতে জলকে ওয়াটার বললেও 'সুপ্রীম গড' বলে তিনি সেই আত্মাকেই লাভ করবেন।

যদি আমরা আত্মাকে লাভ করার প্রক্রিয়া জ্ঞাত নই তবে আমরা সনাতন ধর্মের প্রত্যাশী হলেও সনাতনধর্মী নই। যতক্ষণ ভূতপ্রেত অথবা এদিকে-সেদিকে পূজা করে বেড়াচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সনাতন ধর্ম কি, তা জানি না। এই

কুরীতিগুলিতে জড়ানোর ফলে স্পর্শ করলে, অন্নগ্রহণ করলে নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে স্পর্শ করলে অথবা অন্নগ্রহণ করলে কেউই নষ্ট হয় না। এর কারণ এই নয় যে, ধর্ম এখন সবল হয়ে গেছে, পরন্তু লোকেরা সাক্ষর হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পণ্ডিতমশাইকেই জিজ্ঞাসা করে বসে যে পণ্ডিতমশাই বলুন তো! ধর্ম কি করে নষ্ট হয়েছিল? ধর্মের স্বরূপ কি? পণ্ডিতমশাই তো তাও জানেন না। সেইজন্য সেই প্রশ্নগুলি শুনে চুপ করে যান। অতএব ধর্ম সবল হয়নি। পরন্তু ধর্মের নিন্দাকারীদের সমুদায় পৃথক হয়ে পড়েছে। যারা স্পর্শ করা সেই অন্নগ্রহণ করে তারাও জানে না যে বস্তুতঃ ধর্ম, কর্ম কাকে বলে?

যার নাম ধর্ম, যদি আপনি সেই ক্রিয়াবিশেষ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, সনাতন আত্মাকে লাভ করতে চান, তবে শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে যান। নিষ্কপটভাবে সেবা করে এবং জিজ্ঞাসার সমাধান করে তাঁকে লাভ করুন।

।। ওঁ।।

জাতি-প্রথা

প্রশ্ন- মহারাজজী, বর্তমানে প্রচলিত জাতি-প্রথার কতটা উপযোগিতা আছে?

উত্তর - দেখুন, বর্ণ-ব্যবস্থার জন্য পৃথিবীতে পর্যাপ্ত মতভেদ রয়েছে। দেশে-বিদেশে লক্ষ-লক্ষ জাতি এবং উপজাতি প্রচলিত আছে এবং জানা নেই যে, কত জাতি এবং উপজাতি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি প্রমুখ ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে এরূপ কিছু উল্লেখ নেই। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে তাদের শুধু দুটি প্রকার-দেবতাদের মত এবং অসুরদের মত। এই বিভাজনের আধার কি? বস্তুতঃ অন্তঃকরণে দুটি পুরোনো প্রবৃত্তি বিদ্যমান-এক দৈবী সম্পদ্, দুই-আসুরী সম্পদ্। আসুরী সম্পদ্ অধোগতি এবং নীচ যোনিগুলিতে নিক্ষেপ করে এবং দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণকর। যে হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ কার্য করে, সেই মানুষ দেবতুল্য এবং যার হৃদয়ে আসুরী সম্পদ্ কার্য করে, সেই মানুষ অসুর তুল্য। একটা ঊর্ধ্বমুখী আর একটা অধোমুখী। একটা ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে দেয় অন্যটা প্রকৃতিতে বিমুগ্ধ করে। আসুরী সম্পদ্ অধোগতি এবং নীচ যোনিগুলিতে নিক্ষেপ করে এবং দৈবী সম্পদ্ পরমকল্যাণ করে।

দৈবী এবং আসুরী সম্পদ্রে লক্ষণ কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণ এর উপরও আলোকপাত করলেন। ইন্দ্রিয়গুলির দমন, মনের শান্তভাব, একাগ্রতা, অনুক্ষণ চিন্তনের প্রবৃত্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের বাস্তবিক জ্ঞান, শরণাগতি, সরলতা ইত্যাদি চব্বিশটি লক্ষণ সম্বন্ধে বললেন এই সমস্ত লক্ষণ তো কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব অথবা খুব উচ্চস্তরের, ঈশ্বরের নিকটবর্তী মহাপুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব। আপনিও এই সমস্ত গুণের অধিকারী হতে পারেন, আমিও হতে পারি। এই দৈবী সম্পত্তি পরমকল্যাণকর। অর্জুন! তুমি দৈবী সম্পদ্ লাভ করেছ। তুমি আমাতে নিবাস করবে। শোক কোরো না।

শ্রীকৃষ্ণ আসুরী সম্পদ্রে লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন যে-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর, আশা, অনন্ত তৃষ্ণা এসবই আসুরী সম্পদ্। আসুরী সম্পদ্যুক্ত ব্যক্তি-ভাবে যে, স্ত্রী পুরুষের সংযোগে সৃষ্ট এই জগতের যতটুকু আমরা দেখতে সমর্থ হই, সেটুকুই সত্য; ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। আমিই ঈশ্বর এবং ঐশ্বর্যের ভোক্তা। সে চিন্তা করে যে, আমার কাছে এখন এতটা সম্পত্তি আছে, ভবিষ্যতে আরও

এতটা সংগ্রহ করে নেব। আমি যজ্ঞ করব, দান করব এবং যশের ভাগী হব। এইরূপ ব্যক্তি যজ্ঞ এবং দানও শুধু লোককে দেখাবার জন্য করে। তাদের অনুসারে ঈশ্বর অনাবশ্যক। তারা প্রকৃতিকেই বিশ্বাস করে, সেইজন্য তাদের অসুর বলা হয়। পরমদেব পরমাত্মার উপর যারা নির্ভর করে তাদের সুর বলা হয় এবং পরমাত্মা থেকে বিমুখ প্রকৃতি প্রধান ব্যক্তিদের অসুর বলা হয়। যেমন-যেমন মানুষের মধ্যে দৈবী সম্পদের এক-একটা গুণ সংগৃহীত হবে, তেমন-তেমন সে দেবত্ব লাভ করতে থাকবে। ক্রমশঃ উন্নতি করতে-করতে নিরুদ্ধকালে, ধ্যান এবং সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতালাভ হলে, পরমদেব পরমাত্মার প্রতিবিম্বের দর্শন হয়। দর্শন করার সঙ্গে-সঙ্গে সাধক সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তো সাধক স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ এবং শাশ্বত স্থিতির অধিকারী হন; যে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করেছেন যে, -অর্জুন! তুমি আমাতে নিবাস করবে, জীবভাব-এ নয়।

কখনও-কখনও মানুষ দৈবী সম্পত্তি অর্জন করতে তো পারে না কিন্তু মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জাগে যে, ইস্! আমিও যদি করতে পারতাম, কারও এই ধরনের দশা হলে বুঝতে হবে যে, তার ভিতর সেই দৈবী সম্পদ্ কার্যরত রয়েছে। দেবত্ব লাভের আশায় উন্মুখ রয়েছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না, করতে অসমর্থ-এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি সামান্য মানুষ। যখন এই পথে চলতে সমর্থ হয় তখন সেই ব্যক্তি দেবতুল্য এবং যখন সেই ব্যক্তিই জড়বাদী হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে মানুষও বলা যেতে পারে না। আকৃতি মানুষের মত হলেও সে অসুর তুল্য। 'খাও দাও ফূর্তি কর' পর্যন্তই তাদের দৃষ্টি সীমিত থাকে। তারা অনুসন্ধান করার জন্য সংসারে থাকে কিন্তু যখন এই দেহটাই নশ্বর তখন এর ভোগ্য সামগ্রী 'সংসার' কি করে সত্য হবে। সেইজন্য দেহরূপ-যন্ত্রের সঙ্গেই তাদের সমস্ত রকমের অনুসন্ধান কার্য বন্ধ হয়ে যায় পরন্তু দৈবী সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে নষ্ট তো কখনও হয় না; **'অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ'** পর্যন্ত বিধান রয়েছে। মনে করুন এই জন্মে আপনি সামান্যই সাধন করতে সমর্থ হলেন এবং এরই মাঝে দেহের সময় ফুরিয়ে গেল, তাহলে পরের জন্মে সেখান থেকেই পুনরায় বাধিত সাধনা আরম্ভ হবে এবং ক্রমশঃ চলতে-চলতে **'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।'** *(গীতা, ৬।৪৫)* বহু জন্মের পরিণাম স্বরূপ সাধক সেখানে পৌঁছান, যার নাম পরমসিদ্ধি অর্থাৎ পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সেটা আমার নিজ স্বরূপ।

যখন থেকে সৃষ্টিতে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে (যদ্যপি সৃষ্টি অনাদি। কখন

থেকে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে-এটা বলা সম্ভব নয়। আদিবাসী কেউ নয়), সুদূর অতীতে এই দুটিই জাতি ছিল-সুর ও অসুর। দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনীতে শাস্ত্রগুলি পরিপূর্ণ। বাস্তবে মানুষের এই দুটোই স্বরূপ রয়েছে; বর্তমানে প্রচলিত শব্দ অনুসারে, এক আস্তিক দুই নাস্তিক। এই বিভাজনই সদৈব ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বৈদিককালের এই অনুসন্ধান অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রশ্ন- মহারাজজী! তাহলে তো যে ব্যক্তি বর্তমানে নাস্তিক, সে কি সর্বদা নাস্তিকই থাকবে?

উত্তর- না, কারণ সকলেরই অন্তঃকরণে দুটিই প্রবৃত্তি বিদ্যমান। যখন আসুরী প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তখন দৈবী সম্পত্তি প্রসুপ্ত অবস্থাতে থাকে, কিন্তু তা বিনষ্ট হয় না। কোথাও ঠোক্কর খেলে অথবা সৎসঙ্গ এর মাধ্যমে সৎ-সংস্কার উদয় হলেই দৈবী সম্পত্তি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং আসুরী প্রবৃত্তি হ্রাস পেতে থাকে শনৈঃ-শনৈঃ সাধক পরমদেব-এর দেবত্ব লাভ করেন। অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তিই হ্রাস-বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত পেতে থাকে, যতক্ষণ না তিনি ইষ্টের অঙ্কে স্থিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর উর-প্রেরকরূপে সঞ্চালন করতে শুরু করে দেন না, ততক্ষণ আসুরী প্রবৃত্তি সফল হতেই থাকে।

বাল্মীকি নাস্তিক ছিলেন। চুরি, ডাকাতি হত্যা করাই তাঁর স্বভাব ছিল। নারদাদি ঋষিদেরও ছাড়েননি। গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু সৎপুরুষ-এর সঙ্গতিতে তাঁর অন্তঃকরণের দস্যু স্বভাব সমাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি ব্রহ্মর্ষির পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সাধু সঙ্গতি, অল্প-স্বল্প সেবা করে, তাঁর দ্বারা নির্দেশিত সাধনা পথে চলুন। সকলেই সেই পথেরই পথিক। সৎসঙ্গতির অভাবে যে বিস্মরণ ঘটে, নাস্তিকতা তো তারই নাম। আস্তিকতা, আত্মদর্শনের প্রবৃত্তি সকলের ভিতর রয়েছে।

অন্তঃকরণের এই দুটি প্রবৃত্তির আধারেই মানুষের দুটি জাতি, দুটি স্বভাব অথবা দুই প্রকার রয়েছে। সুদূর অতীতে দেবাসুর জাতিগুলির উল্লেখ এই তথ্যকেই ইঙ্গিত করছে। কালান্তরে কোন রাজা হয়ত অন্য আর একজন রাজাকে পরাজিত করেছিল, পরে সেই বিজয়ী রাজার নামে বংশ এবং জাতি-পরম্পরা (প্রথা) প্রচলিত হয়েছিল। ক্রমশঃ যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ইত্যাদি জাতিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। অতঃপর মণ্ডুক, বানর, ঋক্ষ ইত্যাদি জাতিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। তাঁরা বাঁদর, ভালুক ছিলেন না। আমার আপনার পূর্বপুরুষ ছিলেন। জাম্ববান উত্তম জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। ভালুক কি জ্যোতিষী হয়? পরবর্তীকালে তাঁর ঔরসে জাতকন্যা জাম্ববতীর

সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কি ভালুকের সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন? হনুমান ভক্ত ও পরম বিবেকী ছিলেন। বালি সন্ধ্যা করতেন। বালির মধ্যে একটা-মাত্র দোষ ছিল, সে নিজের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর উপর দাবি করেছিল। বালি যদি পশু হত তবে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম মানবোচিত উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার জন্য তাকে কেন দণ্ড দিতেন?

বস্তুতঃ বানর, মণ্ডুক, ঘোড়া এসমস্তই এক একটি জাতি ছিল। হৈহয় নরেশদের পুরাণে উল্লেখ রয়েছে। শনৈঃ-শনৈঃ সমস্ত জাতি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। কোনকালে জাতি ব্যবস্থা কঠোর ছিল। বর্তমানে তো এক-একটা জাতির বহু উপজাতি সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুটো বেদের জ্ঞাতাকে দ্বিবেদী, তিনটে বেদের অধিকারীকে ত্রিবেদী, চতুর্বেদের জ্ঞাতাকে চতুর্বেদী বলে। যাঁরা অগ্নিহোত্র করাতেন, তাঁদের অগ্নিহোত্রী উপাধি। শিক্ষকদের উপাধ্যায় উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। যাঁদের উপাধ্যায় উপাধি, তাঁদেরও কয়েকটাই উপজাতি ছিল। খোরিয়া উপাধ্যায়, কটোরী উপাধ্যায়, পরাত উপাধ্যায়। এতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, যজ্ঞে করে কারও পরাত (বড়থালা) গ্রহণ করার অধিকার ছিল আবার কারও কটোরী (বাটি) গ্রহণ করার অধিকার ছিল।

ক্ষত্রিয় জাতিতে রাজার পুত্রদের রাজপুত বলা হত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা প্রতিহারের (দারোয়ানের) কাজ করতেন, তাঁদের প্রতিহার বলা হত। মহারাজা রঘুর নামে রঘুবংশী এইরূপ সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, যদুবংশী ক্ষত্রিয়দের জাতি সৃষ্টি হয়েছিল। কুরুর নামে কৌরব বংশ, পাণ্ডুর নামে পাণ্ডব বংশ অস্তিত্বে এসেছিল। কিন্তু আজ কেউই কৌরববংশী অথবা পাণ্ডববংশী নয়। মহারাণা প্রতাপের বংশের সঙ্গে সম্বন্ধীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোন একটা দুর্গ জয় করার জন্য রাণা রাজসভাতে তাঁর দু'জন সর্দারকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দু'জন সর্দারই বাজিমাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। দুই সর্দারেরই সেনাদল নিজের-নিজের শৌর্য প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। মোগল সৈন্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সূর্যাস্তের সময় একজন সর্দার চিৎকার করে উঠেছিল যে, সূর্যাস্তের পূর্বেই আমাকে দুর্গে প্রবেশ করে যেতে হবে, অন্যথা আমার প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর হাতিটি দুর্গের ফটকটির ছুঁচলো পেরেকের জন্য তা ভাঙ্গতে গড়িমসি করছিল। সর্দার পেরেকগুলিতে বুক ঠেকিয়ে মাহুতকে আদেশ দিয়েছিল যে, হাতিটিকে এগিয়ে নিয়ে চল এবং আরও বলেছিল যে, "হর হর

মহাদেব" বলতে-বলতে আমার লাশ সূর্যাস্তের পূর্বেই দুর্গের ভিতর নিয়ে যেও। সর্দারের আদেশ পালন করা হয়েছিল। হাতীর চাপে এবং পেরেকগুলিতে সর্দারের বক্ষস্থল ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ফটকটা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল ঠিক সেইসময় অন্য সর্দারের দৃষ্টি সেদিকে গেছিল, সেই সর্দার আবার মইয়ের সাহায্যে সেনাদলকে দুর্গের ভিতর নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। সে ভেবেছিল যে, এই সর্দার তো আমার আগেই দুর্গে প্রবেশ করে যাবে, অতএব সে নিজের সেনাদলকে আদেশ দিয়েছিল যে আমার মাথাটা কেটে এক্ষুণি দুর্গের ভিতর ছুঁড়ে দাও। সেনা তার আজ্ঞা পালন করেছিল এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এইপ্রকার উৎসাহীরাই জয়লাভ করে। সূর্যাস্তের পূর্বেই দুর্গটি রাজপুতদের অধিকারে চলে এসেছিল। মহারাণা দুজন সর্দারের নামেই দুটো বংশ চালিয়েছেন। শক্তির নামে শক্তাবত এবং চুড়ার নামে চূড়াবত বংশ অস্তিত্বে এসেছিল।

রীবাঁ নরেশ গুজরাট নরেশের পুত্র ছিলেন তাঁর নাম ছিল ব্যাঘ্রদেব। এখানে লড়াই করে তিনি রীবাঁ রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর নামে বঘেল বংশ অস্তিত্বে এসেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য, শৌর্য, ব্যবসা এবং প্রাদেশিক নিবাসের ফলস্বরূপ জাতিগুলির গঠন এবং বিস্তার হচ্ছিল। গন্ধ যারা বিক্রি করত তাদের গান্ধী, হীরা-রত্ন ব্যবসায়ীদের জহুরী, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের স্বর্ণকার, লৌহজীবীদের কর্মকার, ভাজাভাজি করত যারা, তাদের ভড়ভূঁজা বলা হত, তৈল ব্যবসায়ীদের তেলী বলা হত। হালুইকরদের ময়রা। সোনার থালাতে যারা আহার গ্রহণ করত, তাদের সোনথালিয়া, যারা মূষিক আহার করত, তাদের মূসহর, চামড়ার কাজ করত যারা, তাদের চর্মকার বলা হত। অট্টালিকাতে বাস করত যারা তাদের কোঠারী, ভাঁড়ারের ভার যাদের উপর ছিল, তাদের ভাণ্ডারী বলা হত। মালা বিক্রি করত যারা তাদের মালী, কাপড় কাচত যারা তাদের ধোপা, কান্যকুব্জ নিবাসীকে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বলা হত। মগধ নিবাসীকে মাগধ, অম্বষ্ঠ, জয়সওয়াল-এগুলিও আবার কোন জাতি নাকি? পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী কৌরব ও পাণ্ডব জাতিগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলির সুরক্ষার জন্য সংঘর্ষ হয়েছিল। হৈহয় ইত্যাদি সমৃদ্ধ জাতিগুলির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে, তবে কি আজকের জাতিগুলিই সুরক্ষিত রয়েছে। এ সমস্তই তুচ্ছ পদবীগুলির মোহ আর কিছু নয়। এই প্রকার কুরীতির প্রচলন বেড়েই যাচ্ছিল এবং মানুষ সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। এখন তো এই জাতিগুলির প্রভাবও কমে আসছে। ভবিষ্যতে হয়ত সোশ্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, কংগ্রেস ইত্যাদি জাতিগুলির গঠন হবে অথবা কিছু আরও

হবে। কেন ? কারণ অতীতের জাতিগুলি, যেগুলির নিয়ম পালন কঠোরভাবে প্রচলিত ছিল; লুপ্ত হয়ে গেছে, সেইজন্য এগুলিও বিলুপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুতঃ মানুষ দু'প্রকারের। এটাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত।

প্রশ্ন- কিন্তু মহারাজজী! শ্রীকৃষ্ণ তো বলেছেন মানুষ চার প্রকারের 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্।।'

উত্তর- দেখুন, গীতাশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-'**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**' চারটি বর্ণের রচনা আমি করেছি। তবে কি চার প্রকারের মানুষ সৃষ্টি করেছেন ? না, পরন্তু '**গুণকর্ম বিভাগশঃ।**' গুণগুলির মাধ্যমে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। গুণ হল মাপকাঠি, যার সাহায্যে পরীক্ষা করে কর্মকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে একেই আরও স্পষ্ট করেছেন-'**কর্মাণি প্রবিভক্তানি**'-কর্মকে ভাগ করা হয়েছে, মানুষকে নয়। মানুষের তো দুটো মাত্র প্রকার। আপনি ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, আরবদেশ অথবা বিশ্বের যে কোন স্থানেই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। এই দুটি প্রবৃত্তি তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকবেই। মানুষ হয় দৈব, ঈশ্বর প্রধান হবে অথবা প্রকৃতিতে বিশ্বাসী হবে। দৈব প্রধান হলে দেবতার ন্যায় এবং প্রকৃতি প্রধান হলে অসুরের ন্যায় হবে।

এই প্রকার দৈবী প্রবৃত্তিযুক্ত প্রত্যেক পুরুষ ধার্মিক হয়। শুধু পরমাত্মাই সনাতন, সেইজন্য যিনি তাঁকে লাভ করতে ইচ্ছুক, তিনিই সনাতন ধর্মী। নিজের এই অবদানের জন্য ভারত জগদ্গুরু ছিল। ভারতই বিশ্বকে দৈবী সম্পদ্ এবং পরমদেব পরমাত্মাকে লাভ করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত করিয়েছিল। শুধু গ্রন্থ পাঠ করলে সেই ক্রিয়ার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। প্রাপ্তি যুক্ত, তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে সামান্য সেবা এবং তাঁর অনুসারে সামান্য সাধনা করে গেলে সেই ক্রিয়া জাগ্রত হয়, সেই আরাধ্যদেব অন্তর থেকে নির্দেশ দেন, পথ- সঞ্চালন করতে শুরু করেন, যাঁর সাহায্যে চলে সাধক দেবত্ব লাভ করেন। যদি কোন ব্যক্তি দৈবী সম্পত্তি অর্জন করার জন্য প্রযত্ন করেন তবে তিনি বিশ্বের যে স্থানেরই নিবাসী হোন না কেন, তিনি সনাতনধর্মী। হ্যাঁ, একথা আলাদা যে, তিনি সনাতন ধর্মের পিপাসুমাত্র। সনাতন ধর্মের বিশুদ্ধ অনুগামী তিনি তখনই হবে, যখন কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ 'সদ্গুরু'-এর সান্নিধ্য লাভ হবে এবং তিনি তাঁর আত্মাকে জাগিয়ে তুলবেন অর্থাৎ যে স্তরের সেই ব্যক্তি, সেই স্তর থেকেই তার উন্নতি ঘটিয়ে, শনৈঃ-শনৈঃ পথ-সঞ্চালন করে পরম-এর দিকে উচ্চ স্তরে উপনীত করবেন। সেইদিন থেকে তিনি সনাতন ধর্মীর শ্রেণীতে

চলে আসেন, এর আগে তিনি পিপাসু মাত্র।

অন্তঃকরণের এই দুটি প্রবৃত্তি এবং মানুষ মাত্রকে নিজেরই মত অনুভব করে ভারতীয়গণ সমস্ত বিশ্বকে নিজ ধর্মে ঠাঁই দিয়েছে এবং আত্মসাৎ করেছে। গোপনীয় অধ্যাত্ম বিদ্যার মাধ্যমে ক্রমশঃ তাদের উন্নতি ঘটিয়ে শাশ্বত সত্যের গরিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। এই কারণেই ভারত বিশ্বগুরু হতে পেরেছিল। বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে রামের যজ্ঞে, যেখানে সমস্ত প্রজা এবং ঋষিগণ আমন্ত্রিত ছিলেন, ভোজন করানো ইত্যাদির সেবাতে রাম নিজের বিশ্বস্ত অনুচর এবং বন্ধুদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেখানে বিভীষণ এবং তাঁর পরিবার, জাম্ববান, এবং অঙ্গদের পরিবারও সম্মিলিত ছিল, কিন্তু এই অধম জাতিদের দ্বারা পরিবেশিত ভোজন গ্রহণ করতে ঋষি, বিপ্র এবং জনসাধারণের কোন আপত্তি ছিল না। সকলেই তৃপ্তি করে খেয়েছিল এবং সেবকদের প্রশংসা করেছিল। অতএব স্পর্শ করা ভোজন গ্রহণ করলে ধর্ম কখনও নষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ সমাজে কখনও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন না। যাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি এটা তো তাদের অবদান। যিনি সেই পরমকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি প্রতিটি কণায় পরিব্যাপ্ত, তিনি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কখনও বলতে পারেন না যে, ভারতেই রামের অস্তিত্ব আছে। বাইরে নেই। যদি কেউ এই প্রকার কিছু বলে থাকে, তবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সে এখনও ঈশ্বর তত্ত্বকে জানে না। মহাপুরুষদের তিরোধানের পর তাঁদের নামে খ্যাতি অর্জনকারীরা অথবা উদর-পোষণের প্রবৃত্তি নিয়ে জীবন ধারণ করে যারা, তারাই সম্প্রদায়বাদ, কুরীতিবাদ এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। কবীর এই প্রকারের ব্যক্তিদেরই উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

কোঈ সফা না দেখা দিল কা।
সাঁচা বনা ঝিলমিল কা রে.........কোঈ।।
কাজী দেখা মুল্লা দেখা, পণ্ডিত দেখা ছলকা।
অওরোঁ কো বৈকুণ্ঠ বতাবে, আপ নরক মে সরকা।
বিল্লী দেখা বগুলা দেখা, সর্প জো দেখা বিল-কা।
উপর উপর বনল সফেদী, ভীতর গোলা জহর কা।।
পড়ে লিখে কুছ বেদ শাসতর, ভরল গুমান বরন কা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, লানত অইসে তনকা।।

কবীর বলেছেন যে, বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও যাদের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান রয়ে গেছে, এইরূপ ব্যক্তিদের ধিক্। বেদ অধ্যয়ন সে করল কই? কৃত্রিম জাতিগুলি তো উৎপন্ন হয়েছে আবার নষ্টও হয়েছে। নিত্য উৎপন্ন হচ্ছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে, ভবিষ্যতেও উৎপন্ন হবে এবং নষ্ট হবে। মানুষের শুধু দুটি শ্রেণী, দুটি জাতি স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। বাস্তবে মানুষ দু'প্রকারের। চার প্রকারেরও নয় আবার হাজার প্রকারেরও নয়।

প্রশ্ন - মহারাজজী! যদি জাতি কেবল দুটি তবে কে অসুর আখ্যা পেতে চাইবে?

উত্তর- অসুর আখ্যা পেতে চাওয়া উচিৎ নয় কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি পছন্দ করে। অসুরের অর্থ এই নয় যে, দুটো শিং, বড়-বড়-দন্তযুক্ত, রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত কোন জাতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ছিলেন, তাঁর আত্মীয় পাণ্ডবেরা মানুষ ছিলেন। এবং মামা কংস, আত্মীয় বাণাসুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল সকলে অসুর ছিলেন। উত্তম আচরণের ফলস্বরূপ মানুষই দেবতাতে রূপান্তরিত হয় এবং মন্দ কাজ করে সেই ব্যক্তিই অসুরে পরিণত হয়। যে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্বে বিশ্বাস করে না সেই অসুর। বহু ব্যক্তি আজও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যে নামেই তাদের ডাকুন, তারা কিন্তু অসুর। বর্তমানে প্রচলিত এই জাতিপ্রথা স্বাভাবিকও নয় আবার এর উপযোগিতাও নেই। যা স্বাভাবিক, অনিবার্য; তা কেন অস্বীকার করছেন। স্বীকার না করলেও তা কিন্তু আপনার অন্তঃকরণে প্রবাহিত থাকবে।

।। ওঁ।।

বিপ্র

প্রশ্ন- মহারাজজী, ব্রাহ্মণ উপাধি কি জন্মগত অথবা কর্ম-সাধনা করলে তবে লাভ হয়? বিপ্রের বাস্তবিক স্বরূপ কোন্‌টা?

উত্তর- দেখুন, শুধু বিপ্রই নয় শূদ্রও গর্ভজ হলেই হওয়া যায় না, এটা যোগসাধ্য। এসবই ভজনার বিভিন্ন স্থিতিবিশেষ। বর্ণের উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।। *(গীতা, ১৮/৪১)*

হে পরন্তপ! **'স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ'**-স্বভাবজাত গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম বিভাজিত করা হয়েছে। বিভাজিত বিষয় হচ্ছে কর্ম, মানুষকে আর একটা মানুষ থেকে পৃথক্ করা হয়নি। স্বভাব পরিবর্তনশীল, সদৈব পরিবর্তিত হয়। স্বভাবে পরিবর্তন ঘটলে গুণে পরিবর্তন ঘটে। অতএব গুণ পরিবর্তন হলে বর্ণ পরিবর্তন স্বতই হয়। কর্মের চরমোৎকর্ষে, ইচ্ছার সঙ্গে মন-জয় করে নিলে গুণের সঙ্গে স্বভাবও শান্ত এবং বিলীন হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই পরমকল্যাণ, পরমতত্ত্বের প্রাপ্তি হয়, যাকে পরম নৈষ্কর্ম্য স্থিতি বলে। গোস্বামীজী গীতারই অনুবাদ বিনয় পত্রিকাতে করেছেন- **গুণ সুভাব ত্যাগে বিনু, দুরলভ পরমানন্দ।।** *(পদ সং. ২০৩)।*

গুণ স্বভাব শান্ত হলে তবেই সেই পরমানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। গুণ শান্ত না হলেই গমনাগমন করতে হয়। স্বভাব যতক্ষণ শান্ত না হয়, ততক্ষণ প্রকৃতি কাজ করে। গুণ এবং স্বভাবের বিলয় ঘটলে পরমতত্ত্বকে সহজেই লাভ করা যায়। সাধনার পূর্তিকালে গুণ এবং স্বভাব শান্ত হয়ে যায়, সেইজন্য সাধক তখন কোন বর্ণের অন্তর্গত পড়েন না। গুণ না থাকলে বিভাজন কার হবে? সেই সাধক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কোন বর্ণেরই অন্তর্গত পড়েন না। কৈবল্য স্বরূপ আত্মারই অস্তিত্ব থাকে। এই প্রকার চারটি বর্ণ সাধনার চারটি উঁচু-নীচু সোপান। যে কোন সাধক স্বভাব এবং গুণে পরিবর্তন ঘটিয়ে উচ্চ বর্ণগুলিতে প্রবেশ করতে পারেন এবং সাধনা সম্পূর্ণ করে বর্ণগুলির অতীতও হতে পারেন। বর্ণের নির্ধারণ জন্ম থেকে নয় পরন্তু স্বভাবে কর্মরত গুণ থেকে হয়।

এখন বিপ্রের ব্যুৎপত্তি ও পরাকাষ্ঠার উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ শিষ্যদের সঙ্গে

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।। *(গীতা, ১৮/৪২)*

তপস্যা (শাশ্বত ধর্মের অনুগামী হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে রাখাকেই তপস্যা বলে। তপস্যার অনুরূপ গড়ে তোলা, সেই পরীক্ষাতে মনকে পরখ করাই হল তপস্যা।), ইন্দ্রিয় সমূহের দমন, মনের শান্তি, শুদ্ধতা, **'আর্জবম্'** সরলতা, বাস্তবিক ক্রিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপলব্ধি, আস্তিকভাব-এই সমস্তই **'ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্'**-ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্ম, যা স্বভাবজাত। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্মের প্রবেশিকা এটা, নিম্নতম সীমা। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পরাকাষ্ঠাতে, প্রাপ্তিকালে কোন কর্ম বাকী থাকে না কারণ গুণ ও স্বভাবের বিলুপ্তি ঘটে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্ম করতে-করতে গুণ স্বভাবের অতীত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সাধক বর্ণেরও অতীত হন। শাশ্বত শান্তি লাভ করেন।

যে কোন ব্যক্তি কর্মের যথার্থ স্বরূপ বুঝে এই ব্রাহ্মণ তত্ত্বকে লাভ করতে পারে, ব্রহ্মে বিলীন হতে পারে। সকলের জন্য বিধান সমান রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। *(গীতা, ২/৪৫)*

অর্জুন! বেদ ত্রিগুণ পর্যন্তই প্রকাশ করে। তুমি এই তিনগুণ অতিক্রম করে উপরে ওঠ, অর্থাৎ বেদের কার্যক্ষেত্র পার কর। গুণের ঊর্ধ্বে উঠলেই বেদের ঊর্ধ্বে স্থিত হবে। কিরূপে ঊর্ধ্বে স্থিত হবে? নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য, সত্ত্ব বস্তুতে স্থিত থেকে যোগক্ষেম কামনা না করে, আত্মপরায়ণ হও। প্রশ্ন উঠছে যে, কেবল আমিই উঠবো অথবা আরও কেউ বেদের ঊর্ধ্বে উঠেছেন? বেদ অথবা ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে উঠলে আমি কি যোগ্যতা লাভ করব? আমার স্থিতি কিরূপ হবে?

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। *(গীতা, ২/৪৬)*

পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে মানুষের ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন হয়, যে ব্রাহ্মণ উত্তম প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরও বেদের ততটুকুই প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়ে বেশী হলে ছেলেরা শৌচ ইত্যাদি করে, এর বেশী কোন উপযোগিতা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও বেদের ততটুকুই প্রয়োজন হয়। মহাপুরুষের জন্য

বেদ নগণ্য কিন্তু অন্যের জন্য তো বেদের সর্বদিক থেকে মহত্ত্ব রয়েছে। বেদ ব্রহ্মকে জানতে সাহায্য করে এবং যিনি ব্রহ্মকেই জানতে পেরেছেন তাঁর জন্য বেদের কি মহত্ত্ব থাকতে পারে? কিন্তু তা ক্ষুদ্র জলাশয়রূপে থাকে, কারণ এই বেদকেই কল্যাণোত্থানের জন্য নিরূপিত করে। অতএব অর্জুন! তুমি ত্রিগুণ এবং বেদের ঊর্ধ্বে ওঠ। ব্রহ্মকে জানার জন্য তৎপর হও, ব্রাহ্মণ হও। আজ অর্জুন ক্ষত্রিয়। তাৎপর্য এই যে, ব্রাহ্মণ একপ্রকার স্থিতিবিশেষের নাম। যে কোন সাধক ক্রমশঃ চলে সেই বিপ্রত্বে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই স্থিতিও অতিক্রম করে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মে পূর্ণস্থিতিই প্রাপ্ত করে, যা বিপ্রত্বের উচ্চতম সীমা। নিজের জন্য তিনি বিপ্রও নন আবার শূদ্রও নন; কিন্তু অন্যের জন্য তিনি বিপ্র স্বরূপ। অতএব কোন জাতি বিশেষের জন্যই (যেরূপ বর্তমানে সমাজে প্রচলিত রয়েছে) বিপ্রত্বের-বিধান রয়েছে, এমন কথা নয়। যদি গীতা সত্য, তবে গীতার এই ব্যবস্থাই সত্য। এই শাস্ত্রগুলির মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের ধর্ম কি? কর্ম কি? ক্রিয়া কি?

সেই বিপ্রের লক্ষণ কিরূপ? তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি রূপ? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। *(গীতা, ৫।১৮)*

বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে, গরু, কুকুর এবং হাতীতে '**পণ্ডিতাঃ**' পূর্ণ জ্ঞানীগণ '**সমদর্শিনঃ**' সমদৃষ্টিযুক্ত হন। তাঁদের দৃষ্টিতে গাভী ধর্ম নয় এবং কুকুর অধর্ম নয়। বিদ্যা-বিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট নন আবার চণ্ডাল হীন নয়। কেন? কারণ সকলের অন্তরে যে শাশ্বত আত্মা সঞ্চারিত, সেই মহাপুরুষ সেই পরমাত্মারই স্থিতিযুক্ত, সকলের মূলে স্থিত হন। এইরূপ মহাপুরুষের দৃষ্টি যখনই কারও উপর পড়ে, তার আত্মার উপরই পড়ে, চর্মে পড়ে না। সেই জীবাত্মা উত্থান অথবা পতন যে স্থিতিতেই থাকে, সেই মহাপুরুষ সেই স্তর থেকেই তার মার্গদর্শন করেন, এই লক্ষণ ব্রহ্মস্থিত, প্রত্যক্ষদর্শী মহাপুরুষের, যা বিপ্রত্বের চরম সীমা।

একটা অন্য শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, ব্রাহ্মণ কখন হওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ কিরূপ হন?

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।। *(গীতা, ৪।১৯)*

যিনি সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া আরম্ভ করেছেন, যাতে লেশমাত্রও ত্রুটি থাকে না। ক্রমশঃ উত্থান হতে-হতে যখন এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, **'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ'** -যেখানে কামনা এবং সঙ্কল্প থাকে না (কামনা ও সঙ্কল্প নিরুদ্ধ হওয়াই মনের জয়ী অবস্থা কারণ সঙ্কল্প-বিকল্পের উত্থান-পতন তো মনের অন্তরালে ঘটে থাকে।) মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই **'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্'** -যাঁকে জানি না, সেই শাশ্বত, যাঁর নাম পরমাত্মা, বিদিত হন। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানা জ্ঞান। সেই জ্ঞানাগ্নিতে **'দগ্ধকর্মাণম্'** -কর্ম সর্বদার জন্য ভস্মীভূত হয়। কর্ম অর্থাৎ আরাধনাও সমাপ্ত হয়। এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, তবে কার খোঁজ করা হবে? সেইজন্য কর্ম সর্বদার জন্য শেষ হয়। **'তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ'** -বোধস্বরূপ মহর্ষিগণ এইরূপ স্থিতিযুক্ত পুরুষগণকেই পণ্ডিত বলে সম্বোধিত করেছেন। তাঁদের ক্রিয়াতে লেশমাত্রও ত্রুটি নেই অতএব এটা ব্রাহ্মণত্বের অধিকতম সীমা এবং পরাকাষ্ঠা। তিনি ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, ব্রহ্ম পর অর্থাৎ অতীত, সেই পরব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, সেইজন্য বিপ্র। দ্বি অর্থাৎ দ্বৈত বোধ জয় করেছেন, সেইজন্য দ্বিজ।

অতএব ব্রাহ্মণ, বিপ্র, দ্বিজ সাধনারই একটা স্তর বিশেষ, জন্মজাত কেউই ব্রাহ্মণ নয়। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র **'স্বভাবজম্'** -স্বভাব এবং **'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'**-স্বভাবজাত গুণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কালান্তরে অপভ্রংশ হওয়ার ফলে মানুষ অন্তঃকরণের বস্তু বহির্জগতে দেখতে শুরু করেছে সেইজন্য বহু জাতি, উপজাতি এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত মত-মতান্তর শুধু উদর-পোষণের লিপ্সা এবং মান-সম্মানের মনোভাবের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। যার নত না হয়ে উপায় ছিল না সে নত হয়েছিল এবং যার নত করার ক্ষমতা ছিল, সে নত করেছিল। অন্যথা যোগদর্শন, গীতা, রামচরিতমানস অথবা এই স্তরেরই প্রত্যেক মহাপুরুষের বাণীতে অন্যকিছু দেখি না। ভগবান মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, গুরুনানক এবং তুলসী ইত্যাদি সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারটি শব্দই প্রয়োগ করেছেন, চারটিকেই স্বীকার করেছেন কিন্তু সকলের দৃষ্টি একসমান যে, আরাধনারই ক্রমকে চারটি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে, যাতে ব্রাহ্মণ একটা পবিত্র স্থান। ব্রাহ্মণত্বের নিম্নতম সীমাতে ব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করার সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার পর সাধক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র কোন শ্রেণীর অন্তর্গতই পড়েন না। এটাই ব্রাহ্মণত্বের পরাকাষ্ঠা। হ্যাঁ, অন্যের জন্য তিনি ব্রহ্মের পরিচায়ক, উপদেশক এবং প্রেরক অবশ্যই। তাঁর

মধ্যে ব্রহ্মে বিলয় করানোর ক্ষমতা থাকে, সেইজন্য এইরূপ মহাপুরুষদের বিপ্রই বলা হয়। নহুষকে কোন্-কোন্ বিপ্র অভিশাপ দিয়েছিলেন? যে-যে তপোধন তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন, তাঁরা জন্মজাত কুলীন কোথায় ছিলেন? অতএব যে কোন ব্যক্তি কর্ম করে বিপ্র হতে পারে, আপনিও চেষ্টা করুন। সেই বাস্তবিক ক্রিয়ার জ্ঞান লাভ করার জন্য তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হোন কারণ তাঁরাই বস্তুতঃ বিপ্রত্বের জ্ঞাতা হন। ধর্মশাস্ত্রগুলির এটাই নির্ণয়।

গীতার অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয় এটা একটা স্থিতি বিশেষ-

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।। *(গীতা, ১৭/২৩)*

ওঁ, তৎ এবং সৎ পরব্রহ্ম পরামাত্মার নাম, যা ব্রহ্মেরই শ্রীমুখ থেকে প্রসারিত হয়েছে। এই ওঁ, তৎ এবং সৎ-এর দ্বারা যজ্ঞ, বেদ এবং ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব ব্রাহ্মণ একটি সৃষ্টিমাত্র।

যজ্ঞ হল এক নির্জীব ক্রিয়া। যার অন্তর্গত কেবল পরমাত্মাতে নিষ্ঠা, সদ্গুরুর ধ্যান, সেবা, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, মনের নিরোধ, শ্বাস-প্রশ্বাসের যজন দ্বারা যখনই প্রাণায়ামের স্থিতি চলে আসে, তখন সনাতন ব্রহ্মের-দর্শন এবং প্রবেশ লাভ হয়, এটা যজ্ঞের পূর্তিকাল। যখনই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তখনই বেদ রচিত হয়। অবিদিত তত্ত্ব বিদিত হয় অতএব বেদও রচনা। যিনি সেই প্রভুকে জেনেছেন, ব্রহ্মের দর্শন করেছেন স্পর্শ ও স্থিতি লাভ করেছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। অতএব ব্রাহ্মণ একটি রচনা, জগতের মানুষের কোন প্রজাতি নয়।

।। ওঁ।।

১। গুরুনানক - ''যোগ শব্দ গিয়ান শব্দ তে ব্রাহ্মন'' জ্ঞান এবং যোগ শব্দে যে পার্থক্য রয়েছে তা যিনি যথার্থতঃ জানেন, তিনি বিপ্র।

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম ব্রাহ্মণে জনকের যজ্ঞ সভাতে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-গার্গী! সেই পরমতত্ত্বকে ব্রহ্মবেত্তাগণ অক্ষর বলেন। যিনি সেই অক্ষরকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

বাস্তবে যে ব্যক্তিই ব্রাহ্মণত্বের গুণ-ধর্ম দ্বারা যুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনিই সৃষ্টিতে সর্বোপরি, একমাত্র পূজণীয়, এ বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে না। অতএব মহাপুরুষদের জাতি, বেশ ইত্যাদি বাহ্য গুণ-ধর্মের উপর দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

ভিক্ষা

প্রশ্ন- মহারাজজী! গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন গুরুজনদের বধ না করে এই লোকে ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন ভোগ করাও হিতকর বলে মনে করছে। কৃপা করে বলুন যে, সেই ভিক্ষান্ন কিরূপ?

উত্তর- ভিক্ষার রূপ দুটি। একরূপ হল হরিভক্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন পরিবর্তে তিনি ভজন-চিন্তনের কিছু অংশ সেই দাতা ভক্তের জন্য ব্যয় করেন, তাকে শুভ আশীর্বাদ দেন। এটা পরিব্রাজকের জন্য গৃহত্যাগের অনন্তর বিধেয়, যিনি ভজনাতে অনুক্ষণ প্রবৃত্ত থাকেন। বিশ্বের অধিকাংশ ব্যক্তি ভিক্ষার এইরূপ সম্বন্ধে অবগত। গৌতম বুদ্ধ ইত্যাদি ভারতীয় মনীষীগণ শ্রমণদের জন্য বিভিন্ন উপায়ে ভিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন এবং দাতার জন্য মঙ্গল-কামনা পোষণ করেছেন। এর ফলে সাধকের মধ্যে সর্বদা দীনভাব বজায় থাকে। এরই সঙ্গে পরিব্রাজকদের লৌকিক ব্যবস্থার দায়িত্ব শুভ সংস্কারের সৃজন দ্বারা সমাজ অনুভব করে। সেইজন্য যীশুখৃষ্টও নিজের শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "শুধু একটা কুর্তা গায়ে দিয়ে, হাতে পাত্র নিয়ে তোমরা বিচরণ করবে যাও। যারা তোমাদের সেবা করবে, তোমাদের জন্য ভিক্ষার ব্যবস্থা করবে, তাদের কল্যাণ প্রভু করবেন। যারা তোমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত করে, তাঁরা পরোক্ষভাবে আমাকে সম্মান করে।"

ভিক্ষার আরেকটা রূপ সূক্ষ্ম এবং গভীর। গৃহত্যাগ করতে যারা ইতস্তত করেন, সেই শ্রদ্ধালুগণ সনাতন তত্ত্বে স্থিত মহাপুরুষ পরম প্রভু পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার পরিবর্তে তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ কামনা করেন। এটাও ভিক্ষান্নই। "**অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ**" ***(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।২)*** ব্রহ্মই সেই অন্ন, যা আত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্থিত মহাত্মাদের সর্বাঙ্গীণ পূজা দ্বারা পরমতত্ত্বের কামনা করাই ভিক্ষা। যাদের মধ্যে ধ্যান ও ধারণা করার ক্ষমতা নেই, আসক্তির সমস্ত সূতো একত্র করে যে ইষ্টের পাদপদ্মে মনকে নিবিষ্ট করতে সমক্ষ নয়, এইরূপ ব্যক্তিদের জন্য শ্রদ্ধা, সেবা এবং ভক্তিভরে স্বরূপস্থ প্রভুর কাছ থেকে ব্রহ্মান্নের যাচনা করে যাওয়াই কল্যাণের দীর্ঘ কিন্তু সফল সাধন। এটা সদ্‌গৃহস্থ আশ্রমে থেকেই আরাধ্য উপলব্ধির ভিক্ষাজনিত বিধি কিন্তু সংঘর্ষরত সাধকদের জন্য ভিক্ষার প্রয়োজন নেই।

অর্জুন জন্ম-জন্মান্তরের অধিকারী সাধক ছিল। পারিবারিক আসক্তির

ফলস্বরূপ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থেকে সে পরমকল্যাণের কামনা করেছিল, অজুহাত দেখিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে ভিক্ষান্ন স্বীকার করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সদ্গুরুর পীযূষ-বর্ষিণী-প্রবচন-ধারায় অর্জুনের কাপুরুষভাব দূর হয়েছিল এবং সে সেই পরমপবিত্র পথে প্রবৃত্ত হয়েছিল। শুরুতে অর্জুন সাধন-পথে অগ্রসর না হয়েই, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করে পরম কল্যাণের অধিকারী হওয়ার আশা করেছিল এবং তা সম্ভব নয় বুঝে কৃষ্ণস্বরূপ মহাপুরুষের দয়া কৃপার ফলস্বরূপ যতটুকু ভিক্ষান্নই লাভ হোক, তা দিয়েই সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিল কিন্তু সদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাকে উৎসাহিত করে প্রকৃতি-পুরুষের যুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন, সাধনার পরীক্ষায় পরখ করে, ঘষে মেজে পরম কল্যাণের অধিকারী করে তুলেছিলেন।

।। ওঁ।।

শত্রু

কুটিল কর্ম হী শত্রু হ্যায়, আতম হনে দুকাম।
মহামিত্র ইক রাম হ্যায়, 'অড়গড়' করনী থাম।।

অর্থ-কুটিল কর্মই শত্রু। দূষিত কুকৃত্যই আত্মহত্যা। মহানতম সহায়ক একমাত্র রাম। যদি রামকে লাভ করতে চান তবে সকল কর্মকে ত্যাগ করে মনকে নিরুদ্ধ করুন।

ভগবান কর্তা অথবা অকর্তা?

প্রশ্ন- ভগবন্! গীতার অনুসারে 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্' মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র, তবে কেন তাদের উপর দোষারোপ করা হয়? মোটর গাড়ি দুর্ঘটনা গ্রস্ত হলেও কেউ গাড়ির উপর দোষারোপ করে না। সেটা তো চালকের ভুলের জন্য ঘটে থাকে। অতএব ভগবান দ্বারা সঞ্চালিত জীবকে কেন দোষী করা হয়? গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা বিনা নড়ে না, তবে মানুষকে পাপ কার্যের জন্য দোষ দেওয়া কতটা ন্যায়সঙ্গত?

উত্তর- দেখুন, বাস্তবে ভগবান এইপ্রকার করেন না। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে অর্জুন! প্রভু স্বয়ং কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে করানও না এবং ক্রিয়ার সংযোগও সৃষ্টি করে দেন না। মনে করুন তিনি করেন না, করান না কিন্তু জোগাড় তো করতে পারেন। কিন্তু না; তিনি ক্রিয়ার সংযোগও সৃষ্টি করেন না। তা সত্ত্বেও অর্জুন! যারা বলে যে, পরমাত্মা করেন, তাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, সেইজন্য তারা কিছু না কিছু বলেই থাকে। বাস্তবে ভগবান করেন না।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়েই স্পষ্ট করে বলেছেন যে শুভ অথবা অশুভ প্রত্যেক কার্য সম্পাদনের পাঁচটি কারণ নিরূপিত হয়েছে-কর্তা, পৃথক্-পৃথক্ করণ, বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা, আধার এবং পঞ্চম হেতু দৈব। মনই কর্তা, যাদের সাহায্যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে করণ বলা হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, নির্জনে বাস, নিরন্তর চিন্তনের প্রবৃত্তিগুলি, শুভকর্ম সম্পাদনের করণ। এদের দ্বারা আমরা সেদিকে প্রবৃত্ত হই। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ, মৎসর, অনন্ত চেষ্টা ইত্যাদিগুলি অশুভ কর্ম সম্পাদনের করণ।

ইচ্ছাগুলি অনন্ত, চেষ্টাগুলিও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু সব পূর্তি হয় না। যে ইচ্ছার সঙ্গে আধার অর্থাৎ সাধন জোটে, পরিবেশ অনুকূল পাওয়া যায়, সেটাই আধার এবং পঞ্চম হেতু দৈব। দৈব নিয়তি অথবা প্রারব্ধকে বলে। শুভ অথবা অশুভ কর্ম সম্পাদনের পিছনে কারণ এই পাঁচটিই, তা সত্ত্বেও যে বলে যে কৈবল্যস্বরূপ পরমাত্মা কর্তা, প্রেরক, অর্জুন! সে অবিবেকী। সে যথার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ ভগবান করেন না।

কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধে, সেই আঠারো অক্ষৌহিনী জনসমূহে, মহাভারতের গণনা অনুসারে যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ, বর্তমান গণনা অনুসারে ছয় আরব, শুধু অর্জুনই

ভগবানের নিকটবর্তী ছিলেন যার জন্য ভগবান স্বয়ং তালঠুকে লেগে যেতেন-**'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'** *(গীতা, ১১।৩৩)* অর্জুন! তুমি নিমিত্তমাত্র হও। কর্তা-বিধাতা তো আমি। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি যে, তুমি জয়ী হবে। তোমার জন্য এরা আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ইত্যাদি সকলেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। এই মৃতদের বধ কর এবং যশ লাভ কর।

দেখুন! এক স্থানে বলেছেন যে, কৈবল্য স্বরূপ পরমাত্মাকে যারা কর্তা বলে, তারা মূঢ়, অবিবেকী, তাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছাদিত, তারা যথার্থ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ ভগবান করেন না এবং এখানে ভগবান স্বয়ং বলছেন যে, অর্জুন! তুমি নিমিত্তমাত্র হও। কর্তা-বিধাতা তো আমি! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি বিজয়ী হবে। আমার শরণাগত হও। আমাকে আশ্রয় কর।

তবে সেই মহাপুরুষ কি বলতে চাইছেন? বাস্তবে ভগবান এবং মায়ার মাঝে একটি আকর্ষণ, রেখা রয়েছে। একটি নির্ধারিত অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত মায়া প্রেরণা প্রদান করে সেই অবস্থা অতিক্রম করার পরে ঈশ্বর প্রেরকের স্থান গ্রহণ করেন। সাধক সাধনা পথে চলে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে ঈশ্বর প্রেরক হন। যতক্ষণ সাধক মায়ার ক্ষেত্রে অবস্থিত, ততক্ষণ তার প্রত্যেক কার্য সম্পাদিত হওয়ার পিছনে পৃথক্-পৃথক্ করণই মাধ্যম। কিন্তু যখন সাধক মায়ার পরিধি অতিক্রম করে ঈশ্বরীয় আকর্ষণ-ক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এইরূপ পথিককে পরিচালিত করার দায়িত্ব ইষ্টদেব নিজ হাতে তুলে নেন। এইরূপ পথিকের জন্য তিনি স্বয়ং প্রস্তুত থাকেন এমনকি **'জাহাঁ ভগত মেরো পগ ধরৈ, তহাঁ ধরুঁ ম্যায় হাথ। পাছে লাগা সদা রহুঁ, কবহুঁ না ছাড়ুঁ সাথ।।'** এই স্থিতিতে পৌঁছানোর পর যদি কোন পথিক পতিত হতেও চায়, তবু সে পতিত হতে পারে না। ভগবান তাকে পতিত হতে দেবেনই না। তিনি রক্ষা করবেন, যেরূপ নারদকে করেছিলেন। অর্থাৎ সেই সীমা অতিক্রম করার পর ভগবানই করেন।

অতএব প্রত্যেক পুরুষের উচিৎ, সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতরূপে সেই আরাধ্যদেব-এর রূপ চিন্তা করা। সে গৃহস্থ আশ্রমে থাকুক অথবা অন্যস্থানে যেখানেই থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। দু-আড়াই অক্ষরের যে কোন একটা নাম, যেটা পছন্দ নির্বাচন করে নিন। ভগবান কৃষ্ণ তো ওঁ জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন-**'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।'** *(গীতা, ৮।১৩)* অর্জুন! 'ওম' অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক। তুমি ওঁ জপ কর এবং আমার রূপ ধ্যান কর। আমাকে

ছাড়া অন্য কোন বস্তুর চিন্তা না করে অনুক্ষণ আমাকে স্মরণ কর। ধ্যান আমার এবং নাম ওঁ-এর জপ। কারণ প্রাপ্তির পর প্রত্যেক মহাপুরুষের নাম সেই হয়, যাঁকে তিনি লাভ করেছেন। অতএব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর, সদ্গুরু ছিলেন।

প্রশ্ন-মহারাজজী! কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলা যদি অপরাধ, তবে যারা কৃষ্ণ নাম জপ করেন, তারা কি ভ্রান্ত?

উত্তর- দেখ, "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপ কর" এইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। এটুকুই নয়, অর্জুনের মনে হয়েছিল যে, কৃষ্ণ বলা অপরাধ।

শুরুতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলে মনে করত। ধনুর্ধরদের মধ্যে নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। নিজের থেকে তাঁকে কিছুটা বুদ্ধিমান্ অবশ্য মনে করত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ দর্শন করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। কাতরস্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্য ক্ষমা যাচনা করেছিলেন। বলতে শুরু করেছিল-ভগবন্! আপনাকে মহর্ষিগণও জানেন না এবং দেবতাগণও জানতে সমর্থ নন কারণ সকলের আদি কারণ আপনি। শুধু আপনিই নিজেকে জানেন। আমি কখনও আপনাকে হে সখা! হে যাদব! হে কৃষ্ণ! বলে সম্বোধিত করেছি। এই ত্রুটিগুলির জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। পিতা যেমন প্রিয় পুত্রের ভুলগুলি ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার ভুলগুলিকে হাসিমুখে সহ্য করে, সেইপ্রকার আমার সেই ত্রুটিগুলিকেও ক্ষমা করুন। যখন অর্জুন ঐশ্বর্য বিভুক্তিযুক্ত সেই পরমস্বরূপ দর্শন করেছিল, তখন তার বোধ হয়েছিল যে, কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, সখা অথবা যাদব কিছুই নন। ইনি তো অনন্ত, অব্যক্ত, শাশ্বত, সনাতন, পরাৎপর ব্রহ্ম। এই প্রকার অর্জুন কৃষ্ণ বলে যে ভুল করেছিল, সেই ভুলের জন্য ক্ষমা যাচনা করেছিল। এই অনুভূতি তো অর্জুনের ছিল যে, কৃষ্ণ বলতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কারণ তিনি বর্ণ-রূপ-এর অতীত। পরবর্তীকালে ভাবুক ভক্তগণ তাঁর নামও জপ করতে শুরু করে দিয়েছেন এবং নিজের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অনুসারে তার ফল লাভও করেন। ঈশ্বরের যে কোন নাম শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসপূর্বক জপ করলে নিশ্চয় কল্যাণ হয়।

অতএব শ্রদ্ধানুসারে রাম, শিব, কৃষ্ণ ওঁ-এর মধ্যে যে কোন একটা দু'-আড়াই অক্ষরের নাম নির্বাচন করুন। নাম জপ করার সঙ্গে-সঙ্গে সেই নামের অর্থস্বরূপ ইষ্টের রূপ ধ্যান করুন। যদি সদ্গুরুর প্রাপ্তি ঘটে থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। তিনি নামের যা বাস্তবিক প্রবেশ, তার জাগৃতি এবং সঞ্চার করে দেবেন, যা যথার্থ।

না হলে '**যথাভিমতধ্যানাদ্বা**' *(পাতঞ্জল যোগদর্শন, ১।৩৯)* যা আপনার অভীষ্ট মতে সহায়ক হবে, এইরূপ কারও রূপ হৃদয়ে ধারণ করুন। এর ফলে আপনার পুণ্য পুরুষার্থে বৃদ্ধি হবে এবং আপনি ধীরে-ধীরে প্রকৃতির ক্ষেত্র অতিক্রম করবেন, তখন সেই প্রভুই সঞ্চালক হয়ে যাবেন।

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! আমি অব্যক্ত। সকলের ভিতর সমানভাবে ব্যাপ্ত। কেউ আমার প্রিয় নয় এবং কেউ অপ্রিয়ও নয়, কিন্তু যে আমার অনন্যভক্ত সে আমার ভিতর রয়েছে এবং আমি তার অন্তরে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি ভক্তদের জন্যই রথী হন। '**উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন**'। *(মানস, ৭।১১২।১)* অবশ্য আছেন; কিন্তু '**সো কেবল ভগতন হিত লাগী।**' *(মানস, ১।১২।৫)* ভক্তের জন্য ভগবান সদা-সর্বদা তৎপর থাকেন।

।। ওঁ ।।

দেবতা

সভী জগত কে দেবতা, জোর লগাবৈ জায়।
জব লগি সতগুরু সীখ না, মূরখ গোতা খায়।।
প্রথম সিড়ি কে দেবতা, অবসি লগাবে পার।
আগে সিড়ি অনন্ত কী, গুরু মহিমা আধার।।
দেবন পূজা এক তক, অরথ পায় বস বোল।
মন চাহো পরতত্ত্ব কো, সতগুরু সঙ্গত ডোল।।

—স্বামী অড়গড়ানন্দ

যোগ-বিধিই যজ্ঞ, জগৎ আহুতির সামগ্রী

প্রশ্ন- মহারাজজী! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে যোগ সমস্ত পাপ থেকে নিবৃত্তি প্রদান করে (গীতা, ৩।১৩) যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন যজ্ঞকর্তা পুরুষ সনাতন ব্রহ্মকে দর্শন করে এবং সেই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় (গীতা, ৪।৩১) সংসারে যজ্ঞ তো হতেই থাকে কিন্তু সনাতন ব্রহ্মের মত সর্বোৎকৃষ্ট পরিণাম দেখা যায় না। অতএব কৃপা করে যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট করে বলুন?

উত্তর- মহারাজজী বললেন-"হো! ভগবান স্বয়ং যজ্ঞের স্বরূপ বুঝিয়েছেন। গীতার অনুসারে-যোগ-বিধি যজ্ঞ, '**দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্।**' *(গীতা, ৪।২৫)* যাতে বহু যোগী নিজের হৃদয়ে দৈবী সম্পত্তি অর্জন করেন। অন্য বহু যোগী ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবাহকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। সাধনা আরও উন্নত হলে-

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। *(গীতা, ৪।২৭)*

ইন্দ্রিয়সমূহের সকল চেষ্টা এবং প্রাণের ব্যাপারকে জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত আত্মাতে, সংযম রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। আত্মার মিলনের নাম যোগ। সাধনা আরও উন্নত হলে তখন সেই যোগীই নিঃশ্বাসকে প্রশ্বাসে এবং প্রশ্বাসকে নিঃশ্বাসে আহুতি দেন অর্থাৎ তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ জপ করে যান। সাধন এর থেকেও উন্নত হলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। অন্তরে কোন সঙ্কল্প জাগে না এবং বহির্জগতের সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশও করতে পারে না। চেষ্টার বিরাম-প্রাণায়াম, মনের নিরুদ্ধ অবস্থা। মন নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যজ্ঞের পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়। যোগী সনাতন ব্রহ্মের দর্শন করে তাতে বিলীন হয়ে যান।

যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।। *(গীতা, ৪।৩১)*

প্রশ্ন হচ্ছে যে, যজ্ঞ করার অধিকারী কে? শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেই বলছেন যে, যজ্ঞরহিত পুরুষ পুনরায় এই মানবদেহ লাভ করে না, তবে অন্যলোকে কি সুখ পাওয়া যাবে? অতএব মানুষ মাত্রেরই যজ্ঞ করার অধিকার রয়েছে। তার জন্ম যেখানেই হয়ে থাক-উত্তর ধ্রুব, আরব দেশ, অষ্ট্রেলিয়া অথবা ভারত-তাতে কিছু যায় আসে না।

এইপ্রকার যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের তেরো-চোদ্দোটি বিন্দুর উপর

আলোকপাত করলেন, যেমন-শুরুতে কোন যজ্ঞস্বরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের প্রতি সমর্পণ, তাঁর রূপ হৃদয়ে ধারণ, সেই মহাপুরুষের নির্দেশমতই সাধনা পথে এগিয়ে যাওয়া, পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে সাহায্য করে যে দৈবী সম্পদ্, তা অর্জন করা।

দেবত্ব অর্জন করার জন্য সংযম আবশ্যক। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে **'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি'** *(গীতা, ৪।২৬)*-সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। আপনি নির্জনে বসে আছেন, কিন্তু কোন শব্দ ইত্যাদি শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র তার আশয় পরিবর্তন করে যোগ সহায়ক রূপে গ্রহণ করা এবং যখন ঈশ্বরীয় অনুভূতির সঞ্চার হবে তখন যোগাগ্নিতে আহুতি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ, প্রাণের ব্যাপারে নিরোধ, নিরোধের সঙ্গেই যজ্ঞের পরিণাম সনাতন শাশ্বত ব্রহ্ম-দর্শন, স্পর্শ এবং স্থিতি এসমস্তই যজ্ঞ।

এই যজ্ঞে কোথাও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে না এবং না তো তিল, যবের আহুতি অথবা কোন বাহ্য সামগ্রীর আবশ্যকতাই হয়। শুধু নিজের মন সংযম করার প্রয়োজন হয়। কারণ সংসার মনের অন্তরালেই বিদ্যমান এবং যখন নিরুদ্ধ মনেরও বিলয় হয়, সংসার বিলীন হয়ে যায়-**'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।'** *(গীতা, ৫।১৯)* সেই পুরুষগণ জীবিত অবস্থায় (মৃত্যুর পরে নয়) সম্পূর্ণ সংসার জয় করেন, যাঁর মন সমত্বে স্থিত হয়। সমত্বে স্থিতি এবং সংসার জয় উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? বস্তুতঃ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, এদিকে সাধকের মনও নির্দোষ এবং সমস্থিতি যুক্ত হয় সেইজন্য তিনি ব্রহ্মে স্থিত হন। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়। অতএব সেই শাশ্বত সনাতন ব্রহ্মের দর্শনের সঙ্গেই তাতে স্থিত হন।

সাত্ত্বিক পুরুষগণ আত্মসমর্পণ করে শ্রদ্ধাপূর্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজসিক পুরুষগণ কামনা ও দম্ভপূর্বক এই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু তামসিক পুরুষগণ যজ্ঞ নাম দিয়ে কিছু-কিছু কল্পিত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করে সেগুলিকে বলে তো যজ্ঞই কিন্তু সে সব যজ্ঞ নয়। আসুরিক প্রবৃত্তির পুরুষ বলে-আমি যজ্ঞ করব, দান করব, যশলাভ করব। সেই ব্যক্তি সদম্ভে শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু অর্জুন! সে স্বীয়দেহে ও অপর দেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে ও (পরমাত্মাকে) দ্বেষ করে, ভজনা করে না। সেই ক্রূরকর্মা, পাপাচারী, নরাধমগণকে আমি আসুর যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। (গীতা, ১৬।১৭)

মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে তো মানুষ রক্ষা পেলে পেতেও পারে কিন্তু এখানে তো ঈশ্বরের সঙ্গেই শত্রুতা করে ফেলল। এইপ্রকার আসুরি ব্যক্তিগণ কি রক্ষা পাবে? ভগবান বলছেন-না! তারা ক্রূরকর্মা, পাপাচারী। হতে পারে যজ্ঞ নাম দিয়েছে কিন্তু তারা পাপাচারী। তারা নরাধম অর্থাৎ মনুষ্যদের মধ্যে অধম। এইরূপ ব্যক্তিগণ ভগবানকে লাভ না করে উত্তরোত্তর অধম যোনিতে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। উত্তরোত্তর অধম যোনিগুলিতে পতনই নরক।

অএতব যজ্ঞ নাম দিয়ে যে কোন অনুষ্ঠান করে যাওয়া যজ্ঞ নয়। যজ্ঞ একটি নির্ধারিত বিধি। যা ভগবানের শ্রীমুখ হতে গীতাতে অভিব্যক্ত। কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের দ্বারাই সেই যজ্ঞের সূত্রপাত হয়, তার জ্ঞান হয়; সেইজন্য মহাপুরুষগণের সঙ্গতি করা উচিত। কোন উত্তম মহাপুরুষের শরণ, সান্নিধ্য, একটু-আধটু সেবা দ্বারা ভজন জাগ্রত হয় এবং যজ্ঞে প্রবেশ লাভ হয়।

।। ওঁ।।

একজন ভক্তের প্রশ্ন

প্রশ্ন*- একবার এক ভক্ত পূজ্য মহারাজজীকে এই প্রশ্নটি করেছিল, "মহারাজজী! এই রামায়ণে উল্লেখ আছে তেলী, কুমার, শ্বপচ, কোল, কিরাত, শৌণ্ডিক, এরা অধম। যার ফলে মনে হয় বর্ণ কোন ধর্ম নয়। এটা মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই পবিত্র রামায়ণে যেখানে 'মানউঁ এক ভগতি কর নাতা' সেখানে এই বর্ণাধম এবং বর্ণীয় চিত্রণের অভিপ্রায় কি?*

উত্তর- মহারাজজী বললেন যে, সৎপুরুষের সান্নিধ্য লাভ না হলে এইরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়েই থাকে কিন্তু বস্তুতঃ রামায়ণে এইরূপ ভ্রান্তির জন্য কোন স্থান নেই। আপনার জিজ্ঞাসা হল উত্তরকাণ্ডের কাগভুশুণ্ডি-গরুড় সম্বাদ প্রকরণের। যেখানে কাগভুশুণ্ডিজী নিজের থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বের একটা কল্পে দোষে পরিপূর্ণ যুগ কলিযুগের চিত্রণ করেছেন, যেখানে সমস্ত স্ত্রী, পুরুষ অধর্ম পরায়ণ এবং বেদের প্রতিকূল আচরণ করত। '**কলিমল গ্রসে ধর্ম সব, লুপ্ত ভএ সদ্গন্থ।**' ***(মানস, ৭/৯৭), '*বরন ধর্ম নহিঁ আশ্রম চারী।**' *(মানস, ৭/৯৭/১)* বর্ণ ধর্ম ছিল না এবং তা পালন করার মত মানসিক অবস্থাও ছিল না। '**বরনাশ্রম ধর্ম অচার গএ**' *(মানস, ৭/১০১/ছন্দ ৪)* -বর্ণ-ধর্ম-এর আচরণ তিরোহিত, সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সদ্গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছিল তবুও দাম্ভিক ব্যক্তিগণ নিজ বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করে ধর্মের নামে বহুপন্থা প্রচলিত করেছিল, যেমন-'**মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোঈ। তা কহুঁ সন্ত কহই সব কোঈ।।**' *(মানস, ৭/৯৭/৪)* কল্পিত ক্রিয়া-কর্ম শুরু করেছিল। কিছু ব্যক্তি বলতেও শুরু করেছিল যে-ভাল সাধু। '**পর ত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে।**' '**তেই অভেদবাদী জ্ঞানী নর। দেখা ম্যায় চরিত্র কলিজুগ কর।।**' *(মানস, ৭/৯৯/১-২)* আচরণহীন নিজেকে অভেদবাদী বলতে শুরু করেছিল, জ্ঞানী বলতে শুরু করেছিল। সেই দাম্ভিক ব্যক্তিগণই মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল এবং সেটাকে বর্ণ-ধর্ম-এর নাম দিয়েছিল। '**জে বরনাধম তেলী কুম্হারা।**' *(মানস, ৭/৯৯/৫)* -তেলী-কুমার অধম-একথা সেই দাম্ভিক-ব্যক্তিদের মনে উদিত হয়েছিল। রামচরিতমানসের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত নয় এটা। তাদের অধম বলা ধর্ম নয়। ধর্মকে তো গ্রাস করা হয়েছিল। তুলসীদাসজী এই অধম নাম অস্বীকার করেছেন সেইজন্য তো এটাকে দাম্ভিক ব্যক্তিদের ব্যবস্থা বলেছেন। সেই সময় নিরক্ষর, লোভী, কামুক, আচরণহীন, শঠ এবং বৃষলী স্ত্রী লোকদের স্বামীরাও বিপ্র সেজে বসেছিল। '**দ্বিজ**

চিহ্ন জনেউ উঘার তপী।' *(মানস, ৭।১০০। ছন্দ)* -তাদের পরিচয় ছিল যজ্ঞোপবীত। বিচার করুন, যদি এটাই বিপ্রের লক্ষণ, তবে এদের কাছ থেকে সেবা নিলে উভয় লোক কিরূপে নষ্ট হবে? এটা তো লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে ঘটিত কাকভুশুণ্ডিজীর মাত্র সংস্মরণ। তার এক হাজার জন্ম পরে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ হয়েছিলেন। সাতাশ কল্প পর্যন্ত নীলগিরি তাঁর নিবাস স্থান ছিল। তখন থেকে নিয়ে বর্তমানের এখন পর্যন্ত যে ব্যবধান রয়েছে সেটা চিন্তা না করে সেটাকে আজকের সমাজের চিত্রণ ভাবাটা ভ্রান্তি নয়ত আর কি?

রামরাজ্যে বর্ণধর্মের পুনরায় স্থাপনা হয়েছিল। **'বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ। চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখহি নহিঁ ভয় সোক না রোগ।।'** *(মানস, ৭।২০)* রামের রাজ্যে (পরমাত্মার পথে যখনই প্রবেশ লাভ হয়, তারপর) সাধক নিজের-নিজের বর্ণ অর্থাৎ নিয়ত কর্মকে করার ক্ষমতা অনুসারে 'নিরত' অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে **'চলহি বেদপথ লোগ'** বেদ অর্থাৎ অন্তঃকরণে যে ঈশ্বরের নির্দেশগুলি পাওয়া যায়, সেই আলোকে অহর্নিশ পথ চলতে থাকেন। যার পরিণামস্বরূপ ভয়, রোগ, শোক এবং বিয়োগের অতীত শাশ্বত সুখ লাভ করেন।

রামরাজ্যে **'রাম ভগ্তি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী।।'** *(মানস, ৭।২০।৪)* -চার বর্ণের ব্যক্তিগণই একমাত্র পরমাত্মা রামকেই ভক্তি করতেন। নারীদেরও পুরুষের সমান ভজনা করার অধিকার ছিল। সমস্ত বর্ণের নর-নারী পরমগতি মোক্ষ লাভের অধিকারী ছিল।

'অল্প মৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা।' -রামরাজ্যে চারবর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ব্যক্তিদেরই অল্পমৃত্যু হত না, কারণ এই সাধন পথে বীজের নাশ হয় না। **'সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা।।'** *(মানস, ৭।২০।৫)* -চারবর্ণের ব্যক্তিগণই সুন্দর এবং নিরোগী ছিল। যেমন-যেমন সাধক ঈশ্বর-পথ-এ অগ্রসর হয়, তেমন-তেমন ঈশ্বরের তেজ প্রকটিত হয়। **'কাম বাত কফ লোভ অপারা'**-এর মত রোগগুলি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। এই পথের পথিকগণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর দ্বারা আক্রান্ত হন না। **'নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী না দীনা।'** আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। একবার এই সম্পত্তি অর্জিত করতে সমর্থ হলে কখনও সাধক এই সম্পত্তি থেকে রহিত হন না। আত্মিক সম্পদ্ প্রাপ্ত কর্তার কখনও নিজেকে অসহায় বলে বোধ হয় না। সদা তারপর ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয়। **'নহিঁ কোউ অবুধ না লচ্ছন হীনা।'** *(মানস, ৭।২০।৬)* সাধক যে স্তরের, সেই স্তরের নির্দেশ তিনি প্রভুর কাছ থেকে পেতে

থাকেন। এই বেদ-পথ সম্বন্ধে সাধককে অবগত করান প্রভু এবং সাধক উপলব্ধি করেন। সেইজন্যই সকলে প্রবুদ্ধ। কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্য সাধকের মধ্যে যে-যে গুণ থাকা প্রয়োজন সে সমস্তই তার মধ্যে থাকে। **'সব গুনগ্য পণ্ডিত সব জ্ঞানী।'** ***(মানস, ৭।২০।৮)*** -রামরাজ্যে শূদ্র, বৈশ্য সকলেই রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই পণ্ডিত। তারা নিজ শ্রেণী সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। জিজ্ঞাসা অথবা শঙ্কা সমাধানের জন্য তাদের কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না। অপৌরুষেয় বাণীই সর্বদা তাদের শঙ্কা নির্মূল করে। শুধু গন্তব্য পথে চলার তাদের প্রয়োজন রয়েছে। চিত্তের স্থিতি পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবান তাদের সেই সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেন। সকলেই কৃতজ্ঞ প্রত্যুপকার পরায়ণ এবং সরল।

রামরাজ্যে সরযুর রাজঘাটে চার বর্ণের ব্যক্তিগণই ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে স্নান করত। অস্পৃশ্যতার গর্হিত প্রথা সংজ্ঞানে ছিল না। বাস্তবে যজনপূর্ণ স্বরই সরযু। এই শ্বাসের জপে অল্পজ্ঞ শ্রেণীভুক্তদের মন কম, মধ্যমা শ্রেণীভুক্তদের মন তাদের থেকে বেশী লাগে পরন্তু ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সাধক ধ্যানস্থ হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যায়। কেউ উন্নত অবস্থাতে রয়েছে আবার কেউ আরম্ভিক স্তরে রয়েছে। কিন্তু ঘাট একটাই রয়েছে, যেখানে চার বর্ণেরই সাধক পৌঁছান এবং স্নান করেন। যে কেউ রামরাজ্যের পরিধিতে পড়েন তাকে চার বর্ণের ক্রমোন্নত সাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং এটাই ধর্ম।

জাতি-পাতি কোন ধর্ম নয়। সম্পূর্ণ রামচরিতমানসে কোথাও এই কুৎসিত প্রথার সমর্থন করা হয়নি। মানুষ কোন না কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। মহর্ষি কুম্ভজের মত ঘড়ার ভিতর থেকে কাউকে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে জাতি নয়, শুধু মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। সেটা ভগবানের করুণার পরিণাম, ভাগ্যশালী, কারণ মানবদেহ সাধনার ধাম, মোক্ষদ্বার। কুলীন অথবা সচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিকেই ভগবান প্রাধান্য দেন এমন কথাও নয়। মানব-দেহ কোন পূর্ব শুভ সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না। সে কর্মের রচয়িতা, সংস্কারের দাস নয়। মানুষ দেহ লাভ হওয়ার মানেই হচ্ছে আপনি পূর্ণ। কৈবর্ত লোকমত-শাস্ত্র অনুসারে সর্বপ্রকারে নীচ এটাই ভাবা হত। **'সাধু সমাজ ন জাকর লেখা। রাম ভগত মহুঁ জাসু ন রেখা।'** ***(মানস, ২।১৮৯।৭)*** -তার ভাগ্যে রাম-ভক্তির রেখা ছিল না কিন্তু রাম তাকে আপন করে নিয়েছিলেন। **'রাম কীহ্ন আপন জবহী তেঁ। ভয়উঁ ভুবন ভূষন তবহী তেঁ।।'** ***(মানস, ২।১৯৫।২)*** সে ত্রিলোকে পবিত্র পুরুষরূপে খ্যাতি অর্জিত করেছিল।

ভগবানকে লাভ করেছিল। যার শুধু ছায়া স্পর্শ করলে স্নান করার বিধান সমাজ তৈরী করেছিল। সেও ভগবানকে লাভ করেছিল। বশিষ্ঠ তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। বর্তমানে যদি কোন উচ্চকুলজাত ব্যক্তি কোন গরীবকে আপন করে নেয় তবে এইরূপ বলে যে, ওই যে ব্যক্তিকে দেখছ সে আমাদের নিজেদেরই লোক, এই তুমি ওখানে মাটিতে বস। ভগবান এইভাবে আপন করেন না। কৈবর্তকে তিনি বলেছিলেন **'তুমহ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা।।'** ***(মানস, ৭/১৯/৩)*** -ভরত যত প্রিয় আমার কাছে, তুমিও ততটাই প্রিয়। হে তাত! সর্বদা আসবে তুমি, নিজের ঘরের দরজাই খুলে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তার প্রতি উদার হয়েছিলেন। আপ্ত পুরুষদের বাণীতে জাতির তদ্‌বীর কোথাও নেই।

সেই ভক্ত পুনরায় নিবেদন করেছিল যে, "ভগবন্! বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম শম্বুককে শুধু এই কারণে বধ করেছিলেন যে, সে শূদ্র হয়েও তপস্যা করছিল, এর আশয় কি? কারণ বাল্মীকিও অস্পৃশ্য শ্রেণী থেকেই উচ্চ শ্রেণীতে উঠেছিলেন। তাঁকে তো রাম দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন।" 'মুনি কহুঁ রাম দণ্ডবৎ কীহ্না।' ***(মানস, ২/১২৪/১)***

তখন পূজ্য মহারাজজী সেই ভক্তকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-এটাও একটা আধ্যাত্মিক, সাধনীয় কাহিনী যে, শম্বুক তপস্যা শুরু করেছিল, যার ফলে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু ঘটেছিল। বহু বছর পর্যন্ত এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছিল। রাম এদিকে তরবারির আঘাতে শিরচ্ছেদ করেছিলেন ওদিকে সঙ্গে-সঙ্গে বালক বেঁচে উঠেছিল। কোন শল্য-ক্রিয়া ছাড়াই এইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এখন পর্যন্ত তো দেখা শোনা যায়নি।

শম্বুক শূদ্র ছিল অর্থাৎ অল্পজ্ঞ শ্রেণীর আরম্ভিক সাধক ছিল। এইরূপ সাধক প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় **'সোচিঅ সূদ্রু বিপ্র অবমানী। মুখর মানপ্রিয় জ্ঞান গুমানী।'** ***(মানস, ২/১৭১/৬)*** শূদ্র স্তরে থাকাকালীন কাকভুশুণ্ডীজী দ্বারাও এইরূপ ভুল হয়েছিল। তিনি শুধু ভজনাতে বসার ভুলই করেননি পরন্তু (বিপ্র অবমানী) গুরুদেবকে অপমান করে বসেছিলেন, যার প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হয়েছিল। অল্পজ্ঞ সাধক উন্নত সাধকদের নকল করতে শুরু করেন। এরফলে তাঁদের অবস্থা উন্নত তো হয় না পরন্তু আরম্ভিক স্তরের সাধনার জাগৃতিও প্রসুপ্ত হয়ে যায়। এটাই হল ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু। শম্বুক সমতার নকল করে যে সাধক তার প্রতীক। সে বৃক্ষে উল্টোভাবে ঝুলে তপস্যা করছিল। **'সংসার বিটপ নমামহে'** ***(মানস, ৭/১২/ছন্দ***

৫) -সে সংসার বৃক্ষে,গর্ভবাসকালে উল্টোভাবে ঝুলেছিল কিন্তু শম্বুক সমত্বপ্রাপ্ত ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষের নকল করার কাজে ব্যস্ত ছিল। যে ব্রহ্ম আচরণ জাগ্রত হয়। অনুকরণ করার ফলে তাও প্রসুপ্ত হয় কিন্তু যখন ভগবান রথী হন তখন সাধককে পতিত হতে দেন না। ত্যাগরূপ তরোয়াল দ্বারা তিনি সাধককে সেই স্তর থেকে পতিত করে দেন। বহু বছরের মৃত ব্রাহ্মণ বালক নবজীবন লাভ করে। ব্রহ্মাচরণ পুনরায় জাগ্রত হয় এবং এই প্রকার যোগের তত্ত্বাবধান করে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, **'পরধর্মো ভয়াবহঃ'** *(গীতা, ৩।৩৫)* -অল্পজ্ঞ শ্রেণীর সাধক যদি নিজের থেকে উন্নত সাধকের অনুকরণ করে তবে ভয় অর্থাৎ গমনাগমন করতে থাকে। স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে যিনি আচরণ করেন ক্রমশঃ তিনি পরমশ্রেয় লাভ করেন।

।। ওঁ।।

ধর্মের নামে

পূজ্য গুরু মহারাজজীর সমক্ষে ভক্তরা যখন 'হিন্দু' শব্দটির অর্থ জানতে চেয়েছিল তখন পূজ্য গুরুদেব বলেছিলেন, ''হো! হিন্দু শব্দটা তো প্রাচীন কারণ ভারতের সুদূর বনাঞ্চলে-আসাম, মেঘালয়, বর্মা (ব্রহ্মদেশ), সুদূরে যেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিল না, সেখানে পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।'' এগারো শো বছর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা থেকে এই নামের উৎপত্তি। এ কথা নিরাধার। মূলভাষা সংস্কৃত, ধর্মশাস্ত্র গীতা এবং গৌরবপূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থ মহাভারত, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে দ্বাপর পর্যন্তের গৌরবপূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত-এগুলির উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ফলস্বরূপ এইভ্রান্তিগুলির জন্ম হয়েছিল যে, 'হিন্দু' শব্দ কোথা থেকে এল, আর্যরাই বা কোথা থেকে এসেছিল এবং সনাতন কাকে বলে? কিন্তু এসবই গীতোক্ত শব্দ।

গীতার শুরুতেই ভগবান বলেছেন-

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ।। *(গীতা, ২/২)*

অর্জুন! এই বিষমস্থলে তোমার এই অজ্ঞান কোথা হতে এল? এটা কীর্তিদায়কও নয়; কল্যাণকারীও নয়, অতীতে শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ ভুলেও এর আচরণ করেননি। '**অনার্যজুষ্টম্**'-অনার্যদের আচরণ তুমি কোথা থেকে শিখলে? গীতা আর্য-সংহিতা। আত্মা ভিন্ন আর কারও অস্তিত্ব নেই। যিনি সেই পরমাত্মার প্রতি নিষ্ঠাবান, তিনিই আর্য। সেই আত্মাকে জানার বিধি (যোগ-বিধি) যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান যিনি করেন, তিনি আর্যব্রতী এবং এর পরিণামস্বরূপ যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, আত্মতৃপ্ত, আত্মস্থিত-তিনি আর্যত্ব লাভ করেছেন।

আত্মা সনাতন। এর অনুসন্ধানকারী সনাতন ধর্মী। পরমাত্মার নিবাসস্থান সম্বন্ধে ভগবান বলছেন-

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।। *(গীতা, ১৩/১৭)*

অর্জুন! সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি, তম থেকে বহু ঊর্ধ্বে বলা হয়েছে। তিনি পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ, পূর্ণজ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞান দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত। হৃদয়ে স্থিত হয়ে করেন কি? এই প্রসঙ্গে অধ্যায় ১৫।১৫-এতে বলেছেন-

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।।

অর্জুন! আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে স্থিত। স্বরূপের স্মৃতি, জ্ঞান এবং সকল বাধা শান্ত আমার দ্বারাই হয়। সকল বেদ মধ্যে যা জানার যোগ্য তা আমি। বেদান্তের কর্তা এবং বেদবিৎও আমিই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন-**'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।'** ***(গীতা, ১৮/৬১)*** অর্জুন! ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও লোকে জানতে পারে না কেন? ভগবান বলছেন মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকলেই ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করছে সেইজন্য জানতে পারে না।

ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তাহলে কার শরণে যাওয়া উচিত? কার পূজা করা উচিত? পরবর্তী শ্লোকেই ভগবান বলছেন-

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। ***(গীতা, ১৮/৬২)***

অর্জুন! সর্বতোভাবে হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত ধাম লাভ করবে। হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য প্রযত্নশীল সাধককে 'হিন্দু' বলা হয়। জগৎ রূপ রাত্রির অন্ধকারেও সেই জ্যোতির্ময় পরমাত্মার প্রকাশ সদা প্রবাহমান। প্রেরণা প্রদান করতে থাকে। রাত্রিতে চন্দ্রমা (ইন্দু)ই আলোক বিতরণ করে। অতএব 'হৃদি ইন্দু স হিন্দু'-প্রত্যেককে এরই উপাসক হতে হবে। সৃষ্টিতে যত মানুষ আছে সকলকে এরই শরণাগত হতে হবে, সেইজন্য 'হিন্দু' শব্দ সার্বভৌমিক। যে আশয় হিন্দুর তাই সনাতনের এবং আর্যেরও। অতএব অস্তিত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান্ 'আর্য', সনাতন আত্মাতে শ্রদ্ধাবান 'সনাতনধর্মী' এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের উপাসক হলে 'হিন্দু' বলা হয়। কাল-এর নিয়মে পরিবর্তিত এই তিনটি নাম সমার্থক। একটা আলোচ্য বিষয়েরই বার্তা এবং এদের সকলের একটি মাত্র ধর্মশাস্ত্র তা হল 'গীতাশাস্ত্র'।

।।ওঁ।।

মহাপুরুষগণের উদ্ভব এবং তাঁদের পরম্পরা

আদি থেকে আজ পর্যন্ত মহাপুরুষদের জীবনী যেমন দেখা গেছে উদাহরণ স্বরূপ রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি থেকে শুরু করে তুলসী, কবীর এঁদের জীবন যেরকম ছিল পরমপুজ্য পরমহংসজীর জীবন সম্পূর্ণটাই সেই মহাপুরুষদের সঙ্গে মিলে যায়। আজকের মানুষ এই প্রাচীন মহাপুরুষদের যে যুক্তিগুলির দ্বারা সম্বোধিত করে, তাদের এটাই তো রূপ যে, দু-তিনজন মানুষকে জীবনদান, কিছু রোগী এবং পাগলদের সেরে ওঠা ইত্যাদি। পূজ্য পরমহংসজীর কাছে ঘটিত ঘটনাগুলির মধ্যে এ সমস্ত খুবই সামান্য ব্যাপার। মানুষ নিজে বোঝার জন্য যা খুশী তৈরী করুক পরন্তু সেই মহাপুরুষদের অন্তরের বস্তু নয় এটা। মৃত্যুদণ্ড, জীবনদান অথবা রোগ-নিবারণের সঙ্গে সেই মহাপুরুষদের উপলব্ধির লেশমাত্রও সম্বন্ধ নেই। এটা তো তাঁদের এমন তেজ যা স্বাভাবিকভাবে ঘটিত হতে থাকে। পথিক চলে যখন বাস্তবে ব্রহ্মে লীন হন, তখন এই রশ্মিগুলি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে থাকে। এবং ভাল-মন্দ যেমন যার মনঃস্থিতি দেখে, সেইভাবেই তার অবসান করতে থাকে। হ্যাঁ প্রাচীন মহাপুরুষগণের তিরোধানের পর অনুগামীগণ ধীরে-ধীরে বংশানুক্রমে কিছু না কিছু উপাধি প্রদান করে অবতার ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত করেছে এবং নিজেদের জন্য প্রতীক তৈরী করেছে; কিন্তু মহাপুরুষগণ সংঘ অথবা সংস্থা নির্মাণ করেন না।

যখনই কোন দেশ-কালে মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, বাস্তবে সেই পরম সত্তাকে অপরিবর্তিত প্রত্যক্ষ করেছেন। কারণ সকলের নিয়ন্ত্রক পরমসত্তা অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ সেই ভগবান অপরিবর্তনশীল। বাস্তবে যদি কেউ সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তবে তিনি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন না। তুমি খোদার নিকটবর্তী, আমি গডের-এই প্রকার অনন্ত শাখার সৃষ্টি হতে পারে। যদি কেউ দলাদলি করে, তবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এখনও লাভ করেননি। মহাপুরুষের কাছে আপনি এবং অন্যান্য মানুষ সকলেই সমান। যদি আপনি উপযুক্ত, তবে মহাপুরুষ প্রকৃতির একটি সীমা থেকে তুলে অন্য আর একটা সীমা পার করান।

মহাপুরুষ যে ঐশ্বরিক যুক্তি দ্বারা পথিককে সাধনাতে উত্তরোত্তর উন্নীত করেন, তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে স্বয়ং মহাপুরুষ প্রেরকরূপে দাঁড়িয়ে যান। অধিকার অর্জন করার জন্য সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা এবং

ভক্তি যুক্ত মন হওয়া দরকার। এতে কোন জাতি এবং কুলকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

যখন প্রাচীন কাহিনীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন সে সবের মধ্যে কোন জাতি বিশেষের বর্ণনা পাওয়া যায় না। দেবাসুর সংগ্রামে দুটি জাতির অভ্যুদয় হয়েছিল, প্রথম দেবতা এবং দ্বিতীয় অসুর। তারপর যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগ এবং যবন রূপে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে এই মানুষই বানর, ভালুক, মণ্ডূক প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল। ধীরে-ধীরে মানুষ আর্যরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই পরিবর্তন বন্ধ হবে না, কারণ এটা সামাজিক ব্যবস্থাগুলির চক্র। মানুষ সর্বদা নিজের জীবনযাত্রার রীতি সুগম করে এসেছে, এই কারণেই নিজেদেরকে দলে বিভক্ত করে অনেক কুরীতির অনুগামী বলতে শুরু করেছে। হতে পারে ভবিষ্যতে মানুষের অন্য কোন প্রকার দেখা যাবে, কারণ প্রত্যেক দ্বীপে এটাই হয়ে এসেছে। এই শারীরিক ব্যবস্থাগুলির উন্নতির সঙ্গে সেই পরমাত্মার কোন সম্বন্ধ নেই। সেই পরমাত্ম ধর্মের প্রক্রিয়া মন থেকে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ মন যখন অচল, স্থির এবং পূর্ণ নিরুদ্ধ হয় সেই অবস্থাতে ইষ্ট-দর্শনের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ হয়।

যদি অনুরাগ ও বিরহ-বৈরাগ্য আপনার মধ্যে রয়েছে তবেই আপনি ব্রহ্মর্ষি এবং সাধুর স্থিতি লাভ করতে সমর্থ হবেন, মাতা-পিতাকে সৎ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। মহর্ষি বশিষ্ঠ উর্বশীর গর্ভজাত ছিলেন, পরন্তু তাঁর ব্রহ্মত্বে কোন ন্যূনতা ছিল না। মহর্ষি বাল্মীকি কোলের সংযোগে এবং ব্রহ্মর্ষি ব্যাস মৎসোদরীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন কিন্তু তাঁর ঋষি স্তরে কোন ন্যূনতা আসেনি। শৈশবে পুকুরের ধারে কবীরকে জোলানী কুড়িয়ে পেয়েছিল। যীশুর সাতমাস বয়স পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও তাঁর জননী অবিবাহিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও পরে পূর্ণ মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অতএব ভগবৎ পথে মাতা পিতার ত্রুটির কোন প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে না। হ্যাঁ, ভগবৎ পথের পথিক ইন্দ্রিয় সংযমের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ না হয়ে লাভ করতে পারে না। চিন্তনের প্রবেশিকা থেকেই এই সংযমের চেষ্টা আবশ্যক।

এখন এই মহাপুরুষদের বিশেষ প্রশংসা করা তো সেই ব্যক্তিদের কাজ, যাঁরা তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করতে অসফল হয়েছেন এবং যাঁদের সঙ্গে শুধু ভাবপ্রবণতা রয়েছে। এখন সেই মহাপুরুষদের জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যাঁদের তিরোধানের পর সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়েছে। যার ফলে সংঘ নির্মিত হয়েছে। ভাবুক ব্যক্তিগণ

যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলেন। বড়-বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেন যে, ঈশ্বর নিজের একমাত্র পুত্রকে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করেছিলেন। এর মানে ঈশ্বরের কাছে আর কোন পুত্র নেই, অন্য কেউ পুত্র হতেও পারে না, কিন্তু মহাত্মা যীশু বলেছেন যে, শুধু আমিই ঈশ্বরের পুত্র, আর কেউ হতে পারবে না, এমন কথা নয়। যীশু বলেছেন-আমার কাছে এসো, তবেই ঈশ্বরের পুত্র হতে পারবে। মহাপুরুষের কাছে যাওয়ার তাৎপর্য হল সাধনা দ্বারা তাঁর স্থিতি লাভ করা।

কবীরের অনুগামীগণ বলেন যে, পুকুরের ধারে সেই প্রকাশ পুঞ্জ বালকে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটা ভাবপ্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। এতে তো এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে কেউ কবীরের সমকক্ষ হতে পারবে না। অতএব পরমাত্মাই পিণ্ডরূপে প্রকট হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মহাপুরুষ নিজের বাণীতে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে,

কবিরা কবিরা কেয়া করৈ, সোধো সকল শরীর।
আশা তৃষ্ণা বস করৈ, সৌঈ দাস কবীর।।

যখন কবীর মহাপুরুষের স্থিতিলাভ করেছিলেন, তখন সমাজ কিছু-কিছু কল্যাণের কারণ দেখে বলেছিল যে কবীর খুব উচ্চস্তরের মহাপুরুষ, তিনি তো যোগী পুরুষ ইত্যাদি। তখন কবীর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন যে, কি কবীর-কবীর করে যাচ্ছ, গোটা দেহটা (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) অনুসন্ধান করে দেখ। আশা ও তৃষ্ণা সংযত কর, তাহলেই তুমিও কবীর হতে পারবে। কবীর এক স্থিতি বিশেষ, সেই স্থিতি লাভ করলে সকলেই কবীর হতে পারবেন।

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, মহাপুরুষ কোন দেশ, জাতি এবং কুল বিশেষের পৈতৃক সম্পত্তি হন না। তাঁদের উপলব্ধি সার্বভৌমিক চেতনে হয়, অর্ধেক অবস্থাতে হয় না। পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজীও এইরূপ আদর্শ ছিলেন। আমরা ভারতীয়, বিদেশী, হিন্দু, যবন, শিখ, খৃষ্টান যাই হই না কেন; যদি সেই আত্মাকে পরমকল্যাণের স্থিতিতে প্রত্যক্ষ করতে চায়, তবে সমস্ত সামাজিক সীমা লঙ্ঘন করে কোন মহাপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

হ্যাঁ, স্বয়ংসিদ্ধ কিছু সমস্যা মানুষের সমক্ষে রয়েছে। এটা মৌলিকরূপে বিচার্য যে, মানুষ কোন না কোন কুল-বিশেষে উৎপন্ন হয় এবং জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের মধ্যে কুল-ধর্ম এর সংস্কার অঙ্কিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে কুল-ধর্ম-এর সীমাতে আবদ্ধ হয় এবং সেটাকেই পরমশান্তির লক্ষ্য বলে মনে করে, পরন্তু সমাজে

অনেক কুল রয়েছে। তাহলে এই ভাবে তো সেই লক্ষ্যও অনেক রূপে দেখা দেবে, বস্তুতঃ শুধু তারই অস্তিত্ব রয়েছে। সত্যি যদি আমরা পরমকল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছুক, তবে এই সঙ্কীর্ণ কুটুম্বিতার সীমা পরিত্যাগ করে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক করতে হবে। যখনই আমরা আত্মীয়তা-ধর্ম-এর বেড়াজাল ভেঙ্গে বিকাশোন্মুখ হই, তেমনি স্বীয় জাতির প্রতি মমত্ববোধ আমাদের জাতি-ধর্ম-এর বন্ধনে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে।

সত্যিই যদি কোন অনুরাগীর মধ্যে বিবেকবুদ্ধি কাজ করছে, তবে তাকে জাতি-ধর্মও ঠিক সেই প্রকারে তিলাঞ্জলি দিতে হবে, যে প্রকারে কুল-ধর্মকে। এইরূপ অবস্থাতেই সে সসীম থেকে অসীমের দিকে অগ্রসর হবে, সমষ্টি স্পর্শ করতে পারবে। ভাষা-ভেদ-এ তাঁকে বহু নামে সম্বোধিত করা হলেও শুধু সেই ভগবান নামের অলৌকিক সত্তাই রয়েছে। জাতি ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে সাধক যেমনি সাধনাতে প্রবৃত্ত হয়, তেমনি বহু মত-মতান্তরের বন্ধন তাকে পুনরায় অনেকানেক সঙ্কীর্ণতায় কষে বাঁধে। এসবেরই মধ্যে কিছু নৈতিক আদর্শবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলস্বরূপ কিছু কিছু অনুরাগী দেশহিতব্রতী হন। তারা দেশকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে চান, সেটাকেই সর্বোপরি ভাবেন এবং এজন্য প্রাণোৎসর্গ করার জন্যও তৎপর থাকেন। পরন্তু শুধু কি ভারতবর্ষই দেশ? পরমাত্মা কি এখানেই রয়েছেন? এইপ্রকার অনেক দেশ রয়েছে সেইজন্য সেই একরকম সত্তা তো অনেকরূপে দৃষ্টিগোচর হবে। যদি সত্যিই আপনি পরমশান্তি লাভ করতে চান, তবে দেশভক্তির সীমা এবং দেশভক্তির ভ্রম পরিত্যাগ করে সার্বভৌমিক বিচার ধারা আত্মসাৎ করতে হবে। এই সীমা লঙ্ঘন করলে সম্প্রদায় সাধককে সীমাবদ্ধ করে। কেউ রামকে ভক্তি করে, কেউ রহীমকে, কেউ যীশুকে, কেউ বুদ্ধকে, কেউ মহাবীর স্বামীকে, কেউ খোদাকে। এইপ্রকার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি অনেক ধর্মের রোগ দ্বারা সাধক গ্রসিত হন, কিন্তু এই বহু ধর্ম দ্বারা ঈশ্বরের অভিন্ন স্থিতি লাভ হয় না, যা ব্যাপক। অবশেষে যখন অনুরাগী সাধক কুল-ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, মত-মতান্তর, দেশ-প্রেম এবং বিভিন্ন ধর্মের দ্বন্দ্ব তিলাঞ্জলি দিয়ে অসীম সত্তার অনুসন্ধান করেন তখনই ক্রমশঃ প্রগতির পর সেই সর্বব্যাপক স্বরূপের সাক্ষাৎ করেন, যার অস্তিত্ব সমস্ত কুল-ধর্ম এবং জাতিতে বিদ্যমান। সমস্ত সম্প্রদায়গুলিতে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক দেশ এবং ধর্মের তিনিই সর্বোপরি পরমচেতন স্বরূপ, যিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ, অসীম এবং ব্যাপক। এই পরমতত্ত্বেরই উপলব্ধি মানব জীবনের অমর লক্ষ্য।

।। ওঁ।।

পরমহংসজীর লোকপ্রবাদ

—:: ১ ::—

প্রায়ই ভক্ত সমাজ পূজ্য মহারাজজীর কাছে নিবেদন করত যে, ‘‘মহারাজ! আমিও আশ্রমের সেবকের মত আপনার কাছে থেকে আপনার সেবা করব ও ভজনা করব।’’ তাঁদের এইরূপ মনোভাব দেখে শ্রী গুরুদেব ভগবান বলতেন-‘‘হো! আন কে মুহেঁ চনে কী রোটী বহুত নীক লাগত হ্যায়। পীয়র-পীয়র লেকিন গটঈ ধরত হ্যায়।’’ এর সঙ্গে নিয়মরূপ লবণ, প্রেমরূপ বারী দরকার তবেই তা ভক্ষণযোগ্য হয়। এই চিত্তই ছোলা। চিত্তের প্রবৃত্তিগুলিকে গুটানো এবং সেগুলি শান্ত করাই হল গলাধঃকরণ। এই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই, সেই পরমতত্ত্বের আলোকে জীবাত্মা সমাহিত হয়।

—:: ২ ::—

বস্তুর অভাবে ভক্তদের তরফ থেকে কোন কার্যক্রমের প্রস্তাব এলে মহারাজজী বলতেন-‘‘হুঁ, সুওয়া না সুতারী, চলে হ্যাঁয় বনকে ব্যাপারী।’’ উকতাইল কুম্ভার নখে সে মাটী খনে। এইভাবে ব্যস্ত হলে কি কখনও কাজ হয়? ‘‘সূত না কাপাস, জুলাহে সে লট্‌ঠম লট্‌ঠা।’’ আগে জোগাড় কর, তারপর ধৈর্য এবং শান্তিপূর্বক কাজ শুরু কর। ঘোড়া এবং মানুষের দিন সবসময় একরকম থাকে না; বদলাতে দেরী লাগে না। এইভাবে বুঝিয়ে, বিভূতি-প্রসাদ দিয়ে তিনি সস্নেহে আলতো করে একছড়ি পিঠে বসিয়ে দিতেন।

আশীর্বাদরূপে ইষ্টের নির্দেশানুসারেই এই ছড়ি স্পর্শ করাতেন।

—:: ৩ ::—

কোন অনন্য ভক্তকে সঙ্কট, রোগ ইত্যাদিতে বিচলিত দেখে পূজ্য মহারাজজী সান্তনা দিতেন ‘‘হো...! মায়া ও ভগবানের মধ্যে শুরু থেকেই ঝগড়া চলছে। আমার উন্নতি মায়া দেখতে পারছে না, শেষে কাজ হবেই, কিন্তু আগে বিরক্ত করে নেবে। মোর বড়তী মায়া দেখৈ নাহীঁ চাহত হ্যায়। আখির শঙ্খিয়া বাজী, পর বাবা কে খিঝায় কে। যাও বিভূতি নাও গিয়ে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।’’

কোন ভক্ত তার কাজে অসফল হলে মহারাজের কাছে এসে প্রার্থনা করতেন, তখন উনি বলতেন, ‘‘রাতি ভর গায়েন বাজায়েন, সবেরে ববুআকে নূনিয়ে নাহীঁ।’’ দেখ তো! একে কত সাবধান করেছিলাম, এখান থেকে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল,

তা সত্ত্বেও আলস্য ও নিদ্রাতে সময় নষ্ট করে দিল। বাছা! ‘‘আলস্য নিদ্রা জমুহাঈ। তিনো কাল কে মাঈ।।’’ যাও, আলস্য ত্যাগ করে কাজ করবে। হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলে প্রাতঃ-সন্ধ্যা আমাকে স্মরণ কোরো। মন থেকে এখানে এসো, তবেই সব ঠিক থাকবে।

—:: ৪ ::—

অনুসুইয়া আশ্রমে যে সব ভক্ত যাতায়াত করতেন মহারাজজী তাদের সুখ-সুবিধার খুব খেয়াল রাখতেন। তাদের প্রয়োজনের প্রত্যেকটি বস্তু আশ্রমে সর্বদা থাকত। প্রতিদিন দাড়ি কামানোর ব্যবস্থা, চা-কফির, তেল-সাবান, চিরুনি-আয়নার পর্যন্ত ব্যবস্থা মহারাজজী করে রাখতেন, যদ্যপি আশ্রমবাসীদের জন্য এই সমস্ত জিনিষের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভক্তদের মহারাজজী অত্যন্ত স্নেহপূর্বক খাওয়াতেন এবং নিজ হাতে প্রসাদ দিতেন। ভোজনের এত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তো এখন কোথাও দেখাও যায় না। ঘি মাখানো রুটি থেকে শুরু করে নিত্য নতুন ব্যঞ্জন প্রতিদিন সকলের জন্য সুলভ ছিল। ভক্তগণের ভোজনের সময় মহারাজজী কোন না কোন অছিলায় আসন থেকে উঠে তাদের কাছে চলে যেতেন, তাদের বলতেন, ‘হো! চূতর টেকি কে বৈঠো। উকড় বৈঠকর খানে সে পেট মে সিলবট পড়ি জাত হ্যায়।’ আধা পেট খাইল অওর জোয়ানী কা মরল বরাবর হোত হ্যায়।’’ অর্থাৎ ভালভাবে বোসো, না হলে পেটে বলির দাগ পড়বে। আধপেটা থাকা এবং যুবক অবস্থায় মৃত্যু সমান। পরিবেশনকারী সাধুদের বকে বলতেন, ‘‘আরে আচার তো দিলেই না। এখন আমি কি করি? আরে! এরা সকলেই ভাল ঘরের, ভাল খাওয়া-দাওয়া করে, আরেকটু ঘি দাও। খিচুড়ীর চার বন্ধু। দই, পাপড়, ঘি, আচার। একে আর একটা রুটি দাও।’’ যখন বুঝতে পারতেন যে, এখন এদের সকলের পেট ভরে গেছে আর কোন মতেই নেবে না, তখন বলে উঠতেন, ‘‘আরে! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। খুব ভালো বরফি রাখা আছে। এখন তার সঙ্গে এক-একটা রুটি আরও খেয়ে নাও।’’ মহারাজজীর অমিত স্নেহে ভক্তগণ বিভোর হয়ে উঠতেন।

কিন্তু সাধকদের আহার-বিহারের উপর মহারাজজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। যখন দেখতেন কোন সাধক ভজনা না করে শুধু খেতেই ব্যস্ত,তখন বকে বলতেন, ‘‘খেয়ে যাও বাছা! বাবার আটা, বাবার ঘি। শাবাস-শাবাস বাবাজী। না ভজন, না চিন্তন। আরে সাধুকে সূক্ষ্ম এবং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা উচিত। দু’গ্রাস কম খাওয়া উচিত, কম ঘুমানো উচিত এবং সংযমপূর্বক নিরন্তর ভজনাতে প্রবৃত্ত থাকা

উচিত। দূর হও এখান থেকে। প্রস্থানের-জন্য প্রস্তুত হও। বিরহ-বৈরাগ্যশূন্য অকর্মণ্যদের এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।” এটুকু তাড়নাতেই সাধকের মনের মধ্যে গ্লানি এবং শান্তির ভাব প্রবাহিত হত এবং অত্যধিক খাওয়া ত্যাগ করে তিনি অনুক্ষণ সাধনাতে প্রবৃত্ত হতেন।

মহারাজজীর ‘স্পেশাল’ প্রসাদ ছিল গাঁজা। এক সজ্জন ব্যক্তি সাধু হওয়ার জন্য আশ্রমে এসেছিলেন। শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি ঝাঁট দিচ্ছিলেন। কিছু ব্যক্তি হুঁকো টানছিল। একজন সেই ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, ‘‘আপনিও দু'টান দেবেন কি?” তিনি ঝাঁটাটা ছুঁড়ে তৎক্ষণাৎ হুঁকোটা ধরার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হুঁকোর কাছে পৌঁছানো মাত্র মহারাজজী রেগে বলেছিলেন, ‘‘গোঁয়ার কোথাকার! দূর হও এখান থেকে। সাধু হতে এসেছে।” খাবার সঙ্গে জ্ঞান পেলে তো গোটা দুনিয়াই সাধু হয়ে যাবে। ইনি ত্যাগী হওয়ার জন্য এসেছেন। দেখ, কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হুঁকোতে টান দেবার জন্য। হাল দাও, হাল চালনাকারী দাও। পিছন থেকে খনন করার জন্য ছুঁচ দাও। ঘরে ফিরে যাও নিজের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা কর গিয়ে। সুখ-দুঃখ তো জীবনে আসতেই থাকে। এখনও তোমার সাধু হওয়ার সময় হয়নি। যখন সময় হবে, ভগবানই সাহায্য করবেন, ডেকেও পাঠাবেন, তখনই ভবসাগরের পারে যেতে পারবে।” এইপ্রকার সাধকদের সূক্ষ্ম গতিবিধির উপর পূজ্য মহারাজজী সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এইরূপ ভর্ৎসনা দ্বারা আশ্রমবাসী সাধক এবং ভক্তগণও সাধনার সঠিক পথ খুঁজে পেতেন।

—:: ৫ ::—

শুরুতে অনুসুইয়া দর্শনে খুব কম লোক আসতেন, কিন্তু মহারাজজী যখন থেকে সেখানে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকে ধীরে-ধীরে ভক্তদের সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়। মহারাজজী সকলকেই কিছু না কিছু প্রসাদ দিতেন, যা সকলেই ভক্তিভরে গ্রহণ করতেন। কখনও-কখনও কোন কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্যক্তিও আসতেন, যিনি ভগবানের নাম করে কিছু-কিছু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাদের ছিল না। তাদের পথ প্রশস্ত করার জন্য পূজ্য মহারাজজী তাদের মাখন এবং কিছু অন্য প্রসাদ দিয়ে বলতেন, ‘‘নাও, জল খাও। অনেক দূর থেকে এসেছে। রোদে মুখ শুকিয়ে গেছে।” পণ্ডিতমশাই তাঁর কথা শুনে বলতেন, ‘মহারাজজী। এখন তো আমি স্নান-ধ্যান করিনি। ভাবছিলাম যে, গঙ্গা-স্নান করে নিই।’ মহারাজজী তাঁর কথা শুনে বলে উঠতেন ‘‘হুঁ লিপটে কে চমাইন, ভূখা রহে,

ইতওয়ার। পণ্ডিতমশাই, পণ্ডিত হয়েছেন। আরে প্রসাদ নাও, জল খাও জ্ঞানই গঙ্গা। নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করার কাজে মনকে স্থিত করতে পারলেই সেই জ্ঞান লাভ হয়। প্রত্যক্ষভাবে জানার নামই হল গঙ্গা। মন-যখন তন্ময় হয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করে যায়, তখনই সেই ইষ্ট বিদিত হন।'

—:: ৬ ::—

কখনও-কখনও আশ্রমেরই শিষ্য মহারাজের সমক্ষে কোন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলে, তিনি একবার সেই শিষ্যের দিকে তাকিয়ে নিতেন কিন্তু চুপ করে থাকতেন। যখন সে কিছু দূরে সরে যেত, কিন্তু শোনার স্থিতিতে থাকত তখন কাছে উপবিষ্ট ভক্তদের শিক্ষা দেবার জন্য মহারাজজী বলতেন, "হো, দেখছ! ডিম বলছে ছানাকে চূঁ-চূঁ কোরো না। আমার জন্মানো ছেলে, আমাকেই জ্ঞান দিচ্ছে। এখন কোথায় কিছু হয়েছে? পরীক্ষার সময় তো আসছে। যখন মায়া পরীক্ষা নেয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবক হয়ে যায়, নপুংসক বীর পুরুষ হয়ে যায়। **'শৃঙ্গীকী ভৃঙ্গী করি ডারী, পরাশর কে উদর বিদার।'** তাঁরা সকলেই যোগী পুরুষই তো ছিলেন। কালকের যোগী আর আজ পা পর্যন্ত জটা। বক-বক করেই যাচ্ছে। আরে যেটুকু জিজ্ঞাসা করছি, সেটুকুরই উত্তর দেওয়া উচিৎ। সাধককে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে রাখা উচিৎ।"

এইরূপ তিরস্কৃত হয়ে কিছু-কিছু সাধক দু'এক দিনের মৌন অবলম্বন করতেন। মহারাজজী তাদের শুনিয়ে বলতেন, "বাহ! মৌনী হয়েছেন। শুধু কথা না বললে কি হবে? জিহ্বা সংযত রাখলেও যদি মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহে তরঙ্গ বিদ্যমান, তবে সেটাকে মৌন কি করে বলা যেতে পারে? সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সাধককে বহির্জগতের পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। পথ চলতে-চলতে সাধক যখন আকাশবৎ হয়ে যায়, তখনই সেই লক্ষ্য দর্শন করে মৌনী হয়। উত্থান করতে-করতে সাধক যখন শিখরে পৌঁছায় এবং মর্মাবধারণ করে, তখন মৌনী হয়।"

—:: ৭ ::—

প্রায়ই কিছু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি অভিমানবশতঃ গৃহত্যাগ করে ক্ষণিক বৈরাগ্যের আবেশে পূজ্য মহারাজজীর কাছে গিয়ে নিবেদন করতেন, "মহারাজ! এখন থেকে আমি আপনার শরণে বাস করব।" এইরূপ কথা শুনে পূজ্য মহারাজজী তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন-"কি হয়েছে? ঘর ছেড়ে কেন এসেছ?" তখন সেই ব্যক্তি নিজের ব্যথা ব্যক্ত করতেন, "মহারাজ, এই সংসার খুবই স্বার্থপর। ভাই,পুত্র, স্ত্রী

কেউই আজ্ঞাকারী নয়। কেউই আমার কথা শোনে না।” এই সমস্ত কথা শুনে মহারাজজী হেসে একটা গল্প শোনাতেন, “তোর মোর অনুরাগ জগা, আও চলী বন কে। ঝর গয়া তো আওয়া চলী ঘর কে।” এক দম্পতি ছিল। কখনও-কখনও পতিদেবতার উপর বৈরাগ্যের নেশা চাপতো। তখন তিনি বলতেন যে, গৃহস্থজীবন আর আমার ভাল লাগছে না। তার কথা শুনে তার স্ত্রীও তখন বলতেন তুমি ঠিক বলছ, আমারও গৃহস্থ জীবনের প্রতি আর কোন আকর্ষণ নেই। দুজনেই গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। কোনরকমে পাঁচ-সাতদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করতে না করতেই সব বৈরাগ্য নেমে গিয়েছিল, কেবলই ঘরের কথা মনে পড়ছিল। পতিদেবতা তখন বলেছিলেন, “এখানে আর মন লাগছে না।” স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী ব্যবস্থা দিয়েছিল, “এখনও তো কিছু ক্ষতি হয়নি? ‘আওয়া চলী ঘর কে’ চল ঘরে ফেরা যাক।” দুজনেই ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে সম্বোধিত করে মহারাজজী বলেছিলেন, “তোমার বৈরাগ্যও ঠিক এই ধরণের, মর্কট বৈরাগ্য। ঘরে ফিরে যাও। কাজকর্ম দেখাশোনা কর গিয়ে। গৃহস্থ জীবনে এই হড়হড়-ভড়ভড় তো লেগেই থাকে। চারটে বাসন এক জায়গায় থাকলে খন্ন-খুট্ট শব্দ তো হয়ই। তুমি তো ভদ্র ঘরের ছেলে। যাও, সব-ঠিক হয়ে যাবে।”

—:: ৮ ::—

ভগবান রামের তপস্যা স্থলী এবং ঋষিদের মনন চিন্তনভূমি হওয়ার ফলে চিত্রকূট মহাত্মাদের কাছে আকর্ষণের বিশিষ্ট কেন্দ্র। দূর-দূরান্ত হতে সাধক, অনুরাগী, ভক্ত, যোগী এবং মহাপুরুষের আগমন ঘটে। এই তীর্থক্ষেত্রে তীর্থ করার জন্য আশ্রমে কখন কোন্ অভ্যাগত আসবেন, মহারাজজী তা আগে থেকেই জানতে পারতেন। তাদের অন্তর পরখ করে মহারাজজী তাদের ভোজন, প্রসাদ, সেবা, থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন, খুব যত্ন করতেন, ভণ্ড ব্যক্তিদেরও আশ্রমে আসা-যাওয়া-ছিল। আশ্রমে তাদের পৌঁছানোর আগেই মহারাজজী বলে দিতেন, “হুঁ... ‘মীটার’ তো আশঙ্কা জাগাচ্ছে। এদের বোনেদের দাসী করে রাখতে হয়। কোন ভণ্ড ব্যক্তি শ্বশুরালয় থেকে আবর্জনা নিয়ে আসছে। এদের খেতে দাও, বসতে দাও, আগুন পোয়াতে দাও, গাঁজায় দম লাগাতে দাও আর ঘুমাবার জন্য বিছানা দাও।” নিকটে উপবিষ্ট ভক্তদের মনে কৌতূহল জাগলে তিনি বলতেন, “কেউ আসছে, দেখবে দাঁড়াও কুপাত্রে দান করলে দাতাই নষ্ট হয়ে যায়।”

এই সমস্ত কথার মাঝেই প্রদর্শনকারী সাধু বেশধারী আগন্তুককে আশ্রমের অভিমুখে আসতে দেখা যেত। মহারাজজী গর্জে উঠতেন-“হুঁ দিদিমার কাছে মামাবাড়ির বর্ণনা! আমাকে সিদ্বাই দেখাতে এসেছে এর বোনেদেন দাসী করে রাখতে হয়।” এসব কথা শোনার পরেও যখন সে নিজের সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ করেই যেত, তখন তিনি পুনরায় বলতেন, “হুঁ..., জটা ফকিরের ন্যায় এবং আচরণ গৃহস্থের মত! কিরে বাড়ি কোথায়? এত পাপ হবে যে, কলুর বলদ হয়ে হাজারবার জন্মাতে হবে! বাছা, কাঁদার জন্যও চোখে জল জুটবে না! আরে যখন বেশ ধারণ করেই নিয়েছিস তখন কোন তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের শরণে যা, যে ক্রিয়া সোজা ভগবানের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয় যাতে সেই ক্রিয়া জাগ্রত হয় এখনও কিছু ক্ষতি হয়নি। কহে কবীর জনম কা উঢ়রী। জব সে চেতে তবে সে সুধরী।।”

কিছু-কিছু পথভ্রান্ত সাধু তো মহারাজজীর দু-চারটে উপদেশ বাক্য শুনেই নিজেদের জীবনের দিশা পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন কিন্তু যারা জীবিকোপার্জনের জন্য সাধুবেশ ধারণ করেছিল সেই ভণ্ড ব্যক্তিগণ ‘গুরুদেব-গুরুদেব’ বলে সেখান থেকে কেটে পড়ত।

—:: ৯ ::—

যখন কোন উত্তম সাধক কিছুকাল সাধন-পথে চলে পতনোন্মুখ হয়েছে, তখন তাকে মহারাজজী ঘন্টার পর ঘন্টা উপদেশ দিতেন এবং সেই সাধকের কল্যাণ চিন্তন করতেন। তার অনুপস্থিতিতে অন্য সাধকদের বুঝিয়ে পূজ্য মহারাজজী বলতেন-

ধরী না কাহূঁ ধীর সব কে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর তে উবরে তেহি কাল মহুঁ।। ***(মানস, ১/৮৫)***

সেই রক্ষা পায়, যার হাত স্বয়ং ইষ্ট (সদ্‌গুরু অথবা ভগবান)ই ধরেন। কিছুকাল পরে যখন সেই সাধক নিজের কৃতকর্মের জন্য মহারাজজীর কাছে অনুতাপ করতেন, সবশুনে তিনি বলতেন- হুঁ..., যা হবার হয়েছে। যে পুনরায় লড়াই করে, তাকে কাপুরুষ বলা যেতে পারে না। এখন থেকে সঙ্গ-দোষ থেকে তফাতে থাকবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে সাধন-পথ-এ এগিয়ে যাও। যদি অল্প সময়ও সাধনাতে দিতে পার, তবে পরিস্থিতি শুধরাতে দেরী লাগবে না। ইষ্ট থেকে সাধক লেশমাত্র দূরে থাকলেও, মায়া তাড়া করে এবং সফলও হয়ে যায়। সেইজন্য সদৈব সাবধান থাকা উচিত। সাধক যখনই নিজেকে শক্তি সম্পন্ন ভাবতে শুরু করেন যখনই তার

মনে হয় যে আমি জ্ঞাতা, আমি ধ্যাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ধ্যানী” এসব ভাবনা আসে তখনই বুঝতে হবে যে, মায়াই সফল হয়েছে

মায়া বস্য জীব অভিমানী

ঈশ বস্য মায়া গুণখানী। (মানস, ৭/৭৭/৬)

'জীব' সংজ্ঞা পড়ে অভিমানের জন্য।

—::১০::—

পূজ্য মহারাজজী গল্পোচ্ছলেও পথিকদের পথ প্রশস্ত করতেন, যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হত। প্রস্তুত প্রসঙ্গটিও সেই গল্পগুলির মধ্যে একটা। দু'জন ছাত্র গুরুকুলে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করছিল। শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা যখন গৃহাভিমুখী হয়েছিল তখন উভয়েই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, জীবিকা নির্বাহ কি করে হবে? সদ্‌গৃহস্থ আশ্রম সঞ্চালনে বেশী না হলেও অতিথি সেবা, দিন যাপনের জন্য অর্থের খুবই প্রয়োজন। দু'জনের মধ্যে একজন নিজের মত ব্যক্ত করেছিল “**দেত ভুবালং ফরত লিলারং ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।।**” তার বলার আশয় এই ছিল যে, আমরা রাজার কাছে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি চেয়ে নেব, রাজাই সর্বেসর্বা। যদি রাজা কৃপা করেন, তবে আমাদের কপাল ফিরবে বলে আশা করা যেতে পারে, আমরা সুখী হতে পারি, অন্যথা বিদ্যা, পুরুষকার কোনটাতেই কাজ হয় না।

অন্য ছাত্রটি তার মত স্বীকার করতে পারেনি।সে বলেছিল যে, ভগবান এবং ভাগ্যের নিজের সত্তা রয়েছে। রাজা কিম্বা যে-ই হোক, তাতে পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। এইরূপ বলে সে শ্লোকটি সংশোধন করে প্রস্তুত করেছিল-

“**ফরত লিলারং দেত ভুবালং ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।।**” অর্থাৎ যখন ভাগ্য সহযোগিতা করে, তখন রাজাও করে, অন্যথা বিদ্যা কিম্বা পুরুষকার কোনটাই কাজে লাগে না।

কথা বলতে-বলতে তারা যে যার ঘরের কাছে পৌছে গিয়েছিল কিন্তু এই বিবাদের সমাধান হয়নি অবশেষে তারা রাজার কাছে গিয়ে এই বিবাদের নির্ণয় প্রস্তুত করার জন্য আগ্রহ করেছিল। অভিমানী রাজারও নিজের প্রশংসা শুনে ভাল লেগেছিল। তিনি স্পষ্ট মত ব্যক্ত না করে নিজের প্রশংসককে বস্ত্র দ্বারা আবৃত্ত একটি কুমড়ো প্রদান করেছিলেন। সেই কুমড়োর মধ্যে ছিদ্র করে তাতে হীরে এবং রত্নসমূহ ভর্তি করে যুবককে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যবাদী যুবককে সেই প্রকারেরই

অন্য একটি বস্ত্রে ততটাই ছাতু প্রদান করা হয়েছিল। তাদের দু'জনকে রাজা একমাস পরে আসতে বলেছিলেন এবং তখনই এই বিবাদের নির্ণয় প্রস্তুত করবেন একথাও জানিয়ে ছিলেন।

যে যুবকটির হাতে কুমড়ো ছিল, সে তার বন্ধুটিকে পথে বলেছিল-"ভাই! একমাস ধরে আমার ছাতু খাওয়ার ইচ্ছা করছে। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে পুরস্কার বিনিময় করে নিই তবে কেমন হয়। তার ছাতু খাওয়ার আগ্রহ দেখে বন্ধুটি বলেছিল- "ঠিক আছে তবে তুমিই ছাতুটুকু খাও।" রাজ প্রশংসক যুবকটি ছাতু নিয়ে কুমড়োটি নিজের বন্ধুকে দিয়েছিল। এবং নদীর তীরে বসে ছাতু খেয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।

ভাগ্যবাদী যুবক ঘরে ফিরে যখন কুমড়োটিকে দু'খান করেছিল তখন হীরে এবং রত্নসমূহ দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করতে তার দেরী হয়নি। নির্ধারিত দিনে দু'জন যুবকই রাজ-সভাতে উপস্থিত হয়েছিল, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই একটা মাস তোমাদের কাটল কিভাবে? ভাগ্যবাদী যুবক কুমড়ো লাভের ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেছিল যে, তার এই মাসটা খুব আনন্দে কেটেছে। কিন্তু রাজ-প্রশংসক নিজের অবসাদ এবং দৈন্যের চর্চা করেছিল।

রাজাও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তিনি নিজের অহংকারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং নিজের অভিমত প্রস্তুত করেছিলেন যে, যদি কারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে, তার সুখের জন্য কিছু না কিছু নিমিত্ত হয়েই যায়। পুজ্য মহারাজজী এই প্রসঙ্গটি মনোরঞ্জকভাবে প্রস্তুত করে বলতেন যে, ভাগ্য, রাজা অথবা অন্য কেউ তৈরী করে দিতে পারে না।

জো জস করই সো তস ফলু চাখা।। *(মানস, ২/২১৮/৪)*

পূর্বের সংস্কারই ভাগ্যে পরিণত হয়। কিন্তু সংস্কার এল কোথা হতে? সেটাও তো আপনার কৃতকর্মের ফল বৈ.ত নয়। বস্তুতঃ ভাল কর্ম করলে ভাল সংস্কার জন্মায় যা-'**মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।**' *(মানস, ১/৩১/৯)* যদি মন্ত্র জপ করার বিধি জেনে সেই অনুসারে আচরণ করা হয় তবে ভাগ্যের অসাধ্য কুঅঙ্কও মুছে ফেলা যেতে পারে। ভজনা দ্বারা কুসংস্কারের পাহাড়ও নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ভাগ্য বিধাতা, নির্মাতা। অতএব কর্ম করা উচিৎ। কর্মের বাস্তবিক অর্থ হল আরাধনা।

—::১১::—

যোগী পুরুষ কোন কাজ স্বেচ্ছায় নয় পরন্তু ভগবানের যন্ত্র হয়ে সম্পাদিত করেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র হন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার কর্মের সঙ্গে পরিস্থিতি অথবা ভাগ্য দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। এই তথ্যের দিকেই ইঙ্গিত করে মহারাজজী মনোরঞ্জক শৈলীতে একটি কাহিনী এই প্রকার প্রস্তুত করতেন-

এক ব্রাহ্মণ রাজ পুরোহিত, ঘোর জঙ্গলে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পাঠশালার আচার্য ছিলেন। সেই যুগের মান্যতা অনুসারে পাঠশালা জন-কোলাহল থেকে দূরে নির্জনে ছিল। ছাত্রদের উপর সঙ্গ দোষের কুপ্রভাব যাতে না পড়ে, সেই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হত।

রাজকন্যা যখন যুবতী হয়েছিল বিবাহের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য পুরোহিতকে দরবারে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কন্যাকে দিয়ে পুরোহিতকে প্রণাম করিয়ে, রাজা রাজকন্যার ভাগ্য এবং বিবাহ ব্যবস্থার সন্দর্ভে পুরোহিতের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কন্যার শুভলক্ষণ এবং সৌন্দর্য দেখে পুরোহিতের বিবেক-বুদ্ধি অসন্তুলিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের মুখ উদাস করে শুষ্ক স্বরে বলেছিলেন-"রাজন! খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, এই কন্যা যেখানে যাবে , সেখানে সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং যদি এখানে থাকে তবে এখানেও সর্বনাশ হবে নিশ্চিত। এর রেখাগুলি সেরকমই বলছে। এই কুযোগ নিবারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে যে, যেন ডুবে না যায় এমন মজবুত সিন্দুকে বায়ু ইত্যাদির ব্যবস্থা করে কন্যাকে তার ভিতরে বন্ধ করে নদীতে প্রবাহিত করে দিন। যদি কেউ কন্যাকে জল থেকে উদ্ধার করে তবে তার জন্য কন্যার অনিষ্টকারী প্রভাব কেটে যাবে।"

রাজা অনেক বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যদি গ্রামের জন্য দেশের নাশ হয় তবে গ্রামের এবং যদি ব্যক্তির জন্য কুটুম্বের নাশ হয় তবে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা উচিৎ; অতএব ব্যথিত চিত্তে পন্ডিতমশাইয়ের কথাতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। পুরোহিতমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কন্যাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়ে নদীতে প্রবাহিত করিয়েছিলেন এবং রাজাকে আশীর্বাদ দিয়ে ছুটতে-ছুটতে নিজের পাঠশালাতে পৌঁছেছিলেন। শিষ্যদের ডেকে বলেছিলেন-" দেখ একটা সিন্দুক নদীতে ভেসে আসছে তোমরা সকলে নদীর তীরে সেটার অপেক্ষা করবে যাও। সেটাকে নদী থেকে তুলে এনে এই ঘরে রাখবে এবং বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে দিয়ো ভিতরে কোন গোলমাল হলেও দরজা খুলবে না- এ আমার আদেশ।"

গুরুভক্ত শিষ্যগণ -'আজ্ঞা শিরোধার্য' বলে নদীর তীরে সিন্দুকের অপেক্ষা করতে শুর করেছিল।

এদিকে এক রাজপুত্র শিকারে বেরিয়েছিল। শিকার করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে নদীর তীরে বসে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সে নদীতে সিন্দুকটিকে ভেসে যেতে দেখেছিল। কৌতুহলবশতঃ সে তার সেপাইদের সিন্দুকটিকে নদী থেকে তুলে আনতে আদেশ করেছিল। তারা সিন্দুকটি বাইরে নিয়ে এসেছিল, সিন্দুক খোলার সঙ্গে-সঙ্গে অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকন্যা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল রাজপুত্র এসব দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল, সে কন্যার পরিচয় জানার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। রাজকন্যা তাকে নিজের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছিল। সবশুনে রাজপুত্র তাকে প্রশ্ন করেছিল যে, এখন তুমি কোথায় যাবে? প্রত্যুত্তরে সে বলেছিল,'' বাড়ি থেকে বার করে দেবার পর এখন আর আমার আপনার বলে কে-ই বা রইল? এখন তো সংসারে আমার একমাত্র আশ্রয় আপনি।" কন্যার সমর্পণ মনোভাব লক্ষ্য করে রাজপুত্র জঙ্গলেই তার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী বিবাহ করেছিল। শিকারে যে ভালুককে বন্দী করা হয়েছিল সেটাকে সিন্দুকে আটকে নদীতে প্রবাহিত করে স্ত্রীর সঙ্গে সে নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিল।

সেই সিন্দুক যখন পাঠশালার কাছ দিয়ে ভাসতে-ভাসতে যাচ্ছিল, তখন শিষ্যরা নদী থেকে বার করে গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী সেটাকে কুঠুরীর ভিতর রেখে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিয়েছিল। সেই কুঠুরীর ভিতর আগে থেকেই গুরুমশাই লুকিয়েছিলেন। যেমনি ব্যগ্র পণ্ডিতমশাই সিন্দুক খুলেছিলেন, তেমনি ক্ষুধার্ত, বিরক্ত ভালুকটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পন্ডিতমশাই মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, শিষ্যদের দরজা খুলে দিতে আদেশ করেছিলেন, কিন্তু গুরুভক্ত শিষ্যরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

ক্রমশঃ পন্ডিতমশাইয়ের স্বর ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। পালাবার চেষ্টা করছিলেন যখন, তখন তিনি একটি খড়িমাটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। শিষ্যদের উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নপ্রদত্ত শ্লোকটি দেওয়ালে লিখেছিলেন-

মম ইচ্ছা দৈব নাস্তি, দৈব ইচ্ছা পরবলম্।
রাজদ্বারে রাজকন্যা, বিপ্র ভালূ ভচ্ছতম্।।

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল সেই কন্যাকে বরণ করার, কিন্তু দৈবের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। ভাগ্যই বেশী জোরালো। হস্তরেখা অনুসারে নিশ্চয় কন্যা রাজরানী

হয়ে কোন রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেছে কিন্তু আমাকে (বিপ্রকে)ভালুকে ভক্ষণ করেছে। ভাবীই ভালুক। (ভাবী, ভবিতব্য, দৈব,সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ভাগ্য, ললাট- রেখা প্রায় সমার্থক শব্দ এবং একটি অন্যটির পর্যায়ভুক্ত।)

এটিকেই কবীর দাসজী ব্যক্ত করেছেন-

করম গতি টারে নাহিঁ টরী।
মুনি বশিষ্ঠ সে পন্ডিত জ্ঞানী, শোধি কে লগন ধরী।
সীতা হরন, মরন দসরথ কো, বন মে, বিপতি পরী।।

ভাবী অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যিনি ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকেন তাঁর উপর দৈবের কোন প্রভাব পড়ে না '**ভাবিহু মেটি সকহিঁ ত্রিপুরারী**' কিন্ত কখন? '**জৌঁ তপু করৈ কুমারি তুমহারি।' (মানস, ১।৬৯।৫)** যখন পথিকের বুদ্ধি তপস্যাতে অনুরক্ত হয়। প্রেমই পার্বতী। যখন এই কুমারীই (বুদ্ধি) তপস্যা, চিন্তন, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ভাগ্যের অসাধ্য কুঅঙ্ক মুছে ফেলা যেতে পারে-'**মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে।' (মানস, ১।৩১।৯)**

—::১২::—

যখনই সাধন-পরায়ণ পথিকের মধ্যে দূর্বলতা দেখতে পেতেন এবং সেই দূর্বলতা দূর না করে সাধক জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করতেন অথবা কোন পুরুষকে অনাধিকার চেষ্টাতে ব্যস্ত দেখতেন, যা পতনের মূল কারণ, তখন মহারাজজী নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বোধিত করে বলতেন-"হো... নাম তো আঁধিয়ারী বারী, হোম করে কে পল্লব নাহী।" আরে একে কেউ তো বোঝাও যে, প্রকৃতির অনন্ত স্তর রয়েছে। বাছা খুব সাবধানে এই পথে চলতে হয়, তা না হলে-

ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া
বিঘ্ন অনেক করই তব মায়া।। *(৭/১১৭/৮)*

বন্ধন ছিন্ন হবার সময়, মায়া অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। ঋদ্ধি প্রদান করে; এমনকি সাধককে সিদ্ধপুরুষে পরিণত করে যাতে সাধক পুনরায় মায়ার রাজ্যে ফিরে আসে সেই চেষ্টাই করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে অনুক্ষণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস দেখার কাজে মনকে নিযুক্ত রাখা উচিৎ। মন কোথাও না কোথাও ব্যস্ত থাকবেই। ভজনা থেকে ছুটি নিলে মায়ার রাজ্যে বিচরণ করবে। বলা যায় না তখন কোন্ রূপে সম্মুখে উপস্থিত হবে। সেইজন্য একে সদৈব ভয় পাওয়া উচিৎ। এইরূপ উত্থান-পতনের অবস্থাতে সাধক নির্ণয় করে উঠতে পারে না কোনটা

সত্য- অসত্য ? সেই অবস্থাতে ভরসা একটাই, কায়মনোবাক্যে ইষ্টের আদেশ পালন করে যাওয়া। এইরূপ পথিকের জন্য আজ্ঞা পালনই ভজনা। আজ্ঞা পালনে ত্রুটি না রাখলে শীঘ্র লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। এই যোগের জাগৃতির পরই সাধক নিমিত্ত মাত্র হয়ে যায়। ভজনা ভগবান করান এই প্রকার শ্রী মহারাজজী সাধনার নিগূঢ় রহস্যগুলি এত সহজ কথায় ব্যক্ত করতেন যে, সৎসঙ্গে উপস্থিত সাধারণ ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতেন।

—::১৩::—

যখন কোন সাধক পূজ্য মহারাজজীর নির্দেশ এবং অন্তর্যামীর আদেশ অমান্য করে, স্বেচ্ছাচারের চেষ্টা করতেন, তখন মহারাজজী তার ভুল এবং চালচলন সম্বন্ধে জানিয়ে বলতেন- "একে দেখো মেয়েমানুষদের মাঝে বসে জ্ঞানের কথা বলে। আরে ! সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা থাকে, এক ইঞ্চিও ভগবান থেকে দূরে থাকলে মায়া সফল হতে পারে।"

তাঁর কথা শুনে কোন -কোন সাধক চাপা স্বরে বলে উঠতেন-" কিন্তু মহারাজজী, মনে কোন কুভাবও তো নেই ?" তখন তিনি ধমক দিয়ে বলতেন-গোঁয়ার কোথাকার। বাছা,

হম জানী মন মর গয়া, মরা হো গয়া ভূত।
মরনে পর ভী আ লড়া, অইসা মনা কপূত।।

মনকে যে মাঝে-মাঝে শান্ত বলে মনে হয়, সেটা কিন্তু তার বাস্তবিক স্বরূপ নয়। এরূপ ঘটা তো তখনই সম্ভব, যখন ভগবান স্বয়ং প্রমাণপত্র দেবেন। যতক্ষণ মনের পরিবর্তে ভগবান সাধককে পরিচালনা করছেন না, ততক্ষণ মন নাশ হয়েছে একথা ভাবাই উচিৎ নয়।

"গুরু কে বচনো মে গুঞ্জাইশ, কলিযুগ কী তিকড়মবাজী।"

অর্থাৎ গুরু বাক্যে সন্দেহ কলিযুগের প্রভাবেই ঘটে। তারপর হেসে উদাহরণস্বরূপ একটি কাহিনী প্রস্তুত করতেন যে, ঘন জঙ্গলে একটা আশ্রম ছিল। সেখানে এক মহাপুরুষের সংরক্ষণে কয়েকজন শিষ্য সাধন ভজনে রত ছিল। এক শিষ্যের মনে প্রবল বৈরাগ্য জেগেছিল। নির্দ্বন্দ্ব বিচরণ এবং তীর্থদর্শনের কামনা জেগেছিল। কিছুদিন ধরেই সে নিরন্তর গুরুদেবের কাছে তীর্থদর্শন করতে যাবার অনুমতি চাইছিল। তীব্র বৈরাগ্য রক্ষার জন্য উন্মুক্ত বিচরণের অনুমতি প্রদান করুন বার-বার এই প্রার্থনাই সে করে যাচ্ছিল; কিন্তু তার গুরুদেব বলেছিলেন যে, "না

বৎস, এখনো তোমার মধ্যে সে ক্ষমতা আসেনি, এখন তো তুমি আমার সংরক্ষণে রয়েছ, বাইরে বেরুলে না জানি কি দুর্গতি হবে। অতএব এখন তো অহর্নিশ সাধনাতেই সংলগ্ন থাকো। সেই সময়টা আসতে এখন দেরী আছে।" কিন্তু দু'চার দিন পর শিষ্যটি পুনরায় বলেছিল যে, মহারাজ এখন তো ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে।

সেই মহাপুরুষ তখন কিঞ্চিত অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন- দেখো, মায়া খুবই দুর্ধর্ষ। যেতে যখন চাইছই যাও; কিন্তু একটা কথা সবসময় মনে রেখো" গুরু বাক্যে সংশয়, কলিযুগের প্রভাবে ঘটে।" শিষ্যটি বলেছিল -'যে আজ্ঞা' এবং প্রণাম করে সহর্ষে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছুদূর যাবার পর সে চিন্তা করতে শুরু করেছিল যে, মহারাজজীর এরূপ বলার উদ্দেশ্য কি? বুঝতে না পেরে সে আশ্রমে ফিরে এসেছিল এবং মহারাজজীকে প্রণাম করে তাঁর কথার আশয় কি জিজ্ঞাসা করেছিল। মহারাজজী বলেছিলেন- যখন শিষ্য গুরুর আদেশে পরিবর্তন করে, তখন সেই কলিযুগ প্রভাবশালী হয়ে যায় এবং সাধকের পতন হয়। শিষ্যটি করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মহারাজ! আমার জন্য কি আদেশ? তখন মহারাজ বলেছিলেন যে, নারীজাতি থেকে দূরে থাকবে। তাদের দূর থেকেই প্রণাম করে সদৈব সাবধানে থাকবে। দ্বিতীয় আদেশ এই যে, কোথাও নিজের অথবা গুরুদেবের নাম প্রচারের জন্য আশ্রম, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ কার্যে নিজেকে যুক্ত করবে না। গুরুদেবের নাম তো তোমার কর্ম এবং গুরুত্ব লাভ হওয়ার পরেই হবে। তোমার রূপে গুরু প্রকাশিত হবেন যখন এবং যখন তুমি তাঁতে বিলীন হয়ে যাবে, সেটাই হবে উপলব্ধির ক্ষণ। শেষ সাবধান বাণী হল যে, সিদ্ধপুরুষ হওয়ার চেষ্টা করবে না। এই সিদ্ধাইও মায়াই প্রদান করে। আগে সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে উপলব্ধি কর তাঁকে উপলব্ধি করাটাই হল পরম সিদ্ধি লাভ করা। তারপর পথে যা কিছু সিদ্ধাই সাধককে বরণ করে তা বাধা দিতে পারে না। এটাই কলিযুগের প্রভাব এর থেকে সাবধানে থেকো, নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে এবং আমার উপদেশে একটুও হেরফের করবে না এই আমার আদেশ।

সাধক খুব প্রসন্ন হয়ে প্রণাম করে বলেছিল যে,মহারাজজী আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে চিন্তা করছিল যে,গুরুদেবের উপদেশ মেনে চলা তো খুব সহজ। বিচরণ করতে-করতে শিষ্যটি একটি পাহাড়ের উপর আসন পেতে বসেছিল। খবরটি আশেপাশে চাউর হতে দেরী লাগেনি যে, পাহাড়ে একজন উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষ দিবারাত্রি ভজনাতে সংলগ্ন থাকেন, তিনি

যুক্তিযুক্ত তথ্যপূর্ণ কথা বলেন। ধীরে - ধীরে সেখানে ভীড় হতে শুরু করে। সেই ভীড়ে সাধনা- পিপাসা নিয়ে এক নবযুবতীও পৌঁছেছিল। সে বলেছিল যে মহারাজ! আমি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে অনেক ঘুরেছি, আজকে আপনাকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে। এখন কৃপা করে গুরুমন্ত্র প্রদান করুন, যাতে সংসার -সাগর থেকে আমিও উদ্ধার হতে পারি।

মহাপুরুষদের মন সরল হয়ই; সে সাধনা পদ্ধতি অবগত করিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছিল। সঙ্গে এও জানিয়ে দিয়েছিল যে, এখানে কুটীরে রাত্রিতে কারও থাকার অনুমতি নেই; কারণ ভজনাতে ব্যবধান উৎপন্ন হয়। প্রথম দিন মেয়েটি ফিরে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিন সকালবেলা আবার গিয়ে হাজির হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা মহাত্মা তাকে পুনরায় ঘরে ফিরে যাবার জন্য বলেছিল, তখন সে বলেছিল যে, দু- একদিন গুরু চরণের সান্নিধ্য তো লাভ হোক। আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করে এবং চরণামৃত পান করে জীবনটা সার্থক তো করতে দিন। এইপ্রকার প্রার্থনা করতে-করতে এক একটা দিন পার হচ্ছিল ক্রমে একদিন আশ্রমে থাকার অনুমতিও সে হাসিল করে নিয়েছিল।

সঙ্গদোষের প্রভাবে যা ঘটে। ধীরে-ধীরে তাদের দুচারটি সন্তানও হয়েছিল। আগে ভক্তরা শ্রদ্ধা করত কিন্তু যখন সে পতিত হয়েছিল, তখন আর তাকে কেউ একটুও গ্রাহ্য করত না। আগে কোন অভাব ছিল না। কিন্তু পরে ভিক্ষা করার পরও পর্যাপ্ত জোগাড় হচ্ছিল না। লোকে তো যা-তা বলতই, কিন্তু সেই যুবতীটিও কথা শোনাতে ছাড়ত না একদিন বলেছিল - যখন ভিক্ষা করতে যাবেই, ছোট বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিচ্ছ না কেন? ওটুকু ছেলে হাঁটতে পারছে না। আগে জন্ম দেবার সময় একথা মনে ছিল না।

স্ত্রীর এই-রূপ দেখে সাধু মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিল। ভাবতে শুরু করে ছিল যে, কোথায় আমি অত উচ্চস্তরের মহাপুরুষের সেবা করছিলাম আর আজ আমার এই দুর্দশা হয়েছে।গুরুদেব বারণও করেছিলেন কিন্তু মনের তরঙ্গগুলি তাঁর কথা শুনতে দেয়নি। দুঃখের সেই সময় আকাশবাণী হয়ে ছিল-"গুরুর বাক্যে সংশয়, কলিযুগের প্রভাবে ঘটে। বাছা! বার-বার বারণ করা সত্ত্বেও শোনো নি। ঠিক আছে এখন থেকে সাবধানে থেকো।" সাধক সাহসী ছিল, স্ত্রী এবং পুত্রদের ত্যাগ করে অজানা জায়গায় গিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছিল যে, পুনরায় গুরু দেবের কাছে যাব কোনমুখে? অতএব তপস্যা পূর্ণ করেই তাঁর শরণে যাব। এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয়

করে নদীর তীরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিল।

কিছুদিন ব্যতীত হবার পরই চতুর্দিকে তারই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, অমুক মহাপুরুষ খুবই উচ্চ স্তরের, দিবা রাত্রি ভজনাতেই রত থাকেন। পুনরায় ভক্তরা তাকে ঘিরে ধরেছিল। সৎ ব্যক্তি নিয়মিত তার কাছে যাতায়াত শুরু করেছিল। সেখানেই তৎপরতার সঙ্গে বারো বছর সাধনা করেছিল। অন্তরে শক্তি ও সম্বল খুঁজে পেয়েছিল। ভক্তরা আগ্রহ করলেও সেখানে তার জন্য কোন ভবন নির্মাণ করার অনুমতি দেয়নি। পর্ণ কুটিরেই থাকত সে।

একদিন নিত্যকর্ম সারতে সাধুটি তার কুটীর থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ে গিয়েছিল। সম্মুখে হঠাৎ একটা বিস্তীর্ণ শিলাভূমি স্বর্ণের সদৃশ ঝক্‌মক্ করে উঠেছিল। সে স্পর্শ করে দেখেছিল বিশুদ্ধ সোনা ছিল। শৌচের পরও মনে সেই স্বর্ণ শিলা ভাসছিল। সে বিচার করেছিল যে, জঙ্গলে এই শিলার প্রয়োজন কি? যদি এখানে আশ্রম, ধর্মশালা, পাঠশালা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়, তবে গুরু মহারাজজীর খ্যাতিই ছড়িয়ে পড়বে। আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো গুরু মহারাজজীর জন্য এসব করতে চাইছি। এইরূপ বিচার করে সে নিয়মিত যে বৃদ্ধভক্তরা আসত, তাদের কাছে নিজের মনের কথা প্রকাশ করে বলেছিল যে, এখানে আশ্রম, ধর্মশালা, কূপ, পাঠশালা ইত্যাদির নির্মাণ হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপকার হয়ে যাবে। তার কথা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বলে উঠেছিল যে, মহারাজ আপনিই তো কখনও অনুমতি দেননি। এটা তো আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আজ আপনি আদেশ দিয়েছেন অতএব এখন আমরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে নিই, কাল থেকেই নির্মাণ কার্য শুরু হবে।

মহাত্মা বলেছিল যে, না, চাঁদার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মিস্ত্রীরা কাজ করবে, গ্রামের সকলেই সাধ্যমত সহযোগিতা করবে, ঈশ্বরই সকলকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন। পরের দিনই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। শত-শত ব্যক্তি মাপজোক করে ভিত -পত্তনে ব্যস্ত হয়েছিল। বিকেলে সেই মহাত্মা শৌচের পর একটি স্বর্ণখন্ড সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ডেকে স্বর্ণ খন্ডটি তাদের হাতে দিয়ে বলেছিল যে, এটি বিক্রী করে সকলকে পারিশ্রমিক দিয়ে দেবে এবং অন্যান্য কারিগরদেরও আমন্ত্রণ দিয়ো। কারিগরদের ভীড় সহস্রাধিকেরও বেশী পৌঁছেছিল। মহাত্মা সেই অনুপাতেই স্বর্ণখন্ড এনে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দিতে থাকে, যা বৃদ্ধ ভক্তরা কারিগরদের মধ্যে বিতরিত করে দিত। সকলেই আশ্চর্যান্বিত হতেন

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে তীব্র কৌতুহল উৎপন্ন হয়েছিল যে, মহারাজ এই পরিমাণে স্বর্ণ কোত্থেকে সংগ্রহ করেন ? এই প্রক্রিয়া জানা থাকলে আমরাও নিজেদের সুব্যবস্থিত করে নিতাম। নাতি- নাতনিদের বিবাহ সহজেই সম্পন্ন হত। নিজেদের মধ্যে বিচার-বিমর্শ করে তারা মহারাজজীর কাছে গিয়ে নিবেদন করেছিল যে, আপনি প্রতিদিন কষ্ট করে সোনা নিয়ে আসেন কিন্তু এই কাজ তো আমরাও করতে পারি আপনি কি আমাদের অবিশ্বাস করেন? আপনি তো পূর্বে স্পর্শও করতেন না; আপনার এই কর্ম শোভা পায় না। আপনি শুধু স্থান কোথায় এটুকু বলে দিন এবং আসনে বসে থাকুন। আপনার আদেশ অনুসারে আমরা বিতরণ করতে থাকব। যখন সকলেই পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেছিল তখন সে বিচার করেছিল যে, এরা ঠিকই তো বলছে। আর স্বর্ণের আমার প্রয়োজনই বা কি। যদি এরাই সব ব্যবস্থা করে নেয় তবে তো আরও ভালো হয়। এদের সকলকে সেই স্থান দেখিয়ে দেওয়া যাক তাহলে। এইরূপ নিশ্চয় করে তাদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে গিয়েছিল। স্বর্ণ শিলা খন্ড দেখিয়ে বলেছিল, এখান থেকে স্বর্ণ নিয়ে বিতরণ করবে।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ইপ্সিত বস্তু তাদের চোখের সামনেই ছিল। তারা পরস্পর সঙ্কেত করে মহাত্মাকে জাপটে ধরেছিল। কাছেই একটি গাছে বাঁধতে শুরু করেছিল। মহাত্মা তাদের কান্ড দেখে বলে উঠেছিল যে, আরে! তোমাদের মাথা খারাপ হল নাকি? পাগল তো হওনি। তোমাদের স্বর্ণের প্রয়োজন ছিল তো নিয়ে যাও। আমাকে শুধু-শুধু বাঁধছো কেন? তোমরা জানই তো যে ধনের আমার কোনও প্রয়োজন নেই। এটা তো লোকহিতে আমি ব্যয় করছিলাম। কিন্তু লোভী এবং বিবেক শূণ্য বৃদ্ধগণ তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে গাছে বেঁধে নিশ্চিন্ত মনে স্বর্ণ শিলাখন্ডর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একি, বৃদ্ধগণের স্পর্শমাত্র সেই স্বর্ণ শিলা এবড়ো-খেবড়ো প্রস্তরে পরিণত হয়েছিল। বৃদ্ধ ভক্তগণ উদাস হয়ে উঠেছিল। তারা চিন্তা করতে শুরু করেছিল যে, কোথায় তো সাতপুরুষকে সুব্যবস্থিত করার কথা ভাবছিলাম, পুত্র কন্যার বিবাহের কথা ভাবছিলাম কিন্তু এখন তো মহারাজের সেবা করার অধিকার এবং তাঁর বিশ্বাসও হারালাম। সকলে মিলে পরামর্শ করেছিল যে, এখন যদি মহারাজকে বাঁধনমুক্ত করেও দিই, তবুও কোন প্রয়োজন মিটবে না অতএব দুর্নামের ভয়ে মহারাজের বাঁধনমুক্ত করার আগ্রহও অমান্য করে তারা সে-স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

তিন- চারদিন সেই ভাবে বদ্ধ থাকা কালীন মহারাজের মনে পুনরায় মহাদুঃখ

উৎপন্ন হয়েছিল। শিষ্যটি ভেবেছিল যে, কোথায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম কাল পর্যন্ত সকলে সঙ্কেত মাত্র কাজে প্রবৃত্ত হত কিন্তু আজ কাছে পিঠে কেউ নেই। সেই সময় গুরুদেবের সতর্কবাণী তার মনে পড়েছিল, "গুরু বাক্যে সংশয়, কলির প্রভাবে ঘটে। বাছা! চিন্তনে রত পুরুষের লোককীর্তি, আশ্রম,কুটীর নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে নিজেকে জড়ানো উচিত নয়, যেমন-তেমন ভাবে দিন কাটানো উচিৎ। যথা লাভ-এ সন্তুষ্ট হয়ে বৈরাগ্য রক্ষা করা উচিৎ। বার-বার বারণ করা সত্ত্বেও কথা শোনোনি। এখন তো বৎস! তুমি পতিত হয়েছ।"

শিষ্যটি এসব চিন্তা করছিলই, ঠিক সেই সময় আরাধ্যের প্রেরণাতে রাখাল বালকেরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল মহাত্মাজীকে বদ্ধ দেখে তারা বাঁধনমুক্ত করেছিল তাকে, তাদের বহু জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে কোন কথা বলেনি। মৌন অবলম্বন করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। নির্জনে গিয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। গুরুদেবের কাছে কোন মুখে যাব এসব কথাই ভাবছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল এবার ভজন সম্পূর্ণ করে কিছু অর্জন করেই তাঁর কাছ ফিরব। এবার সে জনকোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থান তপস্যার জন্য বেছে নিয়েছিল, খুবই সর্তক এবং নিষ্ঠা পূর্বক যোগ- প্রক্রিয়াতে রত হয়েছিল। এই ভাবে বারো বছর কেটে গিয়েছিল। ভজনাতে সন্তুষ্টি লাভ করে সে গুরু ধামের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছিল।

গুরুদেবের আশ্রম থেকে দশ-বারো মাইল দূরেই ছিল সাধক এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। সাধক পাশেই এক গ্রামের বাইরে পুকুরের কাছে ভজনাতে বসে রাত্রি পার করেছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক ব্যক্তি পায়ে চলা পথ দিয়ে যেতে-যেতে তাকে দেখতে পেয়েছিল। দূর থেকেই প্রণাম করে নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধক থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসেছিল যে; কি বিপদ হয়েছে তোমার যে এভাবে ছুটে যাচ্ছ? সেই ব্যক্তি তার প্রশ্ন শুনে তার কাছে গিয়ে বলেছিল "মহারাজজী! একমাত্র ছেলের না জানি কি ব্যাধি হয়েছে সব কবিরাজ, ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। সবদিক থেকে হতাশ হয়ে এক কবিরাজের কাছে যাচ্ছি। সম্ভবতঃ ঈশ্বর তাঁকেই যশ দিতে চাইছেন।

সাধক একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল। তার তপোবলের কথা মনে পড়েছিল। হেঁচকা টান দিয়ে জননেন্দ্রিয়ের কাছ থেকে একটা চুল ছিঁড়ে বলেছিল "এটা মাদুলিতে দিয়ে ছেলেকে পরিয়ে দিয়ো। দেখ, তারপর কি হয়?" সেই ব্যক্তিটি পেশাতে

স্বর্ণকার ছিল, একটি মাদুলি তৈরী করে ছেলেকে পরিয়ে দিয়েছিল। ক্রমে ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। স্বর্ণকারের পরিবার এবং আরও যত আত্মীয় স্বজন ছিল তারা পর-পর মহাত্মার কাছে গিয়ে তাকে দুধ,দই, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিবেদন করছিল। জমিদারমশাইও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। স্বর্ণকারের পরিবারের সকলের পুকুরের দিকে যাওয়া আসা তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন।

স্বর্ণকারকে পথে দেখতে পেয়ে জমিদারমশাই তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘‘আরে সুখুআ! তুমি এবং তোমার পরিবারের সকলে এদিকে পুকুরের দিকে বার-বার যাচ্ছ কোথায়? তোমার ছেলের অবস্থা কেমন? তখন সে বলেছিল, হুজুর! সে তো সেরে উঠেছে। ” জমিদার মশাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কার ঔষুধ খেয়ে? কি করে সেরে উঠল? স্বর্ণকার বলেছিল, ‘‘হুজুর কারও ঔষুধে কাজ হয়নি। হ্যাঁ, একজন মহাত্মা এই পুকুরের ধারে এসেছেন। তাঁরই আশীর্বাদে ঠিক হয়েছে। মহাত্মা তো নন সাক্ষাৎ ভগবান।”

গ্রামে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। জমিদার এবং গ্রামের ছোট -বড় সকলে পুকুরের ধারে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কেউ কন্যার বিবাহের জন্য প্রার্থনা করেছিল, কেউ জন্মজাত রোগী, কেউ বা পাগল , কেউ নির্ধনতার জন্য ব্যাকুল ছিল-এইরূপ সমস্যা নিয়ে সকলেই আসছিল। জগতে সকলেই দুঃখী। প্রতিটি গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত ছিল। অতএব সমস্যার পাহাড় জমেছিল। মহাত্মা সেখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করতেই সকলে তার চরণে লুটিয়ে পড়ছিল। তখন সেখানেই আসনে স্থির হয়ে বসে সে সকলকে সম্বোধন করে বলেছিল- দেখ আমি কিছু জানি না, শুধু-শুধু আমার কাছে আসছ। কিন্তু সকলেই হাতে নাতে প্রমাণ যে পেয়েছিল। তারা সকলে মিলে মহাত্মাকেই বলেছিল, আপনি মহাপুরুষ তাই নিজেকে লুকোচ্ছেন। মহাপুরুষগণ নিজের আসল পরিচয় গোপন করেনেই।

ধীরে-ধীরে বেলা পড়ে আসাতে, সকলেই বাড়ির কথা, পশুদের খোঁয়াড়ে রাখার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। সকলেই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল। জমিদার মশাই স্বর্ণকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘‘কিরে সুখুআ! এটা তো বল তোর ছেলেকে সারাবার জন্য মহারাজ কি দিয়েছিলেন? তখন সে বলেছিল,‘‘ মালিক! আমি কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যাবার সময় মহারাজকে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি যখন ডাকলেন তখন ভাবলাম ছেলেটার হয়ে এসেছে, যাই এঁর কাছে এঁর আশীর্বাদেই যদি সে সুস্থ হয়ে উঠে। যখন আমি তাড়াতাড়ি প্রণাম করে যাবার জন্য উঠেছিলাম তখন ইনি

জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এত-ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ? তখন আমি ছেলের দয়নীয় দশা সম্বন্ধে বলেছিলাম ইনি তখন জননেন্দ্রিয়ের পাশ থেকে একটা চুল তুলে সেটাকে মাদুলিতে দিয়ে ধারণ করতে বলেছিলেন, এরূপ করাতে ছেলেটা সেরে ওঠে।"

তার কথা শুনে জমিদারমশাই বলেছিলেন যে, মহারাজজীকে কেন বিরক্ত করছ, যখন এঁর চুলের এত গুণ, তখন প্রার্থনা করে এঁর শরীরের সমস্ত চুল কেন কেটে নিচ্ছ না। চুল তো নির্জীব বস্তু। কখনও তো কেটেও ফেলা হয়, নাপিতকে ডেকে সব কেটে নিতে বল, আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেব মহারাজকে শুধু-শুধু আটকে কেন রাখব।

জমিদারের কথা শুনে গ্রামের নাপিত এক ছুটে ঘরে গিয়েছিল ক্ষুর তো ঘরেই রাখা ছিল। মহাত্মার পাশেই অত্যন্ত গরীব, আর্ত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। সে ভাবছিল যে, বড় লোকেদের ব্যাপার এটা, কি জানি তার ভাগে একটা চুলও জুটবে কিনা। যদি চুল না পাই তাহলে গোটা জীবন দুঃখীই থেকে যাব। অধীর হয়ে এসব ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সে তাড়াতাড়ি মহাত্মার চুল ছিঁড়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়েছিল। তারপর আর কে অপেক্ষা করত। একে-একে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহারাজজীর শরীরে একটা লোমও থাকতে দেয়নি কেউ। নাপিত কিছুক্ষণ পর পৌঁছেছিল। যেটুকু বাকী ছিল সেটা সে কামিয়ে নিয়েছিল। বস্তু ফুরিয়ে যাবার পর মহাত্মারই বা প্রয়োজন কিসের? অতএব তাকে সেখানেই ফেলে সকলে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

পুকুরের ধারে একা পড়ে-পড়ে সাধু বিলাপ করতে শুরু করেছিল এবং বার-বার গুরুদেবকে স্মরণ করছিল। পুনরায় আকাশবাণী হয়েছিল।"গুরু বাক্যে অবিশ্বাস কলিযুগের প্রভাবে ঘটে। বৎস! তুমি আবার পতিত হলে" সাধুর মনে এবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আমার দ্বারা কিছু হবার নয়। দেরী না করে গুরুর আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল অশ্রুমোচন করতে-করতে গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। গুরুদেব তাকে বলেছিলেন "কেন বৎস! ভ্রমণের ইচ্ছা আর নেই? বৎস তুমি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে ভ্রষ্ট হয়েছ। গুরুদেব সেই সাধকের দয়নীয় দশা দেখে করুণা করে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজেও অসংখ্য অনুভবের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিলেন, সেগুলির সাহায্যে তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন "বাছা! ভগবানের আজ্ঞা পালন করাটাই হল ভজন। ভজন তো স্বয়ং

ভগবান করিয়ে নেন। সাধককে তো নিমিত্ত মাত্র হয়ে দাঁড়ানো উচিৎ। তুমি নিজের কল্পিত ক্ষমতার সাহায্যে বৈরাগ্য এবং তীর্থাটনের সঙ্কল্প করেছিলে এবং সেই কারণে পথ থেকে বিচলিত হয়েছ। যতক্ষণ ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ সাধককে স্বেচ্ছায় কোন নির্ণয় নেওয়া উচিৎ নয়, কোন মহাপুরুষের শরণাগত হয়ে তাঁর আদেশ সর্বতোভাবে পালন করা উচিৎ। সাধকের জন্য এটাই ভজন।"

—::১৪::—

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ নিজের ইচ্ছা শক্তির জোরে কর্মফল ভোগে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এই রূপ আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিলেন কাকভুশুন্ডিজীও । ভগবান যখন আপন করে নেন তখন কোন ইচ্ছা হওয়া মাত্র সেটা ইচ্ছাশক্তি রূপে কাজ করতে শুরু করে- **'জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ, হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ।।'** ***(মানস, ৩/১১৩/৪)*** 'মহারাজজী এই সন্দর্ভেই দু'ভাইয়ের একটি কাহিনী শোনাতেন, যা এইপ্রকার-দু'ভাই ছিল। এক ভাই নিত্য এক তত্ত্বদর্শী মহাত্মার কাছে যাতায়াত করত। তাঁর সেবা করত। দ্বিতীয় ভাই বিখ্যাত বেশ্যার কাছে প্রতিদিন যেত। সুরাপান করত। তার ভাই তাকে রোজ বোঝাতো, "দেখ! আমরা ভদ্র ঘরের ছেলে। তোমার এরূপ করাটা শোভা পায় না। সৎসঙ্গে আমার সঙ্গে চল। এটাই আমাদের কর্তব্য। **'এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাই।' (মানস, ৭।৪৩।১)** কিন্তু তার উপর এসব কথার কোন প্রভাব পড়ত না।

কিছু কাল পর এক ভাই রাত্রে সৎসঙ্গ থেকে ফিরছিল। ঘন অন্ধকারে তার পা একটা পেরেকে পড়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে সেটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। গোটা পা রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। কোন রকমে সে ঘরে ফিরেছিল। ভোরবেলা তার ভাই বেশ্যার কাছ থেকে ফিরবার সময় পথে বহুমূল্য একটা হার কুড়িয়ে পেয়েছিল। প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরে দেখেছিল যে ভাই, কোঁকাচ্ছে। সে তার পায়ের অবস্থা দেখে বলেছিল, "নাও, আরও সৎসঙ্গে যাও! ফল পেলে? আরে চারদিনের জীবন! ফূর্ত্তি করে নাও। দেখ, আমি লাখ টাকার হার পেয়েছি আজ এবং তোমার পায়ে পেরেক ফুটেছে। সৎসঙ্গ করে কি উপকার হল? টিটনেস হলে মরেও যাবে।" ছোট ভাই বলেছিল- "না! সন্তদর্শন করলে কখনো অনিষ্ট হতে পারে না।" বড়ভাই বলেছিল-"তা তো দেখছি। পা ছড়িয়ে বসে আছো, আবার বলছে অনিষ্ট হতে পারে না।" দুজনে মিলে জ্যোতিষীকে দিয়ে বিচার করাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, একজন হার কেন কুড়িয়ে পেল এবং আর একজনের পায়ে পেরেক ফুটল কেন?

দু'জনই নিজের-নিজের কুষ্ঠি নিয়ে একজন নাম করা জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিল। ভালো জ্যোতিষী বলে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। কুষ্ঠি দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন-"এই কুষ্ঠি যার সে তো আজ ভোরে মারা গেছে। সকাল-সকাল এমন কুষ্ঠি কেন নিয়ে এসেছ?" দুজনেই বলেছিল-"মহারাজ! এই কুষ্ঠিটাও একটু দেখুন।" জ্যোতিষী বড় ভাইয়ের কুষ্ঠি দেখে বলেছিলেন-"বিলক্ষণ কুষ্ঠি। এত শুভ কুষ্ঠি তো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই কুষ্ঠি যার, তার তো আজ রাজা হওয়ার কথা। সেই ভাগ্যবানের সঙ্গে আমি এখনই দেখা করতে চাই।" কে সে। জ্যোতিষী ভেবেছিলেন, রাজা হওয়ার পূর্বেই তার সঙ্গে দেখা করে নিলে প্রভাব পড়বে ভাল, সর্বদা সম্মান পাওয়া যাবে।

দুভাই তাঁকে নিরস্ত করে বলেছিল কুষ্ঠি দুটো আমাদেরই। জ্যোতিষী বলেছিলেন-"এরূপ হওয়া কি করে সম্ভব। জ্যোতিষী বিদ্যা ভুল হতে পারে না। তুমি এখনও জীবিত এ কি করে সম্ভব? বল তোমরা কি কাজ কর? " ছোট ভাই বলেছিল, "আমি নিত্য মহাত্মার সেবা করি, তাঁর বাণী শ্রবণ করি, উপদেশানুসারে চলার চেষ্টাও করি চিন্তনের জন্যও সময় দিই।" জ্যোতিষী মশাই মাথা নেড়ে বড়ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"তুমি কি কর?" সে বলেছিল-"আমি সুরাপান করি, বেশ্যাগমন করি। ছোট ভাই রোজ তাই আমার সঙ্গে কলহ করে।"

জ্যোতিষী তাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি ভুল করছ। কুষ্ঠি অনুসারে তোমার ভাইয়ের আজ মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মহাপুরুষের দর্শন, সৎসঙ্গ, সেবার প্রভাবে এর পায়ে শুধু পেরেক ফুটেছে। এর আয়ুতে বৃদ্ধি হয়েছে। এদিকে তোমার আজ রাজা হওয়ার কথা কিন্তু কুকৃত্যের ফলস্বরূপ পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। এক দু'লাখ টাকার হার পেয়েছ শুধু। দু'চার মাসের মধ্যে সেটাও উড়িয়ে দেবে। তারপর পুণ্য বাকী থাকবে না এবং পুরুষার্থ তো করইনি। তখন কি হবে ভেবে দেখ। সেইদিন থেকে বড়ভাইও সৎসঙ্গে যেতে শুরু করে। এবং সে তার সমস্ত বদঅভ্যাস ত্যাগ করে।

বস্তুতঃ মানুষ কর্মের রচয়িতা । চুরাশি লক্ষ যোনি তো শুধু ভোগ যোনি। মানব দেহে ভাল-মন্দ যেরূপ কর্ম করা হয় সেই অনুসারে ভবিষ্যৎ জন্মগুলি নির্ধারিত হয়। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা যে কার্য করতে-করতে জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করে, সেই অনুসারে উত্তম অথবা অধম যোনিতে জন্মলাভ করে। **"কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্য লোকে" (১৫/২,গীতা)** মনুষ্য দেহই

কর্মানুসারে শুভ অথবা অশুভ বন্ধন তৈরী করে। শুভ কর্ম করলে হাতে শুভরেখা ফুটে উঠবে, অশুভ কর্ম করলে শুভ রেখাগুলি মিলিয়ে যাবে এবং অশুভ গুলিই শুধু বাকী থাকবে। শুধু মনুষ্য যোনিতেই কর্মের সৃজন হয়। মনুষ্য দেহে সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগের জন্য অন্যান্য-যোনিতে জন্মলাভ হয়। লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে বাঘ জঙ্গলে বাস করত। শক্তিশালী জীব সম্মুখে দেখে পালিয়ে আত্মরক্ষা করত এবং দুর্বল প্রাণীকে চিরে উদরস্থ করত। বর্তমানেও তাদের স্বভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি। তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতিতে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু মানুষ উন্নতি করেই চলেছে। পূর্বে মানুষ পাথরকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত কিন্ত বর্তমানে ক্ষেপনাস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করছে। অন্তরিক্ষ অভিযানে যাচ্ছে। ভৌতিক আবিষ্কারের পথে না গিয়ে এই মানব-মন যখন ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করেছে তখন মনকে নিরুদ্ধ করে পরমাত্মাকে পর্যন্ত লাভ করতে সফল হয়েছে। মানুষই কর্মের রচয়িতা কর্মের অধীন নয়। অশুভ কর্ম না করে শুভ করে যাওয়াই মানুষের কর্তব্য।

—::১৫::—

গুরু পূর্ণিমার পবিত্র পর্বে প্রায় দশ হাজার মানুষের ভীড় হত অনুসুইয়া আশ্রমে। শত-শত মায়েরা এই পবিত্র দিনটিতে সপরিবারে মহারাজজীর দর্শনের জন্য আশ্রমে পৌঁছাতেন। ঘরে ফেরার সময় অনুমতি চাইতে গিয়ে দু'-একজন মহিলা নিবেদন করতেন যে, মহারাজজী! এখন থেকে আমরা এখানে আপনার সান্নিধ্যে থেকেই ভজনা করব। সংসারে আমাদের আপনজন বলতে কেউ নেই। তাদের কথা শুনে মহারাজজী অন্যান্য ভক্তদের বলতেন-"দেখ এরা কি বলছে? বৈরাগ্য জেগেছে। গোটা বছরে গৃহস্থের কাজে একটুও ফুরসত পাও না তোমরা আর এখানে বৈরাগ্য জেগেছে। মর্কট বৈরাগ্য! আরে আমি যদি এখানে বোন, মা কিম্বা কন্যাকেই থাকার অনুমতি দিই তবুও লোকে কি জানবে যে, মা-বোন। তারা তো এই বলবে যে বাবাজীর আশ্রমে মেয়েমানুষ থাকে। **যদ্যপি শুদ্ধং লোকবিরুদ্ধম্ ন করণীয়ম্।** যদিও এতে দোষের কিছু নেই। তা সত্ত্বেও যা লোক চক্ষুর বিপরীত তা করা উচিৎ নয়। এর ফলে সমাজে ভ্রষ্টাচরণ দেখা দিতে পারে।"

"না! মহারাজজী! আপনি মহাপুরুষ। আপনাকে কেউ কিছু বলবে না। এখানে ভজনাতে সহজেই মন বসে। এখানেই ভজনা করার অনুমতি দিন।" ভক্ত স্ত্রীলোকেদের এইরূপ অনুরোধ শুনে মহারাজজী বলতেন, "হুঁ! চামে কে ধোকরী

কুত্তা রখওয়ার। টাট্‌কা চামড়া রাখা থাকলে, হাজার প্রভুভক্ত কুকুর হোক না সে, নিশ্চয় ছোঁবে। যখনই সুযোগ পাবে, দাঁত বসাবেই। স্বভাব যে। আরে! আমি সাধু। আমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। দু'চারজন আরও রয়েছেন, যাঁদের উপর সঙ্গদোষের প্রভাব পড়বে না, তারা আমারই স্বরূপ; কিন্তু নতুন সাধক যারা, তাদের তো গুণ স্বভাব পুরানো, অনেক দিনের। গুণ-স্বভাব ত্যাগ না করলে পরমানন্দ লাভ হয় না। দশ-বারো বছর পর তো সাধক ঠিক পথে চলতে শেখে তখন বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। এখন তো নতুন সাধকেরা কুমড়োর গুটি অর্থাৎ দুর্বল মনের। সঙ্গদোষে জাত নষ্ট হয়। যাও ফিরে ঘরে থেকেই ভজনা কোরো। মনে মনে সকাল বিকাল যাওয়া আসা করো। কল্যাণ আমি করব। সকাল-সন্ধ্যা আমার রূপ ধ্যান কোরো। যে কোন একটা নাম জপ করবে। আচ্ছা, রাম নামই জপ কোরো। যাও যাদের স্বামী রয়েছেন, তারা স্বামীরও সেবা করবে। এখানে থেকে যা পাবে সেটা আমি ঘরে থেকে ভজনা করলেও দেব।" এই প্রকার সান্ত্বনা দিয়ে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। মহারাজজী প্রায়ই ভক্তদের বলতেন যে, 'ওঁ', 'রাম', 'শিব' দু'আড়াই অক্ষরের যে কোনো একটা নাম নির্বাচন করে নাও। সমস্ত নামের এক আশয়। 'ওম'-এর উপর বেশী জোর দিতেন। বলতেন ''আমার রূপ ধ্যানে দেখবে। শরীরটা যেখানেই থাক। মনটাকে এখানে মাঝে-মাঝে পাঠিয়ে দিও। সকাল-বিকাল যখনই মনে পড়বে তখন-তখন মনকে পাঠিয়ে দিও। যখন আমার রূপ এক মিনিটের জন্যেও হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবে। তখন যার নাম সাধনা, সেই সাধন সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা আমি তোমাকে প্রদান করব। হৃদয়ে প্রেরণা যুগিয়ে তোমাকে ভজনার প্রশস্ত পথে পরিচালন করব। ভগবান পরিচালিত করেন। **''তুলসীদাস (মন) বস হোই তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু বরজৈ।" (বিনয়০ পদ ৮৯)** তুমি এক মিনিট ধ্যান করতে শুরু কর তো। 'ওম' জপ করতে শুরু তো করো।'

—::১৬::—

পূজ্য মহারাজজী বলতেন, ''বাছা! যখন মায়া পরীক্ষা নেয়, তখন বৃদ্ধব্যক্তি জোয়ানে, ভীরুব্যক্তি বীরপুরুষে পরিণত হয়। সাধু সাজা সোজা, কিন্তু হওয়া কঠিন। **ধরী ন কাহূঁ ধীর, সবকে মন মনসিজ হরে।** হো, মায়া খুবই শক্তিশালী।"

ঘন জঙ্গলে এক সাধুর আশ্রম ছিল। সেখানে একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ বাস করতেন। দশ পনেরজন শিষ্য তার সংরক্ষণে ক্রিয়া এবং সেবা কার্যে সংলগ্ন ছিল। একদিন মহারাজকে তাঁর এক শিষ্য বলেছিল,''মহারাজজী ! আজ্ঞা দিলে

তীর্থ করে আসতাম। প্রবল ইচ্ছা জেগেছে।" মহারাজজী তার কথা শুনে বলেছিলেন, 'বাছা! এখনও তোমার মধ্যে সে ক্ষমতা আসেনি। মায়া খুবই প্রবল। সর্বত্র তার খেলা চলছে। কখন যে আক্রমন করবে, তার ঠিক নেই, তুমি জানতেও পারবে না। শিষ্যটি তাঁকে বলেছিল,"মহারাজজী! আপনি আশীর্বাদ করুন তাহলেই মায়া কিছু করতে পারবে না। মহারাজজী বলেছিলেন,"হ্যাঁ, আশীর্বাদ তো করছি, কিন্তু সাবধানে থেকো। আমিও তো কিছু বলছি , সেটারও তো মূল্য রয়েছে।" শিষ্য তাঁকে প্রণাম করেছিল, তিনি পুনরায় সাবধানে থাকার জন্য সর্তক করেছিলেন।

এদিকে শিষ্যটি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এক মাইলও যায়নি। তীব্র বেগে সামনে থেকে এক বুড়িকে আসতে দেখেছিল। বলিরেখায় মুখ ভর্তি ছিল কিন্তু তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে আশে- পাশে দেখতে দেখতে তীব্র বেগে চলে আসছিল। শিষ্যের মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল, ভেবেছিল, বেচারীর ঘোড়া বোধহয় হারিয়ে গেছে। সে বুড়িকে বলেছিল,"ও বুড়ি, এদিকে কোন ঘোড়া যায়নি, তুমি লাগাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?" বুড়ি তাকে বলেছিল,"বাবা! এই লাগাম মহাত্মাদের জন্য ঘোড়াদের জন্য নয়।" ব্রহ্মচারী রাগ করে বলেছিল,"পেতনী কোথাকার! বলছে মহাত্মাদের জন্য। যা পারিস কর। কি ক্ষতি করবি? " বুড়ী তাকে বলেছিল,"ঠিক আছে বাবা ! সাবধানে থেকো।" ব্রহ্মচারী পুনরায় রেগে উঠেছিল। বুড়ী পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

ব্রহ্মচারী আরও এক মাইল যেতে না যেতেই এক নদীর তীরে পৌঁছে-গিয়েছিল। ওপারে একটি যুবতী ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিল। গোটা মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল তার। কেঁদে-কেঁদে চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। পায়ে মেহেন্দি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা কোন ভদ্রঘরের নববধূ বলে মনে হচ্ছিল তাকে। মহাত্মা নদী পার করে দয়ার্দ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,"তুমি কাঁদছ কেন? তোমার সঙ্গীরা কি পথ হারিয়ে ফেলেছে? কি দুঃখ তোমার?" যুবতীটি ইতঃস্তত করে উঠেছিল এবং ধীর পদক্ষেপে ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে পাঁচ টাকা তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করেছিল। সে বলেছিল-"মহারাজ! আমার মত ভাগ্যহীনা এই পৃথিবীতে কেউ নেই।" এই কথাটুকু বলে সে আবার গিয়ে আগের জায়গাতেই বসে কাঁদতে শুরু করেছিল। ব্রহ্মচারী বিচার করেছিল-খুব ধার্মিক প্রকৃতির। কোন বড় বিপদে পড়েছে। এর সাহায্য করা উচিৎ। তিনি তাকে বলেছিলেন, "কিছু বলবে তো কি হয়েছে?" মেয়েটি ধীরে-ধীরে শান্ত হয়েছিল, বলেছিল,"মহারাজজী ! আমি বাপের বাড়ি থেকে আসছি। ওপারে

যে গ্রামটা দেখছেন সেই গ্রামেই আমার শ্বশুরবাড়ি। এখন নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ফিরে গেলে সেটা কেউ ঠিক বলবে না। শুভক্ষণ দেখে বিদায় দিয়েছিল। ওপারে কি করে যাব? এত জল নদীতে এই দুঃখ আমার। এখন আমার বোধহয় একূল-ওকূল দু'কূল গেল। মরাটাই বাকী আছে। সিংহ, বাঘ এই জঙ্গলে খেয়ে ফেলুক এটাই বাকী আছে। আমার ঘর-সংসার করার সাধ থেকেই গেল। মহারাজ! আমার মত অভাগা কেউ নেই। আপনি দয়ালু সাধু। আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যান। কেন মিছিমিছি বিপদ ডাকতে চাইছেন? মহারাজজী! যেমন কর্ম তেমন ফল। কর্ম যেমন করেছি,এখন কে ফল ভোগ করবে? মেয়েটি আবার কাছে গিয়ে প্রণাম করেছিল, দশ টাকা প্রণামী দিয়ে বলেছিল, ''মহারাজ! তীর্থ করতে যাচ্ছেন নিন, গাঁজা -ভাঙ্গ কেনার সময় দরকার হতে পারে।''

ব্রহ্মচারী সেখান থেকে যেতে-যেতে ভেবেছিল কিছু উপায় কি হতে পারে না? পথে কাউকে দেখতেও পাচ্ছিল না। মেয়েটার কাছে গিয়ে বলেছিল দেখ! তুমি যতটা ভাবছ নদীতে ততটা বেগও নেই, শুধু হাঁটু পর্যন্ত জল রয়েছে। তুমি চল তো ।'' সে বলেছিল ''মহারাজ ! আমার ভীষণ ভয় করছে।'' ব্রহ্মচারী বলেছিল, ''আচ্ছা ,এই লাঠিটা ধর। আমি পার করে দিচ্ছি।'' জলের কাছে যাওয়া মাত্র সে ছড়ি ফেলে চিৎকার করে উঠেছিল, পুনরায় গিয়ে আগের জায়গায় বসেছিল। ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। ব্রহ্মচারী অবাক হয়ে বলেছিল,''এখন আবার কি হল?'' কেঁদে-কেঁদে সে বলেছিল, মহারাজ! আমার দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। এখন তো আর কোন উপায় নেই। আমার কাছে শয়েক টাকা রয়েছে এখানে থাকলে বাঘ-সিংহ তো আমাকে খেয়েই ফেলবে। এই টাকাগুলো আমার কাছে পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি তীর্থ করতে যাচ্ছেন। গ্রহণ করুন টাকা কটা। গাড়ি-ভাড়া,গাঁজা-ভাঙ্গ কেনার সময় কাজে লেগে যাবে। টাকা পায়ের কাছে রেখে, প্রণাম করে আবার গিয়ে বসে কাঁদতে শুরু করেছিল। মহাত্মা দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হল বল? কেন বসে পড়লে? সে বলেছিল, ''মহারাজজী, পায়ে মেহেন্দি লাগানো রয়েছে সেটার রং তো জলে নামলে উঠে যাবে। শ্বশুর বাড়ি থেকে বার করে দেবে। সবাই তো এই বলবে, না জানি কবে ঘর থেকে বেরিয়েছে। মেহেন্দির রং কোথা থেকে ফিকে করে আসছে।''

মহাত্মা ভেবেছিল, বিপদ তো খুব এর কিন্তু বেচারী খুবই ধার্মিক প্রকৃতির। জিজ্ঞাসা করেছিল, ''কোন উপায় কি নেই?'' সে বলেছিল, ''মহারাজ! আপনি

যান” ব্রহ্মচারী বলেছিল, “শুনে তো যাই, কোন উপায়ে তুমি পারে যেতে পারবে?”। নববধূ তাকে বলেছিল, আপনি আমাকে কাঁধের উপর বসিয়ে পার করে দিন। তাহলেই জল না লাগলে পায়ের রংও উঠবে না।” ব্রহ্মচারী বলেছিল, “এটা কি করে সম্ভব?” সে বলেছিল, মহারাজ! আমি তো আগেই প্রার্থনা করেছিলাম, আপনি যান।

ব্রহ্মচারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চিন্তা করেছিল যে মেয়েটি দয়ালু তো খুবই, সাধু সেবিকাও, আমাকে এত পথ খরচ দিল। এই সব ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্মচারী পথের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। আগে-পিছনে কাউকে দেখতে না পেয়ে বলেছিল, “তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর বোসো। আমি পার করে দিচ্ছি।” ব্রহ্মচারীর মনে সেই সময় কোন বিকারও ছিল না। কাঁধের উপর বসিয়ে মেয়েটিকে পার করে দিচ্ছিল। নদীর মাঝে পৌঁছানোর পর নববধূ ব্রহ্মচারীর মুখে লাগাম কষে বেঁধে গোড়ালি দিয়ে ব্রহ্মচারীর দেহে মৃদু আঘাত করে টিক্-টিক্ করে হাঁকাতে শুরু করেছিল। ব্রহ্মচারী রেগে বলেছিল, অসভ্য কোথাকার! এটা কি হচ্ছে? উপরে চেয়ে দেখলে সেই বুড়ীকে দেখতে পেয়েছিল। বুড়ী তাকে বলেছিল, “বলেছিলাম না বাবা সাবধানে থাকতে। দয়ার্দ্র হয়েই গেলে। সাধকের দয়া করার বিধান নেই। অল্প একটু ফাঁদ পাততে না পাততেই পা দিলে। তোমার পুণ্য প্রবল, তোমার গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন, সেইজন্য রক্ষা পেলে তা না হলে এখনই তোমাকে ভ্রষ্ট করে ছাড়তাম। গোটা জন্ম কাঁদার জন্য চোখের জল জুটতো না।”

ব্রহ্মচারী রেগে বুড়িকে নদীতে নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু জলে বুড়ী কিম্বা মেয়ে কাউকেই পড়তে দেখতে পায়নি। ব্রহ্মচারী ভাবতে শুরু করেছিল যে, সত্যি মায়া খুবই প্রবল। একে তো আমি চিনতেই পারব না। এইসব কথা চিন্তা করে আশ্রমে ফিরে গিয়েছিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কেমন তীর্থ করে এলে?” ব্রহ্মচারী বলেছিল, “মহারাজ! আপনার আজ্ঞা পালন না করা সত্ত্বেও একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। মায়ার সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলছিল-গুরুদেব তোমাকে রক্ষা করছেন না হলে এক্ষুনি পথভ্রষ্ট করতাম। এখন থেকে মহারাজ আমি এখানে থেকেই সেবা করব।”

অতএব সাধককে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলে গুরুর সান্নিধ্যে ততদিন সেবা এবং সাধনাতে নিযুক্ত থাকাই উচিৎ, যতক্ষণ সাধনা পথে অনুক্ষণ এগিয়ে যাবার ক্ষমতা লাভ না হয়। তারপর ‘**কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা। কতহুঁ বিলোকত মন**

অভিরামা।।" ***(মানস, ২/৩১১/৫)*** কোন তফাৎ পড়ে না। বিচরণ করতে-করতেও চিন্তনে নিযুক্ত থাকার ক্ষমতা চলে আসে। সাধনাতে তীব্রতা না আসলে বিচরণে সাধন ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সর্বত্র মায়ার খেলা চলছে। '**কালে মূড় কা এক ন ছাড়ী, অজহুঁ আদি কুমারী।।**' কবীর বলেছেন যে, সব কুকার্য করেও মায়া আদি কুমারী রয়ে গেছে। এর কোন লোকসান হয় না। মায়া সবসময় যুবতী রূপেই বর্তমান। যতই এর সংস্পর্শে আসবে, ততই যুবা হয়ে উঠবে।

মায়া দয়ার বেশ ধরে, সেবার বেশ ধরে অনন্ত পথ দিয়ে সাধককে-সাধনা পথ থেকে বিচলিত করে দেয়। সাধকের জন্য দয়া করার বিধান নেই। মাতা সীতা দয়া করেছিলেন। পরিবর্তে লঙ্কাতে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল '**দয়া বিনু সন্ত কসাই, দয়া করী তো আফত আঈ।।**' হ্যাঁ, দয়া-ধামের উপলব্ধি হওয়ার পর, মহাপুরুষ দয়ার স্রোত রূপে পরিণত হন। অতঃপর '**খায় না খুটে, চোর না লুটে; দিন-দিন বঢ়ত সওয়ায়ো।**' '**পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং**' সাধক পূর্ণ হয়ে যান। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালেই পূর্ণ হন। পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণ দান করলেও পূর্ণই বাকী থাকে। এইরূপ মনীষী দয়ারই ধাম, তাদের দ্বারা সদা-সর্বদা কল্যাণ হয় এবং তাঁদের কাছ থেকেই দয়া পাবার আশাও করা হয় কিন্তু সাধকের দয়া করার বিধান নেই। সাধক আগে নিজে পরিক্ষাতে উত্তীর্ণ তো হোক পরে অন্যকে ডিগ্রী-ডিপ্লোমা দেবে। হ্যাঁ এইরূপ সাধন পরায়ণ পুরুষদের সেবা করলে সর্বদা লাভ হয়। সাধক পুরুষ দয়া না করলেও তাঁদের সেবা ও সান্নিধ্য থেকে স্বতই লাভ হয়। সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ইষ্ট থেকে একচুল দূরে থাকলেও মায়া সাধককে ভ্রষ্ট করতে পারে। বাস্তবে সাধুবেশ ধারণ করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া কঠিন। মহাপুরুষের সেবা করে গেলেই সাধনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্বার ধনী কে পড়ি রহে, ধাক্কা ধনী কা খায়।
কবহুঁক-ধনী নিওয়াজিহৈ, (জো) দর ছোড় না জায়।।

—::১৭::—

পূজ্য মহারাজজীকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''মহারাজজী! যোগ কাকে বলে?'' মহারাজজী তার দিকে চেয়ে বলেছিলেন-হুঁ... চাই ভিক্ষা, এদিকে গোটা গ্রামের সম্পত্তি কত জানতে চাইছে! আরে! যোগ বলে দিলেই কি যোগের জ্ঞাতা হওয়া যায়? কি কর্ম করা হয়? ভক্তটি বলেছিলেন,''মহারাজ জী! দোকান আছে আমার। আজকাল ভাল আয় হচ্ছে না। লোকসান হচ্ছে তাই এসেছি।''

মহারাজজী বলেছিলেন-“হুঁ মনে কিছু অন্যই রয়েছে, মুখে যোগ সম্বন্ধে জানতে চাইছে। ‘নাম অহ্নিয়ারী বারী, হোম করে কে পল্লব নাহী।’ আরে, যোগ অধিকারী, যোগ্য ব্যক্তির জানার বিষয়। হুঁ!’ যে জন্য এসেছ, সেটাই চাও! যাও, বিভূতি নাও! এখন দেখ কি হয়! পরে এসে বোলো কি রকম অবস্থা?” মহারাজজী সকলকে এই প্রকার বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

কিন্তু তাঁর কাছে যে সব অন্য ভক্তরা বসে থাকতেন তাঁদের মনে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়েই যেত। কিছু ভক্ত বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করে বসতেন যে মহারাজজী! ভজন কিভাবে সম্পাদিত হয়? মহারাজজী তাঁদের সস্নেহে বোঝাতেন যে, দেখ, সকলেই ভক্তি কাকে বলে জানে না। লোকে ভাবে যে চোখ বন্ধ করে নির্জনে বসে কিছু সময় কাটানো অথবা কন্টকশয্যায় শুয়ে থাকা, অথবা দন্ডায়মান থাকাটাই ভজনা কিন্তু ভক্তির যত দাতা এবং গ্রহণকর্তা ছিলেন, তাঁদের চরিত্র লক্ষ করলে এটা জানা যায় যে, ভক্তিভাব লাভের জন্য সেবার খুবই মহত্ত্ব রয়েছে। ‘ভজ’ -এর তাৎপর্যই হল সেবা।

রাজা দিলীপ বশিষ্ঠ মুনির গাভী চরাতেন। তিনি যদি চাইতেন তবে নিজে না চরিয়ে পাঁচ-দশ হাজার চাকরকে নিযুক্ত করতে পারতেন। চাকরদের দিয়ে সেবা করানোর মানেই হল সেবা এড়িয়ে যাওয়া। আমরা নিজেরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে নিযুক্ত হই, তবেই আমাদের ভিতর সেই সংস্কার গুলির সৃজন হবে, মন নির্মল হবে, ভক্তিতে দৃঢ়তা আসবে। যদি সেবকদের সেবাতে নিযুক্ত করা হয় তবে সেবকদের কিছু লাভ হলে হতেও পারে কিন্তু যিনি তাদের পাঠাবেন তাঁর তো কিছু লাভ হবে না। সেইজন্য মহারাজ দিলীপ চক্রবর্ত্তী নরেশ হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং গুরু বশিষ্ঠের সেবাতে নিজের কল্যাণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সংসারে ভক্তি ছাড়া আর সবকিছুই সুলভ। ‘ভগ ইতি সঃ ভক্তি।’ ভগ প্রকৃতিকে বলে, মায়াকে বলে। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতরেই দেখা যেতে পারে, যিনি মায়া থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। প্রকৃতির অন্ত এবং পরমাত্মাতে স্থিতি লাভই ভক্তির শেষ পরিণাম। এটা উপলব্ধি করার জন্য বিষয়ে আসক্ত সংসারে ছড়ানো মনকে সবদিক থেকে গুটিয়ে তাঁর চরণে নিযুক্ত করতে হবে সেইজন্য রাজা দিলীপ নিজে সেবা করেছিলেন।

অনুরাগী ভক্তগণ গুরুদেবের শরণাগত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করার জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানিয়েছেন, পুরাণে এইরূপ বহু কাহিনী রয়েছে। একটি কাহিনীতে

উল্লেখ রয়েছে যে, সত্যকাম নামের এক শিষ্যকে গুরুদেব বলেছিলেন যে-“ এই একশটি গাভী জঙ্গলে নিয়ে যাও। আজ থেকে এদের সেবা কোরো তোমার সঙ্গে কেউ থাকবে না। নির্জনে বাস করবে। আমি একটা ছোট নাম দিচ্ছি, সেটা জপ কোরো এবং বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ কোরো। যখন গাভীর সংখ্যা সহস্র দাঁড়াবে, তখন ফিরে এসো। সেই সময় আমি তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বলব।” কখনও কোন ভক্ত যদি কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, মহাপুরুষ তাঁকে বারো বছর গোশালা দেখা শোনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ রয়েছে যে, ইন্দ্র এক'শ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করার পর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

বস্তুতঃ ভক্তি, যা প্রকৃতির পারে নিয়ে যেতে সমর্থ, তার উত্থান-পতন এই মনেই ঘটে থাকে। আজ আমরা নিঃসন্দেহে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী কিন্তু কাল পর্যন্ত আমরা কি ছিলাম? মনের অবস্থা আজও সেই রয়েছে, হাজার-হাজার মায়িক গ্রন্থিতে আবদ্ধ। ক্ষণিক বৈরাগ্য মনের যথার্থ স্বরূপ নয়। সেই মহাপুরুষগণ মনকে যোগ্য করে তোলার জন্যই কোন না কোন সেবা কার্যে তাদের নিযুক্ত করতেন। দশ-বারো বছর সেই সেবার ফলস্বরূপ পরিবারের প্রতি আসক্তি চলে যেত। সঙ্গদোষের কুপ্রভাবও পড়ত না। উত্তরোত্তর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ইচ্ছা বৃদ্ধি পেত। ব্রহ্ম যে সারবস্তু সাধক সেবাকালে ক্রমে সেটা উপলব্ধি করত এক একটা দিন যুগ বলে মনে হত তখন। অনুরাগী ভক্ত লালায়িত থাকত যে, কখন অবধি ফুরাবে, কখন ক্ষমতা আসবে এবং আমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করব। সেইজন্য সর্বদা সেবার বিধান ছিল। সহজেই যদি কাউকে সাধনা সম্বন্ধে বলে দেওয়া হয় তবে না তো ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগিতা থাকবে, না ব্রহ্মের। সেই সাধনা সম্পূর্ণ করার ক্ষমতাও সাধকের হয় না। কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত মহাপুরুষের সেবা করলে সেই যোগ্যতা স্বতই চলে আসে। সদগুরুর শরণাগত হওয়ার বিধান এটাই যে,- '**সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**' ***(গীতা, ১৮। ৬৬)*** সমস্ত কিছু ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হও। যদি আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে স্পর্শ করতে পারেন, তবে তাঁর ভিতরে যে যোগ্যতা রয়েছে, আপনার ভিতরেও স্বতই প্রসারিত হবে।

আমিও যখন মহারাজজীর শরণে গিয়েছিলাম তখন পূজ্য মহারাজজী ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দান করেছিলেন কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয়নি আমার। কিছুকাল পরে যখন বুঝতে পেরেও ছিলাম তখন চিন্তনে বসলেই মহারাজজীর

রূপ সরে যেত এবং এক বিশাল মহিষ ধ্যানে চলে আসত। কয়েকটা দিন এভাবেই কেটেছিল। আমি মহারাজজীকে নিবেদন করেছিলাম যে, মহারাজজী, চেষ্টা করেও আপনার রূপ ধ্যানকালে হৃদয়ে ধারণ করতে পারি না, একটা বড় মহিষ যার কল্পনা পর্যন্ত করিনি কখনও, মনে তার ছবি ভেসে ওঠে। মহারাজজী বলেছিলেন ''বৎস! সেই মহিষ আর কেউ নয় স্বয়ং যম। এরই সঙ্গে তো যুদ্ধ করতে হবে। এরই বাঁধন থেকে তো মুক্ত হতে হবে। আচ্ছা বল চিন্তনে মন বসে?'' আমি বলেছিলাম, ''মহারাজজী! উৎসাহ তো রয়েছে কিন্তু ভজনাতে যখন বসি তখন একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। যা ভুলে গিয়েছিলাম, কুড়ি বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'' মহারাজজী নির্দেশ দিয়েছিলেন, ''এভাবে এসব ঠিক হবে না। তুমি চিন্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমর্পণ করে সেবা করবে শুধু ব্যস!''

সেই সময় সেবার বাস্তবিক অর্থ এবং মহত্ত্ব আমি জানতাম না। গুরুদেবের আদেশ ছিল, ভেবেছিলাম ঠিক আছে। কাজের সময় অঙ্গ প্রতঙ্গ সঞ্চালন করতাম, কিন্তু মন সর্বদা চরণ ধ্যান করত। যতদিন সেবার বাস্তবিক মহত্ত্ব বুঝতে পারিনি, ততদিন আমি এই প্রকার কৃত্রিম সেবা উপর-উপর করে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন ইষ্ট,গুরুদেব অনুভবে বার-বার সেই কথা জানিয়েছিলেন, তখন সন্দেহ অবসান হয়েছিল এবং সেবা আন্তরিকভাবে করতে থাকি। এইরূপ বিধান পূর্ব মহর্ষিদের সময় ছিল, এখনও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

যেদিন থেকে সাধনা শুরু হবে সেইদিন থেকে সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেবাতে সময় দিতে হবে। যদি কেউ সেবা ত্যাগ করে চিন্তনে বসে যায়, তবে শুধু দেহটা বসে থাকবে। যে মনকে বসা উচিৎ, সেটা তো হাওয়ায় উড়ে বেড়াবে। কিছুদিন পর্যন্ত সাধক হঠকারিতা করে চিন্তনে সময় দেয় এক দু'বছর পর হতাশ হয়ে কোন প্রচলিত রীতিনীতি স্বীকার করে নেয় অথবা পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -অর্জুন! যে দম্ভপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে কর্ম থেকে বিরত করে, মনে বিষয় চিন্তন করে, সে দম্ভাচারী। অতএব যিনি বাইরে এবং মন থেকে ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে নির্ধারিত ক্রিয়া করে যান, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই যোগের প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল। সেবার বিধান সেইজন্যই রয়েছে।

হতে পারে আজ আপনি নিজের কোন বিকার দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু পূর্বে কোন সময় মনের সুখে অশ্লীল যা কিছু চিন্তা করেছিলেন, সেসব চিন্তা,

ধ্যানকালে ব্যবধান উৎপন্ন করবেই। সেসব চিন্তা দূর না করলে চিন্তনে মন বসবে না। শুধু দেহটা বসে থাকলে কোন লাভ হবে না। সেইজন্য মহাপুরুষের সেবা করার বিধান রয়েছে। মহাপুরুষ মনকে শান্ত করে নেন। তাঁরা যেখানে বাস করেন সেখানে তাঁদের হৃদয় থেকে নিরোধের পরমাণুই প্রসারিত হয়। তাঁদের প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে তপস্যার সংস্কার সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য তাঁদের দর্শন-স্পর্শ, সেবা এবং সংসর্গে জীবনযাপন করলে বর্তমানে মনে যে যোগ্যতা নেই সেটাও কিছু কাল পর চলে আসে। তারপর তো মন মায়াময় পথ ত্যাগ করে ইষ্টকে লাভ করার পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। সাধনাতে তীব্রতা চলে আসে। ভগবান রাম বলেছেন-

সুচি সুসীল সেবক সুমতি, প্রিয় কহু কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরান কহ নীতি অসি, সাবধান সুনু কাগ।। *(মানস,৭/৮৬)*

সুশীল,বুদ্ধিমান, প্রযত্নশীল সেবককে কার না ভালো লাগে? পিতা নিজের সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন কিন্তু যে পুত্র কায়মনোবাক্যে পিতৃভক্ত,পিতৃসেবাই ধর্ম বলে মনে করে অন্য কোন ধর্ম জানে না, সেই পুত্র মূর্খ হলেও পিতার প্রাণপ্রিয় হয়, এই প্রকার, ভগবান রাম বলেছেন যে, গোটা জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়েছে এবং সকল জীবের প্রতি আমার সমান দয়া কিন্তু তাদের মধ্যে যে মদ-মায়া ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে আমাকে ভজনা করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। ভক্তিহীন বিরঞ্চিও সামান্য জীবের ন্যায় প্রিয়-**'সত্য কহউঁ খগ তোহিঁ সুচি সেবক মম প্রান প্রিয়।'** ***(মানস, ৭/৮৭খ)***। প্রাণপ্রিয় তো সেবকই হতে পারে।

এইপ্রকার শুরুতে মহাপুরুষের সেবা দেহটা করে, কিন্তু চিন্তনের একটি নির্ধারিত সীমা পার করে নেবার পর, কিঞ্চিৎ পরিণত হলে, এই সেবাই মানস পূজাতে রূপান্তরিত হয়। সাধনা জাগ্রত হলে সাধক স্বতই উপলব্ধি করতে থাকেন এবং ইষ্টদেব সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটা-একটা করে নতুন রূপ প্রদান করতে থাকেন, সেবার বিধি অবগত করাতে থাকেন। এইপ্রকার নাম গ্রহণ করার ক্ষমতা চলে আসে যখন, তখন তিনি স্বয়ং ছুটি দিয়ে বাইরে বাণী দ্বারা ভিতরে অনুভব দ্বারা সঞ্চালিত করে নিকটবর্তী কোন নির্জন স্থানে নিবাস করার জন্য পাঠিয়ে দেন, তাকে পৃথক অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করে দেন। সেখানে সাধনাতে মনও বসে। এতদূর পর্যন্ত সেবা দেহ দ্বারা করা হয় এবং এর পরে যে সেবা করা হয় সেটা মন করে, দিবারাত্রি সেই মহাপুরুষের প্রার্থনা করে সাধক,

তাঁরই অনুরূপ নিজেকে গড়ে তোলে। মানসিক সেবা শারীরিক সেবার থেকে উৎকৃষ্ট।

মানসিক সেবা করতে-করতে সাধক ক্রমোন্নতির পর যখন ইষ্টের সমীপের অবস্থাতে উপনীত হন, প্রাপ্তি যে কোন মুহূর্তে হতে পারে এইরূপ অবস্থাতে এই সাধনা বন্ধ হয়ে যায়। ইষ্টদেব এক নতুন দিশা প্রদান করেন, যা অনুভবগম্য। গৌতম বুদ্ধও সাধনার শুরুতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন কিন্তু ভজনা পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছানোর পর, তিনি প্রাপ্তির জন্য বারংবার জিদ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু ইষ্টদেব তাঁকে সেতারের তার ঢিলা করতে বলেছিলেন। এই শ্বাসই সেতার। শ্বাসের সাহায্যেই ইষ্টের নামযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। কবীর বলেছেন-

শব্দ শব্দ সব কোঈ কহে, ওঅহ তো শব্দ বিদেহ।
জিভ্যা পর আওয়ে নহীঁ, নিরখি পরখি কর লেহ।।

শব্দ-শব্দ তো সকলেই বলে। তালু এবং কণ্ঠ থেকে স্বরের উৎপত্তির কল্পনা ভ্রান্তিতে পূর্ণ। অক্ষর ব্রহ্মকে বাণীর সাহায্যে উচ্চারিত করা সম্ভব নয়। সাধনা পথে চলতে-চলতে যোগী যখন দেহ থেকে পৃথক হওয়ার ক্ষমতা লাভ করেন, সেই সময় অক্ষর ব্রহ্ম, সেই শব্দ জাগ্রত হয়ে যায়। সেই শব্দের উঠানামা এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসে হয়। সেইজন্য বুদ্ধদেব আদেশ পেয়েছিলেন যে, সেতারের তার ঢিলে করে দাও। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি সাধনাতে তৎপরতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিল যে, বুদ্ধ সাধনা পথ থেকে বিচলিত হয়েছেন কিন্তু তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। সেই স্তরে পৌঁছানোর পর প্রত্যেক সাধকের সমক্ষে এই স্থিতিই উৎপন্ন হয়। এই স্তরের সাধকের জন্যও ইষ্টের আজ্ঞা পালন করাটাই ভজনা। সেখানে কেন এর কোন প্রশ্ন নেই। যদি সাধক এই আজ্ঞাটুকু পালন করতে সমর্থ হন তবে, ইষ্ট সন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বরূপে স্থিতি প্রদান করেন। এই প্রকার সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেবার বিধান রয়েছে।

ইষ্টের এই আদেশ শুধু সাধকই শুনতে সমর্থ অথবা স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষই সাধকদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত থাকেন- **কৈ জানে জিউ আপনা, কৈ রে জনাওয়ে পীউ।** সাধক জানে অথবা সেই প্রিয়তম জানিয়ে দিলে জানা যায়। সেইজন্য মহারাজজী প্রায়ই বলতেন যে, সাধনা কি তা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে না। যাঁরা লেখা পড়া করে যোগের প্রচার করেন, এসব প্রচারের ফলে সংস্কারের সৃজন হলেও, যোগের জ্ঞাতা হওয়া যায় না।

সারাংশতঃ সেবা দু'প্রকারের- এক-শারীরিক এবং দুই মানসিক। ইষ্টের রূপ

হৃদয়ে ধারণ করে সেখানেই তাঁকে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, মাল্যাদি অর্পণ করা, বন্দনা-অর্চনা মানসিক পূজার অন্তর্গত পড়ে। হৃদয়ে রূপ ধারণ করে এই যে সেবা করা হয় সেটা উন্নত এবং সূক্ষ্ম এবং সোজা ইষ্টের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে দেয়। সেবাই ভজনের প্রবেশিকা এবং পরাকাষ্ঠা।

—::১৮::—

পূজ্য মহারাজজী বলতেন- ''হো! মহাপুরুষয়ের সেবা এবং তাঁদের খাওয়ানোতে কোনোরূপ ত্রুটি রাখতে নেই। এতে জোরও করা যেতে পারে। এর ফলে কল্যাণই হয়। হাত সূখা সাধু ভুখা।'' এই সন্দর্ভে মহারাজজী একটি কাহিনীও শোনাতেন। খুব উচ্চস্তরের পরমহংসস্বরূপ এক মহাত্মা ছিলেন। ঠাটবাট এবং সাধারণ অবস্থা যা হোক কিছুই ফারাক বুঝতেন না। নিজের ভজনের মুদ্রাতে বিচরণ করতেন। কখনও-কখনও একমুঠো ছোলা খেয়েই দিন কেটে যেত। আবার কখনও ঘীয়ে তৈরী সুস্বাদু ব্যঞ্জনের ব্যবস্থাও হয়ে যেত। দিগম্বর ছিলেন। যখন সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল তখন ইষ্টদেব বলেছিলেন-''স্থায়ীভাবে কোথাও নিবাস কর।'' কিন্তু একাকী বিচরণ এবং ভজনাতে তিনি আনন্দ পেতেন সেইজন্য ইষ্টদেবের আদেশ প্রণাম করে এড়িয়ে যেতেন। কোথাও বাস করতে শুরু করেননি। মাঘ মাস ! প্রচন্ড শীত! বিচরণশীল মহাত্মার নজরে পড়েনি কোন ব্যবস্থা। এক কুম্ভকার তার মৃন্ময় পাত্রগুলি ভাঁটি থেকে বার করে-করে দেওয়ালে ঠেকা দিয়ে রাখছিল ভাঁটির বিভূতি গরম ছিল। মহাত্মা তার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, ''কুম্ভকার ভাই! আমি রাত্রি যাপন করতে চাই। তুমি এখানে আমাকে বসতে দাও।'' কুম্ভকার সাদরে প্রণাম করে বলেছিল ''মহারাজ! আমি এই মৃন্ময় পাত্রগুলি বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করি। সবদিকেই বাসন রয়েছে। ভেঙ্গে গেলে সর্বনাশ হবে। ক্ষমা করবেন। অল্পই জায়গা রয়েছে। আপনি আরামে বসতেও পারবেন না।''

মহারাজজী বলেছিলেন, ''আমি শুতে চাই না, শুধু বসে ভজনা করব এবং সকালেই চলে যাব। তোমার উপর বোঝা রয়েছে এসব ভেব না।'' মহারাজকে বসিয়ে কুম্ভকার বলেছিল,''লক্ষ্য রাখবেন মহারাজ।'' মহাত্মা বলেছিলেন,''তুমি কিছু ভেবো না কেউ নিয়ে যাবে না।'' কুম্ভকার প্রণাম করেছিল এবং ''আপনি বিশ্রাম করুন'' বলে ঘরে গিয়েছিল।

মহাত্মা সেই গরম স্থানে চিন্তনে রত হয়েছিলেন। রাত্রি প্রায় দুটো তিনটের সময় ভেবেছিলেন, অল্প কোমর সোজা করে নিই। হাত পা গুটিয়ে সেখানেই শুয়ে

পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যদিও সেই সময় ঘুমোনোর অভ্যাস ছিল না। স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মনোরম স্থানে বসে রয়েছেন। হাজার-হাজার লোক দর্শন করছে। কিছু না কিছু বস্তু অর্পণ করছে। মহাত্মা সেগুলি তুলে-তুলে পাশের ঘরে ছুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। যখনই খাবারের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন অমনি এক ব্যবসায়ী একটা থলী অর্পিত করে বলেছিল, ''মহারাজজী! এটা পরোপকারে লাগিয়ে দিন।'' মহাত্মা রেগে বলেছিলেন, ''নিকুচি করেছি এই সব ভক্তদের! ঘুস দিতে চাইছ অ্যাঁ, বলছ পরোপকারে লাগাতে, তা তুমি লাগাচ্ছ না কেন? আমাকে শুধু-শুধু বিরক্ত করছ কেন? না খাবার সময়, না চিন্তনের সময়।'' এই প্রকার প্রতাড়িত করে সেই ধনের থলীটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিতে গিয়েছিলেন তাঁর পা একটা বড় হাঁড়িতে গিয়ে ঠেকেছিল। সেটা ভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গে আরো যত মাটির বাসন একটার গায়ে একটা লাগানো ছিল সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

মহাত্মার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁর পশ্চাতাপ হয়েছিল- আহা! বেচারা আমাকে স্থান দিয়ে উপকার করল। আর তার কিনা এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। গরীবের সর্বনাশ হল। সকালে এসে কি বলবে? আমি এখন চলে গেলে খুব খারাপ দেখাবে। আমি সাধু, মুখ লুকিয়ে চলে যাওয়াটা শোভা পায় না। লোকে তাহলে সাধুদের কি বলবে? এটা অবশ্যই কোন মায়িক উপদ্রব। এইসব চিন্তা করতে-করতে রাত পার হয়েছিল।

সকালে কুম্ভকার এসে সব দেখে বলেছিল-''মহারাজ! আমি কালই বলেছিলাম যে, এই গ্রাম অনেক বড়, অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নিন, আমার সর্বনাশ করবেন না। দেখুন সব বাসন তো ভেঙ্গে গিয়েছে। গোটা বছরের রোজগার নষ্ট হয়ে গেল। এখন কি হবে?'' মহাত্মাকে মৌন দেখে কুম্ভকার বিনীত স্বরে বলেছিল, ''আপনি বলুন তো এসব হল কি করে?'' মহাত্মা স্বপ্নে ঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে বলেছিলেন সঙ্গে এও বলেছিলেন থলীটাকে লাথি মারতে গিয়ে পা'টা বড় হাঁড়িতে গিয়ে ঠেকেছিল। কুম্ভকার ভেবেছিল মহাত্মার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না। মনে হয় ইনি সিদ্ধ পুরুষ। পুণ্যবান ভক্তদের ভীড় এখানে অবশ্যই হবে। মা লক্ষ্মী এই ভগবৎ স্বরূপের সেবা করতে চায়। এঁকে এখানেই থাকার জন্য আগ্রহ করব। ইনি এখানে থাকলে আমার প্রয়োজনও মিটে যাবে আর এঁর সেবা করার সৌভাগ্যও লাভ হবে। ভক্তরা যা কিছু অর্পণ করবে আমি সেগুলি নিয়ে নেব। এইরূপ চিন্তা করে বলেছিল,

"আচ্ছা তো মহারাজজী! যা হবার হয়ে গেছে। এখন আপনার আর কোথাও যাবার দরকার নেই, এখানেই থাকুন আমি আপনার সেবা করব।"

দয়াবশতঃ মহাত্মা কিছুদিন সেখানেই থাকার নিশ্চয় করেছিলেন। দু'মাস ছিলেন সেখানে। বাস্তবেই সেখানে ভীড় হতে শুরু করে। কুম্ভকারও সন্তুষ্ট হয়েছিল। তার প্রয়োজন তো বহু আগেই মিটে গিয়েছিল। মহাত্মা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুম্ভকারের আর কোন অভাব বা কষ্ট নেই, তখন হঠাৎ একদিন সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। অতঃপর ইষ্টের আজ্ঞা পালন করে একস্থানে নিবাস করতে শুরু করেন এবং সেই স্থান থেকে কল্যাণের অজস্র স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। গোটা জগতের কল্যাণ তাঁর দ্বারা হতে থাকে।

মহারাজজী বলতেন- হো! যখন ভগবান কৃপা করেন, তখন বিপত্তিই সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যখন ভগবান বসতে আদেশ দেবেন, বসে যাওয়া উচিৎ, দোষ হবে না। যখন কোন বস্তু গ্রহণ করতে বলবেন গ্রহণ করে নেওয়া উচিৎ, দোষ হবে না, সাধন কালে সেটাই দোষ কিন্তু আদেশ পাওয়ার পর সেটা হিতকর হয়ে যায়।

নোট-এই উপর্যুক্ত কাহিনীর মহাত্মা ,স্বয়ং গুরুদেব ছিলেন কিন্তু এইভাবেই গল্প বলতেন।

—::১৯::—

সাধনাতে অনুশাসন নিতান্ত আবশ্যক। অনুশাসনবিহীন কোন সাধক এই ভগবৎ পথে সফল হতে পারবে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যিনি এই পথের পথিক, তাঁর কথা আলাদা। এই কারণেই পূজ্য মহারাজজী অকারণেই সামান্য ভুলের জন্যও ধমক দিতেন। যখন দেখতেন যে, সাধকের বুদ্ধি সাধনা পথ থেকে বিচলিত এদিকে কাজে কোন ত্রুটিও চোখে পড়ত না তখন তাকে শুনিয়ে বলতেন- "ছাদ ঝাঁট দেওয়া হয়নি। ধূলো জমেছে। ওখানে ঐকাজটা ঠিক হয়নি।" গজ্‌গজ্‌ করে যেতেন সেই সাধক যখন ভাব বিভোর হয়ে ছাদে গিয়ে ঝাঁট দিতে শুরু করতেন তখন রেগে বলতেন-"কে ওখানে? আমার কপালে ঝাঁট দিচ্ছে? ধর তো শালাকে।" সাধক যখন তাঁর কথা শুনে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াত এবং ভাবতে শুরু করত যে কি ভুল করলাম; ততক্ষণে মহারাজ তার গায়ে দু'ছড়ি বসিয়ে দিতেন। আশ্রমবাসীদের সঙ্গে সাধকও যখন সেখান থেকে সরে যেতেন তখন ভক্তদের কাছে হাসতে-হাসতে বলতেন যে-" আমি একমাস ধরে সুযোগ খুঁজছিলাম। শালার কোথাও ভুল দেখতে

পাচ্ছিলাম না। আজ সুযোগ পেলাম।”

এই প্রকার যখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, এখন তাড়নারই প্রয়োজন, তখন কোন না কোন অছিলা খুঁজে নিতেন, তা-না হলে তাঁর ছাদ বা ঝাঁটার কি প্রয়োজন? ভদ্র ঘরের মেয়ে যুবতী হলে মাতা-পিতা যেরূপ বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কর্মে ব্যস্ত করে রাখেন, ঠিক সেই প্রকার সদগুরু নিজের অনভিজ্ঞ শিষ্যকে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে, তার সাধনা সম্পূর্ণ করান। যদি তিনি লক্ষ্য না রাখেন তবে নিজের ভরসায় ভবসাগর পার করা সাধকের পক্ষে অসম্ভব।

গুর বিনু ভবনিধি তরই না কোঈ।
জৌঁ বিরঞ্চি সঙ্কর সম হোঈ।। *(মানস, ৭/৯২/৭)*

ব্রহ্মা ও শিবের স্থিতিপ্রাপ্ত সাধকগণেরও যদি সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ হয়নি, তবে তাঁদের দ্বারাও ভবসাগর উত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

রাখই গুর জৌঁ কোপ বিধাতা।
গুর বিরোধ নহিঁ কোউ জগ ত্রাতা।। *(মানস, ১/১৬৫/৬)*

যদি ভাগ্য অপ্রসন্ন হয়, ঘোর নরক এবং যাতনা কপালে লেখা থাকে তবুও সদ্‌গুরু এই সমস্ত দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ কিন্তু যদি গুরুই অপ্রসন্ন হয়ে যান তবে বিশ্বে ভগবান নামের কোন সত্তা সাধকের জন্য থাকে না। ভগবান সর্বত্র রয়েছেন; তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে তো কিন্তু যাঁর গুরু অপ্রসন্ন হয়ে যান তাঁর জন্য ভগবানের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান হয়ে যায়। কোন উপযোগিতা থাকে না। কারণ ভগবান পর্যন্ত যে দূরত্ব , তা অতিক্রম করার একমাত্র মাধ্যম সদ্‌গুরু এবং তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট পথ।

এখন প্রশ্ন উঠছে যে, তাঁকে কিরূপে অনুসন্ধান করা হবে? মায়া খুবই প্রবল-

মায়া এইসি প্রবল হ্যায়, তজি মালিক কী ছাপ।
বনকর বৈঠি জগত মে, কর্তা ধর্তা আপ।।

মায়া এত বেশী প্রবল যে, জগতে হর্তা কর্তা বিধাতা হয়ে বসেছে। মন্দিরের প্রতি জনসাধারণের আস্থা দেখে সেখানেও কপটরূপে প্রবেশ করেছে। তীর্থ করে কল্যাণ হচ্ছে দেখে পান্ডাদের অন্তরে ধূর্ততারূপে প্রবেশ করেছে। সদ্‌গুরুর প্রভাব দেখে কাতারে-কাতারে সদ্‌গুরু দাঁড় করিয়ে দিল। **ঘর মে বীবী ঝোঁকে ভার। বাহার মিয়াঁ সূবেদার।।** অন্তরে সারবস্তু তো কিছু নাই কিন্তু বাইরে বেশভূষা এমন যেন সত্যিকারের গুরু। এইরূপ পরিস্থিতিতে কি করে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে

যে, ইনি সত্যিকারের পূর্ণ? যদি-বা একজন সত্যিই মহাপুরুষ তো সেই শ্রেণীতেই আরও হাজার জন বসে রয়েছেন। সকলেই নিজেকে শুদ্ধ বলছেন। এখন আপনি বলুন, সেই ভীড়ে কে মহাপুরুষ? কিরূপে চেনা সম্ভব হবে? তা দেখুন-

পুন্য পুঞ্জ বিনু মিলহিঁ না সন্তা।
সত সঙ্গতি সংসৃতি কর অন্তা।। *(মানস, ৭/৪৪/৬)*

সঞ্চিত পুণ্য যতক্ষণ না সহযোগিতা করে, ততক্ষণ সন্ত মহাপুরুষ অথবা সদ্‌গুরু লাভ হয় না। এর মানে এই নয় যে দর্শন মেলে না। বিনা পুণ্যে শুধু সদ্‌গুরুই কেন সাক্ষাৎ ভগবান শিবকে দেখলেও আমরা তাঁকে দু'চারটে কটুবাক্য শুনিয়ে দেব- ''দেখ-দেখ কেমন রূপে দাঁড়িয়ে আছে? একে কি এই ভাবে দিন কাটান উচিৎ ? এখনও তো কাজ করলে চারজনের ভরণপোষণ করতে সক্ষম।" কেন? যে চোখের সাহায্যে সন্ত অথবা সদ্‌গুরুকে চেনা যায় সেই দৃষ্টিই পুণ্যময়ী। এই চর্ম চক্ষুর সাহায্যে তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ভগবান মন বুদ্ধির অতীত। অভ্যাস করতে-করতে নিরুদ্ধ অবস্থাতে যোগী মন-বুদ্ধির অতীত হয়ে ভগবৎ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুত্বের স্থিতি লাভ করেন, তখন তাঁকে সদ্‌গুরু বলা হয়; সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হন, সেইজন্য সদ্‌গুরু বলা হয়। মন-বুদ্ধির অতীত মহাপুরুষকে আমরা মন বুদ্ধির সাহায্যে কিরূপে জানতে পারব? এর একটাই উপায়-পুণ্য, যদি সদ্‌গুরু লাভ হয়নি তবে এর কারণ একটাই হতে পারে পুণ্য ক্ষীণ আপনি অর্জন করুন, পুণ্য পুরুষার্থ প্রবল করুন। যখনই পুণ্য কাজ করতে শুরু করবে, সেই সময় সন্তপুরুষ অথবা সদ্‌গুরু যে সিংহাসনে বসে রয়েছেন অথবা যে ধূলোয় গড়াগড়ি দেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন। হতে পারে আপনিই সেখানে পৌঁছে যাবেন অথবা তিনিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বিশ্বাসও দৃঢ় হবে। আপনি তাঁর অনুগত হয়ে যাবেন এবং তিনি অন্তর থেকে আপনাকে সঞ্চালনও করতে শুরু করবেন। এর একটাই মাধ্যম-পুণ্যপুঞ্জ। যে চক্ষুর সাহায্যে সন্তপুরুষ অথবা সদ্‌গুরুকে চেনা সম্ভব সেই দৃষ্টিই পুণ্যময়ী এবং যখন সদ্‌গুরু লাভ হয় তখন '**সৎসঙ্গতি সংসৃতি কর অন্তা**' তাঁর সত্ত্ব ও সৎসঙ্গতি সংসৃতি এবং গমনাগমনে বিরতি এনে দেয়। সদ্‌গুরু অথবা সাধক ভন্ড হন না। **দেখা দেখি সাধে জোগ। ছীজৈ কায়া বাঢ়ৈ রোগ**।। কোন কাজে অনুকরণ করা উচিৎ নয়। দৈবাৎ যদি ভগবৎ পথে চলার জন্য প্রথম পদক্ষেপ রাখাই হয়, সাধু বেশ ধারণ করে, তবে যতক্ষণ না প্রাপ্তি হচ্ছে ততক্ষণ হতাশ হওয়া উচিৎ নয়। মহারাজজীর কাছে তিলক কেটে যখন কোন মহাত্মা আসতেন

তখন মহারাজজী বলতেন- “ কি ব্যাপার ? নাও জল খাও।” তিনি খাবার কথা শুনে যখন বলতেন, “ মহারাজজী একটু বেশভূষা ঠিক করে নিই তারপর খাবো। মহারাজজী অমনি হেসে বলতেন- “ধুত্তোর! বৈরাগী হয়েছ। মরে তো গেছ।” মহারাজজীর কথার তাৎপর্য ধীরে-ধীরে ভক্তরা বুঝতে পেরেছিল, সেইজন্য তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসতে শুরু করত।

বস্তুতঃ ভগবৎ পথে কোন সম্প্রদায় নেই। তফাৎ এটুকুই রয়েছে যে, কেউ সাধনা পথে সবে চলতে শুরু করেছেন, কেউ অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, কেউ তারও বেশী এগিয়ে গেছেন, আবার কারও প্রাপ্তির সময় হয়ে এসেছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত একজন সাধকেরই উঁচু নীচু অবস্থা বিশেষ এসব কোন সম্প্রদায় নয়। যাদের সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ তারাই সৃষ্টি করেছে এই সমস্ত সম্প্রদায়। তারা লক্ষ্যে উপনীত হতে তো পারেনি। কিন্তু মহাপুরুষগণ যেরূপ সম্মান পেয়ে থাকেন সেইরূপ সম্মান, খ্যাতি, তারা পেতে চায়। সনাতন ধর্ম অস্পষ্ট হওয়ার মূল কারণ এটাই। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে ভগবৎ পথে সাধনা একটাই রয়েছে। **ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন (গীতা, ২।৪১)** -এই ভগবৎ পথে ক্রিয়াত্মক বুদ্ধি একটাই রয়েছে; দিশা, ক্রিয়া এবং পরিণামও একটাই রয়েছে। না জানি কিছু লোক মাঝখানে কেন বিরোধ উৎপন্ন করে? তাদের কর্ম থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয় যে, তারা এখনও লাভ করেনি। বাস্তবে যিনি সবর্ত্র ব্যাপ্ত সত্তাকে লাভ করেছেন তিনি সমাজে বিরোধিতা উৎপন্ন করতে পারেন না। যদি কেউ এখনও করে থাকেন তবে স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি এখনও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেননি। সন্ন্যাসীর বেশে এসে সীতাকে হরণ করা হয়েছিল। লক্ষণ শক্তিশেলের আঘাতে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিলেন। এক অন্য মুনিরাজ হনুমানকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ছল করে আটকে রেখেছিলেন। চক্রবর্তী নরেশ প্রতাপভানুর সর্বনাশ করেছিল। সাধুবেশই এমন যে, যার অন্য কোন উপায় থাকে না তারাও এই বেশের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে নেয়। বর্তমানেও কম্বলচোর সাধু আপনি পেয়েই যাবেন। আগেকার বদঅভ্যাস তো যায় না। হয় চুরি, না হয় কমন্ডলুই এদিক ওদিক করে তারা । কিন্তু সাধু কখনও বদমায়েশ হন না। সাধুবেশে অসাধুই ঢুকে পড়েন, এই সমস্ত সম্প্রদায় তাদেরই দ্বারা সৃষ্ট। ভজনার বাস্তবিক জ্ঞান তো সদ্‌গুরুর অধিকার ক্ষেত্রের বিষয়।

—::২০::—

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করার সঙ্গে-সঙ্গে সাধনা

করতে-করতে ইষ্টোন্মুখ প্রেম জাগ্রত হয়। সেই সময়ও সাধকের জন্য আন্তরিক অনুশাসনের খুবই প্রয়োজন থাকে। সাধনাকালে সংযম এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের মহত্ত্ব অত্যধিক ।কারণ কোন পথিক যখন এই পথে অগ্রসর হয়, তখন শুরুতে তার মনে কিছুদিন পর্যন্ত তো খুব উৎসাহ থাকে কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এই মন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। সাধনাতে সাধক নিজের মৃত্যু দেখতে পান সেইজন্য মন পূর্বের অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। তুলসীদাসেরও আগে খুব ভালো লেগেছিল যে, ভজনা করব কিন্তু যখন সাধনা পথে চলতে শুরু করেছিলেন তখন মন ছটফট করতে শুরু করেছিল। মনের সেই দশা তিনি ব্যক্ত করেছেন। '**বিগরত মন সন্ন্যাস লেত, জল নাওঅত আম ঘরো সো।**' ***(বিনয় পত্রিকা- ১৭৩)***। ভগবন! সন্ন্যাস গ্রহণ করার সময় খুব ভালো লাগছিল যে, ভজনা করব কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মন এমন বিগড়ে গেছে যেমন কাঁচা মাটির জল পাত্র। কাঁচা মাটির জল পাত্রে জল পূর্ণ করুন দেখবেন সহস্র ছিদ্র দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে। এই দশা (গোস্বামীজী নিবেদন করেছেন) আমাদের মনের দেখতে পাবেন। আপনার মন যত স্নেহপূর্ণ ছিল, সব স্নেহ সমাপ্ত হয়ে গেছে। মন এত বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে যায় যে, মনে হয় যেন ইষ্টের প্রতি প্রেম একদম নেই মনের মধ্যে। এইরূপ পরিস্থিতিতে মহাপুরুষগণ মনকে বার-বার অনুশাসন করার চেষ্টা করেছেন, বিবেকের অঙ্কুশের সাহায্যে একে শাসন করেছেন।

প্রত্যেক মহাপুরুষের সমক্ষে এইপ্রকার পরিস্থিতি উৎপন্ন হয়। পূজ্য মহারাজ জী এই প্রসঙ্গে প্রায়ই একটি কাহিনী শোনাতেন। কাহিনীটি এইরূপ-গভীর জঙ্গলে একজন খ্যাতি প্রাপ্ত ভজনানন্দী মহাত্মা বাস করতেন। তিনি দিবা-রাত্রি ভজনাতে রত থাকতেন। তিনি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। একদিন তাঁর মনে জলে গোলা বেসন (ডাল চূর্ণ)টক দই ও মসলা ইত্যাদি সহ ফুটিয়ে প্রস্তুত করা এক প্রকার খাদ্য খাবার ইচ্ছা জেগেছিল। পরের দিন এই ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। তারপর তিনি যখনই ভজনাতে বসতেন তখনই ইষ্ট চিন্তনের পরিবর্তে উপর্যুক্ত খাদ্যেরই চিন্তন এসে তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাত। ইষ্টের ধ্যান করতে শুরু করলেই মন কড়াইতে গরম -গরম ফুলুরি দেখতে শুরু করত। মনের এই অবস্থা দেখে তিনি মনকে বার-বার বুঝিয়েছিলেন ''ওরে মন! কি হবে ফুলুরি খেয়ে?'' এটা খাবার জন্যই কি গৃহত্যাগ করেছিলাম। সাধককে যুক্তাহার করা উচিৎ। আজ এটা খেতে ইচ্ছা করছে, কাল না জানি আরও কি খাওয়ার ইচ্ছা হবে? ওরে মন! তুই ভজনা কর।'' এই

প্রকার নিজেকে অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মন থেকে সেই ভাব দূর হয়নি, পনেরো-কুড়িদিন পর এমন দশা হয়েছিল যে ওঁ জপ করতে বসলে চার-ছ- বার ওঁ উচ্চারণ করার পর ফুলুরি -ফুলুরি জপ করতে শুরু করতেন। আগে ধ্যান গুরু মহারাজের করতেন কিন্তু তখন কড়াইতে ফুলুরিরই ভুরভুর গন্ধ পাচ্ছিলেন। নামে ফুলুরি, ধ্যানে ফুলুরি, অন্য কোন কাজ করলেও ফুলুরির চিন্তা। ফুলুরির চিন্তা ব্যতীত মনে আর কোন চিন্তা ছিল না।

মহাত্মার মনে ঘোর পশ্চাত্তাপ হয়েছিল যে, ভগবন্! ঘর ছাড়িয়ে ঘোর জঙ্গলে থাকার সুঅবসর প্রদান করেছেন। মহাপুরুষের কৃপা ও সান্নিধ্যও প্রদান করেছেন, ভজনের বিধিও বলেছেন; মাঝখানে কোত্থেকে ফুলুরির চিন্তা চলে এল? মনকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু শুনছে না। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে এইসব কথা বলে মহাত্মা নিজের ছড়ি তুলে নিকটবর্তী গ্রামে গিয়েছিলেন, তাঁর নিবাসস্থান থেকে দু'মাইল দূরে ছিল সেই গ্রাম। গ্রামবাসীগণ তাঁকে দেখে ভাব- বিভোর হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বলেছিল-"মহারাজ! বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি গ্রামে আসেননি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন যে, আপনি হঠাৎ চলে এলেন। আমাদের জন্য কি আদেশ?" মহাত্মা বলেছিলেন-"আগে ফুলুরী তৈরী কর।" গ্রামবাসীগণ বলেছিল- "মহারাজ ! এ আর এমন কি বড় কথা। এক্ষুণি তৈরী করে দিচ্ছি।"

মহারাজজী তাদের বলেছিলেন- "একটা কড়াইতে প্রায় কুড়ি কিলো ফুলুরি তৈরী করবে।" "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলে তারা ফুলুরি তৈরী করতে শুরু করেছিল। সুস্বাদু এবং সুগন্ধিত ফুলুরি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মা বলেছিলেন-"ভাই! আমি একা খাবো। কাউকে দেব না। কড়াটা একটা কুঠুরীতে রেখে দাও, আমিও সেই কুঠুরীতে থাকব। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিও।" তারপর তো "যে আজ্ঞা গুরু মহারাজ" বলে, গ্রামবাসীগণ বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ভিতরে মহাত্মা ফুলুরির কড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

শুরুতে ফুলুরি খুবই সুস্বাদু মনে হয়েছিল। মহাত্মা শুরুতে প্রায় দু'কিলোর মত খেয়েছিলেন কিন্তু কতই আর খেতেন? ফুলুরি খেতে আর ভালোই লাগছিল না তা সত্ত্বেও মহাত্মা খেয়েই যাচ্ছিলেন। প্রায় চার কিলোর মত খাবার পর অরুচি ঘৃণাতে পরিণত হয়েছিল তা সত্ত্বেও তিনি খেয়েই যাচ্ছিলেন। সেই কড়াইতে তিনি বমন করে ফেলেছিলেন তা সত্ত্বেও খাওয়া বন্ধ করেননি মনকে উদ্দেশ্য করে বলতে

শুরু করেছিলেন-খা! খা! আরও খা! আরে ঘরদোর ছেড়ে সাধু হয়েছিস জীবনে সবরকম খাবার খেয়েছিস কিন্তু ক্ষুদ্র মন তুই তুচ্ছ বস্তুর জন্য দু'মাইল পর্যন্ত ছুটিয়ে এনেছিস, ভজনা ছাড়িয়ে এখানে এনে ফেলেছিস। একমাস ধরে শুধু ফুলুরি-ফুলুরি, না রাম, না ধ্যান! ফুলুরি আর ফুলুরি! নে খা ফুলুরি! বমন হচ্ছিল, সেটাও মিশিয়ে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এত বেশী ঘৃণা হয়ে গিয়েছিল যে, সেদিকে দৃষ্টি গেলেও শরীর কেঁপে উঠছিল হাতও উঠছিল না তখন ক্লান্ত হয়ে সেই কড়াতেই বসে পড়েছিলেন।

গ্রামবাসীগণ তালা খুলে দেখেছিল যে, ঘরময় ফুলূরি ছড়িয়ে, তারা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল-''মহারাজ এসব কি? ''মহারাজ বলেছিলেন- চিন্তা করো না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। সকলে তাঁকে স্নান করিয়ে আশ্রমে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। সেইদিন থেকে ফুলুরি কেন কোন কিছু খাওয়ার কথা মনে আসেনি। বস্তুতঃ এই মন খুবই দুষ্ট। যখন আপনি চিন্তন পথে চলতে শুরু করবেন, তখন তো খুব ভালো লাগবে কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর মনে উচাটন দেখা দেবে। ভজনা সম্পূর্ণ করে নেওয়ার পরও এই কুটিল মন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না মন সেই অনুপাতেই বিঘ্নও উপস্থিত করে।

প্রত্যেক মহাপুরুষকে এইরূপ বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মহারাজ ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্য খুব সম্পন্ন ছিল। একদিন রাজা তাঁর রানীর মধ্যে দোষ দেখতে পেয়েছিলেন। সংসারের প্রতি তাঁর ঘৃণা উৎপন্ন হয়েছিল। মনে বৈরাগ্য উদিত হয়েছিল। গুরু গোরখনাথের শরণে পৌঁছে ছিলেন। গোরখনাথ বস্তুতঃ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ভর্তৃহরিকে সাধনা-বিধি অবগত করিয়েছিলেন। রাজা সাধনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পাগলের ন্যায় দিগম্বর বেশে কোমরে শুধু একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে দিবা-রাত্রি ভজনাতে রত থাকতেন। দু'দিন তিন দিন উপবাসে কাটানো সামান্য ব্যাপার ছিল তাঁর জন্য। তিনি দিনে একবার মাত্র ভিক্ষা করতে বেরোতেন স্বতই যা পেতেন, স্বীকার করে নিতেন। কারও কাছে কিছু না চাওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন তিনি।

একদিন তাঁর মনে জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। এখন তাঁকে জিলিপি দেয় কে? ভক্ত তো তাঁর অনেক ছিল, কিন্তু তারা জানবে কি করে যে মহারাজের জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। একদিন ভর্তৃহরি এই ভেবে ময়রার দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন যে, যদি কোন ভক্ত এসে তাঁকে সেখানে দেখে জিলিপি কিনে দেয় কিন্তু ভগবানও কম কৌতুকী নন, দীর্ঘ পরীক্ষা নেন। তাঁকে জিলিপি কিনে

দেওয়ার কথা কারও মনেই আসছিল না। এই ভাবে দু'মাস ব্যতীত হয়েছিল। যখনই ভজনাতে বসতেন জিলিপির চিন্তা করতেন, ধ্যানে বসতেন, ধ্যানকালেও জিলিপিই থাকত নাম জপ করতে বসতেন তখনও জিলিপি -জিলিপিই জপ করতেন। ভর্তৃহরি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন বাধ্য হয়ে তিনি নির্মাণাধীন একটি গৃহে সারাদিন মাটি বয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু পয়সা পেয়েছিলেন। মাটি হাতেই পয়সা নিয়ে ছুটে ছিলেন ময়রার দোকানে। পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই দোকানদারের দিকে পয়সা ছুঁড়ে 'জিলিপি' বলেছিলেন। দোকানদার তাঁকে সস্তার বাজারে এক ঝুড়ি জিলিপি দিয়েছিল। ভর্তৃহরির মন বলে উঠেছিল আর দেরী কেন খেতে শুরু কর। তিনি মনকে বুঝিয়েছিলেন-"রে মন! তোর জন্য আমি সারাটা দিন মাটি বয়েছি। দেখ তো! হাতে মাটি লেগে রয়েছে। গঙ্গায় হাতদুটো অন্ততঃ ধুয়ে নিই।" ছুটে গঙ্গার ধারে পৌঁছেছিলেন। হাত- পা ধুয়েছিলেন। মন তো জিলিপির দিকে ছিল। থেকে-থেকে জিবে জল আসছিল। মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি হোক খেয়ে নেওয়া যাক।

ভর্তৃহরি গঙ্গার ধারে বসে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন- "ওহ ! এমন কোন মিষ্টি নেই যা আমি খায়নি। জাফরান, কস্তুরী এবং মোহর দ্বারা সাঁতলানো মিষ্টি খেতাম আমি, কিন্তু ময়দার সাধারণ জিলিপির জন্য দুষ্ট মন আমার সাধনাতে ব্যবধান উৎপন্ন করেছে। এই চিন্তা আসতেই ভর্তৃহরি একটি জিলিপি হাতে তুলে নিয়ে মুখ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন- "কি সুন্দর । কেমন লাল-লাল কুরকুরে জিলিপি রসে একেবারে পূর্ণ।" এই প্রকার মনকে লোভ দেখাচ্ছিলেন এবং এক-একটি করে জিলিপি জলে ফেলে দিচ্ছিলেন। শেষ জিলিপিটা জলে ফেলার আগে একটা ছায়া সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে ভর্তৃহরিকে বলেছিল- 'এটা আমাকে দিয়ে দিন।' ভর্তৃহরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"তুমি কে?" সে বলেছিল- "আপনার ইচ্ছাশক্তি!" ভর্তৃহরি রেগে বলেছিলেন- কপটাচারিণী! ঘরবাড়ি ছেড়েছি, এমন কোন মিষ্টি নেই যেটা তুই খাসনি। কিন্তু ইচ্ছাদেবী! তুই আমাকে শেষাশেষি ফাঁসি দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হলি। ঘরবাড়ি ছেড়ে ভজনা করছিলাম ভজনা ছাড়িয়ে আজ সারাদিন মাটি বওয়া করিয়েছিস। এখন তো তোমাকে জিলিপি দেবোই।" ইচ্ছাশক্তি বলে উঠেছিল- "এই একটা জিলিপি খেয়ে নিন। এরপর আর কিছু খাওয়ার আপনার ইচ্ছা হবে না।" ভর্তৃহরি সেই জিলিপিটা খেয়ে জলপান করেছিলেন এবং সেখান থেকে উঠে

চলে গিয়েছিলেন। এরপর তাঁর সাধনা সুচারুরূপে চলতে থাকে। তাঁর জীবনে এইরূপ আরও একটি ঘটনা ঘটিত হয়েছিল। বেনারসের মত পানের অনুরাগী শহর মহোবার অলিগলিতে ভর্তৃহরি দিগম্বরবেশে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কাগজের উপর কেউ পানের পিক ফেলে দিয়েছিল। চাঁদনি রাতে সেই পিক চক্‌চক্ করছিল। ভর্তৃহরি ভেবেছিলেন- ''এটা মণি হতে পারে। কোটিপতিদের পাড়া। কোন ধনীব্যক্তির পড়ে গেছে হয়ত। কেউ না কেউ তো উঠিয়ে নেবেই। আমিই নিয়ে নিই না কেন? কোন মহাজনকে দিয়ে দেব, তার পরিবর্তে যে টাকা পাব সেই টাকা দিয়েই দিনপাত করে ভজনা করব।" তাঁর মন বিচলিত হয়ে উঠেছিল। যেই তুলতে গিয়েছিলেন অমনি পিকে হাত রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। আলোতে দেখে পশ্চাত্তাপ করে উঠেছিলেন-''রে দুষ্ট মন! তুই রাজা ছিলি, চক্রবর্তী রাজাদের ন্যায় তোর জীবন যাত্রার রীতি ছিল। কোন্ মণি তুই চোখে দেখিসনি। ওরে দুষ্টু! তুই ত্যাগী, মহাপুরুষের অনুগামী। ভগবানের জন্য তুই সবকিছু ত্যাগ করে কটিবদ্ধ ছিলি। একটা মণির লোভে আমাকে পতিত করলি।" এরপর কয়েকটা দিন তিনি উপবাসে কাটিয়েছিলেন, মনকে খুব শাসন করেছিলেন, পুনরায় মন সবল হয়ে উঠেছিল। এই ভর্তৃহরিই ভবিষ্যতে পূর্ণ তপোধন মহর্ষিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। যিনি 'বৈরাগ্যশতক' লিখেছেন।

বস্তুতঃ ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা যখন জাগে, তখন মায়িক প্রবৃত্তি সেই নিষ্ঠাকে ধাওয়া করে। মায়িক প্রবৃত্তিকে নিবারণ করার জন্য মনকেই সবল এবং সক্ষম করে তুলতে হয়, শাসনে রাখতে হয়। ইন্দ্রিয়গুলি খুবই চঞ্চল, সর্বদা বিষয় থেকেই সুখ লাভ করতে চায়, ঠিক নর্দমার কীটের মত। সেইজন্য কোন সাধক মহাপুরুষের সংরক্ষণে যদি বা যায় মনে শীঘ্রই উচাটন দেখা দেয়। যখনই রুটি তৈরী করতে হয়, বাসন মাজতে হয়, অমনি মন চিন্তা করে-'' দূর এখানে বড় কষ্ট। এইসব কাজ করতেই কি এখানে এসেছিলাম? যাই অন্য কোথাও গিয়ে ভজনা করব।" আরে! ছাই ভজনা করবে। মহাপুরুষের সান্নিধ্যে সেবা করতে-করতে যখন মনে এতটা ক্ষমতা চলে আসে যে, চার ঘন্টা ধ্যানে অনায়াসে বসতে পারে, মন ধীরে-ধীরে স্থির হয়ে আসে তখন আশ্রমের বাইরেও ভজনা করা যায়। এই ভজনা করার ক্ষমতা লাভ করার জন্যই তো মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থেকে সেবা করার প্রয়োজন হয়। সাধকের মন ভজনা পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলে মহাপুরুষগণ এইরূপ সাধককে নিজের আশ্রমের কাজের জন্য আটকেও রাখেন না। সদ্‌গুরু যখন কাউকে

শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন তখন তাকে গুরুতেই পরিণত করেন, শিষ্য করে রাখেন না। মহাপুরুষগণ আশ্রম ঝাঁট দেওয়ার জন্য কাউকে শিষ্য করেন না। তাঁরা শিষ্যকে নিজের কাছে রাখেনই এই কারণে যাতে শিষ্যরা তাঁদের বাস্তবিক বিদ্যার বিধি অবগত হয়ে সেটাকে আচরণে পরিণত করতে পারে এবং রামবাণের মত ইষ্টের দিকে শনশন করে এগিয়ে যেতে পারে।

বন্ধুগণ! ধানের খোসার ন্যায় জীবের ভিতর আবিলতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক, তবুও তা নষ্ট অবশ্য হয়ে যায়। অতএব উদ্যোগী হও কঠোপনিষদের নির্দেশ হল- **'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'**- ওঠ! জাগো! মহাপুরুষের নিকট গিয়ে সেই ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হও।

—::২১::—

সংস্কার বশতঃ ব্যক্তি ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে আশ্চর্য করার কিছু নেই। পূজ্য মহারাজজীর কাছে যখন কোন ব্যক্তি কারও নামে নালিশ করত যে, এত বয়স হওয়ার পরও সে এইরূপ ভুল করছে তখন মহারাজজী হেসে-হেসে তাকে বলতেন- "হো! পাকা আমকে শুরুতে ধীরে-ধীরে চুষে খায় কিন্তু যেমন-যেমন রস ফুরিয়ে আসে মানুষ আঁটিটাকে আরও জোরে চুষতে শুরু করে। দেহটা জীর্ণ হলে কি হবে মন বৃদ্ধ হয় না, বাসনা আরও উগ্র রূপ ধারণ করে। সাধনা ও প্রভুকৃপা দ্বারাই বাসনা নিবৃত্তি হয়। এক গ্রামে দু'জন মহিলার মধ্যে খুবই ঈর্ষাভাব ছিল। ছিদ্রান্বেষণ হচ্ছিল, সহসা উগ্ররূপ ধারণ করে এক মহিলা বলে উঠেছিল- "তোমার তো ধোপার সঙ্গে ভাব ভালবাসা আছে।" অন্যজন রেগে বলে উঠেছিল-"তুমি কোন মুখে একথা বলছ? তোমার সম্পর্ক যে চামারের সঙ্গে আছে তা আমারও জানা আছে! একটু আগেই ওখানে কথা বলছিলে দুজনে।" প্রথম জন তক্ষুণি সতর্ক হয়ে বলেছিল- "চুপ চুপ ! তৈঁ রাখি লিহে ধোবী, হম রাখি লিহে চমার। না তৈঁ কহী হমার, না হম কহী তোহার।" কে যে ধোয়া তুলসী পাতা? **'জো জস করই সো তস ফলু চাখা।'** ওর কর্ম নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা কেন। তুমি নিজেকে দেখ! পাঁও তর কা বরল দিখাতৈ নাহীঁ, পাহাড় পর বরেলা!

এই সন্দর্ভেই মহারাজজী একটি কাহিনীও শোনাতেন। এক নদীর তীরে উত্তম বেশভূষার একজন মহাত্মা মাছ ভাজছিলেন। এক বিদ্বান পন্ডিত তাঁর পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। মহাত্মাকে মাছ ভাজতে দেখে তিনি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন- "মহারাজজী! আপনি মাছ ভাজছেন?" মহাত্মা বলেছিলেন- "হ্যাঁ!"

পন্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ‘‘আপনি মাছ খান’’, মহাত্মা বলেছিলেন- ‘‘হ্যাঁ!’’ পন্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন-‘‘তবে তো আপনি মদিরা পানও করেন?’’ মহাত্মা বলেছিলেন- ‘‘হ্যাঁ’’ পন্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘‘তবে আপনি বেশ্যা-গমনও করেন নিশ্চয়?’’ একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল পন্ডিতকে বলেছিলেন- ‘‘ওরে পন্ডিত! যখন আমি পতিত হয়েই গেছি তখন এমন কোন কুকর্ম আছে যেটা আমি করি না? কি বার- বার জিজ্ঞাসা করে মাথা গরম করে দিচ্ছ? নিজের কাজে যাও, আমার তো বিপদ লেগে রয়েছেই।’’

মহারাজজী বলতেন- ‘‘এই ভগবৎ পথ থেকে ভালো আর কোন পথই নেই কিন্তু এই পথে চলাটা অত্যন্ত কঠিন। চঢ়ে তো চাখে রামরস, গিরে তো চকনাচুর।’’

অতএব কারওকে ভুল করতে দেখে হাসতে নেই, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। সাধকের শুধু নিজের দোষ দেখা উচিৎ, যতদিন না ভগবৎ দর্শন হয় ততদিন সাধকের ছোট দোষও গুরুতর অপরাধের সমান কারণ সেইজন্যই তো ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না। ঈশ্বর দর্শনের আগের দিন পর্যন্ত ভরত অধীর ছিলেন। নিজের কর্মের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। এখন বলুন ভরতের কর্ম কি খারাপ ছিল? মহর্ষিগণ তো বলেছিলেন- ‘**সমুঝব কহব করব তুম্হ্ জোঈ। ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ।।**’ *(মানস, ২/৩২২/৮)* বর্তমানে তো ভরতের কর্মকেই ধর্মের মানদন্ড বলা যেতে পারে, তা সত্ত্বেও ভরত নিজেরই মধ্যে দোষ দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর চিন্তনে কত দীনতা ছিল? সাধকের থেকে দীন সংসারের কোন জীব হয়ই না। সে তো ইষ্টের ইচ্ছায় তাঁর সঙ্কেত অনুসারে কর্ম করে, স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা তার থাকে না। ভগবান থেকে একচুল দূরে থাকলেও সাধকের নিজেকে ঠিক বলে মনে করাটা উচিৎ নয়। সাধনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিরহ বৈরাগ্যে ন্যূনতা আনাটা উচিৎ নয়। প্রাপ্তির পর সেই সাধকের সাধনা করার প্রয়োজন থাকে না। সাধক তখন অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু সাক্ষাৎকার করার পূর্বে দীন ভাবে সাধনাতেই রত থাকার বিধান রয়েছে। অন্যের দোষ দেখার তার কি প্রয়োজন? **করৈ আপকে; না মাঈকে না বাপ কে।**

—::২২::—

পূজ্য মহারাজজী বলতেন যে প্রারব্ধ ভোগ করতেই হয় কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় তাও কেটে যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে ইঙ্গিত করে একটি কাহিনী শোনাতেন। একবার এক সাধক পূজ্য মহারাজজীর কাছে নিবেদন করেছিল- ‘‘মহারাজ! গয়া যাওয়ার ইচ্ছা করছে। মহারাজজী তাকে বলেছিলেন-‘‘দেখ! গয়াতে গিয়ে কোন লাভ হবে না। ‘**তীরথহু মে খোজিয়া, গহরী বুড্ডী মার। জল পষান কে বীচ মে, কিন পায়া করতার।।**’ তীর্থ ব্রত করলে পুণ্য পুরুষার্থ প্রবল হয় কিন্তু সেটুকুই পর্যাপ্ত নয়। এর পরিণাম হল যৌগিক ক্রিয়ার জাগরণ। চিন্তনে মন বসতে শুরু করেছে তোমার সেইজন্য তোমার পক্ষে এখন ভজনাতে প্রবৃত্ত থাকাটাই শ্রেয়স্কর হবে। আর তোমার গয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নির্জনে অনবরত ভজন চিন্তনে রত হও।’’

দু’মাস পর সেই সাধক পুনরায় বলেছিল ‘‘মহারাজজী! গয়া যাওয়ার ইচ্ছা করছে।’’ কিছুদিন পর পুনরায় বলতে শুরু করেছিল- গয়া যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে। যখনই ভজনা করতে বসি গয়ার কথা মনে পড়ে। মহারাজজী ভেবে ছিলেন- ‘‘কল্যাণ তো আমার দ্বারা হবে। এ যে গয়া-গয়া করে যাচ্ছে। ভুক্তি-মুক্তি তো আমার কাছ থেকে পাবে তবে কেন বার-বার-গয়া-গয়া করছে?

তার চিন্তনে মহারাজজী প্রবেশ করে জানতে পেরেছিলেন যে সাধকের কাছে একজন ব্যবসায়ীর আট-দশ দানা ছোলা পূর্বজন্মের বাকী রয়েছে। সেই দানাগুলোই মনকে গয়া যাওয়ার জন্য প্রেরিত করছে। মহারাজজী ভেবেছিলেন- ‘‘আমার ভক্ত এতদূর যাবে। আট- দশ দানা মাত্র তো পাবে, পেটভরে খাওয়ার এতটাও তো পাবে না। এদিকে আট- দশ দানাই মনকে গয়ার দিকে আকৃষ্ট করছে।

পূজ্য মহারাজজী সর্ব-সমর্থ ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ীর মনে তীর্থ করার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীর মনে তীর্থ করার ভাব উদিত হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ভ্রমণ করতে-করতে চিত্রকূট হয়ে অনুসুইয়া পৌঁছেছিল। স্বভাব এবং প্রথাবশতঃ টাকা-কুড়ি আনা বার করে মহারাজজীর চরণে নিবেদন করেছিল। টাকা বার করার সময় পকেট থেকে দশ দানা ছোলাও পড়েছিল। মহারাজজী ছোলা দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন- ‘‘অ্যাঁ! কোত্থেকে আসছ?’’ সে বলেছিল- ‘‘মহারাজজী গয়া থেকে আসছি। ওখানে আমার ছোলার আড়ৎ রয়েছে।’’ মহারাজজী বলেছিলেন- ‘‘ঠিক আছে- ঠিক আছে যে ছোলাগুলো পড়ে গেছে, সেগুলো আমাকে কুড়িয়ে

দাও।” ব্যবসায়ী খুব সঙ্কুচিত বোধ করেছিল বলেছিল- “মহারাজ! এগুলো তো মাটিতে পড়ে গেছে। অন্য আনিয়ে দিই? ” মহারাজজী বলেছিলেন- “আরে না! তুমি এই ছোলাগুলোই কুড়িয়ে আমাকে দাও।” মহাপুরুষের আজ্ঞা! বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ী সেই দানাগুলো কুড়িয়ে দিয়েছিল। মহারাজজী কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে তাকে বিদায় করেছিলেন।

ব্যবসায়ী যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সেই সাধক মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। মহারাজজী বলেছিলেন- “নাও প্রসাদ এক্ষুণি আমার কাছে খাও।” শিষ্যটি বিনীত ভাবে ছোলা কটা নিয়ে মুখে পুরেছিল এবং জল পান করেছিল সেখান থেকে চলে গিয়ে সে গয়া যাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল। চার - ছ মাস পরে একদিন গুরুদেব স্বয়ং তাকে বলেছিলেন- “বৎস ! সাধককে ইষ্টের উপর নির্ভর করে নিরাধার বিচরণ করা উচিৎ । কিন্তু তুমি যদি যেতে চাও তবে আমার কাছ থেকে পথ খরচ নিয়ে নাও। যদি অন্য কোথাও নাও যাও , তবু গয়া অন্ততঃ ঘুরে এস।” শিষ্যটি বলেছিল - “জানি না মহারাজ কি যে হয়েছে! আর গয়া যাওয়ার ইচ্ছা এতটুকু নেই।”

বস্তুতঃ অন্ন জলের সংস্কার খুব প্রবল হয়। জানতেও পারা যায় না কিভাবে, কোথায় যে নিয়ে যায়। বলপূর্বক মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। অতএব প্রারব্ধে কি-কি ভোগ বাকী আছে- এই ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে দু'আড়াই অক্ষরের কোন নাম নির্বাচন করে সেই নাম জপ করে যান এবং কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবা করুন। মহাপুরুষগণ ইচ্ছা এবং সংস্কার বিলয় করে নেন সেইজন্য তাঁদের সেবাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রারব্ধের সংক্রমণ তাঁদের মধ্যে সহজেই হতে থাকে কারণ চাপ সর্বদা রিক্ত স্থানের দিকেই যায়। দয়ালু মহাপুরুষ সে সমস্ত ভোগ অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগ করে সেবকদের কল্যাণ করতে থাকেন। ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও সম্পূর্ণ সৃষ্টি হতে প্রভাবিত হয় কিন্তু ভক্তদের ভাব অনুসারে মহাপুরুষ নিয়মবদ্ধ বিধি-বিধানেও পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন না। ভবিতব্য অখন্ডনীয় কিন্তু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত মহাপুরুষের সংরক্ষণে তাও কেটে যায়।

পূজ্য মহারাজজী প্রায়ই বলতেন-

পূরব কী কমাঈ পশ্চিম মে গঁবাঈ।
আগরে কী খোজ খবর কুছ নহীঁ পায়ী।
পায়ী তো দিল্লী কে দলালো নে সৌদা বিগাড় দিয়া।
সঙ্গ কে সঁঘাতী কহেঁ লাহৌর লাহৌর।

নাভা পটিয়ালা কে বীচ এক অজব চিজ পাঈ।
সহারনপুর কা সহারা লেকর গাড়ী হরিদ্বার আয়ী।।

রেলওয়ে স্টেশনের এই রূপকের মাধ্যমে মহারাজজী বোঝাতেন যে, পূর্বজন্মের সঞ্চয় এই জন্মে নষ্ট করছ। ভবিষ্যৎ জন্ম অজানা। কদাচিৎ অল্প বিস্তর যদিও খবর পাওয়া যাচ্ছিল তো হৃদয় (দিল) রূপ দিল্লীর দালাল-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অনন্ত ইচ্ছা এবং বাসনা কারবার নষ্ট করে দিল, লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দিল। সঙ্গের সঙ্গীরা সতর্ক করছে এবং বলছে আত্মোন্নতি কর। নাভা হচ্ছে নাভিকমল, প্রেমই পাটিয়ালা। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নিযুক্ত হলে অদ্ভুত এক বস্তুলাভ হয়-সুরত! (মনের দৃষ্টি) এই সুরতরূপ সহারনপুর-এর সাহায্যে জীবনরূপ গাড়ী, সমস্ত বৃত্তি সংযত করে হরিদ্বারে অর্থাৎ স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এইপ্রকার অনুরাগপূরিক হৃদয়ে ভজনা করার সম্পূর্ণ সাধনা গুরুদেব বুঝিয়ে দিতেন।

—::২৩::—

গুরুমহারাজের শরণে থাকার যখন অনেক যুবা সাধক অনুমতি পেয়েছিল, তখন তিনি প্রায়ই তাদের সতর্ক করে দিতেন- ‘‘হো! যুবাবস্থা রাত্রিতুল্য। কখন যে উঁচু নীচুতে পা পড়বে বলা যায় না। সেই জন্য সাধকদের উঠা-বসা, চলা ফেরা যে কোন কাজের সময় মনকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস অথবা গুরুর চরণ ধ্যানে নিযুক্ত রাখা উচিৎ। অল্প অসাবধান হলেই স্মৃতিবিহীন সাধক বিপদকেই আমন্ত্রণ দেয়। অতএব সর্বদা ভরত, সুতীক্ষ্ণের মত চিন্তনে অনুরক্ত সাধকই সফল হতে পারে।

এই সন্দর্ভে পূজ্য মহারাজজী একটি কাহিনী শোনাতেন। একজন মহাত্মা বাল্যকাল থেকেই ভজনে অনুরক্ত ছিলেন। প্রায় আশি বছর বয়স ছিল তাঁর। ভক্তরা গ্রামের বাইরে পুকুরের ধারে তাঁর জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করে দিয়েছিল। সেই শান্ত নির্জন কুটীরে সেই মহাত্মা যখন নিজের বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন অনায়াসে তাঁর মুখ দিয়ে এই বাণী উচ্চারিত হত- ‘‘হুঁ ,অগলী নীক, পিছলী নীক, বিচলী নাহীঁ নীক।’’ তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই এই শব্দ প্রস্ফুটিত হত।

তাঁর কুটীর পুকুরের ধারেই থাকার ফলস্বরূপ তিনজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক জল নিতে এসে তাঁর মুখ থেকে এইরূপ শব্দ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কটাক্ষ করে বলেছিল- ‘‘চুল সাদা হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে কিন্তু তবুও এঁর দৃষ্টি এখনও সাংসারিক।’’ তারা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে আগের মহিলাটিকে পিছনে এবং মাঝের মহিলাটিকে আগে করে চলতে শুরু করেছিল কিন্তু মহারাজজীর বাণী যথাবৎ ছিল।

তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মহারাজজী তাদের উদ্দেশ্য করে একথা বলেননি তবুও বাড়ী ফিরে পরিজনদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে হাতে লাঠি নিয়ে মহারাজজীকে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল যে, কে এই সাধু? নিজেদেরই গুরু মহারাজকে সেখানে দেখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কুটীরের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়ে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর আবার সেই একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল-'এখন যে আপনি বাক্যটি প্রয়োগ করলেন, এর অর্থ কি মহারাজ।'

সেই মহাত্মা বলেছিলেন-'বৎস! জীবনের তিনটি অবস্থা-বাল্যাবস্থা, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা। আমি ছোটবেলা থেকেই সাধু। বাল্যাবস্থা ভালই কেটেছিল। আন্তরিকভাবে গুরু মহারাজের সেবা করতে পেরেছিলাম এখন বৃদ্ধাবস্থাও সন্তোষজনক, শান্তিতে আছি। ভজনাকালে সঙ্কল্প-বিকল্প-এর আবৃত্তি হয় না; কিন্তু যুবাবস্থাতে ব্যবধান-বেশী এসেছিল। গুরু মহারাজজীর দয়া, কৃপার জন্য খুব জোর বেঁচে গেছি তা না হলে কি যে হত। সেইজন্য আমি বলি ভজনার উপযুক্ত সময় বাল্যাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থাও সন্তোষজনক কিন্তু মাঝের সময়টা অর্থাৎ যুবাবস্থা সংঘর্ষ করে কাটল, এটা ঠিক নয়। এই সময়টা অসিধারা তুল্য খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মত। খুবই কঠিন। এ সময়টা পার করার সময় খুব সাবধানের প্রয়োজন। গ্রামের লোকেরা সেই তিনটি মহিলার নালিশ সম্বন্ধে জানিয়েছিল। মহাত্মা স্মিতমুখে বলেছিলেন, ''আমি খেয়াল করিনি কখন তারা এসেছিল। তাদের বোলো, যাতে তারা ভজনা করে, তবেই কল্যাণ হবে।''

অতএব সাধককে বলা, শোনা, দেখা, কোন কাজ করার পূর্বে সর্বত্র সংযত হওয়া উচিৎ। যে এই নিষেধগুলি মেনে চলে, সেই সফল হয়। তা না হলে উপলব্ধিতে এক দুটো জন্ম আরও লেগে যায়।

—::২৪::—

পূজ্য মহারাজজীর বাণী সূত্ররূপেই প্রস্ফুটিত হত। কথাবার্তার মাঝেই সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। মহারাজজী প্রায়ই বলতেন কুপাত্রে দান করলে দাতা নষ্ট হয়ে যায়। অনাধিকারীকে বিদ্যা দান করলে দাতার অপকার এবং বিদ্যা নাশ হয়। **'ইয়হ্ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহি।'** *(মানস, ৭।১২৭। ৩)* ইত্যাদি চৌপাইগুলির উল্লেখ করে অনেক এইরূপ তথ্য সম্বন্ধে বলতেন। পূজ্য মহারাজজীর বাস্তবিক

বিদ্যা, যাকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বলতেন, গুরুদেবের কতিপয় শিষ্য দ্বারা অদ্যাবধি আর্ত অধিকারীদের মাঝে সেই বিদ্যার প্রচার-প্রসার হচ্ছে। এটা চিরন্তন বিধান যে মহাপুরুষগণ আর্ত অধিকারীদের কাছে কৃপণতা করেন না-**'গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ।।'** *(মানস, ১/১০৯/২)*

প্রস্তুত কৃতি যথার্থের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং এই সম্বন্ধে প্রারম্ভিক বিধি-নিষেধের পরিপালনের জন্য প্রেরণা মাত্র। এটা মানব মাত্রের মানস-ধর্ম এর অভিমুখে করে, যাতে নিশ্চিত কল্যাণ হয়। সাধনার বিলুপ্ত প্রায় মানসিক এবং আধ্যাত্মিক রহস্যগুলির উদ্ঘাটন বিশ্বমানবের জন্য পূজ্য মহারাজজীর অশেষ কৃপা। সামান্য কথাবার্তা এবং গীতগুলিতে অধ্যাত্মের নিরুপণ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। 'শ্রীরামচরিতমানস', 'গীতা', 'পাতঞ্জল যোগদর্শন' মহারাজজীর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। মানস এর জন্য বলতেন **'বাল আদি উত্তর কৈ অন্তা। বীচ অযোধ্যা ডুবৈ সন্তা।।'** বালকাণ্ডের প্রারম্ভিক চৌপাইগুলি এবং কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের বর্ষা, শরৎ-এর বর্ণনা গুনগুন করে গাইতে-গাইতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। লোক জীবনে প্রচলিত কয়েকটা পদ এবং ভজন পূজ্য মহারাজজীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন-

গুরু উড়ি চলো দেশবা বিরানা হ্যায়।

★

ছাও ছাও হো ফকিরবা গগন কুটিয়া।।
আসন মারি মগন হোই বৈঠে, ধ্যান ধরে লৌকেলা তিরকুটিয়া।।

★

মোরি সুরত সুহাগিন জাগ রী।
কা সোবত হ্যায় মোহ-নিশা মে, উঠ কে ভজনিয়া মে লাগ রী।
মোরি সুরত সুহাগিন জাগ রী।
চিত দে শব্দ সুনো সরবন লগি, উঠত মধুর ধুন রাগ রী।।
মোরি সুরত সুহাগিন জাগ রী।।

★

শম্ভু করৈঁ অসনান, গৌরা পনিয়া ভরেঁ।।

★

ভজ লে মন রাম সিয়া, রাম সিয়া, রাম।
রাম নাম নির্মল নীর... রাম নাম কমল ফুল... রাম নাম

বেদ মূল... রাম নাম ওঁকার...

★

শিব শিব জপত মন অনন্দ।

কটত কোটি জম কো ফন্দ।।

★

ওঁ গুরু শরণম্ শ্রী হরি শরণম্।।

★

হরি ওম্ সিদ্ধম্, হরি ওম্ সিদ্ধম্।।

★

জব লগি রাম নাম জীহা তূ না জপিহৈ।

তব লৌঁ তূ কহূঁ জায়, তিহূঁ তাপ তপিহৈ।।

পূজ্য মহারাজজীর বাণী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাগুলির ঊর্দ্ধ্বে এবং মনুষ্যমাত্রের জাগৃতি, উত্থান এবং কল্যাণের জন্য সমান প্রেরণা প্রদান করে। এই বিষয়ে চিন্তন করুন, স্বীয় কল্যাণের জন্য কটিবদ্ধ হোন। অন্যথা "**ধোবী বসি কে ক্যা করে, দিগম্বরন কে দেশ।।**" নাগাদের গ্রামে ধোপা কি কুশলতা দেখাবে? সদুপদেশগুলির অনুসারে আচরণের প্রেরণা প্রদান করাই এই কৃতির অভীষ্ট।

।। ওঁ ।।

মহারাজজীর বিদ্যা

অনুসুইয়া পৌঁছানোর দু'দিন পরেই ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে চিত্রকূট যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। মহারাজজী তাঁকে বলেছিলেন, ''একেও সঙ্গে নিয়ে যাও, পথে সাধনা পথের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে অবগত করিও।'' তিনি বলেছিলেন যে, সর্বদা ভজনে নিযুক্ত থাকা উচিৎ। একটা শ্বাসও চিন্তন বিহীন, ব্যর্থ যেন না যায়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''এখন যেতে-যেতে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এইরূপ অবস্থাতেও কি ভজনা সম্ভব? তিনি বলেছিলেন, ''দশ কুড়ি মিনিটের অন্তরাল কোন ব্যবধান উৎপন্ন করে না।'' এই সমাধান আমার যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হল না। একটাই কথা মনে ধরল যে, একটা শ্বাসও বৃথা যেন না যায়। নিয়ম তো নিয়ম! এখানে শিথিলতা কি রকম? আশ্রম পৌঁছানোর পর গুরুদেব বোঝালেন, সাধকের দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া উচিৎ। এতে হঠকারিতাও চলে। হঠ-এটাই হনুমান। পরিস্থিতি যা-ই হোক, দৃষ্টি সদা লক্ষ্যের উপরই থাকা উচিৎ। অন্তরায় (মনের বিকার)গুলির সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণামের প্রতিফলন হল উপলব্ধি।

সাধককে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিৎ। মনের মধ্যে বিষয়চিন্তন যেন না আসে। নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা এতে দৃঢ়তা আসে। **'সঙ্গ তেঁ জতী কুমন্ত্র তে রাজা।'** ***(মানস ৩/২০/১০)***-বৎস, সঙ্গদোষের প্রভাবে উঁচুস্তরের সাধকও পতিত হন। সাধককে সদৈব সজাগ থাকা উচিৎ। নিজের থেকে উন্নত অবস্থা যাদের, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিৎ। সূর্পনখা-এর নাক-কান না কর্তন করে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে না। সাধকের জন্য সংসারের প্রতিটি স্ত্রীলোক মাতৃতুল্য। তাদের উপর যাতে দৃষ্টি না পড়ে সেই চেষ্টাই করা উচিৎ। কারণ সে তো আর পুত্রতুল্য ভাবে না। তার দৃষ্টি সাংসারিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে দৃষ্টিপাত করে যে চিন্তা করে সেটারও প্রভাব পড়ে। একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই কথা বলা উচিৎ কিন্তু দৃষ্টি লক্ষণের মত সদৈব চরণে নিবদ্ধ রাখা উচিৎ এবং মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করে নেওয়া উচিৎ। শুধু চিন্তনে মনকে নিযুক্ত করে রাখা উচিৎ।

নাম-মহারাজজী বলেছেন 'ওঁ', 'রাম' 'শিব' দু'আড়াই অক্ষরের যে কোন একটা নাম নির্বাচন করে নাও। কিছুকাল লক্ষ্য করার পর দেখেছিলাম যে, মহারাজ প্রণব মন্ত্র জপ করেন। অতএব আমিও 'ওঁ' জপ করতে শুরু করেছিলাম। নাম-জপ-এর বিধির উপর আলোকপাত করে মহারাজজী বলেছেন যে, একটা

নামকেই চারটি শ্রেণীতে জপ করা হয়-বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি এবং পরা। নাম-জপ-এর প্রারম্ভিক অবস্থা হল বৈখরী। বৈখরী জপ ব্যক্ত হয়। বৈখরী জপ-এ নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয়, কেউ কাছে থাকলে স্পষ্ট শুনতে পাবে। মধ্যমা শ্রেণীতে এই নামই মধ্যম শ্রেণীতে জপ করা হয়। এই জপ কণ্ঠ দ্বারা হয়; কিন্তু খুব কাছে বসে থাকলেও কেউ শুনতে পাবে না। নিরন্তর বৈখরী জপ না করলে মধ্যমা জাগ্রত হয় না এবং মধ্যমা নিরন্তর জপ না করলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ জপ করার ক্ষমতা লাভ হয় না। সেইজন্য বৈখরী এবং মধ্যমা শ্রেণীর জপ দীর্ঘকাল পর্যন্ত করে যেতে হয় তবেই মন শান্ত হয়। জপ-এ টিকে থাকার ক্ষমতা লাভ হয় তবেই পশ্যন্তি প্রবেশিকাতে প্রবেশ হয়। এই জপ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ সম্পাদিত হয়। শান্ত হয়ে বসে পড়। মনকে দ্রষ্টারূপে দাঁড় করাও। শ্বাস কখন ভিতরে গেল, দেখ। কতক্ষণ থাকল ভিতরে, লক্ষ্য কর। কখন বাইরে এল, দেখ। কতক্ষণ বাইরে থাকল (প্রায় আধ সেকেণ্ড) এটা দেখ। আবার কখন ভিতরে গেল, দেখ। যখন মন বুঝতে পারবে তখন ধীরে-ধীরে চিন্তনের মাধ্যমে সেই নামজপ কর। শ্বাস ভিতরে গেল ‘ওঁ’, বাইরে এল, ‘ওঁ’ অথবা শ্বাস-এ ‘রা’ এবং ‘ম’কে দেখ।

শুরুতে এই অভ্যাস খণ্ডিত হতে থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিতে তিলের ন্যায় ছোট বিন্দু মেঝেতে অথবা দেওয়ালে দিয়ে সেই বিন্দুতে দৃষ্টি কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করা উচিৎ। পূর্ণ অথবা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাক। মনে যে চিন্তন করা হয়, চক্ষু দ্বারা আমরা তা'ই দেখি। সেই বিচারগুলিকে শ্বাসের কাছে নিয়ে যাও। দেখ শ্বাস কখন ভিতরে গেল এবং কখন বাইরে এল এইপ্রকার চোখ খোলা রেখে দেওয়ালের বিন্দুটি দেখা বন্ধ করে মানসিক জপ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ কর। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ করার চেষ্টা কোরো না। স্বাভাবিকভাবে (অবস্থা ভেদ-এ অল্প বয়সীরা তাদের মত বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁরা তাদের মত) গ্রহণ ত্যাগ কর এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-এ নাম জপ করে যাও। জোর করে কোরো না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ নাম হচ্ছে কিনা দেখে যাও। যার চোখের পাতা যত বেশীক্ষণ খোলা থাকে, তার মন তত বেশী স্থির হয়। মন হল মদমত্ত হস্তী তুল্য। একে সংযত করার জন্য সুদৃঢ় স্তম্ভ এবং ততটাই সুদৃঢ় শেকলের প্রয়োজন। শ্বাস হল স্তম্ভ। সুরত (মনের দৃষ্টি)-এর শিকলে মনরূপী মদমত্ত হস্তীকে শ্বাসের সঙ্গে আবদ্ধ কর। শুরুতে এই মন বিক্ষিপ্ত হয়ই কিন্তু ক্রমে পরাবাণীর প্রবেশকালে এই মন শান্ত হয়ে যাবে। অচল, স্থির হয়ে যাবে। যখন মন-এর দৃষ্টি নামে স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত হবে, তৈলধারাবৎ শ্বাস

বাঁশের ন্যায় সোজা হয়, খণ্ডিত হয় না, তৎক্ষণাৎ অজপা অর্থাৎ পরাবাণীতে প্রবেশ লাভ হয়। পরা বাণীতে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে নাম নিজের অন্তরালে মনকে টিকে থাকার স্থান দিয়ে দেয়। ''মন অন্তর স মন্ত্র।'' যখন নাম মনকে নিজের অন্তরালে স্থির করতে সমর্থ হয়, অন্য কোন সঙ্কল্প, কোন চিন্তা ব্যবধান উৎপন্ন করে না তখন এই নাম মন্ত্রের শ্রেণীভুক্ত হয়। শুরুতে অভ্যাসকালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এ নাম জপ করার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন হত, পরে শ্বাসে সেই নাম স্বাভাবিকরূপে প্রবাহিত হয়। নামের, 'রাম' অথবা 'ওঁ'-এর ধ্বনি স্বতই ধ্বনিত হয়। সুরত (মনের দৃষ্টি) স্বতই নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করতে থাকে। সেই সময় এই জপ অজপা-এর শ্রেণী প্রাপ্ত করে নেয়। সেই সময় মন নাম জপ করে, মনে অন্য কোন সঙ্কল্প উদয় হয় না এবং বহির্জগতের কোন সঙ্কল্প ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যে নাম জপ করা হয় শুধু তার শব্দ থেকে যায়। **'সুরত সমানী সবদ মে, তাহি কাল ন খায়।'** মনের দৃষ্টিকে সুরত বলে, যখন মনের দৃষ্টি নাম জপ-এ তন্ময় হয়ে যায় তখন শুধু যে নাম জপ করা হচ্ছে তারই শব্দ হয়। এইরূপ অবস্থা লাভ হলে সাধক সেই পরম চেতনের দর্শন করে, তাঁকে স্পর্শ করে এবং তাঁতে বিলীন হয়ে যায়, এই অবস্থা কালাতীত।

ধ্যান-নামের সঙ্গে রূপের ধ্যান করার বিধান রয়েছে। ভগবান তো **'তনু বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা'** *(মানস, ১।১১৭।৭)* সর্বত্র ব্যাপ্ত কিন্তু অমূর্ত এবং অরূপ। সদ্‌গুরুর চরণযুগলের ধ্যানই হল তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায়। অতএব হৃদয়ে সদ্‌গুরুদেবের স্বরূপ ধ্যান করা উচিৎ। তুমি নিজের হৃদয়ে আমার রূপ দেখার চেষ্টা কর। **'সুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধূ।'** *(মানস, ১।৩৫।৩)* গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন যে, হৃদয় অগাধ স্থল, কক্ষ স্বরূপ। সেখানে উপযুক্ত আসন স্থাপন করুন, সেখানে নিজের গুরু মহারাজজীকে বসান। তাঁর সমস্ত দেহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখুন। যখন তাঁর চরণে মনের দৃষ্টি পড়বে তখন দৃষ্টিকে তাঁর চরণে তারপর পায়ের নখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। এসবই সম্পাদিত হবে মানসিকভাবে। যখনই তাঁর চরণে ধ্যান কেন্দ্রিত হতে শুরু করবে তখনই যাকে ভজনা বলে, তা আপনার হৃদয়ে জাগ্রত হবে। যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ততটাই স্পষ্ট যখন গুরু মহারাজজীর রূপ ধ্যানকালে হৃদয়ে প্রকট হবে তখন জানবেন যে, ধ্যান ঠিক-ঠিক হচ্ছে। শুরুতে রূপ দেখার চেষ্টা করবেন যখন, তখন তা স্পষ্ট হবে না মন বেশীক্ষণ রূপ ধরে রাখতে সক্ষম হবে না, এর জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। **'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।'** *(গীতা, ৬।৩৫)*

মহারাজজী যখন তাঁর রূপ ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইনি তো মহাপুরুষ, দেহধারী, আমার তো ভগবানকে প্রয়োজন। এঁর রূপ দেখার অভ্যাস করলে ভগবানকে কি করে লাভ করব? কিন্তু যেহেতু আদেশ ছিল সেইজন্য চিন্তনকালের অর্ধেক সময় মহারাজজীর রূপ হৃদয়ে দেখার চেষ্টা করতাম এবং ততটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ-এর ধ্যান ছবিতে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করতাম। সেই ছবিটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এইভাবে আড়াই বছর কেটে গিয়েছিল। মহারাজজী যখন অন্তর থেকে নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন তখন বিরাট স্বরূপের প্রতি মোহ সমাপ্ত হয়েছিল। ক্রমশঃ মহারাজজীর রূপ ধ্যানকালে হৃদয়ে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। অন্তর থেকে তিনি আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন। যেমন তিনি বলতেন জগতে তাই দেখতে পেতাম। এবং তখনই মন আশ্বস্ত হয়েছিল।

আহার-নাম এবং রূপের সঙ্গে সাধকের জন্য আবশ্যক, করণীয় কর্তব্যের জন্য মহারাজজী আমাকে উৎসাহ দিতেন যুক্তাহার-বিহার-এর জন্য মহারাজজী জোর দিতেন। তিনি বলতেন, সাধককে একাহার অর্থাৎ দিনে একবার মাত্র ভোজন করা উচিৎ। দিনে একবার ভোজন-গ্রহণ করার পর রাত্রিতে ভোজন করা উচিৎ নয়, পেট ভরে খাওয়া উচিৎ নয়, এক দুটো রুটি কম খাওয়া উচিৎ। পেট একটু খালি থাকলে ভজনাতে মন বেশী লাগে। পেট ভর্তি থাকলে আলস্য, নিদ্রা এবং প্রমাদ ঘিরে ধরে এর ফলে সাধক সাধনাপথ থেকে চ্যুত হয় তার দ্বারা সাধনা হয় না।

মহারাজজী যেমন বলতেন, তিনি সেইরূপ আচরণও করতেন, তাঁর আচরণই উপদেশ ছিল। সকালবেলা নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি ভজনাতে বসে যেতেন, তার সঙ্গে সাধকগণ যত্রতত্র ভজনাতে রত হতেন। প্রায় দশটা নাগাদ তিনি উঠতেন। মনে পড়লে বালভোগ রূপে সকলকে গুড়ের একটা করে টুকরো দিতেন। চা ও স্বল্পাহারের নামে এটুকুই জুটত। কদাচিৎ যদি না মনে পড়ত তবে এটুকুও জুটত না।

অনুভব-তাঁর নির্দেশ অনুসারে দু'আড়াই মাস চলতে না চলতেই অনুভব জাগ্রত হয়েছিল। বস্তুতঃ অনুভব জাগ্রত হলেই ভজনা পূর্ণ নিবৃত্তি প্রদান করে। এর পূর্বে যে ভজনা করা হয় তা প্রবেশিকার জন্য চেষ্টা মাত্র। অনুভব-এর অর্থ হল অন অর্থাৎ অতীত এবং ভব হল সংসার, অর্থাৎ ভব থেকে অতীত করে যে ভজনা তার জাগৃতি। যে পরমাত্মাকে আমরা লাভ করতে ইচ্ছুক তিনি অভিন্ন আত্মা হয়ে যখন

অন্তরে জাগ্রত হয়ে যান এবং আমাদের পথপ্রদর্শন করেন। এই জাগৃতি প্রদান করা সম্ভব সদ্‌গুরু দ্বারাই। অন্য কোন পথ নেই। ধ্যানকালে যে গুরু মহারাজের রূপ হৃদয়ে ধারণ করা হয়, তিনি প্রত্যেক শ্বাসে সাধককে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে তার পথ প্রদর্শন করেন। **'যদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা। অনুভবগম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা।।'** ***(মানস, ৩/১২/১২)*** ব্রহ্ম তো অখণ্ড, অনন্ত। প্রতিটি কণায় পরিব্যাপ্ত। একে ধরব কিভাবে? গোস্বামীজী বলছেন-অনুভব দ্বারা তাঁকে জানা সম্ভব, সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। যিনি অনুভবের প্রকাশে ভজনা করেন, তিনি সাধু। মহারাজজী বলেছেন-ভগবান যখন জাগ্রত হন, তখন কাছের এই বৃক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন। মহারাজজী অঙ্গ-স্পন্দনের অনুভবগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। ডান কান স্পন্দিত হওয়ার অর্থ হল যে, যে প্রসঙ্গ চলছে তা তোমার পক্ষে শ্রবণযোগ্য। বাম কান স্পন্দিত হওয়ার অর্থ ভগবান বলছেন যে, প্রসঙ্গটি শ্রবণযোগ্য নয়, শ্রবণ করলে দুষ্পরিণাম স্বরূপ তুমি সাধনাপথ থেকে চ্যুত হবে। এইপ্রকার ডানচক্ষু স্পন্দিত হওয়ার অর্থ শুভদর্শন, বামচক্ষে স্ফূরণ অশুভ দর্শন ইঙ্গিত করে। ডান ওষ্ঠ স্পন্দিত হওয়ার অর্থ কথা বল, বাম ওষ্ঠ স্পন্দিত হলে কথা বোলো না। এইপ্রকার চিবুক, পায়ের তলা, পা কেন স্পন্দিত হয়? ইত্যাদি কয়েকটাই সঙ্কেতের নিরুপণ করে তিনি বলেছেন যে, এরপর বাকী ভগবান তোমাকে বলবেন। আমার রূপ তোমার অন্তর থেকে তোমাকে দিশা নির্দেশ প্রদান করবে। অনুভব দৃশ্য রূপেও আসতে শুরু করেছিল। যেমন ধানে ভর্তি খেত দেখা-পুণ্যে বৃদ্ধি ইঙ্গিত করে এবং ইক্ষু ইত্যাদির ফসল খেতে কাটা অবস্থাতে দেখা পুণ্যক্ষয়ের ইঙ্গিত করে। কাটা-চুল পুণ্য-ক্ষীণতার দ্যোতক। এই অনুভবগুলি দ্বারাই জানা গেল যে, বৃত্তিই সহোদরা, ভক্তিই মাতা, জ্ঞানই পিতা। এইসব প্রতিকাত্মক রূপ অনুভবে আসতে থাকে।

অনুভবের সঞ্চারই অনন্ত ধারা। কিন্তু স্থূলরূপে এর চারটি ভাগ- ১) স্থূল সুরা সম্বন্ধীয় অনুভব, ২. স্বপ্নসুরা সম্বন্ধীয় অনুভব, ৩. সুষুপ্তি সুরা সম্বন্ধীয় অনুভব, ৪. সমসুরা সম্বন্ধীয় অনুভব। ভগবান যখন আপন করে নেন তখন সাধকের রক্ষার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন। সাধক ঘুমিয়ে থাকুক, ভজনাতে বসে থাকুক অথবা যে কোন পরিস্থিতিতে থাকুক, ভগবান তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।

ডান অঙ্গ-স্পন্দনকে শুভসঙ্কেত এবং বাম অঙ্গ-স্পন্দনকে অশুভ সঙ্কেত বলে। দুটি সঙ্কেতই ভগবান দেন। পূজ্য মহারাজজী বলেছেন যে, যোগী কখনও স্বপ্ন দেখেন না। জন্ম-জন্মান্তরের দৃশ্য, অতীতের সংস্মরণ্ বর্তমানে মনের অবস্থা,

ভবিষ্যতের সঙ্কেত স্বপ্নে পাওয়া যায়। এই সঙ্কেতগুলি কখনও-কখনও সাধকের বোধগম্য হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিনম্রভাবে ভগবানকে প্রশ্ন করা উচিৎ অথবা গুরু মহারাজজীর কাছে জিজ্ঞাসার সমাধান করে নেওয়া উচিৎ। উপরোক্ত দুটি অনুভবই সাধনার আরম্ভিক অবস্থাতে মহাপুরুষের অল্প বিস্তর সেবা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই জাগ্রত হয়। সাধনার উন্নত অবস্থাতে শেষ দুটি অনুভব কাজ করে।

তৃতীয় অনুভব সুষুপ্তি সুরা সম্বন্ধীয়। সাধনাবস্থাতে সুষুপ্তি কাল সেটাকে বলে, যখন দেহ জাগ্রত থাকে কিন্তু মন সুপ্ত থাকে। মন শান্ত, সম, স্থির শ্বাসে প্রবাহিত অথবা ধ্যানস্থ ভজনাকালে সেইসময় ভগবান ক্ষণিকের জন্য সাধককে চেতনাশূন্য করে কিছু নির্দেশ দেন। যেরূপ শল্য চিকিৎসক ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে চেতনাশূন্য করে। আবশ্যক কাটা ছাঁটা করে পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, সেইরূপ যখন ভগবান সাধককে কোন নির্দেশ দিতে চান তখন এক মিনিটের জন্য বাহ্যজ্ঞান লোপ করে কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে পুনরায় সচেত করে দেন। সুষুপ্তি সুরা-এর অনুভব ধ্রুব, অকাট্য হয়।

চতুর্থ অনুভব সমসুরা সম্বন্ধীয়। এই অনুভব পরমাত্ম-স্থিত মহাপুরুষের জন্য। মহারাজজী বলতেন, ''হো, যেমন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সব কানেকশন ঝটপট কাজ করে সেইরকম বিভিন্ন পরিস্থিতি, সাধকদের গতিবিধি আমি বসে বসে দেখি, প্রয়োজন মতো তাড়না দিয়ে তাদের সুচারুরূপে এই পথে চালিত করি। এইরূপ মহাপুরুষকে ভগবান খেতে, উঠতে-বসতে, চলাফেরা করার সময়, কারও সঙ্গে কথা বলার সময়, ঘুমা-জাগা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে নিজের মত সম্বন্ধে অবগত করান। এই অনুভবগুলিতে আকাশবাণীর সমাবেশও রয়েছে।''

'তুলসীদাস (মন) বস হোই তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু বরজৈ।' *(বিনয়০ পদ ৮৯)* মন তখনই আয়ত্তাধীন হয় যখন প্রেরক রূপে স্বয়ং সদ্‌গুরু সঞ্চালিত করতে শুরু করেন। তা ভিন্ন সাধক বুঝতে পারে না সে তখন ঠিক কখন ভুল করছে। **'ছুটই মল কি মলহি কে ধোএঁ। ঘৃত কি পাব কোই বারি বিলোএঁ।।'** *(মানস, ৭/৪৮/৫)* প্রায়ই লোকে বলে যে, আমি ত অনেক বিচার করে বিকারগুলি দূর করেছি। বিশ্লেষণ করতে-করতে বিকারের মূল পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। বিশেষ দৃষ্টি দ্বারা দেখলাম। যেমন কাম বিকার উৎপন্ন হল। তৎক্ষণাৎ বিচার করলাম যে রূপ ক্ষণভঙ্গুর। বিষয়াসক্তি হল ক্ষণিকের পাগলামি। এই বিচার করে তখনি তা ত্যাগ

করলাম। শান্ত হয়ে বসে পড়লাম কিন্তু এটা সঠিক পদ্ধতি নয়; কারণ সব খেলা ত মনের। **'গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাই।।'** *(মানস, ৩/১৪/৩)*-মন যে-যে সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রত্যেকটি মায়ার অন্তর্গত।

ব্রহ্মবিদ্যা– এই তারতম্যে ব্রহ্মবিদ্যা, মনকে সাধনার পরিধিতে নিযুক্ত করে রাখার চাবিকাঠি। সাধনাকালে যত অনুভূতি হয়, সেগুলি বুঝতে সাহায্য করে। ব্রহ্মবিদ্যা।

যোগ-সাধনাতে নাম, রূপ এবং ব্রহ্মবিদ্যার স্থান সর্বোপরি কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা অধিকারী ব্যক্তির বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভজনার জাগৃতির পর মহারাজজী আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করেছিলেন, তাতে রামায়ণের কথাবস্তুর আধ্যাত্মিক রূপক প্রস্তুত করেছিলেন। এই বিদ্যা অন্তঃকরণের আসুরিক এবং দৈবীবৃত্তিগুলির চিত্রণ। যে সাধকের শুরুতেই এটি বোধগম্য হয় সে সর্বোপরি। তা সত্ত্বেও প্রায় দশমাস পর্যন্ত এ বিষয়টি আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি; কিন্তু মহারাজজীর নিরন্তর নির্দেশে আমি এটি মুখস্থ করে একজন বরিষ্ঠ সাধুকে শুনিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন-মুখস্থ করে নিলে কি হবে? এটা তখনই সার্থক হবে যখন অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি এর অনুরূপ হয়ে যাবে। সেইরূপ দৃশ্য অন্তরে দেখা দেবে। আমার মনে এক নতুন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল।

মহারাজজী বলেছিলেন, দেখ, **'জুগুতি বেধি পুনি পোহিঅহিঁ রামচরিত বর তাগ। পহিরহিঁ সজ্জন বিমল উর, সোভা অতি অনুরাগ।।'** *(মানস, ১/১১)* রামের চরিত্র যুক্তি দ্বারা জেনে অর্থাৎ এর আশয় এই, এর অর্থ এই-এইরূপ জেনে স্মৃতির সুতোয় গেঁথে পরে নাও। অভ্যাস কর, মনন, চিন্তন কর। আমি তো অল্প একটু বললাম। তোমার অন্তরে বসে বিস্তারিতভাবে বলব। **'গুরোর্মৌন ব্যাখ্যানং ছিন্নতে সর্বসংশয়ম্।'**-গুরু মৌন থেকে অন্তর থেকে উপদেশ দেন, যার ফলে সব সন্দেহ দূরীভূত হয়। এখন এই বিষয়টিকে চিন্তনের সাহায্যে সূক্ষ্ম অথবা বিস্তৃত করা তোমার কাজ। প্রতিদিন এর একমালা, একবার আবৃত্তি অবশ্য করবে।" আমি চিন্তনে নিযুক্ত হয়েছিলাম। শুরুতে আধঘণ্টা সময় লাগত। যখন সূক্ষ্মতা আসতে শুরু করে তখন ক্রমশঃ বেশী সময় লাগতে শুরু করে এবং এই অভ্যাসে সময় গিয়ে তিন ঘণ্টায় ঠেকেছিল। সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে যেত, বুঝতেই পারতাম না। একদিক থেকে আরম্ভ করতাম এবং এর এই আশয়, সেটার অর্থ ঐ করতে-করতে অন্যদিকে পৌঁছে যেতাম। মাঝে তিন-চার বার ইতর সঙ্কল্প এসে মনে বিক্ষোভ

সৃষ্টি করার প্রয়াস করত কিন্তু সঙ্কল্প জাগার আগেই জানতে পারতাম। তাই সেগুলি ছেদন করে আমি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মবিদ্যাতে পূর্ববৎ নিযুক্ত হতাম। নিত্য একমালা আবৃত্তি দ্বারা সাধনা সূক্ষ্ম হয় এবং বহুতে আকৃষ্ট মনকে বলপূর্বক আহরণ করে একমাত্র পরমাত্মাতে প্রবাহিত করে দেয়। মস্তিষ্কে ব্রহ্মবিদ্যার এক-একটা প্রসঙ্গ পৃথক-পৃথক তালিকার ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন অনুভব হয়েছিল যে ব্রহ্ম বিদ্যার জ্ঞাতা আমি।

মন ততটাই বড় যত বড় এই সংসার! কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা মনন করলে এটা ছোট হয়ে যায়। অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য কমে তখন মনকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেখার কাজে নিযুক্ত করতে হয় এবং দু'তিন ঘণ্টা পর যখন চাঞ্চল্য আরও কমে আসে তখন এই মনকেই স্বরূপ-এর ধ্যানে নিযুক্ত করতে হয়। মন অবশ্যই স্থির হবে। মন লাগে না এই নালিশ বন্ধ হবে। ভগবান শিব, কাকভুশুণ্ডি এবং লোমশ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এই ব্রহ্মবিদ্যা গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে সুরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি গোপনীয়, শুধু অধিকারীদের জন্য।

মহারাজজী বলতেন, "ভজনা জাগ্রত হওয়ার পর সর্বদা মনের পিছনে বিচারের পাহারা বসানো উচিৎ। মনকে নাম, রূপ অথবা ব্রহ্মবিদ্যাতেই সদৈব নিযুক্ত রাখা উচিৎ। অন্যত্র যাতে ঘুরে না বেড়ায়। যদি মন ভজনা থেকে সরে তবে মায়ার রাজ্যে বিচরণ করবে। বিরহ, বৈরাগ্য এবং ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার, হারিল পাখির ন্যায় নিষ্ঠা (হারিল একপ্রকার পাখি। এই পাখি যখনই মাটিতে নামে গাছের সরু একটা ডাল দু'পায়ে ধরে মাটিতে নামে, দানা শষ্য খেয়ে উড়ে যাবার সময় ডাল ছেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসে। নামবার সময় আবার একটা সরু ডাল দু'পায়ে ধরে নীচে নামে ডালের সঙ্গে ছাড়ে না। এইরূপ সাধককেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিৎ।) অর্থাৎ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, সেই সফল হয়। যার মধ্যে বিরহ, বৈরাগ্য নেই, ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা নেই; তার জন্য ভগবান বলে কেউ নেই।"

।। ওঁ।।

ভাব-সুমন

—::১::—

অনুসুইয়া মে শ্রী পরমহংসজী ধূনী রমায়ে বৈঠে হ্যাঁয়।
নহিঁ বর্ণন কর সকে জুবাঁ, ওয়ে দিল কো চুরায়ে বৈঠে হ্যাঁয়।।
সরকার হ্যাঁয় সর্বোপরি সুন্দর, ওয়ে ব্রহ্ম ঋষি কহলাতে হ্যাঁয়।
গিরী মহেন্দ্র শির উপর হ্যায়, চরণো সে স্রোত বহাতে হ্যাঁয়।।
সাথী জিনকে বন্দর মছলী, আতে তীতর কে জোড়ে হ্যাঁয়।
বাঘম্বর বিস্তর হ্যায় উনকা, সত শান্ত চদরিয়া ওঢ়ে হ্যাঁয়।।
মন্দাকিনি গঙ্গা তট পর কেশরী কিলোলেঁ করতে হ্যাঁয়।
মৃগশাবক ফুদক রহে নির্ভয়, করুণা কে ঝরনে ঝরতে হ্যাঁয়।।
ইয়হ্ সিদ্ধভূমি ভী ধন্য হুই, জব সে সরকার বিহরতে হ্যাঁয়।
হ্যায় অইসি, বিকট ঘনী ঝাড়ী, অবলোকত দুর্জন ডরতে হ্যাঁয়।।
ধূনী উপর হ্যাঁয় দো ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ কি মালা লটকে হ্যাঁয়।
জহঁ নিত ডমরু বাজে ডিম-ডিম, সৎসঙ্গী আগম কহতে হ্যাঁয়।
স্বয়ং পরমানন্দ, সচ্চিদানন্দ, অড়গড়, অখণ্ড ভগবান হী হ্যাঁয়।
শরণং সতগুরু বলদেব রাম, আনন্দ সহিত শিব বৈঠে হ্যাঁয়।।

—::২::—

সন্ত মোহিঁ শ্যাম স্বরূপ লখাও।
মোর মুকুট মকরাকৃত কুণ্ডল, উর ভৃগুচরণ দিখাও।।
মরকত-মাল, কম্বু-কল-গ্রীবা, চরণ কমল দরসাও।
মতি অতি নীচ, উঁচ রুচি চাহৌঁ, সেবক কহঁ অপনাও।।
পীতাম্বর অরু শঙ্খ চক্র গহি রজ সত তমহি ভগাও।
বিরহি পরমহংস থকি বৈঠে, উরঝী অব সুরঝাও।

—::৩::—

শ্রী পরমহংস স্বামী বিনা দিল বেকরারী হ্যায়।
করুঁ ম্যায় কিস তরহ বর্ণন যতী-প্রেমী পূজারী হ্যায়।।
কলাধর ভাল পর ঝলকে, হ্যাঁয় কালে কেশ ঘুঁঘরালে।
কবুতর কে সদৃশ গর্দন, কমল যুগ নেত্র ভারী হ্যাঁয়।।
বতীসী দাঁত কী চমকে, অধর বিম্বা কে ফল লাজে।
কীর কে তুণ্ড সম নাসা, বিভূতি অঙ্গ সঁওয়ারী হ্যায়।
ভুজা আজানু বৃষ সীনা, উমর চালিস বয়ালিস কী।
কদলী কে খম্ব সম জঙ্ঘা, কটি কেহরি বিদারী হ্যায়।।
চরণ জিনকে বহুত কোমল মনোহর নখ সুধাকর হ্যাঁয়।
কহে বলিরাজ সুন অঙ্গদ, এ সুষমা সবসে ন্যারী হ্যায়।।

—::৪::—

ইস সঘন তমিস্রা কে নভ মে তুম এক মনোরম চাঁদ খিলে।
ইস অমাঁ নিশা আঁধিয়ারী মে, তুম পূনম বনকর আ নিকলে।।
হে পরমপিতা! হে পরমইষ্ট! হে জগত্রাতা! -হে ব্রহ্মনিষ্ঠ!
হে কর্তা-ভর্তা সংহর্তা! হে বিশ্ব-বিধাতা! হে বরিষ্ঠ!!
বাস্তবিক সনাতন মূল ধর্ম কা আশয় তুমনে সমঝায়া।
জগ পড়া বিশ্ব, ভূলে ভটকোঁ তক যে নবীন দর্শন পায়া।।
ভক্তোঁ কি রক্ষা মে তৎপর, প্রতিপল আতম-পথ উন্নেতা।
প্রারব্ধ ঝেলতে দীনোঁ কা, তুম অতুলনীয় সুখ-দুখ জেতা।
অনুসূইয়াজীকে রাজহংস! উন্নত ললাট পর শশি ঝলকে।
কুন্দন-কায়া কর্পূর গৌর, মৃগ শাবক সী আঁখে ছলকে।
দুনিয়া মে ভক্ত কহীঁ ভী হোঁ, সবকে সঙ্কল্প পকড়তে হো।
তুম অকথনীয় লাবণ্যযুক্ত চিন্তন মে কভী উভরতে হো।।
হে চিৎস্বরূপ! আনন্দ পরম! তুমকো প্রতিপল ভজতা হুঁ।
ইয়্হ আবাগমন কটে প্রভুবর প্রার্থনা ইয়হী করতা হুঁ।।

মানবতার চরমোৎকর্ষ

মনের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে উৎপন্ন দেহধারীরা ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন সুখ উপভোগ করে। স্ত্রী-পুরুষ-এর সংযোগ, মাতা-পিতার বাৎসল্য, রাগ-দ্বেষ এবং সমস্ত বিষয়ের প্রসার সমস্ত জীবধারীদের মধ্যে সমানভাবে রয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির অনুকূল বিষয় প্রাপ্তিতে তুষ্টি এবং প্রতিকূল বিষয়ের সংযোগ হলে অত্যন্ত শোক এবং গ্লানিভাব তো পশু-পক্ষীদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন কোন সুস্থ বলদের দিকে দৈবাৎ যদি কোন শকুনী অথবা কুকুর যায় তাহলে বলদটি সিং দ্বারা প্রহার করার জন্য তার দিকে ছুটে যায় কিন্তু যখন সেই বলদই কোন সিংহের সম্মুখে চলে আসে তখন ভয়ভীত হয়ে অত্যন্ত দীন অবস্থাতে কাঁপতে থাকে। যদি এই হর্ষ এবং শোকের পরিধিতে মানুষ জীবন যাপন করে তবে সে পশু পক্ষী তুল্য।

যাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, তাঁরা মানবদেহ-এর প্রশংসা করেছেন। বস্তুতঃ এই মানবদেহ তখনই প্রশংসনীয় হবে যখন সেই পরমপুরুষের চরণযুগলের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে যে, সেই অপার্থিব স্নেহ কিরূপে প্রারম্ভ হবে? সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ এবং আদি, অলৌকিক শব্দগুলি দ্বারা ব্যক্ত অমৃতময় পরমপুরুষ চেতন সত্তা তো সর্বত্র সমানরূপে ব্যাপ্ত। আকাশ, পাতাল, সূর্য, চন্দ্র এমনকি প্রকৃতির প্রতিটি কণাতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম স্বরূপে সেই পরমচেতন সত্তার সঞ্চার হচ্ছে। মানুষের কোন ক্রিয়া তাঁর চক্ষু এড়িয়ে যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রযত্নশীল কোটি কোটি জিজ্ঞাসুদের মধ্যে এক দু'জনই তাঁকে জানতে পারেন। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে সেই বিশ্বব্যাপী সত্তাকে জানার অনুপম বিধি সম্বন্ধে বলেছেন। যে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য, তাঁরা দেহধারণ করেছেন। সেই কাজ সম্পূর্ণ করে সেই পরম পবিত্র স্থিতিতে দিনযাপন করে সময় হলে স্থূল দেহ ত্যাগ করেছেন। কালান্তরে সেই মহাপুরুষদের তিরোধানের পর তাঁদের সদ্ উপদেশগুলিকে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে আচরণ ও শিক্ষা ছেয়ে ফেলেছে। যা ভ্রান্তিতে পূর্ণ পাঁকে পরিবর্তিত হয়েছে। সত্যপথ জানার জন্য সেই পরমপ্রভুর অন্বেষণ পরম আবশ্যক, ন'দিনে পাঁচ কিলোমিটার যাত্রা-এর উক্তি চরিতার্থ করেছে আমাদেরই অনেক ভাই। এঁরা পরিশ্রম তো অনেক করেন কিন্তু পৌঁছাতে পারেন না, সেইজন্য আমরা সত্যকে কিরূপে অনুসন্ধান করব? তার জন্য সামান্য প্রেরণা এই কৃতির

মাধ্যমে লাভ হবে। যেরূপ পূজ্য শ্রী গুরুদেবের বাণী হল সাধনা কেউ করে না পরন্তু মহাপুরুষ করিয়ে নেন।

প্রস্তুত কৃতিতে সম্প্রদায় বিশেষের সমর্থন অথবা খণ্ডন করা হয়নি। কারণ পীযূষবর্ষী সাধনাত্মক ক্রিয়া একটাই রয়েছে যা সেই পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ যদি মনে সেই অদৃশ্য সত্তাকে লাভ করার ইচ্ছা জেগেছে তবে নির্বিবাদরূপে সেই প্রয়োগাত্মক পথে চলতে হবে। অপৌরুষেয় নিধি শ্রী গুরুদেবের অমর বাণীতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শাস্ত্রগুলি এবং উপনিষদের অধ্যাত্ম-প্রসূত বিলক্ষণ অর্থ প্রস্ফূটিত হত কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি; কারণ পরমপূজ্য মহারাজজী সদৈব বলতেন যে, চরমোপলব্ধির গূঢ় রহস্য শুধু অধিকারীদের জন্যই সুরক্ষিত। অধিকারী পারলৌকিক বস্তু লাভ করে তবেই ক্ষান্ত হবে।

সাবধানবাণী এবং সংস্কার সৃজনের জন্য দর্শন-স্পর্শ এবং প্রশ্নগুলির উত্তরই ভিন্ন স্থিতিযুক্তদের জন্য পর্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অথবা সাহিত্যিক অনুসন্ধান বিষয়ক কোন পুস্তক যদি প্রারম্ভিক স্তরের ছাত্রকে অধ্যয়ন করার জন্য দেওয়া হয় তবে কি সে তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে?

হ্যাঁ কালান্তরে সেই প্রাথমিক স্তরের ছাত্রটি ক্রমাগত অধ্যয়ন করে সেই যোগ্যতা লাভ করতে পারে। সেইজন্য এটা সামান্য বিষয় ভাবা উচিৎ নয়। ক্ষমতা লাভ হলে উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। যথা-

গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ।।

(মানস, ১।১০৯।২)

বস্তুতঃ অধিকারীর কাছে গোপন করা হয় না। ঈশ্বর লাভে ইচ্ছুক এবং খুবই উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি এই পথে চলার যোগ্য। ভগবদ্-ভক্তি ব্যতীত গমনাগমন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। যথা-

রামচন্দ্র কে ভজন বিনু, জো চহ পদ নির্বান।
গ্যানবন্ত অপি সো নর, পসু বিনু পূঁছ বিষান।।

(মানস, ৭।৭৮ ক)

যদি কেউ ভগবদ্-ভজন ব্যতীত কল্যাণ (মোক্ষ) কামনা করে তবে জ্ঞানী হলেও সে পশু। পার্থক্য এটুকুই যে সে ল্যাজবিহীন। অতএব ভজনাতে সন্দেহ হওয়ার অর্থ আত্মহত্যা করা। ভজনাতে সন্দেহ জাগার সঙ্গে সঙ্গে ভজনাকারী ব্যক্তি অন্যের উপর দোষারোপ করতে শুরু করে কিন্তু অন্যকে দোষ দিলে নিজেরই অমূল্য সময়

নষ্ট হয়। প্রত্যেক প্রযত্নশীল ব্যক্তির জীবনের সৌন্দর্য তো নিরন্তর ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই নিহিত, এর পরিণতি পরমশান্তি, পরমানন্দ।

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের পবিত্র বৃত্তান্ত (জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি) জনসাধারণের উত্থান হেতু আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে খুবই হর্ষবোধ করছি। এই আশা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে পুস্তকটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে আপনি প্রাচীন পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সত্যতা এবং পরমকল্যাণের পথ কোন্‌টি জানার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করবেন।

অবশেষে সদ্‌গুরুর কাছে প্রার্থনা এটাই যে সকল প্রযত্নশীল ব্যক্তিদের ব্রহ্মোন্মুখী প্রয়াস যাতে তিনি কৃপা করে সফল করেন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

নিবেদন

পরমাত্মার জাগরণ, তাঁর অবতরণ এবং তাঁর বাণী প্রসারের একমাত্র মাধ্যম মহাপুরুষ। এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে পূজ্য পরমহংস মহারাজজীর লিপিবদ্ধ পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত জনসাধারণের উত্থান-হেতু সেবাভাব-এ প্রকাশিত করা হয়েছে।

এই কৃতিকে পরমহংস মহারাজজীর আদর্শ জীবন, আশ্চর্যজনক ঘটনা সমূহ আত্মানুভূতির চরমোৎকর্ষে স্থাপন করতে সমর্থ তাঁর অমরবাণী বারমাস্যা সদুপদেশগুলির ক্ষণিক দর্শন, লোকোত্তর শক্তি এবং বিদ্যার সঙ্কলন। এর মাধ্যমে ভক্তদের পথ- প্রদর্শন এবং হৃদয়ঙ্গম হলে সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে।

প্রস্তুত কৃতিতে প্রাচীন পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সত্য এবং পরমকল্যাণের পথ কোন্‌টি, তা বোঝানোর প্রয়াস করা হয়েছে। অতএব সত্যের অনুসন্ধান কিরূপে করা হবে, এর সম্যক প্রেরণা এই কৃতি থেকে আপনি অবশ্য গ্রহণ করবেন।

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো ইস্টেট, গালা নং— ৫,
মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকটে), আঁধেরী (পূর্ব), ভারত- 400069
দূরভাষ —022-28255300
ই-মেল-Contact @yatharthgeeta.com   ওয়েবসাইট-www.yatharthgeeta.com